

লেগে য়, তব্ব খোঁজ! আর তার অদৃষ্টে ঘটে ওঠে না। লালসা
মাত্রই মন ও বন্ধন, ত্যাগের বা ভোগের—স্বকৃতির বা দৃষ্টির
আসক্তি, মানন নিন্দনীয়, বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা আসলে দুই-ই অবস্থা-
বিশেষে বন্ধন বা limitation; তা' মানুষের মুক্তির পথ যোধ
করে দাঁড়ায়। তোমার মেধ-মন-প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমকে তুমি যে
দিন পাপ লেবেল দেবে এবং তাদের গতি দেখে অত্যন্ত উঠবে, এক
হিসাবে সেই দিন থেকেই তুমি যোগপথভ্রষ্ট। এক জন ভূত নামিয়ে
বড় বিপন্ন হয়েছিল, কারণ, সদা-সর্বদা কাজ না পেলে কেজো ভূত
তার ঘাড় মটকাতে চাইত! অতি দুঃসাহ্য কাজও ভূত এক নিমেষে
সম্পন্ন করে ফেলে, তার পর উগ্রমুদ্রিতে আবার উপস্থিত হয় অস্ত
কাজের জন্ত। তখন কোন শুবুদ্ধির উপদেশে সেই বিপন্ন মানুষ
ভূতকে দিত একগাছি বাঁকা কেশ সোজা করবার কাজে লাগিয়ে,
ভূত কেশগাছিকে যতই টেনে সোজা করে, ছাড়া পাবামাত্র
স্বভাব-বাঁকা চুল আবার কুঁকড়ে বাঁকা হয়ে যায়; তখনই সেই
বিপন্ন ব্যক্তি পেল ভূতের হাত থেকে ত্রাণ। এই বাঁকা চুলের
মতই ত্রিভঙ্গ তোমার প্রকৃতি, মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ একে বলে
গেছেন, কুস্তাকী হুম—কুকুরের বাঁকা লেজ! একে সোজা করতে
বাওনার মত বিড়ম্বনা আর নেই। শুচিবায়ু-যোগগুস্ত মানুষ যেমন
যতই হাত-মুখ ধোয়, ততই তুচ্ছ কারণে আবার অন্তঃস্থ হ'লো ধারণায়
বার-বার ধুতে ধুতে হাত-পা সর্বদা তোলো হাজিয়ে ও পচিয়ে,
অন্তঃস্থ-জ্ঞান তার কিছুতেই ঘুচেতে চায় না, নীতিবায়ুগুস্তও তেমনি
নৈতিক শুচিবায়ু-যোগে রুগ্ন; তার সারা জীবন কাটে জড়পিণ্ড মেহের
ও স্বভাব-চঞ্চল মন-প্রাণের কাল্পনিক শুচিতার ব্যর্থ সন্ধানে। “মন
চলা তো কার্যোচিত গলা”—মন যার শুদ্ধ, সে কার্যের বাটিতে গলা
পায়। মন যার শুদ্ধ, তার কাছে জগৎ শুদ্ধ। গীতার ভগবান
বলছেন, “আমি কাউকে পূণ্য দিই নাই, পাপও দিই নাই; কর্ম
ও তার ফল-রূপ সংযোগেরও সৃষ্টি করি নাই; স্বভাবই আপনি
ফুটেছে।” মানব-বুদ্ধির ব্যাবহারিক জগতেই ভাল-মন্দ আছে, অথগুণের
ঘরে নাই; কারণ সে হচ্ছে পরম সম ও দ্বন্দ্বাতীত আনন্দ-ধন ধাম।
তাই সাধকশ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত বলে গেছেন—

শুচি অন্তঃস্থের নিয়ে দিব্য ঘরে যবে শুবি
তবে শ্রামা মারে পাবি,

যবে দুই সতীনে পীরিত হবে

তবে শ্রামা মারে পাবি।

বতকণ মানুষের মন কু স্র, হিত বিপরীত, রাগ ধ্বং ইত্যাদি
দ্বন্দ্বের টানা-পোড়নে ব্যতিব্যস্ত থাকে, সকল সংস্কার-মুক্ত হয়ে প্রশান্ত
ও সমাহিত না হয়, তত দিন জন্ম-মৃত্যু আধির্বাধ্যময় ভবঘাতনা থেকে
মানুষের মুক্তি নাই, এই কথাই কমলাকান্তের গানের ইঙ্গিত।
‘দিব্য ঘর আনন্দে পরমার্থ-জ্ঞানে (Divine consciousness)
অবস্থিতিই বোঝাচ্ছে। উপনিষদের বহু শ্লোক এই ভাবের কথাই
বলছে, যথা “যে শুধু অবিজ্ঞার উপাসনা করে, সে গভীর অন্ধকারে
প্রবেশ করে; যে শুধু বিজ্ঞার উপাসনা করে, সেও গভীরতর অন্ধকারে
প্রবেশ করে” ইত্যাদি।

সত্ত্বভিঞ্চ বিশাশক বস্তুদোষোভয় সহ।

বিনাশেন যন্তুয় তীর্ষা। সত্ত্বাত্ম্যস্তমসঃ সত্বঃ।

নিছক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতরা এই সব পরম সাহায্যচক প্রদানের
যে ব্যাখ্যাই করুন না, তব্ব-সাক্ষ্যকার যার কিঞ্চিৎও হয়েছে, সে
জ্ঞানে উপনিষদের প্রকৃত গূঢ় অর্থ। জীবনে ত্যাগেরও মূল্য আছে,
ভোগেরও মূল্য আছে; সেই একই মহাশক্তির চিহ্নবিশাশই চলেছে
এই গোটা জীবনটি ছুড়ে, তাই আমি তথাকথিত বড়-বিপকে বড়-মুখা
বলি। এরা মানুষের চির-সহচর থেকে ভোগ-জীবনে মানুষের
বুদ্ধিগুলির উন্মেষের সহায়তা করে। বাংলাদেশের তত্ত্ব এ কথা
জানতো, তাই জীবনের বিকৃতিকেও যোগ-সাধনার উপকরণ করে নিজে
পেরেছিল এই দুঃসাহসী পূর্ণদৃষ্টি বীর সাধকের দল। রামপ্রসাদও
জানতেন, সর্ব স্বাবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে সেই পরম জ্যোতির
ও পরাগতির দিকে এগিয়ে। তাই তিনি গেয়েছেন,—

“আমি উজিয়ে যাব উজান টানে

ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।”

সমতা ও দ্বন্দ্ববাহিত্যের পথই সহজ পথ। কারণ, যে ঠাকুরের ভূমি
সাধক, সে যেমন শান্ত ও দ্বন্দ্বাতীত, তাইতো সে সর্ব-রসস্ত রসময়
ঠাকুর, নিখিল, ভাবের ধনি যুগপৎ সে সর্বাতীত ও সর্বময়—ত্যাগ ও
ভোগের মহা-সমময়-ভূমি। তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দেখা পাপ-পুণ্য
সুখ-দুঃখ, শিব-অশিব তাঁরই অথগুণে এক অপূর্ণ জ্ঞানেশ্বর হৃদয়
মহাসিদ্ধুর বৃকে তরঙ্গ-ভঙ্গের মত জাগছে ও লর পাচ্ছে, এই সব
কিছুকে বৃকে করেই তিনি চিরমুক্ত! আমরা দেখে আশ্চর্যবুদ্ধির
জন্তই তো ক্ষুদ্র হয়ে গেছি, তাই একটুতেই পিঁবে বাই, ভেলে পাই।
তাই তাঁর সুখ-দুঃখ পাপপুণ্য আমাদের পথে বাঁটা হয়ে দাঁড়ায়,—
এক গড়ব জলই যে পিঁণ্ডের পক্ষে ডুবে মরবার সাগর।

মনে রাখতে হবে যে, যোগপথ সত্য অমুসন্ধানের পথ, নৈতিক
ভালমানুষ্যের পথ নয়; শুধু নৈতিক বাড়ানার ও পথে চলাতে পারে
না। এখানে বিশ্বমঙ্গল ও ঐব শুকদেব সকলেই তাঁদের স্বভাবগত
ভিন্ন ভিন্ন পথে অমৃত লাভ করে দেবতা হন। জীবনকে তাই ভেদ
পাবে না, জীবনকে শুদ্ধ করবার ভার নিজের হাতে নেবে না। ধীর
দেওয়া এ জীবন, সেই মহাশক্তির উপর সে গুরুভার দিয়ে ভূমি নিয়ে
নিশ্চিন্ত হবে।

ঠাকুর সীরামকৃষ্ণ বলতেন, “সাধা লোকের পা বেতাঁন
পড়ে না, পরমার্থ-জ্যোতিতে দীপ্ত জীবনে বসন্ত সঞ্চারিত রসের
মত শুদ্ধি আপনি লাগে, শুদ্ধিকে খুঁজতে হয় না, তিল তিল করে
গড়তে হয় না। পাপভীত মানুষ হচ্ছে বড়ই বীনাশী, ভীক
যেমন সহস্র বার মরে, তেমন বন-প্রাণ-দেহের তথাকথিত
শুচিতার কায়কের পতন ঘটে প্রতিবৃদ্ধি। ক্রমশঃ নিরোধের
ফলে repression-এ তার জীবনগতি রুদ্ধ হয়ে অবরুদ্ধ জালের মত
দৃষিত হয়ে যায়। সে জীবন বলিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গিত হয় না, ক্রমশঃ শীর্ণ পক্ষু
(maimed) হয়ে পড়ে। একথার কিছু অর্থ এ নয় যে, অব্যব
ভোগ বা অসন্তুতি নিয় প্রকৃতির অসঙ্কোচ অনুগামীতা ত্যাগের বা
নৈতিক কৃচ্ছন্যাসীর চেয়ে ভাল। কোনটারই অতিশয় ভাল নয়।
যে প্রকৃতিতে তার বিকাশের ক্ষমতা বড়টুকু ত্যাগ বা ভোগ কল্যাণকর,
তার পক্ষে ততটুকুই ভাল; তার অতিরিক্ত করতে গেলে আত্ম-
বিকাশের অন্তরায় ঘটে।

মানুষ স্বভাবতই মোহমুগ্ধ জীব, ভাল-মন্দ লব-বিদ্বেষী, অসহ
সহজে পেরে বসে, আর যে নৈতিক উপদেশ দিয়ে তাকে

বিড়বনা বিশেষ। তার মাথায় ত্যাগের মাহাত্ম্য একবার চুকলে মাজা ছাড়াতে ছাড়াতে সে ক্রমশঃ আত্মনিগ্রহের উল্লাসে উদ্ভাসিত হুটতে থাকে। আবার যদি তাকে বোঝাতে বাও গীতার সেই গভীর সমতার বাণী—“নামতে কন্তুচিং পাপং ন চৈবং শ্রুতং বিদুঃ”—তা হলে সে বেপরোয়া হয়ে অতিভোগের চৌঘুড়ি চালিয়ে উদ্ভাস বেগে আত্মকন্ডের পথে ছুটবে।

যোগসিদ্ধির এই প্রথম পরিচ্ছেদের বক্তব্য সংক্ষেপে স্মৃতবাং এই পাড়াচ্ছে যে, জীবনই যোগ; যোগ-সাধনা জীবন থেকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি ছাড়া বা বিপরীত কিছুই নয়। মাহুয়ের অক্ষুট সহজ জীবন বিকসিত হতে হতে ক্রমশঃ ক্ষুট যোগ-সাধনায় গিয়ে পাড়ায়। আমাদের বুদ্ধি মন প্রাণ ও দেহ এই চার ধামের সত্তা বা পুরুষ ও তার শক্তিগুলিকে চিনে নিয়ে তাদের স্তম্ভ ব্যবস্থা করতে পারলেই জীবন আপনি শতদলের মত ক্ষুটতে থাকে, তার অল্পময় স্তম্ভসমূহ স্রবময় ও পূর্ণতার। যেখানে আপনাকে ও আপন বুদ্ধিগুলিকে চিনে নেওয়ার ব্যতিক্রম ঘটছে, সেখানে ব্যুত্থ হতে হবে, সে-মাহুয়ের জাগবার সময় হয় নাই, যোগ-সাধনার শুভ মুহূর্ত আসে নাই, এখনও তার কীট-জীবনই চলছে; তার পর ক্রমশঃ জীবনের ঠেলায় তার গুটি

রচনার প্রেরণা স্বতঃই জাগবে, তখন সমা মাঝে নবদেহ লাভ করে গুটি কেটে আকা তার আসবে পালা।

যোগ-সাধনা কি, কোন্ পথে তার আশ্রয়। পারে বলে দেবার আগে চাই যোগাহুকুল মন। আগে করতে হবে নিরসন, নাহলে অভ্যস্ত ভুলে পুনরাবৃত্তি। হিন্দুর ধর্ম ও যোগশাস্ত্র বহু দিনে ধরে আর্থাপুত্ররা এ পথে করেছেন গতি-বিধি। অনেক ভ্রান্তি, সংস্কার ও পুরাতন মিলে অলোকে করেছে কটকা-কীর্ণ। সহজ হয়ে গেছে জটিল, দুর্গম ও হুর্কোধ্য; লক্ষ্য হয়ে গেছে আপুসা ও প্রাস করে বসেছে উদ্দেশ্যকে, সাধ্য গেছে হা এড়িয়ে সবল ঋজু দৃষ্টি নিয়ে সহজকে আবার ধরতে হবে, নিছক সত্যাহুসন্ধানকেই করতে হবে যোগ-সাধনায় এই অতি-সহজ পথটি নির্দেশ করে উদ্দেশ্য। এ পথ যে কত খাঁটি, তা পরখ করে চলবে। এ পথ সকল যোগ-পথেরই অন্তর্নিহিত লক্ষ্য

অগ্রহায়ণ

ভীকু আশা আর বোঝাকার অশ্রু-জল
বুনেছি মাটিতে; সোনাফসল
প্রাণকল্লোলে আকাশে তুলেছে হাজারো হাসি।
মৃত স্পন্দেরা হয়েছে বাসি;
রভসে এলানো মাটির মমতা গেয়েছে গান—
কাঁচা সোনা ধান—শুধুই ধান।

জানি চিরকাল ভয়-সঙ্কল এ বালুচর—
ভালবাসা পেয়ে, ভালবাসা দিয়ে পরস্পর
বারে বারে তবু লিখেছি নাম;
হিসাব রাখি না কত বা পেয়েছি কত দিলাম।
বহু ভয়ে, বহু বিজয়ে তাই ত বেঁধেছি ঘর।
তবু ঝড় এল ভয়ঙ্কর।

অগ্নি-লক্ষ্যে তাকাল' কখন চৈত্রমাস—
সোনার ফসলে সর্বনাশ।
ভীকুস্পন্দে মৃত্যুতে তাই ললাট হানি,
ছুনিয়ার হালচালের খবর আমি কি জানি।
মমতার মোহে তবুও করেছি যে সঞ্চয়
জানি আজ শুধু ভাগ্যের দোষে আমার নয়।

বিচারের টানে সহরে এলাম অনিচ্ছ
উপোসী রক্ত অন্ন চায়।
বলি বার বার সেই যে আমার অশ্রু-
ফলালো মাটিতে সোনাফসল—
যতটুকু হোক দাও আজ হব খুশী ত
অন্ন নেই—অন্ন নেই
ফিসফিস করে কথা বলে যত ইট-পা
মেলেনি অন্ন সে জনারণ্য নিরন্তর।
ছুনিয়ার হালচালের খবর আমি কি
ভীকুস্পন্দে মৃত্যুতে শুধু ললাটই হানি
অবশেষে তাই কল্লোলে গাঁথা লড়ক।
এলাম আবার মমতা কঠিন মাটির
প্রাণে কখন অগোচরে বুঝি নেমে
সহবেদনার অশ্রু-জল।
আমনি গেল, গেছে কান্তিক, পৌষ
সবুজ ধানের উর্দ্ধে সোনালী রোজ হ
ভাঙ্গা ঘর জোড়াতালি দিয়ে তাই
সঞ্চয় চাই—জীবন-খেয়ার স্রাব্য কবি
অশান-মাটিতে চাপা পড়ে গেছে সব
এবারও আসে কি চৈত্রমাস?



ভূপেন্দ্র সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাশের ছাত্র। সে কবিতা লেখে, কলেজ-ম্যাগাজিনে গরম-গরম প্রবন্ধ দেয়, ছাত্র-ফেডারেশন লইয়া মাতা-বাতি করে, বিজয়লালের কবিতা রাত জাগিয়া মুগ্ধ করে, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া লাফাইতে থাকে এবং জওহরলালজীকে দেবিবার জন্ত তিন ঘণ্টা বোম্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অরভোগ করে। অর্থাৎ এক কথায় সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রের পক্ষে বাহা করা স্বাভাবিক তাহাই করে। এবং কেহ যদি তাহাকে এই কথাটাই শ্রবণ করাইয়া দেয় ত চিট্টা আশুন হইয়া ওঠে।

বন্ধু-বান্ধবদের উপর ভূপেনের অবজ্ঞার সীমা নাই। পৃথিবীতে এত আশাস্ত্র লোক আছে—আশ্চর্য! এই নির্দোষ লোকগুলির সঙ্গেই তাহাকে দিন-রাতের বেশীর ভাগ সময় কাটাইতে হয়, সে জন্ত তাহার পরিতাপের সীমা থাকে না, অথচ সে এই নির্দোষ লোক-গুলির কাছেই নিজের অসুখ বিজ্ঞাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া যে অপরিণীম আত্মতৃপ্তি লাভ করে, ইহাও সত্য কথা। বাবাকে সে একটু করুণার চোখে দেখে। তিনি দরিদ্র এবং সেই হেতু অত্যন্ত নির্দোষ, সন্দেহ নাই; তবে তাহার সামান্য উপাধ্বন দিয়াই তিনি প্রাণপণে তাহার স্বাস্থ্যশস্য ব্যবস্থা করেন, এই প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট মনে করিয়া ভূপেন তাহাকে মার্জনা করে। নিজে একটা টাইশনি করিয়া নিজের সাবান, স্নো, স্পিয়ার প্রভৃতির খরচা সংগ্রহ করে, আর তাহার একান্ত মূল্যবান সময়ের অনেকখানি এই ভাবে নষ্ট হয় মনে করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে।

প্রায় সমস্ত কলেজের ছাত্রদের মতই ভূপেনের বিশ্বাস যে, তাহার চিন্তা ও জীবন-ধারায় সে অসাধারণ! এবং প্রায় সমস্ত আধুনিক বাঙালী ছাত্রদের মতই সে শেলী ও বার্নার্ড শ'র অসুখ একটা সমিশ্রণের ফল। প্রেমকে বলে সে লিভারের অসুখ, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বলে সে সিস্টিমেন্টাল রাবিশ, অথচ শরৎচন্দ্রের চমকপ্রদ প্রেমের কাহিনী পড়িয়া রাখে তাহার ঘুম হয় না এবং কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতাংশ উদ্ধার করে। রোমাণ্টিক চিন্তার ও করুণার প্রায় দিন-রাতই ডুবিয়া থাকে, যদিও মুখে আঙড়ার বার্নার্ড শ'!

বালি একটা ব্যাপারে তাহার কিছু অসাধারণত্ব সত্যই ছিল। তাহার স্থূল ও কলেজের অজ্ঞান বন্ধুরা ইতিমধ্যেই মেয়েদের প্রেমে পড়িয়াছে, পড়িতেছে কিবা সম্ভ্রান্তি স্নান হইয়া ও-বস্ত্রটিকে ছাড়িয়া দিয়াছে—এই কথাটা সে নিত্য শোনে, কিন্তু তাহার নিজের এখনও সে সুরোগে ঘটে নাই। স্থূল পড়িতে পড়িতেই বাহারা প্রণয়ের হাতে-খড়ি সজ্জ করিয়াছে, অপদার্থ-জ্ঞানে তাহাদের সে যেমন একটু ঘৃণা করে, তেমনি যে সব ছেলে সম্ভ্রান্তি প্রেমে পড়িবার অত্যাশ্চর্য বিবরণ প্রত্যহই শোনাইতে থাকে, তাহাদের একটু হিংসা না করিয়াও পারে না। কারণ, যদিও মুখে সে বলে যে কোন মেয়ের

সঙ্গেই আশ ঘণ্টার বেশী আলাপ করা যায় না, সুতরাং প্রেমে পড়াটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ব্যাপার, আসলে কিন্তু তরুণী মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ তাহার হয় নাই, এ জন্ত সে একটু দুঃখিতই।

দারিদ্র্যের জন্ত আত্মীয়-স্বজনদের সহিত বহু দিন হইতেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর ঠিক সেই কারণেই বন্ধু-বান্ধবদের অন্তঃপুবে প্রবেশাধিকার পায় নাই। সুতরাং তরুণীদের সহিত তাহার বা-কিছু পরিচয়, তাহা শুধু বন্ধু-বান্ধবদের মুখে ও আধুনিক উপভাষা সে।

টাকার প্রয়োজন যেমন তাহার সর্কাপেক্ষা অধিক, তেমনি টাকা উপাধ্বনের জন্ত বাহারা ভূতের মত খাটে, ভূপেন্দ্র তাহাদেরই ঘৃণা করে সকলের চেয়ে বেশী। প্রায়ই সে বন্ধু-বান্ধবদের বলে, 'silly goat' এর মত দিনরাত টাকার পেছনে ঘুরে বেড়ানোই কি মনুষ্য-জীবনের একান্ত সার্থকতা? তার কি আর কোন কাজ নেই?' অথচ ছেলে পড়ানোর টাকাটা এক দিন পাইতে দেয়ী হইলেই যে কি 'সকটজনক পরিস্থিতি'র মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়, তাহা ভূপেনের মত কে আর অনুভব করে?

আমাদের বর্তমান গ্রন্থের নায়কের চরিত্রটা মোটামুটি ইহাই। এ-হেন ভূপেনের জীবনে সে দিন যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গেল, সেই কথাটা বলিয়াই আমরা আখ্যায়িকা শুরু করিব।

তিন দিন পর-পর ছুটি গিয়াছে, আজ চতুর্থ ও শেষ দিন। বাকী তিনেক দিবা-নিশা দিয়া উঠিয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ভূপেন সহসা অনুভব করিল যে তাহার বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ নাই। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে, আমরাও মধ্যে মধ্যে অনুভব করি, ইংরেজীতে বাহাকে বলে sudden realisation যে আমাদের পরিচিত বহু লোক থাকিলেও বন্ধুর সংখ্যা খুব কম। এবং সেই বিশেষ বন্ধু, নাটকীয় ভাষায় বাহাকে 'আত্মীয় আত্মীয়' বলে, তাহার প্রয়োজন মানুষের এক-একটা মুহূর্তে বড় বেশী হইয়া পড়ে।

ভূপেনেরও সে দিন সেই অবস্থা। তাহার অনুরক্ত সহপাঠীর সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু মনে মনে তাহাদের চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই কেহ কোন দিন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ আজ সে বোধ করি প্রথম বৃত্তিতে পারিল যে, অন্তরঙ্গ কাহাকেও তাহার দরকার। বিশেষ প্রয়োজন। 'শ্রুশ্রু বৈশ হাঙ্গাইতে পারে, কিন্তু বড় বেশী রকমের ভাসা ভাসা; নিখিলের সজ আশ ঘণ্টার বেশী সহ করা যায় না, বন্ধিম পড়াশুনা চের করিয়াছে, গড় বলিতেও জানে, কিন্তু বিপদ হইতেছে এই যে, সে উত্তম-পুঙ্খ সাক্ষাত গল্প ছাড়া একটা কথাও বলে না এবং বত কিছু কথা বলা সে একঘেটে করিতে চায়। একমাত্র বিত্ত, বিত্তের সহিত এই সময়টা কাটানো চলিত, কারণ, তাহার সবচেয়ে বড় গুণ, সে কথা বলে কম—কিন্তু, দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত তাহার কথাই মনে পড়িল, বিত্ত দেশে গিয়াছে। অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্তে বাহার কাছে বাঙালা যায়, এমন একজন বন্ধু-বান্ধব তাহার নাই।

কিন্তু 'এমন দিনে' আর থাকারও অসম্ভব, সুতরাং, সন্ধ্যাটা চড়াইয়া পথে বাহির হইয়া পড়া হাতে ইত্যাদি নাই।

বাহির হইয়া পড়িল। সিমলার সর্কার গলি পার হইয়াই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কিন্তু সে দিন সে পথও যেন জনহীন বলিয়া বোধ হইল। ভালো লাগিল না। তখন সে স্থির করিল, একা হাঁটিতে হাঁটিতে ইডেন গার্ডেনেই যাইবে।...

চলিতে চলিতে তাহার ভালোই লাগিল। আকাশটা মেঘলা করিয়া আছে বলিয়া গরম যেন একটু বেশী, তবু সবটা জড়াইয়া মোটের উপর ঘরের চেয়ে অনেক ভালো। বৌবাজার পার হইয়া উৎসাহ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে বেশ জোরে জোরে চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই এক সময়ে ধর্মতলার মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল।

কিন্তু এতক্ষণ, বোধ করি উৎসাহের আতিশয্যেই, আকাশের দিকে সে একবারও চাহিয়া দেখে নাই, এখন হঠাৎ গড়ের মাঠের বাস্তব পড়িতেই বড় বড় জলের কঁোটা নামিতে শুরু করিল। তখন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, সে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, যে-কোন আশ্রয়ে পৌঁছিতে গেলেও অন্ততঃ দশ-পনের মিনিট পথ হাঁটিতে হইবে। এখানে জলও বেশ জোরে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন মাঠের পথ ধরিলেও চোরঙ্গী পৌঁছিবার পূর্বেই ভিজিয়া যাইবে। সুতরাং আর কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া একটা বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় লইল এবং নিজেকে 'নির্বোধ' 'ইডিয়ট' বলিয়া গালি দিতে লাগিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া যে সে আরও কত আহাম্যিক করিল তাহা বোঝা গেল আর একটু পরেই। বৃষ্টির বেগ ত কমিলই না, বরং ক্রমশঃ তাহা মুষলধারায় পরিণত হইল। গাছের পত্রাচ্ছাদনে সে-জল বাধা মানিল না, দেখিতে দেখিতে জামা-কাপড় ভিজিয়া আড়া কানের মত অবস্থা দাঁড়াইল তাহার। অথচ তখন সেটুকু আশ্রয়ও ছাড়া চলে না—জলের এমন বেগ!

আরও মিনিট-দশেক এই ভাবে কাটিবার পর যখন ব্যাপারটা প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় পিছন হইতে সহসা একখানা প্রকাণ্ড গুড়ী ছুঁ করিয়া আসিয়া ঠিক তাহারই সামনে সশব্দে ব্রেক করিল। ভূপেন বিস্মিত হইল! মোটর-বারী কোন লোকের সহিত তাহার পরিচয় নাই, থাকিবাশ কথ্যও নয়। সে অবাক হইয়া গাড়ীটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় একটা কাচের গবাক্ষ একটু নামিয়া গেল এবং বহুর দশ-এগারোর একটি ফুটফুটে মেয়ে মুখ বাড়াইয়া কহিল,—ও মশাই, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আসুন আসুন—গাড়ীর মধ্যে এসে উঠুন।

ভূপেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি আবার কহিল,—চলে আসুন না চট্ট করে। আমি শুধু ভিজ্জে গেলুম যে। কি জালা!

ভূপেনের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটো নাই, তবু সে কহিল,—কিন্তু আমি যে ভীষণ ভিজ্জে গেছি থুকা, গাড়ীতে উঠলে গাড়ীময় জল হয়ে যাবে।

সে জবাব দিল,—তা হোক, আমাদের চামড়ার গদি, কিছু হবে না। চলে আসুন।

সে দুয়ারটা কীক করিয়া ধরিল। অগত্যা ভূপেন গাছতলা বাড়িয়া ছোট্ট মতে গিয়া গাড়ীর মধ্যে হুকিয়া পড়িল। মেয়েটিও

সিমলা জিমা জামনার কাচ তুলিয়া দিল।

গাড়ী ততক্ষণ চলিতে শুরু করিয়াছে। ভূপেন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও মাথা মুছিতে মুছিতে একবার গাড়ীর মধ্যে চোখ বুলাইয়া লইল। সেই মেয়েটি ছাড়া গাড়ীতে আর কোন আরোহী নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী শোফেয়ার। মস্ত বড় গাড়ী এবং শোফেয়ারের উর্দ্ধি মালিকের ধনাঢ্যতার পরিচয় দেয়—যদিচ মেয়েটির বেশভূষা নিতান্তই সাধারণ, সাধা আদির ক্রক ও হাতে একগাছি করিয়া চুড়ি। না আছে জলকারের প্রাচুর্য, গায়ে রেশমের বাহার।

জামা হইতে জল গড়াইয়া চামড়ার গদীর খাঁজে ততক্ষণে পুঙ্খ নুষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, ভূপেন সে দিকে একবার কুণ্ঠিত ভাবে চাহিল, কিন্তু কি করা কর্তব্য বুঝিতে পারিল না। মেয়েটি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া জলের দিকে চাহিয়া কহিল,—জামাটা খুলে বসুন না, নাহলে আপনার অসুখ করতে পারে। যা জল, বাবা!

জামাটা খুলিতে বোধ হয় ভূপেনের লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আর কোন উপায় নাই দেখিয়া জামা খুলিয়া সামনের চক্চকে লোহার অনলায় বুলাইয়া রাখিল। তাহার পর অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বসিতে তাহার হৃৎ হইল যে, গাড়ী কোথায় যাইতেছে তাহা জানা দরকার এবং সে নিজেকে কোথায় যাইতে চায় তাহাও জানানো দরকার। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—তোমরা এখন কোন দিকে যাবে থুকা?

থুকা তাহার ভাগর চক্ষু মেলিয়া তাহাকেই দেখিতেছিল, কহিল, আমার নাম সন্ধ্যা। তবে থুকা বলে আমায় দাছ ডাকেন।... আমার এখন বাড়ী বাড়ি।

ভূপেন প্রশ্ন করিল,—কোথায় বাড়ী তোমাদের?

—এই যে, চোরবাগানে। এখানেই আমরা না'ব। আপনি ভিজ্জে জামা-কাপড় ছেড়ে, ওখান থেকে চা খেয়ে তার পর বাড়ী যাবেন, কেমন?

এটুকু মেয়ের এতখানি সৌজন্য ভূপেন বিস্মিত হইল। কিন্তু কহিল,—না, আর জামা-কাপড় ছাড়বার দরকার হবে না, আমার বাড়ী এঁ কাছের। আমি সিমলের থাকি! চোরবাগান থেকে আর কতদূর! চট্ট ক'রে চলে যাব এখন।

সন্ধ্যা তাহার নিষিদ্ধ অথচ খাটো চুলের গুচ্ছ ঢলাইয়া কহিল, পাগল না কি! এত ভিজ্জে কাপড় পরে থাকলে আপনার অসুখ করবে যে! সে আপনি কিছু ভাববেন না, আমি দাছর একটা কুর্সা কাপড় আর একটা গেঞ্জি দিয়ে দেবো'খন, তার পর বাড়ী চলে যাবেন, তার পর সময় মত এক দিন ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ভূপেনের কৌতুক বোধ হইল। সে কহিল,—দাছর কাপড় দিয়ে দেবে, দাছ যদি রাগ করেন?

—ইস!

সন্ধ্যা করুণার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। কহিল, দাছর বাড়ীর গিন্নী ত আমি। দাছর ক'খানা কাপড়-জামা, দাছ কি কিছু খবর রাখে না কি? যা করি সবই ত আমি। সপর্কে সে আর একবার মাথাটা ঢলাইল।

গাড়ী ততক্ষণে চোরবাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। যুহুর্ন্ত করেক পরেই বিরাট একটা বাড়ীর ফটকের মধ্য দিয়া গাড়ী-বাহাদার মধ্যে প্রবেশ করিল।

সাবেক কালের বাড়ী! এখন কিছু হয়ত মলিন, কিন্তু অন্ত্যস্ত 'বেকী বাড়ীর মত হতলী নয়। বাড়ীওয়ালার ঐশ্বর্য যে শুধু এখন বাড়ীর ইট ক'খানাতেই পর্যাবসিত হয় নাই, চাহিলেই তাহা বুঝা যায়।

গাড়ী থামিতেই এক দাবোয়ান আসিয়া দরজা খুলিয়া সেলাম করিয়া গাড়ীহাল। সন্ধ্যা অটল গাড়ীঘেরে সহিত ঈষৎ মাথা হেলাইয়া সেলামটা গ্রহণ করিল; তাহার পর গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল,—আশুন, আশুন, চট করে নেমে আসুন।

কিন্তু বাড়ী ও দাবোয়ানের পোষাক দেখিবার পর ভূপেনের সেখানে প্রবেশ করিতে অন্তস্ত সন্ধ্যাচ বোধ হইতেছিল, বিশেষতঃ সেই অবস্থায়। সে নামিল বটে, কিন্তু জামাটা হাতে করিয়া গাড়ীহায়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিল,—থাক্—এটুকু আমি হেঁটে চলে যাই। জল ত কমে এসেছে।

সন্ধ্যা কিন্তু তাহার কথায় কান দিল না। কহিল,—কিছু জল কমেনি। আপনি আসুন ভেতরে, তার পর দেখা যাবে।

অগত্যা ভূপেনকে ভিতরে আসিতে হইল। লজ্জায় তাহার দুই কান আঁগুন হইয়া উঠিয়াছিল, কোন মতে ঘাড় গুঁজিয়া সে সন্ধ্যার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, চারি দিকে ভূতের দল কোঁতুলী হয়ত বা পরিহাসের দৃষ্টি মেলিয়াই চাহিয়া আছে।

একটা দালান পার হইয়া ভিতরের একটা ঘরে লইয়া গিয়া সন্ধ্যা ছকুমের স্বরে কহিল,—এইখানে দাঁড়ান লক্ষ্মী ছেলের মত—আমি কাপড়-জামা নিয়ে আসছি।

সে চলিয়া গেল।

ভূপেন অসহায়ের মত গাড়ীহায়া ঘরের চারি দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। মাঝারি সাইজের ঘর, একপাশে দেওয়ালের দিকে গুটি-দুই আলমারীতে কতকগুলো জাইনের বই এবং বাঁধানো মাসিক পত্র পাশাপাশি সাজানো বহিয়াছে। মধ্যে একটা টেবিল, তাহাতে ছেঁড়াখোঁড়া কতকগুলো বই-খাতা ছড়ানো এবং খান-দুই চেয়ার। আর কোন সরঞ্জামই নজরে পড়ে না। বোধ হয়, এই ঘরে বসিয়াই মেয়েটি লেখাপড়া করে।

মিনিট-খানেক পরেই সন্ধ্যা ঘরে ঢুকিল, হাতে একখানা থোপদোস্ত কাপড়, একটা তোয়ালে, আর থোয়া গঞ্জি। কাপড়-জামাওলা হাতে কিয়া কহিল, নিন, পরে ফেলুন। ইস্—কি ভেজাই ভিজ়েছেন!

সত্যই ভূপেনের তখন কষ্ট হইতেছিল। বহু ক্ষণ ভিজ়া কাপড়ে থাকিবার ফলে শীত করিতেছিল রীতিমত। সে আর কোনরূপ প্রতীবাদ না করিয়া ভিজ়া কাপড়-জামাওলা ছাড়িয়া ফেলিল এবং তোয়ালে দিয়া ভিজ়া মাথাটা মুছিয়া অপেক্ষাকৃত স্বস্থ হইল।

নিজেই সে ভিজ়া কাপড়-জামাওলা তুলিয়া লইতেছিল, বাধা দিয়া সন্ধ্যা কহিল,—ও থাক। ও আমি কাচিয়ে কাগজ জড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক করে। আপনি এখন চলুন ও ঘরে, চা আনতে বলেছি। তাহার পাকা গৃহিণীর মত চালচলন দেখিয়া ভূপেন না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া কহিল, আবার চা-ও খাওগো!... সলা, তাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার দাছ কাথার? তোমার বাবা-মা?

তাহাকে শব্দ দেখাইয়া লইয়া বাইতে যাইতে গভীর ভাবে সন্ধ্যা

জবাব দিল,—বাবা-মা আমার কেউ নেই। ভাই-বোনও নেই—শুধু আমি আর দাছ। কথাটা সে বেশ সহজ ভাবেই কহিল, কিন্তু ভূপেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। একটু মেন অপ্রস্তুতও হইল। তাড়াতাড়ি কহিল,—তোমার দাছ বাড়ী আছেন ত?

—না, তিনি এখনও আদালতে। আমাদের যে গাড়ী পৌছে দিলে, সেই গাড়ীই গেছে তাঁকে আনতে।

এবার তাহার্য যে ঘরটিতে আসিল সেটি বৈঠকখানাই। মহার্ঘ্য আসবাব-পত্র এবং কোঁচ-কেন্দারায় পরিপূর্ণ। একটা গলী-আটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া সন্ধ্যা নিজে একটা 'সেটীতে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—আপনি কি করেন?

প্রশ্নটা এটুকু মেরের মুখে একবারেই মানায় না। কিন্তু তবু তাহার প্রশ্ন করিবার ভঙ্গিতে এমন সারল্য ছিল যে, ভূপেন বিরক্তি বোধ করিল না, বরং প্রশ্নের মুখেই জবাব দিল,—কালজে পড়ি।

—আর কি করেন?

—আর?

হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল, আর ছেলে পড়াই।

এতক্ষণে বোধ হয় সন্ধ্যার একটু সস্তম্য বোধ হইল। সে কিছুক্ষণ তাহার ডাগর চোখ দু'টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—কি পড়ান তাদের?

—সব। অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, আরও কত কি।

—ও!

ইহার পর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। ইতিমধ্যে চা আসিয়া পৌছিল। একটা ডিসে দু'টি সন্দেশ, দু'খানি নিরমিক এবং দুন্দর একটি কাপে এক-কাপ চা।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল,—তুমি চা খাবে না?

সন্ধ্যা জবাব দিল,—দাছ না খেলে আমি খাই না। আপনি খান।

ভূপেন কহিল,—কিন্তু সে যে বড় খারাপ দেখাবে থুকা!

সন্ধ্যা মাথা হুলাইয়া কহিল,—কিছু খারাপ দেখাবে না।

আপনি ভিজ়ে এসেছেন ভাষণ, আমি ত আর ভিজ়িনি।

অগত্যা ভূপেন খাবারের ডিসে মন দিল। খাবার শেষ করিয়া চায়ে সব চুমুক দিয়াছে, এমন সময় সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, একটা কাজ করবেন?

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি কাজ?

—আপনি আমাকে পড়াবেন? পড়ান না!

ভূপেন সহসা কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। কহিল—কেন, যিনি তোমাকে পড়াচ্ছেন, তাঁর কি হলো?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল,—তিনি দিন পনেরোর ওপর হলো দেশে চলে গেছেন। সেখানকার ইস্কুলে তিনি কাজ পেয়েছেন, তাই আর ফিরবেন না!

তবু ভূপেন কোন জবাব দিতে পারিল না! এখন অদ্ভুত প্রস্তাবে কি-ই বা জবাব দেওয়া যায়! সে নীরবে চা পান করিতে লাগিল। সন্ধ্যা কিন্তু তাহার মৌনভাবকে সম্ভতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইল। থুকা হইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল,—তাহলে ঐ কথাই রইলো, কাল থেকে আপনি, কেমন? বা, এই বেশ হলো!

ভূপেন হাসিয়া কহিল,—তুমি ত কিব্বি সব ঠিক করে ফেললে, কিন্তু তোমার দাছ যদি রাজী না হন?

সন্ধ্যা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—আপনি বড় লা মাষ্টার মশাই। আমি পড়ব, দাও রাজী হবেন না কেন? ... ছা, বেশ, ঐ ত দাও এসে গেছেন, ঠকে এখনই জিগোস্ করছি।

সতাই গাড়ী তখন ফটক পার হইতেছে। এক শ্রিয়দর্শন অল্পলোক সাহেবী পোষাক পরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সগাংসরি হাঁসের ঘবেই প্রবেশ করিলেন। টুপিটা চাকরের হাতে দিয়া ত্র বদনে প্রস্থ করিলেন,—গিন্নী কখন এলে গো?

সন্ধ্যা জবাব দিল,—আমাকে পৌছেই গাড়ী গিয়েছিল তোমাকে নতে।

সন্ধ্যার দাড়র নাম মোহিত রায়! মোহিত বাবুর এককণ্ঠে পড়িল ভূপেনের দিকে। তিনি লজ্জিত-জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া হলেন। ভূপেন ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু সন্ধ্যা বেশ সপ্রতিভ জবাব দ,—উনি আমার নতুন মাষ্টার মশাই।

—নতুন মাষ্টার মশাই? বিমিত হইয়া মোহিত বাবু প্রশ্ন করিলেন।

সন্ধ্যা বাড় নাড়িয়া জবাব দিল,—হ্যাঁ। আজ যখন শিমিয়ার ধান থেকে ফিরলুম, দেখি, উনি গড়ের মাঠের এক গাছতলার ড়িরে ভিসছেন। সঙ্গে করে তাই এনেছি, কাল থেকে নিই আমাকে পড়াবেন। সে সব কথা ঠিক করে ফেলেছি।

ইহার উত্তরে কিছু ভিত্ত্বাই ভূপেন আশা করিয়াছিল, কিন্তু মোহিত বাবু একটু হাসিলেন। কহিলেন,—ঠিক করে ফেলেছ কেরারে? বেশ ত!

তাহার পর একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—তোমার মাষ্টার কি বাবা?

ভূপেন এককণ্ঠে একটু ঠীক ছাড়িল! সে মোহিত বাবুর প্রশ্নের উত্তরে নাম-ধাম-পেশা সবই খুলিয়া বলিল! সব শুনিয়া মোহিত বাবু কহিলেন,—তুমি সত্যিই ওকে পড়াতে পারবে বাবা?

ভূপেন মাথা নীচু করিয়া জবাব দিল,—আপনি যদি আদেশ করেন ত চেষ্টা করি।

মোহিত বাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন,—না, না, আদেশ করার কক্ষই নর। আমার ও গিন্নী আবার এক-রকমের মাহুব। মাষ্টার গুর সহজে পছন্দ হয় না, পছন্দ না হলে পড়াতে চান না একট বর্ণও। অথচ থাকে ভালো লাগে তাঁর কাছে একেবারে ভেরি শুভ, গাল! ...তুমি যদি পারো ত আমি বৈতে বাই। ক'দিন ধরেই জব্বি যে আবার কে আসবে!

ভূপেন কহিল,—কোনু ক্লাসে পড়ে ও?

—উঁহ, ক্লাসে-টাসে নয়। ইহুসে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমি। মেয়েদের ইহুসে লেখাপড়া বা শেখানো হয়, তা আমি জানি। মেয়ে-মাষ্টারগণও ঠিক সেই কারণে আমি বাখি না। হুঁ-এক জনকে চেষ্টা ক'বে দেখছি—লেখা-পড়া ওরা কিছু জানে না। আর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে সব মেয়ে ইহুসে যায় তাদেরও ত দেখি—ইহুসে গিয়ে শেখে শুধু নানাবকম করে প্রসাধন করতে, সুর করে কথা বলতে, কতগুলো মুদ্রাদোষ অভ্যাস করে এবং—খাক, তুমি ছেলেরাম!

ভূপেন একটু হাসিল শুধু।

—তোমার ও হাসি আমি জানি বাবা, অর্থাৎ আমার এটা

বাড়াবাড়ি, এই ত? তাহোক—আমি সেকলে মাহুব, আমার মত অত সহজে বদলায় না। ইহুসে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। বাড়িতেই পড়ে। তবে ট্যাণ্ডার একটা ঠিক আছে বৈ কি! বোম হয় ক্লাস সিক্-এর মত হবে। এখনও আলজের্ণায় হাত দেয়নি।

ভূপেন কহিল, আচ্ছা, সে আমি দেখে নেবো এখন।

তাহার পরের কথাটা সে লজ্জার উপাশন করিতে পারিল না। তাহার এই অল্প-বয়সের অভিজ্ঞতাতেই এটা জানিতে পারিয়াছিল যে বাহার 'বড়লোক' নয় শুধু ধনী, তাহাদের সহিত দরদস্তুর করিয়া না লইলে পরে ঠিকিতে হয়। কিন্তু মোহিত বাবুকে ঠিক কোন পর্যায়ে ফেলা উচিত, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

মোহিত বাবু নিজেই কিন্তু কথাটা পাড়িলেন। সন্ধ্যার দিকে ফিগিয়া কহিলেন,—গিন্নি, একটু ওঘরে যাও ত। ...হ্যাঁ বাবা, কাজের কথাটা বলে নিই। সকালে বিকেলে যখন খুশী তুমি পড়িও, সময়ের হিসেবও আমি নেবো না। দরকার মতো হুঁ-খটাও পড়াবে আবার উভয় পক্ষের স্ববিধা মতো দশ মিনিট পড়িয়েও চলে যেতে পারো—হুঁ-মিনি কামাই করলেও কিছু বলব না। কারণ, আমি জানি এটা বাজারের কেনা-বেচা নয়, কীটায় কীটায় তোল করতে গেলে ঠকতে হয়। বিশেষ আমি ছাত্র-ছাত্রীর সামনে মাষ্টারদের বেতনের কথাটা তুলতেই চাই না, তাতে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হতে পারে। ...কিন্তু একটা কথা, আমি ইহুসে দিইনি কি কারণে তা ত শুনলে, আমি চাই ওকে সত্যিকারের লেখাপড়া শেখাতে। ওরও জ্ঞান-পিপাসা আছে হুঁ, তা আমি জানি। ওকে বাইরের বই পড়াতে চাই, তোমাকেও পড়ে তৈরী হতে হবে। দরকার হলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাবে, অনুবিধা হয় বই কিনবে, আমি দাম দেবো। কিন্তু ও বেন সব প্রশ্নের জবাব পায়। তুমিই ওর জন্ত গল্পের বই বেছে দেবে—লিষ্ট ক'রে সরকারকে দেবে, সে কিনে আনবে। এতে রাজী আছো ত?

ভূপেন ঘাড় ঠেঁট করিয়া কহিল,—তাতে আর আপত্তির কি আছে বলুন? পড়ার ইচ্ছা জানাবার ইচ্ছা আমারও কম নয়। তবে—

—'তবে'র ব্যবস্থা করব বই কি বাবা। ...আগের মাষ্টার মশাইকে আমি ত্রিশ টাকা দিভুম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দিতেও আপত্তি নেই। তুমি খুশী হয়ে আমাকে খুশী করবে, এই আমি চাই।

ত্রিশ টাকা! ভূপেনের মনে পড়িল বর্তমান ট্রাইশনিটির কথা, হুঁ-খটা পড়াইয়া আট টাকা পায় মোটে। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, ত্রিশ টাকাই যথেষ্ট। বেশ, কাল থেকেই আমি আসব তবে সন্ধ্যার সময়?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যার সময়ই ভালো।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহিত বাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ডাক দিলেন,—গিন্নি, কোথায় গো? তোমার মাষ্টার মশাই বাড়ী যাচ্ছেন যে।

সন্ধ্যা কাছেই কোথায় ছিল, সে একটা খবরের কাগজের পুলিন্দা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

—এই নিনু আপনার জিঙ্গে কাপড় জামা।

মোহিত বাবু কহিলেন,—তাহ'লে উনি কাল থেকেই আসবেন। বুসে, তৈরি থকো। এখন ঠকে প্রণাম করো। উনিই তোমার মাষ্টার মশাই হলেন।

ভূপেন বিব্রত হইয়া কোন বাধা দিবার পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া একবারে পায়ের ধুলা লইল।

মোহিত বাবু ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, না, না, বাবা! আমি এখানে অল্প কোন সামাজিক নিয়ম মানি না। গুরু আর ছাত্রের সম্পর্ক যতটা সম্ভব প্রচার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভালো, তাতে শুধু যে ছাত্রের ভালো হয়, তাই নয়, গুরুকেও সত্যক থাকতে হয়। ফল পাওয়া যায় ভালো।

ভূপেন তাঁহাকে যথারীতি নমস্কার করিয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

২

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে চিন্তা করিয়া ভূপেনের হাসি পাইতে লাগিল। ঘটনাটা যদি কোন বন্ধুকে আগাগোড়া শোনানো যায়, তাহা হইলে সে রীতিমত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবে হয়ত—অবশ্য মেয়েটির বয়স বাদ দিয়া বলিলে। নাটকীয় বোম্বারের কিছুই বাকী নাই, শুধু ঐ একটা বড় রকমের কাঁক, নারিকা নিতান্ত বালিকা! বোম্বারের সাথ তাহার মনে ইদানীং দেখা দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সাথ লইয়া ভগবান যে এমন পরিস্থিতি করিবেন, তা কে জানিত!

তা হোক—তবু খ্রিষ্ট টাকা অনেক টাকা। বহু দিনের সখ একটা টেবিল-ল্যাম্পের। প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই কেনা যাইতে পারে। খান-দুই ভালো চেয়ারেরও বড় অভাব! সব চেয়ে বড় অভাব যেটা, একটা স্বতন্ত্র ঘরের। সকলে মিলিয়া দু'খানা ঘরের মধ্যে শুভাশুভি করিলে আর বাতাই হউক, পড়া হয় না। বাড়ীওয়ালাকে বলিয়া বর্তমান ভাড়ার উপর গোটা চার-পাঁচ টাকা বাড়াইলে হয়ত তিন তলার টালির ঘরটা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে সে বাচ্চিয়া যায়—নীচেকার কোন গোলমাল সেখানে পৌঁছায় না।

পুরাতন টাইশিনিটা অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, কিন্তু এখন নয়। ভূপেন টাকা-কড়ির ব্যাপারে যতই ঊদাসীন দেখাক, অভাবের সংসারে কতকগুলো সাধারণ জ্ঞান তাহার হইয়াছিল। এ টাইশিনিটি টেকে কি না তাহার ঠিক কি? এখন বলিয়া কহিয়া দিন-দশেকের ছুটি লইলেই চলিবে। দিন-দশেকের মধ্যে আর মোহিত বাবুদের চেনা যাইবে না? নিশ্চয় যাইবে। তখন হয় মোহিত বাবু, নয় পুরানো মক্কেল—বাহাকে হউক জবাব দিলেই চলিবে।

কিন্তু আজও টাইশিনি আছে। আজিকার দিনটা অস্বস্ত: সারিয়া আসা দরকার, নহিলে অস্বস্ত হয়। সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া ভিজা কাপড়-জামাগুলি বোনের হাতে দিয়া চা তৈরী করিতে বলিল। ছ'টি অনুচর বোন তাহার, কিন্তু তার জন্ত ভূপেনের হৃৎকম্প ছিল না। বোন থাকায় অসুবিধা যেমন আছে, সুবিধাও কম নাই। অহরহ লুক্কম করা যায়, এবং তাহারও কলেক্টরাদার ফরমাল খাটাকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

বোন শান্তি বিম্বিত হইয়া প্রেরণ করিল,—এ কাপড়-জামা কোথা থেকে এল আবার?

—ও আমার এক বন্ধুর বাড়ী থেকে বদলে এসেছি, কাল ফেরৎ দিলেই চলবে। ভূপেন সংক্ষেপে জবাব দিল। তাহার বাবাকে সে চেনে, বেশী মাহিনার টাইশিনির সংবাদ কাণে গেলে আর বন্ধা থাকিবে না, শুৎকপাৎ তিনি সংসার-খরচের জন্ত কিছু দাবী করিয়া বলিবেন। এমনিতেই বলেন, মাসে মাসে আটটা করে টাকা পাল,

কি করিস? কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম সবই ত আমি দিই, তোমার এত কিসের খরচ?...

ভূপেন খাবার ও চা খাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যার দেহী নাই। বাগবাগারের তাঁহাদের ওখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সাড়ে সাতটা বাজিয়া যাইবে—বাড়ী ফিরিতে দশটা। কোন মতে জামাটা কাঁধে গলাইতে গলাইতে সে দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

সদরের কাছে নীচের তলার ভাড়াটে অধিনাশ বাবুর সহিত দেখা। বোণা, একহারা চেহারা, পান-লোস্তার কব ছুই চোয়ালে সর্কলাই লাগিয়া থাকে; কলে দাঁত ও মুখগহ্বর সর্কলাই রক্তবর্ণ। সে নিকে চাহিলে যেন ভয় করে—হাতে একটা আখ-খাওয়া বিড়ি এবং মল্লা হাফ-সার্ট। যখনই দেখা হয়, এই চেহারাটি ভূপেনের নজরে পড়ে। আজও তাহার অস্ত্রা হইল না, পাকা উচ্ছেব বীচির মত দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন,—কি বাবাজী, দেশলাইটা দেবে একবার?

ভূপেনের কাছে তিনি পূর্বেও বার-বারক এক চেষ্টা করিয়াছেন। সে অসহিষ্ণু ভাবে কহিল,—আপনাকে আর কতবার এ জবাব দেব কাকা-বাবু, যে আমি বিড়ি-সিগারেট খাই না।

মুখে এক প্রকার অজুত শব্দ করিয়া অধিনাশ কহিলেন,—কি রকম যে কলেজে পড়ো, বুঝি না। কলেজের ছেলে সিগারেট খায় না, এ শুনি নি কখনও। আমরারও এককালে কলেজে ভর্তি হয়েছিলুম যে, তখন সিগারেট খেলে মাথা ঘুরত, তবু জোর করে যেতুম, নইলে অল্প ছেলেরা ঠাটা করত। বাবু বাবা, Better late than never ওটা ধরে ফেলো—আমাদের একটু সুবিধে হয়।

রাগে ভূপেনের সর্কাজ জ্বলিয়া গেল। সে জবাব দিল,—ধরতে ত বলছেন, শেষে আপনার মতো অবস্থা হবে ত, এখনওর কাছে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে। খরচা দেবে কে?

—আহা বাবাজী, তোমরা খালি মাথা-গরম করছেই পারো, সুবিধেগুলো ভেবে দেখো না। ঐ তোমাদের দেব। বলি ভবে টাইশিনি ক'রে কি করতে? যেখানে বাবে আগে ছাত্রটিকে ঐ দেশা ধরিয়ে দেবে। বাসু, তার পর আর কোন গোলমাল নেই! সে ব্যাটা বাপের পকেট ঘেঁরে দামী সিগারেট কিনবে আর তুমি তার মাথার হাত বুলোবে। ও ভারী সুবিধে। আমিও ত টাইশিনি করেছি ঢের, যেখানে যেতুম, আগে ঐ দেশাটি ধরিয়ে দিতুম। ওতে কোন পাপ নেই বাবাজী। ধরবেই ত, দু'দিন আগে আর দু'দিন পিছে—

তাঁহার নিলজ্জতার ভূপেন নির্বাক হইয়া গেল। বয়স লোক, ইতার পর জবাব দিতে গেলে মারামারি করিতে হয়। সে এক-কম তাঁহাকে ধাক্কা দিয়াই সরাইয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু পথে অনেক-কণ পর্যন্ত কথাগুলি মনে করিয়া তাহার মন বিবাক্ত হইয়া রহিল।

তাঁহার পুরাতন ছাত্রদের বাড়ী বাগবাগারের একটা গলির ভিতরে। ছোট বাড়ী। একটা মাত্র বাহিরের ঘর, তাহারই মাঝে একটা মোটা টের পর্দা বুলাইয়া দু'ভাগ করা হইয়াছে, এক দিকে কর্তা সন্ধ্যার পর বন্ধ-বান্ধব লইয়া আস খেলিতে বসেন, আর এক দিকে ছেলেরা পড়ে। ফল হয় এই যে, তাঁহাদের পাশবিক চাঁৎকারে ছেলেরা পড়ায় মন দিতে পারে না, বার বার অনমনস্ক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়েই রসনাকে ভয় ভাবার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না, খেলার হাবিবার মাঝার এমন সব কথা বাহির

হুইতে থাকে যে, কোন মতেই শিক্ষক-ছাত্র একত্র বসিয়া শোনা যায় না। আগে আগে ভূপেন এ সবকিছু অল্পবোগ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কর্তা বলিয়াছেন, তা বাপু, নিজের বাড়ী থাকতে কি ভূটপাথে বসে তাস খেলায় ? তা ছাড়া এ-ত তাসখেলা, কোর্ন বদ-খোলা ত করি না। তাস ত বাপু-ছেলেতে বসে খেলা যায়। আর এক দিন বলিয়াছিলেন, সন্তা কথা বলতে কি, অমনি মাঠারদের ওপর নজর রাখাও হয়। মাঠারদের তো জানি, ঝাঁক দিতে পেলো আর কিছু চান না। হু' বটা পড়ানো—তা-ও বেন বাঘ মনে হয় তাঁদের কাছে।

ভূপেন আর কিছু বলিবার চেষ্টা করে নাই। পড়ানো বলিতে ইহার বটাটাই বোঝেন। তাস-খেলার যতই উন্নত থাকুন না কেন, প্রতিদিন ভূপেন বাড়ী ফেরার সময় ঘড়ির দিকে, চাহিয়া দেখে যে হুই বটা পূরা হইল কি-না।

সে দিনও সে বখন গেল, তখন তাঁহাদের তাসের আড্ডা বসিয়া গিয়াছে। ভূপেনকে দেখিয়া একবার ঘড়িটার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কি মাঠার, এত দেরী যে ? আমি ভাবলুম, আজ আর এলেই না। এই ভীম, ওরে ভীমে—মাঠার মশাই এসেছেন যে ! হারামজাদা নাম্ না নটে, তাড়াতাড়ি।

ভূপেন কোন কথা না বলিয়া পক্ষীর ওপারে গিয়া পড়াইতে বসিল। এ টাইশনি ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচা যায়। হু'টি ছেলে, একটি একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, আর একটির ক্লাস ফাইভ। ছোটটি বরং ভাল কিন্তু বড়টি যেমন নির্দোষ তেমনি ঝাঁকিবাঁজ ; আর তেমনি অসভ্য। কোন মতে হু'টি বটা কাটাতে প্রত্যাহ ভূপেনের প্রাণান্ত হয়।

আজও অল্প কথিতে কথিতে বড়টি মুখ তুলিয়া কহিল,—শ্রার, চতুর্দশ ছবি দেখেছেন ? খুব না কি ভাল হয়েছে ?

ভূপেন জু কুণ্ডিত করিয়া কহিল,—আবার বায়কোপের কথা !

এক দিন বাবুণ করে দিয়েছি না ?

ছাত্র হি-হি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল,—আপনি ত দেখেছেন শ্রার, রলুন না কমন হয়েছে ! ...দেখব আমি নিশ্চয়ই, বাবা পদমা না দেয়, মায়ের কাছ থেকে আদায় করবো...হি হি !

সজোবে তাহার কাণটা মলিয়া দিয়া ভূপেন কহিল,—অঙ্কে গন লাও, বীরের কোথাকার।

এবারে সে ক্রুদ্ধ হইল, বাড়ি হেঁট করিয়া আঁক কবিবার ভাণ করিতে করিতে গাঁতে গাঁত চাপিয়া কহিল,—উনি দেখতে পাবেন, বাবা নিজে তিন বার দেখতে পাবেন, আর আমি বললেই বীর হইলুম। দেখবই আমি।

ভূপেন ছোটটির দিকে মনোযোগ দিল। সে একটা লঞ্জেসু তা মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; ভূপেন কহিল,—ও কি হচ্ছে ? ভটা চয় ফেলে দাও, নয় গিলে ফেলে। লঞ্জেসু মুখে পুঁজে পড়া হয় না। সে লঞ্জেসুটা কড়মড় করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—দাদা আজ দুপুরবেলা আপনাকে কি বলছিল, জানেন, শ্রার ? বলে দিই দাদা ?

দাদা সহসা বেন বেশিয়া গিয়া ঠাসু-ঠাসু করিয়া তাহাকে বা-কতক চড়াইয়া দিল,—ই-শিউ কমনকার ! মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

সে মুখ-চোখের

চোহা ভীষণ করিয়া উঠিয়া পাঁড়াইল, তাহার পর পাগলের মত দাধার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কীল-চড়-খুঁবি বর্ণন করিতে লাগিল। সে এক কুৎসেত্র ব্যাপার ! টেবিলটা উটাইয়া বাইবার উপক্রম, ছাড়াইতে গিয়া ভূপেনের উপরও দুই-এক বা পড়িল।

অবশেষে বখন উভয় পক্ষই শান্ত হইল, তখন ছোটটির গোট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং বড়টির জামা গিয়াছে ছিড়িয়া। সে বসিয়া বসিয়া গজবাইতে লাগিল,—দেখে নেব জোমাকে, শ্রার কোথাকার ! চামড়া কেটে তাকে মুগ ছিটিয়ে দেব। শ্রার ! শ্রার ! !

ছোটটি মুখের রক্ত জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া শুধু জবাব দিল,—বা ! বা !

ইহাও প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। অথচ পক্ষীর ওপারে তাস-খেলার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। এক দিন ভূপেন নাশিল করিতে ১৭ ছিল, কোন ফল হয় নাই ; কর্তা বরং অপ্রসন্ন মুখে কহিয়াছিলেন,—তুমি থাকতে ওরা মারামারি করে কেন ? শাসন করতে পারো না ? সেই ক্ষতই ত তোমাকে এক গাদা টাকা খবচ ক'রে রাখা।

আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে ভূপেন আসল কথাটা পাড়িল, বলিল, দ্যাখো, আমি বোধ হয় দিন আটেক-দশ আসতে পারবো না।

ছেলেটির মুখ নিম্নে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল,—বাবাকে বলেছেন ? না বলব ? সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্ভাবনা দূর হইয়া গেল, কহিল,—বাবা কি অত দিন ছাড়বে ভেবেছেন আপনাকে ? হ্যাং !

—কিন্তু ছাড়তেই হবে আমাকে। আমার বিশেষ কাজ আছে। আমি আসতে পারবো না।

—অন্ত মাঠার দেখবে তাহলে। বাবা বা, লেখাপড়া যদি আমাদের গিলিয়ে দিতে পারতো ত ভাল হ'তো।

দেখা গেল ছেলেটি এধারে বড়ই নির্দোষ হউক, বাবাকে ভালই চেনে। পড়ানো শেষ করিয়া ভূপেন গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি কহিলেন,—আট-দশ দিন ? সে কি ! আমার ছেলেরা এমনই কিছু করে না তার ওপর আট-দশ দিন কামাই করলে আবার ক-খ থেকে শুরু করতে হবে।...সে আমি পারব না—

শান্ত দৃঢ় স্বরে ভূপেন কহিল, কিন্তু আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি আসতে পারব না।

ঠিক সেই সুরেই কর্তা জবাব দিলেন,—তাহলে আমাকে অল্প মাঠার দেখতে হবে। ছেলেদের ত আমি উদ্ধর দিতে পারি না।

রাগে ভূপেনের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল,—বেশ, তাহলে তাই দেখবেন। আমার টাকাটা মিটিয়ে দিন।

—এখন টাকা ? ক্ষেপেছ না কি ? মাসের শেষে তুমি হঠাৎ চাকরী ছেড়ে দেবে ব'লে আমি তোমার স্ত্রী টাকা নিয়ে বসে থাকব, তা ত আর হয় না। সেই মাসকাবারে চুকিয়ে নিয়ে যেও। এমনই ত নোটসের জন্ম পনেরো দিনের টাকা কাটা উচিত।

ভূপেনের একবার মনে হইল বলে যে, টাকাটা আপনিই রেখে দেবেন। কিন্তু পরক্ষণে নিজের সহস্র প্রয়োজনের কথা মনে পড়িতে সে ক্রোধ দমন করিল। বলিল—তাই হবে।

কোনমতে একটা শুদ্ধ নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। পক্ষীর ওপারে হইতে তখন তাহার ছাত্রদের একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা হাইতেছিল। অন্ততঃ তিনটা দিনের জন্য তাহার নিশ্চিন্ত ! (কমণঃ)

কাল রাত হতে জমিয়াছে মেঘ, শুক্ল-গর্জন ধ্বনি,
ধমকি ধমকি বিদ্যুৎদীপ ঝলকে ঝলকে জ্বলে—
মেঘের আঁধার চিরিয়া চিরিয়া প্রলয়ের আগমনী
বাজিয়া উঠিল বজ্র-আলোকে—খেতভূজা শতদলে
হংসের ঐবা চাপিয়া সহসা ভৈরবীরূপ ধরি—
তিমির-মথন মুষ্টি ধরিয়া এলেন কি এলোকেশে ?
পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তার রূপ এ কি প্রলয়ঙ্করী,
দিগধরী নাচিছেন মাতা সহসা অট্টহেসে !
বিনয়-বসন বুকে নাই মার—বীণা সে দামামা হ'ল—
তজ্জের মতে মায়ের পূজায় বসেছে সাধক যত,
অমাবস্তার শবাসন হতে অনেক মাহুঘ ম'ল,
মারণ-সিদ্ধি লাভিয়া সকল জ্ঞান-সাধনার ব্রত ।

পূজা-মণ্ডপ ঝড়ের দাপটে উড়িল ওই,
বৃষ্টিধারায় ধুয়ে গেল মার রাজ্য চরণ ;
ল্যাবরেটারিতে পুড়ে ছাই হ'ল পাঠ্য বই,
খেলাঘর ভাঙে প্রিয় কল্লার, হের মরণ !
ষাপে ও বেটিতে এ কি বোঝাপড়া তুলনাহীন,
নূতন যুগের নূতন খবর পাই কি মোরা ?
এ মুঢ় দেশের যুগান্তরের স্তম্ভিতে ঋণ
জ্ঞান-বিজ্ঞান যুদ্ধে যেতেছে বিশ্বজোড়া ।
আমরা করেছি আয়োজন যত হ'ল বিফল,
পূজার কুসুম ধুলায়-কাদায় হইল স্নান—
সিক্ত শীতেতে হি হি করে কাঁপে ভক্তদল—
নূতন দেবীর বন্দনা বাঁধো নূতন গান ।

আলোক হ'লে মা অন্ধকার—

সরস্বতী, জয় তোমার ।

হে মোহ-নাশন বোমার মোহ

এনেছে সমরে এ সমারোহ,

তোমার বীণায় মরণ-সুর

জীবনের মায়া করিছে দূর,

বৃথা কেন বহি এ মহা ভার—

সরস্বতী, জয় তোমার ।

হংস তোমার বোমার বিমান উড়িছে নভে—
বীণাখানি তব বোমা হইয়াছে জ্ঞান কি কবে ?
হে ভারতী, হের ভারত জুড়ে
মরণের বীজ বেড়ায় উড়ে,
তোমার পূজায় বাড়িছে ধাঁধা
যত দিন যার পড়ি যে বাঁধা—

বন্ধ হতেছে মুক্ত ঘায় ।

সরস্বতী জয় তোমার ॥



২৫

সুশীল যখন এ-বাড়ীতে আসিল, বেলা তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে !
এ-বাড়ীতে খাওয়া-পাওয়ার সমারোহ এখনো চোকে নাই। ক্ষেত্রের
বৌ আর ছেলোটো তার সঙ্গে আসিয়াছে।

সদরে নহবৎখানা। নহবৎওয়ালারা প্রাণপণে বাজনার কণবতি
দেখাইতেছে। কুটুম-বাড়ীর লোকজনেও যদি ভালো লাগে, মোটা রকমের
বংশিস কোন না মিলিবে। বনিয়াদী ঘরের হাত খুব দরাজ। যে-
সময়কার কথা বলিতেছি, সে-সময়ে লোকে ঋণ করিয়াও বনিয়াদী-
মামের মর্যাদা রাখিত। এই সব বাজনার এবং দীন-দুঃখীদের
তার মায়া বলিয়া মনে করিত; তাদের কথা ভুলিয়া নিজের
বিলাস-ভুগুণকেই সর্ব্ব্ব করিয়া তোলে নাই।

সদরে চুকিতে বিরাটেশ্বরের সঙ্গে দেখা। একখানা আরাম-
কোয়ার বসিয়া আছেন। পাশে প্রকাণ্ড গড়গড়া। গড়গড়ার মাথায়
বড়-কলিকায় তাওয়া-দার তামাক। তামাকের খোশ-বুতে বাতাস
পরিপূর্ণ। বিরাটেশ্বর বসিয়া নহবতের আলাপ শুনিতেছিলেন।

সুশীলকে দেখিয়া কহিলেন—বেয়ান-ঠাকুরগের খুব অসুখ,
শুনলুম। এখন তিনি কেমন আছেন ?

সুশীল বলিল—ভালোই দেখে আসছি।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—বেয়াই-মশায়ের কাছে একটু আগে একথা
শুনলুম। উনি খুবই উদ্বিগ্ন। বাড়ীতে যজ্ঞের কাজ...

সুশীল বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব রক্ষা হয়েছে।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—আর কিছু মানি আর না মানি বাপু,
মেরেরা যে পদ্ম-অপর কথাটা বলে, ও-কথা উড়িয়ে দিতে পারিনি
আজো। বেয়ান-ঠাকুরগের পরেই সকল দিক্ রক্ষা পেয়েছে। বেয়াই-
মশায় তাঁর কথাই বলছিলেন...অনেক কথা!

কথার শেষে বিরাটেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুশীল বলিল—আপনাদের দেখতে পারিনি। ঢের ক্রটি
হয়েছে। মামা বাবু আমার উপরই দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন।

হাসিয়া বিরাটেশ্বর বলিলেন—দেখাশুনা কি আর করবে, বাপু ?
এই সব সাবকী চাল...ও আমার ভালো লাগে না। কুটুমিতা
হলো যেখানে, সেখানে ছলছলতা ধরে মান-মর্যাদার আচ্ছাদন তোলা—
কোনো কালে আমার বরদাস্ত হয় না। ইতরমি! আরে বাপু, মানুষকে
মানুষ কত মাত্র করবে ? মাত্র বার-বার নিজের কাছে। তুমি আমার
টিক সময়ে খেতে দিলে না, আমার প্রানের জন্ত তেল-গামছা এগিয়ে
দিলে না, অমনি আমার অপমান হলো বলে আমি উঠবো কোঁপ
করে ? কুটুম হলে তাহলে তো বাবা সাপে-মাছকে তক্তাৎ থাকে না !
কি বলে ? হাঃ হাঃ ! এই জন্তই অনেকের সঙ্গে আমার বনে না...
আমাকে সকলে বলে; আমি একটা ফাঁতুল ! বলে, প্রেজ !

সুশীল হাসিয়া বলিল—অভি-মানের অহঙ্কারেই আমাদের
সর্ব্বনাশ হতে বসেছে।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—তোমার স্নানাহার হয়নি এখনো ! কাল
সারা দিন এখানে পরিশ্রম গেছে...তার পর রাতে শুনলুম, বেয়ান-
ঠাকুরগকে নিয়ে রাত্রি জাগা...দৃষ্টিস্তা। যাও বাবা, নেয়ে-খেয়ে
এসো ! তোমার মামা বাবু কাছে তোমার কথা শুনেছি।
বলাছিলেন, হীরের চুকবো ছেলে !

সুশীল লজ্জা অমুভব করিল। সলজ্জ হাসি-মুখে বলিল—কুশণ্ডিক
চুকলো কখন ?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—ঘড়ি ধরে সময় দেখিনি, তবে হয়ে গেছে।
বরকর্ত্তা এখন তাঁর সাজোপাজ নিয়ে দান-সামগ্রী বুঝে নিচ্ছেন। আমার
ছেলে নেই, থাকলে বিনা-পণে তার বিয়ে দিতুম। দেবশদাকে তাই
বলছিলাম, ছেলেব বিয়ের এদের কাছ থেকে এই যে...খাট-পালঙ
অবধি আদায় কর্ত্তো, তোমার বাড়ীতে খাট-পালঙ নেই ? তা যদি
না থাকে, আর খাট-পালঙ কেনা যদি তোমার সামর্থ্যে না কুলোয়,
কনের বাপের ঘাড় ভেঙ্গে খাট-পালঙ আদায় করে নিয়ে যাবে, আর
সেই খাট-পালঙে তোমার বাড়ীর বো...তাঁর তবে ফুলশয্যা ? একে
ভিক্ষা বলবো, না, লুঠ বলবো, জানি না। মোক্ষা এ খাট-পালঙ আদায়
করতে লজ্জা হওয়া উচিত। আমার তেমন অবস্থা হলে পুত্র-পুত্রবধূকে
আমি মাহুরে শুইয়ে ফুলশয্যার আচার পালন করতুম, তবু ভিক্ষা
বা লুঠ কবে ও-জিনিষ ঘরে নিয়ে যেতুম না !...কিন্তু না বাবা, যাও...
বেলা চারটে বাজে...নেয়ে-খেয়ে নাও গে।

সুশীল বলিল—বর বেকুবায় সময় স্থির হয়েছ কখন ?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—সে ঐ ভটচাঁয় মশায়রা জানেন। তাঁদের যখন
সুবিধা হবে...মান, বোচ্কা বাঁধা যখন শেষ হবে, তখন পাঞ্জি খুলে
বলবেন, মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত...বর-কনে তুলুন ! হুঁ...কিন্তু না,
তুমি যাও, নেয়ে-খেয়ে নাও। যাবার সময় আমারা ছলছল বাধিয়ে
যাবে। যাকে বলে, বর বিদায়...তার উপর আমার বর-পক্ষ !
উঠতে-বসতে নড়তে-চড়তে খালি নেবো সেলাম আর সেলামী—
হুই !...

চমৎকার মাহুঘটি ! বাঃ ! সুশীলের ভালো লাগিল। প্রথম
বারে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, জমিদার-মাহুঘ...তাকিয়ায় টেল দিয়া শুধু
সুরা-পান, বাইজীর গান শোনা আর ইয়ার-প্রতিপালন,—ইহাই
জানেন ! কিন্তু না, তা নয়...এতখানি মন আছে। এক সে-মনে
এ-সব কথা লইয়া নাড়াচাড়া করেন।

সুশীল বলিল,—আচ্ছা, আমি তাহলে চট করে নাওয়া-খাওয়া
সেরেনি।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, যাও। তাছাড়া তোমার আবার
ওদিকে কর্ত্তব্য আছে...বোগী দেখা !

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

সুশীল চুকিল বাড়ীর মধ্যে। ক্ষেত্রের বৌয়ের পানে চাহিয়া
বলিল—তুই আর আমার সঙ্গে...পুজোর দালানের সিঁড়ির নীচে
বসবি, আর...কারো ছোঁয়া লাগবে না ! তাকে খাবার-পাখার দিয়ে
তবে আমার অস্ত্র কাজ !...

ক্ষেত্রের বৌ আর ছেলেকে ঠাকুর-দালানের বড় সিঁড়ির নীচে
বসাইয়া সুশীল গেল ভাঁড়ারে। সেখানে বেন রাজস্ব-রজ্ঞের ব্যাপার !
বড় বড় পায়ে জিনিষপত্র টল-টল করিতেছে। লোকজনের বেয়ন

চাকলা, তেমনি চাঁৎকার। সুশীল একবার চুপ করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, এত জিনিষ...কত ফেলাছড়া বাইতেছে। আর এ সব নীল-গুথী...এক যুগার কাঙাল...ওদের পানে কেহ চাহিয়া দেখে না। করুণ নয়নে নীল প্রার্থনা জানাইয়া উহারা যদি হাত পাতে, অমনি ক্রুরোবে হুকুর তোলে। মনে হইল, এই অপচর, তার সঙ্গে মানুষকে অবহেলা-অবজ্ঞার এতখানি পাপ...ইহার শাস্তি কেহ কথিতে পারিবে? চকিতের চিন্তা! তার পরেই এক জন বামুনকে ডাকিল—ঠাকুর...

বামুন তার পানে চাহিল।

সুশীল কহিল—তুমি কি করছো?

বামুন বলিল—আজ্ঞে, জম্বরের দালানে প্রায় পঞ্চাশ জন মেয়ে-ছেলে খেতে বসেছেন...ভাদের দেওয়া-খোওয়া।

সুশীল বলিল বেশ, তুমি নিশিট সে-কাজে কামাই হলে কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি এক কাজ করো...এ খালি চ্যাঙারিখানা নাও...ওতে তোলা ভাত লুচি আর সব রকম তরকারি। মাটার গেলাসে করে দই নাও...সব রকম মিষ্টি নাও। বুঝল! পাঁচ জনের মতো খোরাক! নিয়ে ঈগণির করে এসো আমার সঙ্গে!

সুশীলকে ঠাকুর চেনে এবং জানে। কাজেই দ্বিধাক্রান্তি না করিয়া তখন সে-আদেশ পালন করিল।

ঠাকুরের হাতে চ্যাঙারি-ভরা খাবার...ঠাকুরকে লইয়া সুশীল আসিল সদরের উঠানে। আসিয়া দেখে, শিবকৃষ্ণ। খালি গা, একখানা নামাবলী কেবত। করিয়া গলায় ভড়ানো...খাওয়া-নাওয়ার পর উদরটি বেশ ঠেলিয়া উঠিয়াছে...নাভির নীচে কাপড়ের কবি...হাতে একটা খেলো ছ'কো...একখানা হাত প্রসারিত করিয়া গজ্ঞন করিতেছে। লক্ষ্য ক্ষেত্রের বৌ আর ছেলে!

শিবকৃষ্ণ হাঁকিতেছিল,—এই উঠানে খাবার-দাবার নিয়ে বামুনরা যাওয়া-আসা করছে, আর ছোটলোক দুলে-বান্দী...তোরা এখানে! একটা হাল্লামা না বাধিয়ে ছাড়বিনে, দেখছি। যা, যা, যা এখান থেকে!

দেখিয়া সুশীল বলিল, বাচ্ছা-ছেলেটাকে মারিয়াও সেই কলাপাতার আক্রোশ মিটে নাই। এখানে তাব জের।

আগাইয়া আসিয়া সুশীল কহিল—কি হয়েছে ঠাকুর? ওদের ওপর অমন রুখে উঠছো কেন? ওরা সত্তি শেয়াল কুকুর নয়!

শিবকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিল। স্বর তখন নামিল। নম্র এক বিনীত ভাবে কহিল,—এই জাখো না বাবা, বলছি, সব খাওয়া-নাওয়া চুকলে তখন আসিসু, পাতের বাকিছু জড়ো করা থাকবে, ডেকে তোদেরি তখন তা দেবো। তা ষ্টুকু স্বব, সহিছে না।

সুশীল বলিল—না। পাতের এঁটো-কাটাও বা ওরা ধাবে কেন? ষড় বাড়ীর কাজ...সবাই যদি চরু চোষ খেতে পায়, ওরা তা থেকে যুক্তি থাকবে কেন, বলতে পারেন?

শিবকৃষ্ণ কথা কহিল না! আশেপাশে যারা ছিল, তারা চাহিয়া আছে। অগত্যা শিবকৃষ্ণ বলিল—চিরকালের বা বিধি...

সুশীল বলিল—সে-বিধি যদি আপনার বেলায় না মানা হয়ে থাকে, এদের বেলাতেই তা মানা হবে কেন, বলতে পারেন? সে বিধি যদি আজ থাকতো, তাহলে আপনারকেও তো সকলে ঠালা করে রাখতো।

শিবকৃষ্ণর বৃকের উপরে যেন কে হাতুড়ি হুকিল! সে জারী ভর করে একালের এই মুখকোড় ছেলেটিকে। কাহাকেও কেয়ার করিয়া কথা বলে না! নিজের মামা মাখন গাঙ্গুলিকেও বাপে পাইলে ছাড়িয়া কথা কয় না! হার রে, সে কি জানিত, সুশীল এখানে আছে। জানিলে এ-দিক মারাইত না। বাড়ীতে নিশ্চয়কে খাবার-দাবার দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। তার মানে, বর-বিদায়ের সময় শিব-মন্দিরের নাম করিয়া কোন না মোটা কিছু দক্ষিণা আদায় হইবে...সেই আশায়!

শিবকৃষ্ণ সুশীলের কথার জবাব দিতে পারিল না...খেলো ছ'কার ফুটার মুখ দিয়া তাগাতে ছুঁ পাড়িল।

সুশীল বলিল—আমি ওদের ডেকে এনেছি খাবার দিতে। আপনার পায়ে ওদের ছোঁয়া কলাপাতা উড়ে পড়েছিল বলে ঐ এক-রত্তি ছেলেটাকে মেরে ওর হাড় শুড়িয়ে দেছেন একেবারে! ভাবছেন, এর বিচার হবে না! গলায় পৈপে দিয়ে বামুন বলে পরিচয় দিতে চান...আচার-ব্যবহার তো দেখি, কশাইয়ের মতো!

সুশীলের হুঁচোখে যেন আগুন জ্বলিতেছে! সে-কাঁচ গায়ের-কোটে-শিবকৃষ্ণ নিঃশব্দে এক-পা এক-পা করিয়া সরিয়া পড়িল।

দেখিয়া ক্ষেত্রের বৌ সাহস পাইয়া বলিল,—বেশ হয়েছে। যেমন বুনে ওল, তেমনি বাঘা তৈরুল। বামনার মুখে আর বা সরে না! আ মব!

সুশীল চাহিল ক্ষেত্রের বৌয়ের পানে, বলিল—ও কি হচ্ছে ক্ষেত্রের বৌ! বামুন-মাছুকে অপমান করছিসু! নরকের ভয় নেই? গলায় কাপড় দিয়ে মাপ চা এখন!

২৬

বর বিদায় হইয়া গেল বেলা পাঁচটার। পাঁচটার ত্রয়োদশী পড়িয়াছে...নক্ষত্রামৃত বোগ!

বর-কন্ডা বিদায় হইয়া গেলে দালকে একান্তে ডাকিয়া সরস্বতী, বলিল—ইচ্ছা ছিল, জামাই নিয়ে বৌকে একবার দেখিয়ে আসবো।

যেনিরও উচিত, মাকে প্রণাম করা। কিন্তু অমন অশুখ...ভয় হলো।

মাখন গাঙ্গুলি নিশ্চন্দ দাঁড়াইয়া একথা শুনিলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

সুশীল বলিল—বিরহট বাবু মাছুষটি চমৎকার! আমার সঙ্গে বাগানে গিয়েছিলেন...মামীমার খবর নিলেন; তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেন। বললেন, সেরে উঠুন বেয়ান, আপনি জ্বাতে ঠালা হয়ে আছেন—আমিও জ্বাত মানি না। এসে আপনার হাতের রান্না খেয়ে বাবো এক দিন।

সরস্বতী হাসিল...মলিন মুহ হাসি।

মাখন গাঙ্গুলি দাঁড়াইয়া একথাও শুনিলেন, এবারও কোনো জবাব দিলেন না।

সরস্বতী বলিল—আমি আর কদিন বা আছি!...আমার কথা শোনো দাদা, তুমি হলে সমাজপতি...জোর-গলায় তুমি বলে...নিজের দ্বী...জোক যে ভাগ করবো, কি তার দোষ? বিলতে কে না বাচ্ছে। তা ছাড়া বিলতে যে গিয়েছিল, সে আজ নেই! এই কথা বলে বৌকে জোর করে ঘরে নিয়ে এসো। তোমার বয়স হয়েছে...তোমাকেই বা দেখবে কে? তাছাড়া বৌয়ের উপর এ কত-কত অবিচার, তাহ

দিকিনি ? লোকে বলে, রামচন্দ্র ত্যাগ করেছিলেন সীতাদেবীকে !
তুনে আমার হাসি পায় । কিসে আঁর কিসে ! রামচন্দ্র ছিলেন দেবতা ।
দেবতার যা সাজে, মানুষের তা সাজতে পারে না । ঐ যে ভগীরথ...
গঙ্গা এনেছিলেন বাংগের মঙ্গলের জন্ত ! আহুক তো দিকিনি গঙ্গা
এ যুগে, কে পারে...কত বড় ধ্বংসি ! 'মানুষের মনটার দিকে মানুষ
বন্দি' না চাইবে তো কে চাইবে, বলা তো ? একে বান্দরামি ছাড়া
আর কিছু বলে না ।

মাখন গাঙ্গুলি একটা বড় নিখাস ফেলিলেন...তার পর ধীর
পায়ে বাহিরের দিকে গেলেন ।

সুশীল বলিল—তুমি ছেড়ে না মা...বার-বার বলা ! ঠর যনে
বেশ ঝিখা জেগেছে । এই ঠিক সুযোগ ! তা ছাড়া ছেলেগুলো কি
হচ্ছে, দেখছে তো ? বিনয়টা লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে গেছে ।
ওর দেখায়েছি ছোট বিমানও সেই রকম তৈরী হচ্ছে । মামা বাবুর
সে-দিকে লক্ষ্যও নেই । মামীমা থাকলে এমন হতে পারতো ওরা ?

সরস্বতী বলিল—হঁ । সবই দেখছি । পাড়া-গাঁ । বাইরের সঙ্গে
সম্পর্ক রেখে চলতে হলে কি মানুষ এত দূর পারে !

সুশীল বলিল,—কিন্তু বাইরেকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না । পাড়া-
গাঁই কি তাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, ভাবো ? একথা
মামা বাবুর মতো মানুষ একবার ভেবে দেখবেন না ? দেশে
বাবুর ভগ্নপ্রতি ঐ বিরাট বাবু আমাকে সেই কথাই বলছিলেন ।
বলছিলেন, পশ্চিমে গিয়ে যারা বাস করছে, তারা নানা দিক দিয়ে
করোয়ার্ড ; এসব সংস্কার অনেকখানি কাটাতে পেরেছে । সহরেও
জন্মন ধরেছে । গ্রামেই শুধু মানুষ মানুষের দাম না বুঝে
কতকগুলো পুরোনো আচারের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে
এখনো !

সরস্বতী বলিল—ওসব কথা থাক । এখানকার কাজ ভালোয়
ভালোয় এখন চুকলো...বৌয়ের কাছ থেকে কখন আমি সেই এসেছি !
আমার মন আর মানছে না রে । আমি বগানে চলুম ।

সুশীল বলিল—বাও । এমিককার দেখা শুনা সেরে আমিও এখনি
যাবো ।

সরস্বতী বলিল—তোমার মামা বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে যেনো বাবা ।
কাল ফুলশয্যা পাঠাতে হবে । তোমার ওপরেই ঠর ডরনা !

ফুলশয্যা পাঠানোর ব্যবস্থা সবকিছু আলোচনা শেষ হইতে রাতি
নটা বাজিয়া গেল ।

সুশীল বলিল—এবার আমি উঠি মামা বাবু । সেখানে আমি
গেলে তবে ডাক্তার বাবুর ছুটি মিলবে ।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—চ, আমিও তাঁর সঙ্গে যাবো ।

এই পথান্ত বলিয়া পুরোহিত প্রভৃতির পানে চাহিয়া প্রশ্ন
করিলেন,—আমাকে এখন আর তোমাদের দরকার হবে আজ ?

সকলে জানাইল, না ।

সুশীলের সঙ্গে মাখন গাঙ্গুলিও বাহির হইয়া গেলেন ।

বন্ধু বাবু এখনো আছেন । বারান্দায় বসিয়া কদমের সঙ্গে গল্প
করিতেছিলেন ।

সুশীল হাসিয়া প্রশ্ন করিল—খপর ভালো তো ?

বন্ধু বাবু জবাব দিলেন ; বলিলেন—ভালো ।

--আপনাকে তাহলে আজ রাতে আর কষ্ট দেবো না ।

বন্ধু বাবু বলিলেন—কষ্ট নয় । তবে আমার আর দরকার হা
বলে' মনে হয় না ।

সুশীল বলিল—আজ রাত্রে মতো আপনার ছুটি ! যদি দরক
হয়, ডেকে আনবো ।

বন্ধু বাবু বলিলেন—নিশ্চয় ।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—আমার একটা কথা আছে, ডাক্তা
বাবু...

বন্ধু বাবু সঙ্গমে বলিলেন—আদেশ...বলুন ।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—বড় বিপদে আপনি এসে দাঁড়িয়ে
—একশ শোধ দেবার নয় !...তবু এ হলো আপনার পেশা-
কাজেই পেশার দিকে আপনার না লোকশান হয়, সে সখা
আমার যা কর্তব্য, যথাসাধ্য পালন করবো...তাতে আপনার আপ
চলবে না ।

হাসিয়া সুশীল বলিল—সে আপত্তি করলে আমরা তা শুন
কেন ?

মুহ হাসিয়া বন্ধু বাবু মাথা নত করিয়া রহিলেন ; কোনো জব
দিলেন না ।...

সরস্বতী বলিল—তোমার সঙ্গে কথা আছে, দাদা ।

মাখন গাঙ্গুলি গিয়া ঘরে বসিলেন ।

বিন্দুমতী বলিলেন—জামাই তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—পছন্দ তো আগে থেকেই হয়েছিল
তোমার মত নিজেই পছন্দ করেছিলুম ।

বিন্দুমতী বলিলেন—ভগবান্ ওদের দীর্ঘজীবী করুন...স্ব
করুন !

তার পর অনেক কথা হইল । সরস্বতী বলিতে লাগিল বি
আয়োজনের পুছামুপুছা বিবরণ...মাখন গাঙ্গুলি বসিয়া চুপ করি
শুনিত লাগিলেন ।

বাহিরে সুশীল আর কদম...

সুশীল বলিল কদমকে—তুমিও আজ বাড়ী যাও কদম ।...ক
থেকে তোমার খুবই কষ্ট চলেছে । আজ বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্র
...তার পর কাল সকালে বরং আবার এসো !

কদমের মুখ মলিন হইল...মন বিবস । সুশীলের পানে চাহি
সাগ্রহে তার কথা শুনিতোছিল ; একথাও মুখ নাটাইল ।

সুশীল বলিল—কথাটা মনঃপুত হলো না, বুঝি ? না কা
আজ বাড়ী বাওরা উচিত । দরকার বোধ করলে তুমি যেতে চাইলে
তোমাকে আমরা যেতে দিইুম না । কাল তো কোনো আপ
করিনি...আদর করে ডেকে এনেছিলুম...আপনার জন ভেবে ।

কথাটার কদমের বুক বেন জুড়াইয়া গেল । তবু সে মাথা তুলি
না । যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল ।

সুশীল বলিল—ডট্যাফি-মশাই মুখে কিছু না বললেও
হয়তো একটু...মানে, হয়তো ভাবতে পারেন, যজ্ঞমান বলে বড়
জুলুম করছি তাঁর উপর !

কদম এবার চাহিল সুশীলের পানে—চোখে কল্প আবেদ
তার পর কোনো মতে সলজ্জ মুহু কণ্ঠে বলিল—কিছু বলেছেন ?

শুশীল বলিল—না, না...আমার এমনি মনে হচ্ছিল।...তা, রাত্রে খাওয়া-দাওয়াও আছে তো?

যুহু কণ্ঠে কদম বলিল,—এ-বেলায় খাবো না। বিদে নেই।

—না খাও, তোমার একটু ঘুমোনা। দরকার। খোকা শুয়েছে তো...ওর ঝাঁ আছে। ঝাঁ আজ দেখবে। তাছাড়া আমিও খোকার কাছে থাকছি তো রাত্রে...এ ঘরে।

কদম বলিল,—কাল থেকে আপনার যেমনও বড় কম যাচ্ছে না। চিন্তিত্তা...তার উপর বিয়ে-বাড়ীর কাজ।

হাসিয়া শুশীল বলিল,—আমরা পুরুষ-মানুষ...দরকার হলে গাছ কেটে কাঠ বয়ে আনতে হয়...তার তুলনায় একাজ কিছুই নয়।

একথায় কদম হাসিল, বলিল,—যেয়েদেবও ছোট ভাববেন না। জল তোলায় কাজ মেয়েবাই করে। আবার সংসারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজ...পুরুষ-মানুষের করে না, আমবাই করি।

শুশীল বলিল,—তুমি কি বলতে চাও...খোলশা করে' বলো।

কদম বলিল,—আমি আজ এইখানেই থাকবো। আমার কোনো কষ্ট হবে না।...বাড়ী গেলে ঘুমোতে পারবো না...সত্যি। জ্যাঠাইমার জন্ত মন থেকে ভাবনা যাবে না তো!...

শুশীল ভাবিল, হঁ, মামীমাকে কদম ভালোবাসে, মামীমার জন্ত তার মনে চিন্তিত্তা...খুবই স্বাভাবিক।...কিন্তু ওদিকে ভট্টাচার্য্য-মশায়! স্বামী! তাঁকে দেখা কদমের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

কদম ভাবিত্তেছিল, বাড়ী! সেখানে তার কি স্থখ!...মেয়ে হইয়া কলিয়াছে...ভাগ্যকে ঠেলিয়া দিতে পারবে না...তাই কোনো মতে দিন কাটিয়া যায়! নতিলে মনের দিক্ দিয়া কি সে পাইয়াছে? অনেক-কিছুই স্বপ্ন দেখিত। বিবাহ হইয়া...বিবাহের পর স্বামী...স্বামীর আদর...স্বামীর মনে মন মিলিয়া এক হইয়া যাইবে! নিজের মন দিয়া, সে যেমন বুঝিবে স্বামীর মন, স্বামীও তেমনি...

মনে পড়িল, সজ-পড়া চন্দ্রশেখর উপাঙ্গাসের কথা। সেই যে চন্দ্রশেখর বলিয়াছিল, আমার পুঁথি পাড়িয়া পুঁথি তুলিয়া...আমার জন্ত রান্নাবান্না করিয়া আমার সংসারে জল বহিয়া শৈবলিনীর কি সুখ!...

একটা নিশ্বাস অতিক্রমে দমন করিল। মন বলিল, চন্দ্রশেখর তবু শৈবলিনীর কথা ভাবিয়াছিল। শৈবলিনীর সুখ-দুঃখের চিন্তায় বইয়ের চন্দ্রশেখরের মনে সেলা লাগিয়াছিল! কিন্তু তার চন্দ্রশেখর?

সরস্বতী আসিল, বলিল,—কি হচ্ছে তোদের?

শুশীল বলিল,—কদমকে আজ রাত্রে আমি বাড়ী যেতে বলছি মা, ...কাল থেকে ও-বেচারীর থকল বা চলছে...আজ বাড়ীতে ঘুমিয়ে বিজ্ঞান করা চাই! তার পর কাল সকালে আবার না হয় আসবে। মামীমা ভালোই আছেন, এবং ভালোই থাকবেন।

কদম জরাজীর্ণ করিয়া আবারের সুরে বলিল,—দেখন না পিসিমা, ওর জ্বলুম! আমার একটুকু কষ্ট হয়নি। তাছাড়া এখানেও তো আমি রাত জাগবো না, ঘুমোবো।

কদমের কথায় দরদ দেখিয়া সরস্বতী খুশী হইল, হাসিয়া বলিল,—না মা, আজ বরং বাড়ী বাও। ভট্টাচার্য্য-মশায়েরও খুব বেশী রকম পরিশ্রম গেছে...মাথা ধরে আছে, বলছিলেন!...কাল বিয়ে দেওয়া...আজ কুশণ্ডিকা...ব্রাহ্মণ-মানুষ...বরসও হয়েছে। এই সম্রাট

আগে তাঁকে কোনো মতে খাইরে আমি এসেছি। তাঁকে দেখানো করা দরকার।...তুই তাই কর, মা কদম, আজ বাড়ী গিয়ে শুবে পড়, কাল সকালেই আবার আসিস। ভট্টাচার্য্য-মশাইকে বলিস, পিসিমা আসতে বলে দেছে! স্বামী! স্বামীর মতামত নিতে হবে বৈ কি! আমি বাহন্য করে এসেছি, ও-বাড়ী থেকে তাঁর ওখানে সকলকার খাবার যাবে। সেখানেও সব আজ একটু জিহ্বাবার জন্ত আকুল!...

কদম একথায় প্রতিবাদ তুলিতে যাইতেছিল, পারিল না।

শুশীল বলিয়া উঠিল,—স্পীক-টি-নট! মার কথা! মাতৃ-আদেশ! চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তার পর নির্ভয়ানুগে আবার আজ সকাল-সকাল লগ্নে পড়বো।

হাসিয়া কদম বলিল,—ও! আমাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। তাই তাড়া দিচ্ছেন। আমি কিন্তু কাঁটা হয়ে আপনার ঘর জোড়া করে থাকতুম না! এষ্ট বারান্দায় খাঁচল পেড়েই শুতুম...তাতে আমার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হতো না।

শুশীল বলিল—অজ্ঞান মনুষ্য তোমায় দেখাতে দেবো কেন? পুরুষের চেয়ে তুমি হবে বড়...বটে! আমার পৌরুষ তাতে চুম্বার হয়ে যাবে না?

সরস্বতী হাসিল। হাসিয়া বলিল—নে বাপু, ভোদের বগুড়া বাথ! ওকে পৌঁছে দিতে চাস, এমনি দে। ভট্টাচার্য্য-মশাই নিক্ত হইয়া নিতে আসতে পারবন। তাঁকে বলে এসেছি, আমি গিয়েই কদমকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো!

শুশীল উঠিয়া পাড়াইল, কতিল—ওঠো কদম, আর নব। ঘরে আমার চোখ চুলচ। আর দেবী করলে পথেই হইতো ঘুমের ঘোরে ধপাশু করে পড়ে মর্জ্জা যাবো।

কদমকে গৃহ ফিরিতে হইল। শুশীল চলিল সঙ্গে। পথে কোনো কথা নব...তুঁজনে নিঃশব্দে চলিল। বাড়ীর তাড়াকড়ি আলিতে কেশব-ঠাকুরের কঠু লমা গেল...সেই সঙ্গে পুঞ্জ যুগলের কঠু! তুঁজনে বেশ জোর কলহ চলিয়াছে।

সে-কলহের মাধ্যমে কদমকে লইয়া শুশীলের শ্রবেণ।

শুশীল বলিল,—বাপার কি ঠাকুর-মশাই?

কেশব ঠাকুর যেন খাঁটির জোর পাটলেন। বলিলেন,—এই যে বাবা, তুমি। জাগো না চেলের কাণ্ড। ও-বাড়ী থেকে এসে দেখি, যুগল কার্ণের সিদ্ধকেত তাল ভেঙেছে। একটা জাতি গুহ চাই! বলে, টাকার দরকার! হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেছে! শেষে আমাকে মেলে বাজু খসে জাতি নিলে!

শুশীল চাছিল যুগলের পানে। আলো জ্বলিত্তেছিল...সে-আলোর দেখিল, যুগলের দুই টোটা পাশ খাইয়া লাল, যেন পাকা তেলাকুচ। মাথার চুল চার-আনা বারো-আনা হাঁদে ছাঁটা...গায়ে একটা সিঁড়ের পাঞ্জাবি...পাঞ্জাবির হাতা দু'টো প্রায় দশ হাত লম্বা! আর দু'চোখে যেন দু'টো আগুনের গোলা ঘুরিতেছে!

শুশীল ডাকিল,—যুগল...

যুগল বলিল,—এর আবার যুগল কি? আমার স্পষ্ট কথা, বড় হয়েছি—এটা-ওটা খরচ আছে তো! বাবা একটি পরমা দেবে না, কাজেই এ ছাড়া উপায়? বলিয়া সে এক-সুহৃৎ পীড়ায়িল না, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

কদম যেন পাখর ! কেশব-ঠাকুর বলিলেন,—দিন-দিন যা হচ্ছে,
আমার ভয় হয় সুনীল, আমার অবর্তমানে...

একটা নিশ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। নিশ্বাস ফেলিয়া কেশব-ঠাকুর
জবাব বলিল,—অবর্তমানে কেন ! আমি বেঁচে থাকতেই ও
যে কি না করবে, ভাবলে আমার মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে !

সুনীলের মনে পড়িল, মায়ের মুখে শুনিয়াছে, ও-বাড়ীর
খিয়েটারের দিন কদমের সখল একখানিমাঝে দামী বেনারসী শাড়ী—
কদমকে বকিয়া ঠেলিয়া জোর করিয়া—সেই শাড়ী লইয়া
গিয়াছিল এই যুগল খিয়েটারে ফিমেল সাজিবে বলিয়া।
...ছনিয়াকে সরা দেখিয়া বেড়াইতেছে ! এত প্রতাপ ও কোথা

হইতে পাইল ? তাছাড়া কেশব ঠাকুর যে কথা বলিলেন,
অবর্তমানে...

কথাটা তুচ্ছ করিবার নয়। ও-কথার সঙ্গে কদমের
বিজ্ঞপ্তি আছে বৈ কি !

সুনীল চাহিল কদমে পানে...কদম তার পানে চাহিয়া আ
হ'চোখে ভীতা হৃদয়ী বৃষ্টি !

বলিল—আপনার উপর নিতা এমন জুলুম করে না কি ?
কেশব ঠাকুর বলিলেন—মোটে মানে না বাবা। আর জু
আমি সত্য বলছি, কি মিথ্যা বলছি, তুমি বরং এই ক
জিজ্ঞাসা করো !

আদি কবি

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য

আজি আমি অন্তবাসী বঙ্কাজলি সশ্রদ্ধ অন্তরে
আসিয়াছি আশ্রমে তোমার,
তোমার নিখিল জুড়ি যে বিরাট গ্রন্থ লেখা হয়
সেখা মোরে দাও অধিকার !
তোমার বিশাল বিধে তুণে-তুণে পল্লবে-পল্লবে
রচিত্তেছ যে মহা-কবিতা,
আমারে দীক্ষিত করো স্মহান্ সেই ছন্দে তব
হৃদাকাশে উচুক্ সবিতা !

প্যানমোন হে মহর্ষি, নভাঙ্গন ঘেরিয়' তোমার
কুতূহলী আসে শিষ্যদল,
চিরগাত্রি জাগরুক অনিমেঘ অবহিত তারা—
তব নাহি পায় তব তল !
এ কি ঘন রহস্তেতে আপনারে অবলুপ্ত করি
বিরচিছ মহামোন বাণী !
চির আলো-অন্ধকারে বঞ্চারিত হয় চিব-যুগ
অপকূপ তব তন্ত্রীখা ন !
চিস্তে মোর নৃত্য করে অন্তহীন অভিনব আশা
প্রকাশিতে স্বরূপ তোমার,
আশা আছে, ভাষা নাহি ! সাধ আছে, সাধ্য কোথা মোর,
অর্থ বুঝি তোমার লিখার ?
দাও, দাও, খুলে দাও নিজ-করে ওই স্বনিক
রাখিয়ো না ঘন অন্ধকারে,
কৃপা করি অনাবৃত করো তব অক্ষর ভাণ্ডার
এই ভিক্ষা মাগি তব দ্বারে ।

যদি পারি রেখে যেতে মৃত্যুহীন জীবনের গান
বিরচিয়া অভিনব গীতা,
মোর প্রতি কোন দিন যদি করে কৃপা-দৃষ্টিপাত
বিশ্বলক্ষী অনবগুণ্টিতা—
ধন্য মানি এ-জীবন, বেদনারে মনে নাহি গণি
যদি কভু পূরে মন-সাধ,
কৃতজ্ঞালি কস্ত্র বন্ধ আসিয়াছি চরণে তোমার—
লভিব কি দৃষ্টির প্রসাদ ?

আদি কবি মহাকবি মনে জাগে অভিলাষ প্রভু,
মোর এই মানব-ভা
লাগে যদি কণ-তরে অপার্থিব ও-স্বরের রেশ
তুচ্ছ করি কাঁদা ও হাস
সৃষ্টির প্রভাত হতে উদেছিল মানব-হৃদয়ে
যে গভীর অশেষ জিজ্ঞাসা
তোমার ভুবন ব্যাপি লিখে যাও উত্তর তাহার
পড়িব তা' জানা নাই তা
তুচ্ছ করি স্মৃতি-হুঃখ জন্ম-মৃত্যু আশী লক্ষ বার
জন্মান্তরে যদি কোন ।
অজ্ঞান তমিস্রপুঞ্জ ছিন্ন করি' অন্তরে আমার
বাজে তব আলোকের ।
পারি যদি ভাষা দিতে, সৃষ্টিকাব্য যদি ওঠে হুটে
মোর পাব্যে ওগো মহা-
অমৃতের সরোবরে হৃদি-পদ্ম উঠি বিকসিয়া
তব পদে লুটায় হে ব

১

হুন্সা আর অম্বর দু'খানি যেন জীবন্ত ছবি। এমন মিল দেখা যায় না। অম্বর যেন উপল-সমাকীর্ণ গিরি-পথ, আর হুন্সা যেন নবীন অরণ্যে সজ-জাগবিভা স্বৰ্ণা! কিছু না ভাবিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া ঐ গিরি-পথে বাঁপাইয়া পড়িয়াছে! এক জনের বয়স একুশ, আর এক জনের বোল।

হুন্সা যখন গান ধরে, অম্বর আসিয়া তাহার শরের বিকৃত অঙ্ক-করণ করে। কৃত্রিম কোপে হুন্সা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলে ঘর মুখবিত্ত হইয়া ওঠে দু'জনের হাতরোলে। হুন্সা হয়তো নিভৃত বসিয়া একমনে মাকে চিঠি লিখিতেছে, অম্বর চুপি-চুপি পিছনে আসিয়া এমন কাড়কুড় দিবে যে, হাসিতে-হাসিতে বেচারীর নিশ্বাস বন্ধ হইবার লো! কাগজ ভিঁড়িয়া, কলম ভাঙ্গিয়া, দোয়াত উন্টাইয়া গৃহ-তল নিমেষে রণস্থল হইয়া ওঠে।

বাড়ীর পিছনে মন্ত বাগান। দু'জনের অনেকখানি অবসর এই বাগানে অতিবাহিত হয়। দু'জনে বকুলতলায় বসে—গছভরা ছোট-ছোট ফুলগুলি করিয়া গায়ে পড়ে—অম্বর বলে, আমাদের গায়ে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে! হাসিয়া হুন্সা উত্তর দেয়, ঠিক, আমরা দেবতা না কি? তাহার কণ্ঠে বাহু সংলগ্ন করিয়া কাণে-কাণে অম্বর বলে, দেবতাই তো। কিসে জানো?—প্রেমে।

দু'জনে দু'জনের পানে কখনও অপলক নেড়ে চাহিয়া থাকে, কখনও নুকোচুরি খেলে, কখনও দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা করে। দিনগুলি কাটিতেছে সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়া। কিন্তু এক দিন এ হাসিখেলার অবসান হইল।

অম্বরকে ডাকিয়া অম্বরের পিতা যোগেশ বাবু কহিলেন,—আসুতে সপ্তাহে তোমার সিলোন যেতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হও।

সাবানটা বজ্রাঘাতের মত তরুণ-তরুণীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। কিন্তু প্রাণে সেই একই রাগিণী বজ্রত, বৃকে একই আবেগ! হুন্সা পরামর্শ দিল, একবার মাকে বলে দ্যাখো না, হয়তো বাবাকে বোলে তিনি ষাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন।

অম্বর ছুটি মায়ের কাছে। সেখানেও বিধি বাম! ধরা-গলায় মাথা নাড়িয়া মা বলিলেন,—অনেক বলেছি বাবা, ফল হয়নি। উনি বলেন, উন্নতি হবে কত—বাকে বলে, মামুষের মত মামুষ। কাজটা শিগগিরে পারলে, আর শিগগিরে মোটে বছর চারেক সময় লাগে—একবারে খুব মোটা মাইনে নিয়ে ফিরে আসবে। তার পর দ্রুত উন্নতি।

অম্বর ফিরিল নিরাশা-ভরে। মনে মনে বলিল, টাকা! টাকা! টাকা! টাকার কি হইবে? চাইনে আমি বড়লোক হইতে।

রাত্রি গভীর। হুন্সা আর অম্বর তখনও বাগানে। অম্বরের পানে চাহিয়া আছে হুন্সা—সজল চোখ। অম্বর লুট বাজাইতেছিল। অতৃপ্ত স্বর চলিয়াছে অসীমে যেন কোন্ জীব-জগতের বাহিরে!

কতক্ষণ পরে বাঁকি ধামিল। অম্বর চাহিল হুন্সার পানে। বলিল,—ও কি, তুমি কাঁদছে?

অম্বর হুন্সার চোখের জল মুছাইয়া দিল। হুন্সা বলিল—সিলোন অনেক দূরে—না?

—হ্যাঁ। অনেকে বলেন, এটাই ছিল লক্ষ্য-বীণ, ত্রোতাংগে বাবেশের রাজ্য।

হুন্সা চুপ করিয়া বসিল। তাহার মানস-নয়নে অভিনব দৃষ্ট অভিনীত হইতেছে। সেই উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অশোক-কানন—সে কাননে রামপ্রিয়া বন্দি সীতা এবং আশ্রয়কে বসিয়া বার্তাবাহী হনুমান রামের অঙ্গুরী প্রদান করিতেছে! অম্বর জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছো?

নিশ্বাস ফেলিয়া হুন্সা কহিল,—ভাবছি আমি যদি সীতা হতুম!

অম্বর তাহার গাল টিপিয়া আদর করিয়া কহিল,—আর জন্ম-দুঃখিনী সীতা হয়ে কাজ নেই! ত্রিশদিন আমার আদরিণী হুন্সাই তুমি থাকো। বিরহ যত ভীত হোক, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, শেষে আবার মিলন—চির-মিলন!

২

অম্বর চলিয়া গিয়াছে। বিদায়-কালের বাক্য-স্মৃতি হুন্সার বৃকের খাঁজে-খাঁজে বাধিয়া গিয়াছে। বিচ্ছেদ দু'চার দিন আবুল করিয়া তুলিলেও শেষে সেই স্মৃতি লইয়াই সে মালা গাঁখে। বকুল গাছের তলাটি তাহার তীর্থ। সময় পাইলেই সেখানে গিয়া বসে। মাথায় টুপটাগ করিয়া ফুল করিয়া পড়ে। মনে জাগে অম্বরের কথা—‘দেবতাই তো। কেমন কোরে, জানো?—প্রেমে।’ চোখ জলে ডরিয়া আসে।

এক দিন যোগেশ বাবুকে ধরিল,—বাবা, বকুলগাছের তলাটা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিন না।

তার প্রতিশ্রুতির বিপক্ষে বধূর আব্দার জয় লাভ করে। অবিলম্বে বকুল-তলা মনোজ্ঞ প্রস্তরে শোভিত হইল।

দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ চার বৎসরও কাটিয়া গেল। অম্বরের ফিরিবার সময় হইয়াছে। হুন্সা হুন্সার মত লীলা-চঞ্চল। যৌবনের প্রাণজ্ঞে যাতাকে সর্কু স্বদান করিয়া নিঃশব্দ হইয়াছে, যাহার প্রতীকার রাত্রির পর রাত্রি কাটায়াছে অকুল চিন্তায়, অনিদ্রায়, আবার সে তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিতেছে! আবার তেমনি কহিয়া জ্যোৎস্না-বিকশিত বজ্রনীতে, স্বচ্ছ পুষ্পময় শরৎ-প্রাতে, মধুর বন্ধারে সে তাহার হৃদয় বিমুক্ত করিবে।

ফিরিয়া আসিল অম্বর। ছাফিল বছরের অটুট আত্মবান বলিষ্ঠ যুবক। পরনে কোট-প্যাট, চোখে সোনার চশমা। হুন্সা লজ্জা-বিজড়িত সন্ধোচে এক-পলক চাহিয়াই রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা ছুটিয়া কোথাও গিয়া লুকায়।

সকলের সহিত আলাপ ও প্রণামাদির পর অম্বর নিজের ঘরে আসিল। হুন্সাকে জড়সড় দেখিয়া হস্তমুখে কহিল,—কি, চিনতে পারছো না? পরিচয় দিতে হবে?

হুন্সার মুখ পাতুর। মনে হইল, এ লোকটির সঙ্গে যেন নূতন করিয়া পরিচয় করিতে হইবে।

দুপুরবেলা আহারের পর অম্বর বাতির হইয়া গেল। এখন আর সে কলেজের তরুণ ছাত্র নয়, দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত নব্বয়মত একজন বড় অধিকার। হুন্সা বিবর্ণ-মুখে জানলায় পাশে পাড়িয়া বসিল। হাতে রূপার একটা স্মৃতি কোটা। অশ্রু-ক্ষণে মনে আসিতেছে

অশ্বরের অভিনন্দন-বাণী—**তুমি** মাথায় ভরষার লম্বা হয়েছ, বং একটু ময়লা গয়ে গেছে ! তার উপর নীতিমত গম্ভীর গিন্নী একেবারে !

কিন্তু অশ্বর একবার দেখিল না, তাহার নিজের পরিবর্তন হইয়াছে কতখানি ! দেখিল না, নিম্নল শতদল নিষ্ঠুর পদ-পীড়নে ব্যথার কতখানি আতুর ! ধীর ভাবে হুন্না কোটা খুলিয়া টুংগড়া বকুলমালা বাতির করিয়া একবার জ্ঞান লইল। তাহার পর সাক্ষ্যনয়নে টুকরা টুকরা করিয়া সে হুটা জিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

৩

সে অটালিকাব আত্ম নুতন শ্রী। গেরাজে মোটর-কার। রাজ-সরকারের অরণ্য-বিভাগের বড় অফিসারের যেমন চালচলন মানায়, কোথাও তাহার গতিটুকু ক্রটি নাই। অংহুত অনাহুত বহুবাক্ষবে গৃহ সর্জন সাবগম। তাহারের আদর-আপ্যায়নে হুন্না কেও যোগ দিতে হয়, অন্ততঃ শিষ্টাচারের খাতিরে। অশ্বরের নারী-বন্ধুর দলটিও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। কারণ, স্ত্রী-পুরুষ-নির্কির্শেবে সমভাবে মিশিতে না পারিলে সামাজিক হত্যা যায় না।

সে দিন বাড়ীতে পাটি। উৎসব শেষ হইতে রাত্রি বারোটা বাজিল। হুন্না সামাজিক সাজসজ্জা ছাড়িয়া সাধারণ বেশে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, স্বামী তখনও অমুপস্থিত। তাহাকে এখানে-সেখানে খুঁজিতে খুঁজিতে বারান্দায় আসিয়া দেখে, ইঞ্জিনের দিকে হুইয়া অশ্বর সিগারেট টানিতেছে। হুন্না কহিল,—এখনও বাইরে শুয়ে আছো যে ?

—তুমি এত রাত্তিরে ওপরে এলে ! হ্যাঁ, এবার চलो। এখানে শুয়ে চাদের আলো দেখছিলুম।

—চাদের আলো খুব ভালো লাগে !

অশ্বর হাসিয়া রহস্তভরে কহিল,—লাগে।

—আচ্ছা, তুমি ফুল ভালবাসো ?

—ফুল কে না ভালবাসে ?

—তবে চलो না, একটু বকুল-তলার গিয়ে বসি।

ক্র কুঞ্চিত করিয়া অশ্বর কহিল,—কোথায় ?

—বকুলতলার। আমাদের সেই বাগানে।

বিরক্তির অশ্বর কহিল,—রাত একটার সময় বাগানে বকুল-তলার ! মাথা খাড়াপ হয়েছ ?

হুন্না নত-মুখে মলিন ছবির মত গাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অশ্বর কহিল,—মিষ্টার বোসের বোন হেনাকে তোমার কেমন লাগলো ?

হুন্না নীরবে মাথা তেলাইল। অশ্বর উচ্ছ্বসিত বর্ণে কহিল,—চমৎকার মেয়ে। আমি কি ওর সব্বন্ধে অভ্যাক্তি করেছি ?

হুন্না ভেমন নীরব নিম্পন্দ ! অশ্বর বলিতে লাগিল,—অন্ত বড় একটা ধনীর মেয়ে, কিন্তু দেখলে বা মিশলে বোঝবার জো নেই। কি অমায়িক সরল ! আমাদের সমাজে এমন মেয়েই দরকার।

হঠাৎ অশ্বর আবিষ্কার করিল, হুন্না কিছুই শুনিতেছে না। তখন বিরক্ত-ভরে সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া কহিল,—তোমার কি হয়েছে ? সর্জন বিষম্ব দেখি কেন ? ক্রমশঃ যেন একটা প্রহেলিকার মত হুন্না গাঁড়াচ্ছে তুমি !

অশ্বর উঠিয়া ঘরে হুইতে গেল। হুন্না বারান্দায় গাঁড়াইয়া

৪

অশ্বর ক'দিন বাড়ী নাই, বাহিরে গিয়াছে কাজে। বৈকালে হইতে বাহির হইয়াই হুন্না বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিছু শান্তি কি-কাজে সে দিকে আসিয়া হুন্না কে এমন অসম্মে থাকিতে দেখিয়া কহিলেন,—এমন সময় শুয়ে !

গৃহিণী নিকটে গিয়া তাহার মাথার হাত দিয়া টাট্টিলেন। কহিলেন,—এ কি ! অশ্বর হয়েছে যে ! হঠাৎ কেন ? তাও বলি মা, যাঁতা লাগাও।

তিনি চলিয়া গেলেন। হুন্না ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে চোখ মেনিতেই হুন্না দেখিল, শান্তি পাশে তাহাকে চাহিতে দেখিয়া শান্তি কহিলেন,—কেমন আছো, —এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে মা !

তার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—আমায় এ বকুলফুল আনিয়ে দেবেন, মা ?

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, পাগলী ! এখন বকুল ফুল হবে মা ?

হুন্না হাসিল—ভারী মধুর হাসি। কহিল,—একটু আছে।

পরিচারিকা হিম্ব এক-সাজি ফুল আনিয়া দিল।

৫

আট দিন কাটিয়া গেছে। হুন্নার সেই স্বর বাঁকা-পথে ভ গাঁড়াইয়াছে। যে-কাজে অশ্বর গিয়াছিল, তাহা অসম্পূর্ণ তাহাকে গৃহে ফিিয়া আসিতে হইল। বড় বড় ডাক্তাররা করিতেছেন। রোগ সাংঘাতিক, এ বিষয়ে সকলে তুচ্ছবায় পাছে ক্রটি হয়, এজন্য দু'জন নার্স বাহাল অশ্বর ছুটি লইয়া রোগিণীর তত্ত্বাবধানই ব্যস্ত।

সেদিন রাত্রে সহসা হুন্না চোখ মেলিয়া চাহিল।

দুঃখ। মাথা ঘুরাইয়া সকলের পানে তাকাইয়া যেন খুঁজিতে লাগিল। নার্স জিজ্ঞাসা করিল,—কিছু বলবেন ?

হুন্না বেশ স্পষ্ট ভাবে কহিল,—উনি ?

অশ্বর মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—এই যে আ বলবে, বলো।

হুন্নার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যত্ন অথচ সে কহিল,—আমায় একবার বাগানে নিয়ে যাবো ?

অশ্বর সর্গমুখে কহিল,—বাগানে ?

হুন্না কহিল,—হ্যাঁ, সেই বকুলতলার।

অশ্বর কহিল,—কি বলছ হুন্না ! সেখানে যেতে প এখন ?

হুন্না কহিল,—পারবো। আমার তীর্থ। যা আমি আর কি পারবো ? তা এ বাগান বৃকে করে রেখেছি। নিয়ে চलो।

বলিতে বলিতে মানসিক উত্তেজনায় যত্নে কি যে তা ডাক্তার ছুটিয়া আসিলেন—উত্তর দিলেন। কিন্তু সব হুন্নার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অভিযান্ত্রিক-ভরে ইহলোক হইতে বিদায় লইল।

আচরণে প্রকাশ করিতে পারে নাই। অকালে নীরবে বিলাস লইয়া জানাইয়া গেল, সে বাহা চাহিয়াছিল, সংসার তাহাকে তাহা দিতে পারে নাই! তাই ছন্দের মতই ছন্দা কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

অম্বর এখন এক। সে জানিত না, একা থাকার দুঃখ কত-খানি। জানিত না, বিচ্ছেদ কত তীব্র হইতে পারে। ছন্দা বধন বাঁচিয়া ছিল, তখন সে বৃকের কতখানি জুড়িয়া ছিল, অম্বর তাহা বোঝে নাই। তাহার প্রথম উপাঙ্গনের অর্থরাশি দ্বয়ে প্রতীক্ষিতা বৌবনের মানসী শ্রিয়াকে চাপা দিয়াছিল।

সেদিন সে টুরে বাইবে। জিনিষ-পত্র গুছাইতে গুছাইতে একখানা খাতা বাহির হইয়া পড়িল। খাতার মলাট সুদৃশ্য। আগ্রহে পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে খাটের উপর বসিল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা—শ্রিতমম্!

তাহার পরই টকটকে একটা গোলাপ আঁকা। ছন্দা এত সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত!

গোলাপের ছবি। তাহার নীচে লেখা আছে—

বিহব মোর অঙ্গ-রূপে দিলাম গোলাপ তোরে,
মিনতি মোর শিশির সম রাখিস্ হৃদয় ভোরে!

হেরি তোরে বন্ধু হবে মুগ্ধ হয়ে বন্ধে লবে

মোর বেরনার বান্ধা জানাস্, বলিস্—সেনা মোরে?

অঙ্গবাসে চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। খাতার পর-পৃষ্ঠাতেই বাহির হইল আঠা দিয়া আঁটা একখানা ফটো—বাসানে অম্বরের কোলা মাখা রাখিয়া ছন্দা শুইয়া আছে। ফটোর তলার লেখা—

তুমি আর আমি এসেছি ধরায়।

বচিতে অলকানন্দা!

মহন করি স্বর্গের প্রেম

এনেছে তোমার ছন্দা।

খাতাখানা বৃকে চাপিয়া অম্বর বিবর্ণ মুখে বসিয়া রহিল। ঘরের দেওয়ালে ছবি দু'খানার ক্রেমে ঝোলানো শুক বকুলের মালা দু'টি বাতাসে হুলিয়া হুলিয়া যেন বলিতে লাগিল—নাই! নাই! সে আজ নাই!

গীতা-প্রসঙ্গ

শ্রীরমেশচন্দ্র বাগচি (বি-এল)

ভাত্র মাসের বসুমতীতে এম আলি নেওয়াজ চৌধুরী বি, এ, মহোদয়ের লিখিত 'গীতার ভগবান' শীর্ষক-প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দ অমূল্য করিয়া। শিক্ষিত স্ত্রী মুসলমান গীতোক্ত ধর্মের সার্বভৌমতা উপলব্ধি করিয়া গীতোক্ত উপদেশ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা।

গীতা হিন্দু ধর্মের প্রস্থানতর মধ্যে অন্ততম। ইহা মোক্ষ-শাস্ত্র। হিন্দুর অঙ্গাঙ্গ দর্শন-শাস্ত্রের দ্বারা গীতার প্রকৃত তত্ত্ব হ্রদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। অন্ততঃ হিন্দু ইহাট ধারণা। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "তদ্বিৎ গীতা-শাস্ত্র সমস্তবোধার্থসারসংগৃহ্যতং চুক্তিজ্যোত্স্বং"—এই গীতা-শাস্ত্র সমস্ত বোধার্থসার সংগৃহ্যত চুক্তিজ্যোত্স্বং।

চৌধুরী সাহেবের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কয়েক ভায়গার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে তাঁহার ব্যক্ত মত সম্বন্ধে সম্মুখে কিছু আলোচনা করিব। শাস্ত্রালোচনা—শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণের অন্ততম উপায়।

উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই চৌধুরী সাহেব লিখিয়াছেন, "দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের ভায় জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন"। কিন্তু দেহ ও আত্মা প্রকৃতই কি এক ও অভিন্ন?

"ইদং প্রকল্পিতে দেহে জীবো বসতি সর্বগঃ"

(শিবসংহিতা ২।৩৭)

প্রকল্পিত দেহের সর্বত্রই জীবাত্মা বাস করেন। জীবাত্মার অল্পভূক্তি দেহের সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা সত্য। মনে বস্তু, গৃহের মধ্যে আলো ছলিতেছে, গৃহের সব ভায়গাটুকু পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আলোক এবং আলোকিত গৃহ এক এক অভিন্ন? দেহ ও আত্মার একত্ব ও অভিন্নত্ব হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অসম্ভব কথা। ইহা পূর্ণ দেহাত্মবাদ, এবং এই দেহাত্মবাদের খণ্ডনের

জরুরি বলিতে গেলে গীতার অবতারণা। এই গীতা-শাস্ত্রের "অশোচ্য-নবশোচ্যং প্রজ্ঞাবাদাংশ ভাবসে" ইতি বীজম্। বাহ্যদের দেহের ভজ্য শোক করা অমূল্য, অজ্ঞান সেই দেহের মমতায় শোকগ্রস্ত হইয়া উক্ত বাক্য গীতাশাস্ত্রের বীজ অর্থাৎ শাস্ত্রাঙ্গক বাক্য।

গীতায় ভগবানকে জানিতে হইলে প্রথমেই এই দেহাত্মবুদ্ধি পরিভাগ করিতে হইবে। গীতার নিম্নলিখিত একটি শ্লোকের দ্বারা এই বিষয়ে ভগবানের উপদেশ সম্যকরূপে জানা বাইবে।

"ন জায়তে স্থিরতে বা কশাচিৎ"

নাহং ভূত্বা ভবিষ্য বা ন ভূয়ঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্ততে হস্তমানে শীরে" ২।২০

আত্মা অজ, অমর—ইনি উৎপন্ন হইয়া কখনও বিদ্যমান থাকিবেন না। ইনি নিত্য, শাশ্বত পুরাণ (পুরাতন হইলেও সর্বত্র নূতন; পরিণাম-মুক্ত)। অতএব যৎবিধ ভাব-বিকারমুক্ত; এবং শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। ততঃ দেহ ও আত্মার একত্ব ও অভিন্নত্ব শাস্ত্রবিদগ্ধ এবং তাহা অসম্ভব। এ বিষয়ে অধিক লেখা নিম্নোক্ত। কারণ, ইহা সর্বজন-বিদিত অভিশাধারণ ও সহজ কথা।

লেখক মহোদয়ের দ্বিতীয় কথা—"জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন, তাঁহাতে-আমাত কোন প্রভেদ নাই, সেইহে। তিনি আমি এক"। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের একটি প্রধান বথ। এবং ইহা হইয়াই হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রের সম্প্রদায়-গত বিভিন্ন বাদের মূল হইয়াছে। কিন্তু এক নিম্নোক্ত আত্ম ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন, এ কথা বলা সাধারণ লোকের পক্ষে শাস্ত্রানুমানিত নয়। তুমি, আমি, পক্ষোপাধিক ও অসীম অণুপরিমাণ, জাগতিক যাত্রাতৃঘাতে উদ্বেলিত ও সঙ্গ-বিহারী জীব; নিত্য, বিদ্যুৎ, সর্বগত প্রপঞ্চাতীত, জ্ঞানবরূপ, সত্যস্বরূপ

ঈশ্বরের সহিত তুমি আমি কোন প্রকারেই এক ও অভিন্ন নয়। ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, ইহা ঠাট্টা প্রত্যয়ের কথা। কিন্তু বহুজন্ম-ব্যাপী কৃত উপযুক্ত তপশ্চার দ্বারা পঞ্চকোষ-বিমুক্ত জীব যখন স্ব-স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজের জ্ঞান (consciousness)-এর সহিত আন্তঃশূন্য পূর্ণজ্ঞানের একত্বানুভূতি লাভ করিবে, তৎপদার্থ বিমুক্ত করিয়া যখন জীব তাহা তৎপদার্থের সহিত মিলাইতে পারিবে, সেই অবস্থাতেই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধ হইবে। জীবের উক্ত অবস্থার জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই 'সোহং' 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'অহমাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা; নতুবা জীব জীব, এবং শিব শিব।

লেখকের মতে জীবের ইচ্ছার কোন মূল্য নাই। ইহা শাস্ত্র-সম্মত নয়। জীবকে যখন ঈশ্বরকে বিজ্ঞান, তখন জীবের ইচ্ছারও বিশেষ মূল্য আছে; নতুবা জীবের ব্রহ্মকে স্বরূপাবিভাব (evolution) মিথ্যা হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরের ত্রিশক্তি "স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া চ" সং, চিৎ, আনন্দ। জীবাত্মার ক্রিয়াজ্ঞানও ইচ্ছারূপে প্রতিভাত হয়—এবং এই ত্রিশক্তিই প্রকৃতির উপাধিতে প্রতিফলিত হইয়া জ্ঞান-শক্তি সত্ত্বরূপে, ক্রিয়া শক্তি রজরূপে, এবং ইচ্ছা-শক্তি তমরূপে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের দ্বার জীবাত্মারও এই ত্রিশক্তি স্বাভাবিক এবং উপাধির ত্রিগুণও স্বাভাবিক। সূত্রগঃ জীবের ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তির কখনও লোপ হয় না। এই শক্তিই জীবের ভবসমুদ্র পার হইবার একমাত্র সম্বল। ইহার বিশেষ মূল্য ও সার্থকতা আছে। গীতার ভগবান উপদেশ দিতেছেন, "উদ্ধবেদান্মনান্মনঃ নাত্মানমব-সাদয়েৎ। আত্মৈব জ্ঞাত্বেনো বদ্ধুরাত্মৈব বিপুণাত্মনঃ (৩।৫) জীবের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি না থাকিলে এই উপদেশ মিথ্যা হইয়া যায়। জীবের ইচ্ছার মূল্য না থাকিলে কণ্ঠবাদ থাকে না। ঈশ্বরে বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈদুর্ঘ্য (নিদ্রয়তা) দোষ আসিয়া পড়ে। বোদ্ধা-দর্শনে বাদরাগর বলিতেছেন—

"বৈষম্যনৈদুর্ঘ্যেণৈব সাপেক্ষত্বং, তথাপি দর্শয়তি—" ২।১৩৩

অর্থাৎ বিষম সৃষ্টি-সাহায্যাদি নিমিত্ত ব্রহ্মের বৈষম্য নৈদুর্ঘ্য প্রকাশিত হয় না। কারণ, ইহা জীবের কণ্ঠ-সাপেক্ষ। স্রুতি বলিতেছেন :—পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কণ্ঠগা ভবতি, পাপাঃ পাপেন কণ্ঠগা, সাধুক্যো সাধুভবতি পাপক্যো পাপী ভবতি (বৃ ৪ অ ৪ ব্রাঃ)। জগতে কোন বিশেষ সৃষ্টি (Special creation) নাই। কোন বিশেষ অম্লগ্রহের (Special favour) পাত্র কেহ হইতে পারে না। স্ব স্ব কৃতকর্মের অধীন সকলেই; সূত্রগঃ জীবের ইচ্ছারও বিশেষ মূল্য আছে। জীবের স্ব-স্বরূপাবিভাবের (evolution) সম্বন্ধে তাহার ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি এবং তাহার কৃত কর্মই একমাত্র কারণ।

একপক্ষে কণ্ঠসম্মান ও কণ্ঠযোগ সম্বন্ধে লেখক মহোদয়ের মতের আলোচনা করিব।

সংসারে জীব-সাধারণকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর জীব প্রবৃত্তি-মার্গে বিচরণ করিতেছেন। ইহার প্রকৃতি-কক্ষে অবতরণ করিয়া (descending into matter) ক্রমশঃ মম্বা-বোনি প্রাপ্ত হইবার পর ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সবেমাত্র সাংসারিক কর্মে প্রযুক্ত হইয়াছেন। ইহালাকের

কণ্ঠলব্ধ সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ ইহাদের কণ্ঠ-বহুল ও আদর্শ। প্রকৃতির সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে ইহাদের জ্ঞান সক্রিয় হইয়া, স্মৃতির ও স্মৃতিতম লোকের অবস্থা ও জ্ঞান সম্বন্ধে ই কোন অনুভূতি নাই। ইহার কণ্ঠসঙ্গী; অকালে প্রকৃত সময় হইবার পূর্বে ইহাদের বুদ্ধিভেদ ঘটাইয়া কণ্ঠত্যাগ-প্রবৃত্তি জ কর্তব্য নয়। তাই গীতা বলিতেছেন :—

"ন বুদ্ধিভেদে জনয়েদজ্ঞানং কণ্ঠসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন" ৩।২৬ পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর। কারণ, প্রবৃত্তিমূলক জগতের স্থিতির কারণ।

অপর শ্রেণীর জীব নিবৃত্তি-মার্গের অধিকারী। ইহাদের অল্প। সংসারের দ্বাভ-প্রতিদ্বাভের দ্বারা বিবেক-দর্শনভাস্ত্র একপক্ষে ইহার প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া অধিবাহনের (ascent into spirit by the path of return) আরম্ভ করিয়াছেন। প্রধানতঃ এই সকল পুণ্যাধ্যায়গণই গীতা অধিকারী। তাই আনি বেশান্ত তাঁহার Hints to the ৫ of Gita গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"All the instructions of Gita are for the ciousness on that path (of return). They useless and inappropriate, nay, harmful on the path of forthgoing." P. 63, 64.

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বলিতেছেন—অভ্যাসার্থোহপি যঃ লক্ষণো ধর্মো...বিহিতঃ স চ—ঈশ্বর্যপূর্ণব্যাক্ত্যন্তীর্ণমানন্তরস ভবতি ফলাভিসন্ধিবিক্তিতঃ শুদ্ধত জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিহা নিঃশ্রেয়সহৃতুতমপি প্রাপ্তপত্ততে" অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছালা পায়লৌকিক অভ্যাসের ভজ প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠান তাঁহারও যদি ফলাভিসন্ধি বজ্ঞন পূর্বক ঈশ্বর্যপূর্ণ বুদ্ধিতে কণ করেন, তবে কালে তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্ত জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারেন। আচা ইহাই মত। লেখক মহোদয় গীতার—

"সম্যাসঃ কণ্ঠযোগগণ নিঃশ্রেয়সকরাবুভে।

তয়োক্ত কণ্ঠসম্মানং কণ্ঠযোগো বিশিষ্যতে।" ৫।

এই শ্লোকটি তুলিয়া তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া লিখি "ভোগলালসার মধ্যে থাকিয়া ভগবানকে পাওয়ার সাধনই বর্তমান যুগের বিশ্বকবিও তাই বলিয়াছেন—"বৈরাগ্য-সাধনে সে আমার নয়।" "সর্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া সমস্ত আশা-আমুলে কঠোরভাবে করিয়া ভগবানকে পাওয়ার বাসনা ও মুক্তি ইচ্ছা কোন মতেই শ্রেয়ঃ নয়। সাম্য ভাবে থাকিয়া ইহা স্বর্গ মনে করিয়া পরব্রহ্মের শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্ব বিকাইয়া জীবনের সার্থকতা। ইহাই গীতার ধর্ম ও বাণী।"

হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার্য্যগণ অনধিকারীকে মোক্ষ-ধর্ম দিতেন না। কি কি গুণসম্পন্ন হইয়া বোদ্ধাবাক্য-শ্রবণে ও জন্মায়, তাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। ইহার ব্যভিচারে বুদ্ধি-বিশোধই ঘটয়া থাকে। লেখক মহোদয়ের মতে লালসা ত্যাগ করিয়া ভগবানকে পাইবার যদি কোন সাধন তাহা অতি নিকৃষ্ট সাধন। বৈরাগ্য-সাধনে যদি মুক্তি

উপায় থাকে থাকুক, তাহাতে লেখকের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, ইহা নিশ্চয় পথ। ইহলোকের সর্বপ্রকার মায়িক বন্ধনে জড়িত থাকিয়া, সর্বপ্রকার কামনার দাসত্ব করিয়া যদি ভগবানকে পাওয়ার বা মুক্তি-লাভের কোন উপায় থাকে ভালই নতুবা ভগবান ও মুক্তি দুই থাকুক; কামনার বন্ধনই শ্রেয়ঃ। লেখক মহোদয় পরব্রহ্মের যে ঐশ্বর্যপদের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সর্বত্র বিকসিৎ দিবেনই—ইহাই না কি তাঁহার মতে গীতার ধর্ম ও বাণী।

এই সকল উক্তির প্রতিবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তথাপি কিছু ভালোচনা করিব।

উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান ৪র্থ অধ্যায়ের শেষে “জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্মাণি ভ্রমসাং কুরুতে তথা” “ব্ৰহ্মস্বরূপত্বেরেব শ্রাদ্ধাত্মকং মনঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কর্মসম্মান্য যোগ এবং “হিঁস্রনঃ সশয়ঃ যোগমাত্তিত্ত্বোত্তিষ্ঠ ভারত” এই বাক্যের দ্বারা কর্ম-যোগের প্রশংসা করার স্বভাবতঃই অর্জুনের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, ভগবান কর্মসম্মান্য বা কর্মযোগ—কোন পথ অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। এ সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন যে, কর্ম-সম্মান্য এবং কর্মযোগ উভয়ই নিশ্চেষ্ট প্রাপ্তির হেতু; কিন্তু অর্জুনের ভ্রায় মন্দাধিকারীর পক্ষে কর্মযোগই প্রশস্ত। বোদান্তবন্তে আত্মতত্ত্ব পুরুষের পক্ষে কর্ম-যোগই প্রশস্ত, এ কথা উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই। অর্জুনের ভ্রায় বাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি দূর হয় নাই, বাঁহারা বজ্রবধাদির নিমিত্ত শোক ও মোহগ্রস্ত হইয়া আশ্রয়োচিত কর্তব্য করিতে পরাশ্রুত, এইরূপ ব্যক্তিগণকে দেহাত্মবিবেক-জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা তাঁহাদের সংশয় ছিন্ন করিতে উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে কর্মযোগ আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং অর্জুনের ভ্রায় বাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত কর্মসম্মান্য-যোগের অধিকার সম্পাদন হেতু কর্মযোগই প্রশস্ত, ইহাই উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে ভগবান এই কথাই পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন—

“সম্যাসক্ত মদ্যবাহো হুংমাপ্ত যোগগতঃ।

যোগযুক্তো মুনিব্রজ ন চিরেণাধিগচ্ছতি।”

হে মহাবাহো, অযোগগতঃ (কর্মযোগং বিনা) সম্যাস্ত প্রাপ্তঃ হুংমঃ (হুংমহেতু অশক্যমিত্যর্থঃ) (চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠার অসম্ভবঃ) যোগযুক্তস্ত মুনিঃ (সম্যাসী ভূত্বা) ন চিরেণ ব্রজ অধিগচ্ছতি (সাক্ষ্যং করোতি) (অতঃ চিত্তশুদ্ধে প্রাক্ কর্মযোগেব এষ সম্যাস্য বিশিষ্যতে ইতি সিদ্ধম্) ঐশ্বর্য স্বামিপাদ। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ মা করিয়া কর্মসম্মান্য-লাভের আশা হুরাশা মাত্র; ভগবান ইহা পরিষ্কার ভাবেই বলিতেছেন এবং এই জন্তই উক্ত শ্লোকে যে “কর্মযোগো বিশিষ্যতে” বলা হইয়াছে, তাহা অর্জুনের ভ্রায় মন্দাধিকারীর পক্ষে। উক্ত শ্লোকে ভগবান কর্ম-সম্মান্য যোগকে হ্রেয় এবং কর্মযোগকে উপদেশে বলেন নাই। বরং ৬ষ্ঠ শ্লোকে কর্মসম্মান্য যোগ যে উচ্চাধিকারীর পক্ষে আশ্রয়ণীয়, ইহাই বলিয়াছেন। কাম-সাধন ও লালসা-ভূতির লজ্জা বিষয়-ভোগ মুক্তির সোপান বলিয়া ভগবান কখনই বর্ণনা করেন নাই। সুতরাং লেখক মহোদয় উক্ত শ্লোকের যে অর্থ করিতেছেন, তাহা

নিতান্ত কদর্ঘ। ভোগ-লালসার মধ্যে বাঁহারা হাবুডুবু খাইতে ভালবাসেন, বৈরাগ্য বাঁহাদের ভীতি আনয়ন করে, সকল প্রকার মায়িক বন্ধন ছিন্ন করিতে বাঁহারা কাতর, ইহলোকই বাঁহাদের স্বর্গ, বাঁহারা কামময়, নিজ নিজ আশা ও ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই বাঁহাদের জীবন নিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাবাত হইলে বাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের অন্তিত্ব থাকিবে না, দেখা যাইতেছে, ভগবান তাঁহাদিগকে কোন আশ্বাসই দিতেছেন না।

দ্বিতীয় কথা কর্মযোগের স্বরূপ সম্বন্ধে। কর্মযোগ ভোগলাল-সার বিলাস নয়। বাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছেন, বাঁহারা লেখকের মতে ইহলোকেই স্বর্গ মনে করেন, তাঁহারা ইহলোক-সর্বত্র হইয়া তাঁহাদের কামনার তৃপ্তির লজ্জা কর্ম করিতে থাকুন; তাঁহাদের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাবাত করিতে কোন শাস্ত্রই উপদেশ দেয় নাই; ভগবানও সেরূপ উপদেশ দেন নাই। বরং তিনি তাঁহাদের বুদ্ধিতে জয়াইতে নিবেদ করিয়াছেন।

গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৭ম—১ম শ্লোক দেখুন। কর্মযোগীকে বিশুদ্ধাত্মা, বিশ্ভিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। তিনি সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-কর্ম করিয়াও মনে অজড়ত্ব করিবেন, “নৈব কিঞ্চিৎ কেরামি”। কর্মযোগী হইতে ইচ্ছা করার অর্থ প্রবৃত্তিমূলক কথত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ শক্তিরূপে ক্রিয়া-জ্ঞান-ইচ্ছারূপে জীবাত্মার বর্তমান আছে। এই শক্তিরূপের বিকাশ উচ্চ ও নিম্নগ্রাম-ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। জীবাত্মা যখন প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছেন, ইচ্ছা-শক্তি তখন কামরূপে, জ্ঞানশক্তি বৈজ্ঞান্যরূপে এবং ক্রিয়াশক্তি ভোগবস্তুর সাধনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পথে চলিতে চলিতে যখন জীবের সাংসারিক বাত-প্রতিঘাত-জর্জনিত বিরক্ত মন আর বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকিতে চায় না, তখন সে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া নিবৃত্তির পথে চলিতে আরম্ভ করে। তখন সাধনা-বলে তাহার কাম ভক্তিতে, বৈত ও বিভিন্নজ্ঞান অর্ঘ্যেত জ্ঞানে (সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবুযব্য-মীকতে” ১৮.২০) এবং ভোগসাধন জন্ম কর্ম যজ্ঞে পরিণত হয় (গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞাত্যচরতঃ কর্ম সমগ্র্য প্রবিলীয়তে”—৪।২০)। পুনরায় ভগবান কর্মযোগীর লক্ষণ বলিতেছেন “যস্ত সর্কে সমারম্ভাঃ; কামসঙ্কল্পবিক্টিতাঃ; ত্যক্তা কর্মকলাসস্ত নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ” ইহার মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াও “নৈব কিঞ্চিৎ কেরামি”। তবেই দেখা যাইতেছে, লেখক বাঁহাকে বলিতে চাহিতেছেন, “ভোগ-লালসার মধ্যে থাকিয়া কর্মসাধন—এরূপ কর্ম সর্বসাধারণে নিতাই অসম্ভব করিতেছে; কিন্তু তাহার অর্থ কর্মযোগ নয় এবং তাহা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়কও নয়।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, ভগবানই ত সমস্ত কর্ম করাইতেছেন; সুতরাং কামোপভোগ ভগবৎপ্রাপ্তির পরিপন্থী হইবে কেন? ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ভগবান বলিতেছেন—

“ন কর্তব্যং ন কৰ্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মকলাসযোগঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততে।

নাগন্তে কতচিৎ পাণ্ডা ন চৈব স্রুতং বিদুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃত্ত জ্ঞানং তেন মুহুর্ন্তি লজ্জমঃ।

গীতা ৫।১৪. ১৫

ভগবান কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছেন না। কর্তৃক-সংযোগও তাহার দ্বারা হয় না। সমস্ত কথই স্বভাবের অর্থাৎ প্রকৃতি এবং তাহার বিকারাত্মক জীবের উপাধি দ্বারা কৃত হইতেছে। ভগবান বা জীবের জ্ঞান (Light of the Logos ভগ্নঃ) কখনও জীবের বন্ধকারক প্রভুত্বের তেজ হইতে পারে না। জীবের পাপ বা পুণ্যের সঙ্গিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত জ্ঞান উপাধিকৃত অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত বলিয়া জীব মোহগ্রস্ত হয়। উপাধির সহিত তাদৃশ্যভাবে যাবৎ না ছিন্ন হইবে, তাবৎ কাল পর্যন্ত “বাহু-সংশ্লিষ্টশক্ত্য” হওয়া সম্ভব নয়। অর্জুন এই সামাযোগের উপায় ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন, “অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে”। যাবৎকাল বিষয়-সংশ্লিষ্ট জনিত চিত্তের বৃত্তি (Transformations) নিরোধ না হইবে, তাবৎকাল চিত্তের এই সামাভাব অর্থাৎ লব-বিক্ষেপ-শুদ্ধ অবস্থা আয়ত্ত হয় নাই! পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে চিত্তের এই অবস্থা সম্ভব। পাতঞ্জল-দর্শনও বলিতেছেন, “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাস তত্রিরোধঃ” চিত্তের এই লব-বিক্ষেপশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কর্মযোগের কাল। ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে তৎপরে কর্মসম্যাস যোগ অবলম্বন পূর্বক জ্ঞান-নিষ্ঠার সময় আসিবে।

সাধক রামপ্রসাদের “চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালোবাসি” এই পদের মর্ম বিখ্যাত কবি-কবিতায় ধ্বনিত হইতেছে। বৈষ্ণবগণও জগৎকে ভগবানের লীলাভূমি মনে করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে প্রাপ্তি অপেক্ষা জগতে পুনঃ পুনঃ আসিয়া ভগবানের লীলার সহকারিতা ও সেবা করিয়া রসরূপ শ্রীভগবানের লীলামৃত আশ্বাদ করা বহু ভাগ্য মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবকে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে প্রথমতঃ হুগ, হৃদয়, কারণ এই ত্রিবিধ জগৎকে ব্রহ্মময় দর্শনে অভ্যস্ত হইতে হইবে। প্রতি ঘটে, বিশ্বের প্রতি অণুতে এক ব্রহ্ম-সত্তা বিগাজ করিতেছে, এই প্রত্যক্ষানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত জগৎকে ব্রহ্মের প্রকৃত লীলাভূমি বলিয়া সত্যদর্শন লাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু উপায়ে এই অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহার বিবরণ ৪৯—৫০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সাধক বিগতপ্ৰসূহ ও সর্বত্র অনাসক্তচিত্ত হই অবলম্বন পূর্বক নৈকত্যা সিদ্ধি লাভ করিবেন। তৎপরে যুক্ত হইয়া শব্দাদি বিষয় ও রাগ-দেব পরিত্যাগ পূর্বক হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করত নিত্য ধ্যানযোগ অভ্যাস করি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব ও শাস্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হন। ব্রহ্মভূত হইলে

“ব্রহ্মভূতঃ প্রেসন্নাত্মা ন শোচতি ন কান্ধতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তস্তি লভতে পরাম্।

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানতি যাবানু বশ্যামি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞান্য বিপণতে তদনন্তরম্”।

গীতা ১৮।

ব্রহ্মভূত হইলে সাধকের সর্বত্র সমদর্শন হইবে। হইবার এই একমাত্র লক্ষণ। কারণ, এই বৈচিত্র্য-পূর্ণ জগৎ একমাত্র ব্রহ্মেই বিরাজমান। তিনি একমাত্র সত্য পদার্থ পবিত্রশ্রুমান ত্রিবিধ জগৎ মায়া-বিশৃঙ্খিত (illusion) মাত্র এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই পরাভক্তি লাভের সেই পরাভক্তির দ্বারা সাধক তখন তত্ত্বতঃ বৃত্তিতে পারেন, স্বরূপ কি, তখনই তিনি ভগবানের লীলামৃত পানের হন। তখনই চিনি খাওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধককে চিনি হইয়া চিনি খাইতে হইবে। ইহা মৌলিক জ্ঞান বলিয়া মনে হইলেও অতি সত্য কথা। বুঝদায়ক ট এই কথা উক্ত হইয়াছে

প্রক্কেব সনু ব্রহ্মাপ্যতি ৪।৪।৬

ব্রহ্মবিং ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মের প্রাপ্ত হন। তর্কে দ্বারা এই ক্রমা যায় না অথবা কাম সাধনা বা লালসার বিলাস। এই সাধনার কোন অঙ্গ নয়। গীতায় ভগবান মুক্তির কো জনক সহজ পথ (Royal road) আবিষ্কার করিয়াছেন যদি কাহারও ধারণা হইয়া থাকে, তবে সে-ধারণা ভ্রান্ত বলা কবি। এই সাধনার রহস্য অতি নিগূঢ়। ইহার বক্তা দুর্লভ।

প্রতীক্ষা

পরিপূর্ণ সাজি লয়ে, নিত্য বয়ে
আনি আমি পূজা-উপচার,
মুছিয়া পূজার ঘর, বেদী'পর
যতনে সাজাই ফুলহার।
ধূপ দীপ জালি দিয়া, মোর হিয়া
জাগে নিতি তব প্রতীক্ষায়,
ব্যর্থতার মানি বহি, নিত্য সহি
চিত্ত কাঁদে তোমার আশায়।
নৈবেদ্য-পালিকাখানি, রোজ আনি,
রাখি ধীরে সে বেদিকাতলে,
কি জানি, যদি বা এসে, অবশেষে,
আমাদের ছলিয়া যাও চলে!

শ্রীমতী বীণা বন্দ্যোপ

তব পূজা অমুঠানে, মোর প্রাণে
রাখিব না কভু কিছু বাকি
আমার আপন হিয়া, প্রেম দিয়া,
তোমা লাগি নিত্য ভরে রাখি
আপনি আসিয়া যবে, তুলি লবে
যত্নে গাথা মালিকা দুর্লভ
সেদিন আসিবে কবে, ধৃষ্ট হবে
প্রতীক্ষিত ধূপের সৌরভ
আমার এ পূজা-ঘর, অকাতর,
দিবা-নিশি আগুলিয়া থাকি—
আসিবে দেবতা মোর, ঘুমমোর
ঘুচাইবে—ঘুচাইবে আঁখি

সলিল সে দিন হাসপাতালে এসে আগে গেল মেরেরের ওয়ার্ডে। প্রথমে দেখানো শাওয়ার সঙ্গে দেখা। শান্তা বললো—“খানিক আগে অঙ্কুর তাদের বাড়ী থেকে নিয়ে গেছে। ডাক্তার মিত্র সার্টিফিকেট দিলেন।”

সলিল যেন নিজেকে একান্ত একা মনে করলো! এত বড় হাসপাতালে আর যেন কোন ‘চার্ম’ নেই, তারও যেন সব প্রয়োজন এক নিমেষে ফুরিয়ে গেছে। পর-মুহূর্তেই মনের এই ক্ষণিক দুর্ভলতা সবিয়ে ফেলে সহাস্ত্র বলে উঠলো—“বাকু, ভালোই হলো। এত দিনে এক-বকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কি বলেন? আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে গিয়ে পড়লেন, এবার তিনি বেশ তাড়াহুড়া দিয়ে উঠবেন। তার পক্ষেও এখন নিজের লোকেরই প্রয়োজন বেশী।”

ললিতাদের বাড়ী গিয়ে সর্বোজ্ঞ যা দেখলো, তাতে মনের সমস্ত আশা তার নিবে এলো! এবং বাইরে যাওয়ার জন্যও নিজেকে লজ্জিত বড় হলো না। অঙ্কুরকে আগে যে দেখেছে, আজ দেখলে চিন্তে তার কষ্ট হবে। চৈত্র মাসের শুক্লদশমী মতো স্নিগ্ধ হয়ে গেছে তার ভগবৎ দেহ, বিজ্ঞানের এক-পাশে নিজীব মতো পড়ে আছে! অতি সন্তপণে অঙ্কুরের কপালে নিজের ডান হাতখানি রেখে ধীর মুঠ-কণ্ঠে সর্বোজ্ঞ বললো—“সন্ধ্যা, তুমি তো আমাদের এলাহাবাদের ঠিকানা জানতে, তবে কেন খবর পাঠাওনি?”

অজ কত দিন পরে পুন্যো সন্ধ্যা-নামে অঙ্কুরকে এই সম্ভাষণ! অঙ্কুরের মনের পটে অর্দ্ধবিশ্রুত অতীত দিনের ছবিগুলো একে-একে ফুটে উঠতে লাগলো। হঠাৎ তার চমক ভাঙলো সর্বোজ্ঞের কথায়:—“কি হয়ে গেছে তুমি সন্ধ্যা! জানি, তোমার কোন কথাই আমাকে জানাতে চাও না। বোধ হয়, ভেবেছিলে, তোমার স্বস্থের খবরে আমার কি বা দরকার! না?”

অঙ্কুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল—“আমি তো কিছুই জানতে পারিনি,—অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম যে। যদি মরে যেতাম, আপনার পারের ধূলো পর্যন্ত আমার মাথায় পড়তো না। আপনার কাছে যে আমি কত ঋণী!—সর্বোজ্ঞের অলক্ষ্যে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

তার পর প্রত্যাহ কুশল-প্রশ্ন, নমস্কারের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সলিল ও অঙ্কুরের বহিষ্ঠতা অনেকটা জমে এলো। এরা হুঁটিতে পরস্পর বন্ধন আলাপ করে, তখন শান্তা ও রেণুর চোখে-চোখে কৌতুক খেলো যায়!

সলিল বলে অঙ্কুরকে—“আপনার মুখে যে আবার হাসি দেখবো, এ আমার কোন দিনই মনে হয়নি! এর জন্য ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিই।”

অঙ্কুর সলিলকে বলে:—“আপনি আমার জন্য কত কষ্ট করেছেন।”

বাধা দিয়ে সলিল বলে—“না, না। ও কথা আপনি বলবেন না। মানুষ যদি মানুষের অসুখে-বিষুখে না দেখবে, তাহলে তার কিসের মনুষ্য?”

অঙ্কুর কিন্তু তার মনের ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিশেষ ভীত

হলো। মনের মধ্যে অলক্ষ্যে কোথায় যে বিপ্লব বেধেছে তার, আজ তা টের পেলো। সলিলের সঙ্গে সে চায়, সলিলকে সে ভালোবাসে।

কিন্তু সত্যোজ্ঞ! না, না সত্যোজ্ঞ দেবতা, সে ভুল! তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারে সে, ভালোবাসতে পারে না।

সে দিন কলেজের ছুটির পর চোটেলে এসেই অঙ্কুর তার ক্লাব দেহ অঙ্গ ভাবে বিছানায় ছড়িয়ে দিল। ললিতাদিগের কাছে ক’দিন যায়নি, তাদের কোন খবরও পায়নি। ইচ্ছা করলে এখন অবশ্য যেতে পারে, কাল বেলা দশটার মধ্যে হাজির হলেই চলবে। কিন্তু তবু কি জানি, এসময়টুকু আর অপব্যয় করতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। কি আশা—কি একটা আকাঙ্ক্ষা তাকে উত্তলা করে তোলে! যারা তাকে ছুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত করে দিল, যারা তার জন্য অহেতুক কত কি করলো, তাদের উপর মনের এই অবস্থায় সে বড় লজ্জিত হলো।

বিছানা ছেড়ে অঙ্কুর উঠে পড়লো। পরে প্যাডাট টেনে এনে মৈত্রীদিকে একখানা চিঠি লিখলো—“আমি বাড়ী বাচ্ছি। কাল দশটার মধ্যে পৌঁছুবো। বিশেষ দরকার।”

চিঠিখানা একটা কভারের পুরে নাম-ঠিকানা লিখে শোয়াত চাপা দিয়ে রেখে বাথরুমে গেল। সেখান থেকে গা ধুয়ে এসে চুল বাঁধলো, তার পর পছন্দসই একখানা হাফা নীল রংয়ের শাড়ী পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বেশ করে দেখে নিয়ে জুতো পরে যেই বেকবে, অমনি সামনে দেখতে পেলো সলিলকে।

সহাস্ত্র সলিল জিজ্ঞেস করলো—“এই যে, সেজেগুজে বাচ্ছেন কোথায়? সত্যি, চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে।”

লজ্জায় অঙ্কুরের গাল হুঁটে গোলাপের মত লাল হয়ে উঠলো। নীচের দিকে চেয়ে সঙ্কপে উত্তর দিল—“বাড়ী।”

—“বিশেষ দরকার আছে?”

—“না, এমনি বাচ্ছি। অনেক দিন দিদির খবর পাইনি, তাই।”

—“তবে আর এক থাক, আজ দিন যাবেন—অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে! আমি গাড়ী এনেছি,—চলুন না খানিক বাইরে হাওয়া খাওয়া যাক। দেখুন, আপত্তি নেই তো?”

অঙ্কুর একটু ভেবে নিয়ে ঈষৎ কাঁপা গলায় বললো—“না, আপত্তি আর কি! চলুন।” একটু আগে সে যে-সংকল্প করেছিল, পর-মুহূর্তে তার আর কিছুই অবশিষ্ট হইলো না।

খোলা গাড়ীতে পাশাপাশি বসে দু’জনে—মন আনন্দে বিহবল। দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে সীমান্তীয় যাত্রার নেশার বিজের। দু’জনেই নিক্কাক। মন-প্রাণ তাদের কি এক অপকল্প ভাবের উদ্ভাসনার ভেসে গেছে, কে জানে!

অঙ্কুর নিজের অজ্ঞাতে এক-মনে সলিলকে দেখছিল। হঠাৎ অঙ্কুরকে লক্ষ্য করে সলিল বলে উঠলো—“কি দেখছেন? ভাবছেন একটা মিল্লির সঙ্গে বেরিয়ে কি স্বক্কারিই করছেন, না?”

অঙ্কুর ভীষণ অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে বললো—“না, না, আপনি বড় দেখছেন—তাই বলবো ভাবছি, এবার না হয় করা যাক।”

—“ও! তাই ভাবছেন? কিন্তু আমরা অনেক দূর এসেছি—কলকাতা ছাড়িয়ে।”

অঞ্জলি সত্যিই এবার মনে মনে একটু ভীত হলো—এতখানি স্নেহের তার ভালো হয়নি। মন শুকনো হলেও লোকতঃ এ অভ্যাস! জা' ছাড়া এর পরিণাম কোথায়, অঞ্জলি তা' জানে না। তাই সে ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলো—“আজ না হয় এই পর্যন্তই থাক, সলিল বন্ধ!”

সলিল যেন বুঝতে পারলো অঞ্জলির মনের ভাব! তাই অল্প একটু হেসে বললো—“কোন ভয় নেই আপনাব। ঠিক সাতটার মধ্যেই আপনাকে পৌঁছে দেবো। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো অঞ্জলি, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।”

শেষের দিকে “তুমি,” বিশেষ করে তার নাম ধরে’ সন্ধান—অঞ্জলির সারা মেহে এক অপূর্ণ পুলকের তরঙ্গ তুলে দিল! এ যে তার যুতুকিত স্নায়বের গোপন আকাঙ্ক্ষা! ঈবং কল্পিত কণ্ঠে অঞ্জলি বললো—“আপনাকে যদি বিশ্বাস না করবো, তা’ হলে আপনাব সঙ্গে আসবো কেন?”

গাড়ী থেকে নেমে তারা বসলো এক গাছের তলায়। চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ গাছের উপর থেকে কতকগুলো পাখী ডানা কাঁপাট করতে করতে উড়ে গেল। কাছেই বোধ হয় কোথাও কাঠমল্লিকার গাছ, ফুলের সৌরভ তা জানিয়ে দিল। অঞ্জলি কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চমকে উঠলো সলিলের মুহূর্ত্ত স্পর্শে। সলিল হীরে হীরে সরে এলো অঞ্জলির কাছে, তার পর অতি-সতর্কপণে পরিপূর্ণ আবেগ-ভরে অঞ্জলির একখান হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো—“আমায় তুমি ভয় করো না অঞ্জলি। তোমার কোন অসম্মান আমি করবো না। বলো তো তুমি, আমার মনের কথা কি তুমি কিছু জানো না?...জীবনের পথে আমার সাথী হবে তুমি?...”

অঞ্জলির বুকের মধ্যে যেন ঝড় উঠলো! এক নিম্ন! অতি কণ্ঠে নিজেকে সযত্ন করে শান্ত সহজ কণ্ঠে অঞ্জলি উত্তর দিল—“জানি, কিন্তু আপনি জানেন না,...আমি... শুধু অমঙ্গলকেই আমি জানি। আলো দেখলে আমার ভয় হয়, এখনি ও-আলোটুকু আমার স্পর্শে নিবে যাবে! তাই—”

বাশভারে অঞ্জলির কথা রুদ্ধ হলো—জলে হ’চোখ ঝাপসা—অঞ্জলি আনমনে অস্ত্র দিকে তাকিয়ে রইলো! সলিল অবিলম্বে অঞ্জলির পানে চেয়ে রইলো—অঞ্জলিকে আর কিছু বলতে পারলো না সে। বুকের মধ্যে পুলকের স্পর্শ! মনে হলো, যেটুকু অঞ্জলি বলেছে,—তার বেশী কথাই আর এখন প্রয়োজন নেই! এ কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে তার অন্তরের গোপন কথা।

৫

এর পর ছ’টি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেছে। সলিল সম্মানে পাশ করে বেরিয়ে এসেছে। সলিল ও অঞ্জলি দু’জনেই কত শ্রমের নীড় রচনা করে আর অনাগত স্বপ্ন ভবিষ্যতের কত ছবিই দু’জনে আঁকে। অঞ্জলি সময়ে সময়ে বলে,—“এত আশা, এত আনন্দ—যদি বিষাদে পরিণত হয়, তখন পারবে তো ভাগ্যের দ্বন্দ্ব দেখাতে?” সলিল হেসে বলে—“সে শক্তি তোমার কাছ থেকেই সঞ্চয় করছি, অঞ্জলি। তুমিই তো বলেছ, তোমরা শক্তির অঙ্গ!”

দু’জনে কত কথা হয়। অঞ্জলি তার অতীত কীকট অকপটে বলে যার সলিলকে, আর সে কত নিখাটে লালনার সমস্ত গ্রানি যে এক-মুহূর্ত্তে মুছে দিয়ে তার সাক্ষ্য স্মরণ-ভাণ্ডার খুলে দেয়, জীবনকুঞ্জে তার এনে দেছে কুণ্ড মাধুরী আর পাখীর গান, সেই নীরব পুরুষটির উদ্দেশে। অঞ্জলি প্রণাম করলো—সলিলের অন্তরও সেই অণু মাধুরীর উপর কৃতজ্ঞতার ভরে উঠলো।

হঠাৎ সংশয়ভরা মনে সলিল প্রশ্ন করলো অঞ্জলিকে অল্প, আমরা আবার তুল-পথে বাছি না তো? হবে সেই দেবতা, তিনি যদি তোমার উপর কোন আশা রাখেন অঞ্জলি ভীত হরিণীর মত চমকে উঠে বললো—“না—বলো না। তিনি দ্রাগকর্ত্তা—আমার নব জীবনে প্রভাবে তিনি দেবতা—তার স্থান বহু উর্দ্ধে। আমার মতো তিনি হয়তো দয়া করতে পারেন, কিন্তু—” কথা এ সাহস হলো না অঞ্জলির।

অঞ্জলির দিক চেয়ে সলিল বললো—“ভাবছি, তিঁরা হোন, আর মাধুর্যই হোন, যেটা সত্য, যেটা বাত্যা চলতে হবে বৈ কি?”

তুফানে পড়লে মাধুর্য যেমন আকুল প্রাণে আশা কুল পাই, তেমনি অসহায় ভাবে অঞ্জলি চাইলো সলি দিকে। অজ্ঞকণ্ঠ কণ্ঠে বললো—“আমার এত সাধের খেলা-ঘর একটা দম্কা বাতাসে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে, কবে সহ্য করবো?”

ললিতা সরোজের জঙ্ঘা িস্তিত হয়ে পড়লো, অল্প ভাবান্তরও তার সতর্ক লক্ষ্য এড়ায়নি।

এক দিন ললিতা সরোজকে বললো—“ঠাকুরপো, এ নি—আর কেন? বড় হয়েছে, পড়তে চয়, বিয়ের পরেই সরোজ বাণা দেয়।”—না, বউদি, ওকে জিজ্ঞাসা : তুমি জানো না, ও আমার কত ভক্তি করে। আমার ই অবশ্র ওর কোন আপত্তি হবে না—কারণ, ওর আশ্রয়, আমি। কিন্তু, যদি মনে কর, ও আমার ভালোবাসে ন বকমটি চাই, ওর মন যদি নিজে থেকে তাতে সায় না হলে? যে গাছ শুকিয়ে বাছিছিল, আমিই যাকে সজ্জা দি তাকে কোন্ প্রাণে আবার নিজের হাতেই ছিন্ন করবো তার চেয়ে আমি অপেক্ষা করবো—যদি কোন দিন ওর প্রতিদান পাই, ভালো, নাহলে এ-জীবনে আর কাকেও এ তাকে আর দুঃখের ভাগী করবো না।”

সে দিন খাওয়া-দাওয়ার পর একখানা বই আনতে ললিতা সরোজের ঘরে। কতকটা লক্ষ্যহীন ভাবে এ-বই ও-বই করতে করতে মার্কেল পাখরের মেঝের উপর ঝুপ করে পড়লো। তুলে দেখে—একটা অ্যালবাম, আর তার—ওটা কি? কার ছবি। সে মুহূর্ত্তে বস্তুপাত হলোও অতটা চমকে উঠতো না। শরীরের সমস্ত ধমনীর রক্ত গিয়ে জমেছে—আর সোখানকার প্রতিটি স্পন্দন সে শুক্বে

হাতখানা অঙ্গনীর তাঁর আলার বলে উঠলো। তখনো তার হাতে হাতবরা তরুণী অঙ্গলির কটো, নীচে লেখা—“সন্ধ্যা”। সলিলের মাথার কে যেন সজোরে আঘাত করলো—ভগবান এ কি করলে। বাক্যে কেন্দ্র করে নটকের এই অভিনয়, আজ সেই হয়ে লক্ষ্য। উজ্জল আলোর কটোখানা তুলে ধরলো—হী, সেট। তুল নয়। এ যে সলিলের কত বাস্তব। এখানে কি তুল হয়? কটোখানা উল্টে দেখে, আট বছর আগেকার তারিখ। ভালো হয়েছে বিলাসপুরে। চকিতে তার মনের উপর থেকে একখানা পর্দা সরে গেল, আর স্মৃতি মেলে ধরলো সেখানে অতীত দিনের এক অসমাপ্ত অধ্যায়। হী, ঠিক তাই। শিমিমার বাড়ী বিলাসপুর, তাঁর ভগিনীর নাম সন্ধ্যা। তার পর শিমিমার সেই চিঠি—সন্ধ্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না—একে একে সবই মনে পড়লো তার।

অঙ্গলিও তার কাছে কিছু লুকায়নি তবে। সে শুধু বলেছিল, বর্ডমানেব এক গ্রামে তাদের বাড়ী। সর্বোচ্চের নামের পরিবর্তে এক মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করেছিল, কিন্তু সেও তো কম বোঝারি করেনি। তার গ্রামের নাম, ভুললোকের কি নাম, কোথায় তিনি থাকেন। সে কেন জিজ্ঞাসা করেনি? অঙ্গলি সে-সব স্পষ্ট করে বলেনি। এ কি বড়মস্ত তাকে নিয়ে।

আগত অভিযানে কৃষ্ণ ব্যাঘ্রে মতো নিফল আক্রোশে সলিলের সমগ্র অন্তর জঙ্ঘবিত হয়ে উঠলো—শুধু চোখ দুটোতে কুটে উঠলো আত্ম-বর্ধাচার ভাবের কীপ্তি। সলিলের জীবনে সব চেয়ে বড় আঘাত এই প্রথম। বন-হরিণের মতো চল আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল মন। হৃদয়ের সঙ্গে কোলাকুলি আজও করেনি। অতি শৈশবে বাবা মারা যান—তার পর থেকেই সে মার স্নেহে, লালার অকৃত্রিম প্রগাঢ় প্রীতির আবেষ্টনীর মধ্যে সোহাগে আত্মকে বেড়ে উঠেছে। যে সুন্দরী পৃথিবী তার কাছে ছিল শুধু কলে কলে সুবহার ভরা, আজ এক যুদ্ধে তার মধ্যে দেখলো সে স্বার্থের ঘন, বিঘা ছায়া, অকৃত্তির হা হাকার।

ঘড়ির ঢাক শব্দে সলিল চমকে উঠলো। রাত এগারোটা। লালার আসবার সময় হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দোরটো সজোরে বন্ধ করে দিল, তার পর নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার লুটেরে পড়লো। সে যেন তার সব চেয়ে প্রিয়জনকে এতখানেক অশ্রুতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসেছে—সর্বস্বতার হুমকি বৃকে নিয়ে।

৬

—“তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে শেলি? শরীর ভালো আছে তো?”—সলিলের কপালে হাত রেখে মা তার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। সলিলের মন তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

সে বললে,—“না মা, কোন অসুখ হয়নি তো আমার। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তাই বোধ হয়, এরকম মনে হচ্ছে। যা তো ভজ্জা, এই খামখানা আগে পাঠ করে দিয়ে আর। আজই যেন যায়—থুব জরুরী চিঠি।” এই বলে ভজ্জার হাতে একখানা খামে মোড়া চিঠি দিয়ে সলিল মুখ-হাত বুঝে নিল। তার পর শরতের সোপালি রোদের মতো টলটলে এক-কাপ চা আর তার বোজকার বরাদ্দমতো খান-চারেক অমৃতি জিলিপি এনে মা হাজির করলেন। হুঁখানা জিলিপি খেয়েই সলিল বললো—“আর খাবো না মা, ভালো লাগছে না।”

মা হেসে বললেন—“এ যে দেখছি বেড়ালের মতো অলস তা’হলে সন্ধ্যা তোমার শরীর ভালো নেই শেলি।”—বলেই সলিল জন্ত খানিকটা উৎকণ্ঠিত হলেন।

সলিল লাইট পরে তাতাতাকি বেরিয়ে প্রথমই বতীশলা’র ম গেল। ললিতা তখন বায়ন ঠাকুরকে কুটনো কুটে জিজ্ঞাস, হ সামনে অমনো লোক দেখে সমস্তই উঠে পাঁজাভেই সলিল বললো “বৌদি, আমি সলিল, সর্বোচ্চের ভাই। বতীশলা কোথায়?”

বতীশ বাখরমে শেত করছিল, অমনো পলা গুনে বেরিয়ে এ —“হালো, সলিল ডাক্তার।” ললিতাকে লজ্জারনতমুখী এ বললো—“আবে, ও শেলি সাহেব। এ বিকে ঠিক বড় এ আগমন হয় না। তাই গৃহকর্তা লজ্জার জড়নড়ে। তার পর, মনে করে? এই কালী, একটা চোয়ার এনে দে—মালী অতিথি।”

ললিতা এতকণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,—“আ ঠাকুরশো, আমার আর সোম কি, বলুন? সেই কত দিন আ শুধু একবার দেখেছি।”

সলিল জোর করে মুখে হাসি টেনে বললো—“না বৌদি, এ আমারই, স্বীকার করছি।”

বতীশ সলিলকে বললো—“তুমি বসো, আমি বাকী কাজ সেজে আসি।” এই বলেই বতীশ বাখরমের দিকে চলে গেল।

ললিতার সঙ্গে সলিলের অনেক কথা হলো। একে একে। স্নেহের কথা, কটো, সবই বলে গেল সলিল। ললিতা কলস “হী তাই, মুখিল তো ঐখানে। সর্বোচ্চ ঠাকুরশো’র ক একান্ত জিব, সন্ধ্যাকে ছাড়া আর কাউকে সে ঘিরে কলসের অথচ সন্ধ্যাকে বলতে দেবে না—পাছে সন্ধ্যা কিছু মনে করে সন্ধ্যার এ দিকে কোন খোয়ালই নেই। বললে ও কিছুতেই অ করবে না—সেই জন্তই বেশি বিপদ।”

সলিল কৃষ্ণ নিখাসে সব শুনলো, তার পর বললো—“বৌ আমার মতে মেয়েটিকে আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত।”

—“বেশ তো, বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবে ওকে?”

—“অবস্তা আজ নয়। কাল একটু আভাস দেবেন, শু পদ দামাকে দিয়েও একবার বলাবেন।”

—“কিন্তু আপনার দাখা কি বাজি হবেন?”

—“আপনি একটু আভাস দিলেই বুকতে পারবেন। আর তা’ ছাড়া দামার হৃদয়ের জন্তও যেমন করে হোক ওর মনের কথা আমাদের জানতে হবে। নাহলে দামা যদি সন্দারী না হন তো বড় হৃদয়ের কথা।”

ললিতা খানিকক্ষণ মৌন হয়ে ভেবে নিল, তার পর কৃষ্ণ হয়ে বললো—“কিন্তু মনে করুন, অঙ্গলির যদি সত্যই মত না থাকে? এতো আর ওর গেলানো নয়।”

সলিল গভীর হয়ে বললো—“সন্ধ্যার সম্বন্ধে এ আপনার নিজস্ব স্নেহের পরিচয়।”

ললিতা বললো—“জানেন, আমি অনেক আগেই সর্বোচ্চ ঠাকুর-পোকে বলেছিলাম, অত দূর থেকে প্রাণের ভাষা অঙ্গলীরকে জানালে তো চলবে না, ওকেও জানবার অবকাশ দিন—সে শু আপনার দয়ার পাত্রী যা আজিতা নয়। এখন বুকতে পারছি

আমারই হয়েছে বিড়ম্বনা। ঠর কাছেরে, যে পরামর্শ নেবো, সে উপায় নেই। রোমাঞ্চে পড়লে কি করতে হয়, সে কথা ঠর ডায়েরীতে না কি লেখা নেই।”

কথা শুনে সলিল হাসলো, তার পর বললো—আপনাকেই এ ক্ষার নিতে হবে বৌদি।”

—“দেখি, কি করতে পারি। তবে অঞ্জলির মনের ধারা আজ-কাল যেন কেমন-কেমন মনে হয় আমার। সর্বদা আনুমনা—ভালো করে হাসে না, কথা বলে না—কি রকম যেন!” ললিতা উপাশ ভাবে বাইরের দিকে তাকালো।

—“আজকের মতো তাহলে উঠি বৌদি।”

—“না, না, সে কি কথা! কত দিন বাড়ে আসা, একটু মিষ্টি-মুখ করতে হবে বৈ কি।”

হাত জোড় করে সলিল বললো—“না বৌদি, আজকের মতো কমা করতে হবে। পেটে আমার এক কৌটা জলও গলবে না আজ।”

সলিলের চোখের দিকে চেয়ে বিম্মিত হলো ললিতা। দরদী কণ্ঠে বদলো—“তবে থাক ঠাকুরপো! আপনার কথা তুলবো না, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।”

ললিতাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সলিল দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চললো—যে দিকে হুঁচোখ যায়। আজ নিজের হাতে সে তার অমৃতের পথ রুদ্ধ করে দিল। মন-প্রাণ তার কি এক অব্যক্ত বেদনায় কেঁদে উঠে বললো—বন্ধু আমার, বিদায়! আজ আমার কিছু ফিলো না, শুধু তোমারই প্রেমের জয়-ঢাক। ললাটে এঁকে আমি চন্দ্রবো দুর্গম মরু-কান্ডার অতিক্রম করে।

৭

তার পর নিশ্চক্ষে সরোজকে আত্মসমর্পণ করলো অঞ্জলি। ললিতা সরোজের হাকে সব খুলে বললো, মাও সানন্দে অহুমতি দিলেন। দাহ বললেন—“শালা আগেই কল্লিণী-হরণ করে রেখেছিল।”

বিয়ে খুব ধুমধামেই হলো। শিসিমা তাঁর মেয়ে পাকুলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সন্ধ্যার উপর ব্যবহারের কথা মনে করে সভাই আজ বড় লজ্জিত, অসুস্থ হয়ে তিনি বললেন—“আমার ভাইপো যে আমার অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, সে জন্ত আমি আজ খুব খুশী! সন্ধ্যা আজ আমার রাজরাণী।”

পাকুল সন্ধ্যাকে দেখে ভজিত হয়ে গেছে। সে ভাবে, মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মতো এত বার সুখ-ঐশ্বর্য্য, সে কি তাদের সেই অনাদৃত্য অবহেলার পাজী সন্ধ্যা!

ফুলশয্যা ও বৌ-ভাত একই দিনে। কত লোক এলো, কত সেল—তার সীমা-সংখ্যা নেই। ললিতা আজ হৃদয়ের সঙ্গে সজিরেছে ‘সন্ধ্যাকে, যেখানে বা দিলে মানায়। ভালো একখানা লাইট-গ্রীণ রঙের বেনারসীতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। শাঙ্খা, রেণু, সুজাতা—আরও অনেক বন্ধু এসেছে। শাঙ্খা ও রেণু কিন্তু এ আনন্দে যোগ দিতে পারছে না মোটেই। তারা জানে, তাদের অঞ্জলি আজ সর্ববাস্তব হলো—প্রাণহীন দেহটাকে নিয়ে সমারোহের এ বিরাট আয়োজন কেন?

বাইরের লোকজন একে একে সব চলে গেছে। কেবল দাহ, কল্লিণী, ললিতা আর বা আছেন সন্ধ্যার কাছে। ললিতা হঠাৎ

বিম্মিত হয়ে বলে উঠলো—“দেখুন মাসিমা, সন্ধ্যার হাত পড়ছে নতুন গহনার খেঁব লেগে।”

এমন সময় সরোজ ঢুকলো ঘরে, সঙ্গে সলিল। সন্ধ্যা করে বসেছিল, কথার সুরে তার চমক ভাঙলো। সরোজ শুনছো মা, শেলি কি বলে।”

—“কি রে শেলি?” মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—“আমি পুনায় দরখাস্ত করেছিলাম মা, কা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। পনেরো তারিখে জয়েন করতে সন্ধ্যার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো। এ কি! এখনি হাটফেল করবে।

সলিল এসে দাঁড়ালো সন্ধ্যার কাছে। “দেখি, মুখ এই বলে” সে হুঁখানি বই তার হাতে দিল। একখানা “সন্ত একখানা “সাবিত্রী।” মা বললেন—“একখানা মহাভারত আরও ভালো করতিস শেলি।”

সলিল বুঝলো সন্ধ্যার বড় বঠ হচ্ছে। মাকে উদে বললো—“মা আমার ট্রেন একটায়, আর ঘণ্টাখানেক আমার বেরতে হবে।”

মা বললেন—“দিন-রাত্তির তোরা দৌরাছা আমার ভ না শেলি।”

—“না মা, সত্যি বণ্ড সহি করে দিয়েছি।”

—“কিন্তু কোন্‌ দুঃখে তুই নাম দিলি? কিসের অজ আর তোকে ছেড়ে আমিই বা কি করে থাকুবো বাবা?” সজল হয়ে উঠলো।

সরোজ বললো—“আমাকে জিজ্ঞাসা না করে ও দরখাস্ত করতে বললে? আমি যে এদিকে শোভাবা দেখে এসেছি, সামনের বিশ তারিখে পাকা দেখা, আর মধ্যে ওস্তাদি করে চাকুরি নিলে।”

দাহ পাখরের মতো নিশ্চল, মাঘের চোখে জল।

করলেন—“কবে তুই ফিরে আসবি?”

সলিল উত্তর করলো—“যেখানেই থাকি না কেন একবার করে অন্ততঃ তোমার শান্তির নীড়ে এসে জী করবো, তোমার কোলে এসে শোবো।”

মা বললেন—“তবে বিয়ে করে বা না কেন! অজ চমৎকার মেয়ে,—রূপে-গুণে এমন দেখা যায় না। ও হবে।”

সলিল বললো—“না মা, যদি ঐ উৎপাত করো, ত কোন দিন আমার দেখতে পাবে না। এই তো বৌ ও নিয়ে খুশী হও—এর মধ্যেই আমাদের পাবে। ও মাতুল নেহের কাঙাল। তোমার স্নেহে ওর সকল দুঃখ, সকল অবসান হয়। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, ঘরের টানে আমার ও চেষ্টা করো না।”

মার মন কিছুতে স্থির হয় না। জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা কোন ভয় নেই তো?”

সলিল মুহূর্তে বলে বললো—“হাজার হাজার লোক মা তাকে যদি কোন দিন হুখ না পেয়ে থাকে, তাহলে জীবনের জন্ত আর কতটুকু দুঃখ পাবে মা?”

মা নীরব। জামেন, তাঁর খেয়ালী ছেলোটিকে সংকল্পচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নয়। তবু একবার বললেন—“এখন বড় হয়েছিস, নিজেরে ভালো-মন্দ নিজেরাই বুঝিস। তবে একান্তই যদি বাস, আমাকেও সঙ্গে নে।”

সলিল উত্তর দিল—“সে তো নেবোই, তবে আরও কিছু দিন বাদে।” পরে সন্ধ্যার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—“ও

বেচারি এলো আমাদের বাড়ীতে, ওর সঙ্গার ওকে ভালো করে আগে বুঝিয়ে দাও, তার পর থাকবো তুমি আর আমি। এখন তবে আসি মা। ট্রেনের সময় হলো।”

সলিল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। কারো মুখে কথা নেই। নড়বার শক্তি নেই। সন্ধ্যাও নিম্চল পাখরের মতো বসে; চোখে তার এক কৌটা জলও অবশিষ্ট নেই!

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

১

বঙ্গদেশ কত কালের প্রাচীন এবং ঋগ্বেদে বা মহাভারতে ও অজ্ঞাত পুণ্যে বঙ্গদেশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কি না— আমরা এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না। মধ্যযুগে বৌদ্ধ-প্রভাব ও মুসলমান-প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র কি প্রকারে বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এ প্রবন্ধে তাহাই সাধারণ ভাবে আলোচিত হইবে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বহুমূল হওয়ার পূর্বে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, পাহাড়পুরেও হিন্দুগণের উপাস্ত দেবদেবীর যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বা সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তী নহে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পালরাজবংশের গোপাল প্রবল হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইবার চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে দ্বারবঙ্গ ও মিথিলাও পঞ্চগৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোপালের পর মহারাজ ধর্মপালের রাজ্যকালে পালরাজবংশের বিশেষ অভ্যুদয় হয়। পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। পালরাজগণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ না করিলেও তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের প্রচারে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই সময়ে বৌদ্ধ-প্রচারকগণ বঙ্গদেশের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্ত চেষ্টা করেন। এই সময়ে হিন্দুসমাজের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রশ্রেণীর বহু জাতির বহু ব্যক্তিই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে জায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে গেলে এ কথাও বলিতে হয় যে, পালরাজগণ হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন না। হিন্দুর দেবমন্দিরে ও পূজা-মহোৎসবেও তাঁহারা অর্থ-সম্পত্তি দান করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তবে বঙ্গদেশের কায়স্থ, গন্ধবণিক, সুবর্ণ-বণিক ও বৈজ্ঞগণের অনেকেই এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্মপালের জ্যৈষ্ঠ শাসক জায়পরায়ণ রাজার শাসনকালে বঙ্গদেশের সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও অভিসন্ধি অনুযায়ী ধর্ম গ্রহণ করিতেন। তথাপি রাজা বখন স্বয়ং বৌদ্ধ, তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই যে হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার সঙ্কুচিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এ কথা বঙ্গদেশের ঐ সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধর্মপালের পরবর্তী রাজা দেবপাল এবং তৎপরবর্তী রাজা প্রথম মহীপালের ও নবপালের সময়ে রাজ্যের শাসননীতি “এই ভাবেই পরিচালিত হইতেছিল। ফলে বঙ্গদেশের কায়স্থ, বণিক, বৈজ্ঞ-প্রমুখ সমস্ত জাতিই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিল। কেবল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটি প্রবল সম্প্রদায় তখনও হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর আচার-ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই।

বৌদ্ধগণ আচারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিধান না মানিলেও দায়াদিকার বা অজ্ঞাত ব্যবহার বিভাগে তাঁহাদিগকেও হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে চলিতে হইত এবং এই জন্মই তৎকালে দায়াদিকার বা ব্যবহার বিষয়ে বৌদ্ধগণের জন্ত কোনও স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। পরন্তু, তৎকালিক অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ পণ্ডিত চান্দুদাসের ব্যাকরণের ও ব্যাকরণের সূত্রের কারিকাপ্রণয়নের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঐ সময়ে বৌদ্ধ কায়স্থ ও বৈজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিরচিত অনেক আত্মকৃত ও কাব্যাদি গ্রন্থ বিজ্ঞান ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ-প্রভাব লোপ পাওয়ায় ও ব্রাহ্মণ ধর্মের অভ্যুদয় হওয়ার ঐ বৌদ্ধ-পণ্ডিতের রচিত গ্রন্থাদি লোপ পাইয়া

পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

শেষ ভাগে ১০৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ঐ সময়ে সুশাসনের অভাবে ও ঐ কৈবর্ত-বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু ছিলেন বলিয়া কোনও আত্মসভা ইংরেজরাজের রাজত্বে যে দেখিতে পাইতেছি, সে কালের বঙ্গদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্পর্কে অভাবই দেখিতে পাওয়া যাইত ক্ষেত্রে আমদানি করার কৌশল বঙ্গদেশের ও বিহারের হিন্দু, রামপালের রাজ্যপ্রাপ্তির সহায় পরাক্রান্ত ও নিহত করিয়া বঙ্গদেশে বৌদ্ধনির্মিলণে প্রজাপালন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহারাজ বৌদ্ধ-বিহারে অর্থ-সম্পত্তি দান কা গোড়া বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকাল সূরীর্ণ ও শান্তিপূর্ণ না হই হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে এক ধর্ম বহিঃশ্রমণ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ উভয়েই তাঁহাদের প্রাপ্ত হইতেন। ফলতঃ, ঐ সময়ের বঙ্গ-বাসীরা হিন্দুর অবলম্বনীয় হিন্দুধর্মের শাখা হইত।

বঙ্গদেশে রামপালের রাজত্বকালেই

বঙ্গদেশের সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে হিন্দুধর্মের পক্ষেই হিন্দুধর্মের অত্যন্ত পরিচরিত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বঙ্গদেশের নেতৃস্থানীয় ধর্মশাস্ত্রকাবগণের মধ্যে বালক, জিকন, ধনঞ্জয় ও শ্রীকরের নাম বিশেষ ভাবে পরিচরিত হয়। বোম্ব হয়, তৎকালে বর্তমান কালের দ্বায় শ্রুতি-নিবন্ধ না থাকিলেও পশ্চিমা-প্রদেশের কোনও অভাব কোনও দিনই অনুভূত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন-প্রমুখ শ্রুতি-নিবন্ধকারগণ তাঁহাদের সংগ্রহ-গ্রন্থে প্রাচীন শ্রুতিকার হিসাবে বালক, জিকন, ধনঞ্জয় ও শ্রীকরের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই সময়ে মৌর্যসাম্রাজ্যের অভাব ছিল না, এবং বৈদিক কথ্যকাণ্ডের যে বিশেষ প্রভাব ছিল, গুণবিহীন ছানোগো-পরিশিষ্ট ভাবো ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালরাজাদের রাজত্বের অবসানে যখন সেনরাজগণ বঙ্গদেশের রাজা হইলেন, তখন বাঙ্গালা দেশের সমাজে একটি অপূর্ণ পরিবর্তন দেখা গিল। সনাতন হিন্দুধর্মের মহান সত্য বাতাদের দ্বারা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা এমন ভাবে দেশের বহুশাস্ত্র ও সমাজ-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন যে, বিরোধ বা বিপ্লবের কোনও নিদারণ অভিযুক্তি ব্যতীত বঙ্গদেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, হিন্দুর বৈদিক ও তাত্ত্বিক সাধনা সমস্ত বৌদ্ধসমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। পতি ও কালেশ্বর পশ্চিমা-প্রদেশ ও বাহা কগিতে পারে নাই, ভবনব অভূতপূর্ব মনোবা তাহাই করিতে সমর্থ হইল। তিনি নব ভাবে

পশ্চিম হিন্দুসমাজের মধ্যে বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বস্তু মধ্যমা-সন। কিন্তু ইহাতে বঙ্গদেশের র ধারণ করিল। বঙ্গদেশে ও শূদ্র মাত্র এই দুইটি প্রধান গ। কায়স্থ, বৈষ্ণব, বালিক ও বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধ না করিলেও উপরীত ভাগ হইলেন, কিন্তু ইহারা মাত্র বিধি বৈদিক সত্যের তাঁহাদের কায় তাঁহারা বৈদিক সাধনার অভিনব শূদ্র—বৈদ, পুরাণে বা বঙ্গদেশ সেই অভিনব শূদ্রের অধিকারী এবং প্রশিক্ষিত করাইবার অধিকারী, যজুর্বেদ সহিত ইহাদের উন্নত চরিত্রের ও হইল না বলিয়া পরাশর স্ববি ও হারিদকে গজুর আখ্যায় অভিহিত তাঁহাদের গৌরোহিত্যের জন্য বৌদ্ধ-পূর্ণ মধ্যমা পান নাই, সেই সকল বর্ণ-গা দেশের এই অভিনব সমাজ-ব্যবহার হারাজ বাল্যসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট প্রচলিত প্রকাশ করিলেন। সমাজের গণ্যগণ চারভে অক্ষর রাখিবার জন্য পুণ্ডরী বাল্য

এই প্রচার করিলেন। ইহার পরে আভির্ভূত হইল মুবন্ধর মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। মহারাজার বা রাজার দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত না হইয়াও বিবেচনা করিয়া যে আধাবিশিষ্ট তত্ত্ব এই প্রচার করি ফল সমগ্র বঙ্গের হিন্দুসমাজ বিজাতীয় ও বিশ্বাসের সা-আসিয়া আভি ও উন্নত শীর্ষে জগতের সমুখে গুণাবলী। মহাশয় রঘুনন্দন বঙ্গদেশের সমাজের উপর যে ভ-বিতার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই তাঁহার আশ্রয়ি অপূর্ণ ফল। তিনি যদি এই সময়ে বঙ্গদেশে আবিষ্ক-তবে অগণপতিত বাঙ্গালা দেশের যে কত দূর অগণপ-কল্পনা করিতেও ভয় হয়। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব যে দান ও তাহার মূল্যবান কার্যপণ দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-বিবিক সমাজ ও দেশকালপাত্রোচিত করি শ্রান্ততত্ত্ব তিনি মনুজ শ্রান্তকার্যে নিমন্ত্রণযোগ্য র শাস্ত্রোক্ত মণ্ডমর ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্র ও স-বক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই তাঁহার অপূর্ণ প্রতি-নিত্য-নৈমিত্তিক সদাচার রক্ষার জন্য আকিততত্ত্ব ও । প্রচলিত যে ব্যবস্থা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা ও প্রতিভার ও অসামান্য দেশভক্তির পরিচায়ক। ও তাঁহার কথ্যের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় প্রদানে কৃতার্থ হইবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালার সমাজ-ব্যবহার কথা বলিতে গেলে আরও উল্লেখ না করিলে চলে না। প্রথম, মহারাজ বলা কৌলীত ব্যবস্থা ও দেবীর কর্তৃক প্রবর্তিত মেলবন্ধন। হউক, নব্যজাতের প্রতিষ্ঠা-ভূমি বঙ্গদেশের পুঙ্গবান-ছিলেন, এ কথা কোনও দিন কেহই বলিতে পারিবেন। কৌলীত প্রথার ও মেলবন্ধন প্রথার অনেক দোষ : করিয়াছে; কিন্তু যখন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, ও প্রথা হিন্দু সমাজের কল্যাণ-বিধান করিয়াছিল সমাজকে অচিরে স্বেচ্ছা-পতিত হইবার আশঙ্ক করিয়াছিল। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা দেখাইবার বঙ্গদেশের পূর্বক ব্রাহ্মণ ও কার্যগণের সজিত কতে ও কার্যের মিলন সম্বন্ধেও আমরা এ প্রবন্ধে কো-করিলাম না।

বিধাতার আশীর্বাদ ব্যতীত কোনও জাতিই পারে না। আজ যুরোপীয় সভ্যতার অগ্রগণ্য-মোরে প্রবল নিশ্চেষ্টে জাতির যেকদও ভয় হইয়া ও কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এই বিশদ অনিবার্য্য বরি শীর্ষকে বঙ্গদেশে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের, শ্রীমন্ত-ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ও তাত্ত্বিক কুলচূড়ামণি ব-বাগীশের আবির্ভাব এক শতাব্দীর মধ্যেই ঘটিয়া আবির্ভাবের ও জীবনব্যাপী সাধনার ফলে ব-চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছিল—বাঙ্গালার যে অনাবিল পবিত্র প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছিল, বাঙ্গা-গণের তাহা বাঙ্গালী জাতিতে হুঁসাইরা দিবার স

কীভাবে, ঠিকভাবে জীবনযাপন সাধনার বাস্তবতার ক্ষেত্রে, বাস্তবতার জরাজীর্ণ, বাস্তবতার ক্ষেত্রে ধর্ম বাস্তবতার পূর্ণতায়, বাস্তবতার আকাশে ও বাস্তবতার বিভিন্ন জাতির ও উপজাতির আচারে, ব্যবহারে ও সমাজ-ব্যবহারে যে ইতিহাসের উপাদান

সুত্রায়িত হয়। আছে—আত্মনিবেদিত প্রাণে ভক্তিবিগলি চিত্তে সমস্তসম্পন্ন বিচারশক্তির নির্দেশে তাহার উচ্চাঙ্গ-সা করিতে হইবে।

[কমলা]

প্রত্যাহত

প্রীতমলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম, এ, বি, টি

বিচ্ছেদ হইয়া গেল! স্নানোপরিহিত চরণে হুঁচট খাইলে যেমন নৃত্যঙ্গুরির চামড়াবোঁটা আসল অবলম্বন অর্থাৎ সোল হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, বিমান-আক্রমণের ভয়ে যেকের সঙ্গে একাত্ম ভাবে বিভক্তিত উৎকল পাচকের সঙ্গে যেমন সকলের ছাড়াছাড়ি হয়, অথবা বরোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপূর্বেই স্বাধার খুলির সঙ্গে কুক্ষিত কোষের সম্পর্ক যেমন ঘূরিয়া যায়, চরিত সেইরূপই বিচ্ছেদ হইল—ইতি আর অশেষের মধ্যে!

কিন্তু এ-বিচ্ছেদ কেন হইল?

প্রেমটা পুরানো হইয়া গিয়াছিল? না, কোন ভয় ভয়িরাছিল? না প্রাণবন্ত কোন কথার অভাব ঘটিয়াছিল? জানা যায় নাই! শেষে অশেষের সেই সিঁড়িয়ার মত নাকওয়াল বন্ধু ভয়দেব আসিয়া জানাইল যে, ইতির সরকারী চাকুরে পিতা বন্দী হইয়াছেন।

চরিত অশেষের সঙ্গে দু'-এক দিন ইতির কথা-কাটাকাটি বা ঐ জাতীয় কিছু ঘটন, কারণ, ব্রীজের আড্ডার অশেষকে মাঝে মাঝে অনমনস্ক দেখিতাম। তার ফলে পাটনার যে হইত, সে ভাবিত কোন অজানিত পানের প্রারম্ভিত হইতেছে।

এই আত্ম বিচ্ছেদের সংবাদটা সে দিন ভগ্নদূত জয়দেবই আসিয়া আমাদের জানাইয়া দিল। কাজেই খেলায় অশেষের আকর্ষণ 'regularly irregular' দেখিয়া তাহাকে আমরা কমা করিলাম।

দুই বৎসরে উভয়ের মধ্যে পরিচয় গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। বাগলক ও নাবালাকাদের দ্বারা চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে, জয়দেবের সহযোগে দু'জনের নানা বিষয়ে আলাপও হইয়াছে; পরিশেষে পরস্পর বিবাহিত হইতে না পারিলে লোকে ভূবিয়া য়া, অন্ততঃ পক্ষে মাটির চড়িয়া উঠাও হইয়া যাওয়ার বন্ধোবন্ধ পাকা—এমন সময় ইতির বাবা প্রায় সব-কিছুর ইতি করিয়া বন্দীর আদেশ পাইলেন।

বিচ্ছেদের আনুসঙ্গিক কান্নাকাটি, প্রতিজ্ঞার বিভিনন ও প্রতিদিন চিঠি দিয়া খোঁজ করিবার প্রতিজ্ঞাও উভয় পক্ষে হইয়া গেল! 'অল্পপূর্ণা উত্তরিলো গালিনীর তীরে'...শব্দ ছিল। চিঠিগুলি দ্ব্যর্থবাক্যক হইবে, হঠাৎ কেহ না ধরিয়া ফেলে। দু'দিন ধরিয়া তাহারা মক্শো হইল।

তার পর কোন অবস্থিত মুহূর্তে অশেষ রহিয়া গেল কলিকাতার এক ইতির বাবা গেলেন দু'য়ে কোন্ সহরে ছেলেমেয়ে, বাজ-প্যাটার, হ-হাঙ্গামাসহ।

দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেছে। অশেষ বিধ-বিভিন্নভাবে কলার (কলীর নচে) বাটার : ককমা এক যামার

ভোরে চাকরী পাইয়া কলিকাতা ছাড়িয়াছে। ইতির বাবা ইহার ক আবার বন্দী হইয়াছেন।

প্রথম প্রথম ডাক-শিয়ন পানের বাড়ীতে চিঠি দিয়া লেখ-ই ট করিলেই অশেষের হার্টের গতি কেমন কেন ধামিয়া বাইত! যি আসিত। প্রত্যুত্তরে অশেষ প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করাইয়া দিত ক্রমে সপ্তাহে একবার, তার পর মাসে একবার—এই ভাবে চিঠি সংখ্যা কমিয়া আসিল। কিছু কালের মধ্যেই লেকের জলে ডুবির মত অজিনবন্ধ নাই বা সুবিধামত মোটর পাওয়া যায় না, এবং অর্থাৎ যে কারণেই হউক, ক্রমপরিবর্তনশীল কাল সব প্রজ্ঞা ভাঙ্গিয়া দিল।

অশেষ সংসারী হইয়াছে। বিশেষ নরক হইতে সবেমাত্র এ বৎসর হইল ত্রাণ পাইয়াছে। বন্দীর চাকরী—নানা জায়গার ঘুরি হয়। মাসে বাব-দুই সিনেমা না দেখিলে তার চলে না। ফি দ্রীকে লইয়া একসঙ্গে বসিয়া দেখা—সাছেবিদ্যনা বলিয়া তার কের গা-ছম্ছম করে।

চাকরীস্থলে কোন্ এক সিনেমা-হলে ছবি দেখিতেছে। দোস্তলা দ্বী বিশাশা আর আতুরে ছেলে।

ঘটনার পর ঘটনা তাক লাগাইতেছে। মাতার নৃত্য-বৃত্তে বিশেষ প্রত্যাগত ছেলের উচ্ছ্বাস দু' মিনিট মাত্র চলিয়াছে, অভিনয় দর্শকবৃন্দ অন্তরে এবং কেহ কেহ বাহিরেই কাঁদিয়া আকুল, এবং সময় দোস্তলা হইতে ছেলের ক্রন্দন। আর যায় কোথা? 'বাড়ীতে বেধে আসতে পারেন না'? 'বাইয়ে নিয়ে যান', 'নুন দিয়েইত্যাদি ভঙ্গ-অভয় চাঁৎকার সিনেমা-শর্কার প্রাণ হইতে হলের শেষ-ভাগের অর্ধেক অধিকৃত দর্শকবৃন্দের কণ্ঠে ককত হইয় উঠিল।

অশেষের আর সঙ্গ হইল না। একমাত্র ছেলের বিষয় লইয় তাহার মাতাকে এই অবাচিত উপদেশ আর টিটকারী। দু'দিন সে বাহিরে আসিল।

ঘেরে-গেটের ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "তপরে যে ছেলো কাঁদছে, তার মাকে গিয়ে বলো, খোঁকাকে নিয়ে নেমে আসবে বাবু ডাকছেন।"

ছেলে কোলে করিয়া মা নামিয়া আসিল।

"এ কি! অশেবলা! তুমি? চিনতে পারছ না? আমি ইতি ...উনি নীচে বসে আছেন...আলাপ হয়নি বুঝি? এটি আশা ছেলে...বা হরত...ও! এসো না এক-দিন...এক দিন কেন, আক সিনেমার পরে আমাদের বাড়ীতে। আচ্ছা থাক, আচ্ছা আর এ রাজে গিয়ে কাজ নেই, কিন্তু এক দিন এসো...উনি এখানে চাকরী পেয়ে এসেছেন।" টিকানা বলিয়া দিল।

শেষে “পরের স্ত্রীকে এমন ভাবে ডাকতে নেই...বুঝলেন?”
বলিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া গেল।

সে দিন অকসি হইতে কিরিয়া বসিয়া আছি। চাকর আসিয়া
চা করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া একখানা চিঠি দিল। পরিচিত
অক্ষর।

“ভাই হিমুদা

...সে দিন সিনেমায় হঠাৎ ইতির সঙ্গে দেখা! ইতরের
মত ভেঙচে গেল, খোঁজও করল না, আমি কি করি, কোথায়

থাকি। নিজের একরাশ পরিচয় দিয়ে পদার আকর্ষণে
গেল।

ভালবাসার অর্থ কিছু বোঝে না, এমন মেয়ের সংখ্যা দিন
বাড়ছে না কি?...

প্রত্যারিত অশেষ

বুঝিলাম, অশেষ আর ইতির সিনেমা দেখার গল্প সিঁড়াড়া
জয়দেব ইতিপূর্বে যা জানাইয়াছিল, তার সঙ্গে অশেষের ১
বেশ মিল আছে।

দিল্লীর পারোয়ারী সুলতান খুসরো খাঁ

ত্রিনারায়ণ চক্রবর্তী

বে সকল ব্যক্তি অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে
আরোহণ করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের নাম অঙ্কিত করিয়া
গিয়াছেন, খুসরো খাঁ পারোয়ারী তাহারিগের অন্ততম। তাঁহার
কাহিনীতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। খুসরো খাঁ ১৩২০ খৃষ্টাব্দে
বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া আসিয়া
দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীতির
সমুচিত জ্ঞানের অভাব-বশতঃ দুর্ব্বলের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া
লইয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়ন
একবার ম্যাটারনিকের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, “তিনি ষড়যন্ত্রকে
রাজনীতি মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।” খুসরো খাঁয়ের সম্বন্ধে
এ কথা আরও ভালো করিয়া বলা চলে। প্রকৃত পক্ষে মধ্যযুগের
ভারতে রাজ্য অধিকার করা তত কষ্টসাধ্য ছিল না, যত কঠিন ছিল
অধিকৃত রাজ্য নিজের আয়ত্তাধীনে রাখা। কৌশল, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস-
ঘাতকতা, হত্যা প্রভৃতি তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে অপরিভাভাবে
বিজড়িত ছিল এবং খুসরো খাঁয়ের ক্ষমতা-লাভের কাহিনীতে আমরা
এই সব প্রক্রিয়া দেখিতে পাই।

এই কাহিনীর একটা দিক্ বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।
সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাসিকগণ খুসরো খাঁয়ের কার্যকলাপের
নিশ্চা করিয়া অতিশয় মর্ম্মবেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন;
সত্য ও মিথ্যা প্রয়োগ তাঁহাকে সর্বপ্রকার দোষে অভিযুক্ত করা
হইয়াছে। খুসরো খাঁ যে হীনজন্ম ছিলেন, কেহই তাহা অস্বীকার
করিবে না, কিন্তু সাধারণের চক্ষে হের প্রতিপন্ন করিবার জন্ত
কোন ব্যক্তির জন্ম-বৃত্তান্তের প্রতি কটাক্ষপাত করা শরীয়তের
আইনে অন্তর্য। তিনি যে কতকগুলি পাপকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন,
কেহই তাহা অবিশিত নয়, কিন্তু যেহেতু পশ্চিম ও নিষ্ঠুর ভাবে
ঐতিহাসিকগণ তাঁহার বিস্ময়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সঠিক
কারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়, যখন দেখা যায়, আলাউদ্দিন
খিলজির অকৃতজ্ঞতা এবং কুতুবুদ্দিন মুবারকের লজ্জাজানি উচ্ছৃঙ্খলতা
ও মূর্থতা এই সব ঐতিহাসিককে এতটুকু বিচলিত, দ্বন্দ্ব করে নাই।

খুসরো খাঁ ছিলেন গুজরাটী। আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্ব-কালে
সমর অবসারের সময়ে তিনি মুসলমান-হস্তে পতিত হইয়া

ও প্রকৃত ক্ষমতাশালী ওমরাহ কর্তৃক প্রতাপালিত
বারানী তাঁহাকে ‘বারাও বাচ্চা’ বলিয়াছেন। ‘বারাও’
অর্থ বাড়দার। কিন্নকেড এবং প্যাগাসিনিস এই অর্থ
করিয়া তাঁহাকে মেঘর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ‘পারে
শব্দের অভিধানগত অর্থ বুঝায়, যাহারা ভিত্তিগাত্তরীন গু
করে। স্তত্রাং তাহার যে অস্পৃক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ
ফেরিস্তা-অনুবাদক ব্রিগ্‌স্‌এর মতে ‘পারোয়ারী’ অর্থ বুঝায়
হিন্দু; যে সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ করে এবং এত অসপবিত্র
গণ্য হয় যে, নগরের মধ্যে তাহাকে বাসগৃহ নির্মাণ
দেওয়া হয় না। ‘পারোয়ার’ শব্দটিকে কোন কোন ঐতি
‘পরমার’ পাঠ করিয়াছেন। ‘পর-মার’ অর্থ পক্ষীহস্ত বুঝায়
এই উপজীবিকা পূজোক্ত উপজীবিকা হইতে উৎকৃষ্টতর নয়।

দিল্লীর সুলতানদের রাজত্ব কালীন রাজনীতিক পরি
পথ্যালোচনা করিলে ধুমকেতুর মত খুসরো খাঁয়ের অভ্যুদয়ের
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ১২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের প্রধান শা
পরিগণিত হইয়া অগোঁঠবে ১২১০ খৃষ্টাব্দে দাসবংশের
এবং রাজত্বও ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ প্রবীণ যোদ্ধা মালিক ফি
হস্তগত হয়। মালিক ফিরোজ ইতিহাসে সুলতান জাল
খিলজি নামে পরিচিত। মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া
সুলতান তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতৃপুত্র কর্তৃক অতি দুঃখ
নিহত হন। খুল্লাত-বংশের সমস্ত চির পৃথিবী হইতে চি
জন্ত লুপ্ত করিয়া আলাউদ্দিন খিলজি স্মৃদু হস্তে রাজত্ব
করেন। তাঁহার ভ্রাতৃ যোগা সৈন্যধ্যক্ষ ও তেজস্বী সুলতান
ইতিহাসে বিরল। রাজত্বের শেষভাগে এই “লৌহ ও
মাছুঘটির স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে তাঁহার স্ত্রী ও পরিণত-বয়স্ক
যখন তাঁহার অসুস্থতার সম্বন্ধে নিতান্ত অনমনোযোগ
এবং তাঁহাকে বঞ্চিত অবহেলা করেন, সুলতানকে তখন বাধ
একমাত্র হিঁটহী বন্ধু হিসাবে মালিক কাফুরের উপর সম্পূ
রাখিতে হইল। নিজের পরিবারবর্গের প্রতি সুলতান
হইতেই বিরক্তি ছিল; এখন এই সুযোগে গুজরাটী মালিক
সেই বিরক্তিতে ইচ্ছন যোগাইতে লাগিলেন। যুবু সুলতান

খিজির খাঁ, শাদী খাঁ এবং মুবারক খাঁকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। সুলতান সুলতান দেহত্যাগ করিলে মালিক কাফুর পাঁচ বৎসর বয়স্কা হাবুদ্দিন ওমরের নামে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। খিজির খাঁ এবং শাদী খাঁকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। মালিক কাফুরের প্রকৃতি অতি ক্রুর এবং ব্যবহার খুব নীচ ছিল। সেই জন্ত মুবারকের কান অনিষ্ট করিবার পূর্বেই তিনি স্বয়ং প্রাসাদের কণ্ঠচারিগণ কর্তৃক নিহত হন। মালিক কাফুরের মৃত্যুর পরে মুবারক সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

এই মুবারক শাহের রাজত্ব-কালেই খুসরো খাঁ অতি শীঘ্র উচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। গুজরাট প্রদেশ এই সময়ে নূতন সম্রাটকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল এবং সে জন্ত সাম্রাজ্যে তখন এমন লোকের প্রয়োজন ছিল, যে সেই প্রদেশের রাজনীতিক এবং স্থানীয় পরিস্থিতির বিষয়ে সম্যক্ জানে। প্রথমে আলি উলমুখ সুলতানী সেখানকার উৎপাত-দমনে প্রেরিত হইলেন। তার পর গেলেন সুলতানের স্বস্তর জাফর খাঁ। খুসরো খাঁয়ের মাতামহবংশীয় লাম্বাদী হিমাযুদ্দিন জাফর খাঁয়ের বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করে। ফলে জাফর খাঁকে ফিরাইয়া আনিয়া অপমানিত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অন্তঃপরি হিমাযুদ্দিন গুজরাটে প্রেরিত হইলে খুসরো খাঁ দিল্লীতে তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। মালিক কাফুর ও মালিক শাদীর সময়কার অশিক্ষিত সৈন্তগণ তাঁহার অধীনে আসিল এবং তিনি রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই খুসরো খাঁকে মালাবার অভিমানে প্রধান সেনাপতিরূপে প্রেরণ করা হয়। সেখানে যুদ্ধ-জয়ের মধ্যে মালাবারে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনার বাসনা তাঁহার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে, আলাউদ্দিন খিলজির সময়কার প্রবীণ বোদ্ধার খুসরো খাঁয়ের অধীনে কাজ করা অপমানজনক মনে করিয়া তাঁহার পতনের উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা কাহিনী রচনা করিয়া সম্রাটের গোচরীভূত করে। মালিক তালে শা, মালিক তৈমুর ও মালিক গুল আফগানের প্রেরিত সংবাদে খুসরো খাঁকে ফিরাইয়া আনা হয়; কিন্তু সম্রাট-সমক্ষে নিজেই নিদোষ প্রাপ্তি প্রমাণ করিতে সমর্থ হওয়ার ঘটনা বিপরীত আকার ধারণ করে এবং আবেদনকারীরা সকলের সম্মুখে লালিত হয়।

যাহারা খুসরো খাঁয়ের উচ্চ ক্ষমতা-লাভে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন স্পষ্ট বুঝিল যে, সম্রাটের নিকটে তাঁহার প্রিয়পাত্রের বিরুদ্ধে সত্য অথবা মিথ্যা সংবাদ জানানোই তাহাদের নিজেদেরই ক্ষতির আশঙ্কা অধিক। কয়েক জন ওমরাহ সুলতানের চরিত্রভীর্ণতা ও অবিশ্বাস্যকারিতার জন্ত মনে মনে বিদ্রোহ ভাব গোপন করিত। এখন বেছায় তাহারা খুসরো খাঁয়ের পক্ষ লইল। কারণ, তাহারা আশা করিয়াছিল যে, অন্যথা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া খুসরো খাঁ এক দিন সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। সুলতান এই সময়ে লাম্বাদী ও বহু পাপকার্যে জবাবে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিত্য-সহচর ছিলেন খুসরো খাঁ। তিনি স্বযোগ পাইয়া নিজের আত্মীয়-বৃদ্ধদের মধ্য হইতে সৈন্ত সংগ্রহ

করিবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। সুলতান সানন্দে অমুমতি দিলেন।

অন্তঃপরি খুসরো খাঁ সুলতান-সমীপে নিবেদন করিলেন যে, রাজ্যদেশে তাঁহাকে অধিক রাষ্ট্র পৃষ্ঠপুত্র প্রাসাদে অবস্থান করিতে হয়, কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের হস্তে তিনি প্রাণের আশঙ্কা করেন; সুলতান তিনি প্রাসাদে প্রবেশের সময় তাঁহার সৈন্তগণকে প্রাসাদের সিংহ-দরজা পৃষ্ঠপুত্র আনিবার প্রয়োজনীয়তা অজ্ঞেয় করেন। কারণ, তাহা হইলে কিরিবার পথে তাহারা তাঁহার শরীর-রক্ষি-রূপে সঙ্গে থাকিতে পারে; এখন ইহা সুলতানের অমুমতি-সাপেক্ষ। সুলতান ইহাতে দোষের কিছু দেখিতে না পাইয়া তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত দিলেন।

খুসরো খাঁয়ের বড়শা এখন নির্দম ও নির্দয়রূপে প্রকাশ পাইল। সুলতানের এক শিক্ষক কাজি জিয়াউদ্দিন ওরফে কাজি খাঁ 'ভেলিক-এ-দ্যার' অর্থাৎ প্রাসাদের দ্বার-রক্ষক ছিলেন। তিনি বড়শাকারীর গোপন পরামর্শের কথা সুলতানকে জানানইলেন। কিন্তু মূর্খ মুবারক প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা না করিয়া খুসরো খাঁয়ের নিকটে কাজি-দণ্ড সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিলেন। চক্রান্তকারী খুসরোর চোখে জল দেখা দিল এবং সুলতানের নিকটে সান্ত্বনা পাইয়া সাক্ষর নয়নে তিনি নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার ধারণা, সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্ত তাঁহাকে এক দিন বধাভূমিতে প্রাণ হারাইতে হইবে। তাঁহার সৌভাগ্যে ইচ্ছাদের ভ্রাস, অথচ ইহাদিগকে তিনি নিজের প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মনে করেন! প্রিয়পাত্রের প্রতি সুলতানের বিশ্বাস অটুট রহিয়া গেল। কিন্তু খুসরো খাঁ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আর কালবিলম্ব করা সমীচীন হইবে না। যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা বিধাহীন দৃঢ়তার সহিত অচিরে সম্পন্ন করা প্রয়োজন, নহিলে নিজের বিপদ।

এই ঘটনার পরের রাতে সুলতানের প্রাসাদে এক চূড়ান্ত নৃশংসতার অভিনয় হইল। পারোয়ারিগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কাজি খাঁকে হত্যা করিল; তার পর করিল প্রাসাদ-রক্ষকদিগকে পরাভূত করিয়া সুলতানের বাসগৃহে প্রবেশ। সুলতান পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু খুসরো খাঁ চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া রাখেন, যতক্ষণ না পারোয়ারীরা আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করে। রাজ-পরিবারের পুরুষদিগকে হত্যা এবং রমণীগণকে পারোয়ারীদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। সুলতান-বংশের কাহাকেও জীবিত রাখা হয় নাই।

এ-কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না যে, এই কাহিনী স্বপ্ন-বিদ্যারক হইলেও মধ্য-ভারতের ইতিহাসে নূতন নয়। খুসরো খাঁয়ের অকৃতজ্ঞতা সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির অকৃতজ্ঞতার চেয়ে অধিকতর হীন ছিল না; তাঁহার নৈতিক চরিত্র সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারকের নৈতিক চরিত্র অপেক্ষা অপকৃষ্ট ছিল, একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মধ্য-যুগের ভারত পতিত রাজবংশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং এরূপ পাণে খুসরো খাঁ একাই পাপী নন। খুসরো খাঁয়ের পক্ষে রাজকীয় ক্ষমতা লাভ করা মোটেই কঠিন হইল না। কারণ,

যে সমস্ত ওমরাহ ইহাতে বাধা দিতে পারিত, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত, অথবা প্রচুর উপহারে চূর্ণ করাইয়া দেওয়া হইল।

চারি মাস স্থায়ী খুসরো খাঁয়ের রাজত্ব-কাল পাণাছটানের ইতিহাস। অপবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি হিন্দু রাজত্বের পুনরুদ্ধার ও ইসলামের পরিবর্তে হিন্দুধর্ম স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বারানী বলেন, ইসলামকে যুগের চক্ষে দেখা হইত, গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল এবং মসজিদে কোরাণের উপরে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল; মুসলমানদিগকে তাহাদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল এবং রাজ্যের উচ্চ পদগুলি কেবল হিন্দুরাই পাইত। 'অপবিত্র পারোয়ারী' গুজরাট হইতে বহু পারোয়ারী আনিয়া নিজের চতুর্পার্শ্বে সন্নিবেশিত এবং কিঞ্চিৎ দূরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। এক দিকে তিনি যেমন ওমরাহদিগকে ধনদৌলত বিতরণ করিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমন হিন্দুজাতিকে স্বপক্ষে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে উচ্চ পদাদিও দিয়াছিলেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ পারোয়ারী সুলতানের পাপ-কার্যের সূচী বিবরণ দিয়াছেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার কার্য অগৌরবের কারণ হইলেও তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানগণের কার্যের সহিত একশ্রেণীভুক্ত। তবে তাঁহার একটা দোষ ক্ষমার অব্যোগ! সে-দোষ—তিনি ভারতবাসী ছিলেন! তুর্কীর পন্থাশালী ব্যক্তিবর্গকে তিনি বুদ্ধিমত্তায় পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, স্বীয় অভ্যুত্থানের জন্য বিবেকহীন হইতে তিনি তাহাদের মত বিধা বোধ করেন না! যদ্ব্যবসায় তাঁহার তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না; এবং ক্ষমতা-লাভের প্রতিযোগিতায় তিনি তাহাদিগের সকলের চেয়ে বড় ছিলেন। এক জন ভারতীয়ের পক্ষ হইয়া থাকিবার অপমানে তাহাদের তুর্কী-রক্ত উচ্চ হইয়া উঠিল এবং এই ক্রোধ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টায় তাহাদের হস্তে যত প্রকার অন্ত ছিল, তাহা প্রয়োগ এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, কি করিয়া তাহাদের স্বজাতীয়দিগকে উত্তেজিত করা যায়। তাহারা তাহাদের হীন জন্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। যদিও জানিতেন যে, ইহা আরবের পরগণবের প্রচারিত সাম্য

ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিরোধী। তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ যে, তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাম-লাব জাগরিত করিব মুসলমান রমণীদের সত্যিকার নাশ করিয়াছেন! দেবল অপমানের কাহিনীর কোন ভিত্তি নাই। ইহা তাহাদের প্রসূত। কারণ, আমীর খুসরো বলেন যে, কুতুবুদ্দিনের স্বীয় পতি খিজির খাঁয়ের সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু হয়। অপবিত্র করা, অথবা সে স্থানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার কথা দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। হিন্দুধর্মে খুসরো খাঁ দোষিত হইবার কথা নিতান্ত অস্বাভাবিক। খুসরো খাঁ অজ্ঞাত ছিল না যে, হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত হইলে তাহাকে অস্পৃশ্য হইয়া থাকিতে হইবে। বহু চেষ্টা করিয়াও খু: তাহাদিগকে বশে আনিতে পারেন নাই, কারণ, ভারতীয় ও তীয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য আছে, এ পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

কাহিনীর শেষাংশ অতি সংক্ষেপ। দিল্লীর যে স ওমরাহ খুসরো খাঁয়ের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তা মধ্যে তিনি ফকরুদ্দিন জোনা খাঁয়ের (পরে যিনি সুলতা তুগলক নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন) দি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। খুসরো খাঁ শত্রুগণের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেন! কারণ, তাঁহার পি মালিক ছিলেন এক জন প্রবীণ যোদ্ধা এবং তাঁহার অর্থ সাম্রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্য-দল। মুহম্মদ তুগলক কিছু দি তাঁহার অধীনস্থ থাকিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে খাঁ ক্রমে অসাবধান হন। এই সুযোগে মুহম্মদ তুগলক পিতার সহিত যোগ দিলেন। প্রায় সকলেই পারোয়ারী অসন্তুষ্ট, এ কথা জানিতে পানিয়া গাজী মালিক ঠে দিল্লীতে আসিলেন এবং ১৩২০ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন শাহের অন্ত হইল। খুসরোর পতন কুতুবুদ্দিন খুসরো পতনের মত নয়, কারণ, তিনি বীরের মত তাঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সৈন্যগণকে অগ্রিম ছয় মাসের বেতন গ্রহণের হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে জন-মত ছিল যে, সেই স্রোতে তাঁহার সৈন্যদল ভাসিয়া গেল এবং যি ও নিহত হইলেন।

বাইশ বছর

শ্রীনীলাপদ ভা

বাইশ বছরে যে লতিকাটিরে ধরিয়াছিলাম বুকে,
ঝড়ে উড়ে গেল চৈকাত্তে পারিনি তাহা;
তিরিশ বছরে সেই স্থিতি আজও বারে বারে পড়ে মনে,
তারই দাগ বুকে আজও মিলাল না আঁহা!

আজও তার পরে এত দিন ধরে কত ঝড় এল গেল,
পৃথিবী ঘুরিল হঠাৎ চারি ধারে;
দিন গেল আর রাত হল শেষে দিনে দিনে মাস গেল,
বরষে বরষ ঘুরে এল বারে বারে।

কত যে লতিকা জড়ানে ধরিল ছিঁড়ে গেল তার
সব কথা আর রাখিতে পারি
বাইশ বছরে তবু যে লতাটি বুকে ছুঁইয়াছিল,
আজও তার স্থিতি আগে ওঠে কত

চাচা—চাচা...চাচাজী...ও হালদার চাচাজী।

বুদ্ধ ছুতার হরিচরণ হালদার নিজের তৈয়ারি এক খুড়ি খড়ম মাথায় লইয়া হন্-হন্ করিয়া হাটে চলিয়াছে। বর্ষা জন্ত হাটে বাহির হইতে দেরী হইয়াছে...আবার পিছন হইতে ডাকে কে?

চার ডাকের পর হরিচরণ পীড়াইল। পীড়াইয়া দেখে, পাঁচু সন্দাঁর মণ দুই ওজনের চালের বস্তা কাঁধে লইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। সে ডাকিতেছিল।

কাছে আসিয়া পাঁচু বলিল—কাল আমার মেয়ের বিয়ে চাচা, ...জিয়াবৎ দিতে আপনার বাড়ী গিয়ে শুনুন আপনি হাটে বেরিয়ে গেছে।

এক-মুখ হাসিয়া হরিচরণ বলিল—সোনার বিয়ে? কোথায় যে?

পাঁচু উত্তর দিল—গোসাইচরের ওমার মোড়লের মেজ ছালের সঙ্গে।

শুনিয়া হরিচরণ একটু শিহরিয়া উঠিল।

দেখিয়া পাঁচু বলিল—চাচার কি জ্ঞার লেগেছে?...তা লাগতে পারে। বর্ষা তো ছাড়াইছে না।

তাহার পর আপন-মনেই বলিতে লাগিল—আমি মণ খাসির গোস্তু জোগাড় হবে না চালগুলো বেচে? আর আছে গোটা দশেক টাকা...তাতে রূপার পৈচ হব কেমন কোরে?...আপনি তা জামিন হয়ে কিনে দাও চাচাজী। কাপড় কেনা আর হোলো না...তাতেও কোন কুড়ি টাকা না লাগতো।

হাটে পৌঁছিতে যে অল্পটুকু পথ বাকি ছিল, হরিচরণ মৌন হইয়া চলিল। হাটে মাথার খুড়িটা নামাইয়া সে বলিল—দ্যাখ, চাল বেচেই আমার কাছে আসিস...তা ও ক'টাকার কাপড়ের জন্তেও ঘোষাল মাড়োয়ারীর দোকানে আমি জামিন হবে...সোনা দিগির বিয়ে।

স্বস্তির নিশ্বাসের সঙ্গে পাঁচুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আজ্ঞা পাক!

স্বখ-দুঃখের কোনো উত্তেজনা হইলেই পাঁচুর মুখ দিয়া একথা বাহির হয়।

রাত্রে ঘরে ফিরিয়াই হরিচরণ গ্রামের সব হিন্দুর কাছে খবর পাঠাইল। দশ ঘর মালো, আট ঘর ছুতার, কামারদের পাঁচ ঘর, নাপিত এক ঘর...মায় বাড়িলদের আখড়াতেও লোক গেল। রাত্রেই পরামর্শ করিতে হইবে। সবই বদলাইয়া গিয়াছে... আরও যে কি হয়, কে জানে? গ্রামের এই উনিশ ঘর মুসলমান ভাইদের সঙ্গে কতই-না সদ্ভাব ছিল! কিন্তু এসব হইল কি? হালদারদের পাওনা টাকা তারা সবাই ডুবাইয়া দিতে বসিয়াছে। কেবল সন্দাঁররা এখনো ঠিক আছে। তার মূল পাঁচু। আর গ্রামে যে এত দিন পাকিস্থানের বক্তৃতা দিতে কেহ আসিতে সাহস করে নাই, তার মূলও পাঁচু। পাঁচু করিত ধর্ম-ভয়...আর লোকে করিত পাঁচুর লাঠির ভয়। সেই পাঁচু এবার চালে পড়িল। সেই গোসাইচরের মোল্লাদেরই চালে পড়িল...তাদের বাড়ীতেই মেয়ের বিবাহ দিতে চলিয়াছে! তারা সব গ্রামে গিয়াছে...শুধু এই গ্রামে আসে নাই পাঁচুর ভয়ে। কিন্তু এখন তাদের কথিবে কে?

হালদারদের কাঠের কারখানায় রাত্রি তিন প্রহর পর্যন্ত গ্রামের হিন্দুরা হুচিন্তায় মাথা ঘামাইতেছে। বুদ্ধের দল হতশ হইয়া পড়িয়াছে। যুবকল হরিচরণের সঙ্গে নিবিষ্ট হইয়া কি পরামর্শ

করিতেছে। কেবল বাড়িলরা তুরিতানন্দে উচ্চরবে বীর অবস্থায় জয় দিয়া কলিকার পর কলিকা চালনা করিতেছে।

পরের দিন। বেলা প্রায় বারোটা। দূরে শুনা বাইতেছে আজ্ঞা'ল্লা ধনি। হরিচরণের কাঠের কারখানায় সকলেরই হাত যেন বন্ধ হইয়া গেল। হরিচরণ বলিল—কি...তোমাদের সব হলো কি! আমি এই বাহান্তর বছরের বড়ো...আমার তো বুক একটুও টলবে না! হরিচরণ গরুর গাড়ীর চাকা গড়িতেছিল। সত্যিই সমান তালে তার হাতুড়ির শব্দ শুনা বাইতেছে—ঠকঠক।

দেখা গেল, হরিচরণের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাঁচু তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। বলিতে বলিতে যাইতেছে—চাচাজী, আপনার তরে খাজা-মুড়কি আর কাঁচা দুধ দিয়ে গেঁধু...আমাদের বাড়ীর জিয়াবৎ আর কি দিঘু?

হরিচরণ বাটালি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল—তবে তাই ঠিক পাঁচু।

পাঁচু শুধু বলিল—আইজ্ঞা পাক!

হরিচরণ মুখ তুলিয়া চাহিল। চাচা-ভাজতের মধ্যে কি কথা হইল, অস্ত্র কিছু বুঝিতে পারিল না। হরিচরণ যেন অপরাজিতের বিগলিত হইয়া পাঁচুর দিকে চাহিয়া আছে। চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ণ যুবক...নিটোল দেহ...শাস্ত্র স্বভাব।...তার বগলে লাড়ে তিন হাত লম্বা পাকা বাণের লাঠিটা সর্বদাই আছে। হরিচরণের কাঠের কারখানায় সে এক জন ভালো গড়নদার...গরুর গাড়ীর এক জোড়া চাকা সে দু'দিনে তৈয়ারী করিতে পারে!

নিকটে শুনা গেল, বৃহৎ জনতার আজ্ঞা'ল্লা রব। এইবার গোসাইচর হইতে পাঁচুর বাড়ীতে বরযাত্রীর দল আসিয়া পৌঁছিল।

পাঁচুর মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তুরিভোজনের পর মজলিশ বসিয়াছে। সে-মজলিশে খানিকটা মুকরিয়ানা ভাবে গোসাইচরের মৌলভি ছাড়াই বলিল—এই মহরমের দিন এখানে আমার মজলিস কোরবেন, আপনারা প্রতিজ্ঞা নিলেন তো?

স্বদৃঢ় কণ্ঠে পাঁচু জবাব দিল—না, না। বার-বার বলছি, ছ'মাস না গেলে আমার মজলিস হবে না। তার একটা প্রধান কারণ, আপনারদের খাতির করার সাধ্য নেই আমার ছ'মাস না গেলে।... মজলিস হবে চৈত্র মাসের শেষে ফাতেহাইয়াজে...আমি আপনারদের ডেকে নিয়ে আসবো।

মৌলভি বলিল—এতটা গোস্তাকি!...আমার কথার জবাব?

মৌলভির ইঙ্গিতে বরযাত্রীর দল তড়িৎবেগে উঠিয়া পড়িল। পাত্র তার টাটু ষোড়ায় চড়িয়া বসিল। মেরেকে লইয়া ডুলিতে চড়ানো হইল। একটা সেলাম পর্যন্ত বিনিময় হইল না।

যাইতে যাইতে ভল্লী করিয়া মৌলভি বলিল—তবে ছ'মাস পরে ফতেহাইয়াজের সময় মেরেকে আনতে যাবেন...হিঃ হিঃ হিঃ।

পাঁচুর অন্দর হইতে চাপা গলায় ক্রী-কণ্ঠের কান্নার স্রব ভাসিয়া আসিল—বয়ের মেরে ছ'মাস কেমন কোরে থাকবে গো!

একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পাঁচু বলিল—আইজ্ঞা পাক! বলিয়া সে কান্টিকের ভিত্তি মাটিতে এত জোরে তার হাতের লাঠি ঠুকিল যে, সেটা আশ হাত বসিয়া গেল!

ইহার পর সাত দিনও যায় নাই। হালদারদের বাড়ীর দক্ষিণে পতিত ডাঙাটা সাফ করা হইয়াছে। ভূতের ডাঙা বলিয়া কত কাহ্ন হইতে ইহা পড়িয়া আছে, কে জানে? শেরালকাটা, শ্রাওড়া, বিছুটি

আরো কত সব অখ্যাত গাওঁের ঘন জঙ্গলে ভরা এ জায়গাটার দেশের বুনা শূয়াররা আড্ডা জমাইয়াছিল। প্রথম যেদিন আখড়া খোলা হইল, সে দিন পাঁচু বলিল—হরিচরণকে ঠিক বলেছো আপনি চাচাজী, আমি একলা...তাই সন্ধ্যা কোরতেই হবে হুঁমাস। হুঁমাস পরে এরা পঁড়াবে আমার পাশে।...তখন এ-গ্রামে মাখা নাড়া দিতে আসে এমন মর্দানাকে খোদা পয়দা করেনি।...ভাই সব, হুঁমাস পরে তোমাদের লাঠির জোর এমন হবে যে আমার তোমরা রুখবে। আপসোব, আমার জাত-ভাইদের তিন-চার জন ছাড়া কেউ তোমাদের দলে এলো না! না আশ্রুক। কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক তোমাদের তারিফ কোরতে আসবার পথ পাৰে না এক দিন।...কবে, জানো? যেদিন হুঁমাস পরে গৌসাইচরের মোড়লরা এসে তোমাদের সেলাম দেবে, সেই দিন।

হরিচরণ বলিল—সে তোমার হাত-বশ।

পাঁচু বলিল—আপনি তো সবই জানো...বাইশ বছর বয়সে আমার হরিরামপুর রাজবাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায় আপনাদেরই কারখানা থেকে। সেখানেও আমার পকাশ জনের বেশি ছিলাম না। আজ তো এখানেও প্রায় পকাশ জন আছে। পশ্চিমা পালোয়ান আমাদের সেখানে কসরৎ শেখাতো। হুঁমাস না যেতেই আমাদের দাঙ্গা কোরতে লাগিয়ে দিলে। দশ মাইল বিশ মাইল দূরে চর-দখল...বিল-দখল...পরের জিনিষ দখল আর মারপিট। যেন আমরা ভাড়াটে গুণ্ডা!...কাজে বেঁধা হলো।...সেই যে লেঠেলি ছেড়েছি, আজও আর সে কাজে বাইনি।...তবু মনে হয়, বিশ বছর আগে যা শিখেছি, তুলে বাইনি সব...তোমাদের কিছু শেখাতে পারবো।

ফতেহাইয়াজ্জাহম আসিল। সেদিন সকালেই তার বাড়ীতে মজলিশের জেরাকৎ দিতে পাঁচু গৌসাইচরে গেল।

পাঁচুর সঙ্গে আসিতেছে তার মেয়ে-জামাই, বেয়াইয়ের ছেলেরা, গৌসাইচরের মুসলমান সমাজের কয়েক জন লোক। মৌলভি-ছায়েব যেন বিজয়গর্বে আগে আগে চলিয়াছেন লাঠি হাতে সুবক দলকে লইয়া...নিশান উড়াইয়া...কাড়া-নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে। মোক্কে মাঝে আক্কা'ল্লা ধ্বনি হইতেছে।

গ্রামের ভিতর খানিকটা চুকিয়া মৌলভি-ছায়েব রুঢ় স্বরে বলিল—কৈ, আমাদের খাতির-পছান করবার কোনো বন্দোবস্তই তো নেই! বাটারকু গ্রামের লোকগুলো সবই কি বেতজমিজ?

একটা চিড়ুব শুনা গেল...সঙ্গে সঙ্গে তাদের খিঁচি একটা লাঠিঘালোর দল।...বিশ-বাইশ হাত দূর হইতে এল লাঠিতে ভর দিয়া লাফাইয়া আসিয়া পড়িল সম্মুখে। পাঁচু দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—ওস্তাদ কুহুম?

সেলাম দিয়া পাঁচু কি যেন ইঙ্গিত করিল। ছোকর লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইয়া তার দলের মধ্যে গিয়া পড়ি মৌলভি জিজ্ঞাসা করিল—এরা?

পাঁচু বলিল—গত হুঁমাস থেকে আমার সাক্ষর।! ছাড়া সবাই হিন্দু—এই গ্রামের ছেলে।

জুজুটি করিয়া মৌলভি বলিল—মতলব কি এদের?

পাঁচু জবাব দিল—আপনাদের খাতির-পছান কোরো এরা সব গ্রামের মান রাখতে জোট বেঁধেছে—আর যেন গ্রামের বিয়ের মেয়েকে হুঁমাস আটকে রাখতে না পারে দেখবে। গ্রামের মধ্যে কোনো কলি কজিয়া আসতে দে তার জঙ্গ জান কবুল কবেছে।

পিছন হইতে হরিচরণ আসিয়া বলিল—কৈ পাঁচু, শু সোনা দিদি কৈ? নিয়ে এসো সবাইকে ঘরে।

পাঁচুর বেয়াইয়ের বড় ছেলে দবীকদ্দীন কলজের ছু আসিয়াছে। তার ভাইয়ের বিবাহের সময় সে দেশে ব ভাইয়ের খণ্ডর-বাড়ীতে সে এই প্রথম আসিল। সে জিজ্ঞাসা ইনি কে?

পাঁচু বলিল—ইনি চাচাজী...হরিচরণ হালদার...গ্রা মুকরী।

দবীকদ্দীন বলিল—ছেলাম হালদার মশাই...ছব ছাহেব।...হিম্বৎ না থাকলে মিল হয় না! জান কবুল! মান থাকে না! আপনাদের মতো লোক যেখানে আ হিন্দু-মুসলমানে মিল হবেই হবে...তবে এ ছ'টো কথা ম হবে। আর ভাই সব...দেশের স্ববরদারী কোরতে ব বেঁধেছেন, তাঁদেরও ছেলাম দিছি।...আপনাদের মতো কোমর বাঁধতে পারে, তবে শুধু এই ছোট জায়গাটাই হিন্দুস্থানের রাস টেনে ধরতে পারি আমরা।...আবা আমি ছেলাম জানাছি।

আনন্দের আশিষ্যে পাঁচু জোরে চীৎকার করি আইল্লা পাক!

কেন স্তম্ভর

তুমি প্রিয়া মোরে স্তম্ভর কহ,

স্তম্ভর আমি কেন তা' কহি—

জানো তো পবন সুরভিত নিতি

কুসুম-সুরভি বন্ধে বহি'।

বিকচ কুসুম তুমি সখি মোর,

পরশ-আতুর পলক বিভোর

দিবস-রজনী বেয়াফুল হিয়া

ও তবু-বিলালে মত্ত রহি'

স্তম্ভর আমি কেন তা কহি।

শ্রীধীরেন্দ্রকু:

স্তম্ভর আমি!—কেন স্তম্ভর

তোমাতে সজনি কহি তা আ

জানো তো ভূঙ্গ হয় মনোহর

কমল-বুকের পরাগে স

সেই মত তব প্রেমের পরাগে

সারা দেহে মার মধুরতা-আগে,

ওঠে বিকশিয়া অজানা হরষে

নিতি নব নব স্তবমা:

কেন স্তম্ভর কহি তা আজি।

আমরা মানুষ, কাজেই কয়েক লক্ষ বছর আগে এই মানুষ-জাতটা কি রকম ছিল, সে কি খেতো, কেমন ভাবে চালাতো তার জীবনযাত্রা, তার সমাজ ছিল কি রকম, এ সব জানতে আমাদের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। এক-টুকরো পোড়া সিগারেট, আঙ্গুরের ছাপ, পায়ে দাগ,—যখন-স্থলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে গোয়েন্দা পুলিশ যেমন খুনি আসামীর নাড়ী নক্ষত্র জানতে পারে, অনেকটা সেই ভাবে শিলীভূত (ফসিলাইজড) মাথার খুলি, কয়েক টুকরো হাড়, পায়ে দাগ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা করতে পারেন প্রাগৈতিহাসিক জীব-জন্তু, গাছ-পালা, মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। আজ পর্যন্ত সব চেয়ে আদিম মানুষের তিনটি মাত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রাণিবিদ্রা জানতে পেরেছেন। প্রথম গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্ব ধরা পড়ে জানায়; অপর দু'টি গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্ব-দেহাবশেষ যথাক্রমে উত্তর-চীনে পিকিঙের কাছাকাছি জায়গায় আর ইংলণ্ডের পিণ্টডাউনে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

জাভা-গোষ্ঠীর মানুষ পাঁচ লক্ষ বছর, পিকিঙ-গোষ্ঠীর মানুষ দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর আর পিণ্টডাউন-গোষ্ঠীর মানুষ দু'লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে জন্মেছিল—বিদায় নিয়েছে তার কয়েক হাজার বছর পরেই। আরও পুরাতন গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্ব প্রাণিবিদের পক্ষে আবিষ্কার করা মোটেই বিচিত্র নয়, কাজেই মানুষের আবির্ভাব কত দিন আগে, তা ঠিক করে বলা শক্ত।

শিলীভূত দেহাবশেষ থেকে প্রাচীন মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা হলেও সে কি খেতো বা কি ভাবে জীবন যাপন করতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অসুমান করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য জানা যেতো যদি আমাদের লক্ষ বছর আগেকার পূর্বপুরুষরা তাঁদের মাসকাবারী খরচের ফর্দ বা মুদ্রি হিসেব গুহার গায়ে খুঁদে যেতেন। তবে আধুনিক কালের বড় জাতের গরিলাদের খাত্ত বৃত্তির তুলনায় অসুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, আদিম মানুষরা জন্তু এবং উদ্ভিদ হ'রকম খাবারই খেতো। এরকম সর্বভোজী পথ্যের (omnivorous diet) প্রমাণ তাদের শিলীভূত দাঁত থেকেও পাওয়া যায়। কারণ, দাঁতগুলির গড়ন দেখে মনে হয়, সেগুলি জন্তু এবং উদ্ভিদ বহু প্রকার খাত্ত চিবিয়ে খাবার মত করেই তৈয়ারী।

অসুমানের কথা গেল। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও আদিম মানুষের আহাৰ্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জাভা-মানুষ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জাভায় আবিষ্কৃত হয়েছে; আবিষ্কারের সময় পাওয়া গিয়েছিল মাথার খুলির একটি অংশ আর মেরুদণ্ডের কয়েকটি টুকরো। এ ছাড়া এমন কিছু পাওয়া যায়নি যা থেকে তার খাত্তবৃত্তি (feeding-habit) বুঝা যায়। পিণ্টডাউন মানুষের দেহাবশেষও ছিল অসম্পূর্ণ; দাঁত ছাড়া খাত্ত ও খাত্ত-বৃত্তি অসুমানের অল্প কোনও উপায় ছিল না।

চীনের গ্রাশজাং জিওলজিক্যাল সার্ভের সদস্যেরা মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ ডেভিডসন ব্যাকের তত্ত্বাবধানে পিকিঙের কাছাকাছি জায়গায় মাটির বুক থেকে খুঁড়ে বার করেছেন আদিম মানুষের মাথার কয়েকটি খুলি আর অসংখ্য দাঁত। এই নতুন-জানা গোষ্ঠীর মানুষের বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন 'পিকিঙ মানুষ'। পিকিঙ মানুষই এশিয়ার প্রবচনের আদিম অধিবাসী। দেহাবশেষের সঙ্গে পাথরের হাতিয়ার

(implements), চুরী, অতুল্য খাদ্যের অংশও গুহাবাসী পিকিঙ মানুষের বাসস্থানে পাওয়া গেছে। এইখানেই সর্বপ্রথম মিলেছে আদিম মানুষের ভোজ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কয়েক কোটি বছর আগে কোন এক অখ্যাত অগভীর সমুদ্রের নীচে ধীরে ধীরে জন্মেছিল চূণ-পাথরের স্তর। পৃথিবীর পিঠে যখন পরিবর্তন ঘটলো, সেখানে তখন মাথা তুললো এক-সার পাহাড়; পাহাড়ের মাথায় চড়ে চূণ-পাথরের স্তরটি উঠলো আকাশ-পানে, বেয়িরে এলো খোলা হাওরায়। পিকিঙের কাছাকাছি আধুনিক পশ্চিম পর্বত-মালা হলো এই নবজাত পাহাড়ের সার। কাল-কালে পাহাড়ের মাথায় চড়া চূণ-পাথরের স্তরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে বড়-বড়, হয়েছে প্রচুর ধারা-বর্ষণ। মাটির তলার জলের স্রাবক (ডিসলজি) শক্তি ধীরে ধীরে পাহাড়ের পাথর দ্বিধে তৈরী করেছে বড় বড় গুহা। বিভিন্ন সময়ে গুহাগুলিতে বসবাস করতো,—অশ্রয় নিত মহাচীনের আদিম মানুষের দল, হায়েনা প্রভৃতি গুহাবাসী জন্তুরা। এই ভাবে কয়েক যুগ কাটবার পর পশ্চিম পর্বতমালার গুহাগুলিতে ভ্রমণ ধরলো—গুহার ছাত থেকে, দেওয়ালের গা থেকে পাথরের টাই খসে পড়ে আংশিক ভাবে গুহাগুলিকে বৃষ্টিয়ে দিলে। মাটির অল্পপ্রাণী (পারকোলেট) ভলে থেকে চূণজ পদার্থ (calcaresus) খিঁচিয়ে জমিয়ে দিলে, জুড়ে দিলে পাথরের টাইগুলিকে। জমাট-বাঁধা পাথরের নীচে লোক-লোচনের অন্তরালে পড়ে রইল গুহাবাসীদের দেহাবশেষ; আর এই ভাবে জমাট-বাঁধা চূণজ পাথরের স্তরকে নতুন কালের বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয়েছে ব্রেকিয়া (Breccia)!

তার পর এগিয়ে চললো কাল, এগিয়ে চললো বিচিত্র প্রকাশ-ধারার নিরবচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহ। ব্রেকিয়ার স্তূপ পাহাড়ের গুহার রইলো অখ্যাত অজ্ঞাত। ক্রমে আমরা জন্ম নিলাম—চলতি বুকের মানুষরা। পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর তৈয়ারী করতে চূণের দরকার পড়তে চীনা শ্রমিকের দল এলো পশ্চিম পর্বতে চূণ-পাথরের স্তর খুঁড়তে। চূণ-পাথর খোঁড়বার সময় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-পড়া ব্রেকিয়ার স্তূপ তাদের নজরে এলো বটে, কিন্তু শাব্দ-মেশানো বলে শ্রমিকেরা ব্রেকিয়া স্পর্শ করলো না। ব্রেকিয়ার টুকরোগুলি যেমন ছিল, তেমনিই পড়ে রইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সুইডিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ অ্যান্ডারসন (J. G. Anderson) ব্রেকিয়ার টুকরোগুলিকে পর্যথ করে তার মধ্য থেকে গুণ্ডার, বাইসন ও অজান্ত এমন প্রাণীর শিলীভূত অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কার করলেন, যারা বহু কাল আগেই উত্তর-চীনের বুক থেকে লোপ পেয়েছে, যাদের ছায়া মাত্র আজকাল উত্তর-চীনে দেখতে পাওয়া যায় না! বিজ্ঞানীর দল তথ্যের সন্ধানে জড় হলেন, স্রব হলো হাড়-বহা (born-bearing) ব্রেকিয়া জুপের খোঁড়াখুড়ি। তার ফলে জানা গেল এশিয়ার আদিম মানুষের জীবনের এক অজানা অধ্যায়।

পিকিঙের প্রায় ত্রিশ মাইল পশ্চিমে 'পশ্চিম-পর্বতমালার পার্শ্বীয় সহর চোকোউতেনে (Choukouten) পিকিঙ মানুষের কবর প্রথম দেখা যায়। চোকোউতেনে কয়লা ও চূণ-পাথর সরবরাহের প্রধান স্থানীয় কেন্দ্র। এই দু'টি গুহাভার মাল বহনের জন্য কয়েক বছর আগে এখানে রেল-পথ খোলা হয়েছিল; পরে জাপানী লড়াই স্রব হলে রেল-পথটি তুলে নিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়। রেলের বদলে এখন এশিয়ার হু' কু'জঙলা হুয়ে-পুকা

উটের দল ক্রান্ত চরণে মন্থর গতিতে হেলে-দুলে মাল বয়।
চোকোতিয়েনের উপরে পাহাড়ে যে গুহাতে সব চেয়ে বেশী জীবাত্ম
(কসিল) পাওয়া গিয়েছিল, তার পাশে মহাচীনের ত্রাশস্ত্রাল
জিওলজিক্যাল সার্ভে তাঁদের পরখশালা তৈরী করেছেন। পরখ-
শালাটিতে গবেষক কস্মিন্ডের বসবাসেরও বন্দোবস্ত আছে।

প্রাণিবিদগণের ধারণা, অতীতে একাধিক প্রবেশ-পথ দিয়ে মানুষ
ও জন্তুবা গুহাটির মধ্যে যাতায়াত করতো; তার পর এই প্রবেশ-
পথগুলির একটি পথ ছাড়া বাকী পথগুলি হয় ধ্বংস হয়েছে না হয়
বুজ্ঞে গেছে। তাঁদের মতে ভবিষ্যতে খোঁড়াখুড়ির কলে লুপ্ত পথগুলির
পুনরাবিষ্কারে নতুন তথ্যের সম্ভাবন মিলতে পারে। বর্তমানে চূণ-
পাথরের স্বাভাবিক খাড়ি-পথ দিয়ে গুহার মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাত
নীচে নামলে গুহার আসল মেঝেতে এশিয়ায় আদিম মানুষের
বাসস্থানে পৌঁছানো যায়। এখানে ত্রেকিয়ায় স্থপের বহু ফুট নীচে
থেকে খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে অনেকগুলি আদিম মানুষের মাথার
খুলি, খুলির গড়ন দেখে বোঝা যায়, এ গোষ্ঠীর মানুষ একেবারেই
নির্বোধ ছিল না! তখনকার দিনের অস্ত্রাশ্রয় জন্তুদের চেয়েও তাদের
অনেক বেশী মানসিক উন্নতি ঘটেছিল। আবিস্কৃত হয়েছে বলে এই
গোষ্ঠীর মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে ‘পিকিং মানুষ’ (Peking
man, Sinanthropus pekingensis)। মাথার খুলির সঙ্গে
কতকগুলি হাতিয়ার, ছুরির ফলার মত ফলাও পাওয়া গেছে।
ফটিক পাথরকে ঘষে মেনে কেটে কুঁদে ফলাগুলিকে পিকিং মানুষ
তৈয়ারী করেছিল। এগুলিতে লেগে আছে তার অণুটু হাতের ছাপ।
কলা থেকেই তার কৰ্মপটুতার (technical skill) প্রমাণ পাওয়া
যায়। পিকিং মানুষ আঙুন ছালতেও পারতো; কারণ, তার
গুহার দেওয়ালের কাছে কয়েক হাত উঁচু জড়ো-করা ছাই পাওয়া
গেছে। এটা পিকিং মানুষের গৃহিণীর অলসতার চিহ্ন কি না, কে
জানে!

ছাইয়ের স্থপের মধ্যেও কতগুলি দরকারী সামগ্রীর আবিষ্কার
হয়েছে। স্থপের মধ্যে পাওয়া গেছে আধপোড়া কাঠের কতকগুলি
টুকরো আর প্রচুর ঝলসানো হাড়। আধপোড়া কাঠের টুকরোগুলিকে
পরখ করে দেখা গেছে, তাদের সঙ্গে ঠাণ্ডা ও শুকনো আবহাওয়া-
দেশের, উত্তর-চীনের আধুনিক গাছপালায় কাঠের কোনও তফাৎ
নেই। পশ্চিম পৰ্ব্বতমালায় ও তার কাছাকাছি সমতল ভূমিতে
খোড়া, বাইসন, গুগার ও অস্ত্রাশ্রয় যে সব জন্তু চরে বেড়াতো,—এখন
যাদের কোন চিহ্ন বা জীবিত আত্মীয়-স্বজনকে উত্তর-চীনে দেখতে
পাওয়া যায় না, সেই সব জন্তুর বাছাই-করা দেহ-খণ্ডের রান্না-করা
অবশেষ হলো এই সমস্ত ঝলসানো হাড়।

পিকিং মানুষ যে সব জন্তু খেতো তাদের অস্তিত্ব দেখে মনে হয়,
তখনকার দিনে দেশটির অধিকাংশই ছিল সমতল ভূমি, আর এখনকার
দিনে আধ-শুকনো (Semi arid) আবহাওয়া-দেশে যে সব
গাছপালা জন্মায়, সেইগুলিই এখানে নদীর ধারে ধারে জন্মাত।
পিকিং মানুষ থাকতো গুহার, আঙুন ছেলে তাত পোয়াত কিম্বা
রান্না করত। যদি আমরা ধরে নিই, তখনকার দিনে উত্তর-চীনের
আবহাওয়া কতকটা শুকনো থাকলেও তার উষ্ণতা ছিল ভরানক
কম, ঠাণ্ডা ছিল অত্যন্ত বেশী, তাহলে তাব গুহার বাস করা আর
আঙুন ছালার কারণ বোঝা যায়। ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর অস্ত্রাশ্রয়

মহাদেশে চলেছে হিম-যুগ (Ice-age); তাদের মাটি তখন
পুরু স্তরে আবৃত। উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় জলহাওয়া
শুকনো ছিল বলে সে বেঁচে গিয়েছিল হিম-সরিতের (G
হাত থেকে।

গুহার মেঝের প্রায় তেরো হাত উঁচুতে অনেকগুলি
হাতিয়ার হাড়ের টুকরোর সঙ্গে ত্রেকিয়ায় মধ্যে পাণ্ডা
বাদামের অসংখ্য ভাঙ্গা খোলার কয়েক ইঞ্চি পুরু স্তর। থে
দু’পিঠের দাগ পরখ করে দেখা গেছে তারা চেরী ফলের
এক-জাত বাদামের খোলা। এ জাতের বাদামের
আমাদের দেশে ভাল কথায় চিকন (Chicon Roxig), চ
চেকন গাছ বলে; ইংলেণ্ডে একে বলা হয় সুগার বেরী বা
আমেরিকায় এর নাম হ্যাকবেরী (Hackberry celtis)
গাছ জাম গাছের মত মাঝামাঝি-রকমের উঁচু। এ
চেহারা অনেকটা পাটের পাতার মত এক পিঠা রসখসে,
খাঁজ-কাটা। ফুলের রঙ সবুজ, তারা ফোটে থোকায়
আকারে খুব ছোট, বছরের প্রায় সব সময়েই ফোটে। চিব
দেখতে মটরশুটির মত গোল হলুদ আকারে তার এ
ছোট। চিকন গাছ উত্তর-আমেরিকায় ও এশিয়ায় জঙ্গলে
ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বাংলায় এবং নেপালেও দেখা ব
প্রাচুর্য্য ঘটে আধ-শুকনো আবহাওয়ার দেশে, সমতল
নদীর ধারে ধারে। গুহার মধ্যে প্রচুর চিকন বাদাম
করে, ভাঙ্গল কি করে, তা বিশেষ ভাবে আলোচ্য। জ্ঞে
এরা গুহার মধ্যে আসেনি! কারণ, গুহার কাছাকাছি কে
তার চিহ্নও নেই! চারি দিক-বন্ধ গুহার মধ্যে হাওয়ায় ট
অসম্ভব। গুহার মধ্যে রৌদ্রের অভাবে গাছগুলি জন্
না। কাজেই নির্ভরযোগ্য অনুমান হ’ল—বাদামগুলি থ
থেকে আদিম মানুষ বা অন্য কোন জন্তু প্রচুর পরিমাণে
আর খাবার সময় ভেঙ্গে ফেলেছে খোলাগুলিকে। এখন
বাদামগুলির বাহক কে? মানুষ? না জন্তু?

খোবানীর মত চিকন বাদামের খোলা ঢাকা
শাঁসে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে
ইহুদের প্রিয় ভোজ হলো এই বাদাম। সেখানে
রুটিকে সুগন্ধি করবার জন্তুও চিকন বাদাম প্রচুর পরিম
করা হয়। বাদামকে খুব ভাল করে পিষে তার রসটুকু
মিশিয়ে দেওয়া হয় রান্না করা খাবারের সঙ্গে—খোল
ফেলে। অনেকে বাদাম-শুক খোলাটি ফেলে শাঁস থ
চিবিয়ে খায় শাঁস-শুক-বাদাম ফেলে শুধু খোলাটি। পি
যদি রান্না করা খাবারকে সুগন্ধি করবার জন্তু চিকন ব
করে থাকে, তাহলে তাঁর গুহার মধ্যে বাদামের খোল
রহস্ত খায় পরিষ্কার হয়ে। কিন্তু চোকোতিয়েনের গুহার
শিল্পীভূত কঙ্কালও পাওয়া গেছে, তাই বিজ্ঞানীদের
জাগ্রাসো যে, ইহুদর মহাপ্রভুরাই গুহার মধ্যে জড়ো
বাদাম। এ কাজ পিকিং মানুষের নয়। ইহুদবিদদের
তারা বলেন, তাঁদের ধারণা, ইহুদরা বাদাম খাবার জন্তু
দিকেই কুরে কুরে একটু গর্ভ করবে, সমস্ত খোলাটা
করবে না। কালিকোশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরখশা

শব্দী-করা নানা জাতের ইঁদুরদের খেতে দেওয়া হলো বোদে শুকনো-করা চিচন বাসাম। ইঁদুরা বাসাম ছুঁলো না—হয় তাদের ক্ষিপে ছিল না, নয় অমনো জিনিষ বলে ভয়ে খেলো না। এর পর ডাক পড়লো খাঁচার পোরা বাঁদরদের। তারা এই শুকনো বাসাম শাঁস-শুষ্ক খোলা-শুষ্ক কড়মড় করে চিবিয়ে গিলে ফেললো মহানন্দে। বাঁদরদের বাসাম খাইয়ে বিজ্ঞানীদের কোন লাভ হলো না; কারণ, হিম-যুগে উত্তরা-চীনে বাঁদরের অস্তিত্বও ছিল না। কাজেই চিকন বাসামের খোলাগুলি পিকিও মানুষের প্রাত্যহিক ভোজের পরিত্যক্ত অংশ, এ কথা ধরে নিলে নিতান্ত অসঙ্গত হবে না! উপরন্তু হিম-যুগে উত্তরা-চীনে ফল ও বাসাম দুর্লভ হয়ে পড়ায় পিকিও মানুষ তার বাসস্থানের কাছাকাছি ঝোপঝাড় থেকে সংগ্রহ করে আনতো।

বেটে রান্না করতো এই সব বাসাম, এও ধরে নেওয়া চলতে পারে।

তার মাথার খুলির মাপ থেকে জানা যায়, পিকিও মানুষ কথা বলতেও পারতো, অজ্ঞাত ভাবায় মুগ্ধিত হয়ে কাটতো তার নানা রঙের দিনগুলি। বর্তমানে সে-ভাষা মিলিয়ে গেছে লক্ষ বছরের কাল-স্রোতে। আদিম মানুষ তার খাত্তবৃত্তির কথা নিজে লিখে বাবার আগেই মহা-কাল গিরিগুহার শিলাকূপে রেখেছেন তার চিহ্ন, কিছুই যায়নি হারিয়ে।*

* 'সায়ান্টিফিক আমেরিকানে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু অবলম্বনে লিখিত।

ভারতের রাজপথ ও রেলপথ

যুদ্ধোত্তর ভারতে কৃষি, শিল্প ও বৃত্তি-ব্যবসায়ের সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন, প্রত্যেক প্রদেশাভ্যন্তরে এবং প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে দীর্ঘ ক্ষুদ্র রাজপথ ও সুবিষ্মৃত রেলপথ। যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত পণ্য ও পরিচর্যার আদান-প্রদান সুরক্ষিত ও সহজসাধ্য হয় না। খাত্তশস্ত্র ও বর্জিত পণ্যের উৎপাদন সর্বত্র সমান নয়। স্তত্রাং যেখানে যে জিনিষ অধিক উৎপন্ন হয়, সে স্থান হইতে সেই দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া যেখানে তাহার অপ্রাচুর্য্য ঘটে, সেই সব জায়গার অভাব-অনটন দূর করিতে হয়। শান্তির সময় জন-সাধারণের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত ও মাল-চলাচলের যেমন অবশ্য প্রয়োজন, যুদ্ধকালে সামরিক সুযোগ-সুবিধাকল্পে পথ-ঘাট, সেতু ও রেলপথের প্রয়োজন তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী। আমাদের বর্তমান বড়লাট লর্ড ওয়াডেল সমর বিভাগের লোক। বড়লাটরূপে ভারতে আসিবার অবাবহিত পূর্বে তিনি এই ভারতের জঙ্গলীকরণে সংরক্ষণ-কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। বর্তমান যুদ্ধের অভিঘাত এবং বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞতার ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তরূপে ভারতে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমাদের দেশে পথ-ঘাটের স্বল্পতার প্রতি তীব্র লক্ষ্য করিয়া যাতায়াত ও মাল-চলাচলের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির আশু প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক প্রগতি, এই উভয়ের নিমিত্ত যানবাহনের সুযোগ-সুবিধার সমান প্রয়োজন। এই নিমিত্ত বড়লাটরূপে তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য অভিভাষণে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের তুলনায় তাঁহার সংগঠন-সমুন্নয়ন পরিকল্পনায় যান-বাহনের সুযোগ-সুবিধাকে তিনি প্রথম ও প্রধান স্থান দিয়াছেন।

লর্ড ওয়াডেলের যুদ্ধোত্তর-পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের প্রয়োজন ৪,০০,০০০ মাইল পথ; এবং ইহার অর্ধেক হইবে সর্বক্ষুদ্রসহ; নতুবা ভারতের অন্যান্য ১,০০,০০০ গ্রামকে সুপরিকল্পনা-সম্মত সর্ববিধ যান-পরিচালনোপযোগী রাজপথের সহিত যাত্রী ও মাল-চলাচলের সংযোগস্থলে গ্রথিত করা সম্ভব নয়। এই পথ-ঘাট ও সেতু সংস্থাপন করিতে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ভারতে পাকা পথের মোট পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ মাইল। কিছু দিন পূর্বে নয়। বিস্তারিত বিভিন্ন প্রদেশের পূর্ণ বিভাগের নায়কদের (Chief

শ্রীযুক্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Engineers) এক বৈঠক বসিয়াছিল; ভারতের বর্তমান রাজপথের পরিমাণ পাঁচ গুণ বাড়াইবার জন্য তাহার একটি বর্ষ-মণ্ডলী (Road Board) স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাদের অভিপ্রায়, জাতীয় কতকগুলি বড় বড় সরকারী পথকে (National highways) কাঠামো (Frame work) করিয়া তাহার সহিত প্রাদেশিক রাজপথ ও বিভিন্ন জেলা এবং গ্রামের সরকারী পথগুলিকে বধাক্রমে সংযুক্ত করিয়া দেশের সর্বত্র যাতায়াত ও মাল-চলাচল যাহাতে হয়, তাহার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তাহার একটি বর্ষ-আইনের (Highway Act) পক্ষপাতী। বর্ষ-মণ্ডলীকেও তাহার উপযুক্ত ক্ষমতার অধিকারী করিতে চান। বোম্বাই-এর শিল্পপতিগণ-বিরচিত পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনায় বাতী ও মাল-চলাচলের নিমিত্ত পথঘাটের পরিমাণ আরও অধিক। তাহার ২,৪১৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ভারতের সমগ্র সরকারী পথের দৈর্ঘ্য ৬,০০,০০০ মাইলে পরিণত করিতে অভিলাষী। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমিতির শিল্প-কারিকরী উপসমিতিও (Technical Sub Committee) কর্তৃপক্ষের নিকট পথ-ঘাট সম্পর্কে একটি বিবৃতি দাখিল করিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রদেশের পূর্ণ বিভাগের নায়কদিগের পরিকল্পনা দুই ভাগে বিভক্ত। নিখিল ভারতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বর্ষ-বিভারের একটি দূরদর্শী কল্পনা (Long-term plan) প্রথম; এবং দ্বিতীয়, বর্তমানে যুদ্ধব্রীত সমস্তা সমাধানের উপায়। শেবাক্ত পরিকল্পনায় বর্তমান যুদ্ধের শুরু প্রয়োজনে বহুল পরিমাণে প্রবর্তিত যান-বাহন চলাচলের ফলে পথ-ঘাটের যে অসীম ক্ষয় ও ক্ষতি ঘটিতেছে, তাহার পূরণ ব্যবস্থা; মাল-মশলা ও যন্ত্রপাতির স্বল্পতার আত্ম-প্রতিকার এবং যুদ্ধ-বিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও যন্ত্রপাতির পূর্তকর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পথগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম, জাতীয় সরকারী পথ এবং যে সকল স্থান প্রাদেশিক সরকারগুলির অধিকারে নয়, অথচ বাহার উন্নতি সাধন হয় নাই, এরূপ স্থলের সহিত সংযুক্ত পথ। দ্বিতীয়, প্রাদেশিক অথবা দেশীয় রাজস্বাঙ্গত পথ সমূহ; তৃতীয়, জেলা-মহকুমার অভ্যন্তরস্থ পথ এবং চতুর্থ, পল্লীপথ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, জাতীয় সরকারী পথ এবং অনুরূপ অঞ্চলের

সহিত সংযুক্ত পথগুলি হইবে কাঠামো বাহার অভ্যন্তরে সমগ্র দেশের লক্ষ্যস্থলিত বস্তুজাল বিস্তার লাভ করিবে। এইগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরস্থ এবং জেলা-মহকুমা এবং গ্রামের রাস্তাগুলি তৈয়ারী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির বস্তুবিভাগের। এই প্রধান পূর্ত-কম্পচারিগণ তাহাদের বিবৃতিতে বিভিন্ন প্রকারের রাস্তার শ্রেণী-বিভাগ এবং মান নির্ণয় করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সে সকল খুঁটি-নাটি কটিকর হইবে না। তাহাদের নির্ধারণ অল্পস্বল্প কঠিন বস্তু-বিশিষ্ট (hurd crust) পথের একুন দৈর্ঘ্য হইবে ১,৪৭,০০০ মাইল এবং মোট পথের পরিমাণ হইবে ২,৫৩,০০০ মাইল। বর্তমানে ভারতের পাকা পথগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৭১,০০০ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ১,৬৩,০০০ মাইল। প্রস্তাবিত নূতন পথগুলি তৈয়ারী হইলে সর্বশ্রেণীর পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) ব্যয় পড়িবে ১৬ কোটি টাকা। পূর্ত-কম্পচারিগণের বৈঠক বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে বর্তমান মাসের মধ্যে তাহাদের পরি-কল্পনার স্থল নকশা কিংবা সম্বন্ধের আনুমানিক হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারে দাখিল করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তরত সেগুলি দাখিল হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের যন্ত্রান্তর পরিচালনা সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত যানবাহন পরিচালন সংক্রান্ত (Transport) উপসমিতির অভি-প্রায়, একটি একাবন্ধ ও সংযুক্ত যানবাহন-পরিচালন নীতি। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশগুলি একাভিসন্ধি হইয়া যানবাহনের সর্বত্র সুপরি-চালনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সম্মতি ও সহযোগিতা-সাপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিবেন। ভারতের অনতি বিস্তৃত রেলপথের মধ্যে অনেক ফাঁক (Gaps) আছে। এই ফাঁকগুলি যুক্ত করিতে প্রয়োজন, উত্তম রাজপথের প্রসার এবং যানবাহনের স্বেচ্ছাচল। যানবাহনের মধ্যে অবশ্য হাওয়া-গাড়ী প্রধান। হাওয়া গাড়ীতে যাত্রী ও মাল-পরিবহনের সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটিলে পল্লী অঞ্চলে যাতায়াতের ও তথাকার উৎপন্ন পণ্যের স্থানান্তর-করণের সৌকর্য্যের ফলে কৃষি, শিল্প ও বৃত্তি ব্যবসায়ের উন্নতি হেতু পল্লী অঞ্চলের লোকের আর্থিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে। পল্লীর উন্নতিতে সমগ্র দেশের উন্নতি সাধিত হইবে। মাল-চলাচল ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার অভাবে বহু পল্লী-কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন জব্যাদি ঐ সকল পণ্যে অভাব-প্রসূ স্থানে চালান দেওয়া যায় না। স্তবরাং স্বস্থানে চাহিদার সঙ্কোচ হেতু প্রাথমিক উৎপাদকেরা তাহাদের শেষের পরিশ্রম-লব্ধ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না। ফলে তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয় না। উপযুক্ত রাস্তা দ্বারা যে কোন প্রকার যানের সাহায্যে রেলপথের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইলে তাহারা চাহিদা অল্পস্বল্প কৃষি অথবা শিল্পজাত জব্যাদি যোগাইয়া তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে। পল্লীর উন্নতিতে যেমন সমগ্র দেশের উন্নতি, কৃষকের উন্নতিতে তেমনি ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও উন্নতি; স্তবরাং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উন্নতি অবশ্যস্বাভাবিক। এই নিমিত্ত যান-বাহন-উপসমিতি সুপারিশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের অবসানের নিমিত্ত আমাদের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, এখন

হইতেই আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার হাওয়া-গাড়ীর চর-সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সুবিধামত হাওয়া গাড়ী যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্তবরাং রাস্তা উন্নতি ও প্রসার সাধন পূর্বক বিবিধ প্রকার মোটর গাড়ী যাতায়াত ও মাল-চলাচলের সুবন্দোবস্তের উত্তম সুযোগ উপ-বিস্তৃত তাহার যোগ্য উত্তম কোথা?

পূর্ব রেল কোম্পানীগুলির ধারণা ছিল যে, উত্তম উত্তম নির্মাণ করিয়া মোটর গাড়ীতে যাতায়াত ও মাল-চলাচলের সু-সুবিধা প্রদান করিলে তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি ঘটিবে। এ ধারণা সত্যতঃ ভুল। ভারতবর্ষ এক প বিস্তৃত দেশ যে, সর্বত্র লৌহ-নিগড়ে সংযুক্ত করা অতি তুসসাধ্য ও ব্যয়-ব্যাপার। কিন্তু রাস্তা-ঘাটের উন্নতি ও প্রসার দ্বারা মোটর গ-যাতায়াত ও মাল-চলাচলের বন্দোবস্ত তত হৃদয় নহে, পরস্ব সাধ্য। রেলপথের সহিত প্রতियোগিতা না করিয়া রেল সহিত মোটর-পথের সহযোগীল সংযোগ স্থাপন করিলে অল্পস্থানের উন্নতি ঘটিবে। উভয় পথের মধ্যে মাত্র দুই-এক প্রতियোগিতা সম্ভব, কিন্তু সহযোগিতা সর্বত্রই সম্ভব, এবং যোগিতা যদি ঈর্ষা কিংবা অনিষ্ট-মূলক না হয়, তাহা হইলে ব-দায়ক। বাহা হউক, এখন প্রায় সমস্ত রেলপথই সরকারী চালনাধীন। স্তবরাং স্বাধাংস্বী কোম্পানী-পরিচালিত রেল প্রতियুদ্ধকতার আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা-মোটর অল্পস্থানগুলিকে যথাসম্ভব শক্তি-সামর্থ্য-সম্পন্ন গরিষ্ঠ অ-পরিণত করিয়া প্রধান প্রধান ব্যবসা-মার্গে যান-বাহন পা-করিলে এবং লঘুষ্ঠ মার্গগুলিতে স্তবাসিত একাধিপত্য সা-করিলে অসুখা কিংবা অনিষ্টমূলক প্রতियোগিতার সম্ভাবনা সম্প-তিবোধিত হইবে। যাত্রীবাহী মোটর-অল্পস্থানের সংখ্যা ও প-যথাসম্ভব আয়তান্তর্গত করিতে পারা যায়; এবং রেল ও পরিচালন-কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে রেল ও মোটর উভয় পথের ও মানুল যথাসম্ভব নিম্নতম করিতে পারা যায়। এই সাধনার্থ উপসমিতি সুপারিশ করিয়াছেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব য-যুক্তি-সম্মত উন্নতি ও প্রসার সাংসাধনার্থ বিধি-ব্যবস্থা প্রা-য়ে উপসমিতির ইচ্ছা। যে, প্রত্যেক প্রদেশে এক জন অনন্তকর্ম্মা (w-ime) যান বাহন পরিচালন আয়ীন (Transport Con-sioner) নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এই কর্ম্মচারী প্রত্যেক ও যানবাহন পরিচালন সংসদের সভাপতি হইবেন এবং যাত্রী ও পরিবহন বিষয়কপক্ষে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। উপসা-আর একটি সুপারিশ এই যে, যানবাহন-পরিচালন সৌকর্য্যার্থ একটি বিশিষ্ট “বাজেট” প্রস্তুত হইবে এবং প্রদেশগুলি স-তাহার সাহায্যে তাহাদের আয়কে সমষ্টিগত ভাবে (Poolin-revenues) এবং মৌলিক ব্যয়কে রাজপথ ও রেলপথের সমঞ্জস ভাবে খরচ (Balancing of capital expend-on both road and rail) কথিতে পারিবে।

উপসমিতিও একটি ভারতীয় বস্তু-মণ্ডলীর (Indian I-Board) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার প্রধান হইবে ভটিল ও কুটিল সমস্তার সমাধান; বস্তু-পরিষ্কা-কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ-আয়োজন; বিভিন্ন য

মাল-পরিবহন অ্যুট্রানের নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভবস্থ সমাঙ্গন (Co-ordination); রাজপথ ও রেলপথের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সংযোগ স্থাপন। কলে রাজপথে ও রেলপথে যাত্রী ও মাল-পরিবহনের উন্নতি সাধন এক উভয়ের সম্ভবস্থ ভাবে পরিবহন-কার্য পরিচালনের চরম দায়িত্ব থাকিবে এই মণ্ডলীর।

বোম্বাইয়ের শিল্পপতিগণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের রাজপথগুলির বর্তমান একুশ দৈর্ঘ্য ৩০০,০০০ মাইল। ইহার মধ্যে ৭৪,০০০ মাইল পাকা এবং ২২৬,০০০ মাইল কাঁচা। পনের বৎসরের মধ্যে এই সমষ্টিতে তাঁহার দ্বিগুণ করিতে চাহেন, প্রধানতঃ গ্রাম্য ও মহকুমা এবং জেলার অভ্যন্তরস্থ রাস্তাঘাটের বিস্তার দ্বারা। শিল্পপতিগণের অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত প্রধান প্রধান গ্রামগুলিকে এমন ভাবে প্রধান প্রধান ব্যবসায়-মার্গের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে এক সহস্র কিংবা ততোধিক বাসিন্দা-সমন্বিত গ্রামগুলি সরকারী পথ হইতে এক মাইল কিংবা দেড় মাইলের অধিকতর দূরবর্তী না হয়। এইরূপ রাস্তা-ঘাটের উন্নতির সহিত গো ও মহিষ-যানেরও উন্নতি করিতে হইবে। কারণ, পল্লী অঞ্চলে গো ও মহিষযানই হইতেছে, যাত্রী ও মাল পরিবহনের প্রধান উপায়; এবং ইহাদের উপকারিতা ও উপযোগিতা সহজে বিনষ্ট হইবে না।

শিল্পপতিগণ গো ও মহিষযানগুলির চক্কগুলিকে বায়ুপূর্ণ রবারের বেড় (pneumatic tyre) দিয়া মজবুত করিতে বলেন। তাহাতে রাস্তাঘাট ও গাড়ীগুলির মেরামত খরচা কম পড়বে। গ্রামাঞ্চলে যান-বাহনের চলাচল তত অধিক নহে; সুতরাং পল্লী অঞ্চলের রাস্তা-গুলিকে সাধারণ ভাবে পাকা করিলেই চলিবে। বায়ুপূর্ণ অর্থাৎ কাঁপা বেড় দিয়া চাকাগুলিকে খাটাইলে এইরূপ রাস্তার পক্ষে তাহার উপযোগী হইবে। সাধারণতঃ ১৮ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইলে, মাইল প্রতি ১০,০০০ টাকা ব্যয় পড়ে। এই হিসাব অনুযায়ী আরও ৩০০,০০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিতে ৩০০ কোটি টাকার প্রয়োজন; এবং ইহাদের রক্ষাবেক্ষণের ব্যয় পড়িবে ৩৫ কোটি টাকা। ভারতবর্ষকে যথোপযুক্ত রাস্তা-ঘাটের সংযোগ বিহীনমানের সুবিধা দিতে হইলে এই অতিরিক্ত ৩০০,০০০ মাইল রাস্তা ব্যতীত ২২৬,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তাকেও পাকা করিতে হইবে। এই রাস্তা-গুলিকে পাকা করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে মাইল প্রতি ৫০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে; অর্থাৎ মোটের উপর ১১৩ কোটি টাকা খরচ হইবে। যদি তাহাদিগকে ভাল করিয়া পাকা করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের বর্তমান রক্ষাবেক্ষণের ব্যয়ও কমিয়া যাইবে। সুতরাং শিল্পপতিগণের মতলব অনুযায়ী রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করিতে ৩০০ + ১১৩ + ৩৫ = ৪৪৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

এই সকল পরিকল্পনা ও সুপারিশ এখনও কেন্দ্রীয় যুক্তান্তর পরিকল্পনা সমিতির বিবেচনাদীন। সরকারের চরম পরিকল্পনা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা এখন অনুমান করিতে পারা যায় না। তবে স্পষ্টতঃ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিষদ (Council of State) নায়ক ডাক ও বিমান বিভাগের মন্ত্রী শ্রী মহম্মদ ওসমান একটি সাংবাদিকের বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আর্থিক কিংবা অন্য কোন প্রকার অসুবিধার নিমিত্ত সরকার এই ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কুড়ি বৎসরের মধ্যে ৪০০,০০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে পশ্চাদ্দান হইবেন না। যুক্তান্তর ভারতে যথোপযুক্ত

রাস্তাঘাট এবং বিবিধ প্রকার যান-বাহনে যাত্রী ও মাল পরিবহনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত; উত্তম, মূল্য এবং প্রচুর রাস্তা-ঘাট ও যান-বাহন ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় উন্নতির নিমিত্ত অবশ্য প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান পূর্ণ-কক্ষচারিগণের পরিকল্পনা অবশ্য বিরাট, কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আর্থিক কিংবা অন্য কোন অসুবিধায় সম্ভব না হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন। এ আশঙ্কিত ক্রটিসম্বন্ধ, সন্দেহ নাই; কিন্তু যুক্তান্তর সরকারের মতিগতি কোন পথে ধাবিত হইবে, তাহা বিধাতা পুরুষই জানেন। ভারতে জাতির স্বার্থ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

শ্রী মহম্মদ ওসমান এই ঘোষণা প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের শিল্প-পতিগণের পরিবহন (Transport) পরিকল্পনার উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার রচয়িতাগণের অন্ততম শ্রীর আদেশের দালাল সম্প্রতি বড়লাটের শাসন পরিষদে স্থান পাইয়াছেন। তিনি এখন সংগঠন-সমূহন (Planning and Development) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। রাস্তা-ঘাট, রেলপথ প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী এডওয়ার্ড বেঙ্কাল। উভয়েই অবশ্য যুক্তান্তর পরিকল্পনা সমিতির সদস্য। ভারতের কল্যাণকল্পে উভয়েই উদ্বেগ এক হওয়া উচিত; তথাপি শাসন পরিষদের ভারতীয় ও স্বৈরাচার সদস্যদের মধ্যে মতবৈধ অনিবার্য।

পরিবহনকার্যে রাজপথ ও রেলপথের দ্বারা জলপথের ও ব্যোমপথেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। বোম্বাইয়ের শিল্পপতিগণের পরিকল্পনায় এ সকল পথের পরিবর্তনের ব্যবস্থাও আছে। আমরা এ প্রসঙ্গে মাত্র জলপথের আলোচনা করিব। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের রেলপথের একুশ দৈর্ঘ্য ছিল ৪১,০০০ মাইল এবং ইহাতে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৪৮ কোটি টাকা। ভারতবর্ষে আয়তন ১৫৮,০০০ বর্গ-মাইল। আয়তনের অনুপাতে ভারতের রেলপথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। রুশিয়া ব্যতীত যুরোপের আয়তন ১৬,৬০,০০০ বর্গ-মাইল, এবং তাহার রেললাইনের বিস্তার ১,৯০,০০০ মাইল। রেলপথের দ্বারা ব্রিটিশ-ভারতে রাজপথেরও পরিমাণ অত্যন্ত কম। প্রতি এক শত বর্গ মাইলে ৩৫ মাইল। কিন্তু আমেরিকায় প্রতি এক শত বর্গ মাইলে রাজপথ ১০০ মাইল এবং যুক্তরাজ্যে প্রতি এক শত মাইলে ২০০ মাইল। প্রতি লক্ষ অধিবাসীর নিমিত্ত অষ্ট্রেলিয়ায় রাজপথের পরিমাণ ৭,১০০; কানাডায় ৫,৪০০; যুক্তরাষ্ট্রে ২,৫০০; জাপানে ৮৫০; যুক্তরাজ্যে ৩৯৩ এবং জার্মানিতে ২৬০ মাইল। ভারতে প্রতি লক্ষ অধিবাসীর নিমিত্ত রাজপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৭২ মাইল। রাজপথের তুলনায় ভারতবর্ষে রেলপথের প্রতি সরকারের মনোযোগ ছিল অধিক। পরন্তু, সহর অঞ্চলের তুলনায় পল্লী অঞ্চলে রেলপথ অপেক্ষা রাজপথেরই প্রয়োজন অধিক। এই নিমিত্ত শিল্পপতিগণ তাহাদের যুক্তান্তর পরিকল্পনায় রাজপথকে আরও ৩০০,০০০ মাইল বিস্তৃত এবং রেলপথকে আরও ২১,০০০ মাইল দীর্ঘতর করিবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ বর্তমান রাজপথকে শতকরা ১০০ অংশ এবং বর্তমান রেলপথকে শতকরা ৫০ অংশ বৃদ্ধি করিতে অভিলষী। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের মূলধন ও একুশ রেলপথের অনুপাতে আরও ২১,০০০ মাইল নূতন রেলপথ প্রস্তুত করিতে মৌলিক ব্যয়

(Capital cost) লাগিবে ৪৩৪ কোটি টাকা। শতকরা ২ অংশ হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় পড়িবে বার্ষিক ১ কোটি টাকা। অল্প একটি বেসরকারী (People's plan) পরিকল্পনার প্রস্তাব আরও অধিক—৬,৭০,০০০ মাইল রাস্তা পথ।

রেলপথ সম্বন্ধে সরকারের অভিশ্রায়ে ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছি, গত আগষ্ট মাসে নয়া দিল্লীতে পূর্নবিজ্ঞানবিদগণের অসোসেন্স-সভার (Institute of Engineers) বার্ষিক অধিবেশনে রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য শ্রাব লক্ষ্যপতি মিশ্র মহাশয়ের অভিভাষণে। আগামী সাত বৎসরে ৩১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০০ মাইল নতুন রেলপথ প্রস্তুত করা হইবে। এই মৌলিক পরিকল্পনা (Basic plan) তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম, পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Rehabilitation), অর্থাৎ কারখানার বহুপাতি, এঞ্জিন, মালগাড়ী, যাত্রীগাড়ী, রেলের রাস্তা ও পাটি এবং তাহাদের সাজসজ্জার মেরামত ও পুনঃস্থাপন (Replacement); এবং সমগ্র ভারতের জাতীয় রাস্তাপথ ও প্রাদেশিক রাস্তাঘাট পরিকল্পনার কাঁচামের মধ্যে খাপ খায় এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া অথবা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে যে সকল শাখা রেলপথ, সেগুলির (Dismantled branch lines) পুনঃস্থাপন। দ্বিতীয়, কৰ্ম-পরিচালনা ব্যবস্থা এবং কৰ্মচারিবৃন্দের উন্নয়ন সাধন (Improvement in organisation and personnel), অর্থাৎ মাল, পুলিশ ও যাত্রী পরিবহন প্রথার উন্নতি সাধন। যুদ্ধোত্তর প্রয়োজনের প্রতি বধ্যযোগ্য দৃষ্টি রাখিয়া নতুন মাল-সংকল্পের ক্রমোন্নতি; রেলগাড়ীতে বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস, এবং রেল-কৰ্মচারীদিগের কল্যাণ ও কৰ্মপটুতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কৰ্মচারী-কল্যাণ-সাধন বিধি-ব্যবস্থার উন্নতি। তৃতীয়, রেলগাড়ীতে ও গাড়ী থামিবার ষাঁটিতে-ষাঁটিতে (Railway stations) তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদিগের সুখ-স্বাস্থ্য ও সুযোগ-সুবিধার উন্নতিতর ব্যবস্থা; এঞ্জিন গাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন; স্থলপথে ও বিমান-মার্গে পরিবহনের নিমিত্ত রেলগাড়ী-পরিচালক কৰ্ত্তৃপক্ষের কৰ্মপরিদর বৃদ্ধি (Extension of activities to other transport services); যুদ্ধবিমুক্ত সৈনিক ও অজ্ঞাত কৰ্মচারীদিগের রেলপথ-স্থিতিচালন-বিভাগ কক্ষে নিয়োগ এবং বর্তমানে যে সকল অঞ্চলে রেল-রাস্তা নাই সেই সকল স্থানে নতুন-নতুন রেলপথ নিৰ্মাণ ও রেলগাড়ী পরিচালনের এবং রেলরাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের আর্থিক ব্যবস্থা। উক্ত সভায় উপস্থিত কয়েক জন সদস্য ও পদস্থ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রাব লক্ষ্যপতি মিশ্র ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বর্তমানে ভারতীয় রেলপথে যে দুই প্রকার পরিসরের রেলরাস্তা আছে, অর্থাৎ Broad gauge (৫'৬") এবং Metre gauge (৪'৬") তাহাদের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। কারণ, তাহাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া একই প্রকারের পরিসর-যুক্ত রাস্তা প্রবর্তিত করিলে, অজ্ঞাত প্রকার পরিবহন অসুষ্ঠানের সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা বাহ্যত হইতে পারে।

তৃতীয়-শ্রেণী রেলযাত্রীর অসীম হৃৎ-হৃদশার কাহিনী সৰ্বজন-বিসিত, অথচ তাহারাই রেল-পরিচালনা আয়-ব্যয়ের গরিষ্ঠ অংশ সরবরাহ করে। যুদ্ধোত্তর তাহাদের যাত্রায়াতের ও পরিবহনের সুব্যবস্থা হইলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জনসাধারণ বধ্যবহী আদায় ও আনন্দলাভ করিবে। কিন্তু

গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে কোন কল্পনাই কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে না। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যদি এ-দেশে এঞ্জিন-গাড়ী মালগাড়ী ও যাত্রী-গাড়ী প্রভৃতি নিৰ্মাণের ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে বর্তমান যুদ্ধ সামরিক ও অ-সামরিক উভয় প্রয়োজনেই রেলপথ ও রেলগাড়ীর সাহায্যে সৈন্ত-সামন্ত, রসদ-পোষাক এবং যুদ্ধোপকরণ দ্রুতস্থলতার সহিত পরিবহন করিয়া রেলকৰ্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রা নিৰ্দ্ধারোপযোগী নিত্য-নৈমিত্তিক আহাৰ্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর অপ্রতিহত গত্যাত্য রক্ষা করিয়াও ভারতপ্রবাসী সৰ্ব শ্রেণীর লোকদিগকে অভাব-অনটন, দৃশ্য-দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষ-মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিত। ভারত সরকার সম্প্রতি যুদ্ধের অভিঘাতে, পাঁচ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, ভারতে সৰ্ব্বপ্রকার রেলগাড়ী প্রস্তুত করিবার আশু প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু এখনও বিলাতী কারখানাগুলির স্বার্থের হানি ঘটাবার ভয়ে কুণ্ঠিত। বৎসরে ২৩০খানি এঞ্জিন তাঁহারা ক্রয় করিবেন এবং পুনর বৎসর এই ক্রয়-নীতি চলিবে। কাঁচড়াপাড়ার কারখানা ৮০খানি যোগাইবে; একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ১০০খানি সরবরাহ করিবে এবং দক্ষিণ ভারতে একটি সরকারী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই প্রতিষ্ঠান বাকী ৫০খানির কিয়দংশ যোগান দিবে। অবশিষ্টগুলি বিলাত হইতে আমদানী করা হইবে। সমস্ত গাড়ীগুলিই যে সাগরপার হইতে আমদানী করা হইবে না, ইহাই আমাদের বর্তমানে একমাত্র সন্ধান।

এঞ্জিনগাড়ী, মালগাড়ী ও যাত্রীগাড়ী সরকারী তত্ত্বাবধানে সরকারী কারখানায় প্রস্তুত হইলে উত্তম হয়। কিন্তু সরকারী কারখানায় যাহা উৎপাদন করা বর্তমানে অসম্ভব, সেগুলি বিলাত হইতে আমদানী না করিয়া কোন কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই কাধ্যে অধিকার দিয়া ব্রতী করিলে ক্ষতি কি?

সম্প্রতি বোম্বাই-বরোদা ও সেন্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলপথের প্রধান কৰ্মচারী (General manager) ঘোষণা করিয়াছেন যে, এঞ্জিন নিৰ্মাণের নিমিত্ত রেল-কৰ্ত্তৃপক্ষ ভারতের কয়েকটি রেল-কারখানাকে শীঘ্রই এই কার্যের উপযোগী করিবেন। তিনি আশাস দিয়াছেন যে, অচিরে নিকট এবং দূরবর্তী প্রাচ্যের (Near and Far East) নিমিত্ত এঞ্জিন-গাড়ী তৈয়ারী করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হইবে। আশার কথা সন্দেহ নাই। বর্তমানে ভারতে বৎসরে ২২খানি মাত্র এঞ্জিন-গাড়ী প্রস্তুত হইতেছে।

যুদ্ধের অভিঘাতে ভারতীয় রেলপথের উপর যে কি প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে, তাহার একটু ইঙ্গিত দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রেলপথে যাত্রী ও মাল-চলারের পরিমাণ (Volume of traffic) ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ৮৬৬ পাথে (Broad gauge) ১৮,৬২০ মিলিয়ন টন মাইল হইতে ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৪,০৮৫ মিলিয়ন টন মাইলে উন্নীত হয় এবং সরুপথে (Metre gauge) ৩,১৬৫ মিলিয়ন টন মাইল হইতে ৩,৫৫০ মিলিয়ন টন মাইলে উর্দ্ধগতি লাভ করে। উভয় রেলপথে বোম্বাই-সুত মালগাড়ীর সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে অবশ্য এই

গাস ঘটে। অজান্তে কারশের মধ্যে প্রাধান্যঃ সামরিক বৃদ্ধি হেতু অ-সামরিক প্রয়োজনে অবনতি ঘটে। সামরিক র পরিসরেরও একটু ইঙ্গিত আমরা এখানে দিবা। ১১৪৩-৪৪ ভারতীয় রেলপথগুলি ৮০০০ সামরিক স্পেশাল ট্রেন করে। এই যাত্রায়েতে তাহার ৫৪,০০,০০০ মাইল পথ করে। গত আর্থিক বৎসরের শেষ হইতে এ পর্যন্ত এই স্পেশাল ট্রেনগুলি প্রতি মাসে অর্দ্ধ মিলিয়নেরও অধিক ল গতায়াত করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যে-পরিমাণে প্রয়োজন বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণে অ-সামরিক প্রয়োজন দ্রাড়ে। গত মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে

বানবাহন-মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সাগরপার হইতে এঞ্জিনের আমদানীর ফলে এ বৎসর যাত্রী ও মাল-পরিবহনে রেলপথের তৎপরতা বাড়িবে। তাহার কোন নিদর্শনই এখনও প্রকট নহে। সম্প্রতি উত্তর-আমেরিকা হইতে অনেকগুলি অধিকতর শক্তিশালী এঞ্জিন আসিয়াছে।

মোটের উপর রাজপথ ও রেলপথের দ্রুত ও দৃঢ় বিস্তার ব্যতীত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতি ও জাতীয় জনসাধারণের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি এবং সমগ্র দেশের ঐক্যবদ্ধি সম্ভবপর নহে। সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, সভা-সমিতিতে আলোচনার অন্ত নাই! কিন্তু তৎপরতার লক্ষণ তাদৃশ প্রকট নহে।

১ মাষ্টার

শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ

। সূর্য্য ক্রমশ পশ্চিমে ছেলিতেছিল।

। লর ইউ, পি স্কুলের দুটা হইয়া গেল। ছোট ছোট ছেলে-ডাছড়ি কথিয়া বাতির হইয়া আসিল। সকলের পিছনে ফুঃফুটে একটি মেয়ে তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনীর সহিত কি চলব আঁটিতে আঁটিতে ঘর পড়ে হাটিতেছিল।

কম্পাউন্ডের এক দিকে পাশাপাশি কয়েকটা মাটির ঘরে-তিন জন শিক্ষক বাস করেন। সে জায়গাটা অতিক্রম সময় ভারতী সঙ্গী সঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল,—এই, ঘরের কাছে ঘাবি? চ'না!

কাল কি ভাবিয়া লীলা কহিল,—আচ্ছা, চ'। সেই ভালো। আগে বাহ্যেদের বাগানে থেবে চুপি চুপি পেড়ে আনলেই হবে। [—এ্যা!]

মাছা।

। ঘরগুলিকে দূর হইতে গোঁহাল মনে হইলে আশ্চর্য্যের কিছু মার ঘরগুলি ছোট মাষ্টারের। ঘরে ছোট একটি জানালা কিছু সে দিকে যেটুকু আলো প্রবেশ করে, ঘরের অন্ধকার পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত নয়। একটা দড়ির খাটিকায় চেমা-ক কিশোর শুইয়া শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল।

ছোট মাসুসাই!

তোমরা বুঝি! এসো, এসো! এসো লীলা!

। ঘরে প্রবেশ করিল। লীলার সহিত ছোট মাষ্টারের ভাব নাই। সে বই-বগলে সজ্জিত হইয়া ঘরের মাঝখানে। রহিল। ভারতী অতি পরিচিতির মত ঘরে প্রবেশ করিয়া ইই-ক্রেটগুলা ওদিককার একটা নড়বেড় টেবিলের উপর নামাইয়া শূন্য-কপাট জানালার চটটা ভালো করিয়া গুটাইয়া দিল।

শোর হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। ভারতী কহিল, মাসুসাই!

কি!

আপনার কি হয়েছে? আজ ইস্কুলে গেলেন না যে?

কিছু নয়। এমনি একটু অর।

রতী তাহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। ঐটুকু ঘের মধ্যে গৃহীণীপনার অঙ্গভঙ্গিগুলা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

। র কপালে ও মাথায় ছোট ছোট হাত ছ'খানা বারকয়েক

বুলাইয়া গম্ভীর মুখে কহিল,—হুঁ! অরই তো। বেশ অর। অর হবে না? যে রাত করে আপনি খান। বলিয়া সহসা সঙ্গিনীর দিকে চোখ ফিরাইয়া বসিল,—বোস রে লীলা। তুই তো আচ্ছা?

কিশোর হাসিয়া কহিল,—কাল যাবোঁ খন। তোমাদের পড়াগুলো হয়েছিল তো?

ভারতী সহসা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিশোরের হাতখানা সম্ভারে নাড়িয়া লীলাকে দেখাইয়া কহিল,—জানেন ছোট মাসুসাই, লীলা আজকে 'সংস্কার' বানান পাঠেনি তাই বড় মাষ্টার ওকে বকলেন, একেবারে বেশিতে গাঁড় করিয়ে দিলে। হি হি।

লীলা লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। কিশোর কহিল,—আচ্ছা গাঁড়াও, তোমার হাসি বার করচি। কাল তোমাকেও ওমনি গাঁড় করিয়ে দেবো। আর লীলা, তুমিও হাসবে তাই দেখে। বুঝছ?

দিন-শেষের আলো ঘীরে ঘীরে দ্বান হইয়া আসিতেছিল। রাগেদের বাগানে কি এক অজ্ঞাত বস্তুর আকর্ষণে দুই সখী চকল হইয়া উঠিতেছিল। ভারতী আরও কিছুক্ষণ কিশোরের বিছানার বসিয়া এক সময় বই-হাতে উঠিয়া গাঁড়াইল। কহিল,—আজ বাড়ি মাসুসাই।

—আচ্ছা।

—রাতিরে কি থাকেন!—সাবু তো?

—হ্যাঁ।

ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া ভারতী কিশোরের নিকটে সরিয়া আসিল। কহিল,—মাকে করে দিতে বলবো—কেমন, এ্যা? বিধু দিয়ে যাবে এখন।

কিশোর প্রতিবাদ করিল না। ঘরের বাহিরে ছুট জনে কি পরামর্শ করিল। ভারতী পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া চুপি চুপি কহিল,—ছোট মাসুসাই!

—কি!

—চুপ—আম্বে। পেয়ারা থাকেন?

—কোথায় পাবো?

—রাগেদের বাগানে। চুপি চুপি পেড়ে আনবো—কেউ দেখতে পাবে না। থাকেন তো?

কিশোর কহিল,—আমি না তোমার মাঠের মশাই! সে দিন কি পড়লে? 'না বলিয়া কাহারও জিনিষ লইলে'—তাকে কি বলে?

ভারতীর মুখ শুকাইয়া গেল। কহিল,—তবে আর কি হবে। আমরা যাছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা শোনো। নিয়ে এসো—বেশী না কিন্তু।

ভারতী বিমিত্র মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মস্তক-হেলনে সম্মতি জানাইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

বহর দুই পূর্বে কিশোর এক দিন অসহায় অবস্থায় যখন বাসিন্দার গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছিল, ভারতীই সে সময়ে তাকে প্রথম আবিষ্কার করে। রাস্তার বহরস্বত্ব বাগানে শিশু-কাল হইতে ভারতীর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডূরে শাড়ীর আঁচল ভরিয়া সে দিন সে কি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিল, আসিবার পথে পূজামণ্ডপে এক জন অপরিচিত নিমিত্ত ছেলেকে দেখিয়া সে কৌতুক স্বরূপ করিতে পারে নাই—শঙ্কিত পায়ে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোটটি গত দুই দিন হইতে অত্যন্ত ছিল, আঁচলের ফল-মূল ভারতী তাকে খাটতে দিল। খামখেয়ালী নানা প্রসঙ্গে তাহাকে আরও কিছুকণ বিবর্ত করিয়া অবশেষে ভারতী তাকে একেবারে মায়ের কাছে টানিয়া আনিল। ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে ভারতীর বাবা এক-কালে মোড়লী করিয়া গিয়াছেন—ভারতীর প্রৌঢ় জঠরভূতা দাদা এখন তাঁহার স্থানে বসিয়াছেন। কিশোর মাটিক পাশ করিয়াছিল—ভারতীর মা তাহাকে বলিয়া কহিয়া ছেলেটাকে স্থলের কাছে লাগাইয়া দেন। সেই হইতে ছোট মাষ্টারের পদে সে বহাল হইয়া এইখানে বহিয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া আরও দু'চার বছর কাটিল। ভারতী এখন ব্রজ ছাড়াই রঙীন শাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে, মাথার টানা বিহীন ঘুচাইয়া খোঁপা বাঁধিয়া স্থলে আসে। ইউ, পি স্থলের চতুর্থ শ্রেণীতে সে এবার প্রোমোশন পাইয়াছে। আগের চেয়ে এখন তাহার আচরণ অনেকটা সম্মত হইলেও কিশোরের কাছে তাহার পরিবর্তন হয় নাই। তাহাদের শ্রেণীতে কিশোর পড়ায় না—কিন্তু এ জন্ম তাহাদের আলাপে বাধা পড়ে নাই। ভারতী কেমন করিয়া বুঝিয়াছিল, স্থলের অঙ্ক সব ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে এই তন্ত্রণ মাষ্টারটির উপর; তাহার দাবীর মাত্রা একটু বেশী। শৈশব হইতেই তাহার। এমনি—তাই কাহারও চোখে ইহা বিসদৃশ মনে হয় নাই।

কয়েক দিন হইতে স্থল-প্রাঙ্গণে ভারতীর দেখা মিলিতেছে না। ভারতীর ভাইপো সাত বছরের বাবলু স্থলে নিয়ন্ত্রণীতে কিশোরের কাছে পড়ে। এক দিন ছুটির পর কিশোর তাকে ঘরে আনিয়া লজ্জল চকোলেট দিয়া আপ্যায়িত করিয়া এক সময় কহিল,—হাঁ যে বাবলু, তোব পিসিমার কি হয়েছে রে?

—কিছু হয়নি তো মাসুদাই!

—ইহুলে আসে না যে।

হাস্তের চকোলেটটা চুম্বিতে চুম্বিতে ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বাবলু কহিল,—পিসিমা আর আসবে না মাসুদাই।

কিশোর বিশ্বাস করিল না। কহিল,—কেন রে? ব্যাং, ভূট জানিস না।

বাবলু চোখ বড় করিয়া কহিল,—হাঁ মাসুদাই! দিদমা বলছিল। বলিয়া কিশোরের সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল,—আব একটা মি—ন!

কিশোর হাসিয়া তাহার পকেটে আরো কয়েকটা লজ্জল ভুজিয়া দিল। বাবলু মুহু সাবধানী কর্তে কহিল,—আমি কাল পড়ছিলুম—দিদমা বাগাকে বলছিল।

—কি বলছিল রে?

—বলছিলো, পিসিমা আর আসবে না। বড় হয়ে গেছে কি না—তাই বলছিল, ও এবার বাড়ীতে পড়বে! আমি যাই মাসুদাই—ওরা খেলতে।

কিশোর আর একবার তাকে কোলের কাছে আকর্ষণ করিয়া ছাড়াইয়া দিল। কহিল,—আচ্ছা যা। রোজ আসবি, বুখলি! লজ্জল দেব।

—আচ্ছা। বলিয়া বাবলু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিশোর অস্তমন্ডল হইয়া পড়িল। অনেককণ স্থলের ছুটি হইয়াছে। দীর্ঘশীর্ণ গাছজলার আড়ালে অন্তঃগামী সূর্যের আলো পৃথিবী বাড়া করিয়া একটু একটু করিয়া নিভিয়া আসিতেছিল। স্থলের ময়দানে ছেলেদের উচ্চ বাকবিতণ্ডা শাস্ত হইয়া তাহাদের খেলা শুরু হইয়াছে।

বৈকালিক ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হেডমাষ্টার মশাই কিশোরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—কই হে, যাবে না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চলুন। বলিয়া কিশোর সেই বেশেই বাহির হইয়া আসিল।

গ্রামের শেষে পোড়ো ময়লানের পায়ে-চলা সড় পথে দুই জনে হাঁটিতেছিল। দেখিলে মনে হয় না যে উভয়েই এঁরা শিক্ষক। প্রাচীন মাষ্টারের পিছনে কিশোরকে অগ্রগত চাত্র বলিয়াই ভ্রম হইবার কথা। হেডমাষ্টার কথায় কথায় কহিলেন,—শুনচ হে, ভারতীকে ওরা স্থল ছাড়িয়ে দিলে।

কিশোর জবাব দিল না। বাবলুর কয়েকটা কথার আজ সহসা তাহার মনে, হইল, ভারতী সত্যি বড় হইয়াছে। কেবল তাহার চোখে এত দিন সেটা ধরা পড়ে নাই। পল্লী-অঞ্চলের তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে—বড় হইবার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। এবার কোন দিন শত্রু ও উলুখনি শুনিলেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

তাহার মুখের দিকে না চাতিয়া অগ্রগামী হেডমাষ্টার বলিতে লাগিলেন,—মেয়েটা বেশ ভালো ছিল হে! ভেবেছিলাম, ওকে দিয়েই এবার স্থলে একটা বৃত্তি পাইয়ে দেব। বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে চলিবার পর কহিলেন,—লীলার গুণ আমার ভরসা নেই, বুঝেছ! ছেলেগুলো তো সব হীন্দা—মেয়েগুলোর রেণ বেশ সার্প। দেখি, ওকে একটু মেজাজে ঘাবে।

কয়েক দিন পরে বাবলু আসিয়া কহিল,—মাসুদাই, দিদমা আপনাকে যেতে বলেছে।

কিশোরের বুকের কাঁপিয়া উঠিল। গলার স্বরও বেশ সহজ হইল না। কহিল,—আচ্ছা, সন্দের সময় যাবো—যদি।

ভারতীয় বা অভ্যাস এক কালে ম্প ছিল। এখন সে ম্প
গর দীপ্তি আসিয়া তাহাকে বহিষাখিত করিয়াছে। রাগা ঘরের
র বসিয়া চা তৈরী করিতেছিলেন, কিশোরকে কাছে বসাইয়া
ইলেন। এ কথা সে কথার পর এক সময় কহিলেন,—বোধ হয়
বাবা, ভারতীকে ইচ্ছা ছাড়িয়ে দেওয়া হলো।

মশার খড় নাচিয়া জানাইল, সে জানে।

—হ্যাঁ। পেরন্ত ঘরের মেয়ে, বয়স হয়েছে। ঐ ঢের—কি বলে।

এইবার এখন ভালোর-ভালোর সুপাত্রে দিতে পারলেই আমি
হই।

পার চূপ করিয়া রহিল। অভয়া হাসিয়া কহিলেন,—
তাহাকে আমি ছাড়বো না বাবা।

পর শুক মুখ তুলিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন,—
থাকে, তুমি বোজ হুঁবেলা পড়তে এসো বাবা। কেমন,
!!

পড়িয়া কিশোর কহিল—আচ্ছা।

না আসিলেও কিশোর সন্ধ্যার সময় এক বেলা করিয়া
পড়িয়া বাইত। লোকের মুখে নিজে বয়সের কথা
রতী এবার বোধ করি একটু সচেতন হইয়াছে।
অশেফাকৃত নরম করিয়া সে এখন কথা বলে।
চাহি বড় একটা শুনা যায় না—কিশোরের গায়ে
। কথা বলার অভ্যাস তাহার একটু একটু করিয়া কমিয়া

ভাবে কিশোরের আর ভালো লাগিল না।

মাসের পর এক দিন সে ম্প করিয়া বলিয়া আসিল, সে
ক পড়াইতে পারিবে না। কথাটা শুনিয়া প্রথমে অনেকে
ছিল, কিন্তু বয়স। কুমারী মেয়ে বলিয়া এ পক্ষে কথাটা
টি হইল না। অভয়া তাহাকে আড়ালে কারণ জিজ্ঞাসা
র কি বলিয়াছিল, সে কথা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই।
র আগে অভয়া কিশোরকে বার-বার বলিয়াছেন, সে
ঝে এ বাড়ী আসিতে তুলিয়া না যায়।

শোর আর যায় নাই।

। আগের দিন ভারতী পড়বার মাঝে সহসা মুখ তুলিয়া
ঢাকিল,—ছোট মাসুদাই।

মুখ তুলিল। ভারতীর মুখে কি একটা সজ্ঞাবনার
ছে। পরিপুষ্ট কপোলের উপর গোলাপী রেখার প্রতি
হয়া কহিল,—কেন?

আর পড়াতে আসবেন না?

কিত চোখ ছোট হইয়া আসিল। কহিল,—কেন,
করেছি শুনি?

শুক কঠে হাসিল। কহিল,—বোধ আবার কি!
লখাপড়া শিখিনি। তুমি এবার বড় মাষ্টারের কাছে

সো বইগুলো সপক্ষে বন্ধ করিয়া উঠিয়া পাড়াইল।
খু, না ছাই! আশিস্যার আসবার ইচ্ছে নেই, তাই

সে দিন গ্রামের কাঁচা পথে গাছের কাঁকে কাঁকে টাসের আসো
খেলা করিতেছিল। অগ্নে বুদ্ধবীরে সন্নিবীর প্রতি নিশাচর
পাখীর ব্যাকুল ইঙ্গিত বার-বার বর্ষ হইয়া কিরিতেছিল। কিশোর
অন্তরনে বহু রাত্রি পঞ্চাঙ্গ পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরে কিরিল এক
তাহার খাবার তেমনি চাকা পড়িয়া রহিল; আর শেষ রাত্রি পঞ্চাঙ্গ
সে ঘুমাইতে পারে নাই।

আরও দুই বৎসর কাটিয়াছে। গ্রামের পাল-পার্কণ পূজা-আর্চা
ও যাত্রা-খিয়েটারের উপলক্ষ ছাড়া কিশোর ভারতীকে আর বড়
একটা দেখিতে পায় না। ভারতীর বিবাহের সখ্য আসিতেছে,—
এ কথা বাবলু তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ঘর বর অপছন্দ
হইবার কারণেই বোধ করি সেটা এখনও ঘটিয়া উঠে নাই।
এ গ্রামে আসিবার পর কিশোর এক দিনের তত্ত্ব বাহিরে কোথাও
যায় নাই। বৎসরের দুইটা লখা ছুটীও সে বরাবর এইখানে
কাটাইয়াছে। গ্রামের লোকেরা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিচ্ছ,
—আহা, বেচারার তিন কুলে কেউ নাই গো!

কলিকাতার কোন একটা ‘অপেরা’ পুজার আগে এই অকলে
আসিয়া পড়িল। অল্প বয়ের মত এবার গ্রামের হল না হইয়া
তাহাদেরই গান হইবার কথা। এ জন্ত গ্রামখানা এক পক্ষ আসে
হইতে প্রতীক্ষিত দিনের আশায় ঢেল হইয়া উঠিয়াছে। কিশোরের
তুহিত অন্তর এই সব উপলক্ষগুলার আশার উদ্গীর হইয়া অশেষ
করিত, কিন্তু বাহিরে কোন দিন সে কিছু প্রকাশ করে নাই।

মেয়ে-মহলের তলারক করিবার সময় বার-কয়েক ভারতীর সহিত
তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল,—কিন্তু প্রতিবারই ভারতী চোখ ঘুরাইয়া
লইয়াছে। সে রাতে কিশোর অশ্রমক হইয়া সারা রাত গোলমাল
খামাইয়া শ্রোতাদের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যাত্রার এই
জমাটি আসর এবং সমবেত জনতার উপস্থিতি তাহার হৃদোন্মেষ
উদাস দৃষ্টি হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

স্থলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া সে দিন ছুটি হইয়া গেল।

বাবলু কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া চুপি চুপি কিশোরকে
জানাইয়া গিয়াছে, কলিকাতার কোন ধনিগৃহে তাহার পিসিমার
আজ বিবাহ।

বারোটোর পরেই স্থল-প্রাক্ষণ আজ নিমিত্ত হইয়া গিয়াছে।
ঐপ্রহরের সময় স্থলের আর দুই জন শিক্ষক তত্ত্বীভূত। শুটাইয়া রঙনা
হইয়াছেন। গ্রামের শেষে কাঁকা স্থলঘরের একটি দুজ কুটারে সারাটা
দুপুর কিশোর একাকী কেবল ছটফট করিয়া কাটাইয়াছে। সকালে
ভারতীর দাদা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন, অভয়াও বিশেষ
করিয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কিশোরের এখনও বাওয়া হয় নাই।

সকাল হইতে ভারতীর বিবাহের বাজনা বাজিতেছে।
বিছানায় শুইয়া প্রভাতের সে বাঁশীর সুরে কিশোরের মন এ-রাজ্য
ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সারা দিন তাহার অন্তর কেমন
মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। যনের মাঝে কি
এক অশান্তির কাঁটা প্রতিনিবর্ত তাহাকে সকল কথার বিমূখ করিয়া
রাখিল। সারা দুপুর সে দড়ির খাটিয়ায় পড়িয়া জানালার বাহিরে

এমন তাহার মাঝে মাঝে হয়। মনটা যেন কি এক অনাবিক্ত বস্তুর অভাবে সহসা কারণহীন অশান্তিতে কঁদিয়া মরে—অথচ কি সে জিনিষ, কেন এমন হয়, কিশোর আজও বুঝিয়া উঠে নাই। তাহাদের প্রায়ে ছোটবেলায় অনেক মেয়ে ববাহে তাহার মন এমনি উল্লাস হইয়া বাইত—কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা বোধ করি তাহাদের হইতে কিছু স্বতন্ত্র।

ভারতীর মুখখানা তাহার মনে পড়িল। অনেক দিন তাহাকে নিকটে সামনাসামনি দেখে নাই। এখন সে কিরূপ হইয়াছে, বিবাহের দিনে সজ্জা তাহার মুখখানিকে কেমন রাঙাইয়া দিয়াছে, কোন্ রঙের কোন্ শাড়ীটি পরিয়া এখন সে কি করিতেছে, এসব আজগুবি চিন্তার অন্তর প্রয়াসে কিশোর কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাটাইল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহার কিছুই ভালো লাগিল না।

সহসা মনে হইল, এ সময় একবার ভারতীর দেখা পাইলে বেশ হইত। আর কিছু না—শুধু একবার তাহাকে নিকটে দেখিয়া সাধারণ হুঁ-চারিটা কথা বলিলও যেন সে তৃপ্ত পাইত! এক সময় সে তাহার পুতান বান্ধ হইতে খানকতক বই বাছিয়া রাখিল। কিতোর অভাবে কাপড়ের লাল পাড় দিয়া সেগুলো বাঁধিল; একখানা সাদা কাগজে কি লিখিয়া সেটা উপরে রাখিয়া স্থির করিল,—অভয়ার দায়বৎ এক সময়ে সে এগুলো তাহাকে দিয়া আসিবে।

কিশোরের আজ ভালো করিয়া খাওয়া হয় নাই। প্রায়ের যে প্রাক্কণটি মাষ্টারদের রান্না করিত, তাহাদের খাওয়াইয়া সে আজ সকাল সকাল বিনায় হইয়াছে। কিশোরের আহার্য ঢাকা দেওয়া ছিল। কিন্তু অসময়ে সে আর মুখে তোলা গেল না।

এমনি করিয়া দুপুর অতিক্রান্ত হইয়া বেলা গড়াইয়া আসিল। বিজ্ঞ প্রান্তরে লম্বমান বৃক্ষছায়ার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে এক সময় সে অমুভব করিল, এখানে আর থাকিতে পারিবে না। বহু দিন কোথাও যাওয়া হয় নাই, এই জুই বোধ হয় মনটা এমন চাপিয়া বসিয়াছে। বহু দিন পরে আবার তাহার মনে কোন্ এক স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর কথা জাগিয়া তাহার প্রবাসী তৃষ্ণার্ত অন্তরকে নিরন্তর সেকদিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৈকালের দিকে এক সময় সে ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং মাঠে মাঠে খানিক বেড়াইয়া ফিরবার পথে পিয়ারী বাগদীর গন্ধর গাড়ীখানা ভাড়া করিয়া আসিল।

স্কুল-গৃহ হইতে ভারতীদের পু্যানে আমলের ত্রিতল বাড়ীটা গ্রামের শাখাবিরল গাছপালার কঁকে-কঁকে দেখা যাইত। সন্ধ্যার পরে তাহাদের ছাদে উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং রাত্রির অন্ধকার বহু মাছুষের আনন্দ-কাকলীতে, বাজে ও গানে মুগ্ধ হইয়া উঠিল।

কিশোর অন্ধকার দাওয়ার সন্ধ্যা হইতে বহু রাত পর্যন্ত সে দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! এত লোকের মাঝে তাহার অমুপস্থিতি বোধ করি কেহই লক্ষ্য করে নাই। কিশোর উদ্গ্রাহব নয়নে প্রায়ের অন্ধকার পথে দিকে চাহিয়া ছিল; মাঝে মাঝে পথে আলো দেখিলেই আশায় অধীর হইতে লাগিল,—কিন্তু কেহই আসিল না। এমনি করিয়া রাত্রি বাড়িয়া চলিল।

মিলন-বাগিচার ব্যাকুল স্রবের শেষ মূর্ত্তনা কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটু আগে চূপ করিয়াছে। সন্ধ্যার পরেই লগ্ন ছিল। অল্প রাত্রের

মধ্যেই সমস্ত সমাধা হইয়া অত বড় বাড়ীটার মধ্যে এখন মাত্র দুই-চারিটি মাছুষের কণ্ঠস্বর জাগিয়া আছে।

মধ্যরাত্রি উত্তর্ণ-প্রায়। ঘরের মধ্যে রান আলোকের সম্মুখে সেই বইগুলো কইয়া কিশোর চূপ করিয়া বসিয়াছিল। সেগুলো আর দেওয়া হইল না। পিছনের দিকে বাহিরে পিয়ারী তাহার গাড়ী হাকিব করিয়াছে। কিশোরের ভাঙ্গা স্মার্টকেস ও গুটানো বিড়ানাটা সে এই একটু আগে লইয়া গিয়াছে। রিক্ত ঘরখানায় শুধু সে চূপ করিয়া বসিয়াছিল।

কিশোর আর একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কুকপক্ষের শেষ শ্রেহের চাঁদ উঠিতে আর বিলম্ব নাই। সারা গ্রামখানা সমস্ত দিনব্যাপী অবিশ্রান্ত কলরবের পর একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের বৃক প্রোতাহার মত ঐ বৃহৎ বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, ইহারই এক সুসজ্জিত কক্ষে কোন্ এক অজ্ঞাত রূপবান যুবকের বাহু আলিঙ্গনে ভারতী হয়তো অগাধ শান্তিতে নিদ্রিত। এখটা নিশ্বাস সে কিছুতেই বোধ করিতে পারিল না! আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিল—বাহিরে পিয়ারীর বাধাছাঁদা তখনও শেষ হয় নাই।

আলো নিবাইয়া কিশোর অন্ধকার ঘরে খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল। পিয়ারীর হইলেই সে বাহির হইয়া আসিবে!

পিছনে মাথার দিককার জানালাটা একবার নড়িয়া উঠিতে সে ফিরিয়া চাহিল। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। কহিল,—কে?

অস্তবাল হইতে কে বলিল,—ছোট মাসুদাই!

কিশোর চমকিয়া উঠিল।—কে? ভারতী?

—হ্যাঁ। এখানে একবারটি আসুন তো!

পিছনের দিকে ভারতী জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিশোর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এমনটা সে আশা করে নাই। তাই অতি অপ্রত্যাশিতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার বৃক কাঁপিতে লাগিল, গলা শুকাইয়া আসিল। কহিল,—এত রাত্রে তুমি কেমন করে এলে ভারতী?

ভারতী নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিশোর চলমা খুলিয়া চোখ দুইটা ভালো করিয়া মুছিল। কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না, এমনি সময়ে এ ভাবে ভারতী এখানে আসিতে পারে! কুকপক্ষের অধিক রাত্রের চাঁদ এইবার উঠি-উঠি করিতেছিল। তাহার অস্পষ্ট আলোয় কিশোর দেখিল, ভারতী অনেকখানি দীর্ঘ হইয়াছে। অঙ্গের নূতন শাড়ীটার সে যেন আবাল্যের খোলস ছাড়িয়া সহসা নূতন দিনে নূতন বেশে রূপান্তরিত হইয়াছে! কহিল,—একলা এসেচ?

—হ্যাঁ।

শঙ্কিত মুহু কণ্ঠে কিশোর কহিল,—আচ্ছা! সাহস তো! এত রাত্রে এমন করে কি একলা আসতে হয়!

কিন্তু এত কথার সময় ছিল না। স্কুল-প্রাঙ্গণ হইতে পিয়ারী চাঁৎকার করিয়া ডাকিল—ম্যাটোর মুশায়...

ঘরের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া কিশোর জবাব দিল,—বাই পেয়ারী। তোমার হয়ে গেল না কি রে?

সে ভাবিল, মাষ্টার ঘরে আছে। কহিল—গরুকে দুটো ছানি দিই, আপনি এসো ততক্ষণ।

কিশোর ভারতীর দিকে চাহিল। তাহার অঙ্গে চাকলা নাই। বহু দিন পরে আজ এই নিম্নলিখিত স্তব্ধ প্রেমের প্রান্তে উদ্ভুক্ত আকাশের নীচে উজ্জ্বল পাশাপাশি আসিয়াছে। এখনই এ মায়া মিলাইবে মনে করিয়া কিশোরের সারা অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। অমূল্য করেবটি হুহুর্ভ! কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না। তাহার চোখের দিকে চাহিয়া আর এক বার পূর্বের ভারতীকে কিশোর খুঁজিতে চাহিল—কিন্তু সে মিলাইয়া গিয়াছে। ভারতী ডাকিল,—মাষ্টার মশাই!

—কি?

অগকাল চুপ করিয়া সে কহিল,—আপনি যাবেন ভেবেছিলাম। গেলেন না, তাই—

—কি তাই, ভারতী?

—তাই যাবার আগে একবার প্রণাম করতে এলাম।

—ও। আচ্ছা। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।

অল্প পরেই সে বাঁধা বইগুলো আনিয়া ভারতীর হাতে দিল। কহিল,—গুডবিনে তোমাকে দিলাম ভারতী। তুমি পোড়ো।

ভারতী কাম্পিত হস্তে সেগুলো লইয়া কিশোরের দিকে একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দেখা গেল না—অন্ধুরের আলোয় চশমার কাচ দুইটা একবার ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল। পর-হৃদয়েই লেখা কাগজখানার উপর সে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিশোর কহিল,—চাঁদের আলোর তো পড়া যাবে না ভারতী। বাড়ীতে গিয়ে পোড়ো।

সে কথা র জবাব না দিয়া ভারতী ডাকিল,—মাষ্টার মশাই!

—কি ভারতী!

—ওসব কি? আপনি কোথায় যাচ্ছেন মাষ্টার মশাই?

কি ভাবিয়া কিশোর কহিল,—বাড়ী যাচ্ছি। তুমি তো জানো, বহু দিন যাইনি।

—আপনার বাড়ীর কথা কই শুনিনি তো। আপনি তো কোন দিন আমায় বলেননি! ভারতীর বস্তুর এবার অনেক সুহু হইয়া আসিল।

তক হাসিয়া কিশোর কহিল,—জন্ম যখন নিয়েছি,—বাড়ী থাকবে বৈ কি ভারতী! কিন্তু এবার তুমি যাও—রাত হয়েছে। কেউ যদি দেখে বেলে, কেহে দ্বারদ্বার একদেখ হবে।

ভারতী জবাব দিল না। কিশোর কহিল,—যাও, এমন করে আসা তোমার উচিত হয়নি।

ভারতী কহিল,—আপনি আবার আসবেন?

কিশোর ভাবিয়া কহিল,—ঠিক বলতে পারি না। দেখি।

পিয়ারীর বস্ত্র শুনা গেল,—কই, আশুন বাবু, ভোর হয়ে গিয়েছে।

—বাই বাবা, দাঁড়া। দেখি, আর কিছু পড়ে রইল না কি।

বলিয়া ভারতীর দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কিশোর কহিল,

—আর সময় নেই ভারতী, আমি এবার বাই। তুমি বড় দেয়ীতে এসে। থাক্‌গে—তুমি যাও এবার, রাত শেষ হয়ে এল।

ভারতী তাহার পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাইবার জন্ত ফিরিতেই সহসা কিশোর তাহার পিছনে আসিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—ভারতী!

ভারতী দাঁড়াইল। কিন্তু ফিরিল না। কিশোর হোচট খাইয়া যেন সামলাইয়া লইল। নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল,—এত রাতে একা গিয়ে কাজ নেই। চলো, এটুকু তোমায় এগিয়ে দি। বলিয়া তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাহার পিছনে পিছনে স্থলের পথে আসিয়া পড়িল। পিয়ারীর অনবদ্যে লঠন সম্মুখে রাখিয়া বসিয়াছিল, তাহাকে কহিল,—তুই ততক্ষণ আস্তে আস্তে এগো রে। সেক্রেটারী মশাইকে আমি চট করে স্থলের চাবিটা দিয়ে আসি। তুই চ, ওই মোড়ে তাকে আমি ধরবো।

প্রেমের ধূলি-সামান্দ্র পথে ভারতীর পিছনে পিছনে কিশোর নামিয়া আসিল। স্তব্ধ স্থল-গৃহ পড়িয়া রহিল, সম্মুখের দ্বার জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট পথের আভাস যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া সজ্জত করিল। ভারতী একটাও কথা বলিল না—যেন অতি ক্লান্ত পদক্ষেপে সে দুর্কলের মত পথ চলিতেছে! হেমন্তের মধ্যে শেখরাজির শির, শিরে ঠাণ্ডা বাতাস অল্প অল্প বহিতে শুরু করিয়াছে। রাস্তার পাশে ডোবার উপর কৃষ্ণা-পড়া বাঁশঝাড়টার ডাল চাঁদের আলো পড়িয়া সে জায়গাটা যেন অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। রাস্তার মোড়ে আসিয়া কিশোর কহিল,—এবার তুমি যাও ভারতী।

ভারতী আসিল, একবার একটু ইতস্ততঃ করিল বোধ হয়,—কিন্তু পরক্ষণেই সে অঙ্গস পদে ঘুরে ঘুরে চলিতে লাগিল। কিশোর তাহার দিকে চাহিয়া রহিল,—তল্ল পরেই প্রেমের পথে সে দ্বার আলোয় মিলিয়া গেল,—আর দেখা গেল না।

দীড়িত চক্ষু ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কিশোর দেখিল, নিকটের তারাকলাকে নিশ্চয় করিয়া চাঁদ গাভের আড়াল ছাড়িয়া মাথার উপর উঁকি দিতেছে। শির, শিরে বাতাসের কোন ব্যতিক্রম নাই। চারি দিকে নিভ্রাময় প্রকৃতিও অচঞ্চল! অসীম সূক্তের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, কয়েক হুহুর্ভ একটা মৌচুম্বলের মধ্যে কাটাইয়া এইমাত্র তাহার ঘুম ভাঙিল।

পিছনে গাড়ী লইয়া পিয়ারী আসিয়া পড়িল। কহিল,—কই গেলেননি যে?

—না। ভাবলাম, আর দরকার নেই। ই্যা, কত রাত হল বল দেখি? গাড়ীটা ধরতে পারবি তো রে?

বলদের ল্যাজ মালিয়া পিয়ারী কহিল,—থুব পারবো বাবু, আপনি উঠে এসো।

কিশোর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। স্থলগৃহ পিছনের বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে রহিয়া গেল।

যাওয়া আসা

অকস্মে যাওয়ার কালে মনে চয়,

জীবন হয় না আজই শেষ?

আমারি কপালে লেখা যত কী

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বাড়ীতে আসার কালে ভুলি সব—

তখন কোথায় যার শোচনা!

এমনি মায়ার সেথা কলরব—

প্রথম অধ্যায়

৬

মূল:—‘হে দৈত্যগণ। তোমাদিগের শোকের (দৈত্বেয় বা ক্রোধের) (কোন) প্রয়োজন নাই। হে অনবগণ। বিবাহ ত্যাগ কর’।

আপনাদিগের ও দেবতাদিগের শুভাত্ত-বিকল্পক—১১০৫।

কর্মভাবাব্যাপেক্ষী নাট্যবেদ মৎকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।

সংক্ৰান্ত:—১০৫। অভিনব বলিয়াছেন যে, দৈত্যগণের পক্ষে এইরূপ মন্তব্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। উচিত নহে—ইহা ক্ষুদ্রত মিত্যাজ্ঞান-দ্বারা আদোষিত সূর্য হইতে উৎপন্ন ত্বয়ের দ্বারা দ্ব্যস্তিত-জনিত। মন্তব্য—ক্রোধ ও দৈত্ব—এস্থলে উভয় অর্থই সুস্পষ্ট প্রযোজ্য।

দৈত্যগণের অন্তর্ভুক্তি লোকপ্রসিদ্ধ—অতএব তাহারা পরাজিত হউক, আর দেবগণের পক্ষে উহার অজ্ঞতা (অর্থাৎ জ্ঞয়) হউক—ইহাই নাট্যের মুখ্য তাৎপর্য্য নহে (১)। অর্থাৎ দৈত্যগণ অন্তর্ভুক্তি প্ৰিন্সিপাল পক্ষের পরাজয় নাট্যে প্রদর্শনীয়। আর দেবগণ তদ্বিরোধিত (অর্থাৎ শুভকারী) বলিয়া তাঁহাদিগের জয় নাট্যে প্রদর্শন করিতে ইবে—এইরূপ কোন নিগূঢ় পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য লইয়া বর্তমান নাট্য-রচনা করা হয় নাই। বস্তুতঃ, যদি তাহা হইত, তাহা হইলেও ইহা দৈত্যগণের মন্তব্য উৎপন্ন হইতে পারিত। তাহা হইলে নাট্যের স্বার্থ উদ্দেশ্য কি—এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, শুভকারী ভাবের ভোগ করে ও অন্তর্ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত ভোগ করে, ইহাই সামাজিক নিয়ম—আর ইহাই নাট্যে প্রদর্শনীয় তাৎপর্য্য। এ কারণে নিম্নোক্ত বলা চলে যে—নাট্যমধ্যে দেবতা বা দৈত্য—যে কোন সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে অথবা পক্ষপাত অথবা বিপক্ষে অথবা কেবল নাই। অতএব দৈত্যগণেরও স্বার্থাদির প্রতি যে সংপ্রতিষ্ঠা দান করণ দেখা যায়, তাহা তাঁহাদিগের শুভকর্মেরই বিপাক পরিণাম-ফল) বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভবতাং দেবতানাং তু শুভাত্ত-বিকল্পক—পাঠান্তর—ভবতাং দেবতানাং ৫০০ (কান্ধী)—এই পাঠটিই ভাল বলিয়া উহার প্রবাদ প্রস্তুত হইল। ভবতাং—আপনাদিগের। স্রোতটির প্রথমার্ধে ক্রোধের বিবাদ ত্যাগ কর—বলা হইয়াছে। আর দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে—আপনাদিগের ও দেবগণের—। ‘তোমরা’ ও ‘আপনাদিগের’—আপাততঃ একই অঙ্গুষ্ঠ হইলেও যখন ভাবা যায় যে, দৈত্যগণকে গামবালা-প্রয়োগে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন আর এ অঙ্গুষ্ঠিত বোঝের বলিয়া মনে হয় না। এই অঙ্গুষ্ঠিত অর্থ হইবে—‘আপনাদিগের শুভাত্ত-বিকল্পক ও দেবগণের শুভাত্ত-বিকল্পক’।

ভবতাং—আপনাদিগের—দৈত্যগণের প্রতি এ সম্বোধন। কথা বাইতেছে যে, নাট্যবেদ দৈত্যগণেরও শুভকল্পক—আবার শুভকল্পক ত বটেই। পক্ষান্তরে, ইহা (নাট্যবেদ) দেবগণের যেমন শুভকল্পক তেমনই অন্তর্ভুক্তকও নিশ্চয়ই।

প্রথমেই ‘ভবতাং’ (আপনাদিগের) বলিয়া দৈত্যগণের উদ্দেশ্য পূর্বক তাহাদিগেরও সচিত্র তত্ত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করার কথা বাইতেছে যে, ক্রোধের কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাত নাই; কারণ, তাঁহার সৃষ্ট নাট্যবেদ যেমন দৈত্যগণের শুভবিষয়ক, তেমনই দেবগণেরও অন্তর্ভুক্ত-বিষয়ক হইতে পারে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫)।

শুভাত্ত-বিকল্পক—শুভ ৫র্থ; অন্তর্ভুক্ত অর্থ। শুভ বা অর্থের ফল সুখ ও অন্তর্ভুক্ত বা অর্থের ফল দুঃখ। নাট্যবেদ সুখঃ-ফলক শুভাত্ত (অর্থাৎ স্বার্থস্ব) বিভিন্নরূপে কল্পিত করে; অর্থাৎ নাট্যবেদে বিভিন্ন ভাবে শুভ ও অন্তর্ভুক্তের স্বরূপ ও উদ্দেশ্যের সুখ ও দুঃখ ফল প্রদর্শিত হইয়া থাকে (‘শুভাত্ত-বিকল্পক’ স্বার্থস্ব-ফলত্বের বিভেদে কল্পিতব্যবসায়সংক্রান্ত নাট্যবেদ:—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫)।

১০৬। কর্মভাবাব্যাপেক্ষী—পক্ষা (কান্ধী)। কর্ম—কর্ম ও অর্থ। স্বার্থ—দান, গম্যাদির্থে স্থান ইত্যাদি। অর্থ—হিংসা, চৌর্য্য ইত্যাদি। ভাব—আশয়, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি (স্বার্থতা, পরার্থতা ইত্যাদি)। অর্থ—বংশ, অভিন্ন (উত্তরবংশ জন্মের গৌরব)—যথা আখ্যাবলি নিবাস, ব্রাহ্মবংশ ইত্যাদি। কর্ম ভাব অর্থ—এই তিনকে যথা সহকারিকরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ—কর্ম-অভিপ্রায়-বংশগৌরব-সাপেক্ষ এই নাট্যবেদ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও মনে করা উচিত হইবে না যে, নাট্যবেদে কেবল স্বার্থস্বের ফল-সম্বন্ধই উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ—এই দেশে এই কালে এইরূপ কর্ম করিয়া যে ব্যক্তি শুভ (স্বার্থ) বা অন্তর্ভুক্ত (অর্থ) অর্জন করিয়া থাকেন, তিনি এইরূপ কর্মভোগী হন—এরূপ উপদেশ নাট্যবেদে প্রদত্ত হয় না—উহা স্বার্থস্বাদির বিষয়ভূত (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫)। নাট্যবেদে বদ্য কর্ম ও কর্মফলদির সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয়, তবে তাহা উক্ত প্রকারে মুখ্যভাবে প্রদর্শিত হয় না—গৌণভাবে—অবান্তরূপে সূচিত হইয়া থাকে মাত্র—ইহাই অভিনয়ের উক্তির তাৎপর্য্য।

মূল:—ইহাতে একান্তভাবে আপনাদিগের ও দেবতাদিগের অহুতাবন নাই। ১০৬।

নাট্য এই সমগ্র ত্রৈলোক্যের ভাবায়ুক্তির্জন।

সংক্ৰান্ত:—এখন দৈত্যগণের পক্ষ হইতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—যদি নাট্যে কর্ম-ফলের সম্বন্ধ সাক্ষ্য প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে বর্তমান নাট্য-প্রয়োগের অবশেষে দৈত্যগণের পিছনেই বা লাগা হইল কেন (‘নমু চৈবমপ্যসংপূর্ণে কিমেতৎ যোজিতম্’)? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—কৈ না, দৈত্যগণের পক্ষান্তে কেহ ত লাগে নাই। দৈত্য ও দেবগণ বাহুতঃ যে ভাবে স্ব স্ব অবস্থার অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই ভাবেই থাকুন, নাট্য তাঁহাদিগের কালাভ্যন্ত পক্ষান্তে লাগিবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হয় নাই (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৬)।

ইহাতে—নাট্যবেদে; একান্তভাবে দেবতাদিগের অহুতাবন নাই—কোন প্রকারেই দেবতাদিগের নাট্যবেদে অহুতাবিত হন না (‘দৈব তেহুতাব্যন্তে কেনচিৎ প্রকারেণ’)।

অহুতাবন—অহু অর্থে পক্ষান্ত; তাবন অর্থে—উপেক্ষণ। ৩

কি দেবতা—কি মৈত্ৰী—কোন সন্তানদেরই অবিকল অনুকরণ নাই। কেন নাই—সে সম্বন্ধে অভিনবত্ব অতি গভীর ও সুবিস্তৃত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। উহা বর্তমানে অনুবাদের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও অতি সংক্ষেপে উহার সাব বর্ষ নিয়ে বিবৃত করা হইতেছে। নাট্যে প্রথিত দেবাত্মক-চরিত ও বর্ষাৎ দেবাত্মক-গণের চরিত—এতদ্বয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক ঐক্য নাই—বসন্তাত সন্তান-দ্বয়ের দ্বারা উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও নাই—তুচ্ছিতে রক্তভ্রমের দ্বারা নাট্যোক্ত চরিতে জীবিত চরিতের ভ্রমও হয় না, নাট্যোক্ত চরিত জীবিতের চিত্র বা প্রতিকৃতি নহে, নাট্যোক্ত চরিত ইচ্ছাকৃতভাবে তৎকালীন সৃষ্টি নয়:—এই প্রকারে অভিনব অনেক দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইয়াছেন যে—নাট্যে জীবনের চরিত নকল বা অনুকরণ নহে। কারণ, পূর্বে যে দৃষ্টান্তগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, তৎ তৎ স্থলে স্রষ্টা উল্লাসে থাকেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে রসাবলম্বন সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, নাট্যের প্রাণ রসাবলম্বন। যদি কারো বর্ণনায় বিবরণটি বর্ণা-বর্ণা গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, আর যদি যদি উহার চতুর্দশীর বাহিরে বিচরণের সুযোগ না পান, তাহা হইলে বর্ষাৎ কাব্যেরই সৃষ্টি হইতে পারে না। অতএব, বর্ষাৎ রসাবলম্বন-কর দৃষ্টান্তাবলীর সৃষ্টি করিতে হইলে ব্যাবহারিক ভ্রমকে দৃষ্টমান চরিত্র বা কল্পের চরিত্র নকল (অনুবাদন) করা চলিতে পারে না। পক্ষান্তরে, নাট্যে অখিল ত্রিভুবনের ভাবাত্মক-কর্তন-বস্তু (অ: ভা: পৃ: ৩৬)। যেহেতু চাত্তবানব (বহাণ)। যেহেতু চাত্ত ভাবনয় (কাই)।

এই প্রসঙ্গেও আচাৰ্য্য অভিনবত্বকে যে বিবর্ত ও নৃত্য বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও বর্তমানে প্রসঙ্গে অবাস্তব।

ভাবাত্মক-কর্তন—ভাবসম্বন্ধের অনুকর্তন। অভিনব বলিয়াছেন—অনুবাস্যাত্মক কর্তনই নাট্য—উহা অনুকরণাত্মক নহে (তৎসাদৃশ্যবাস্যাত্মক কর্তন—নাট্যে নকলকরণত্ব—অ: ভা: পৃ: ৩৮)। অনুবাস্যাত্মক—ইহা নৈবাসিকের পারিভাষিক ‘অনুবাস্যাত্মক’ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন (২)। অনু—পক্ষাৎ; বাবসার—বৃন্দচর্য্য, অভ্যন্তান, effort, performance, অনুবাস্যাত্মক—অভিনব ভঙ্গমান, নবরূপে প্রকাশন—reproduction, representation, reconstruction, reorientation, (বধা, মানসমুখি তেজিা ভৈলচিত্রাভন)। অনুকরণ—নকল নকল (নবা ভালাকচিত্র দ্বারা জীবিতের প্রতিকৃতি নির্মাণ)। অনুবাস্যাত্মকে শিল্পীকে কিছু মৌলিকতার কৃতিত্ব থাকে—সে মৌলিকতার প্রকাশ রসসৃষ্টি ও রস-পরিপোষে। আর অনুকরণের মধ্যে এ কৃতিত্বের জন্ম থাকে—প্রকাশ পায় কেবল বাস্তবিক পদ্ধতিগতভাবে। নাট্যে জীবনের অনুবাস্যাত্মক, আর চলচ্চিত্র উহার অনুকরণ-রাস্তা।

কৃত্য—কোন স্থলে বর্ষ, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও অর্থ, কোথাও শব্দ (১১)।

কোথাও হাত, কোথাও বুদ্ধ, কোথাও কায়, কোথাও বস।

সম্বন্ধ:—তাঁহা হইলে তাৎপৰ্য্য পাঁজাইতেছে এই যে—ক্রৈলোক্যের যে সকল ভাব, নাট্যে তাহাদিগেরই অনুকর্তন। এখন

একটি আশঙ্কা—এ ক্ষেত্রে একটি বার দৃষ্টকাব্যে—এমন কি একটিবার অর্ধেই সকল ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া উচিত। কিন্তু সম্বন্ধ: ত তাহা বৃষ্টি হয় না; কেন?—এই আশঙ্কায় নিরাকরণার্থ স্থলে বলা হইয়াছে—বলিও ক্রৈলোক্যের সকল ভাবের অনুকর্তনবস্তু নাট্যে, তথাপি যে কোন নাট্যে রচনার যে কোন অর্ধেই সকল ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, কোথাও (কটিং) বর্ষ, কোথাও বা ক্রীড়া ইত্যাদি বৃষ্টি হইয়া থাকে, অর্থাৎ—যে কোন একধাণি দৃষ্টকাব্যে বা এক কোন দৃষ্টকাব্যের যে কোন একটি অর্ধেই একত্র সমাবেশ-সম্বন্ধের দেখা যায় না। দৃষ্টকাব্য-ভেদে ও উৎসাহের অনুভবে বিভিন্ন ভাব-সমাবেশ হইয়া থাকে—কোন নাট্যরচনার বা কোন দৃষ্টকাব্যের কোন অর্ধে কোন বিশিষ্ট ভাবের স্মরণ বৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন উঠিবে—এই ভাবগুলি কি? তাহার উত্তর—প্রসঙ্গে স্থলে বলা হইয়াছে—ভাবগুলির কথা ১০৭ ও ১০৮ শ্লোক উক্ত হইয়াছে—বর্ষ, ক্রীড়া, অর্থ, শব্দ, হাত, বুদ্ধ, কায়, বস। কিন্তু বর্ষ-ক্রীড়াগি ত ভাব বলিয়া অত্র কৃত্যগি পরিগণিত হয় নাই। যদ্বি ভবত নাট্য-শাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে ভাবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ভাব বলিতে ব্রূকায়—হাসিভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যক্তিগত বা সকারিতাব, সাম্প্রিক ভাব ইত্যাদি (৩)। বর্ষ-ক্রীড়াগি এই সকল ভাবের কোন শ্রেণীই অন্তর্গত নহে। এ কারণে অভিনব বলিয়াছেন যে—এই স্থলে যে বর্ষ-ক্রীড়াগি শব্দের ভাব-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে শব্দগুলি বসাবোপাত্তবে বোচিত হাসি-ব্যক্তিগত-বিভাবের সূচনা করিয়া থাকে। অতএব, বর্ষ ও অর্থ শব্দ—উৎসাহগি ভাবের সূচক, ক্রীড়া—বিস্ময়গি, শব্দ—নির্ভুলগি, হাত—হাস্যগি, বুদ্ধ—বৌদ্ধগি, কায়—কৃত্যগি ও বস—ক্রৌঞ্চ-ভব-কৃত্যগি-পোকাগি সূচনা করিতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। আশি-দেব দ্বারা বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যক্তিগত-সাম্প্রিক-ভাবগি সূচনা। বধা, কায় বলিতে ব্রূকায়—হাসি হাসিভাব ও অনুভব বিলাবাত্মক-ব্যক্তিগত-সাম্প্রিক ভাবসমূহ (অ: ভা: পৃ: ৩১)।

কটিং বর্ষ: (বহাণ)—পাঠান্তর—কটিংব: কটিংব: (কাই)।

কটিং—কোথাও, কোনও স্থলে—বস-ভঙ্গকের অন্তর্ভুক্ত কোন ভঙ্গকে। ভঙ্গক বলিলে ব্রূকায়, দৃষ্টকাব্য বা নাট্যরচনা। নাট্যশাস্ত্র মতে ভঙ্গক লম্বিণ—নটক, প্রবন্ধ, সমবকাহ, ইত্যাদি, সিম, ব্যাংগ, উৎসাহীক, প্রহসন, ভাণ ও ব্যাংগ (৪)। এই লম্বিণ ভঙ্গকের মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর ভঙ্গকে কোন একটি বিশিষ্ট ভাব (ও রস) প্রকাশ। অতএব কটিং—কোথাও বলিলে ব্রূকায়

(৩) ভাবাধারের পরিচয় দ্বৈত বস্তুগতীয় পাঠকর্তার পূর্ণ-পরিজ্ঞাত। অগ্রহায়ণ ১৩৫০ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রের ভাবাধারের দ্বারাভাবিক ভাবাত্মক দ্বৈত বস্তুগতীয় প্রকাশিত হইয়াছে। বিভাবাত্মক-বিভাবের বিবরণ সেই প্রবন্ধভুক্তিতে প্রাপ্য।

(৪) নাটক-প্রবন্ধগি লম্বিণের বিস্তৃত লক্ষ্যগি দ্বৈত বস্তু

।নও এক বিশিষ্ট শ্রেণীর রূপকে । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নাটক-
র রূপকে বা দৃশ্যকাব্যে সাধারণতঃ ধর্ম (উৎসাহাদি) প্রধান
বার প্রেরণ-জাতীয় রূপকে অর্থই প্রধান। পক্ষান্তরে, ভাণ-
সীর রূপকে ক্রীড়া প্রধান। আবার 'কচিং' বলিলে ইচ্ছাও
হইতে পারে যে—কোন বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত রূপকের অন্তর্গত কোনও
কথানি বিশিষ্ট গ্রন্থে; দৃষ্টান্ত—নাটক-শ্রেণীর রূপকগুলির মধ্যেও
গান একখানি নাটকে হয় ত ধর্ম প্রধান (যথা—'হলিতরাম'
টেকে রামের অশ্বমেধ-যাগ-বিবরণ)। আবার কোন আর
কথানি নাটকে বা ক্রীড়া প্রধান (যথা—স্বপ্নবাসবস্তার)।
ইরূপ একই জাতীয় রূপকের বিভিন্ন দৃষ্টান্তে বিভিন্ন
ণবের প্রোথিত দেখান যাইতে পারে। পুনশ্চ 'কচিং'
লিলে ইচ্ছাও বুঝাইতে পারে—কোন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর
রূপকের অন্তর্গত কোন একটি বিশিষ্ট গ্রন্থের কোন এক বিশিষ্ট অঙ্কে
অঙ্কপ্রাণে; যথা—অভিজ্ঞান-শকুন্তলের দ্বিতীয় অঙ্কের সেই স্থলে
যেই প্রোথিত, যথায় দৃশ্যতঃ বলিতেছেন—এমনও ত সম্ভব যে এই
দৃশ্য রূপপটিক কথের অপর্যায় জীব গর্তজাত্য হইতে পারেন।
এইরূপ দৃশ্যকাব্য শ্রেণী-বিংশয়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থবিগণের আংশ-বিশেষে
ধর্ম, আবার অপর কোন এক অংশে ক্রীড়া, অথ এক দেশে কাম
ইত্যাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন
ভাবের স্থানা এই হেতু অসম্ভব নহে। (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৯)।

[প্রথম :- বরোদা-সংস্করণে—'নৈকান্তভোহর ভরতা দেবানাং
চাম্ভভানম্' শ্লোকটির সংখ্যা ১০৬; উহার পর 'কচন্দ্রধ্বঃ কচিং
ক্রীড়া ইত্যাদি শ্লোকটিও ১০৬ বলিয়া ছাপা হইয়াছে। উহার পর
'কচিন্দ্রাঃ...কামঃ কামোপদেশবিনাম্' ইত্যাদি শ্লোকটির সংখ্যা দেওয়া
হইয়াছে ১০১। এগুলি স্পষ্টতঃই ছাপার ভুল। অম্বাধে সংখ্যাগুলি
ঠিক করিয়া দেওয়া হইল।]

মূলঃ—ধর্ম প্রবৃত্তগণের ধর্ম, কামদেবগণের কাম ১০৮।

দুর্জিনীতগণের নিগ্রহ, বিনীতগণের দমক্ৰিয়া; ক্রীতগণের ধৃষ্টতা-
জনন, শূন্যভিমনিগণের উৎসাহ ১০৯।

অবৃণগণের বিবোধ, বিদ্বৎগণের বৈদ্রব্য, ঈশ্বরগণের বিলাস ও
দুঃখাদিত জনের হৈদ্র্য ১১০।

অর্থোপাধিবিগণের অর্থ, উদ্বিগ্ন-চিত্তগণের ধৃতি (উক্ত হইয়াছে)।

সঙ্কেত :- এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—নাট্যে অবস্থা-দেশ-কাল
প্রভৃতি বিশেষায়গার যথোচিত ভাবামুকীর্জন মাত্র কর্তব্য—রাম-
রাবণাদির চরিত্রাঙ্কন করার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ—নাট্যে কেবল
এই কথাগুলি বলিলেই চলে যে—এইরূপ অবস্থা ভেদে—এই প্রকার
দেশ-ভেদে—এইরূপ কাল-ভেদে ও এইরূপ প্রকৃতি-ভেদে এই এই
বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবের সন্নিবেশ কর্তব্য। উক্ত প্রকার নির্দেশগুলি
প্রত্যেকের সরল ভাষায় দিলেই যখন চলিতে পারে, তখন সেই
সরল পথ অমূল্যগণের পরিবর্তে নাট্যে রাম রাবণাদি নায়ক
প্রতিনায়ক ইত্যাদির চরিত্র-চিত্রণ-পূর্বক পরোক্ষভাবে ধর্মপ্রতিভার
উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি? রাম-রাবণাদির চরিত্র বিশ্লেষণ-
পূর্বক নাট্যদর্শকগণ পরিশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে—
রামের মত হইতে হয়, রাবণের মত নহে। অনেক বিচার-বিশ্লেষণের
পর এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়া থাকে—ইহাই নাটকের মূল
শিক্ষা। কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনার স্বাভাবিকতা, রসের উদ্বোধন—
ইত্যাদি নানা জটিল ব্যাপারের মধ্য দিয়া এই ভাবটির পত্রোক্ত স্থান
না করিয়া স্থাপিত ভাবে উক্ত ভাবটির প্রত্যেক নির্দেশ করিয়া দিলেই
ত সকল বোধ-প্যাচের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তবে
সেই সরল পথ অমূল্য হইয়া নহে।

ইহার উত্তরে অভিনবগুণ বসিদ্ধাভেদে যে—লোকবৃত্তাভ্যাসের
(অর্থাৎ লোকে যেমন যেমন ঘটে, তদনুরূপ) প্রয়োগ-করণই নাট্য।
ব্রহ্মা এই কথাই। দৈত্যগণকে বলিতেছেন, যেহেতু, লোকবৃত্তাভ্যাসী
প্রয়োগরূপ নাট্যের সৃষ্টি আমি করিয়াছি, অতএব যে সকল ব্যক্তি
ধর্ম প্রবৃত্ত (যথা—শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি) তাঁহাদিগেরই
চরিত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে নাট্যে ধর্ম-ভাব উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ
abstract গুণগুলি মাত্র নাট্যে নির্দিষ্ট বা বিবৃত হয় নাই—পক্ষান্তরে;
concrete চরিত্রের মধ্য দিয়া সেই abstract ভাবগুলির প্রকাশ
করা হইয়াছে। তাহার কারণ, নাট্য-জীবনের জীবন্ত অমুকীর্জন—
গতাহুগতিক বা ব্যক্তিক অমুকরণ মাত্র নহে—অথবা নিছক
হিতোপদেশও নহে [অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪০]।

ধর্ম, কাম, নিগ্রহ, দম ক্রিয়া, ধার্টাজনন, উৎসাহ, বিবোধ, বৈদ্রব্য,
বিলাস, হৈদ্র্য, অর্থ, ধৃতি ইত্যাদি ভাবগুলি—কর্তৃপদ; ক্রিয়া—উক্ত
হইয়াছে—উহ। এইরূপে অভিনব অর্থ করিয়াছেন।

১০৮। ধর্ম—ধর্ম-শব্দ-দ্বারা সূচিত ভাবসমূহ—উৎসাহাদি।
কাম—রতাদি ভাব।

১০৯। নিগ্রহ—বধ। বিনীত—জিতেন্দ্রিয়। অভিনব
বলিতেছেন—বিনয় ইন্দ্রিয়জয়ের পথ্যায়। ভগবান্ মহুও ঐরূপ অর্থ
—করিয়াছেন। দমক্ৰিয়া—অভিনব 'শম' ও 'দম' দুই প্রকার
পাঠই ধরিয়াছেন। শম—অন্তরিক্ষের নিগ্রহ। দম—বাহ্য-স্রো
দশটির সংযম। দমক্ৰিয়া—দমের ক্রিয়া অর্থাৎ যোজন। বিনীত-
গণের দমক্ৰিয়া—জিতেন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়, সংযম চিত্তযোজন—এইরূপ
অর্থ। ক্রীতগণের ধৃষ্টতাজনক—(মূল—ধার্টাজনন—ধার্টাকরণ
—কালীর পাঠ)—অভিনব বলিতেছেন, এ স্থলে বিভাবের উজ্জ্বলতা
হাস-হাস্যনিবোধের সূচনা করা হইয়াছে। ধার্টাজনন—ব্যাধকরণ
বহুব্রাহ্মী সমাস—ধার্ট্য হইতে জনন (অর্থাৎ জন্ম) বাহার—যে হাস-
হাস্যভাবের।

১১০। অবূণ—অপণ্ডিত, মূর্খ, নিরোধঃ।

বিবোধ—বিশুদ্ধ পদ—বোধ বা ব্যাপ্তি জন্মাইয়া দেওয়া
—বিবোধন—এইরূপ অর্থ। বাহার অপণ্ডিত বলিয়া লোকে
অপরিজাত, তাহাদিগের নানা রূপ উপায়-উপদেশ-দ্বারা বৃত্তি
(বোধ) জন্মাইয়া দেওয়া।

বৈদ্রব্য—পাঠান্তর বৈদ্রব্য। বাহার স্বয়ং বিদ্বান্, তাঁহাদিগের
আবার বৈদ্রব্য জন্মান যায় কি প্রকারে? উত্তরে অভিনব
বলিয়াছেন—বিদ্বান্ বাহার, তাঁহারাও উপায়-জ্ঞানের অভাবে কার্যে
প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অতএব, ভদ্রাদির দ্বায় বিদ্বৎস্বভাবও
উপায়-শিক্ষা দেয় এই নাট্য। আবার হয়ত কোন একটা বিষয়
বিদ্বানের জ্ঞান আছে, কিন্তু তাৎকালিক বিমুখতির ফলে তিনি কি-
কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এস্থলে নাট্য তাহার মূখতির উদ্বোধন
করিয়া দেয়। ফলে তিনি নাট্যদর্শন-কালে পূর্বপরিজাত অথচ
সাময়িক বিমুখ অনেক বিষয়ের অমূল্যদান-পূর্বক নিজ পাণ্ডিত্যের
প্রকাশ করিতে পারেন—'বৈদ্রব্য উদ্বাহনামুপায়ব্যাপ্ত্যভেদে
বৈদ্রব্যম্'। অনেক মূখতিমতি প্রভৃতি নানা নিরূপণম্' (অঃ ভাঃ
পৃঃ ৪০)।

বিলাস—ক্রীড়া। ঈশ্বর—প্রভু স্থানীর ব্যক্তি। হৈদ্র্য—দুর্ভা-
ব্যবস্থা-রূপ উৎসাহ। পাঠান্তর—বৈদ্র্য। দুঃখাদিত—দুঃখপীড়িত।
দুঃখাধি বলিয়া লোকে যে ব্যক্তি পরিজাত, তাহার সযত্নে দুঃ-
খাবদার বা উৎসাহের উদ্রেক-করণ।

১১১। ধৃতি—বৈদ্র্য। পাঠান্তর—বৃত্তি (কাঙ্গী)।

[ক্রমশঃ ।

ছোট্ট আর

বুদ্ধ সৈনিক ✓

(নিকোলে টিকনফের লেখা শোভিয়েট গল্প)

বয়সে খুব বুদ্ধ—হুঁ চোখে ঝাপসা দেখে! সব যেন কেমন অস্পষ্ট ছায়ায় ঢাকা।

খোলা জানলাগুলোর সামনে সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, বুদ্ধ এসে তাদের পাশে দাঁড়ালো। বাইরের দিকে তাকাশো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। তখন সকলকে ডেকে বুদ্ধ বললে,— ওখানে কি হচ্ছে? কি তোমরা দেখছো? আমাকে বলো তো!

এক জন বললে,—ওখানে অনেক দূরে সহরের বুক থেকে উঠছে শুধু ঘন ধোঁয়া। সাদা ধোঁয়া। যেন রাশ-রাশ পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। অন্ত-স্বর্গের লাল আলো পড়েছে সে ধোঁয়ার গায়ে—তাতে দেখাচ্ছে যেন গোলাপী পাড় বোনা। ধোঁয়ার রঙ এবারে দেখছি নীল! এত উঁচুতে ধোঁয়া উঠছে, মনে হচ্ছে, ধোঁয়া গিয়ে যেন আকাশ ছোঁবে!

বুদ্ধ বললে—কিসের আগুন ও? জাখানরা সব জালিয়ে দিচ্ছে?

—হ্যাঁ।

এ্যাটি-এয়ার-ক্রাফট কামানগুলো এখনো গর্জন করছে তবে থেকে থেকে—যেন কিমিয়ে-কিমিয়ে! বুদ্ধ এক দিন কত গভীর রাত্রি ধরে ম্যাপ খুলে সেই ম্যাপের উপর হুঁ চোখের সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকতো। চোখে ঘুম নেই...মুখে অন্ন নেই...সেই শেষ রাত্রি পর্যন্ত!

বুদ্ধ ছিল মিলিটারী শিক্ষালয়ে। ভূগোল পড়াতো। তাছাড়া কত কি আবিষ্কার করেছে। রাশীকৃত ম্যাপ নিয়ে ছিল বুদ্ধের বা কিছু কাজ...দেশের কোথায় কি...কটা পাহাড়...কোন পাহাড়ের গা ফাটিয়ে কোন নদী-নালা বয়ে পড়ছে...সে নদী কোন পথ ধরে কোন কোন গ্রাম-নগর ছুঁয়ে কোন মাটিকে উর্বর করে বয়ে চলেছে...কোথায় বন, কোথায় কোন গ্রাম...এ সব খবর বুদ্ধের নখদর্পণে। নস্রায় চোখ মেলে বুদ্ধ দেখতো কালির এই অসংখ্য লেখা-জোখার অন্তরালে সবুজ ফশলে ভরা দেশমাতৃকার শ্রামল অঞ্চল—দেশের বৃক্কে সাহসী বীর লক্ষ লক্ষ সন্তান। সকলের সম্মিলিত সাধনায় মাতৃভূমি ঐশ্বর্য্য-সম্পদে কি রকম বিভূষিত হয়ে উঠছে! বুদ্ধ দেখতো, ম্যাপের চেহারা বছরে-বছরে বদলে চলেছে! এখন?

লেনিনগ্রাড আর তার আশ-পাশের ম্যাপ দেখতে দেখতে বুদ্ধের ললাট কুঞ্চিত হয়...চোখের সামনে যেন কালো পর্দা নেমে আসে।

পুশকিন পার্কের চারি ধারের পথ জুড়ে জাখানরা কুচ-কাণ্ডাজ করে বেড়াচ্ছে। ওদের শেল-বর্ষণে পাটশিনার প্রাসাদ কেঁপে

কেঁপে উঠছে—শিটারহলের হয়েছে পতন—যেশিন 'গানের চক্রার-রব এখন কোলপিনো থেকে শোনা যায়!

বুদ্ধ বলে উঠলো—না, না! এ অসম্ভব! এ হতে পারে না। জাখানরা চুকবে লেনিনগ্রাডে...যে-লেনিনগ্রাড কখনো শত্রুর সামনে মাথা নোয়ায়নি! না, বিশ্বাস হয় না! এ আমার চিন্তার অতীত। লেনিনগ্রাড কখনো বেদখল হয়নি...কখনো না। আমাদের জন্তাই কি লাঞ্চার যত কালি জমা ছিল!

লেপখানা ফেলে দিয়ে বুদ্ধ বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে উদ্দামের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো।...

—তাছাড়া নিজেকে সাঁপে দেবে কার হাতে? জাখানদের? ঐ সব লম্বীছাড়া...বুনো পশু...দানব...রক্তপিপাসু জল্লাদ—ওদের হাতে? নাহী আর শিশুদের হত্যা করতে যাদের হাত কাঁপে না! সব দ্রবৃত্ত ফাশিস্ত...না...না! বুদ্ধের মনে যেন বাজ ডাকছে! বুদ্ধ বলতে লাগলো,—জাখান সেনাপতিগুলো তো পুতুল। নিজেদের দেশ ও-হাতে শাসন করতে পারে—তা বলে বুদ্ধ? বুদ্ধের ওরা জানে কি।

পায়চারির বিরাম নেই...তার পর আবার বললো—বুদ্ধ করতে ওরা জানে...যাকে বলে সত্যিকারের বুদ্ধ? ওরা জুয়াড়ি,...ওরা চুরি করতে জানে...ডাকাতি করতে জানে। ডাকাতি! এবার কিন্তু ও-চালে কিছু করতে পারবে না। আমরা অন্ধ নই। মূর্খ নই! ভয় কাকে বলে, রাশিয়ান-জাত তা জানে না। আমাদের সঙ্গে ঝাপসা চলবে না।...লেনিনগ্রাড তোমরা পাবে না বাপু!

শান্ত পায়ে বুদ্ধ এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো...কিন্তু চোখে ঘুম নেই! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে! বৃকের মধ্যেও আগুন! সর্ব্বাঙ্গ আগুনের জ্বালাতে যেন ঝলশে রয়েছে! সহরের চার দিক জুড়ে বুদ্ধ চলেছে...এ-চিন্তা চকোর আগুনের মতো তার মাথায় ঘুরছে!...

চোখ বুজে বুদ্ধ ভাবতে লাগলো—আগেকার দিনের কথা। বুদ্ধের আগেকার কথা! চারি দিকে কি দ্বিধা শান্তি! বাইশ বছর আগে! সে তখন তরুণ অফিসার...সহরের বৃকে পল্লীর বৃকে স্নেহ-প্রেমে রচা সব শান্তি-নীড়...নিবিড় নিরাপদ আশ্রয়-ভূমি! আজ শত্রুর হিংসার আগুনে সে সব পুড়ে হহতো ছাই হয়ে গেছে। শত্রুর ট্যাঙ্ক সে-ছাইয়ের উপর দিয়ে তার হিংস্র গতিতে করেছে অব্যাহত...মুক্ত! যদি তাই হয়ে থাকে?

বুদ্ধ নিজের হুই হাত প্রসারিত করলো...মুঠিবদ্ধ করলো। পেশীতে এখনো শক্তি আছে! জাখানরা দলে কত? জিজ্ঞাসা করবে না কি, কোথায় ঐ সব জাখানগুলো? কিন্তু না, মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গনে জাখানরা আসবে কি? অসম্ভব!

সাইরেন বাজলো। আকাশ-বাতাস সে-শব্দে কেঁপে উঠলো। বুদ্ধ সে-শব্দ শুনে নিরাপদ শেলটারে গেল না! বোমার সারা বাড়ী কেঁপে কেঁপে উঠছে। জানলা-দরজাগুলো বনুনিরে মুহূর্ত্তে আঁর্জনাদ তুলছে। শেলের অসংখ্য টুকরো ছাদের উপরে পড়ছে—যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ীখানা হলছে যেন শেলশাই-ক্যাটর তৈরী খেলা-ঘরের মতো। বুদ্ধ নিশ্পান দাঁড়িয়ে আছে। আক্রোশ-ভরে

বিভিধ করে বলছে—পালা, পালা, ওরে শকুনের দল...বুঝছি
না, তোদের মাথা এখনি শুঁড়িয়ে বাবে।

বুদ্ধ সমানে চলছে। লেনিনগ্রাডের বাইরের প্রাচীর ঘেঁষে
শকুনের ছাউনি।

শীত এসেছে। হৃৎক শীত। ঘরে-বাইরে যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি
মিষ্ণ-কালো অন্ধকার। উল্লুনের মধ্যে ক'খানা ভিজে কাঠ—তাতে
কতটুকু বা তাপ মেলে। দিনের পর দিন ঘরে-এমনি চলেছে...বুদ্ধের
হাড়-পাঁজরাগুলো বার্তাকো ক্রমে যেন অবশ শিথিল হয়ে আসছে।
একখানা রাগ মুড়ি দিয়ে বুদ্ধ পড়ে আছে তার শয্যায়। নিজের
সমস্ত জীবনটুকু চোখের সামনে ভেসে চলেছে নৌকার মতো অলস
মহুর গতিতে।...

জীবন-ভোর কি পরিশ্রমই না সে করেছে। জীবনে কতখানি
বৈচিত্র্য ছিল। আজ যে এত দুঃখ দৈন্ত দুশ্চিন্তা...এসব না থাকলে
এখনো কত কাল হৃৎক সবল দেখে বুদ্ধ কত কাজ না করতো।
বার্তাকো হাত-পা অবশ হয়েছিল। এমন অবশ যে, উল্লুনের ঐ ছালানি
কাঠ-ক'খানা চালাতে পারে না। লজ্জা হয়, সামান্য ক'খানা ঐ
ছালানি কাঠ...নিজের হাতে কাটিতে গেলে বুদ্ধের হুঁহাত স্ফীতিতে
ভরে ভাঙা হয়ে ওঠে...কাঁধ থেকে হাতের কজা পর্যন্ত বন্বনিয়ে
অবশ হয়।

মনে জাগলো এই সমুদ্র গরিমায় নগরের কথা। এই
লেনিনগ্রাড। তার ঘরের জানলা থেকে দেখা যায় নগরের বিচিত্র
সমৃদ্ধি...এর অপূর্ণ সম্পদ। আজ এই লেনিনগ্রাড যুদ্ধ বিপন্ন।
অথচ সে দুর্বল। ভাঙ্গের এ কি নির্মম পরিহাস।

কাছাকাছি কোথায় বোমা ফাটছে...অবিরাম। সে শব্দে দেহ-মন
জর্জরিত।

ভাবালুতায় বুদ্ধের মন যখন আচ্ছন্ন হয়, তখন সে টেবিলের
ড্রয়ার থেকে সোনার ছোট ঘড়ীটি বার করে নাড়ে-চাড়ে। এ ঘড়ীটি
পেরেছে তার সামরিক ডুগো-শিক্ষকতার পটুতার জন্ত। আজ মনের
পটে ক্ষুদ্র উঠতে লাগলো ছবির মতো...বুদ্ধিমান তরুণ ছাত্রদের টোটে
জেগে-ওঠা হাসি। ছাত্রদের মধ্যে ক'জন আজ এ যুদ্ধে ফৌজের
ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মনে পড়লো নিজের তরুণ বয়সের কথা। ঘোড়ায়
চড়ে ককেশাসের দুর্গম শির উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে নদ-নদী পার হয়ে...
বিশ্ব-বিশ্বস্তির সব বাধা চূর্ণ করে...নমস্কা হাওদার মতো...তেমনি
হুজুয় বেগে। সে কত কালের কথা...

দেহ এখন দুর্বল...কালের চামচখানা মুখে তুলতে হাত কাঁপে।
মেয়ে তাকে খাইয়ে দেয়। খাওয়ার সময় মেয়ে তাকে বলে বুদ্ধের
খবর।

তুনে বুদ্ধের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। সন্ধ্যা বুদ্ধ বলে
ওঠে—রাশিয়ানরা খালি পিছু হঠছে?...যা যা যেন পাহাড়ের মতো
জারী হয়ে বুদ্ধের উপরে চেনে বসে।

পড়কীরা বলে,—বুড়ো আর বেশী দিন নয়। বোধ হয়, এই
শীতেই...

সে দিন ভোরে মেয়ে তনুলো বুদ্ধের ঘরের মধ্যে অজুত বুদ্ধের
শব্দ। ভিতর থেকে ঘরের দরজা খোলা।

পেতে মেয়ে পাড়ালো। শব্দটা...যেন কবিতা দিয়ে ঘরের মধ্যে থেকে কাঠ
চালা করছে, এমনি। তার পর হাতুড়ি ঠোকাব শব্দ। তার পর
গান। ঠাণ্ডা, ঘরের মধ্যে কে গান গাইছে। তাই বটে। পানির
ভাষা ঠিক বোঝা গেল না। বাণী আছে কি নেই, কে জানে। শুধু
স্বপ্নটুকু।

মেয়ে ভাবলো, বাবা? কিন্তু বসিয়ে দিলে বাবা তবে কসতে
পারে। যগ মুড়ি দিয়ে অসহায়ের মতো বিছানায় পড়ে থাকে।

মেয়ে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে খুললো। খুলতেই দেখে, ঘরের
জানলা খোলা...আর বুদ্ধ বাণ কবিতা হাতে একখানা কাঠ
চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কঠে শব্দের নিকর বয়ে চলেছে। মেয়ে দেখলো,
বাবার হুঁচোখে সে-যোলোটা ভাব আর নেই। আশ্চর্য। হুঁচোখে
তারুণ্যের দীপ্তি।

মেয়ে এগিয়ে এলো বাপের কাছে, বললে—কি করছো বাবা
কবিতা নিয়ে? না, না, দাও। মাথা গুঁবে শেষে একটা কাণ্ড করবে।
বুদ্ধ চাইলো মেয়ের পানে। উজ্জ্বলিত কঠে বললো,—ওরে না,
না, না। আমার আর এতটুকু দুর্বলতা নেই। আজ সকালে
রেডিয়েন্স খবর শুনেছি।

মেয়ে বললো—না। কি খবর?

কাঠখানা পা দিয়ে ঠেলে বুদ্ধ বললো,—সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এ
খবর কারো জানতে বাকী নেই...তুই শুধু জানিস না। মনোহাতে
স্বাধীনতা বেজার প্রহার খেয়ে পুসে। হয়ে গেছে। হস্তভাগা
ডাকাতের দল। বুদ্ধের হুঁহা কি জানে? ওরা জানে শুধু
ডাকতি আর লুটপাট। ওদের একবারে কেঁটিয়ে বার করে
দেখে রাশিয়ানরা। বুকলি? মনোর সীমানার যদি এই, তাহলে
লেনিনগ্রাডের সীমানায় পা বাড়ালে কি আর ওদের চিহ্ন থাকবে?
হা: হা: হা: এ সময় কি বুড়ের মতো বিছানায় পড়ে থাকা
যায় বে? তুই পারিস মা এ খবর শুনে পড়ে থাকতে?

পশু-পক্ষী বন্ধ

যন্ত্রণা মানুষ আজ বুদ্ধিগতভাবে কাজে যন্ত্রপাটকে একান্ত সহায়
স্বরূপ গ্রহণ করিলেও অবশ্যো ইতিব পশু-পক্ষীর সাহায্য ত্যাগ করিতে



বশবাহী উট—ভারতে

পারে নাই। মানুষের অশ্ব-দ্বন্দ্বের কুকুর যে নানা গুণে বহু মানুষ-
বন্ধুর চেয়েও হিতকারী, তার বহু পরিচয় তোমাদের দিয়াছি। কুকুর

সাধারণ করিতেছে, তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছে, আজ তাহার একটু পথিক হয়।

রামায়ণ-অভিযানে আমরা পড়িয়াছি, 'গজ-বাজি' ছিল বশব্দে মাহুকের মত বড় সহায়। ঐতিহাসিক যুদ্ধের 'চৈতক' অগতির ইতিহাসে অবিনশ্বর কোড়ি লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ বীর হানিবল কে-বুডে রোমানদের পরাজিত করিয়াছিলেন, সে-বুডে গাড়ী ঘোড়া ও বন্দু হিল



অশ্বতরের পিঠে আহত—নিউ গিনি

তার প্রধান সহায়। তার পর পৃথিবীতে বহু জাতি কত বুদ্ধ করিয়া গিয়াছে—সে-সব বুদ্ধে ঘোড়া হাতী কুকুর ছাড়া তারা সহায় পাঁটাইছিল অশ্বতর, পাখিরা এবং উটকে! বুদ্ধত্বের ভক্ত কামান বন্দুক তলোয়ার বা গুলি ও বুদ্ধভাষাতের কাছে মাহুকের বেশিরমাণে



কুকুর-বাহিনী ব্রেডে মেশিন-গান বহিতেছে

কণী—হাতী, ঘোড়া, পাখিরা, উট এবং অশ্বতরের কাছেও তেমনি তার স্থান কম নয়।

এ-বুদ্ধে কে-সব কুকুর মাহুকের সহায়তা করিতেছে, বুঝি কোশলে বা সাহসে তাহদের নাম বড় বড় সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত। কালিফিনি-সীমান্তে বাশিয়ার বনকুলী এক মল কুকুর নাৎসী ট্যাঙ্ক-সমূহের সামনে গিয়া বোমা রাখিয়া দাতিয়াছিল। তাদের বন্ধিত সেই সব বোমার আঘাতে নাৎসীর গতি ক্ষ এবং বাশিয়ার বিজয়-লাভে সমর্থ হয়।

চীনা যুদ্ধে জাপান প্রায় তিন লক্ষ ঘোড়া নামাইয়াছিল। ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট প্যাশিফিক অভিযানে জাপানের ঘোড়ার খোঁা ছিল পঁচাত্তর হাজারের উপর। বিচক্ষণ সমরাত্মকেরা বলেন,

বুড়ে জলে অন্ধকারে, পড়িল বা পাহাড়ী পথে অশ্বপত্র ও সর্পবিধ বশব-বহনে ঘোড়ার শক্তি-সামর্থ্যের 'কুলনা' নাই। ফিলিপাইনসে এবং ইতালীর পার্বত্য প্রদেশসমূহে দুর্গমতা-হেতু মোটর-ট্রাক চলিতে পারে নাই। সে দুর্গম পথে ঘোড়াই ছিল একমাত্র যান। কোঁজ বহিরা বশবপত্র বহিরা ঘোড়া এ যুদ্ধে বিরাট ভাবেই মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিয়াছিল। বাশিয়ার বন্দুক অব্যাহতী নৌক, আজও শক্তি-সামর্থ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। মকী-নালা পার হইতে খানা-ভোবা বা পাহাড় টপকাইতে তাদের ঘোড়ার আর ক্ষুতি নাই।

অশ্বতরের মত পরিচরী ভীষণ আর নাই। পাহাড়-পথ ধরিয়া—তা সে পথ বত দুর্গমই হোক, কামান-বন্দুকের মোট বহিরা অশ্বতর চলিতে পারে মাইলের পর মাইল অবিরাম অনায়াস গতিতে; সমস্ত পথে তো কথাই নাই।



পাহাড়া-পুতের মাহুকের খবর পাঠানো

ইতালী-অভিযানে মার্কিন-বাহিনী পাহাড়-পথে বন্দপত্র পাঠাইবার জন্য ট্রাক ছাড়িয়া অশ্বতর-বাহিনীর ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে অতীত লাভ করিতে পারিয়াছে। মার্কিন অশ্বতর-বাহিনীতে মেহি টামেল নামে একটি অশ্বতর আছে। পথে এক জন জাঙ্গান সেনাকে দেখিয়া দ্রুত বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাকে সে পায়ের চাঁট দাতিয়া জখম করিতে ছাড়ে নাই। পরে জাঙ্গান-হস্তে মেহি টামেল আহত হয়। মেহি টামেল এখনো বাঁচিয়া মার্কিন গভর্নমেন্টের পেন্সন ভোগ করিতেছে। পারাবত-বাহিনীর কৃতিত্বের কথা ভোমাদের পূর্বে বলিয়াছি। সেনাধ্যক্ষ লর্ড মটবার্টেনের অন্তরে বহু পারাবত আছে। শিকার তারা এমন হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া বার্ডা বন্দন করে।

হাতী এক উটের সাহায্যগিতিয় এ যুদ্ধে মাহুকের বহু শক্তি লাভ করিয়াছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বর্মারোডে রেলপথ ধরে হটলে হাতীর সাহায্যে সে-পথ অভয় সমুদ্রের মধ্যে পুনর্গঠিত করা হইয়াছিল। হাতীকে বিয়া এ যুদ্ধে কেন, বুলভোকারের কাজ করানো হইতেছে;

পাশে বিশাখা—সর্বত্র হাতীকে দিয়া লোহার রেল, কাঠের গুঁড়ি প্রভৃতি
রহানো। হুইতেছে। হাতী ভিন্ন হুগম বনপ্রদেশ অতিক্রম করা আর
কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না—না মোটর-ট্রাকের, না মানুষের।

মকর বালুকা-বন্ধে উটের সাহায্যে দুর্গম বিমান-ক্ষেত্র রচনা
করা চাইতেছে। সেখানে পেট্রোল টায়ার প্রভৃতি মিস্ত্রিবে না,



হাতীর পিঠে ষোড়ের লগেজ—ভারতে

কাজেই উটই একমাত্র সহায় ও বহু! উত্তর আফ্রিকা, ব্রহ্ম,
ভারত, চীন ও দক্ষিণ-রাশিয়া—এ কয় প্রদেশের বালুকাময় ক্ষেত্রে
উটকে দিয়া অন্তঃস্থ বহানো হইতেছে।

এই সব ইতর পশুর সাহায্য না পাইলে মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তির
দাম্যয্য যে বহু ক্ষেত্রে পলু থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৌরুষ

পরব্রহ্মতার মত দুর্ভাগ্য আর নেই! লেখাপড়া করার জন্ত বই
খাতা পেঞ্জিল চাই—সেই খাতা বেধে দেবে অপরে—নিজে পেঞ্জিলটা
কেটে নিতে পারবে না—এতে কতখানি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, বলে
তো! এই পরব্রহ্মতার জন্ত দায়ী মা-বাপের অত্যধিক আদর,
নয় নিজেদের আলস্য-ঔদাস্য।

অনেক মা-বাপ এমন যে, ছোট বয়সে ছেলেমেয়েদের সব কাজের
ভার—যেখানে পরসার জোর আছে, সেখানে চাপিয়ে দেন দাসী-
চাকরের উপর; আর যেখানে দাসদাসী রাখবার মত অর্থ-সামর্থ্য নেই,
সেখানে নিজেরা ছেলেমেয়েদের কাজ করে দেন। এর ফলে ছেলে-
মেয়েরা অলস হয়, কাজকর্মে অপদার্য হয়ে ওঠে।

বিশ-বাইশ বছরের অনেক কিশোরকে দেখেছি, কাউন্টেন পেনে
কালি ভরতে পারে না। লিখতে লিখতে পেনের কালি ঘেঁ নিঃশেষ
হলো, অমন ডাক পড়লো মায়ের, নয় ছোট ভাইবোনদের, নয়
নাচারের—এসে কালি ভরে দিয়ে বাও! হুঁহাত দু'বে জলের কুঁজো-

কলেও এরা নিজেরা জলটুকু গড়িয়ে নিতে পারে না—

মন লোক এসে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে হাতে তুলে দেবে

জলের দ্রাস।

এমনি ভাবে অপরের উপর নির্ভর করে চলার ফলে মানুষ
অপদার্য হয়—পরে কোনো কাজে নিজেদের উপর এরা নির্ভর রাখতে
পারে না! সে জন্ত জীবন-সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য হয়!

ছোট বয়স থেকে এ অভ্যাস ত্যাগ করে চলবে। খুব এক জন
কৃতী ভক্তলোকের গৃহে দেখেছি—ইনি বিস্তার-বৃদ্ধিতে এবং ব্যবসায়-

কৃতিত্বেও বড়—পরস-কড়িও প্রচুর উপার্জন করেন

—এঁর গৃহে দেখেছি, ভক্তলোকের ব্যবস্থা—ছেলে-

মেয়েরা স্নান করবার সময় নিজেদের হাতে সাবান-

জলে গেঞ্জি কাচবে, কাপড় কাচবে; তার পর সেই

কাচা কাপড়-গেঞ্জি শুকোতে দিয়ে তবে খেতে যাবে।

খাবার সময় নিজেরা ঠাই করে নেবে, জল গড়িয়ে

নেবে; তার পর ঠাকুর দিয়ে বাবে পাতে ভাত-

তরকারী! পড়াশুনার ব্যাপারে বাড়ীতে মাস্টার

মশাই আছেন—ছেলেমেয়েরা ডিক্সনারি দেখে শব্দ

কথার মানে লেখে—মাস্টার মশাই পড়া বলে দেন,

বুঝিয়ে দেন! ছুতা প্রশ্ন—তাও ছেলেরা করে নিজের

হাতে! ভক্তলোকের এক আশ্চর্য বলেছিলেন,—

আপনার সব বাড়াবাড়ি! এতটা না করলেও

পারেন! এ কথার উত্তরে ভক্তলোক বলেছিলেন,—

মানুষের কখন কি অবস্থা হয়, কে জানে! সে জন্ত

সব সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে! না হলে দুঃখ-কষ্টে

পড়লে অপদার্যতার ফলে হুখ আরো বেশী হবে!

এ কথা খুব সত্য। তাছাড়া নিজের হাতে যে কাজই করো না

কেন, তার আনন্দ আলাদা রকমের। নিজের হাতে কাজ করতে

কাজে উৎসাহ মেলে প্রচুর, বুদ্ধিও নানা দিকে বিকশিত হয়।

বাড়ীতে ইলেকট্রিকের তার ফিউজ হলো—কোথায় কখন মিস্ত্রী

পারবে—পারবে কি না,—সে সম্বন্ধে অন্ধকারে দুর্ভাবনার সারা হয়ে

কি লাভ? নিজে থেকে হাতে-কলমে কাজ করার অভ্যাস থাকলে

এ কাজটুকু নিজেরাই তো চাই করে সেরে নিতে পারি। একটি গল্প

আছে,—শত্রু এসেছে শুনে কোন্ বাদশা প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেন

নি। খানদামা কাছে ছিল না বলে ছুতো পায়ে পরিচয়ে দেবে কে?

সেই জন্ত! ফলে বাদশা স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্য তো হারালেনই,

উপরন্তু শত্রুর হাতে বন্দী হলেন!

গল্প হলেও এর মধ্যে যে নীতি-কথা রয়েছে, তার দাম যদি বুঝতে

পারো, এক বুকে তেমনি ভাবে চলতে পারো, তাহলে জীবনে কোনো

কাজে কোনো দিন হঠাৎ ভয় থাকবে না। কে আমার আমার

বোতাম টেকে দেবে বলে যদি ঠিক সময়ে কাজে বেরুতে না পারো,

তাহলে তোমার পরাজয় কোনো কালে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

তা ছাড়া নিজেকেও লজ্জা হয় না? এক গেলাস জল যদি

নিজে না গড়িয়ে নিতে পারো, তাহলে জীবনে কোন কাজে তুমি

কৃতিত্ব লাভ করবে? ঠেকা দিয়ে মানুষকে খাড়া রাখা যায় না।

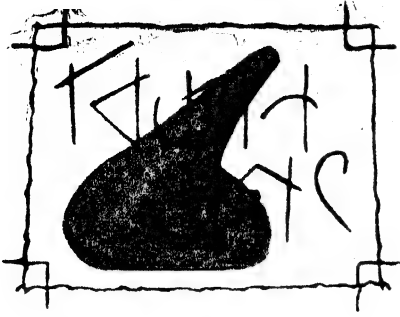
যে-লোক কোনো কাজে করবে মুখোপেক্ষী নয়, তার শক্তি-সামর্থ্য

নিশ্চয় জন্মযুক্ত হবে। বাধা-বিপত্তি শুধু সেই লোকই অতিক্রম করতে

পারবে, যার নিজের শক্তিতে বিশ্বাস আছে। কোনো বিপদে সে

কখনো দম্বে না। এই শক্তিকে বলে পৌরুষ। এই পৌরুষ

মানুষকে সাধনায় লাভ করতে হয়।



বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ

ক্রান্তে মিত্র-শক্তির পক্ষে বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ-লাভ—এ মহাযুদ্ধে
বিরাই কীৰ্ত্তি! এ প্রসাদ-লাভের অন্তরালে যে সাধন-ভজন



জল ভাঙ্গিয়া মিত্র-বাহিনী তাঁরে চলিয়াছে

চলিয়াছিল, তাহার বিপুলতা উপক্রাসের গল্পের চেয়েও অভিনব!
জল স্থল এবং ব্যোম-পথ ব্যাপিয়া এ আয়োজন চলিয়াছিল
অদ্বীত কাল ধরিয়া; এবং এ-আয়োজনে লোকজন অন্তরঙ্গ রশদ-



জাকে চড়িয়া হাফ-ট্রাকে চড়িয়া মিত্র-বাহিনীর গতি

সরঞ্জামের পরিমাণ যেমন বিরাই ছিল, তেমন বিপুল ছিল এ
অভিযানের জন্ত নল্লা বা ম্যাণ-রচনার সমারোহ। এই অভিযানের

জন্ত নল্লা বা ম্যাণ আঁকা হইয়াছিল এক কোটি পঁচিশ লক্ষের উপর।
তার উপর চার হাজার সংখ্যক জাহাজ লক্ষ লক্ষ কোঁজকে
ইংলিশ-চ্যানেল পার করিয়া ক্রান্তের কূলে নামাইয়া দিয়াছিল। এই
সব জাহাজের সঙ্গে গিয়াছিল পাহারাদারের মত বারোখানি বিরাই
রণতরী এবং সহস্রাধিক বিমানপোত। প্যারাসুট এবং বিমান-
বাহিনীতে নর্মান্ডির আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল।
কোঁজকে তাঁরে নামাইবার পূর্বে মিত্রশক্তির বিমানপোতগুলি
হইতে ১১০০০ এগারো হাজার টন বোমা এবং নৌ-সেনাদের
কামান হইতে অজস্র গোলা বর্ষণ করা হয়। নাৎসী স্তোপ লক্ষ্য
করিয়া যে-পরিমাণ গোলা আর শেল বর্ষিত হইয়াছিল, তার হিসাব
দাঁড়ায় গড়ে দশ মিনিটে প্রায় ৩০০ গোলা এবং ২০০ শেল।
নর্মান্ডির উপকূলেই হিটলার গড়িয়াছিল তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর—



নাৎসী-সেনার আত্মসমর্পণ

ওয়েস্ট ওয়াল বা পশ্চিম প্রাচীর। এই প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা লইয়া
হিটলার বহু ভাবে দস্ত প্রচার করিয়াছিল। মিত্রশক্তির দুর্ভব
আক্রমণে নাৎসী-প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং মার্কিন কোঁজ জল
ভাঙ্গিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া সশস্ত্র গিয়া তাঁরে উঠিয়া আক্রমণকে প্রচণ্ডতর
করিয়া তোলে—ডাক, হাফ-ট্রাক এবং বিধিনস্ত চরণযুগলের চূড়ান্ত
সদ্যবহার করিয়া মার্কিন কোঁজ বে ক্ষিপ্ৰকারিতার পরিচয় দিয়াছে,
যুদ্ধের ইতিহাসে তার আর তুলনা নাই। মিত্রশক্তির গতির বেগে
বহু জাঞ্চল সেনা অস্ত্র ফেলিয়া হাত তুলিয়া পরাজয় মানিয়া
আত্মসমর্পণ করে।

জাহাজের আসন

বড় বড় জাহাজ তৈরারী হইবার পর তাহাদের জলে ভাসানোর
ব্যাপারে বেশ ভারী রকমের আয়োজন করিতে হয়। সে
আয়োজনে দীর্ঘ সময় এবং বহু লোকজনের প্রয়োজন ঘটে। যুদ্ধ-
বিগ্রহের এ ঘনঘটাৎ সময়ের মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে—হুঁ-টার
মিনিটের উপর শুধু যাহাযের নয়, জাতির ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।
সে জন্ত বৈজ্ঞানিকেরা বহু কারখানায় জাহাজকে নির্মাণ-কালে সিঁচা
খাড়া রাবিবার জন্ত অতিকার পিঁড়ি বা আসন তৈরারী করিয়াছেন,
সেই পিঁড়িতে জাহাজকে চড়াইয়া তবে তার নির্মাণ সংস্খিত হয়।

নির্দোষ শেখ হুইবামাত্র মোটা তারে বঁধিয়া পিঁড়ি-বদ্ধ জাহাজকে জলের বুকে নামানো হয়। জাহাজ জলে নামিলে তারের প্যাচ খুলিবামাত্র পিঁড়িগানি দু'ভাগে ড'মিকে সরিয়া যায়; এবং পিঁড়ি বা

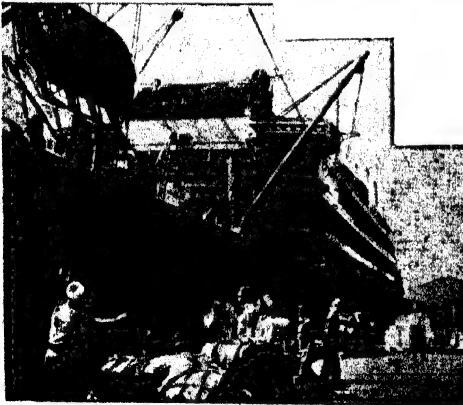


জাহাজের পিঁড়ি

আসন ছাড়িয়া জাহাজ তখন জলের বুকে তার জীবন-লীলা শুরু করে।

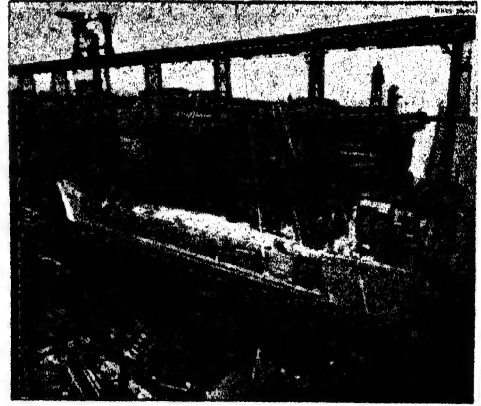
যমদ্বার

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন-শক্তি যে সমর-বাঁটা খুলিয়াছে, সানফ্রানসিসকো-উপসাগরকে সে-বাঁটার ফটক বলিলে অত্যুক্তি



সানফ্রানসিসকোর মাল তোলার

হইবে না। প্রতীচ সাগর-সীমান্ত, প্রতীচ প্রতিরোধ-বাঁটা এক চতুর্থ বিমান-বাহিনীর মূল আস্তানা এই সানফ্রানসিসকোর।



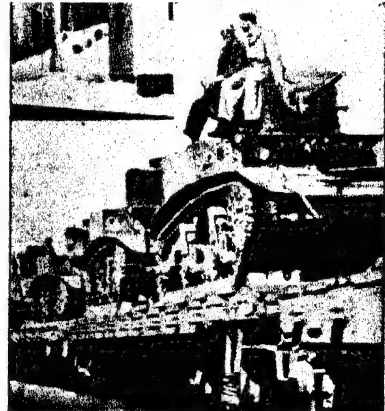
মেঘার ধোঁপে ভাগা ক্রেন

শত্রুর আক্রমণ-রোধ-কল্পে সানফ্রানসিসকোকে চারি দিক দিয়া এমন ভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছে যে, বিপক্ষ-পক্ষের একটি



নৌ-কামানীদের শিক্ষা

মার্কিন-পক্ষের এ তল্লাটে প্রবেশ আজ রীতিমত দুষ্কর! এই সানফ্রানসিসকো হইতে যুদ্ধের মত কিছু রশদ বড় বড়



ট্রেনে চড়িয়া লড়াই-ট্যাংক চলিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে মাল-কাহাজে তুলিয়া দেশ-দেশান্তরে নিত্য চালান বাইতেছে। সানফ্রানসিসকো-উপসাগরের বুকে যে মেঘার ধোঁপ, সেই ধোঁপের

৮-ডকে অভিকায় কেন আছে—মার্ক্সার যেমন মার্ক্সার-কে ধরিয়া তালে, সেই কেনে বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজকে নি ভাবে তুলিয়া সাগরের অর্ধে জলের বুকে চকিতে নামাইয়া যা হয়; এবং এই উপসাগরের ভীম দাঁড়াইয়া নো-কামানীরা স্তম্ভ মহাসাগরের বুক লক্ষ্য করিয়া গোলা বর্ষণ-কৌশল না করে। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে সানফ্রানসিসকো বিরাট বণ-খানায় পরিণত হইয়াছে। বোমা ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সকল দ্রব্যই নিকার বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে—বিরাট ট্রাকে যা শত শত লড়ায়ে-ট্যাঙ্ক চলিয়াছে বিশাল রেল-পথ বহিয়া স্তম্ভ মহা-সাগরের যুদ্ধ-বাঁটাতে।

গৃহিণীর সুবিধা

এর আশ্রানে আমেরিকার নব-নারীদের মধ্যে অনেকেই আজ গৃহ-ভিয়া বাহিরকে আশ্রয় করিয়াছেন। যে সব রমণী গৃহে থাকিয়া কণ্ঠ সাধন করিতেছেন, দু'টি বড় কর্তব্য তাঁদের মনোযোগ টুকু শিখিল করিবার উপায় নাই! ছেলেমেয়েদের লইয়া একটু

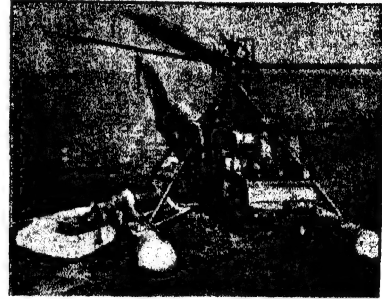


ঠালা-গাড়ীতে ছেলেমেয়ে ও মাল বসা

ডাইতে বাহির হওয়া চাই—নহিলে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা হইবে; সেই সঙ্গে চাই হাট-বাজার করা। এ দু'টি কাজ বাহাতে কসঙ্গে সুনির্কীর্ণিত হয়, সে ভ্রম ছেলেমেয়েদের ঠালা-গাড়ীর সঙ্গে ঠের বাজ্ঞ আঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। গাড়ীগুলি আকারে ছোট; জ্বরের মধ্যে গলি-পথে এ গাড়ী অনায়াসে চালানো যায়। কাজেই জ্বরে কেনাকাটা করিবার সময় পথের উপর গাড়ীতে ছেলেমেয়েদের থিয়া বাইবার প্রয়োজন ঘটে না; ছেলেমেয়েদের তদারকির দ্ব কেনাকাটার কাজও অনায়াসে চলে। গাড়ীগুলির ওজন টি সের অথচ গাড়ীর সঙ্গে আঁটা কাঠের বাজ্ঞে প্রায় চার মণ হনের জিনিষ ধরে। এই ওজনের মালপত্র বহিতে মেয়েদের কষ্ট না।

হেলিকপ্টারের নুতন শক্তি

'হেলিকপ্টার'-গুনের সঙ্গে সম্প্রতি "পোনটন" জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তার ফলে জলের বুক হইতে বিপন্ন নব-নারী বা তাহাজ্ঞ ও বশম্পত্র উদ্ধার করিতে তার সামর্থ্য হইয়াছে অসাধারণ বৃদ্ধম।



হেলিকপ্টার জলে নামিয়াছে

এই উদ্ধার-কার্যের ভার কোষ্ট-গার্ডদের উপর হস্ত হইয়াছে। বিপন্ন নব-নারী জলে পড়িয়াছে দেখিবামাত্র হেলিকপ্টার লইয়া কোষ্ট-গার্ডরা তাহাকে জলে নামায়—নামাইয়া হেলিকপ্টারে আঁটা ট্রেনার-বাস্কেট ভাসাইয়া জল-নিপতিতকে বাস্কেটে তুলিয়া হেলিকপ্টারে আনয়ন করে। জল হইতে মালপত্র তুলিয়া এমনি ভাবেই তাহার উদ্ধার-সাধন হয়। কোষ্ট-গার্ডরা এখন হেলিকপ্টারে চড়িয়া সাগরের পাহারাদারী করিতেছে।

লোহার বর্ষে জাপানী সেনা

কাসলিন ছীপে মার্কিন যৌদ্ধ সম্প্রতি জাপানী সেনাদের কয়েকটি লৌহ-বর্ষ হস্তগত করিয়াছে। এগুলি সেই আর্থার-রাজের নাইটদের



জাপানী সেনার বর্ষাবরণ

অজাবরণের অমুকপ। আপাদমস্তক এই লৌহাবরণে ঢাকিয়া জাপানী সেনারা বেরনেট-যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করে। এ বর্ষাবরণের কল্যাণে অঙ্গের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগিবার আশঙ্কা নাই

প্রথম অধ্যায়

বন্ধুর রামাম্বুজ বন্ধকে অবাক করে দেব ভেবে বিনা খবরে ষ্টেশন থেকে একেবারে তার বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। চাকরদের গাড়ী থেকে মাল-পত্রের নামাতে বলে সোজা দোতলায় তার ঘরে উঠে গেলুম। পড়বার ঘরে রামাম্বুজ চেয়ারে বসে রেলওয়ে টাইম-টেবিল দেখছিল। পদশব্দে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে অনাহুত বিনা এস্টেলার অতিথির জ্ঞান বিরক্ত-মুখে অপেক্ষা করছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে লাঞ্ছিত্যে উঠে একেবারে জড়িয়ে পরে বললে—“কি ব্যাপার? ফাস্তিনি! হঠাৎ! এমন সময়? কেমন আছ? বাড়ীর সব ভাল তো? কবে এলে? কোথায় উঠেছ?”

আমি হেসে নিজেকে তার বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে বললুম—“আমি দশানন নই যে, একসঙ্গে তোমার অতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেব। একে একে বলছি শোন। আগে বসি। সোজা ষ্টেশন থেকে আসছি। কিছু দিন তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব। অনেক দিন পাটনায় থেকে কলকাতার জঙ্গ বিশেষ করে তোমাকে দেখবার জঙ্গ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। বাড়ীর খবর সব ভাল। তবে আমি আশাততঃ শ্রান্ত।”

ভূতাকে ডেকে আমার জঙ্গ চা আনতে হুকুম করে রামাম্বুজ ছেলে বললে—“বত দিন থাকতে ইচ্ছে হয়-থাক, তবে একলা থাকতে হবে। আমার দুর্ভাগ্য—তোমার সাহচর্যালাভে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। চারিধারে একবার নজর কর।”

এতক্ষণ বন্ধুসম্মুখণে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ঘরের কোন দিকে নজর দেবার সময় পাইনি। এখন দেখলুম, স্টটকেশ বেড়ি ইত্যাদি ঘরের এক কোণে লেবেলযুক্ত অবস্থায় সাজানো রয়েছে। অর্ধ অভ্যস্ত মুশ্ঠা।

প্রশ্ন করলুম—“যাচ্ছ?”

উত্তর এল—“হ্যাঁ।”

—“কোথায়?”

—“বহে।”

—“বহে! বল কি? কবে যাচ্ছ?”

—“আজই। বহে মেলে। বার্থ বিচার্ড করা পর্যন্ত হয়ে গেছে।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম—“ভেবেছিলাম, একসঙ্গে একটু হৈ-টো করা যাবে—”

বাধা দিয়ে রামাম্বুজ বললে—“আমারই কি এখন যেতে মন চাইছে, কিন্তু কি করব? কথা দিয়ে ফেলেছি।”

ভূতা চা দিয়ে গেল। রামাম্বুজ বললে—“কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা যাবে, কি বল?”

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললুম—“অগত্যা। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো। হঠাৎ বহে যাচ্ছ কেন?”

রামাম্বুজ বললে—“সবটা খুলে বলি শোন। ভারতবর্ষে এখন সব চেয়ে বড়লোক কে জান? গায়েকওয়াড, নিজামের চেয়েও বড়লোক।”

—“কে?”

—“শ্রামল দাস।”

—“শ্রামল দাস! মানে শ্রামল মিলসের শ্রামল দাস?”

হেসে রামাম্বুজ উত্তর দিলে—“হ্যাঁ। কোটিপতি বললেও কিছু বলা হল না। ভারতবর্ষের শতকরা আশ্টি কাপড়ের কল তার নিজস্ব কিংবা সেই সব চেয়ে বেশী শেয়ারের মালিক। তার

এক জন সেক্রেটারী আমার কাছে এসেছিল। কি এক গণ্ডগোলের জঙ্গ তার আমার পরামর্শ চায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপারটার হদিস করতে হবে। আমি প্রথমে যেতে রাজী হইনি। বললুম, সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললে এইখানে বসেই পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু সেক্রেটারীপুঙ্খব কিছুই বলতে পারলে না। শুধু এক কথা, ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজ করে বার করতে হবে। আমি হয় তো রাজী হতুম না, কিন্তু যা কী দিতে চাইলে তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলুম। সমস্ত জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থেতে পারব। ভাবলুম, কাজ-কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে সেই অর্ধে তোমার জমীদারীর কাছে একটা বাড়ী কিনে দুই বন্ধুতে একত্রে থাকা যাবে! রাজী হলুম।”

আমি বললুম—“বেশ তো, এক কাজ কর না। দু’এক দিন পরে বেও। আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারব। বহুটা বেড়িয়েও আসা যাবে।

আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে রামাম্বুজ বললে—“তা হয় না বন্ধু! রামাম্বুজের কথা নড়চড় নেই। কোন একটা অসম্ভব রকম ঘটনা, অথবা জীবন-মৃত্যু নিয়ে টানাটিনি—”

নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলুম—“তার তো কোন লক্ষণ দেখছি না। হঠাৎ যে রবাহুত এক অতিথি এসে এখন এই শেব মুহূর্ত্তে বলবে—‘বাঁচাও জীবন-মৃত্যু সমস্তা—এমন তো কোন সম্ভাবনা দেখছি না।’

ঠাটন ছলে কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দে হুঁভনেই চমকে উঠলুম।

প্রশ্ন করলুম—“কি?”

রামাম্বুজ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে—“অনাহুত অতিথির পদশব্দ। শোবার ঘর থেকে আসছে বলে মনে হয়।”

বিস্মিত হয়ে বললুম—“তোমার শোবার ঘরে! কে?”

—“জানি না। অনাহুতেরা খবর দিয়ে আসে না।” হয় তো

আমাকে স্নেহ করল। পাণ্টা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শোবার ঘরের দরজা ঘের ঘের খুলে গেল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক মহুবা-মুগ্ধি! পাগলের মত উন্মোহ-মুগ্ধা চেতারা। জামা-কাপড়ে ধূলা-কাদা মাখা। চোখ কোটরগত, মুখ শুকনো, গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। সেকেণ্ড খানেকের জঙ্গ আমাদের দিকে চেয়ে হঠাৎ টলে পড়ে গেল। রামাম্বুজ ভাড়াভাড়ি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নাড়া দেবার্থে বেরিয়ে আমাকে বললে—“জল।”

কুঞ্জো-গেলাস বেড়িএর পাশেই রাখা ছিল। কিছুক্ষণ মুখে চোখে জলের কাপটা দিতে আগন্তুক ঘের ঘের চোখ মেলে চাইল। আমাতে রামাম্বুজের ধরাধরি করে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলুম। মুখে চামচে করে একটু একটু জল খাইয়ে দিতে কিছুক্ষণ পরে শূন্যদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—“রামাম্বুজ বহু, ২৫, এভিনিউ টেরাস।”

রামাম্বুজ তার মুখের কাছে বৃকে পড়ে বললে—“আমার নামই রামাম্বুজ বহু। বলুন, কি বলবার আছে।”

আগন্তুক রামাম্বুজের কথা হয় শুনতে না হয় বুঝতে পারল না। মেশিনের মত এক কথাই ক্রমাগত বলে যেতে লাগল—“রামাম্বুজ বহু, ২৫, এভিনিউ টেরাস।”

রামাম্বুজ অনেক রকমে আগন্তুককে অস্ত্র কথা কওয়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোন কল হল না। কখন চুপ করে থাকে,

আবার কখনও সেই একই কথা ক্রমাগত বলে চলে। রামাহুজ লসে—“ফান্টি, একবার অসিতকে টেলিফোন কর। এখনি দাসতে বল। ভেরী আক্সেন্ট।”

ডাক্তার অসিতবরণ চৌধুরী আমাদের বন্ধু-লোক। মোড়েরি চার প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বাপের অগাধ টাকা। তা ছাড়া নেজের প্র্যাক্টিসও ভাল। সৌভাগ্য বশত: বাড়িতেই তখন ছিল। বে কিরেছে। খবর পেতেই বললে—“আসছি।”

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হস্তলব্ধ হয়ে ওপরে এসে বললে—“বাপার কি বল তো? এই মরণাপন্ন লোকটিই বা কে?”

রামাহুজ বসে অল্পে সম্ভব ব্যাপারটা শুঁড়িয়ে বললে। রোগীকে মনেক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে অসিত বললে—“বাপারটা রীতিমত বারালো।”

বললুম—“ব্রেন-কিবার। কি বল?”

আমার দিকে চেয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হেসে অসিত উত্তর দিলে—“ব্রেন-কিবার না ছাই। তোমাদের যত সব বুদ্ধকিকি। ব্রেন-কিবার আবার কি? নাটকে নভেলে ফিগো কথায় কথায় নায়কের ব্রেন-কিবার হয়। ভুল বকে। ডাক্তাররা চোখ কপালে তোলে। ায়িকা এসে অস্ত্রাস্ত্র সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। নায়ক-নায়িকার মত, অভিমানে শেষ হয়ে যায়। ডাক্তার বলে—‘মা, তোমার জন্তই রাগী প্রাণ ফিরে পেল।’ মিলন হয়ে গেল। ফিনিস।”

—“তবে ব্যাপারটা কি?” রামাহুজ প্রশ্ন করলে।

—“ঠিক বলতে পারছি না”—অসিত উত্তর দিলে। “মনে হচ্ছে, কান একটা আইডিয়া মাথার মধ্যে এমন ভাবে বসে আছে যে অল্প কান চিন্তা অথবা কথা সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না। নেকটা অবসেশনের মত। আচ্ছা, ওর হাতে কাগজ-পেনসিল নিয়ে দেখ তো কি করে।”

আগন্তুককে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসালুম। রামাহুজ তার হাতে একটা পেনসিল ও রাইটিং প্যাড দিলে। সে কিছুক্ষণ পেনসিল হাতে চূপ-চাপ বসে রইল। তার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি লিখতে আরম্ভ করল। আমরা একদৃষ্টে তাকে পড়ে দেখতে লাগলুম, যদি কান কথা লেখে। কিন্তু নিরাশ হতে হল। সে কেবলই একটি খ্যা লিখতে লাগল—৩৩৩৩। তিনগুলি ক্রমেই বৃহদাকার হতে তে গোটা পাতা ভরা একটি তিন লিখে হাত থেকে প্যাড-পেনসিল ফলে দিয়ে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা মুখ-চাওয়াচাষি করতে লাগলুম। মাথা-মুণ্ডি কিছুই বুঝলুম না।

অসিত বললে—“আমি এখন চললুম। সেই সকালে বেরিয়েছি। ডাী চুকতে না চুকতেই তোমরা ডেকে পাঠালে। এখনও নাওয়া ওয়া হয়নি। সন্ধ্যার দিকে একবার আসব। কেসটা বুঝই টায়েস্টি। এর দিকে একটু নজর রেখ।”

আমি অসিতকে রামাহুজের বসে যাবার ব্যাপারটা জানিয়ে লুম—“আমি মনে করছি, রামাহুজকে হাওড়া পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব।”

অসিত বললে—“তাতে কি? লোকটার পালাবার কোন ভর ই। কারণ, অন্তস্ত হৃদয়। হয়তো এখন দিবারাত্রি-ব্যাণী ক লখা মম দিতে পারে! চাকরকে একটু নজর রাখতে বলে ও। আর আমি সন্ধ্যার দিকে তো একবার আসছিই।”

অসিত চলে গেল। রামাহুজ বাকী জিনিস-পত্তর শুদ্ধোতে শুদ্ধোতে বললে—“সময় বহিয়া যায়। আর মাত্র এক ঘণ্টা আছে। ফান্টি, তোমার একটা ইন্টারেস্টিং কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি! রহস্য-ঘন সমস্ত। অনাহুত অতিথির আগমন। কে? কি? কেন?”

হেসে বললুম—“বেশ শোনাচ্ছে। যেন উপভাস। অবস্ত্র মেটিরিয়ালের একান্ত অভাব। শুধু কতকগুলো তিন। নামকরণ করা যাবে—“ত্রিমুণ্ডি। কি বল?”

রামাহুজ কিছু বলবার সময় পেল না। রোগী হঠাৎ শয্যায় উঠে বসল, যেন বৈদ্যাতিক শক্তি পেয়েছে। তার পর দম-শেষে গ্রামফোনের মত গড় গড় করে বলে চলল—“ত্রিমুণ্ডি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টি করে ত্রিমুণ্ডির মাথা। বিষ্ণু বাঁচিয়ে রাখে—দেহ। আর মহেশ্বর ধ্বংস করে—ত্রিমুণ্ডির হাত-পা। ব্রহ্মা ত্রিমুণ্ডির বুদ্ধিবল, বিষ্ণু অর্থবল আর মহেশ্বর বাহুবল।”

যেমন অকস্মাৎ কথা আরম্ভ হয়েছিল, তেমনই অকস্মাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। রোগী ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখে-চোখে ভীতিব্যঞ্জক ভাব।

রামাহুজ গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বললে—“ঠিকই ভেবেছিলুম। কথাটা মিথ্যা নয়।”

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম—“কি?”

—“এখন বলবার সময় নেই। বললেও বুঝতে পারবে না। আমি নিজেই এখনও কিছু বুঝতে পারিনি। সবই ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরো টুকরো খবর। আর দেবী করলে ট্রেন ধরতে পারবো না। যদিও যাবার ইচ্ছা মোটেই নেই। কিন্তু নিরুপায়। কথা দিয়ে বিনা কারণে কথার খেলাপ করতে চাই না। চল ফান্টি, বাওয়া হাক।”

দু’জনে মোটরে উঠলুম। ইচ্ছা ছিল রামাহুজকে কিছু প্রশ্ন করি, কিন্তু দেখলুম, সে গম্ভীর মুখে বসে গভীর চিন্তার মগ্ন। ট্রেনে নেমে প্রাটফর্ম-টিকিট কিনে উভয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। বসে মেল প্রাটফর্মের টাড়ায়েছিল। ট্রেন ছাড়বার মিনিট হয়েক বাকী। হঠাৎ রামাহুজ বলে উঠল—“ফান্টি, নেমে পড়। একটা কুলি ডাক। উঃ, আমি কি বেতুব। এই সহজ কথাটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। ছিঃ ছিঃ।”

অবাক হয়ে গেলুম। কিছুই বুঝতে পারলুম না। সবই হৈয়ালী। লোকটা লেপে গেল না কি। কিন্তু রামাহুজের ওপর আমার বিশ্বাস অগাধ। বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। কুলি ডেকে মাল-পত্র নিয়ে ট্রেনের বাইরে এলুম। শুধিকে ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্ত মোটর অপেক্ষা করছিল। উভয়ে উঠে বসলুম। রামাহুজ ধ্যানমগ্ন বৃদ্ধের মত বসে রইল। আমি আর কৌতুহল চেপে থাকতে পারলুম না। একটু রেগেই বললুম—“বাপারটা কি বুসে বললে একটু বারিত হব।”

রামাহুজ আমার দিকে চেয়ে ঈর্ষ হেসে বললে—“বন্ধুদর, এতক্ষণ পরে যেন আলোক দেখতে পাচ্ছি।”

বিরক্ত হয়ে বললুম—“হয়তো পাচ্ছ, কিন্তু আমি যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি।”

রামাহুজ বললে—“আমিও এতক্ষণ তিমিরেই ছিলাম। ট্রেনে

বসে হঠাৎ আলোক দেখতে পেলুম। বাপারটা বুঝতে পারছি না। আমাকে কলকাতা থেকে সরাবার বড় বন্দু।

—“হ্যাঁ, বল কি?”

—“হ্যাঁ এবং অতি চতুর ভাবে। তারা আমাকে ভয় করে।”

—“কারা?”

—“ক্রিম্ভি। পবেশ আরও জোরে চালাও। যত জোরে পার। ঠিক সময়ে বাড়ী পৌঁছতে পারলে বাঁচি।”

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—“হঠাৎ এ কথা কেন?”

রামাভুজ উত্তর দিলে—“কল্প অতিথির ভক্ত বিলক্ষণ ভীত হয়ে পড়েছি।”

—“কেন? প্রাণের ভয় আছে?”

—“হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, বাড়ী পৌঁছে তাকে জীবিত দেখতে পাব না।”

দরজার গাড়ী দাঁড়াতেই রামাভুজ লাফিয়ে নেমে পড়ল। আমিও দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ করলুম। বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই রামাভুজের বাস ভূত্যা সদাশিবের সঙ্গে দেখা। অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করলে—“কিরে এলেন?”

গভীর ভাবে রামাভুজ বললে—“হ্যাঁ, ট্রেন ফেল করেছে, আমার অবর্তমানে কেউ এসেছিল?”

সদাশিব উত্তর দিলে—“আজ্ঞে না। কেউ আসেনি।”

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রামাভুজ তাড়াতাড়ি দ্বিতলে উঠে গেল। আমিও পিছু পিছু গেলুম। দ্রুতপদে গিয়ে শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলেই রামাভুজ ধমকে দাঁড়াল। “ফাস্টনি, বা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই হয়েছে।”

ব্যগ্র ভাবে জিগোস করলুম—“কি?”

—“মরে গেছে।”

এতক্ষণে হৃৎকেন্দ্রেই ঘরে ঢুকেছি। রামাভুজ গায়ে হাত দিয়ে, নাড়ী দেখে, নাকের কাছে আশী রেখে পরীক্ষা করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—“মরে গেছে। তবু একবার অসিতকে খবর দাও।” তার কথার ভক্তিতে একটা ভরানক বকম নিরাশা।

আমি তাড়াতাড়ি অসিতের কাছে গেলুম। বাড়ীতেই ছিল। বলা মাত্রই আমার সঙ্গে চলে এল। রোগীকে পরীক্ষা করে বললে—“ডেড। সেই সকালের লোকটা না?”

রামাভুজ উত্তর দিল—“হ্যাঁ। মৃত্যুর কারণ বলতে পার?”

অসিত ডাক্তারোচিত গাভীধোর সঙ্গে বললে—“বলা শক্ত। কখনও হওয়ার মত মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার ঘরে তো গ্যাস নেই।”

—“না। ইলেক্ট্রিক।”

ক্ষয়ের চারি ধারে দেখে অসিত বললে—“কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এইবার তোমাদের কাজ। পুলিশে একটা খবর দিও। আচ্ছা, চলি, আমার কিছু করবার নেই।”

অসিত চলে গেল। রামাভুজ পুলিশ ইন্সপেক্টর দীপঙ্কর সেনকে আসবার জন্য টেলিফোন করে দিলে। এমন সময় রামাভুজের ভূত্যা সদাশিব এসে ঘরে ঢুকল। প্রকৃত খাটে একটি মৃতদেহ শায়িত দেখে চমকে উঠল। ভীত হয়ে প্রশ্ন করলে—“লোকটা কখন গেল?”

রামাভুজ বললে—“হ্যাঁ। আমাদের অবর্তমানে কেউ আসেনি ঠিক তো?”

সদাশিব উত্তর দিলে—“আজ্ঞে হ্যাঁ। চলক করে বলতে পারি আমি সমস্ত ক্ষণ ফাস্টনি বাবুর ভক্তে সব দরজার বসে ছিলুম কেউ এলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম। তবে এখন এক জন লো: এসেছে। নীচে দাঁড়িয়ে আছে।”

—“কে?”—রামাভুজ প্রশ্ন করলে।

—“আজ্ঞে তা জানি না। নাম বলনি। বললে, উদ্ভাব-আল: থেকে এসেছে।”

রামাভুজ বললে—“আচ্ছা, তাকে এটোখানেই নিয়ে এস।”

সদাশিব চলে গেল। রামাভুজ মৃতদেহ চালায়ে আনতে ক: চাপা স্বরে বললে—“দীপঙ্কর না আসা অবধি মৃতদেহ একলা ফে: অন্তর্য যাতো চলবে না। এর ভেতর কোন রকম আছে বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক মৃত্যু—হয়তো হত্যা।”

ততক্ষণে এক মোটা মোটা, তকমা কাটা ব্যক্তিকে নিয়ে সদাশিব: হাজির হয়েছে। আমাদের নমস্কার করে সে বললে—“আজ্ঞে আমি উদ্ভাব আলম থেকে আসছি। আজ কোরে হাসপাতাল থেকে এক জন পাগল পালিয়েছে। সন্ধান নিয়ে নিয়ে জানতে পাবলুম এই বাড়ীতে ঢুকছিল।”

রামাভুজ উত্তর দিলে—“হ্যাঁ, ঢুকছিল বটে।”

ব্যস্ত হয়ে লোকটা জিগোস করলে—“সন্ধান? আবার পালিয়েছে কি বিপদ?”

গভীর স্বরে রামাভুজ ভাব দিলে—“পালাননি, মারা গেছে।”

বিস্মিত হয়ে লোকটি বললে—“মারা গেছে? বলেন কি?”

রামাভুজ বললে—“হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক হ'ল মারা গেছে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটি নিশ্বাস ফেলে লোকটি বললে—“যাক, ভালই হ'ল। লোকটা শান্ত হল। আমরাও বাঁচলুম।”

—“কেন? খুব ভয়লেন্ট ছিল?”—রামাভুজ প্রশ্ন করলে।

—“আজ্ঞে না। অতি শান্ত ছিল। একবারে শুয়ে পড়তে বাক্য নাহাতে চাইত না, খেতে চাইত না, কাকর সঙ্গে কথা পছন্দ বল: না। কিন্তু এক এক সময় যেন ক্ষেপে উঠত। ক্রিম্ভি ক্রিম্ভি বলে চিৎকার করত। ঘটায় পর ঘটনা সব আবেল ভাবল বক্ত।”

রামাভুজ জিগোস করলে—“আচ্ছা, হাসপাতালে কত দিন থেকে ছিল বলতে পারেন?”

—“তা, বছর দু'য়েকের ওপর হবে।”

—“আপনাদের কি কখনও মনে হয়নি যে লোকটা পাগল না: হতে পারে। হয়তো প্রকৃতিস্থই ছিল।”

একটু হেসে লোকটি বললে—“বলি পাগলই না। হবে তবে পাগল: গারদি কি করতে থাকবে।”

লজিক অকাটা। এর পর আর কিছু বলা চলে না। রামাভুজ চুপ করে গেল। হয়তো বলবার মত কিছু খুঁজে পেল না।

লোকটাই বললে—“একবার দেখলে চিনতে পারতুম—”

রামাভুজ “নিশ্চয়ই” বলে মৃতদেহের মুখ থেকে চামড়া সরিয়ে দিলে। দেখেই লোকটি বলে উঠল—“আজ্ঞে হ্যাঁ, এই পালিয়ে ছিল আচ্ছা, আমি হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানাই। কর্তৃপক্ষের এ: জনের আসা দরকার। পুলিশও খবর দিতে আস: .”

—“কিন্তু কাজটা খুবই বোকার মত হয়নি কি? ধব, আমায়
জকে চিনে যেসকলুম।”

বাসায়স্থ ব্যক্তদের বললে—“কি ছাই চিনলে শুনি। শোভাটাকে দেখে আয়ব। হাসপাতালের কর্মচারী মনে করলুম, কিন্তু সে মোটেই তা নয়। অতএব চম্ভবেশ, এবং এমন নিখুঁত যে আমাদের মনে কোন সন্দেহই জাগল না। তার যে রূপ আমরা দেখেছি সেটা আসল রূপ নয়। তার আসল চেহারা যে কি, তা আমরা জানি না। আবার বেগলে চিনতেও পারব না।”

জলকূট স্বরে বললুম—“তুমি কি বলতে চাও, আবার দেখা হবে।”

বুড় গম্ভীর কণ্ঠে রামানুজ বললে—“হবে কাক্ষনি, নিশ্চয়ই হবে।

জায়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমার বিরুদ্ধে। কুলদারজনকে তারাই আটক রেখেছিল। কোন মতে সে আমায় খবর দিতে পাালিয়ে এসেছিল। কতটা বলতে পেরেছে তা হয়তো তারা এখনও জানে না। তবে নিশ্চয়ই সল্লেই করেছে যে আমরা কিছু জানতে পেরেছি। অতএব আজ থেকে মৃত্যুদণ্ড আমাদের ছায়াবর মত অনুসরণ করবে। এই জীবন-মরণ যুদ্ধ। হয় আমরা, না হয় তারা—এক পক্ষের জীবন অবসান না হলে এ যুদ্ধের শেষ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুলদারপত্তনের বহুশতাব্দিক ইত্যার প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে এক দিন
রামানুজ বললে—“চল ফাঙ্কনি, তোমায় এক জনদের বাড়ী বেড়িয়ে
আনি।”

—“কোথায় ? কাদের বাড়ী ?”—জিগোস করলুম, কিন্তু রামামুখ কোন উত্তরই দিলে না ! ওর স্বভাবই ঐ রকম । ঠিক বড়টুকু স্বপ্ন বলবার ইচ্ছা হয় বলে । প্রেম করে ওর কাছ থেকে কিছু বার কলার উপায় নেই ।

লোকাল ট্রেনে চেপে বেলুড়ে গিয়ে হাজির হলাম। পথে যেতে যেতে বামদিক বালু—বাচ্ছি আমার এক বন্ধুর কাছে। পঙ্কাবে বহু দিন ছিলেন—সেখানকার রিটার্ড প্রেস-অফিসার। আমার চেপে বসে অনেক বড়।”

—“কই, তাঁর কথা তো কখনও শুনিনি। ভদ্রলোকের কি নাম?”

—“নাম বললে চিনতে পারবে না। তবে ঝাঁর গাড়ী যাক্ তাঁর

নাম জেনে রাখা ভাল। নাম—“জয়শঙ্কর লাহিড়ী। সরকারী কাজে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই লাহিড়ী মশায়ের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। বেলুড়মঠের অনতিদূরে গল্গার ধারে মিথ্য একখানি বাগান-বাড়ী। ভঙ্গলোক বাড়ীতেই ছিলেন। খবর দিতেই এগেলেন। নমস্কার, পরিচয়, কুশলাদি সংবাদ আদান-প্রদানের পর ভ্রম্যেশ বাবু রামাচন্দ্রকে জিজ্ঞাস্য করলেন—“তার পুত্র, কি মনে করে আসা হ’ল—আপনার তো আজকাল খুব নাম আর প্রতিপত্তি। বিনা কান্ধে যে এসেছেন, এ কথা তো বিশ্বাস করতে পারছি না।”

একই লজ্জিত ভাবে রাধামুখ বললেন—“অভিযোগ করবার
কারণ রয়েছে বৈ কি ! কিন্তু সত্যই ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম বলে
জানতে পারিনি। আপনি ঠিক ধরেছেন। আজ একটা বিশেষ

কুলদ্বারজনের আকর্ষক আবির্ভাব ও মৃত্যুর কথা সন্ধিবেশে বর্ণনা করে বামামুখ জিগোস করলে—“আপনি তো পঞ্চাব অকলে কই দিন ছিলেন। তা ছাড়া অনেক স্থানে ঘুরেছেন। ত্রিমূর্তির ব্যাপারটা আমার কাছে একবারে হেয়ালী ব মত ঠেকেছে। সবই যেন কপকথা ব মত অবিদ্বাঙ্গ। কিন্তু লোকটা যে যথেষ্ট এটা তো নিতু ক সত্য; এব হত্যা, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আপনি যদি কিছু জানেন—”

চরেশচন্দ্র বললেন—“পরিহার কিছু না জানলেও জিম্মিত্ব সম্বন্ধে অনেক কানায়ুধো ভুলিছি। সরকারকে জানিয়ে ভিলুয়, কিন্তু তাঁরা আমার কথা বিধাস করেননি। উৎকট কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, জিম্মিত্বের অস্তিত্ব আপনার আমার অস্তিত্বের মতই সত্য। পড়াবের এক ব্যক্তি এই জিম্মিত্বের স্রুজা অর্থাৎ মাথা মানে বুদ্ধিবল। ভারতই পরিচালনার এক বিরাট বড়ত্ব গড়ে উঠছে। শুনেছি, সে সি এক অস্তি উল্ল বিখ্যাতবিহার করছে যার কয়েক কোটির এক বিধা জমির শত শতাংশ হয়ে একবারে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ভারতবাসী থাকের অভাব, ফলে খাজ চাষ, দূষণের অবশেষে প্রতিক। সামাজিক শৃঙ্খলার অবসান, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব। এক কথায় ভারতবর্ষের, ভারতবাসীর মৃত্যু।”

আমি অভিজ্ঞতর মত কৃত্ত বস এই অবিদ্যাত কাহিনী
 জনছি ম। প্রসঙ্গ কলম—“বাধা”

কয়েশচক উত্তর দিলেন—“বাথ নিশ্চয়ই কিছু আছে, তবে সেটা আমার ঠিক জানা নেই। ভাবতবাহে এখন যা কিছু গন্তগোল মধ্যস্থত, মাঝপাট ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে, প্রায় সবকই পেছনে আছে। সেই বন্ধা আর তার কটকটি।”

আমি একটু হেসে বললাম—“কখনোটা একটু—”

বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে প্রশ্নাভূত বললে—“প্রত্যেক কাজে
পিছনেই কল্পনা শক্তি থাকে, তবে কোন্টো লজিক্যাল আ-
কোন্টো নয়, সেটটা জানা দরকার। পুতুল-নাচ যে দেখিনি তাই
স্বতঃ। টেনে পুতুল নাচান যায় বললে চলেছে। বিশ্বাস করবে না
আপনার কথা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করছি জয়ন্ত বাবু। এক
অবধি প্রমাণ পেয়েছি ছাটো। শ্রেয়স আমাকে কলকাতা থেকে
সরাসরি প্রোফেসর ছোটো সোভাগ্যকামে বিকল করেছিল, আর দ্বিতী
কুলদারপুত্রেই হল। ছাটোভাষণতঃ আমি ঠিক সময়ে কলকাতা এ-
বাধা নিতে পারিনি। আচ্ছা, হিম্মতি সবচেয়ে ক'জন লোক জানে।”

কয়েশচন্দ্র উত্তর দিলেন—“তা বলতে পারি না। তবে আমি মনে হয়, দু’চার জনের বেশী জানে না। তবে হাবাই জানে তাদের প্রাণের আর কোন মূল্য নেই।”

—“কেউ তাদের বাথা দেবার অথবা শুণ্ড অভিসন্ধি প্রকাশ
 চেষ্টা করেনি ?”—বামানুজ জিগোস করলে ।

জরেশ বাবু চাবাব দিলেন—“কবেছে। অন্তত দু'জনকে আ
জানি, কিন্তু তারা আর ইচ্ছাপূৰ্বে নেই। এক জন তাদের সব
সিখছিল, সর্পাঘাতে তার অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। আর এক
টেলিফোন করতে গিয়ে হাটফেল করেছে। আদার সঙ্গে এই
তাকে জোর করে উগ্র বিশ্ব ত্যাগের জন্যে প্ররোচিত করে।

হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আপনাদের যে কিছু জানাবার চেষ্টা করেছিল।

রামায়ুজ প্রশ্ন করলেন—“তাদের সম্বন্ধে আরও বেশ কিছু জানেন এমন কোন লোক আপনার সম্মানে আছে কি?”

জয়শচন্দ্র বললেন—“আমার এক বন্ধু বাহাগতে থাকেন। পছন্দে ছিলেন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তিনি হয়তো কিছু জানলেও জানতে পারেন। আজই তাঁর কাছে বাবার কথা আছে। একটা চিঠি লিখেছেন, দেখাচ্ছি।” জয়শচন্দ্র উঠে গিয়ে চিঠি নিয়ে এলেন।—“এই দেখুন।”

আমরা পড়লুম—

“জয়শ বাবু,

বিশেষ দয়াকরে সাক্ষাৎ চাইছি। আমি যেতে চাই না, কারণ আছে। আপনি পত্র পাঠা মাত্রই আসবেন। সাক্ষাতে সকল কথা বলব।

বিনীত

ত্রিপুরাপদ বাগচী”

রামায়ুজ উত্তেজিত হয়ে বললেন—“চলুন, এই ব্রহ্মর্থে বাওরা যাক। বিলম্বে বাগচী মহাশয়ের বিপদ হতে পারে।”

আমি অবাক হয়ে গেলুম। এটী সামান্য চিঠির মধ্যে এমন কি আছে, যে জড় রামায়ুজ উত্তেজিত হতে পারে। জয়শ বাবুও বোধ হয় আমার মতই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রশ্ন করলেন—“এই নিরীচ চিঠির মধ্যে কি দেখলেন?”

রামায়ুজ বাস্তব বলে—“অনেক কিছু। হয়তো সবটুকুই কল্পনা কিন্তু সত্যও তো হতে পারে। দেখছেন না, ‘ত্রি’কথাটা মোটা করে লেখা। অতএব তাঁর নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে আর সেই অর্থ হল ‘ত্রি’ অর্থাত্ ত্রিপুরা। অতএব আর সেরা করা উচিত নয়।”

জয়শ বাবু বিস্ময়িত লোচনে রামায়ুজের দিকে চেয়ে বললেন—“কথাটা যেন সত্য বলেই মনে হচ্ছে, যদিও শোনান্ধে তপস্কার মত। চলুন, আর সেরা নয়।”

বাহাগতে ত্রিপুরা বাবুর বাড়ী পৌঁছতে প্রায় খটা হুঁরেকের গুণ লাগল। গিয়েই দেখি, বাড়ীর বাহিরে এক জন কনট্রোল পাড়িয়ে। জয়শচন্দ্র বাড়ীর ভেতর ঢুকতে যাচ্ছেন, এমন সময় সে বাধা দিল—“কার সঙ্গে দেখা করতে চান?”

জয়শচন্দ্র পুলিশ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। এই বাধা এবং প্রশ্নে অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললেন—“কার সঙ্গে মানে? বাড়ীর মালিকের সঙ্গে। ত্রিপুরা বাবুর সঙ্গে।”

কনট্রোল কটমট করে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—“ত্রিপুরা বাবু! জানেন না, আজ সকালে তিনি খুন হয়েছেন?”

আমরা চমকে উঠলুম। চোখের সামনে ভূত দেখলেও মানুষ বোধ করি এমন ভাবে চমকায় না। কাকুর মুখে কথা নেই। প্রথমে রামায়ুজই কথা কইলে। বললেন—“বিনি চাচ্ছে আছেন তাঁকে গিয়ে খবর দাও, রামায়ুজ বস্তু দেখা করতে চান। ক্যালকাটা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অফিসার বীপস্বর সেনের কাছ থেকে আসছি।”

একটু পরেই আমরা ভেতরে বাবার অস্থতি শেলুম। স্থানীয় ইন্সপেক্টর খুব বাড়ির করলেন এবং খুনের ব্যাপারে যা যা জানতে

—“আজ সকালেই ত্রিপুরা বাবুকে কেউ খুন করেছে। আমাদের সম্মত, এ কাজ তাঁর চাকরের। লোকটা নতুন। তাঁর কীচাঁচর খুঁটে ‘তিনপ’ টাকার মোটা পাওয়া গেছে। ঘরের বস্তাবাধা পুত্রিক—তাঁর পায়ের সঙ্গে হবহ মিলে যায়। কাপড়ের-জামার একটু আধটু রক্তের লাগও আছে।”

রামায়ুজ বললেন—“বৃত্তসেহটা দেখতে পারি কি?”

ইন্সপেক্টর বললেন—“নিশ্চয়ই। আপনাকে দেখাতে কোন আপত্তি নেই। আপনাকে কে না চেনে বলুন। তাঁর গুণর আপত্তি বীপস্বর বাবুর বন্ধু।”

বৃত্তসেহ দেখলুম। মনে হল যেন খুব দারাল কোন আত্ম দিলে গলার নালি কেটে কোলা হয়েছে।

ইন্সপেক্টর বললেন—“দেখছেন, দু'ব দিলে গলার নালি কেটেছে। নিশ্চয়ই ত্রিপুরা বাবু চূপ করে বসে কঠিনালি কাটতে গেলেন। তাঁর মানে, আগে তাঁর মাথার আঘাত করে অজ্ঞান করে তবে এই কাজ করা হয়েছে। এই দেখুন, মাথার আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।”

রামায়ুজ বললেন—“আপনি খুব বিচক্ষণ ভাবে সব জিনিষই লক্ষ্য করেছেন দেখছি।”

প্রশংসার গলে গিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন—“আরে, এ তো আমাদের কর্তব্য। এই চাকরটাই খুঁটা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কি বলেন?”

রামায়ুজ বললেন—“একবার চাকরটার সঙ্গে দেখা হতে পারেন না? হুঁ-একটা কথা জিজ্ঞাস্য করতুম।”

ইন্সপেক্টর “বিলম্বণ” বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এক একটু পরেই শৃঙ্খলিত ভৃত্যকে নিয়ে হাজির হলেন। রামায়ুজ ভৃত্যকে অতি সাধারণ হুঁ-চারটে কথা জিজ্ঞাস্য করলে। খুনের সম্বন্ধে কোন কথাই হ'ল না। তাঁর পর ইন্সপেক্টরকে বললেন—“বস্তাবাদ, আর কিছু প্রশ্ন করার নেই। এবার একে পাড়িয়ে দিতে পারেন।”

ভৃত্য চলে গেলে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন—“রামায়ুজ বাবু, আপনি ওকে খুনের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য করলেন না তো?”

রামায়ুজ মুহূর্তেই বললেন—“পরে করব। একবার বাড়ীটা ঘুরে দেখতে পারি কি?”

ইন্সপেক্টর উত্তর দিলেন—“নিশ্চয়ই পারেন। আমিও সঙ্গে আসিব?”

রামায়ুজ বললেন—“না, আমি একলাই ঘুরে বেড়াতে চাই। অজানা লোক বাড়ীতে ঢুকলে তাঁর কি রকম মনোজর্জর হয় তাই দেখব।” রামায়ুজ চলে গেল।

ইন্সপেক্টর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—“রামায়ুজ বাবু একটু ভাবপ্রশ্ন। পুলিশের কাজে ভাবের স্থান নেই, সেখানে চাই কেবল সত্য ও প্রমাণ।”

আমরা রামায়ুজের জড় অপেক্ষা করতে করতে অনেক রকম কথাবার্তা কইলুম। ইন্সপেক্টর আমাদের দু'জনেই জানিয়ে দিলেন যে চরমাসই খুঁটা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সমস্ত প্রমাণই তাঁর অপরাধের দাঁড়ী বিহীন।

কিছুক্ষণ পরে রামায়ুজ এসে উপস্থিত। হাতে কাটা-কাছের বস্ত্র। এসেই বললেন—“কাজটা, দেখেই টাটকা হয়ে।”

না কি। কীভাবে বললুম—“হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বই কি। টাটকা মাছ। তাতে কি হয়েছে?”

—“কি হয়েছে মানে? অনেক কিছু হয়েছে।” রামাহুজ উত্তর দিলে। তার পর ইন্সপেক্টরকে বললে—আর একবার চাকরটাকে ডাকতে পারেন।

চরণদাসকে আবার উপস্থিত করা হ'ল। রামাহুজ প্রশ্ন করলে—“যখন ত্রিপুরা বাবুকে হত্যা করা হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে?”

—“আজ্ঞে, বাজারে।”

—“কি কি আনলে?”

অনুত প্রশ্ন। আমি বিরক্ত হলাম। লক্ষ্য করলুম, ইন্সপেক্টরের মুখে স্রেফ হাসি।

চাকর উত্তর দিলে—“আলু, বেগুন, শাক, কুমড়া, কচু, পটল, লেবু।”

—“রামাহুজ জিগোস করলে—“মাছ এনেছিলে?”

—“আজ্ঞে না। সোমবারে বাবু নিরামিষ খান।”

—“আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পার।”

চরণদাস চলে যাচ্ছিল, এমন সময় রামাহুজ হঠাৎ তাকে ডেকে বললে—“তুমি যখন টাকা চুরি করলে তার আগেই ত্রিপুরা বাবু মরে সিঁহলেন—কেন?”

চরণদাস ভীত ভাবে রামাহুজের দিকে চেয়ে বললে—“আজ্ঞে।”

—“ঘরে ছ'বার চুকেছিল। প্রথম বার বাজার করে এসে, দ্বিতীয় বার চুরি করতে। নয় কি?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন?”

—“বাজার করে এসে দেখলে তোমার মনিব খুন হয়েছেন।

কিন্তু তুমি তখন কাউকে খবর দাওনি। কেন? চুরি করবার জন্ত? ঠিক তো?”

চরণদাস চুপ করে পঁড়িয়ে বইল।

রামাহুজ প্রশ্ন করলে—“তুমি এখানে নিজে আসনি, এক জন লোক পাঠিয়েছিল—তাই নয়?”

চরণ বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলে—“আজ্ঞে হ্যাঁ। এক জন লোক আমাকে ঠিকানা দিয়ে বললেন, এই বাড়ীর চাকর চলে গেছে। তুমি যাও, চাকরী পাবে। চাকরী পেলুমও। সে প্রায় মাস তিন আগেকার কথা। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?”

—“সেই লোকটা কি রকম দেখতে বলতে পার?”

—“আজ্ঞে, এক জন বড়ো ভরলোক। শালা চুল, বাড়ী-গোঁক।

চোখ খারাপ ছিল, নীল চশমা পরে ছিলেন। তাঁর আমি জানি না। আর কোন দিন তাঁকে দেখিনি।”

—“আচ্ছা। এখন যেতে পার।”

হ'জন কনষ্টেবল চরণদাসকে নিয়ে চলে গেল। সে যেতেই ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলে—“আপনি কি তবে বলতে চান, চাকরটা খুন করেনি? সে লোথী নয়?”

রামাহুজ হেসে বললে—“চুরি করেছে বটে, কিন্তু খুন সে করেনি। খুনী এক জন বাইরের লোক।”

—“বাইরের লোক? কি বলছেন আপনি? আমি এসেই সকলকে

প্রশ্ন করেছি। পাড়ার কয়েকটি ছেলে বাড়ীর সামনে খেলছিল। তারা বললে, কেউ আসেনি।”

—“সে এসেছিল অদৃশ্য হয়ে।”

হো হো করে খুব খানিকটা হেসে ইন্সপেক্টর বললেন—“এতক্ষণে ব্যক্তি পাবলুম, আপনি ঠাট্টা করছেন।”

গম্ভীর ভাবে রামাহুজ বললে—“জীবন নিয়ে যেখানে চানচানি, সেখানে ঠাট্টা করা আমার স্বভাব নয়।”

আহত স্বরে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন—“তবে দিনের আলোয় একটা ভলভার্বাস্ট মাহুৰ অদৃশ্য হয়ে কি করে বাড়ীর ভেতর ঢুকল।”

হেসে রামাহুজ উত্তর দিলে—“অতি সহজে। আচ্ছা, আপনার বাড়ী কি দোতলা।”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“ক'টা সিঁড়ি বলতে পারেন?”

ইন্সপেক্টর একটু ভেবে বললেন—“না, ঠিক মনে নেই। শুণে দেখিনি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?”

রামাহুজ সঙ্গাত্তে বললেন—“অতি দৃশ্য জিনিষ অদৃশ্য। কাণ, সে দিকে আমরা মন দিই না, লক্ষ্য করি না। এক জন মস্ত-বিক্রেতা মাছ নিয়ে রাস্তায় দিয়ে যাচ্ছে। কেউ লক্ষ্য করল না, অতএব দেখতেও পেল না। ত্রিপুরা বাবুর বাড়ীতে মাছ বিক্রী করতে এল—বিক্রী করে চলে গেল—সকলের চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে। যাওয়া-আসার কঁাকে ত্রিপুরা বাবুর গলার ওপর দিয়ে ক্ষুব্ধ বুলিয়ে দিলে। মস্ত-বিক্রেতার গায়ে ছ'চার কৈটা রক্ত লেগে থাকলে লোকে বিস্মিত হয় না, স্ততঃ লক্ষ্যও করে না।”

—“তবে সেটা মাছওয়ালায় সন্ধান করতে হয়?”

—“কিন্তু তাকে তো আর দেখতে পাবেন না। এক দিন চরণদাস দেখেছিল—হ'মাস আগে, বড়োর বেশে। কেউ তাকে চেনে না—সন্ধান করবেন কি করে? আচ্ছা, চরণদাস কত টাকা চুরি করেছে?”

—“তিনশ’। এক একশো টাকার তিন খানা নোট।”

উত্তেজিত ভাবে রামাহুজ বললে—“ঠিক হয়েছে। তিনখানা নোট। তিন নম্বর। খুনীর সন্ধান পাওয়া শক্ত। তবে চরণদাস যে খুন করেনি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আচ্ছা, নমস্কার।”

আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। পথে যেতে যেতে রামাহুজ বললে—“এও সেই ত্রিমুত্তির কাজ। তিন নম্বর—মহেশ্বর, ধ্বংসের অবতারণা। হয়তো ত্রিপুরা বাবু তাদের সন্দেশ অনেক কিছুই জানতেন। কোন রকমে ওরা জানতে পেরেছিল যে, জন্মে বাবু ওর বন্ধু আর জন্মে বাবুর সঙ্গে আমারও আলাপ আছে। হয়তো এও জেনেছিল যে, জন্মে বাবুকে দেখা করবার জন্ত ত্রিপুরা বাবু চিঠি লিখেছেন। তাই আমরা এসে পৌছবার আগেই—উঃ, কি চালাক এরা! কতখানি বুদ্ধি এদের এবং কি অদ্ভুত গোয়েন্দাগিরি! আশ্চর্য্য! এই নিয়ে ছ'—হ'বার আমার পরামর্শ হ'ল। তবে এক জন নিরীহ লোকের প্রাণ রক্ষা হয়েছে এই আমার সাহস। চরণদাস খুনী নয়। তারা পুলিশকে ঠকাতে পেরেছিল কিন্তু আমায় পারেনি।”

বাকী পথটা তিন জনেই গুম হয়ে বসে বইলুম। কারো মুখে কথ নেই।

[ক্রমশঃ]

ফিলিপাইন্স

এ যুদ্ধে বহু হৃৎ-চর্গাভি অভাব-অভাবিত্য ভোগ করিলেও সেই যে কবি পাণ্ডিত্য গিয়াছেন,—“বুককে নিকট করিলে”—সে-কথা ভাষিয়া মনে আনন্দ ভাগে! ছেলেবেলার জিওগ্রাফিতে কত-না নদ-নদী গিরি-বন দেশ-মহাদেশের নাম যুদ্ধ করিয়াছি—মাপের গায়ে তাদের অবস্থান নির্দেশ করিয়া এগুণায়িনে নখরও পাইয়াছি—তার পর জীবনের কণ্ঠক্ষেত্রে নামিয়া সে সব দেশ-মহাদেশ নদ-নদীর

পাহাড়-নদী—সে-সব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! তাদের কথা মনে আনিবার প্রয়োজনও এত দিন অল্পভূত হয় নাই।

কিন্তু যুদ্ধের দুর্ভুভিনাদে আজ সেই সব তুলিয়া-বাঁধা কত দেশ, কত দ্বীপ, নদ-নদী, সাগরের নামমতলা আসিয়া শুধু আমাদের স্মৃতি স্পর্শ করা নয়—বুকও বেশ খানিকটা চাকল্যের স্রুটি করিতেছে! এমন দেশ-দ্বীপটির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকুর উপরকার ফিলিপাইন্স দ্বীপপুঞ্জের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফিলিপাইন্স এখন জাপানের অধিকারে। ছোট-বড় ৭০৮৩টি দ্বীপ লইয়া ফিলিপাইন্সের স্রুটি। প্রাচ্য সমব-দ্বীপের দিক দিয়া ফিলিপাইন্সের গুরুত্বের সীমা নাই! এই ফিলিপাইন্সের একাংশে সম্রাতি মার্কিন ফৌজ গিয়া নামিয়াছে এবং দক্ষিণ চীন-সাগরে জাপানী বাহিনীর সঙ্গে মার্কিন নৌ-বাহিনীর দক্ষিণ সম্বন্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। সে সঙ্কটে জাপানের বহু কতিও সঙ্গতি হইয়াছে। জাপানের হাত হইতে ফিলিপাইন্সের একটি একটি করিয়া দ্বীপ ছিনাইয়া লওয়াই আমেরিকার উদ্দেশ্য। আমেরিকা তাহাতে সকল-মনোরথ হইলে জাপানের সাগর-শক্তি ক্ষুদ্র এক ব্রহ্ম ও মলয়ের সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্র হইবে বিচ্ছিন্ন।

এই ফিলিপাইন্স দ্বীপপুঞ্জ ছিল আমেরিকার অধিকারে। শাসন করিলেও আমেরিকা ফিলিপাইন্সের অধিবাসীদের জাতিভেদ ও স্বাভাব্য-রক্ষার কথাটা উলানীন ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন্সকে আমেরিকা শুধু পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে তা নয়—দ্বীপগুলিকে অধিবাসীদের হাতে প্রত্যর্পণ করিবে! ফিলিপাইন্স দ্বীপগুলি সম্পদে সমৃদ্ধ; ম্যাঙ্গো-রিয়া-বিষে ভরা বা জঙ্গলে ঘেরা নয়। এখানে প্রচুর খনিজ তৈল, রবার এবং কুইনিন্ মেলো।

৪০ বৎসর পূর্বে স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার এক দারুণ সংগ্রাম হয়। সে যুদ্ধের সন্ধি-সপ্তে মূল্য দিয়া স্পেনের কাছ

হইতে আমেরিকা এই দ্বীপগুলি কিনিয়া তার শাসন-পালনের ভার গ্রহণ করে।

ফিলিপাইন্সের আয়তন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারি শত বর্গ-মাইল; অর্থাৎ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চেয়ে ফিলিপাইন্স আকারে সামান্য ছোট। এখানকার লোক-সংখ্যা ছ'বৎসর পূর্বে ছিল এক কোটি বাট লক্ষ। নাতিশীতোষ্ণ জল-বায়ুর গুণে বাসের পক্ষে



ফিলিপাইন্স

কোথায় কোনটা, সে-কথা আর মনে ভাবি নাই! মনে ভাবিবার প্রয়োজনও হয় নাই!

যে সব দেশ-মহাদেশ সভ্যতার-সংস্কৃতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে শক্তি-সামর্থ্যে আ-সব-ভঙ্গকে চাপিয়া ঠেলিয়া মাথা উঠ করিয়া তুলিয়াছে, সেগুলার কথাই শুধু মনের উপরে নানা দিক দিয়া ভাসিয়া গুটে। পৃথিবীর বুক বাকী থাকিছে দেশ-মহাদেশ

ফিলিপাইন্স দ্বীপগুলি স্তম্ভময়। দ্বীপগুলি শ্রামল উর্বর। সাগর-বন্ধ হইতে এ সব দ্বীপের দৃশ্য অপূর্ব রমণীয়।

পশ্চিমে এবং উত্তরে চীন সাগর—বায়ু-বিক্ষোভে নিত্য তরঙ্গ-ময়। এ তরঙ্গে কত জাহাজ কত নৌকা ধ্বংস হইয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! সাগরের তালীবনাক্ষর কূলে বহু জাহাজের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ফিলিপাইন্সের সর্বোত্তর কোণে ইয়াসি দ্বীপ। ইয়াসির ৮৮ মাইল দূরে জাপান-অধিকৃত তাইহুয়ান দ্বীপ (সাবেক ফরমোসা)। ইয়াসির পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধে ক্ষতল জলরাশি ৭০০০ মাইল ব্যাপিয়া মস্ত উত্তাল শ্রোতে

ফিলিপাইন্সের সব চেয়ে বড় দ্বীপ লুজন। লুজন সর্বোত্তরে অবস্থিত। লুজনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নিভৃত নিরাপদ এক উপসাগরের কূলে মানিলা সহর। এই সহর ছিল এখানকার প্রাচীন রাজধানী।

লুজন বেশ সমৃদ্ধ দ্বীপ। রেলোয়ে এবং প্রশস্ত রাজপথ-দ্বয়ে মানিলার সঙ্গে লুজনের সমস্ত গ্রাম-নগরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হইয়াছে। তা ছাড়া, জলপথে ষ্টীমার এবং শৃঙ্গপথে বিমানপোত-যোগে মানিলার সঙ্গে ফিলিপাইন্সের অপর জনবহুল দ্বীপগুলির সম্পর্ক আজ যেমন অন্তরঙ্গ, তেমনি নিত্যকার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।



সান ফেলিপে দুর্গ

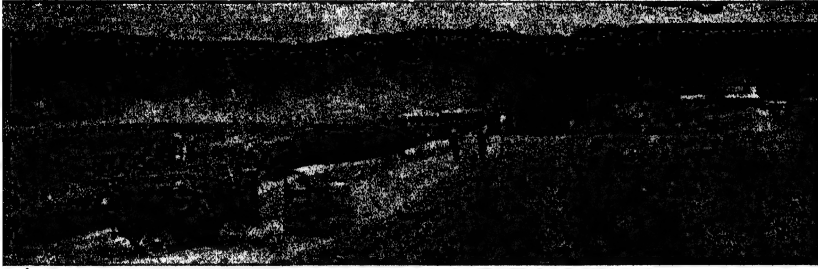


ও'টকি মাছের বাঁটা—সিতাকাই

বহিয়া চলিয়াছে। এদিকে ফিলিপাইন্সের বৃকে তার প্রধান সহর মানিলা; আর ওদিকে ৭০০০ মাইল-ব্যাপী প্রবাহের পারে সানফ্রানসিসকো। ফিলিপাইন্সের দক্ষিণে শুভ্রোজ্জ্বল সেলিবিশ সাগর। সেলিবিশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ষের দস্তা-অধিকৃত বোর্নিয়ো। বোর্নিয়োর একটা দিক্ যেন সাগরের বৃকের উপরে বাহু বাড়িয়া দিয়াছে ফিলিপাইন্সকে স্পর্শ করিবার উদ্দেশ্যে। এট জারগায় বোর্নিয়ো আর ফিলিপাইন্সের মধ্যে বাবধান মাত্র এগারো মাইল।

ফিলিপাইন্সের ৭০৮৩টি দ্বীপের মধ্যে কয়েকটি যেমন বড়, তেমনি কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার; ৪৬৪২টি দ্বীপ আবার এত ক্ষুদ্র যে সে সব দ্বীপের কোনো নাম নাই, সেখানে লোকের বসতিও নাই।

লুজনের উত্তর-পশ্চিমে আপারি দ্বীপ। এইখানেই জাপানীরা প্রথম আসিয়া নামিয়াছিল। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানিলা। যে উপসাগরের কূলে মানিলা অবস্থিত, সেটি ক্রেগিডর দ্বীপের দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থরক্ষিত। সেখানে নামা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই জাপানীরা প্রথমে আসিয়া আপারিতে নামে; নামিয়া কূলাবস্থিত ভাইগান, লিজেন্যান সাগর, লেগাসপাই ও ডাভাওয়ে অভিমুখে অভিবান পরিচালিত করে। নিঃশঙ্কে শূন্য হইতে মানিলায় আসা সহজ। আপারি হইতে মানিলা পথান্ত পথ স্বল্প-পরিসর এবং পর্বতময়। এ পথে শত্রুর গতিবেগ সহজে রোধ করা চলে। এ ক্ষম মানিলা লক্ষ্য হইলেও জাপানীরা মানিলায় আসিয়া নামিতে পারে নাই।



আগের ক্ষেত—কিলিপাইনস্ হইতে বহরে চিনি চালান যায় দশ লক্ষ টন।

লুজনের উত্তরে কাগাইয়ান উপত্যকায় তামাকের প্রচুর ক্ষেত-
দার আছে। সেখানে তামাকের চাষ হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে।
হাড়ের চালু দেহ ঘন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। পাহাড়ের কোলে বণ্টক।
যে “মাথা-কাটা” (head-hunters) ইগরট-জাতির বাস।
রা করে ধানের চাষ। এ-জাতি এখনো মানুষ হইয়া ওঠে নাই।



কাঠ বোঝাই—পোর্ট হলান্ড—মিন্ডানাও

বিধা পাইলে এখনো শৌর্ধ্যের আফালন করিতে মানুষের মাথা
টিতে ছাড়ে না।

লুজনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে লোহার বেশ সমৃদ্ধ খনি আছে।
কাল হইতে ক্রেতা-হিসাবে সেগুলির মালিকানী-স্বয় ভোগ
রিতেছে জাপান।

মানিলার উত্তরে ১৩০ মাইল দূরে বাণ্ডইয়ো। গ্রীষ্মকালে এই
ওইয়োতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। মানিলা হইতে
ওইয়ো পর্যন্ত সারা পথ পর্বতময়। মার্কিন জাতি পাহাড়
টিয়া এখানে চমৎকার রেল-পথ নির্মাণ করিয়াছে। এ-পথে ট্রেন

এ পথটুকু অতিক্রম করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে।

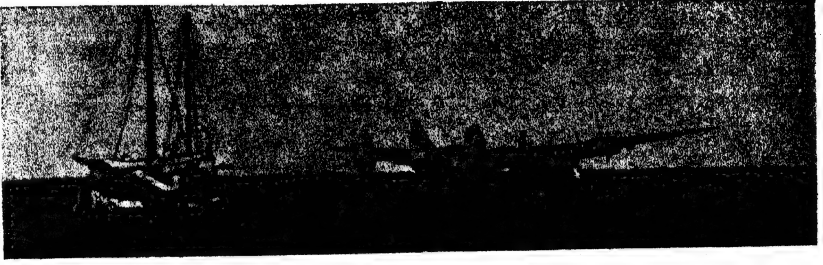
বাণ্ডইয়ো এখন বেশ সমৃদ্ধ সহর। অষ্ট-সাত-আট বৎসর পূর্বে
বাণ্ডইয়ো ছিল নগণ্য একখানি পশুগ্রাম—ইগরট-জাতির বাসভূমি।
তারা বাস করিত মাটির জীর্ণ কুটারে। তার পর এখানে সোমাল
খনির সন্ধান মেলে এবং গ্রামের হয় সংস্কার। এখন বাণ্ডইয়োতে

২৫০০০ লোকের
বাস। পথ-ঘাট আছে,
খিঁচি টার আছে,
সিনেমা আছে।
অফিস, বাজার এবং
অ.সং. থা হোটেল
আছে। মানিলার
অধিবাসীরা এখানে
গ্রীষ্মবাস নির্মাণ
করাইয়াছেন। সাম-
রিক ও বেসামরিক
বিভাগের বহু আমে-
রিকান অফিসারও
কর্মজীবনাবসানে
বাণ্ডইয়োয় আস্তানী
বাঁধিয়াছেন।

পাদরী উর্সেটোর
১১০০ খৃষ্টাব্দে এখান-
কার আদিব বর্বর
অধিবাসীদের আত্ম

বিবরণ সকলনে প্রবৃত্ত হন। কয় বৎসরের গবেষণায় তিনি
তাহাদের সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সে গ্রন্থ
সমগ্র সভ্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তার
পর উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাক্ট বখন কিলিপাইনস্‌র গবর্নর
জেনারেল ছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগিতায় উর্সেটোর বাণ্ডইয়োয়
বহু সংস্কার সাধন করেন। টাক্টের পর গবর্নর-জেনারেল ফবশের
আন্তরিক চেষ্টায় মার্কিন জাতির সঙ্গে আদিম অধিবাসী কিলিপাইনো
জাতির সম্পর্ক সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। বাণ্ডইয়োয় মাথা-কাটার
দল এখন স্বর্ণখনির দাম বুঝিয়াছে, সভ্য হইয়াছে। বাণ্ডইয়োয় এক

সমুদ্রি খড়িয়াছে শুধু
সোনার দৌল তে।
এখানকার নদী-নির্ঝর
য়ের জলে অজস্র
স্বর্ণেরেণু। কত কাল
হইতে জলে এ স্বর্ণ-
রেণু ভাসিয়া চলিয়াছে,
তার নির্দেশ মিলে
নাই।



প্রাচীন কালে
মোরো বোম্বের্টের দল

লুজনের উপকূল-প্রদেশে আসিয়া লুঠপাট করিত। সোনা, ফসল এবং
নারী—ইহাই ছিল তাদের লুণ্ঠের লক্ষ্য। মানিলার দক্ষিণে জোশি
পাঙ্গানিবানে (সাবেক মাম্বুলাও) এক ধনশালিনী রমনী বাস
করিতেন; তার নাম ছিল জানাপানে। বোম্বের্টের দল তার
বধাসম্বন্ধে চুরি করিয়া লইয়া গেলে তিনি স্পেনের রাণীর কাছে
হুজু শা জানাইয়া
মোরো বোম্বের্টের
হাত হইতে রক্ষার
আবেদন জানাইয়া-
ছিলেন। আবেদন-
পত্রের সঙ্গে রাণীকে
তিনি উপঢৌকন
পাঠাইয়া ছিলেন
সোনার তৈরী নিরেট
একটি মুগা এবং সে-
মুগার সঙ্গে নিরেট
সোনার সাত-আটটি
ডিম। কথিত আছে,
উপঢৌকন পাওয়া
জানী খুশী-মনে
বোম্বের্টের দল
ব্যবস্থা করিয়া বাণ-
ইয়োকে নিবহুল
করেন। কথাটা গল্প
বলিয়া মনে হয় না।

যেহেতু জোশি পাঙ্গানিবানের স্বর্ণখনিগুলির অধুনা প্রাচীন দুর্গের
জীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল আজো বিস্তারিত দেখা যায়।

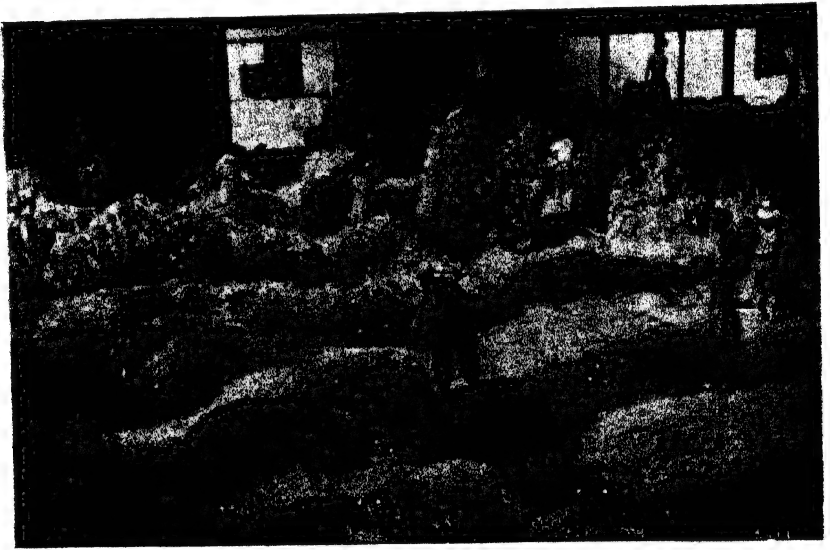
কিলিপাইনসে বহুরে এখন যে-পরিমাণ সোনা মেলে, তার
আনুমানিক মূল্য হইবে চার কোটি ডলার। অর্থাৎ মার্কিনের
স্বর্ণভূমি কালিকোনিয়ায় যে-সোনা পাওয়া যায়, তারই অল্পরূপ।

আয়তন-হিসাবে লুজনের পরেই উল্লেখযোগ্য মিনডানাও দ্বীপ।
এ দ্বীপের আয়তন ৩৭০০০ বর্গ-মাইল। এ দ্বীপটি দ্বীপপুঞ্জের
দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এ দ্বীপের প্রধান দুটি সহর জামবোয়াক
এবং ডাভাও।

জামবোয়াকের মার্কিন কোজের মত ব্যারাক আছে। দ্বীপটি

মালবাহী বোট ও শীপ্লেন—কাভাইট

তালীবন-সমৃদ্ধ। বানরের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত বেশী। এই মিনডানাও
দ্বীপে মোরো বোম্বের্টের সঙ্গে মার্কিন কোজের ভীষণ সংগ্রাম
হইয়াছিল। মোরোর প্রাচীন মুর-জাতির বংশ-সমৃদ্ধ। ধর্ম
তার মুসলমান। মোরো জাতির খৃষ্টান-বিষেব এত প্রবল ছিল যে
এক জন খৃষ্টান মারিলে বেহেশতের পথ হইবে মুক্ত—এমনি ছিল



শপ—ডাভাওয়ের গুদাম—মিনডানাও

বিশাস। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্প্যানিশ জাতির সহিত মোরো
জাতির সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল পার্শি এই
মোরো জাতিতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেন। এখন বস্ত্রতা স্বীকার করিয়া
দম্ভতা ছাড়িয়া মোরোর এখানকার পুলিশ-বিভাগে কনস্টেবলের পদ
গ্রহণ করিতেছে। যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া মোরো জাতির কাছে লাজনা-
অপমানের চরম বলিয়া বিবেচিত হয়। যুদ্ধে মরিলে শত্রুরা তাদের
শুকের সঙ্গে এক-খাতে মাটি চাপা দিবে—ইহাই লাজনা-অপমানের
কারণ। খৃষ্টান কোজের দল তাদের এ হুজুরতায় দৌলতে সহজেই
তাদের বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিলে অত্যাক্তি হইবে না।

বাণিজ্যের দিক দিয়া মিনডানাওয়ের গুরুত্ব আছে। এখানে অজ

জন্মায়। এই শপে যে দড়ি-কাছি তৈয়ারী হয়, তার মত বৃত্ত দড়ি আর হয় না। সকল কাজে মজবুত যে সব কাছি দড়ির হার আজ প্রচলিত দেখি, সে সব এই মানিলার শপের।

এ ব্যবসায়কে একচেটিয়া রাখিবার জন্য ক'বৎসর পূর্বে কিলিপাইন-গবর্ণমেন্ট কোনো বকমে শপের বীজ বিদেশে চালান না যায়, ইন রচিয়া সে পথ বন্ধ করিয়াছে। ওবু চোরাই রীতিতে এ বীজ

শপের ক্ষেতের মালিক সব ভাপানী; কিন্তু ক্ষেতে কাজ করে কিলিপাইনো গ্রী-পুফ্র। জার্মান যন্ত্রে শপ আহুড়ানো হয়; তার পর কিলিপাইনো রমণীরা সে সব নাড়িয়া চাড়িয়া শুকাইতে দেয়।

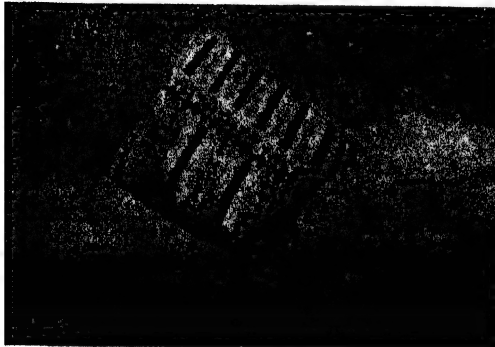
লুজন এবং সেবু দ্বীপে বহু লোকের বাস। মিনডানাও সমুদ্র হইলেও সেখানে জনসংখ্যা অল্প। বসতি বাহাতে বাড়ে, সে জঙ্গ জমির ব্যবস্থা-করে গবর্ণমেন্ট নানা সুবিধা-দানে মুক্ত-হস্ত। জমি খাজনা



চড়াই পথে—বাগুইয়ো-বটক

পিয়ো, ডাচ-ইশুজ এবং পানামায় চালান হইতেছে। তাহা লেও পৃথিবীর কাছি দড়ির বেশীর ভাগ এই কিলিপাইনসের মালিক।

ভাতায়ে যে সব ভাপানী আন্তানা পাতিয়াছে, তারা এখানে উট আলোর ছায়াতলে শপের চাব করে। এখানে শপের চাবেয় আঠারো হাজার ভাপানী দিন-গুজরান করিতেছে। যুদ্ধের



মোরোদের পাল-তোলা নৌকা

ক' ভাতাওয়ারে ভাপানী সদাপ্রসী-জাহাজে করিয়া ভাপান তে বিবিধ ভাপানী পণ্য আসিত এবং ফিরতি-জাহাজে এখানকার ৬ নারিকেল তৈল, শুক মাছ প্রভৃতি নির্ঝিষানে জাপানে চালান হিত।

এখানে বাড়ী-ঘর, পার্ক, স্কুল, মন্দির, চাবের ক্ষেত, গোবাক-বিহঙ্গ, রান্না, হস্ত—সব এখন ভাপানী। পথ-বাট চমৎকার।



সমুদ্র-তীরে আমেরিকান হাই-কমিশনারের গৃহ

সবকে গবর্ণমেন্টের বিধি সাধারণের পক্ষে লোভনীয়; এবং সেই সহজ বিধির ফলে বসতি বাড়িতেছে; মিনডানাও ক্রমে জনবহুল হইতেছে।

মিনডানাওয়ের অধিবাসীদের শতকরা ২৫ জন মোরো। জয়সত্ত অধিকারে এখানকার জমিতে আজো তারা দাবী জানায়; কিন্তু



লেশের কাজে কিলিপাইনো রমণী। অনুচাদের বেশী—
বিবাহিতাদের মাথায় খোঁপা

সে দাবী আইন-কাহান মানিবে কেন? এ জঙ্গ খুঁটানদের উপর তাদের অন্তর্গত আক্রোশ-বিষেবের সীমা নাই।

সারা কিলিপাইনসে এই মহাযুদ্ধের ঠিক প্রাকালে চীনা অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১১৭৫০০; ভাপানী ২১০০০; কিলিপাইনোর সংখ্যা এক কোটি বাট লক্ষ। কিলিপাইনসে সর্বসমেত ৮৭টি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। ভাপানীদের প্রতি কিলিপাইনোদের মনোভাব

যুদ্ধের পূর্বে করুণ ছিল, বলা কঠিন। তবে তরুণ ফিলিপাইনোরা শিকার জন্ত ভাপানে বাইত। সেখানে গিয়া শিখিত বৈজ্ঞানিক রীতিতে মৎস্ত-পালন, বিমানপোত-পরিচালনা এবং কৃষিবিজ্ঞান।



স্বাধীন-গাছের তত্ত্বাবধান—মাকুইলি-পাহাড়—সুজুন

দীপমালায় বৃক্ক মধ্যমণির মত ছোট নেগ্রোস দীপ। নেগ্রোসে আখের চাষ প্রচুর। এই আখ হইতে চিনি তৈয়ারী হয়। এখানে বছরে চিনি মেলে প্রায় পনেরো লক্ষ টন। এখন চিনির রাজ্যে সরকারী কোটা-বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।



খনি-লব্ধ সোনার বাট

নেগ্রোসের পূর্বে অনতিদূরে সেবু দীপ। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে এই দীপেই স্প্যানিশরা আসিয়া সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপনা করে। সেবুর ওপারে মাকটান দীপ।

নেগ্রোসের উত্তর-পূর্বে আর একটি ছোট দীপ আছে—পানে। পানে এবং সেবুর অধিবাসীরা অভ্যস্ত গরীব। কলসের সময় এ দুই দীপ হইতে প্রায় তিন লক্ষ সুবাস্তি নব-নারী যার নেগ্রোসের নানা

নেগ্রোসের পর উত্তর কুলে বিস্তীর্ণ ভূভাগে শুধু আখের ক্ষেত। সমুদ্র-কূল হইতে এ সব ক্ষেত ভিতরে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আখ হইতে চিনি তৈয়ারীর জন্ত বহু কারখানা আছে।



গ্রাজুয়েট বি-ইউনিয়ন—ছাত্র-ছাত্রী-সংমেলন

চিনির উপর প্রায় বিশ লক্ষ ফিলিপাইনোর জীবিকা নির্ভর করে। তার দ্বিগুণ-সংখ্যক নব-নারী জীবিকা অর্জন করে নারিকেল ক্ষেত-সমূহে। এ সব দীপে নারিকেল গাছ এত যে তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

নেগ্রোস, পানে আর সেবুতে আখের চাষ ক্ষান্তকি। এই তিন দীপের মাল এবং চিনির চালানীতে সরকারী মাওল ঘা আদায় হয়, তার পরিমাণ রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ।



বাম্পারে বাঁধিয়া শূকর-বহন

ফিলিপাইনদের সহিত জলপথ-সূত্রে আমেরিকায় যে সংযোগ, শান্তির সময়ে সে-সংযোগে লাভ ছিল বিস্তর। আজ যুদ্ধের দিনে এ-পথ শত্রুর গতিরোধে মস্ত সহায়।

ফিলিপাইন হইতে আমেরিকায় যার প্রচুর ধান, নারিকেল তৈল, কোমাইট, চিনি এবং কিছু মালানীজ। সিলাপুর ও জাভা হইতে আমেরিকায় স্বাধীন আর কুইনিয়ন বাইত এই হাবিলা-বারবৎ।

মহাসাগরপথে মানিলা হইল বাণিজ্য-বাপারে পাশ্চাত্য র সহিত প্রাচ্যের মিলনক্ষেত্র। এদিককার মিত্র-পক্ষীয় র জন্ত আমেরিকা হইতে টিনে-ভরা তুখ, সিগারেট, ইম্পাত, যন্ত্রপাতি, ময়লা, মাংস এবং আরো বহু দ্রব্য আসে এই পথ । শান্তির দিনে মানিলা দিয়াই মার্কিন পশ্যসম্ভার প্রাচ্য র বাজারে আসিয়া পৌঁছিত।

পালিগ নদীর মোহনায় মানিলা-উপসাগরের উপর মানিলা সহর ত। চীন-সাগরের দক্ষিণে উপসাগরের মুখে এত বেশী পাহাড়



ভাড়ি-সংগ্রহ। ফিলিপাইন্সে তাড়িকে বলে, 'টুবা'

মহাজের পক্ষে সে পথ বিপদ-সঙ্কুল। এইখানেই করেগিডর দ্বীপ দুর্ভেজ প্রস্তর গিরিদেহ লইয়া অবস্থিত। জিলালটাবের মতই গিডর দ্বীপের গা ছুঁড়িয়া বহু টানেল-গুহা-কক্ষ নিশ্চিত আছে। সে সব কক্ষে কামান বন্দুক গোলা বারুদ পথ্য পানীয় জর আস্তানা হাঙ্গপাতাল বন্ধনশালা সন্ধেত-বস্ত্রাদি সুরক্ষিত আছে। করেগিডর ছাড়া আরো কয়েকটি দ্বর্গ-দ্বীপ আছে। সেগুলির বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—কাভাইট। কাভাইটে মার্কিন ফৌজের একটি বৃহৎ কেন্দ্র আছে। মার্কিন আভমিরাল ত্রিয়ারে ঘাঁটিও এই কাভাইটে। যুদ্ধ-জাহাজ-মেঘামতীর মন্ত খানা এক ফৌজ-হাসপাতালও এই কাভাইটে। মানিলা হইতে গাইট ২২ মাইল দূরে।

লুজটনের পশ্চিমে মানিলা-উপসাগরের মুখ হইতে ৩৫ মাইল রে ওলোকাপো দ্বীপ। এ যুদ্ধে এটি বহুবার বোমাবর্ষণ রাখা করিয়াছে। এখানেও একটি মার্কিন নো-ঘাঁটি আছে। পৌর্যে-বীর্ঘ্যে ফিলিপাইনো ফৌজেরও বহু খ্যাতি আছে।

অশিক্ষিত ফিলিপাইনো সেনার সংখ্যা দেড় লক্ষের উপর। এ যুদ্ধে ফিলিপাইনো ফৌজকে মার্কিন ফৌজের সঙ্গে একত্বীভূত করা হইয়াছে। ক্লজডেন্ট এই সম্মিলিত মার্কিন ও ফিলিপাইনো ফৌজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন কমান্ডার ম্যাক আর্থারকে।

ফিলিপাইন্স-শাসনে আমেরিকার লক্ষ্য The Philippines for the Filipinos—(ফিলিপাইনোদের দেশ ফিলিপাইন্স)। ফিলিপাইনোদের হাতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন্স প্রভাপিত হইবে—এই প্রতিজ্ঞার জন্ত কোনো মার্কিন ধনী এখানকার কোনো ব্যবসারে বেশী টাকা ঢালেন নাই। পথ-ঘাট ও গৃহাদি-নির্মাণে মার্কিন কন্ট্রাক্টররা আসিয়া কাজ করিয়া গিয়াছে। এখানকার টাকা হুঁহাতে লইয়া ঘাইবে বলিয়া কারেমি ভাবে মোক্ষ-বীষ দিয়া কাঁরবার



নারিকেল-তৈল পরিভ্রম করা—সাবান ও কলমেটিক তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে কাঁচিয়া বসে নাই। তবে যে সব আমেরিকান এখানে চিরদিনের আস্তানা বাঁধিয়াছেন, তাঁহারা জমি-জমা, কারখানা ও খনি কিনিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

মার্কিন অধিবাসীর সংখ্যা এখানে সাত-আট হাজারের বেশী নয়। সোনার খনি থুলিয়া ধীরে ধন-সম্পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে মার্কিনের সংখ্যা অল্পই। এখানকার মার্কিনরা অর্থসম্পদ লাভ করিয়াছেন লণ, আখ, চিনি, নারিকেল, কাঠ, যন্ত্রপাতি, মোটর এবং লণ্ডির ব্যবসারে। আইন-ব্যবসারে এবং সাংবাদিকতা করিয়াও কয়েক জন মার্কিন বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি দু'-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো মার্কিন আর এখানে আসিয়া চিরদিনের নীড় বাঁধেন নাই। তবে শগের স্বাধক বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে কৃষিক পণ্যের জন্ত ফিলিপাইনোরা জাপানীদের কাছেই স্বণী—মার্কিনের কাছে নয়।

শিক্ষা-সভ্যতা, সন্স্কার এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে ফিলিপাইনোদের জন্ত মার্কিন বাহা করিয়াছে, পৃথিবীর উপনিবেশিক ইতিহাসে তার তুলনা নাই।

মার্কিন আমলের পূর্বে ফিলিপাইনোরা নিরক্ষর ছিল না—
 স্কুলের সংখ্যা ছিল খুব অল্প। মার্কিন আসিয়া পাড়ায় পাড়ায় স্কুল
 খুলিয়াছে এবং আমেরিকা হইতে ভালো শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আনা হইয়া
 শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে।

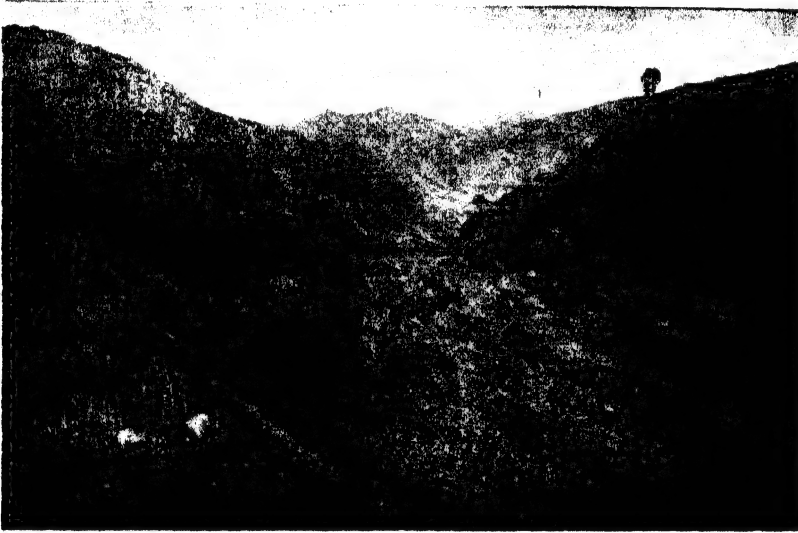
মার্কিন জাতি আসিবার পূর্বে এখানকার সরকারী ভাষা ছিল
 স্প্যানিশ। এখন কোনো ফিলিপাইনোরা স্প্যানিশ ভাষা শিখিবার
 ইচ্ছা হইলে স্বতন্ত্র গৃহ-শিক্ষক রাখিতে হয়। ইংরেজীই এখন সাধারণ
 চলতি ভাষা হইয়াছে। দেশী ভাষারও প্রচলন আছে—সে শুধু
 পল্লী-স্তরকলে। দেশী ভাষায় দেশী ফিল্ম তৈয়ারী হইতেছে। দেশী
 ভাষার নাম তাগালগ ভাষা। তাগালগ ছাড়া বিশায়ান, ইগরোট
 এবং মোরো ভাষার প্রচলন এখনো আছে।

প্রধান সংবাদ ও মাসিক-পত্রাদি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।
 ইংরেজী ভাষা শিখিতে ফিলিপাইনো স্ট্রী-পুঙ্করের আগ্রহের সীমা

বিজ্ঞা শিখিয়া আমরা কেরাণীগিরি পাইয়া কৃতার্ণ হইতাম। নামের
 শিখনে ডিগ্রী আঁটিয়া ভাবিতাম, জগতে পরমার্থ লাভ করিয়াছি
 ইহাতেই আমরা কিছুকাল আনন্দভরা ছিলাম।

তার পর ভুল ভাঙ্গিল বেকার-সমস্যা দেখা দিতে। তখন বুঝিলাম,
 ডিগ্রীতে খাত জোটে না, অর্থ হয় না। দেশে উকিল ডাক্তার বাড়িয়া
 উঠিয়াছিল। এক উকিল যে, মক্কেল ও মকদ্দমার সংখ্যা তার
 তুলনায় কম! ডাক্তার বহু। কিন্তু প্রত্যেকে রোগী পায় না। তখন
 সাধারণ লোকে চাষবাণ করিত এবং গভীর খাটাইয়া অর্থোপার্জন
 করিত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর চেয়ে কান্টিক শ্রমের সম্মান
 অনেক বেশী।

ফিলিপাইনোরা ব্যায়াম সহজে খুব সচেতন, স্বাস্থ্য বিধি-
 পালনে সজাগ। এ জন্ত রুম্য টুর্কল স্কোপ-দেহী ফিলিপাইনো
 বড় একটা চোখে পড়ে না। স্ট্রী-পুঙ্কর—উভয়ের দেহ বেশ



পাহাড়ের বৃক্কে থাকে-থাকে চাষের ক্ষেত

নাই। সরকারী আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয় অধিবাসীদের
 শিক্ষাকার্য্যে। মেয়েদের স্কুলে রন্ধন, সেলাই, স-সার-পরিচালনা এবং
 সজ্ঞান-পালন বেশ ভালো করিয়া শিখানো হয়। ফিলিপাইনসে
 সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ১২০৮৩; ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা
 উনিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশো বিবানরুই।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মানিলায় সাঙ্ঘো টমাস বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপিত
 হইয়াছিল। এখন এ ধাপপুঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আটটি। প্রধান
 বিশ্ববিদ্যালয় আছে মানিলায়—অপরগুলি মানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের
 অধীন—শাখা।

স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখিলেও ফিলিপাইনোরা বিলাসী হয়
 নাই। তারা কান্টিক পরিশ্রমের মূল্য বোঝে। তারা বলে, আমেরিকানরা
 আসিয়া বিনামূল্যে বিজ্ঞা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রথম-প্রথম

বলিষ্ঠ। কখনপটুতায় ফিলিপাইনো জাতির খ্যাতি আজ
 বিশ্ববিস্তৃত।

ফিলিপাইনসে কোনো সংক্রামক ব্যাধি আসার ভীতিক্রমে পাবে
 না। প্রেগ কলেরা বসন্ত এককালে মারাত্মক ছিল; কিন্তু মার্কিন
 বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় দেশের লোক পানীয় জলকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে।
 জলা-ভক্ষণ সাক করিয়া রোগের আড়ৎ তুলিয়া দেশে পাতিয়াছে
 কুবি-লক্ষ্যের আসন। তার কলে কলেরা প্রেগ প্রভৃতি সরিয়া পড়িবার
 পথ পায় নাই।

ব্যবসার কীদে মার্কিন জাতি এখানকার লোকের ধন-সম্পত্তি
 সাগর-পারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে নাই; সে জন্ত ধাপগুলি নিজস্ব
 সম্পদ দ্বারা রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। তার কলে অভাব-হীন তুলিয়া
 দেশের লোক পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছে।

স্বাস্থ্য-মোক্ষ

দেহ-সাধনা

১ বাঁধা স্তম্ভম দেহে নারীকে যে শুধু সুকুমার-সুন্দর দেখায়, য, দেহের স্বাস্থ্যও তাহাতে চমৎকার থাকে। রূপ-যৌবন বা ত্যের নির্ভর স্বাস্থ্যে। স্বাস্থ্য
১ হইলে রূপসৌর রূপ মলিন দেহের ছাঁদ বিপর্যয়-ভর ভাবে বিনষ্ট হয়। যেদের
১ রূপ-লালিত্যের যম। তা দেহে মেদ জমে এবং
১ র ফলে দেহ হয় তুল, ল—যে ড শী কে দে খা য়
১ র মত!

১ নহ ষাঁর সুকুমার স্তম্ভম
১ বাঁধা, তাঁর যৌবন থাকে
১ ; যদ্যৎ বাড়িলেও লালিত্য
১ মাধুরী করিয়া যায় না।
১ নন্দন-সমৃদ্ধিও হয় কাস্তি-
১ স্তম্ভ; তাহাদের দেহ খর্ব
১ বদন-দীর্ঘ হইতে পারে না।
১ সকল দিক্ দিয়া বিচার
১ বলিবে, স্তম্ভম্বে বাঁধা দেহ
১ শরীর-বিকাশের জন্মই ঈপ্সিত
১ বশের কল্যাণে তাহার
১ হ্রদয়তার সীমা নাই।
১ হ-পঠনের জন্ত বিশেষজ্ঞের
১ করেকটি ব্যায়াম-রীতির

১ দিয়াছেন। আমাদের দেশে ত্রিশ-চল্লিশ
১ পূর্বে পঞ্জী-অঙ্কলে মেয়েদের মধ্যে যে-সব
১ দার প্রচলন ছিল, সেগুলির সঙ্গে এ
১ প্রণালীর সাদৃশ্য আছে। আজ সে-রাম
১ সে-অবোধাও তাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে
১ ন হইরাছে! পাশ্চাত্য আচার-রীতির
১ হ পঞ্জীর ভালো বা-কিছু, তাও আমরা
১ ম দিয়া বসিয়াছি। কিন্তু সে-স্বপ্নের
১ লাভ নাই। তাই সে কথা রাখিয়া দেহ-সাধনার উপযোগী বিশেষ
১ রীতির কথা বলি।

১ এ বিধির প্রথমটিকে 'নৃত্য'-বিধি বলা চলে। সিধা
১ দাঁড়ান,—তার পর ডান পায়ের আঙুলে ভর দিয়া বাঁ
১ ডোইয়া বাঁ পা তুলুন; এবং দুই হাত উদ্ধে প্রসারিত করিয়া
১ হবির নৃত্য-ভঙ্গীতে বিচরণ করিতে হইবে। এই ব্যায়ামের
১ একবার ডান পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া বাঁ পা মুড়িয়া
১ পর বাঁ পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া ডান হাঁটু মুড়িয়া



১। ডান
পায়ের
আঙুলে ভর
দিয়া



২। দুই হাত দুই
দিকে প্রসারিত

১ বিচরণ! পাঁচ মিনিট কাল এমন কীর্ণনের নাচের ভঙ্গীতে
১ ঘুরিতে হইবে।

২। এবার বাঁ পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া ২নং ছবির মত
১ ডান পা প্রসারিত করিয়া বাঁ হাত সামনের দিকে এবং ডান হাত
১ পিছন দিকে প্রসারিত করিয়া এই ছবির নাচের ভঙ্গীতে বিচরণ। দুই
১ পায়ের ক্রম-পর্যায়ে এ ব্যায়াম করা চাই। অর্থাৎ যখন ডান পায়ের
১ আঙুলে ভর রাখিবেন, তখন বাঁ পা তুলিতে হইবে এবং বাঁ আঙুলে
১ ভর দিবার সময় ডান পা তোলা।

৩। এবার বৃকে ভর রাখিয়া মেঝের উপড় হইয়া শুইয়া পড়ুন।
১ পিছন-দিক দিয়া দুই হাত দুই পা ধরিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে
১ সামনে-পিছনে দোল খাইতে হইবে। নৌকা যেমন দোলে, তেমনি
১ ভাবে তুলিবেন। ছেলেমেয়েদের খেলার রকিং-ঘোড়া যেমন দোলানো
১ হয়, তেমনি ভাবে তুলিতে হইবে—প্রায় পাঁচ মিনিট।

৪। এবার ৪নং ছবির মত পা তুলিয়া দুই হাত নৃত্যক
১ ভঙ্গীতে তোলা চাই। এক পায়ের আঙুলে ভর রাখিয়া আর এক
১ পায়ের হাঁটু মুড়িয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত অমনি ছবির ভঙ্গীতে
১ তুলিতে হইবে—পা নামাইবার
১ সঙ্গে সঙ্গে হাত নামাইতে হইবে।
১ এ ব্যায়াম বেশ ক্রত তালে করা
১ চাই চার-পাঁচ মিনিট।

৫। হুঁখানি চেয়ারের পিঠে
১ দুই হাতের অবলম্বন রাখিয়া
১ দুই পা তুলিবেন (৫নং ছবি
১ দেখুন)। তার পর যেমন করিয়া
১ বাইসিক্ল চালানো হয়, তেমনি
১ ভাবে একবার ডান পা তুলিয়া
১ পরকণে বাঁ পা তুলিয়া ক্রত
১ পরিচালনা। এ ব্যায়াম
১ চাই পাঁচ মিনিট।



৩। নৌকা যেমন দোলে

১ এ ব্যায়ামে বৃক-পেটের পেশী সবল স্রুত থাকিবে, সেখানে
১ কোনো কালে মেদ জমিবে না।

৬। এবার ৬নং ছবির ভঙ্গীতে মেঝের দুই হাত এবং জখন-
১ মেঝের উপর মেঝের ভর রাখিয়া দুই পা তুলিয়া চকাকান ধোয়া।

এ ব্যায়ামে কোনো কালে মোটা হইবার আশঙ্কা থাকিবে না—
বুক, পিঠ ও কোমর হইবে স্তম্ভার।

শিশু-পালন

মায়ের প্রাণ সন্তানের প্রাণ। শিশুর জন্ম হইলে সেই শিশুকে
লইয়া নাজাটাড়া করা, তাহাঁক ঘুম পাড়ানো, নাওয়ানো-খাওয়ানো—
জীবনে এর চেয়ে বড় কাজ মায়ের আর নাই! মায়ের এই বৈশা,
এই মমতা আছে বলেই মানুষের বংশ-ধারা কোন সেই আদিম যুগ
থেকে আজ পর্যন্ত অবিরাম বয়ে আসছে।

ছেলেমেয়ে যদি ভালো থাকে,
তবেই মায়ের মনে আনন্দ
আর শান্তি। তাদের একটু
অসুখে মায়ের প্রাণ যেন
উড়ে যায়। অবোলা শিশু—
কি তার কষ্ট, কোথায় কষ্ট—
মুখ কুটে বলতে পারে না!
কাজেই শিশুর অস্বাস্থ্য
হলে মায়ের ত্বন অঙ্গকারে
ভরে যায়।



৬। দুই হাত এবং ভবন-দেশে ভর

দু'খানি
চরারের
পিঠে

শিশু-বয়সে তাদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-রক্ষা কেমন করে হয়,
কিসে তারা সুস্থ সেহে বেঁচে থাকবে, সে সবকে বিশেষজ্ঞেরা বহু
পরীক্ষায় যে-তথ্য আবিষ্কার করেছেন,—বাঙলার মায়েরদের কাছে
আজ তাই বলছি। তাঁরা বলেছেন—শিশুকে খাইয়ে মায়ের মনে
বিধার সীমা থাকে না—ঠিক খাওয়ানো হলো তো? বেশী হলো,
না, কম হলো, এই বিধা। এ সবকে বিধার কিছু প্রয়োজন নাই।
কম কিংবা বেশী খাওয়ানো হলে শিশুদের ভাব-ভরীতে বৈলক্ষ্য
দেখা যাবে—সেই বৈলক্ষ্য হলো এর মাপকাঠি।

শিশু বড় হয়ে বখন বুকতে দেখে, তখন অপরের সামনে তার
খাওয়া-দাওয়ার সব্বকে এতটুকু আলোচনা করবেন না। সে
আলোচনা শুনে শিশুর মনে ধারণা জন্মাবে যে, তার খাওয়াটা



৮। দুই হাত
বুকতোর ভরীতে

হলো একটা মস্ত ব্যাপার;
এবং এ ধারণা মনে জাগলে
শিশুর খাওয়া-দাওয়ার আর
কি করা যায়।
এই ও মাচের টের দু'পক্ষ
কটে হাজারীর সহযোগিতা
করে রাখ করিয়া মাচের টি
বাইরে। ঘর-পাকড়
শিশুকে খাওয়ানো না।
একই বকমের খাবার
শিশুকে নিত্য খাওয়ান উচিত
না। অবশ্য শিশু বখন একটু
বড় হয়, তৎকাল কথ্য
লাভ করেন।
করিয়া ও দ্বিতীয় ইনি
থাকবে না। বিশেষ পারদর্শিতা
খানেক দিনের
পক্ষে কেন পুষ্টিজনক হয় এক
শিশুকে যেমন খাওয়ানো তা
পরিপাক করতে পারে।

বড়রা যা খাবে, শিশুও তাকি সহ যেন

খেতে দেবেন না।

তরকারী বা শুকনো করিয়া অপূর্ণ কুতি

করিয়া উচিত নয়।

যদি খেলে দেখিয়া দর্শক

কথা বলবে।

যদি, এ, ম্যাডগাভকারকে পরাজয় স্বীকার করি

তিনি পূর্বে ভি, এ, ম্যাডগাভকারকে বিভিন্ন ছুনি

ভালো দু'তায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন

খাওয়ার ওয়া ব্যাডমিটন এসোসিয়েশনের কোন চ্যাম্পিয়ানশি

করেছে, ভয়। যি: ম্যাডগাভকারকে ইতিপূর্বে পরাজিত করি

তাকে খেতে দেখে শিশু বহু সম্ভ্রতি অস্বস্তিত বোধই এর পশ্চিম ভার

দেনেন। ছেলে খান্ন খান্ন স্বীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি

ভর দেখিয়ে তাকে খাওয়াতে বিধি ও চেষ্টা থাকিলে ইনি ব্যাড

করবেন মাটি! তাতে অস্বাস্থ্য ঘটবে।

বড়ীতে যদি ছুটি ফেললে, শিশু হুটু হুটু

করবেন আদর, আর-একটুকু

যেন না হয়। একাধিক শিশুকে

হয়তো দু'খ খাবে না, তাকে দিলেক,

সুস্থ ছেলেটিকে দিলেন ভাত-তরকারী

এতে অসুস্থ ছেলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না।

মায়ের নিজের খোরা-খুশীতে ছেলেটিকে

হয়। আহা! তাদের কুটি না থাকলে খাওয়া

খেতে বসে ছেলে যদি কোনো খাবার খেতে

যবে তাকে তা গেলো যেন না—তার জন্ম

না। নিজের পেট বুঝে সে খাবে।

গোব-জবরদস্তি

ভঁতোর বা খাবে, সেটুকু তার পেটে গিয়ে বিবের কাজ করবে।

"বনফুল"

মুসলিম—১ম ইনিংস—৩৭৮ রান (৭ জন আউট হইয়া)

(৬ জন মহম্মদ ১০৬, গজালী ১০৮ আউট না হইয়া)

মুসলিম ১ নং আমীর এলাহী ও বালুক বোলিং পারদর্শিতা দেখান।

হিন্দু ও পাশাঁদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাশাঁদের অনায়াসে পরাজিত করিয়া হিন্দু-দল শেষ খেলায় মুসলিম-দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করে। নিজস্ব দুই শতাধিক রান করিয়া মার্চেট মানকড়ের সহযোগিতায় স্বীয় পক্ষের জয়ের পথ সুগম করিয়া দেয়। ১ম ইনিংসে ১৩৬ রানে অগ্রগামী থাকিয়া ও মাত্র ১০০ মিনিট অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও পাশাঁদিগকে 'ফলাজনের' স্থানি হইতে অব্যাহতি দিয়া মার্চেট খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেয়।

হিন্দু—১ম ইনিংস—৪৭৪ রান (৫ জন আউট হইয়া)

(মানকড় ১২৮, মার্চেট আউট না হইয়া ২২১)

২য় ইনিংস—৬৬ রান (৩ জন আউট হইয়া)

পাশাঁ—১ম ইনিংস—৩০৮ রান (কুপার আউট না হইয়া ৫৮)

হিন্দুদল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়ায় খেলায় জয়লাভ করেন।

হিন্দু বোলারগণের মধ্যে এস, ব্যানার্জী ও সি, এস, নাইডু বথাক্রমে দশটি করিয়া উইকেট দখল করেন।

মাসার খেলায় মুসলিম বোলারগণের চাতুর্য ও হিন্দু ব্যাটসম্যানদের ক্রটিগুলি খেলার কালে মুসলিম-দল বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম দিকে খেলার তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এবং সময় ও স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পড়িয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ই-৩৩ রান ও আমির ইলাহী ও বালুকের দ্রুত রান দ্বারা হিন্দুপক্ষে কিছু প্রবেশের ক্ষেত্র আউট না হইয়া ১১৮ রান করে।

১৩৩ রান (কিংগচাঁদ ৭২)

২য় ইনিংস—৩১৫ রান (কিংগচাঁদ ১১৮ আউট না হইয়া)

১ম ইনিংস—২২১ রান

২য় ইনিংস—২১৮ রান (ইব্রাহিম আউট না হইয়া ১৩৭)

আমীর এলাহী ও সি, এস, নাইডু ১ম ইনিংসে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন ও বথাক্রমে ৭৬ ও ১৩৩ রান দিয়া ৫টি করিয়া উইকেট লাভ করেন।

বিভিন্ন দলে খাঁহারা খেলিয়াছেছেন

ইউরোপীয় :—হার্ডটাক (অধিনায়ক), কম্পটন, হচকিন্স, সিম্পসন, জ্ঞানমার, ফেরাবেরগার, জাজ, হওয়ার্থ, ক্যারলক, ব্র্যাক-মুর ও ডোব্রীস্কারী।

পাশাঁ :—পালিয়া (অধিনায়ক), মেহেরোমজী, প্যাটেল, সাখা, তারাপোর, কোলা, মোদী, কুপার, ডাভিস্টে, বাঘাটা ও উল্লিগার।

হিন্দু :—মার্চেট (অধিনায়ক), মানকড়, সোহনী, সর্কাপে, রঙ্গনেকার, কিংগচাঁদ, সি, এস, নাইডু, এস, ব্যানার্জী, ফারকার, হিন্দোলকার ও অধিকারী।

অবশিষ্ট :—ডি, এস, হাজারী (অধিনায়ক), ভায়াস, কথম, ডিম্বজা, সলাশিবম, জয়বিক্রম, ক্র্যাক, ভালেরাও, বোচ, কার্ণাওজ, ও বিবেক হাজারী।

মুসলিম :—মুস্তাক আলী (অধিনায়ক), ইব্রাহিম, হাকিজ, গুল মহম্মদ, সৈয়দ আমেদ, গজালী, আমীর ইলাহী, ই, এস, মাকা, আমোদার হোসেন, বালুক ও এনায়েৎ খাঁ।

এম,ডি,ডি,

পট্টাঙ্গার ক্রিকেট খেলার এ বৎসরের পর্ব শেষ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত গত বৎসরের, যী হিন্দু-দল সৌরভ অক্ষয় রাধিতে অসমর্থ হওয়ায় মুসলিম-দল এবার বিজয়ী সন্মান অর্জন করিয়াছে।

ভারতীয় ক্রিকেট-ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতা অতি পুরাতন অনুষ্ঠান। প্রমাণিত করে যে, ১৯১৫ সারিকর্তার গভীর মধ্যে পড়ায় এই বিষয়ে সমালোচনার অন্ত নাই। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্তরায় নহে। নিম্নলি ভাষ্যতর পরামর্শের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

এ বৎসর বথানি ১৫ই নভেম্বর-৩২তে বোম্বাই ত্র্যাবোর্গ ট্যাড্রি, এই খেলার স্থান হয় ও ২৮শে নভেম্বর শেষ দিনের খেলায় মুসলিম-দল হিন্দু-দলকে পরাজিত করিয়া এ বৎসরের বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হয়।

গঠন এক প্রকার সমস্ত হইয়া উঠে।

অন্তরূপ ও উদীয়মান ক্রিকেটীড়ারিদের

নিরপেক্ষ ভাবে শ্রেষ্ঠ গঠন বিশেষ

গঠন মনো নিয়ন্ত্রণটি শ্রেষ্ঠ

সহায়তা সত্ত্বেও তাহারা

৩০০ রান (হার্ডটাক ১৫০)

১০০ রান (৩ জন আউট হইয়া)

১০০ রান (আর এস মোদী ২১৫)

থাক্রমে—খোট, তারাপোর ও ডোব্রীস্কারী

চীত খেলায় মুসলিম-দল অবশিষ্ট দলকে

২১৫০ পরাজয়ের প্রতিশোধ লয়। বিজয়ী ও

১৫০০ রান ও ডি এস হাজারী উভয়েই

১৫০০ পাবে নাই। অবশিষ্ট পক্ষে সিংহলী

বকু ও মুসলিম পক্ষ গজালী ও গুল মহম্মদ শতাধিক

হয়।

১ম ইনিংস—৩০৮ রান (সলাশিবম ১০১)

২য় ইনিংস—৬৬ রান (৩ জন আউট হইয়া)

পেন্টাঙ্গুলার খেলায় বাঁহারা দুই শতাধিক রাণ করিয়াছেন :—

- ১১২৪—হোসী (ইউরোপীয়)—২০০ রাণ
- ১১৩৭—অমরনাথ (হিন্দু)—২৪১ রাণ
- ১১৪১—মার্চেন্ট (হিন্দু)—২৪৩ রাণ
- ১১৪৩—হাজারী (অবশিষ্ট)—২৪৮ রাণ
- ১১৪৩—মার্চেন্ট (হিন্দু)—২৫০ রাণ (আউট না হইয়া)
- ১১৪৩—হাজারী (অবশিষ্ট)—৩০১ রাণ
- ১১৪৪—মোলী (পাশী)—২১৫ রাণ
- ১১৪৪—মার্চেন্ট (হিন্দু)—২২১ রাণ (আউট না হইয়া)

বিজয়ী-ভালিক।

- * ১১৩৭—মুসলিম ; ১১৩৮—মুসলিম ; ১১৩৯—হিন্দু ;
- * ১১৪০—মুসলিম ; ১১৪১—হিন্দু ; ১১৪২—খেলা হয় নাই ;
- ১১৪৩—হিন্দু ।
- * চিহ্নিত বৎসরে হিন্দু-দল যোগদান করে নাই ।

বোম্বাইএ প্রদর্শনী ক্রিকেট

ভারতীয় রেকর্ডসের সাহায্যকল্পে বোম্বাই ক্রীড়াঙ্গণে প্রদর্শনী বিগত ১লা ডিসেম্বর হইতে চার দিন-ব্যাপী এক বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া বিজয়ী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সার্ভিস ক্লাব প্রথম ইনিংস ও ৩৫ রাণে পরাজিত হইয়াছে।

বিজিত দলের খ্যাতনামা ও প্রবীণ ভারতীয় ক্রিকেটবীর কর্ণেল সি. কে. নাইডুর নেতৃত্বে হার্ডষ্টাক, কম্পটন, সিম্পসন, হচকিন্স, ক্যানমার, ডোব্রীকারী, জাক, বাটলার ও কোরাল যোগদান করেন। ইহারা সকলেই বিলাতী ক্রিকেট মহলে সুপরিচিত। কম্পটনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি আছে। ভারতীয় খেলোয়াড় যুক্তাক আলী এই পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

বিজয়ী মুসলিম দলের অধিনায়ক যুক্তাক আলী ১০৫ রাণে ব্যাটিং-চাতুর্য্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সি. কে. নাইডুর অবদান ১১ রাণের মধ্যে বিভিন্ন মায়ের কৌশল দেখাইয়া গৌরবের কথা স্বরণ করাইয়া দেন। তাঁহারা প্রথম ইনিংসে মোট ৩৪২ রাণ করিতে সমর্থ হন। যুক্তাক আলী (১০) ও নাইডুর (১১) রাণ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বাম্বাই করা উদীয়মান ও বিখ্যাত খেলোয়াড়গণের সমন্বয়ে গঠিত ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া দলে খেলেন :—

মার্চেন্ট (অধিনায়ক), হাজারী, সি. এস. নাইডু, এস. ব্যানার্জী,

আমীর এলাহী, মানকড়, আর. এস. মোদী, সর্কাপে, সোহনী, ও মহম্মদ ও মাকা।

প্রথম ইনিংসের খেলায় মোট চার জন আউট হইয়া ৩১৫ রাণ করার পর অধিনায়ক মার্চেন্ট ইনিংস ঘোষণা দেন। তদ্ব্যতীত মানকড় (৬৫) সোহনী (৮২) হাজারী ১০০ শতাধিক রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ উইকেট ভারতীয় ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রেকর্ড ৩৬২ রাণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সার্ভিসদল সর্বসমেত ২৩৮ রাণ করিলে ক্রিকেট ক্লাব বিজয়ী হয়।

সিম্পসন ও কম্পটন যথাক্রমে ৫০ ও ১২০ রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ক্রিকেট ক্লাব পক্ষে প্রথম দফার খেলায়, এস. ব্যানার্জী বিপর্য্যয়ের অবতারণা করিয়া চারটি ভাল উইকেট করে। সি. এস. নাইডু ও আমীর এলাহী প্রথম ইনিংসে তিনটি রাণে যথাক্রমে তিনটি ও পাঁচটি উইকেট দখল করিয়া চার পরিচয় দেন।

ব্যাডমিণ্টন

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন-পরিচালিত বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। বাঙ্গালার উদীয়মান খেলোয়াড় শ্রীযুত হুনীল বসু সিললস্, ডাবলস্ ও মিক্সড ডাবলস্ তিনটি বিভাগে বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত বসুর সিললস্-মুদ্র হন। তাঁহার অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য চ্যাম্পিয়ন প্যারেন নাই।

ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা, অর্জন করিয়াছেন। সুযোগ, মিটন খেলায় বাঙ্গালার সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার একেটা উত্তরোত্তর সফলতা

যতীন্দ্র-প্রশস্তি

যাহাদের প্রতিভার শিখা
উদ্ভাসিল যুগে যুগে জীবনের পথ,
যাহাদের ঢাকা
বাস্তবের ক্ষুদ্রতায়ে করিল মহৎ,
মায়া-মরীচিকা
শ্রান্ত করিল না কভু যাহাদের মানস-মুগুরে,
হাতে লয়ে স্বপন-বস্ত্রিকা

অতিক্রমি অন্ধকার
উত্তরিল যুগে যুগে যারা
জ্যোতিষ্মান মহিমা-
ভূমি তাহাদের এক জন,
তোমার লাগিয়া নহে ধন-মান-খ্যাতি
ভূমি কবি, পূর্ণ-মনস্কার
দূর হতে সঙ্গমে জানাইব তোমায়ে ও

১ ও জাপান :—

বকের এংলো-সান্নন বৈঠকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার শলা-পরামর্শ হয়। মার্কিন ? দর্প করিয়া বলে যে, তাহার একাই প্রশান্ত মহাসাগর যুদ্ধ শেষ করিবে। মিঃ চার্লিস বেন তাহাতে শঙ্কিত বলেন—এই প্রকারের অংশ বুটেনকেও দিতে হইবে। কিন্তু এ দিকে আগ্রহ দেখায় নাই। স্বতঃই প্রায় ওঠে, পরাজয়ের পর রুশিয়া কি জাপান-দর্প চূর্ণ করিতে সাহায্য ? বুটেন ও আমেরিকা কি রুশিয়ার সাহায্য গ্রহণ ঈর্ষান মনে করিবে না ? মনে হয়, রুশিয়া জাপানকে ক্ষুব্ধ ।। এক দিকে রুরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রে সোভিয়েট-প্রভাব-জাখ্যাণ যুদ্ধে ক্রশ-কৃতিত্ব, অল্প দিকে এশিয়ার জাপ-দ্বিত হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক : রুশিয়া ও জাপানকে ঘিরিয়া ক্রমে জটিলতর হইয়া ।

আক্রমণ পরিকল্পনা :—

বক বৈঠকে এংলো-সান্নন নেতৃগণ সম্মতঃ এই উভয় সঙ্কট লোচনা করিয়াছেন। জাপান সম্বন্ধে বৈঠকে স্থির হয়— এডমিরাল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনের পরিচালনায় । ভিতর দিয়া সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে হইবে। জেনারল ম্যাক আর্থারের পরিচালনায় ফিলিপাইন্স দ্বীপপুঞ্জ করিতে হইবে।

এডমিরাল নিমিক্সের পরিচালনায় জাপানগিকে স্বগৃহে করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে কিউরাইলস দ্বীপপুঞ্জের গা অগ্রসর হইতে হইবে।

১ কত দিন বাধা দিবে ?

গীর প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ জানা না গেলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যে, সর্ব দিক হইতে জাখ্যাণী কাদে পড়িয়াছে। পশ্চিম সংক্রিড লাইনের দক্ষিণতম দিকে ফরাসী সৈন্তগণ বেলফোর্ট দ্বা অগ্রসর হইতেছে। এ দিকটা খুব নিরাপদ নয়। সিগক্রিড লাইন অতিক্রম করিলেই ব্লাক ফরেস্টের দুর্গম নী। গত মহাযুদ্ধেও এই অঞ্চলে বিশেষ কোন যুদ্ধ হয় নাই হইতেছে, ফরাসীরা এ স্থান হইতে বুরিয়া উত্তর দিকে ক অগ্রসর হইবে এবং যেকোন স্থানের পর মার্কিন

সৈন্তগণ দক্ষিণে কিরিয়া ট্রাসবুর্জ আসিয়া ফরাসী সৈন্তের সহিত মিলিত হইবে। বর্তমানে মার্কিন সৈন্ত সার ক্রকেনের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

জাখ্যাণরা যে প্রবল বাধা দিতেছে এবং মিত্রপক্ষকে যে প্রতি গজ স্থানের জন্ত প্রবল সংগ্রাম করিতে হইতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেছে। নেপোলিয়ানের পর পশ্চিম-জাখ্যাণীর উপর ইহাই সর্বপ্রথম আক্রমণ। জাখ্যাণীর আভ্যন্তরীণ সামরিক বিশৃঙ্খলা না ঘটিলে মিত্রপক্ষের ঝটিকাগতি জাখ্যাণরা হয়ত রুদ্ধ করিতে পারিত। এই বিশৃঙ্খলার জন্ত মিত্রপক্ষ এক সপ্তাহে প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্ত, প্রায় ১০ লক্ষ টন রসদ ও প্রায় ১ লক্ষ যান ক্রাজের উপকূলে নামাইতে সমর্থ হয়। যদি জাখ্যাণী সর্ব দিক হইতে আক্রান্ত না হইত, তাহা হইলে হয়ত এই বিপর্যয়ে সে বিপন্ন না-ও হইত।

পোলাণ্ডের সীমান্ত হইতে ডানিযুব নদের তট পর্যন্ত, বুলগেরিয়া হইতে মুইজারল্যান্ডের সীমান্ত পর্যন্ত জাখ্যাণী এখনও প্রবল বাধা দিতেছে। বুদাপেস্ট সহর আজ পর্যন্ত অধিকৃত হয় নাই। ইটালী, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ায় এখনও তাহার মিত্রপক্ষের প্রবল আক্রমণকে বাধা দিতেছে। জাখ্যাণীর এই একক প্রতিরোধ-শক্তি এংলো-সান্নন ও রুশ-প্রহার সহ করিতে পারিবে কি না এখনও কেহ বলিতে পারিতেছে না।

পূর্ব-সীমান্তে জাখ্যাণীকে গ্রাস করিবার জন্ত রুশিয়া প্রায় ৪০ ডিভিশন সৈন্ত সমাবেশ করিয়া প্রবলতম অভিযানের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। পশ্চিমে মিত্রপক্ষের আশাভরূপ সাক্ষ্যের ইঙ্গিত পাইলেই লালকোঁজ নিখম আক্রমণ চালাইবে, আশা করা যায়। কিন্তু রুশিয়া এখন পর্যন্ত সমগ্র পোলাণ্ড গ্রাস করিতে পারে নাই, চেকোস্লোভাকিয়ায় সীমান্ত সবে মাত্র অতিক্রম করিলেও বন্ধন শত্রু-যুক্ত করিতে পারে নাই। জাখ্যাণীর পশ্চিম ও পূর্ব উভয় বক্ষেই আরম্ভের আক্রমণ-উগ্রতা বেন হ্রাস পাইয়াছে। অনেকে মনে করেন, জাখ্যাণীর অভ্যন্তরে হয়ত পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে, এ জন্ত জাখ্যাণরা সমবেত চেষ্টায় বাধা দান করিতে সক্ষম হইতেছে।

পরাজিত জাখ্যাণী কি করিতে পারে :—

কিছু দিন পূর্বে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকলের' রাজনীতিক সংবাদ-দাতা মিঃ ই পি মটগোমেরী অনুমান করেন, এংলো-সান্ননগণের আক্রমণ হইতে "পিডুডুমিকে" বক্ষা করিবার জন্ত জাখ্যাণরা কুখ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, চোরগোস্তা সংগ্রাম চালাইয়া যুদ্ধ দীর্ঘ-কাল স্থায়ী করিতে পারে। মিত্রপক্ষের টেলদারী সৈন্তকে অলক্ষিতে ইহার আক্রমণ করিবে, শাসন-ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে, সমরনারকগণ রহস্তজনক ভাবে ব্রুডামুখে পতিত হইবে। হিটলার ও তাঁহার অনুবক্ত নাৎসিগণ, বিশেষতঃ হিমলার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে শুণ্ড প্রতিবোধের কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। মিত্রপক্ষের সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে কোন জাখ্যাণই দারিদ্রপূর্ণ পদ গ্রহণ করিবে না। "হুইসলিং" (বা মীরজাকর) শব্দের নাথী প্রতিশব্দ আবিস্কৃত হইয়া কাদে কাদে উদ্ধার প্রচার হইবে। এই "হুইসলিং" হুই-এক জন নিখম ও বর্কযোচিত ভাবে নিহত হইলে, প্রত্যেক জাখ্যাণ তাহার অর্থ কি, তাহা উপলব্ধি করিবে।

ইউরোপে নূতন পরিস্থিতি—

ইতোমধ্যে ইউরোপে যে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, রুশিয়া তাহা যেন বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া বাইতেছে। রুশিয়া না হউক, সোভিয়েট মতবাদকে ঘিরিয়াই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ বর্তমান সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির যে মূলমন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একলা ধনিকত্ব-বিধেবা রুশ সমাজতন্ত্রীরা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীদের ধনিকত্ব মানিয়া লইয়াছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির মূল মূল্যগুলি এই—

(১) পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতি ও ব্যবস্থা বাহাই হউক না কেন, সকল রাষ্ট্রের সহিত রুশিয়া শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিলে।

(২) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌম সম-মর্যাদা ও স্বাধীনতা এবং ধনতন্ত্রবাদ ও ধনসাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া রুশিয়া সকল রাষ্ট্রের সহিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা করিবে।

(৩) পরস্পরের রাষ্ট্র আক্রমণ নিবারণের জন্ত রুশিয়া অপর যে কোন রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইবে।

(৪) অপর জাতির স্বাধীনতা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব প্রসার রুশিয়া সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

(৫) কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশিয়া হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) ক্যাসিন্ড পররাষ্ট্রলোভীদের সহিত সংগ্রামের জন্ত রুশিয়া যুদ্ধ জাতি সমূহের একা মুদ্রণ করিবে।

জাতিগত-কবলমুক্ত অঞ্চলগুলি বর্তমানে আর সাম্রাজ্যবাদী তথা ধনতান্ত্রিক পূর্বাধিকার বিরিতে রাজি হইতে না চাহিলেও প্রধানতঃ বুটেন এ সকল জাতিকে আশনার নিয়ন্ত্রিত নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে চাহিতেছে।

রুশিয়া কি চায় :—

সুনা বাইতেছে, অধিকৃত জাতিগত ইঙ্গ-মার্কিং প্রভাব-সীমান্ত সঞ্চকে রুশিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুশিয়া চায়—

(১) পরাজিত জাতিগত যন্ত্রপাতি এবং (২) রুশিয়ার যে সকল অঞ্চল যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছে, সে সকল অঞ্চল পুনর্গঠিত করিবার জন্ত যথেষ্ট জাতিগত জোয়ান। এংলো-সাম্রাজ্যবাদ এ সম্ভেদও করিতেছে যে, রুশিয়া এ সকল জাতিগত তরুণকে কমুনিষ্ট-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া জাতিগতকেও ধনসাম্রাজ্যবাদী করিবে।

‘নিউইয়র্ক টাইমসের’ কূটনৈতিক সংবাদ-বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন যে, জাতিগত জাতিগত সোভ্যালিজমের ফলে ইউরোপের সর্বত্র সোভ্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ) প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইবে। রাইএর ইন্টার জাতিগত বিজ্ঞানস কনফারেন্সের মার্কিং প্রতিনিধিগণ বলিতেছেন, বুটেন দৃষ্টান্তঃ ধনতান্ত্রিক হইলেও সে আজ ঋণ-প্রাপ্তি, বুটেনের বাসিন্দা-সম্পদ নষ্ট। যুদ্ধকালে বুটেনকে অনেক সম্পদ বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। বর্তমানে দীর্ঘকাল অনিয়ন্ত্রিত সমবার প্রচেষ্টা ব্যতীত বুটেন আর পঁড়াইতে পারিবে না।

ইউরোপে ব্যস্তির সম্পত্তি বলিয়া বর্তমানে আর কিছুই নাই। নাৎসী সরকার কোডার কারখানা আপনাদের প্রয়োজনে ব্যবহার

এবং উত্তরাঞ্চলের বড় বড় কয়লা-খনিগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে চালাইতে হইবে। একপ অবস্থা জাতিগত এবং অজাতি জাতিগত-অধিকৃত দেশেরও।

গ্রীসে বিজ্ঞোহ—

গ্রীস জাতিগত দ্বারা অধিকৃত হইবার পর, দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত অভ্যন্তর হইতে দেশভক্ত বিভিন্ন দল গঠিত হয়। (১) গুপ্ত সরকার (PEEA), (২) কমুনিষ্ট (EAM), গ্রীক জাতিগত লিবারেশন ফ্রন্ট, (৩) কমুনিষ্টদের পথচালিত বৃহত্তম গেরিলা বাহিনী, লিবারেশন ফ্রন্ট মিলিশিয়া ELAS. (৪) সোভ্যাল ডিমোক্রাটিক দল—জাতিগত পাপানদ্র এই দলের নেতা; গত এপ্রিলে ইনি গ্রীস হইতে পলায়ন করিয়া কায়রোতে গমন করেন। (৫) (মিশরে) নির্বাসিত গ্রীক সরকার—রাজপন্থী দল এবং (৬) রিপাবলিকান দল—গ্রীসের অজাতিগত মুমুকু দলের মধ্যে বৃহত্তম। গত মে মাসে গুপ্ত সরকারের প্রধান সচিব জাতিগত পাপানদ্র সকল দলের ২৫ জন প্রতিনিধির এক বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, সকল দলের প্রতিনিধিকে লইয়া গঠিত এক সরকার ও সর্বদলের সৈনিককে লইয়া গঠিত এক অখণ্ড জাতীয় প্রতিরোধ সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইবে।

সর্বদলের এই চুক্তি মননচ্যুত গ্রীকরাজ জর্জের সিংহাসন রক্ষার জন্ত ইংরেজদের সামরিক কূটনৈতিক সাফল্য বলিয়াই অনেক মনে করিয়াছিলেন।—“Agreement was a temporary victory for British policy aimed at saving the throne for London's friend, exiled king George II.”

কমুনিষ্ট দলকে মন্ত্রিসভায় এটি আসন দেওয়া হয়। কিন্তু এই দল ৬টি মুখ্য পদ দাবী করে। এই দাবী অগ্রাহ্য হইলে EAM দল প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু পরে বোধ হয় কৌশলস্বরূপ সম্মিলিত সরকারে যোগদান করিতে সম্মত হয়। রুশ মিশন ও মার্শাল টিটোর দলের সহিত এই কমুনিষ্ট দলের বিশেষ যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয়।

গত অক্টোবরের মাঝামাঝি গ্রীক সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্বদলে একা স্থাপিত হয় নাই। রাজপন্থী, রিপাবলিকান ও সোভ্যাল ডিমোক্রাটিক দলের প্রভাবে গেরিলা দল ভাঙিতে আদেশ দেওয়া হইলে গেরিলা দল বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। ফলে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে রীতিমত ঘরোয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে।

অনেকে বলিতেছেন, কমুনিষ্টদেরকে হতমান করিবার জন্তই ৩রা ডিসেম্বর বহু সহস্র EAM বিক্ষোভকারী নিরস্ত্র তরুণ-তরুণীর উপর গুলিবির্ষণ করা হয়। (“It is possible that the Communist...are being deliberately brought into disrepute so that citizens tired of violence will rally to the king and the Government”—The Statesman). গ্রীসে ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, বত দিন পর্যন্ত বিধিসঙ্গত সৈন্যবল দ্বারা গ্রীকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং নূতন নির্বাচন না হয়, তত দিন ইংরেজরা গ্রীসের বর্তমান সরকারকে সমর্থন করিবে।

গ্রীসের বর্তমান সরকার রাজতন্ত্রী। ক্ষুণ্ণগ্রীক সামরিক কর্তৃপক্ষ এই রাজতন্ত্রীদের সমর্থক। কমুনিষ্ট লিবারাল ফ্রন্ট

লিশিয়ার সহিত এই সাময়িক কর্তৃত্বাদিগের প্রবল সংঘর্ষ—রীতিমত ছুই চলে। ইংরেজ সৈন্য গেরিলা দলকে নিরস্ত্র করিতেছে এবং গ্রীক পুলিশ-কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করিতেছে। ELAS দল অভিযোগ করে যে, গ্রীক সরকার ফ্যাসিষ্ট হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ("they accused the Government of preparing for 'fascism, of threatening the liberties of the people, of turning toward reaction'.") গ্রীক জাশনাল লিবারেশন ফোর্সেস সেক্রেটারী জেনারেল নিন্‌স পাপাশালাইডিস ঘোষণা করিয়াছেন, Henceforth Premier Papandreou is an outlaw. The people will fight for their liberty without counting their sacrifice."

চরমপন্থীরা ব্যাপক ধর্ষণও ঘোষণা করিয়াছে। মনে হইতেছে, লুগেরিয়ান, ইটালীয় ও রুমানীয় কতিপয় চরমপন্থী গ্রীক চরমপন্থী-দলকে সাহায্য করিতেছে। চরমপন্থীরা প্রধান মন্ত্রিকে ফ্যাসিষ্ট-পন্থী আখ্যা দিয়া বলিয়াছে যে, এই ব্যক্তি বিধাসভাতকদিগকে শাস্তি দিতেছে না, সরকারী চাকরিতে দেশদ্রোহীদিগকে রক্ষা করিতেছে এবং শত্রুর সংগঠিত স্ত্রুবহু সৈন্যদল রক্ষা করিতেছে। অপর দিকে মিত্রপক্ষের তরফ হইতে জেনারেল সার হেনরী মেইটল্যাণ্ড উইলসন ইংরেজদিগের কার্যের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, জাশনালরা এখনও বখন এখেল হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তখন মিত্রপক্ষের বিমান ও নৌ-বীজগুলিকে বিপন্ন করা চলে না। গ্রীস যে সকল চরমপন্থীকে খিঁচিয়া ফেলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত জাশনাল ও বুলগেরীয় সৈন্যও আছে।

ইটালীতেও অসন্তোষ—

গ্রীসের মতন ইটালীতেও রাজতন্ত্রাদিগের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট ও গণতন্ত্রবাদী তরুণগণ আন্দোলন চালাইতেছে। যে দিন এখেল গুলী চলে, সেই দিনই রোমে (৩রা ডিসেম্বর) কম্যুনিষ্ট ও অপর গণতন্ত্রবাদিগণের সহিত রাজতন্ত্রাদিগের দাঙ্গা হয়। দলে দলে রিপাবলিকান তরুণরা যে যে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তাহা লইয়া রাজতন্ত্রবাদী দলপতিদিগকে আক্রমণ করে।

গ্রীসের মতন ইটালীতেও নতুন সরকার গঠনের ব্যাপার লইয়া ইংরেজদিগকে অশ্রিয় মন্তব্য শুনিতে হইতেছে। ইটালীর কোন কোন স্থানে চরমপন্থী দল মনে করিতেছেন যে, ইটালীর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বুটেনেরই গ্রহণোপযুক্ত সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার অযোগ্য না দিয়া, বুটেন এক ক্রৌড়নক সরকার গঠন করিবে। সিনর বোনোমি বর্তমানে ইংরেজদিগের প্রিয়পাত্র, ইংরেজের সমর্থনে তিনি ইটালীর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। কাউন্ট কার্লো ফোঙ্জাকে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ দিতে ইংরেজদের বিশেষতঃ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এটন ইডেনের আপত্তি।

বেলজিয়মে অশান্তি—

বেলজিয়মেও যে সকল রাজনৈতিক দল অভ্যন্তর হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে প্রতিরোধ-কৃতি-দের জন্য কম্যুনিষ্টদল অধিক সুবিধার দাবী করে। প্রধান-মন্ত্রী মঁসিয়ে পিরেলট কটাক্ষ করিয়া বলেন—"there exist in the country political groups which claim a monopoly of merit of resistance and patriotism and want to

exploit it for political aims"—এই দাবী অস্বীকার করিবার জন্য দুই জন কম্যুনিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিরোধ-বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মঁসিয়ে ডিম্যানি পদত্যাগ করেন। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নগণ এই পদত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছেন। ইটালী ও গ্রীসের মতন বেলজিয়মেও সভ্য-সমিতি নিবেদন করা হয়, এবং শুণ্ড রাজনৈতিক দলগুলি এই নিবেদন আদেশ অমান্য করে। চরমপন্থীরা মঁসিয়ে ডিম্যানিকে প্রধান-মন্ত্রী করিতে চায়।

মার্কিন সংবাদপত্রগুলি বুটেনের এই নতুন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট' প্যাপ্ট বলিয়াছেন—"মিঃ চার্লিস ই গ্রীস, ইটালী ও বেলজিয়মে ব্রিটিশ নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং তাহার সমর্থক মিঃ ইডেন তাই কমল সভায় তীব্র ভাবে কাউন্ট ফোঙ্জাকে আক্রমণ করেন।

পোলাণ্ডে উত্তেজনা—

রুশবিধেবী মঁসিয়ে মিকো লাজিক (পোল কৃষাণ দলের নেতা) লণ্ডনে পোলাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রিপদ ত্যাগ করার বুটেন চেষ্টা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে টমাশ আর কিলেউকী লণ্ডনে পোল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কিন্তু রুশ-অধিকৃত পোলাণ্ডের অধিবাসীরা (লুবলিন পোলাগণ) দাবী করিতেছেন যে, পোলিশ কমিটি অক্স-জাশনাল লিবারেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া শত্রুকবলমুক্ত পোলাণ্ডে স্বাধীন এক সর্বদল-গঠিত সরকার গঠন করা কর্তব্য। ৩রা ডিসেম্বর রুশ সরকারী সংবাদপত্র 'প্রাভদা' পত্র প্যাপ্ট জানাইয়াছেন—"the formation of the Arciszewski (৩০শে নভেম্বর গঠিত) Cabinet in London does not solve either the Government crisis or the crisis of the Polish reactionary invigrist."

পোলাণ্ডে নতুন মন্ত্রিসভার নিষ্পা করিয়া সাংবাদিক-বিচ্ছিন্নগণ বলিতেছেন, এই মন্ত্রিসভার এমন অনেক মন্ত্রী আছেন, যাহারা ইহুদী-বিধেবী, যাহারা নাৎয়ী-সাম্রাজ্যতান্ত্রিক নীতির সমর্থক।

বন্ধান ধুমায়িত—

যুগোস্লাভিয়ার কিন্তু গ্রীস, ইটালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানের জায় বিক্ষোভ হয় নাই। কম্যুনিষ্ট মার্শাল টিটোর নেতৃত্ব স্বত্বকে সম্মে করিতে বা সে নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে কেহ সমর্থ নয়। চরমপন্থী টিটো আশা করিতেছেন যে, কোন রাজনৈতিক দল যেন চরমপন্থী দেশত্রাতাদিগের কার্য পণ্ড করিয়া ধনতান্ত্রিকদিগের সাম্রাজ্যবাদী চক্র-প্রবর্তনে সহায় না হন।

রুমানিয়ায়ও জেনা: রাডেভুর নেতৃত্বে রুশপন্থী নতুন সরকার স্থাপিত হইয়াছে। ঢেকোভোভাকিয়াও বলিতেছে, সে আর পোলাণ্ডের জায় ভুল করিবে না; সে কৃষিয়ার সহিত সর্বদা মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবে।

টীনেও কম্যুনিষ্টরা অসন্তুষ্ট—

টীনেও কম্যুনিষ্টদিগের সহিত ধনতন্ত্রবাদী মার্শাল চিক্স কাইশেক প্রয়োজনকালে যেচ্ছার সহযোগিতা করিলেও বর্তমানে আর সহ-যোগিতা করিতে চাহিতেছেন না। কম্যুনিষ্ট দল টীনে গণতান্ত্রিক সর্বদল-সমর্থিত সরকার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিল। চিক্স কাইশেক সে-প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

যুরোপে জাতিগত বৈকল্য, এসিয়ায় চীনের অবস্থা হাইব্রিড। যে জাতিগত উপর প্রভুত্ব করিবে সেই সমগ্র উপর প্রভুত্ব করিবে। চীন সম্বন্ধেও একই কথা। যে নর উপর প্রভুত্ব করিবে, সেই সমগ্র এসিয়ার উপর প্রভুত্ব হবে। মার্কিন সাংবাদিকরা চীনের ব্যাপার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টা মনে করেন। তাহারা বলিতেছেন—“If the Chinese Communist State within-a-state should ever eliminate China the combination of a Communist China's 450,000,000 people and Communist Russia's 190,000,000 people might by sheer numbers and economic resources dominate the world.”—চীনা কম্যুনিষ্টরা চীনে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। এ চীনা কম্যুনিষ্টরা চীনের উপর যদি প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহা হইলে চীনের ৪৫ কোটি নর-নারী এবং রুশিয়ার ১৯ কোটি নর-নারী মাত্র জনসংখ্যার প্রাবল্য ও নীতিগত সম্পদের বলে পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হইবে। কম্যুনিষ্ট-বিরাগী চিয়াং কাইশেক চীনা কম্যুনিষ্টদিগের দাবী নিতে অসম্মত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্টরা চায়—

(১) অবিলম্বে চীনা জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করা হউক। কিং সরকার বলিতেছে, যুদ্ধকালে উহা অসম্ভব;

(২) কম্যুনিষ্টদের সৈন্য-সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭০ হাজার, চিয়াং কাইশেক উহা হ্রাস করিয়া দেড় লক্ষ করিতে পারিবেন না।

পাঠ্যক—

চীনে জাপান যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সকলেই কৃত হইয়াছে। চুংকিং ও কুনমিং বিপন্ন। তাহারা আর ৭০ মাইল অগ্রসর হইলে চীন-ব্রহ্ম পথে মিত্রপক্ষের সকল যোগাযোগ পথ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। একবার তাহারা যদি কুইচাংও প্রদেশ দখল করিয়া ফেলে, তবে তথা হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা মুকঠিন হবে।

জাপান কিউলিন পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করার চীন তথা ইংলিশ শক্তির কি ক্ষতি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মার্কিন সাংবাদিকদিগের দ্বারা “প্রবিশদনযোগ্য”—“Here in this campaign the Japanese have combined a whole sheaf of objectives—a supply route safe from submarines; destruction of China's best troops, a political blow at Chungking which will rock the regime on its foundations. But these are secondary considerations. What they wanted most of all was to get us; to get the nest of planes that had accounted for more than half a million tons of Japanese shipping, had killed Japs by the thousands.”

চীনের এই অবস্থার ফলে—

(১) চুংকিং সরকার চীনের দক্ষিণ উপকূলবর্তী প্রদেশের উপর ও অভ্যন্তরীণ পথবাসী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

(২) ইন্দোচীনে জাপানের স্থলপথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

(৩) যে সকল খাঁচী হইতে চীনস্থিত মার্কিন বিমানবহর পাল্লায় আসিয়াছে ও বন্দরগুলির উপর হানা দিত এবং অতি

ক্লান্ত চীনা সৈন্যদিগকে সাহায্য করিত, সে সকল খাঁচী হইতে আমেরিকা বঞ্চিত হইয়াছে।

মিত্রপক্ষীয়গণ বলিতেছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে মার্কিন নৌ ও বিমান-বিক্রমের সহিত আট্টা উঠিতে না পারিয়া জাপান রণনায়কগণ এশিয়ায় বিভিন্ন দূর্ভেদ খাঁচী স্থাপন করিয়া আপাততঃ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সহিত কোন না কোন প্রকারের আপোষ করিয়া ফেলিতে চায়।

জাপানকে স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাহার করিবার চেষ্টা যে এংলো-আমেরিকান শক্তিবর্গ না করিতেছে, তাহা নহে। খোদ জাপানের উপর মার্কিন বিমান গত মাসে একাধিক বার আক্রমণ করিয়াছে। এবং মিত্রপক্ষ অনুমান করিয়াছে যে, জাপান রাজধানী টোকিও এবং ইয়োকোহামার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন সামরিক তথ্য প্রচার বিভাগ বলিয়াছেন (২৬শে নভেম্বর), জাপান পূর্ব হইতেই এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত—“What are civilian defence activities in London today have long been standard civic responsibilities in Tokyo and other Japanese metropolitan areas. Tokyo can withstand bombing similar to that visited upon Cologne or Berlin and can remain operative.”

জাপানের সামরিক শক্তির হিসাব-নিকাশ—

মার্কিন সহকারী সমর-সচিব মিঃ রবার্ট প্যাটার্সন ‘Colliers Weekly’ পত্রে লিখিয়াছেন—জাপানের নৌশক্তি এখনও আপদ-স্বরূপ, জাপান বিমান বাহিনীর শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাদের সৈন্যশক্তি পূর্বাঙ্গেকা অধিকতর শক্তিশালী। এ সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, জাতিগত পূরাজয় হইয়া গেলেও, জাপানকে অনায়াসে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। তিনি হিসাব দিয়াছেন যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জাপান প্রতি মাসে ১২ শত বিমান নির্মাণ করিতেছিল, এখন তদপেক্ষা প্রতি মাসে শতকরা ২৫টি অধিক বিমান নির্মিত হইতেছে। জাপানের বর্তমান সৈন্যবল ৪০ লক্ষ। ইহা ছাড়া ১৭১৮ বৎসর বয়স্ক ১০ লক্ষ লোককে এখনও যুদ্ধ করিতে আহ্বান করা হয় নাই। জেনারেল স্ট্রলিংওয়ার্ডের স্থানে নিযুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের সহকারী প্রধান সেনাপতি মার্কিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রেমণ্ড এ. হুইলার সাংবাদিকদের এক বৈঠকে মত প্রকাশ করেন (২৬শে নভেম্বর) যে, প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপ হইতে অপর দ্বীপ লাকাইয়া লাকাইয়া জয় করিয়া বেড়াইলেই জাপান পরাজিত হইবে না, জাপানকে পরাজিত করিতে হইলে চীনে খাঁচী সংগ্রহ করিতেই হইবে (“Japan would not be defeated by island-hopping. We must get a lodgement in China.”)

ভারত-পথ নিরাপদের চেষ্টা—

ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যপন্থীদের অশ্রিহারা সম্পদ, বিশেষতঃ বর্তমানে ও যুদ্ধান্তে। ব্রুটেন হইতে ভূমধ্যসাগর দিয়া ভারতে আগমনের সহজ পথ ব্রুটেন নিরাপদ করিতে চায়। টিউনিস দখলের ফলে তাহার জিরাফ্টারের দ্বার নিরাপদ হইয়াছে, উত্তর-আফ্রিকা হইতে জাফা-ইটালীয় প্রভাব উচ্ছেদ করিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তট

নিরাপদ হইয়াছে। ফ্রান্স, ইটালী ও গ্রীসে মিত্রপক্ষের তাবদার না হৌক সমর্থক সরকার স্থাপন করিয়া এক্ষণে বুটেনে উত্তর ভূট নিরাপদ করিতে চায়। এ স্থানে সোভিয়েট প্রভাবাধিত চরমপন্থীরা বাধা দিতেছে। তুর্কী ভূমধ্যসাগরীয় পূর্ব দুই পন্থা—সুয়েজ ও কসকাসে বুটেনের সুবিধা করিয়া দিতে উজ্জত হইয়াছিল—এমন কি, যুদ্ধে যোগদান করিতেও উজ্জত হইয়াছিল। কিন্তু রুশিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছে। রুশিয়া আবার স্তর ধরিয়াছে, বসকাস ও জার্ডানেলিসকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বে রাখিতে হইবে। ভারত-পন্থের লোহিত-সাগরীয় দ্বার নিরাপদ করিবার জন্য উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় বুটেনে আপনাদের অধিকার যেমন সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তেমন আরবী-রাষ্ট্রসমূহকে আপনাদের স্বার্থায়ুকুল করিবার জন্যও বুটেনে ক্রমে চেষ্টা করিতেছে না।

নিউ ইয়র্কের 'ডেলী মিরার' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি গোপনে মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইংরেজরা ইথিওপিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছে। 'ডেলী মিরার' পত্রের লেখক মিঃ ড. পিয়ারসন অবগত হইয়াছেন যে, ইংরেজরা ওগাডেন ও হরার দখল করিয়াছে এবং এই স্থান দুইটি আপনাদের কবলগত করিতে চায়। 'রয়টার'ের কূটনীতিক সংবাদদাতা কিন্তু বলিয়াছেন যে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের স্কিসিস্তি অল্পসংখ্যে বুটেনে ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী কোন কোন অঞ্চল শাসন করিবার অধিকার পাইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে আপন প্রভাব বর্ধিত করিবার জন্য বুটেনে সিসিলি দ্বীপকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যাংশে প্রাধান্য করিবার জন্য বাধ্য হইয়াছে। গত বৎসর মিত্রপক্ষ যখন সিসিলিতে পদার্পণ করে, তখন হইতে

জমিদারশ্রেণী বুটেনের সাহায্য লইতে চায়। ইহা মনে রাখিতে হইবে— "Sicily is the centre of gravity of the Mediterranean Empire". সিসিলিয়ানরা আজ মনে করিতেছে, ব্রিটিশগণের আওতার ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহ মন্দ হইবে না। ইংরেজরাও মনে করিতেছে— "Control of Sicily, for a nation which already has Gibraltar and Suez, would mean control of the eastern and western basins of the Mediterranean."

হিটলার সম্বন্ধে জনরব—

কিছু দিন হিটলারের আওয়াজ শুনা যাইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে গুজব-সম্মতিগণ গুজব রটনা করিয়াছেন (বিলাতী 'Daily Mail' পত্র), হিটলারের কিছু হইয়াছে; হয় তিনি গুরুতর অসুস্থ, না হয় জাৰ্মানীর রাজনীতিক সঙ্কট উপস্থিত। লণ্ডনে রাজনীতি লইয়া বাঁহায়া নিয়তই মাথা ঘামান, তাঁহারা অমনি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, হিমলার হিটলারকে ছাড়াইয়া উঠিতেছেন এবং হিটলারের অসুস্থতার জন্য হিমলার জাৰ্মানীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরে 'রয়টার' সংবাদ বিতরণ করিয়াছেন যে, হিটলার বেশ সুস্থ আছেন।

ইহার পর জনরব রটে যে, হিটলার ও গোয়েবিং জাপানসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাবমেরিণে চড়িয়া রুশিয়ার উত্তরে উত্তর-মেরু অঞ্চল দিয়া যাত্রা করিয়াছেন। ইহার পরই সংবাদপত্রগুলি অল্পমান করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, জাৰ্মানীতে 'তিব্বতিজ' জাহাজ-ভূবির পর হইতেই জাপানের জাৰ্মানীর উপর ত্রুণা জন্মিতেছে, তরাং জাপান-জাৰ্মানী বিচ্ছেদ আসন্ন।

মুসলমান পাটচাষী ও মসলেম লীগ সচিবসভা

ত্রিশিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

গত ২২শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা এক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, সরকার-নির্দিষ্ট পাটের সর্বোচ্চ মূল্য উঠাইয়া দেওয়া হউক ও প্রতি বৎসর প্রদেশের প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্যের অল্পপাতে পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারিত হউক। প্রস্তাবটি ৩০—২৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। বাণিজ্য-সচিব মিঃ কে. সাহাবুদ্দিন বলেন, পাট হইতে উৎপন্ন ত্রব্যের (যেমন চটের) যখন উচ্চতম মূল্য স্থির করা আছে, তখন পাটেরও ঐক্য মূল্য স্থির করা সোপেব হইতে পারে না। এই বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত এক-মত; কিন্তু চটের যে উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত পাটের অল্পরূপ মূল্যের তুলনাই হয় না। ১০০ গজ চটের উচ্চতম মূল্য ২৮ টাকা ৮ আনা, আর পাটের বেলা করা হইয়াছে কলিকাতায় 'জাত মধ্য' ১৭ টাকা মণ। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে ৩৫ সেরের অধিক পাট লাগে না। উচ্চতম মূল্যের হিসাব ধরিলেও এই ৩৫ সের পাটের দাম পড়ে ১৪ টাকা ১৪ আনা। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে পাটকলের খরচ পাড়ে ২ টাকা। আরও এক টাকা ধরিয়া দিলে ণীড়ায় ৩ টাকা। তাহার উপর কলের ভাড়া লাভ ১ টাকা ধরা হইতে পারে। তাহা হইলে সর্বোচ্চ পড়তা হইতেছে ১৮ টাকা ১৪ আনা। এই জিনিস বিক্রীত হইতেছে ২৮ টাকা ৮ আনায়। অতএব প্রতি ৩৫ সের পাটে কলগরালার লভ্যের ভাবে লাভ করিতেছে ১ টাকা ১০ আনা। গত কসলে

উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৫৪,১৩,২০৫ গাট অর্থাৎ ২,৭৪,৬৬,০২৫ মণ। হিসাবে দেখা যাইতেছে, সমগ্র কসলে অন্টার লাভের পরিমাণ ৩০,২১,২৬,২৭৫ টাকা অর্থাৎ ৩০ কোটি টাকার উপর। এই টাকাটি কৃষকের ক্ষতি হইতেছে। পাটের উচ্চতম মূল্য বাঁধিতে হইলে তাহা ক্রয়সঙ্গত ভাবে করিতে হইবে, কলগরালার সুবিধা করিয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ দারিদ্র্যজঙ্ঘরিত মুক কৃষকের স্বার্থ বলি দিয়া করিলে চলিবে না। উচ্চতম মূল্য ১৭ টাকার বাঁধিয়া না দিলে ১১২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে যেমন হইয়াছিল, তেমনই পাটের দর অন্ততঃ ২৫ টাকা মণ ত হইতে পারিত বরং অনেক অধিক হইত। পাটের নিম্নতম মূল্য কলিকাতার মণ-করা ১৫ টাকা বহিয়াছে, ইহা ২৮ টাকা হওয়া উচিত এবং ইহাতেই পূর্বোক্ত হিসাবে কলের খরচ ও লাভ পাওয়া যাইবে। গত কসলের পূর্ব কসলে কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ ৩৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা! সে সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। পাটচাষীর শতকরা প্রায় ১০ জন মুসলমান। পাটকলের শতকরা প্রায় ১০ অংশ ইংরেজের পরিচালনাধীন। মসলেম লীগ সচিবসভা অন্ততঃ অগণিত স্বধর্ম্মীর স্বার্থ সরকার করিবেন এ আশা আমরা করিয়াছিলাম; কিন্তু ভারত শাসন আইনের প্রবর্তন হইতে আজ পর্যন্ত ৭ বৎসরে তাহা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, ব্যবসায়ের স্বাভাবিক নিয়মে যে দর উঠিবে, আইনের দ্বারা সচিবসভা সে পথও বেধে করিয়াছেন। পাটচাষের জমীর পরিমাণ আগামী কসলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের দিকি হওয়া উচিত।



গেল কোথায় ?

গত দুই বৎসর ধরিয়া বঙ্গার ভ্রায় বাঙ্গালা দেশে খরচের শ্রোত বহিরা চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়াছেন খরচ কর, অন্তঃপ্রব দেশার খরচ কর। কিন্তু এক দিন যে এই খরচের হিসাব-নিকাশের তলব হইতে পারে, বঙ্গনা-নীতির স্থানীয় কর্তাদের সে কথা মনে ছিল না। আজ অডিটর জেনারেল হুঃ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, প্রায় তিন কোটি টাকার হিসাব পাওয়া যাইতেছে না। উহা সাপেলে একাউন্ট ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

হক সাহেবের নিকট হইতে যখন জোর করিয়া পদত্যাগ-পত্র আদায় করা হয়, তখন ব্যবস্থা পরিষদে এই বিষয়ের আলোচনা হয়। তখন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে বঙ্গনা-নীতির নিন্দা এবং অর্থব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে পরামর্শ না করার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আজ অডিটর জেনারেলও বলিতেছেন, 'বঙ্গনা-নীতির খাতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার গরমিল রহিয়াছে। তদন্তের যে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাঁহার রিপোর্টও শোচনীয়। এ দিকে এই বৈ-হিসাবী খরচের দায়িত্ব পাবলিক একাউন্টস কমিটি লইতে রাজী হইতেছেন না। কিন্তু খরচের জন্ত বাঁহারা দায়ী, তাঁহারা ত দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন না। তাঁহারা কি বলেন? এইরূপ ঘটনা নূতন নহে। ব্রহ্মদেশীয় শরণাগতদের জন্ত অর্থব্যয় সম্পর্কেও অডিটর জেনারেল গরমিলের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

দুর্নীতি দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তদন্ত নাই, দণ্ড নাই, প্রতিকার নাই। সর্বোচ্চ ক্ষমতার নিম্নেই সর্বাধিক গরমিল আত্মগোপন করে। জনসাধারণের অর্থেই দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয়। সুতরাং আমাদের জাতিবার অধিকার আছে, এই গরমিলের জন্ত কি ব্যবস্থা করা হইবে? জনসাধারণের অর্থব্যয়ে উড়নচণ্ডীগিরি করা অস্বচিত। ইহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা আবশ্যিক এবং ভবিষ্যতে বাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে শাসনের স্বাস্থ্যরক্ষা করা হইবে। কিন্তু আমাদের আবেদন কি কর্তাদের টলাইতে পারিবে?

ভেঙ্কি

বাঙ্গালা সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগ কত ভেঙ্কি জানে! ছ ছ করিয়া মাল খরিদ করিয়া গুদামজাত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু হুম্ব করিতে পারিলেন না। তাই আবার গুদামজাত বহু বাজ্রে মাল টেণ্ডারের সাহায্যে বাঙ্গালা দেশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর কত মাল বে নন্দ্যায় মাঠে ঘাটে পোপনে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরানো ও পচা বস্তার টেণ্ডার চাই। এক লক্ষ মণ আত্ম ছোলার টেণ্ডার চাই। কিন্তু এই ছোলা যে

কি অবস্থায় আছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। নির্দেশ আছে, সর্বোচ্চ মূল্যের টেণ্ডার ছাড়া এ ছোলা ছাড়া হইবে না। ঠিক কথাই। যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে ত। কিন্তু এই বাজ্রে খাজ বাহারা কিনিবে, তাহারা ত বাজারে তাহা বেচিবেই। ফলে বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষের পরও যে অর্ধমৃত ব্যক্তিরা বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও মরিতে হইবে। সাবাস!

স্পষ্ট কথা

ভারত হইতে যে বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি-দল বিলাত গিয়াছেন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বলিয়াছেন যে, বিলাতের জনসাধারণ ভারতের কোন উল্লেখযোগ্য খবর রাখে না, সে স্বাধীন তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। বাঁহারা খোঁজ-খবর রাখেন অর্থাৎ কর্তারা, তাঁহাদের মতামতকে 'আন্তরিকতা-হীন কথা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের প্রকৃত উন্নতি একমাত্র দায়িত্বশীল জাতীয় গভর্ণমেন্টই সাধন করিতে পারে। বিদেশীরা পারে না, কারণ, সে সদিচ্ছা তাহাদের নাই। কর্তারা একটু বিজ্ঞত হইয়া পড়িয়াছেন। ভোজ দিয়া, সম্মানিত করিয়া আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যকে শ্রদ্ধা করে। স্পষ্ট কথা বলিতে ভয় পায় না। এই প্রতিনিধিদল মিথ্যার রঙীন ফায়াস কাঁদাইয়া দিয়া ভারতের মর্যাদাসিক্ত কাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন। ইহাতে দেশের প্রভূত উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়।

পঞ্জাব মেল-দুর্ঘটনা

'ভ্রমণ কমাও' বিজ্ঞাপনে সরকার অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন। হুঃপ্রব প্রকাশ করিয়াছেন, উপযুক্ত ফল পাওয়া যাইতেছে না। সফর আরও কমান প্রয়োজন। আজ ভারতবর্ষের জনসাধারণের বা অবস্থা, তাহাতে সখ করিয়া বেড়ান সম্ভব নয়। আর ট্রেনের অসুবিধা, ভিড়, গুঁতোগুঁতি কেহ সাধ করিয়া সম্ব করিতে যায় না। বাহারা ট্রেনে যায় তাহাদের উপায় নাই বলিয়াই যায়। সরকার বলিতেছেন, বাত্মিসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। সত্য কথা, কিন্তু এই বাড়তি সংখ্যা ভারতবাসীদের নয়, নবাবগত বিদেশীদের। তাহা ছাড়া গাড়ীর সংখ্যা যে অত্যন্ত কম, তাহাও তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

কিন্তু এইবার ফল ফলিবে। বিজ্ঞাপনে বাহা সম্ভব হয় নাই, দুর্ঘটনায় তাহা সম্ভব হইবে। পূর্বেকার ভিটা-ট্রেন-দুর্ঘটনায় যে মর্দ-ভৌ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, আর্য নিকটে সম্প্রতি ডাউন পঞ্জাব মেল-দুর্ঘটনার অবস্থা তাহাই, হয়ত আরও শোচনীয়। ইঞ্জিন ও ছয়-খানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, আর মৃত্যুসংখ্যা—সে কথা আর নাই বলিলাম। কোন দিন কেহ সত্যাকারের মৃত্যুসংখ্যা জানিতে পারিবে না। করাতীর কর্পোরেশনের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান মিষ্টার থেমটাম নিহত হইয়াছেন। তদন্তে না কি জানা গিয়াছে, 'ত্ৰাবোটেজ'এর জন্ত এই দুর্ঘটনা। বাহাই হউক, এই বার ভ্রমণ কমিবে। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সফল হইবে। বাঁহারা ত্ৰাবোটেজের জন্ত দায়ী অথবা বাঁহাদের অসাবধানতা বশতঃ এই দুর্ঘটনা, তাঁহারা পূর্বদ্রষ্ট হইবেন, না তিরস্কৃত হইবেন?

নিয়ন্ত্রণে গলদ

দামরা অপরাধ না করিয়াও অপরাধী। কর্তাদের দুর্বলি ও দনীচাদের কল আমাদেরই ভোগ করিতে হইতেছে। করদাতাদের দর্শে কত রকম নতুন আপিস হইয়াছে ও হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বের লেন-দেনও বাড়িয়া চলিয়াছে!

সে-দিন কেন্দ্রীয় পরিষদে সার এডওয়ার্ড বেঙ্কল বলিয়াছেন, ঘুঘু গাড়া রেল ভ্রমণে বার্ষিক রিজার্ভ করা যায় না। ঘুঘু দেওয়া এবং গাড়া উভয়ই পাপ, এ জন্ত জনসাধারণ দায়ী; কারণ, তাহারা ঘুঘু নয়। কিন্তু ঘুঘু কি আর সাধ করিয়া দেয়? বাধ্য হইয়া দিতে হয়। ১১ দিলে টিকিট অথবা রিজার্ভেশন মেলে না। সখ করিয়া আজ-কাল কেই ভ্রমণ করে না। এমন ব্যক্তি—যার না বাইরা কোন উপায় নাই, অথচ ঘুঘু না দিলে বাওয়া যায় না, তাহাদের জন্ত ঘুঘু ছাড়া আর থে নাই।

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিয়া বাহাদের মাল বিক্রয়ের ভার দিয়াছেন, গাহারা যদি চোরাবাজারী মনোবৃত্তি লইয়া নির্দ্ধারিত মূল্যের অধিক নয়, তখন কি উপায়? বাচিতে হইবে ত। খাত চাই, বস্ত্র চাই, ৩খ চাই। কিন্তু কোন দ্রব্যই নির্দ্ধারিত মূল্যে মেলে না। দাকানীরা পরিষ্কার বলিয়া দেয়, মাল নাই। তখন অন্ত্রোপায় ইয়া চড়া দামেই মাল খরিদ করিতে হয়। সখ করিয়া কেহ বেশী ম দেয় না।

আমাদের মনে হয়, কপ্টোলের সিটেমেই কোথায় গলদ রহিয়া গয়াছে। আইনের বিরাট কাক না থাকিলে এ জিনিষ কি করিয়া সম্ব হয়? কর্তারা বৃদ্ধির দোষে অসাধু লোককে সাধু মনে করার লে আমাদের প্রাণ যায়!

এ কি শুনি!

কণশীল চার্লিস মন্ট্রিসভায় মি: আমেরীয় সহকারীর পদ লাভ দিয়াছেন সমাজতন্ত্রবাদী আল'অফ গিল্ডওয়েল। কি করিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাকে দলে লইলেন তাহা বুঝা কঠিন। তাহার পর নতুন পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে রকম গলো ভালো কথা বলিয়া ফেলিলেন, ভয় হয়, শীঘ্রই আল'অফ গিল্ডওয়েল জেনারেল গিল্ডওয়েলের পর্ষায়ে গিয়া না পড়েন! ক্রিসভা চিরকাল ভারতবর্ষকে ইংরেজদের কামখেদু হিসাবে গণ্য দিয়াছেন। যত চাও দোহন কর। মুখে মিষ্ট কথা বলিয়াছেন, আমাদের অধীনে থাকিয়া যে স্বগম্ভূ ভারতবাসীরা ভোগ করিতেছে, করা করিয়া তাহাদের সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করি? আল'অফ গিল্ডওয়েলের মত আজ সেই সভায় এক জন সমাজতন্ত্রবাদী কি করিয়া ন পাইলেন? তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ নিজের গর্ভমেষ্ট গঠন বিবায় যোগ্যতা ও অধিকার রাখে। যদি সেই অধিকার হইতে রতবর্ষকে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে সর্বত্র বুটেনের দুর্নাম টবে।

এই রকম মারাত্মক কথাবার্তা কি চার্লিস-আমেরী কোম্পানী ম করিতে পারিবে? লর্ড অব গিল্ডওয়েল তাহার কথাকে কত দূর প্রাণকরী করিতে পারিবেন বলা শক্ত, কিন্তু তিনি যে আন্তরিক ভাবে রতবর্ষের দাবীকে মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতেই আমরা আনন্দিত য়াই।

বন্দি-সমস্যা

কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে অল্প কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু বটুকু বলিয়াছেন, তাহাতেই আমরা অস্বস্তি ভোগ করিতেছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং সমিতির আত্মীয়-স্বজনের সম্মিলিত দেখা করিবার সুবিধা ক্রান্তাখান করিয়াছেন কেন? স্ট্রীটের তিনি বলিয়াছেন, বহু দিন তাহারা সে সুবিধায় বঞ্চিত ছিলেন। সেই জন্তই সে সুবিধা তাহারা আর চাইতে চাহেন না। বেন সুবিধা দেওয়া হয় নাই, তাহা বলা হয় নাই। বন্দীরা কেবল স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক কুশল সম্পর্কেই প্রশ্নাদি করিবার অধুমতি পায়। কিন্তু সরকার কংগ্রেস কমিটির সমস্তদের প্রতি সেই শর্তাচারটুকু পণ্যস্ত দেখাইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। শুনা যাইতেছে, বাহাদের সরকার বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন, তাহারা মুক্তি পাইবেন না। কিন্তু বিচার পাইবেন কি? আর কে বিপজ্জনক, তাহা সরকার কি করিয়া ঠেঠ করেন? বাহাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই সত্যকার বিনা সর্টে মুক্তি পাইয়াছেন। বন্দীদের ভাতা, সম্পর্কেও অস্বস্ত্য বার হইতে অনেক বেশী কড়াকড়ি এবং কুপণতা দেখা যাইতেছে।

সরকার কি চান? মৃত্যু ছাড়া কি মুক্তি মিলিবে না?

প্রশংসনীয় বটে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফাক্স ব্যাঙ্কারদের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টাকা রাজগারের কারখানা নহে। * * * আমি প্রায়ই আমেরিকানদের বলিতে শুনি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা শোষণের দ্বারা সম্মিলিত—নিছক অল্পবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট কারবার এবং যে অর্থ স্পর্শ করার নৈতিক অধিকার বুটেনের নাই, সেই অর্থ আহরণ করিয়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়া আছে।"

দ্রব্য বক্তৃতা! আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস আছে! কিন্তু আসল জিনিস—সত্য নাই। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উপনিবেশিক নীতি সম্বন্ধে বাহারা জানেন—তাহারা এই বাণী শুনিয়া হয় কৌতুক বোধ করিবেন, না হয় মিথ্যা কথা সাম্রাজ্যীরা বলিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে নৈতিক অধিকার (অথবা অনধিকার) বলে ভারত শাসন করিতেছেন, তাহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ প্রতি বৎসর ভারত হইতে হোম-চ্যাঞ্জ বাবদ একটা মোটা টাকা ইলগু যায়। তাহার উপর বহু ব্রিটিশ কোম্পানীকে ভারতে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার দিয়া অর্থ আহরণ নির্বিবাদে শ্রোণ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আর এই সাম্রাজ্য গড়িবার ব্যয় ভারত-বর্ষকেই দিতে হইয়াছিল, বুটেন দেয় নাই।

ভারতবাসীকে নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িবার অধুমতি না দিয়া ব্রিটিশ-স্বার্থ বজায় রাখা হইয়াছে। ভারতের কাঁচা মাল বুটেনে লইয়া গিয়া 'কিনশাড প্রোডাক্টস' আবার ভারতকেই বিক্রয় করিতেছে চতুর্ভুগ মূল্যে। বুটেনের যে ছেলেগুলির কিছু হয় না, বাপ-মা তাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। তাহারা জানেন, টাকা লুটবার এমন সুবিধা অল্প কোথাও নাই! এবং এই শোহন ও শোষণে সরকার কোন আশঙ্কি করিবে না।

লর্ড জালিফারকে কি বলিয়া অভিনন্দিত করিব ? তিনি মিথ্যা কথা বলিবার যে অপূর্ব নমুনা ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয় !

গভর্নরের বস্তী-ভ্রমণ

বঙ্গাঙ্গার গভর্নর মিষ্টার কেসি বঙ্গাঙ্গার প্রধান-সচিব ও কলিকাতার মেয়রের সহিত কলিকাতার বস্তী সমূহ প্রদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট হাউসে কিরিয়া তিনি বিবৃতি দিয়াছেন যে, মাদ্রাস মাদ্রাসকে কিরূপে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। ইহার জন্ত কাহারো দায়ী, তাহা তিনি জানিতে চাছেন না, কিন্তু ইহাদের উন্নতি-সাধন না করিলে যে মদ্রাসের অবমাননা করা হয়, তাহা তিনি উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন গোলাবোগ এই উন্নয়নের চেষ্টাকে যেন ব্যর্থ না করে।

কথাগুলি সত্য এবং মর্মস্পর্শী। কিন্তু কে এই উন্নতি-সাধন করিবে ? বিরাট অট্টালিকাবাসী বস্তীর মালিক কি কোন দিন সেই দিকে নজর দিয়াছেন ? ভাড়া পাইলেই হইল। শুনা যায়, ব্যাকের চেষ্টা না কি বস্তী হইতে বৈী 'রিটার' পাওয়া যায়। বাসিন্দা মরিল কি বাঁচিল, তাহাতে তাঁহাদের কি বা আসে যায়।

বস্তীর এই অবস্থার জন্ত কাহারো দায়ী, সে কথা মিষ্টার কেসি জানিতে চাছেন না, কিন্তু বস্তীর উন্নতির জন্ত কাহারো দায়ী হইবে, সে কথা জানিবার জন্ত আমরা উদগ্রীব।

ফুড কমিশনের রিপোর্ট

ফুড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তদন্তে দুভিক্ষের প্রকৃত কারণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। 'কমিশন রিপোর্টে' প্রকাশ, বঙ্গাঙ্গা দেশে হয় ত খাদ্যের কিছু অভাব ছিল, কিন্তু সে অভাব দূর করা অসম্ভব ছিল না। চেষ্টা করিলে দুভিক্ষ রোধ করা হইত। বঙ্গাঙ্গা সরকারের এবং সচিবসজ্জের 'বালি' এর ফলেই এই ভীষণ অবস্থা।

আমরা এই কথা বহু দিন বহু বার বলিয়াছি যে, এই দুভিক্ষ মাদ্রাসের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট, কিন্তু জনসাধারণের কথা ত সরকার অথবা সচিবসজ্জের কাছে উঠে না। শুভ্র, মিথ্যা, বাড়িয়ে বলা ইত্যাদি নানা ভাবের প্রয়োগে আমাদের উক্তিটির গুরুত্ব এবং সত্যতা তাঁহারা খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই বার ! সরকারী রিপোর্টকে ত তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে না ?

যদি সরকার এই রিপোর্টে কোন গুরুত্ব আরোপ না করেন, তবে আমাদের প্রশ্ন, মিছামিছি এত টাকা খরচ করিয়া কমিশন নিযুক্ত করিবার সার্থকতা কোথায় ? আর যদি এই রিপোর্টকে তাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাঁহারা বঙ্গাঙ্গা দেশের এই মর্মান্তক অবস্থার জন্ত দায়ী, সরকার সেই অপরাধীদের জন্ত কি দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন ?

নরেন্দ্র-মণ্ডলের বিক্ষোভ

নরেন্দ্র-মণ্ডল-সঙ্ঘট সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। অতি বিবস্ত্রিতরূপে জানা গিয়াছে যে, এই গোলাবোগের কারণ একটি 'ট্রান্সি-বর্ডার'। যে পত্রের দ্বারা এই আদেশ জারী

করা হইয়াছিল, তাহা রাজনৈতিক বিভাগের এক জন কর্মচারী দ্বারা সাক্ষরিত। সেই পত্রের মর্ম এই যে, নরেন্দ্রগণ নরেন্দ্রমণ্ডলে অথবা ট্রান্সি কমিটিতে তাঁহাদের অভাব অভিযোগ অথবা তদন্তরূপ বিষয় সমূহের আলোচনা করিতে পারিবেন না। রাজস্বগণ রাজনৈতিক বিভাগের অধীনে। ফলে রাজস্বগণ স্থির করেন যে, রাজস্বপ্রতিনিধিকে অথবা তাঁহার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সার ফ্রান্সিস উইলিকে না জানাইয়াই উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

ট্রান্সি কমিটি তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম—রাজস্বপ্রতিনিধিরূপে লর্ড ওয়াভেলের নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ ; দ্বিতীয়—দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসন-সংস্কার ; তৃতীয়—ভবিষ্যৎ শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্তন। তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ-রাজ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্বে যেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করা হয়। সচি সখ্যে বলা হইয়াছে যে, রাজস্বপ্রতিনিধি দুই পত্রের মধ্যস্থ চুক্তির কোন পরিবর্তন করিতে পারেন না, যে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা স্বাধীন ভারতীয় গভর্নমেন্ট গঠিত হইবে, রাজস্ব-বিগকে উহার সহিত আলোচনা চালাইবার অধিকার দেওয়া হউক।

এই প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে। উত্তরে নরেন্দ্রগণ রাজনৈতিক বিভাগের প্রতুষ্টব্যাক্র একটি কড়া চিঠি পাইয়াছেন। ফলে এই সঙ্ঘটের উদ্ভব। পরে লর্ড ওয়াভেলকে এই ট্রান্সি কমিটির মর্ম জানানোর ফলে একটা সম্মানজনক মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে। শেষ অবধি কি হইবে বলা কঠিন, তবে রাজস্বগণের এই সংসাহস প্রশংসনীয়।

পরলোকে আবিরাবাল দেবী

বিখ্যাত ডাক্তার রায় বাহাদুর শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ আবিরাবাল দেবী গত ৫ই অগ্রহায়ণ চিত্তব্রজন সেবাসদনে মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে দুরারোগ্য কর্কট রোগে ভুগিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি ছিলেন বাগবাজারনিবাসী স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার রামবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আবিরা দেবী আদর্শ সত্যী সাক্ষী রমণী ছিলেন। এই অল্প বয়সেই তিনি শস্ত্র ও পিতৃকুলের সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। হৃৎথের বিষয়, তিনি কোন সম্বাদি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মার সুগতি হউক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পরলোকে শ্বেতাঙ্গিনী দেবী

গত ২১শে কান্তিক বৃধবার শ্বেতাঙ্গিনী দেবী মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীহামপুর 'চাতরা কুটারে' দেহতাগ করিয়াছেন। ইনি সুবিখ্যাত 'লিষ্টার এন্টিকেশন টেক্স' নামক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর ও 'চাতরা কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস' এর প্রতিষ্ঠাতা বর্গত শরণচন্দ্র চক্রবর্তীর পত্নী। যু্যাকালে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখির গিয়াছেন। ভগবান এই শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে অচিরে শান্তি দান করুন।

শ্রীশ্যামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রিট, 'বহুবলী' ঘোঁটার মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত



চলিত ক্ষেত্রে হিন্দুসম্প্রদায় আজ এক
স্তর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। যে
দেশেই আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই প্রদেশেই
এই সমস্যা। প্রত্যেক প্রদেশেরই নানাবিধ
সমস্যা আছে এবং তৎসমুদয়ের সমা-
দর জন্য সকল প্রদেশকেই স্বাধীন ভাবে
গণনা হইতে হইবে; কিন্তু যে সমস্যা
যার হিন্দু-প্রদেশমাত্র। পক্ষেই সমান
লিখিত প্রয়াস এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা
তাহার সমাধান একরূপ অসম্ভব।



ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এই স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা
শুরু। স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিরোধ করিতে
এ সব প্রাণে হিন্দুজাতিকে সম্মুখীন হইয়া আত্মশক্তিকে উদ্ভব
তে হইবে, জনমত সুগঠিত করিয়া স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত
হইবে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দু সমস্যা শুধু
ই সমস্যা নয়, ভারতের সমস্যা, হিন্দুর স্বার্থের প্রতিকূলতাচরণ
তর স্বাধীনতার পরিপন্থী।
রাজশক্তি হিন্দুর প্রতি বিমুখ। ভারতশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ
নায়ে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান
নায়ে স্বার্থ অরক্ষিত হইয়া পড়িবে—এই স্বচিন্তিত এবং সুকল্পিত
নাজিটিকে তাহার নানা কৌশলে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু
লব্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের যে সৌহার্দ্য তাহার মধ্যে
রিক্ততা কোথায়? হিন্দুসম্প্রদায় যেখানে সংখ্যালঘু, যেখানে
সব স্বার্থ ও অধিকার বিপর্যস্ত, সেখানে তাহাদের স্বয়ং-বিগলনের
পরিচয় পাওয়া যায় না কেন?
ব্রিটিশের ভারতশাসন পদ্ধতির মধ্যে ভেদনীতিটাই প্রাধান্য
লাভে। মুসলিম লীগ-মন্ত্রিগণের হাতে যেখানেই শাসনভার
লাভে সেখানেই দুঃশাসনের স্বরূপ পরিস্ফুট। তাহার হাতে শুধু
নয়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরও সাহায্য নাই।
নের প্রায় পাইরা দুঃশাসন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর

একমাত্র অপরাধ—স্বদেশপ্রীতি। বিদেশী
শাসনশক্তির সৌহৃদ্য হইতে ভারতবর্ষকে
মুক্ত করিয়া স্বনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ভারত-
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই তাহার কাম্য। বৈদেশিক
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিন্দুর এই স্বাধীনতা-
প্রিয়তাকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন কেন?
ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে
আমরা দেখিতে পাইব—কি হিন্দু, কি
মোগল, কি পাঠান সকলেই ভারতবর্ষকে
এক অঞ্চল রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করিতে
চাহিয়াছিলেন। তাহার বৃথিলা ছিলেন, এ রাষ্ট্রের অন্তর্গত
প্রদেশগুলি যদি শক্তিশালী হইয়া রাষ্ট্রেরই অঙ্গীভূত হইয়া
থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ মহাশক্তি-সম্পন্ন হইবে। সাম্রাজ্য-
বাদী ইংরেজও সে কথা বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই বিপরীত
পথ ধরিয়াছেন। অঞ্চল ভারতবর্ষের শক্তিমত্তা তাহাদের বিতর্কিত-
স্বরূপ, তাই খণ্ডনের দিকেই তাহাদের আনুগত্য।

এক দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনিচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেন্ট, অন্য দিকে তাহাদেরই প্রসাদপুষ্ট সাকারী স্বার্থলোলুপ আত্মঘাতী
ভারত-বাবুদেরকামী মুসলমান দলবিশেষ—ভারতের স্বাধীনতা লাভের
পথে এই দুইটি হইল প্রধান অন্তরায়। আশ্বাসের বিষয় এই যে, এই
সব বিরোধীদের প্রতিরোধ প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য বখন
মিত্রের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, আশঙ্কা তখনই। আমাদের আপন
সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন অনেক আছেন, বাহারা বাহ্যতঃ বন্ধুত্ববাপন
হইলেও কার্যতঃ তাহার বিপরীত। তাহারা বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা
করিয়া কাল্পনিক কল্যাণের নামে আত্মকলহের পথ প্রস্তুত করিয়া
দিতোছেন। অবাস্তবের অলীক স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহারা স্বদেশ এবং
জাতির সর্বনাশ আহ্বান করিয়া আনিতেছেন। ভারতের স্বাধীনতা
আন্দোলনের ইতিহাস অল্পসংখ্যক করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, রাষ্ট্রনীতির
ক্ষেত্রে স্বৈচ্ছাপূর্বক ধর্মসমস্যা আনয়ন করিয়া জাতিকে পঙ্গু ও দুর্বল
করিয়া সাম্রাজ্যবাদের সৌহার্দ্যকে সচল ও সকল রাষ্ট্রের

ভারত-শাসনপদ্ধতির একটি অপরিসীম অঙ্গ। পৃথিবীর কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তার উদ্বোধন হয় নাই। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। এক রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম বর্তমান থাকিবে। এক ধর্মের প্রতি অন্তর্মুখী সম্মান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে। প্রত্যেকে আপন আপন মত অনুসারে ধর্মমুগ্ধান করিবার অধিকার পাইবে—যে কোনো সভ্য দেশে ইহাই ত লোকে আশা করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের রাজশাসন যেন হিন্দুর প্রতি মার-মুষ্টি ধরিয়াই আছে। কলে কৌশলে হিন্দুর কঠোরতা করিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে চাপা দিবার জন্ত তাহার চোঁটার আর অস্ত্র নাই। এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? হিন্দুর অধিকার ক্ষুণ্ণ করার অর্থই যে দেশের স্বার্থ ব্যাহত করা, ইহা জানিয়াও কি জনসাধারণ তাহার প্রতিকারের জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইবে না?

ভিক্ষাপঞ্জীর মত ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভারতবর্ষ কাহারও দ্বারস্থ হইবে না, ভারতবর্ষ আজ মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবীতে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্ত অগ্রসর হইবে। ভারতবর্ষ দীর্ঘকালের চোঁয় এটুকু উপলব্ধি করিয়াছে—স্বাধীনতা চাহিয়া পাণ্ডুর জিনিষ নহে, উহা কাড়িয়া লইতে হয়। ভারতবাসী নন্দুর ছায় পবনজোর উপর সোলুপ-দুটী নিক্ষেপ করে না, সে কেবল আপন দেশে আপন ইচ্ছামত বিবরণ করিতে চায়। স্বদেশে থাকিয়া প্রবাসীর দুঃখ ভোগ করা তাহার পক্ষে দুঃসহ ইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দেশটাই যে আজ তাহার পক্ষে অনর্গল বন্ধিলা। তাহা হইতে সে মুক্তি চায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে জগৎ কোন্ সম্পদ পাইয়াছে? বস্ত্রভারে এই সভ্যতা যতই ছুঁতর হউক না কেন, স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার কোনো পথ কি সে প্রদর্শন করিয়াছে? সাম্যের বাণী পশ্চিমের মুখে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সাম্যের সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম কি কখনও কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটী পর্যন্ত উত্তোলন করিয়াছে? করিবে কি করিয়া? পশ্চিমের সভ্যতা তো একাপত্তী নয়, বৈষম্যই তাহার মূলমন্ত্র। পশ্চিমের রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যই হইল আত্মশক্তি সম্প্রসারণ, অস্ত্রশক্তি সংকোচন। তাই বৃহত্তর শক্তিসমূহ ক্ষুদ্রতর শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া ফলোদার হইবার চোঁয় বস্ত্র। বিধাতা স্বয়ং তাঁহাদিগকে দীন-দরিদ্রের রক্ষাকর্তা করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। তাঁহারা উক্ত জাতি, নিম্নতর মনুষ্য জাতি তাঁহাদেরই অভিভাব্য—এই বিশ্বাস তাঁহাদের মন হইতে এখনও মুছিল না। পাশ্চাত্য জাতির এই অভিভাবকতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আজ সমগ্র জগতে মুখর হইয়াছে, তাহার উদ্ভব কেবল প্রোচাদেশেই নয়, পশ্চিমের নিপীড়িত মানব-সাধারণও তাহার অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া বিরুদ্ধ হইয়াছে।

স্থায়ী শাস্তি যতই কাম্য হউক, শান্ত-খাদকের মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। স্বয়ং বিবাদীই যখন বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত, সেখানে বারীর ভরসা কোথায়? ব্রিটিশগণ স্বচ্ছন্দ মনে ভারতবর্ষের হাতে স্বাধীনতা তুলিয়া দিবেন, ইহা কেহ কল্পনাও করিবে না। কিন্তু যুগমান যাবতীয় বৃহৎ শক্তির আজ এ কথা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে যে, ভারতবর্ষ যত দিন না স্বাধীন হয়, তত দিন পর্যন্ত বিশ্ব-শান্তির আশা মরীচিকার মতই ছুঁসি দূরত্বের সিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের কথা আজ কাল প্রায়ই শোনা যায়। বিভিন্ন মতবাদ, আদর্শ এবং চিন্তাধারার প্রত্যেক

এই নাম দিয়া জিন্ন জিন্ন লোককে এ দেশে পাঠানো হইতেছে। তাঁহারা পূর্বকল্পিত কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া ভারতে অর্থনৈতিক দুর্গতি ও হরবহুর জন্ত স্বাধীনতা অঙ্গ এবং উপদেশ বর্ষণপূর্বক প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথিবীর কোণে ঘুরি দিবার পক্ষে এই নীতি হয়তো কতকটা কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু ভারতের উন্নতির কোনো উপায় তো এই নীতির মধ্যে নিহিত নাই। এই নীতির মধ্যে কেন, কোথাও তাহা নাই। ভারতের উন্নতির একমাত্র উপায় স্বাধীনতা লাভ। ভারতবর্ষ যে দিন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবে, অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সেদিন তাহার পক্ষে আর কঠিন থাকিবে না। কিন্তু আমাদের শাসকসম্প্রদায় শৃঙ্খলার নামে পদে পদে নূতন শৃঙ্খল বোজ্ঞানার কৌশল ভাল ভাবেই জানেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র একাধীনতা। বিভিন্নের মধ্যে একের সম্মান করাই তাহার লক্ষ্য। বিভিন্ন জাতির বহু বিচিত্র সভ্যতার বহুমুখী প্রবাহ আসিয়া এই ভারতের মহামানবের সমুদ্রসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। একানীতির ছত্রচ্ছায়ায় প্রতিপালিত ভারতবর্ষীয় সভ্যতা সাহিত্যে ও শিল্পে, ধর্মে ও কর্মে, সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অপূর্ব সম্পদ আবিষ্কার করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের আদান-প্রদানের অবসরে কখনও যে সূচ্য উপস্থিত হয় নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু সে সূচ্য স্থায়ী মিলন সাধনের অন্তরায় হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও মাঝে মাঝে সংঘাত লাগিয়াছে বই কি! কিন্তু আজ তাহার যে বীভৎস মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাক-ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসে তেমনটি বোধ হয় কখনও দেখা যায় নাই। সাম্প্রদায়িকতার সমুদ্রপ্রমাণ ব্যবধান হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দুর্বৃতিক্রমণীয় অনেক স্থল করিয়াছে, রাজনীতির খাতিরেও তাহা অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু আমাদের মত এই যে, দুর্বৃতিক্রমণীয় হইলেও এ বাধা অনতিক্রমণীয় নয়। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যদি জাতিধর্ম নিবিশেষে দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্ত সমান নাগরিক অধিকার দিতে সর্বাত্মকরূপে সম্মত হন তো সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান অনায়াসেই হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িক একাধীনতার জন্ত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সর্বপ্রকার আচার অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা দিতে হইবে, কোনো বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্র থাকিলে তাহাদের শিক্ষাবিধান এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রতির জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থা যে শুধু অল্পমাত্র সম্প্রদায়কেই উন্নত করিবার জন্ত আবশ্যক তাহা নহে, সমগ্র দেশের উন্নতির জগাই ইহা আবশ্যক। জীবদেহের ছায়ে সমাজ-দেহেরও এক অঙ্গ ক্ষত হইলে সর্বদেহই বিষাক্ততার আশঙ্কা জন্মে। সর্ব অঙ্গের পরিপোষণ দ্বারা সর্বদেহের স্বাস্থ্যবক্ষা সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কাম, কিন্তু তাই বলিয়া সমাধানের নামে যদি কেহ সর্বনাশ আত্মন করিয়া আনিবার চোঁয় করে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। স্বয়ংনির্বাচিত যে সব দেশনায়ক সাম্প্রদায়িক অনেকা দূরভূত করিবার জন্ত উগ্রপ্রব হইয়াছেন, তাঁহারা আশুন্ লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি এখনও সাবধান না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বরাভয় সমগ্র দেশের পক্ষে অভিশাপ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। অল্পর ভয়লোচন শিবের কাছে বর পাইয়া

বর উপরেই তাহার লোচনদ্বয়ের শক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্ভত
রাছিল। শিব এবং অশিবের দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে। অশিবকে
হার করিয়া লইলে শিবের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

সত্যকার হিন্দু-মুসলমান মিলন-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিবার জ্ঞান
হিতৈষী সকল ব্যক্তিই প্রস্তুত আছেন, কিন্তু অথও ভারতের
ভিত্তে সেই মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের পবিত্র
ভূমির অথগুতা বাঁহাদের কাম্য নয়, ইহাকে বিভক্ত করিয়া
র কিয়দংশ লইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রচনা না করিলে এ দেশে
করা বাঁহাদের কাছে প্রত্যাবাস বলিয়া গণ্য হইতেছে, বাঁহাদের
রচনা সত্যে পরিণত হইলে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী কোটি কোটি
র স্বীয় স্বাভাৱ্য-মর্যাদা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে—তাঁহাদের
ত কোনো প্রকার আপোস মীমাংসা সম্ভব নয়। ব্যবচ্ছেদের
ভেদে নহে, অথগুতার আদর্শেই দেশের কল্যাণ। জাতীয়
নব্যবস্থা ভিন্ন সে কল্যাণ সূত্রপরাহত। কেন্দ্রে শক্তিশালী
গায় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক
চ, অর্থনীতি, ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পপ্রসার, বানবাহন প্রভৃতি যে
ন বিষয়ের উপর ভারতের মঙ্গলমঙ্গল প্রধানতঃ নির্ভর করে,
সকল বিষয় পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জ্ঞাত
ব। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তির উপরে প্রদেশসমূহ গঠিত হইবে।
নি আপন উন্নতির জ্ঞান প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র চেষ্টার
নিতা থাকিলেও জাতি হিসাবে সমগ্র ভারতের সংহতি ও সম্মতির
আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও শক্তি অর্জন ও বৃদ্ধির পথে যাহাতে
কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে, শাসন-পদ্ধতির মধ্যে তাহার
ছা রাখিতে হইবে।

সুদূর অতীত কাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আসিয়া ভারতবর্ষের
তথ্য গ্রহণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করে নাই।
অনার্য, মোগল-পার্সান, শক-হুন যে যখনই আসিয়াছে, ভারতের
বিত সঙ্গ্রহেতে সে তখনই সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছে। মানব
তর এই মহামিলন-তীর্থক্ষেত্রের দ্বার আজও রুদ্ধ হয় নাই।
তি বিধর্মী বলিয়া ভারত কাহাকেও ঘৃণা করে না, কিন্তু অস্ত্রের
সহ করিবার জ্ঞান ভারতবর্ষ প্রস্তুত নহে। পরকে আপন করি-
জ্ঞান ভারত ছই বাহ প্রসারিত করিয়া আছে। পরদেশ হইতে
দয়াও যে ভারতকে স্বদেশ বলিয়া স্বীকার করে, ভারতবর্ষ তাহাকে
। করিতে অসম্মত নহে। ধর্মগত স্বাভাব্য বজায় রাখিয়াও যে
মুসলমান আপনাদিগকে ভারতের সন্তান বলিয়া গৌরব অনুভব
ন, ভারত-মহাজাতির অঙ্গীভূত বলিয়া ভারতের স্বত্বভ্রংশের সম্পাদ-
দের সমান অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে
ট গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর আত্মকল্যের
তায় থাকিয়া তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যে সব ব্যক্তি বিপথে
গলিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে রূপথ দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যিক।
দায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থের দোহাই দিয়া আশু লাভ হইতে পারে, কিন্তু
। কল্যাণের নহে। সমগ্র জাতির স্বার্থকে বলি দিয়া বাঁহারা
স্বার্থের দিকে অধিকতর মনোযোগী তাঁহারা জাতির শত্রু—

এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহাদিগকে মজলের পথ প্রদর্শন করিতে
হইবে।

হিন্দুর মধ্যেও অনেক দোষ অনেক ত্রুটি আছে। সামাজিক
এবং অর্থনৈতিক বহু দুর্গতি আমরা নিজের হাতেই সৃষ্টি করিয়া
জাতীয় সংহতির মূল কুঠারাবাত করিতেছি। আত্মীয় বলিয়াই
যে তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্ধ থাকিব, এ কথা কখনও বলিব না। নিজের
দোষ পরিহার না করিলে প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম
করা নিশ্চল। হিন্দুকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা এক
মহান জাতির বংশধর। তাঁহাদের গৌরবময় ঐতিহ্য সমগ্র পৃথিবীর
প্রদ্বা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছে। বহু সংঘাত ও সংঘর্ষের সন্মুখীন
হইয়াও তাহা উন্নতমস্তকে কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। তাহার বিনাশ
নাই। আমরা সেই উজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করিয়া উজ্জ্বলতর
যুগোপযোগী ভবিষ্যৎ রচনা করিবার জ্ঞান নির্ভয়ে অগ্রসর হইব।

ভারতবর্ষ মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্মান দিয়াছে। একের উপর
অস্ত্রের প্রভুত্ব সে কখনও সম্মত করে নাই, মনুষ্যত্বের মর্যাদানামসকারী
বলিয়া দাসত্বকে সে ঘৃণা করিয়াছে। দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসন
আমাদের সেই মুক্তির উদ্রণ বাসনাকে চাপা দিবার জ্ঞান চেষ্টার ত্রুটি
করে নাই, কিন্তু আশার নবরূপ কিরণসম্পাতে আজ নৈরাশ্যের
পুঞ্জীভূত মেঘ অপসৃত।

আজ নবজাগরণের বাণী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়াছে,
ভারতবর্ষ আর নিম্নিত রহিবে না। অপ্রতিকৃত বীরের দ্বারা,
অপরাজেয় শৌর্যের দ্বারা ক্রৈব্যবিনাশী শৌর্যের দ্বারা সে আশুপ্রতিষ্ঠার
পথ উন্মুক্ত করিয়া লইবে। মানুষের মধ্যে যে অন্তর-মর্দিনী
দেবী শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সে শক্তিমান
হইবে।

কুরুক্ষেত্রে যে দেবতা মোহাম্মদ অর্জুনকে সোধোন করিয়া বলিয়া-
ছিলেন—“ক্লেবঃ মাংস গমঃ পার্শ্ব”, তাঁহাকেই আমাদের অন্তরের
আগনে আজ উপবিষ্ট দেখিতেছি। ভীকৃতার পথে, নির্বিরোধ
নিশ্চেষ্টতার পথে চলিলে যে নিশ্চিত মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনা হইবে,
তাহা আমরা বৃথিচ্ছ। তাগের মধ্য দিয়া, দুঃখের মধ্য দিয়া,
অনলস তপস্যার মধ্য দিয়া সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে শক্তিরপাখনা
করিতে হইবে। ভাবের ললিত ক্রোড়ে উপবিষ্ট না থাকিয়া উন্মুক্ত
কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে হইবে। উপলব্ধি করিতে
হইবে—“নায়মাশ্চা বলহীনেন লভাঃ।”

স্বাধীনতার সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যস্বারী। বারংবার নিশ্চল হইলেও
তাহা এক দিন সার্থকতায় সম্পূর্ণ হইবে। যে ক্ষুদ্রের দক্ষিণমুখ
আমাদিগকে নিত্য রক্ষা করিতেছে, তাঁহার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা
জানাই :—

“করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে
দুঃখ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচির-অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিশ্চল প্রয়াসে।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেহ ও দেহী

মানুষের বিচিত্র এই আধার—এই দেহ-মন-প্রাণের স্বল্প অল্পপম যন্ত্র, যাকে সন্ধিং বা চেতনা “আমি” জ্ঞানে আঁকড়ে রয়েছে ও প্রায় এক চেতন পুরুষে (personality) পরিণত করেছে। যোগ সাধনার পথ ধরতে গেলে আগে বুঝতে হবে এই সন্ধিং বা চেতনা আসলে কি বস্তু—যা’ দেহ-মন-প্রাণময় এই যন্ত্রকে এমন করে “আমি”-জ্ঞানে আবদ্ধ করে নিয়ে আনন্দ-সুখ-দুঃখ-আনন্দের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছে। শুধু চৈতন্যতত্ত্বই নয়, এই জটিল সূক্ষ্ম (delicate) যন্ত্রটাই বা কি এবং কোথা থেকে এ যন্ত্র বা সন্ধিংপাত্র এলো, কোন্ অল্পপম তত্ত্বের ও শক্তির মাঝে এ আধার গজিয়ে উঠলো? এই প্রশ্নের বা সমস্তার সমাধানই হলো যোগ-সাধনার সূত্র ও লক্ষ্য। ভগবান বলে যদি কিছু থাকে—তা’ হলে তা’ এই চৈতন্যতত্ত্ব থেকে পৃথক কিছু নয়; কারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর ও অনুভবের বস্তু এই জগৎ-চরাচর তো এই সন্ধিতেই ভাসছে, তারই মাঝে উদয় ও লয় হচ্ছে। সে মূল বস্তু বুদ্ধিমেনের অগোচর—আপাততঃ তা আমাদের নাগালের বাইরে; ভূতপ্রত্যয়ের মত তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহ শুধু আমাদের শোনাই আছে, তাঁর সন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন জ্ঞানই আমাদের নাই। জগতের মূল তত্ত্ব বা উপাদানের কোন জ্ঞান আমাদের নাই। কারণ, আমরা সে বস্তু কখনও খুঁজে দেখিনি, তাকে লোভবার কোন প্রয়াসই করিনি। যার মধ্যে এই তত্ত্বাহুসন্ধান জেগেছে, সেই হচ্ছে মুমুকু; তারই জন্ম যোগ-সাধনা।

এখন কি করে কোন্ পথে এই খোঁজা আমরা আরম্ভ করবো? পল্লবগ্রাহী মূলবুদ্ধি আমরা যে শুধু শাখা ধরে ঝুলছি, এই জগৎ প্রপঞ্চরূপ ঘনপল্লবিত শাখা-প্রাশাখার অন্তরালে সেই গোপন মূলকে অবশেষ করবো কোন্ বস্তুকে সূত্ররূপে ধরে? জগতে আমরা যা’ কিছু দেখছি, অনুভব করছি, তার মধ্যে আমার এই আমিও ও এই আধারের চেয়ে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত এবং এত কাছে আর কি বস্তু আছে? তাই এই সমস্তার সমাধান হয়তো খুব সহজেই মেলে যদি আমার “আমি”কে ধরে এই অল্পসন্ধান আরম্ভ করি। প্রথম প্রথমে এই খোঁজা এই পরিচয় আরম্ভ হবে অবশ্য মন-বুদ্ধিরই দ্বারা, তার পর জাগবে দীপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সাংখ্য-দর্শন বলেছে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নিয়ে এই জীব-জগৎ সৃষ্ট হয়েছে;—ব্যা পুরুষ, প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তমাত্রা ও পঞ্চভূত। এই ভাবে কেউ বলছেন জগতের উপাদান হচ্ছে পঁচিশটি; কেউ বলছেন বারোটি; কেউ বা বলছেন দশটি মাত্র উপাদানে এই জীব-জগৎ গড়ে উঠেছে। আসলে এ সব হচ্ছে বুদ্ধির ও তর্ক-বিচারের কচকচি; পুথিগত নর্শনশাস্ত্র পাঠে কিন্তু কোন সাক্ষ্যও জ্ঞান হয় না, মন-বোঝানো একটা বিচার বা বিশ্লেষণ হয় মাত্র। এ রকম বিচার-বিতর্কে বুদ্ধিজীবী (intellectual) মানুষের বুদ্ধিবিন্যাস-জনিত একটা তৃপ্তি হতে পারে, প্রত্যক্ষ পরমার্থ জ্ঞানের পথে মানুষ এক-পা এগোয় না।

এই বিশ-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব বা উপাদানের (ভগবান) কথা আপাততঃ ছেড়ে দিই। সে বস্তু তো সূক্ষ্মাতীক্ষ্ম বলে চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের আরম্ভের বাহিরে; ইন্দ্রিয়ের চেয়েও সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধিরও

তা’ না কি অগোচর পদার্থ—“অবাঙ্গমনসগোচর”। এই মূল জড় জগতের সূক্ষ্ম শক্তি যথা বিদ্যুৎ, ম্যাগনেটিজম, ইথার, আকাশ, মুলের ও শক্তির কথা পরমাণু—atom ও electron এ সব কিছুই ভগবানের মত অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় পদার্থ, এদের কাউকেই আমরা সহজে ধরতে চুঁতে পারি না; অথচ তারা জগৎ-চরাচর ব্যপ্ত রয়েছে। চোখে না দেখতে পেলেও, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না করতে পারলেও বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম (delicate) যন্ত্র-সাহায্যে তাদের ক্রিয়া ধরে তাদের অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি; কিন্তু স্বরূপতঃ তারা যে কি, তা’ আমরা অনুমান করি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পারি না। জড়-বিজ্ঞানের এত লাফালাফি ইলেকট্রি সিটি, ম্যাগনেটিজম, রেডিয়ম ইত্যাদির বাহ্য ক্রিয়া ও গুণ নিয়েই; তাদের আসল স্বরূপ সন্দেহ জড়-বিজ্ঞান অন্ধ।

সূক্ষ্মাতীক্ষ্ম শক্তি বা energyর রাজ্য থেকে মূল জড় নেমে আমরা দেখতে পাই, দেখানে কতকগুলি মৌলিক ও বৌগিক পদার্থকেই আমরা চিনি—শুধু নামে ও রূপেই—স্বরূপতঃ নয়। অগ্নি, জল, বায়ু, ধাতু—এরা সব আমাদের কাছে গোটা কতক নাম মাত্র, কোনোটা বা কেহ দৃশ্য পদার্থ। তারা কোথা থেকে এলো, কি মূল পদার্থের বা শক্তির তারা পরিণতি, এ খবর আমাদের জড় বিজ্ঞানের পুথিগত বিদ্যা দেয় নেয় না। একগাছি তুচ্ছ তৃণ কোন্ নির্গূঢ় জীবনী-শক্তির বলে হরিত, পীত, রক্ত বর্ণ নিয়ে গজিয়ে ওঠে তার সঠিক তত্ত্ব আমাদের জানা নাই। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী—তিনেরই সন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অসীম ও অটুট, অথচ এই তিনই অক্ষুট, অর্ধক্ষুট ও পরিক্ষুট চেতনা বলে জড়-বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মন-বুদ্ধির আরম্ভের মধ্যে নিশ্চিত করে পাওয়া যে-সব বস্তুকে আমরা চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নি, সে সন্ধে জ্ঞানও আমাদের অভ্যস্ত নয়। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হলোই শুধু হলো না, কারণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা মূল বস্তু সন্ধেও সব সময়ে আমাদের সঠিক খবর দেয় না, আপাত-প্রতীয়মান আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারা তারাও অনেক সময় প্রতারণিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যা প্রত্যক্ষ করে, বা বোধ করে, প্রায় তাইই সংবাদ বয়ে মন-বুদ্ধির কাছে হাজির করে—তা’ সে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বা শব্দ সত্যই হোক আর আপাত-প্রতীয়মান অলীকই হোক। বৌদ্ধী প্রলাপের ঘোরে কত কি অলীক বিভীষিকা দেখে, ধ্যানে মনকে একটু স্থির করতে পারলেই বস্তু-নিরপেক্ষ কত না রূপ ও দৃশ্য চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে, পুষ্পাদি গন্ধ দ্রব্য ছাড়াও কত অপূর্ণ পুষ্পগন্ধ ধূপ-চন্দন-গন্ধ পাই। এ সবও তো চোখে দেখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার। তা’ বলে কি সব ক্ষেত্রে সেগুলি মূল জগতের সত্য? সূতরাং সত্য নির্ধারণে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাই সব চেয়ে বড় এবং অকাট্য প্রমাণ নয়। বস্তুর যেটুকু আমরা চোখে দেখি, স্পর্শে পাই, স্বাদে গন্ধে জানি, সেটুকু হচ্ছে তাদের সন্ধে অতি ভাসাভাসা বাহিরের পরিচয় মাত্র। আমাদের মন-বুদ্ধি সেইটুকু নিয়েই নাড়াচাড়া করে; বস্তুর আসল ও গভীরের পরিচয় সে জানে না। সূতরাং সৃষ্টির মূল তত্ত্ব বা ভগবানকে চোখে দেখিনি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাঁর সাক্ষ্য পরিচয় পাইনি বলে সে-বস্তু নাই, এ কথা নিতান্ত-মূলবুদ্ধি অর্ধাটীনের কথা! তাঁর সন্ধে আমরা কিছু জানি না এইটাই আসল কথা।

আমরা চেতন মানুষ হলো এ জগৎ-সংসার আমাদের কাছে

দলে সম্পূর্ণ অজানাই রয়ে গেছে! তার সঙ্গে আমাদের এমনি ভাসা-
রা বাহিরের পরিচয়। এমন কি, আমি নিজ স্বপ্ন যে কি বস্তু,
তা থেকে আমার উদয়, কিসে আমার পরিণতি, তার কিছুই আমি
নি না। অহং-জ্ঞানে দেহটাকে ধরে তন্ময় হয়ে জীব-চেতনা ঘুরছে
হচ্ছে জীবন কাটাচ্ছে,—তা' সে দেহ মাছুষের স্বদর্শন-তত্ত্বই হোক,
সরই হোক, আর কীটপতঙ্গ-সরীসৃপের কলাকার শরীরই হোক।
র এই যে আমি-বোধে দেহকে আপন করে নেওয়া, এটিও হঠাৎ
নি, বহু বছরের চেষ্টায় ও অভ্যাসে ক্রমশঃ শিশু-চেতনা দেহকে
এনেছে, এর উপর পূর্ণ অধিকার বা control পেয়েছে। দু'হাতের
আঙুলে সব কিছু ভালো করে ধরতে, শুঁচিয়ে কাজ করতে, দু'পায়ে
র পড়ে না গিয়ে ভার-সাম্য রেখে স্চারুরূপে চলতে, স্বহৃদে নৃত্য
তে, কণ্ঠ ও জিহ্বা ইত্যাদির দ্বারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করতে,
এ শব্দ শুনে তার দ্রুত পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে
মাদের দশ পনের বিশ বছর লেগে গেছে। জীব-চেতনা যে দেহ
দেহ যে তার ব্যবহারের যন্ত্র, এই হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
বচেতনা শৈশবে সজোজাত অবস্থায় সকল সংস্কারমুক্ত নির্মল অবস্থায়
স প্রথমে দেহকে আশ্রয় করে, তার পর বহু বয়সের অভ্যাসে
ব সে দেহী হয়ে নাম-রূপের কাঁদে ধরা পড়ে। যোগী অভ্যাসের
রা ক্রমে সজ্ঞানে আবার নাম-রূপের কাঁদে খুলে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ
র তার নির্মল অবস্থায় ফিরে যান; সজ্ঞানে আপন পরম অখণ্ড
রূপের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় করেন। তুল-পথে অভ্যাসের বলে যে
মন যে খণ্ডতা যে বিকৃতি এসেছিল, ঠিক পথে অভ্যাস-বশেই তার
বিলয় ও বিমুক্তি।

এই দেহাধাস-জনিত জড়বুদ্ধি থেকে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন;
হ-মনের নাগপাশ ছাড়াতে কঠিন কঠিন ক্রিয়া ও অমাত্রিক
হাসের দরকার, এই রকম একটা ধারণা মাছুষের গজিয়ে গেছে।
গা যে খুব সহজে চিরাত্মকে পথে হতে পারে, আশিক ভাবে জীব
ত্রেই যে এই নির্মল বিদেহ অবস্থায় প্রায়ই গিয়ে অবস্থান করে,
গা আমরা জেনেও জানি না। এই দেহকে আমরা প্রতিদিন
দ্রে নিত্ৰায় ছেড়ে দিই, নিত্রিত অবস্থায় আমরা ক্ষীণ attenuated
স্বিং দ্বারা দেহকে ছুঁয়ে থেকে স্বপ্ন বা সূক্ষ্মস্তির মাঝে অবস্থান্তরে
ল যাই; তখন অহং-জ্ঞান থেকে মুক্ত জড় দেহটা অচল নিষ্পন্দ
বে এই স্থূল জগতে পড়ে থাকে। এটি এক প্রকার সহজ চিরাত্ম
গেরই ক্রিয়া। অনেক সময় মুছাঁয়, ব্যাধিবিকারে, আকস্মিক আঘাতে,
ধ্বংসপ্রয়োগে বা সমাধিতে দেহ নিষ্পন্দ নিষ্প্রাণ শীতল মৃতবৎ হতে
থা যায়। আবার সে মোহ মুছাঁ বা সাময়িক মৃত্যুর কারণ হুচে
লে নিদ্রোপ্তিতে মত আমরা পরিত্যক্ত দেহকে কুড়িয়ে নিই,
লে রাখি আশ্রয়চেতনার মাঝে সাদরে নিভাঙই আপন করে। এই
ড়িয়ে নেওয়া এবং ফেলে দেওয়া—হু' কাজই আমরা বেজায় সজ্ঞানে
রি, নিভার্নেমিত্তিক চিরাত্মক ঘটনা বলে' এটাকে তলিয়ে বুঝি না।

তবেই দেখো, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক জীবমাত্রেরই দিন-রাত্রি
কিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার অন্ততঃ কিছু কালের জন্ত দেহে আশ্রি-
ণাধের পূর্ণ গ্রাস ত্যাগ করে বিদেহ অবস্থায় থাকে; তাতে পরিত্যক্ত
হে বিশ্রাম পায়, সারা দিনের অক্লান্ত কর্ম ও চিন্তাজনিত ক্লম-ক্লতি
কতকটা পূরণ করে নিতে পারে। দেহ তখন ধরা থাকে মনের
ভীত জ্ঞান super-conscious হলে, "আমি-জ্ঞান"র মোহে

নয়। শুধু নিজা নয়, দেহের প্রাণ মন স্নায়ুর বজ্র ক্রিয়াই আমরা
যোগময় অবস্থায় করে থাকি, super-conscious জ্ঞানে; সে
কাথ্যাদি সাধারণ অহং-জ্ঞানে করি না। আমাদের মন প্রাণ জটিল
দেহযন্ত্র ও ইন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক গতিকে অভিনিবেশ দিয়ে তলিয়ে
দেখলে আমরা বিষয়ে অবাক হয়ে যাই। দেহ ধারণ, দেহের পুষ্টি,
তার ক্ষয়পূরণ ও পুনর্গঠন, তার মল-শোধন ও রসরক্ত-চালনার
অধিকাংশ কাজই আমাদের অহং-বুদ্ধির বাইরে কোন এক মহাচেতনার
স্বয়ংক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে হয়ে চলেছে। সে সব কঠিন ক্লম ও জটিল
কাজ শুধু যে আমরা আদৌ সজ্ঞানে বুঝে-সুঝে করি না, তা নয়,
অধিকন্তু তার কোন সুবাদই আমরা রাখি না। অহং-জ্ঞানে আমরা
জীবনের চার আনা কাজই চালাই, তার বারো আনা চলে নাহি-এ।
আমাদের হৃদয়, কুসকুল, যকুৎ, জঠর, মলাধার, মূত্রাশয়, শিরা-উপশিরা,
পেটের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্র, প্রত্যেকটি কোষের এই যে স্থানিপূর্ণ অভ্যাস
যথাযথ গতি, এ-সব কি চলেছে সজ্ঞানে, না অজ্ঞানে? অহং-জ্ঞানের
বশে কখনই নয়; কারণ আমাদের বহির্মুখী ভাসাভাসা মন-বুদ্ধি সে
সব জটিল পরস্পর অল্পপূরক ক্রিয়ার কোন সন্ধানই রাখে না। জটিল
ক্লম পরম আশ্চর্য্য এই দেহযন্ত্র! সামান্য তুল জটিল বাতিক্রম
না করে নিভূল ও সঠিক ভাবে এতগুলি যন্ত্রের সহযোগিতায়
এত কাজ হচ্ছে কোন্ অব্যর্থ জ্ঞানে? এ অল্পপূর্ণ দেহযন্ত্র
চলেছে স্তব্ধতা অহং-বোধে নয়, অজ্ঞানেও নয়, কারণ তা হলে
মৃত এই যন্ত্রের mechanical চালনায় বহু তুল ও ছন্দপতন ঘটতো।
এই পরমার্চর্য্য ক্রিয়া-ধারা চলেছে বৃহত্তর ও উৎকর্ষের ঐক্যজ্ঞানে, যে-জ্ঞান
একেবারে অভ্যাস—স্বতঃস্ফূর্ত যার ক্রিয়া। স্বয়ংপ্রভ সপ্রকাশ অপলক সে
জ্ঞানের সম্পূর্ণ জীব হয়ে তুমি আমি জন্মাচ্ছি, চলছি, বালা কৈশোর
যৌবন বাদ্ধিক্য দশায় পরিণত হচ্ছে, দেহ ত্যাগ করছি।

এই ভাবে হির ও গভীর অভিনিবেশে ধ্যানস্থ হয়ে বিচার করলে
সহজেই বোঝা যাবে যে,—চৈতন্য কি এক অপূর্ণ ভাবের পদার্থ যাকে
শ্রীঅরবিন্দ বলছেন,—self-contained self-determining
—স্বয়ং স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংক্রিয় বস্তু। মন-বুদ্ধি এই পরাজ্ঞান থেকে ধার
করা আলো যে ঐক্য জ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষৎ বলছে "তমেব ভাস্করমহাত্মা
সর্বং" "যদানসো ন মমুতে যেনাহর্মদোমতম্" "যচ্চক্ষুঃসি ন পশ্যসি
যেন চক্ষুঃ পশ্যতি" ইত্যাদি। তিনি সপ্রকাশ আছেন বলেই সব
কিছু প্রকাশিত, মন যাকে মনন করতে পারে না, যিনি মনকে মনন
করেন, চক্ষু যাকে দেখতে পায় না অথচ যিনি চক্ষুর দ্বারা দেখেন।

এই চিয়ামির কোব বা চৈতন্যাধার হচ্ছে আমাদের এই চেতনবৎ
দেহ; সে দেহও স্তব্ধতা সামান্য নয়। সেই পরমার্চর্য্য স্বয়ংপ্রভ পদার্থ
আপন সত্তা থেকে একে দেশ-কালের মধ্যে গড়েছে, প্রতিভাসিত
করেছে; সেই চিয়ামির আধার দেহ তাই নিজেও চিয়ময়, জীবন্ত ও
বোধময়। তাই এর আপাদ-মস্তকে জেগে রয়েছ। ঠা, কোষ কোষ
এর আছে শক্তি ও রাসনাকৌশল, নিজের ছন্দে ও আলোয় এ দেহ
চলেছে আপন অন্তর্নিহিত গতিতে স্ব-স্বভাবে—শৈশব থেকে বাল্যে,
বাল্য থেকে কৈশোরে ও যৌবনে, যৌবন থেকে পরিপক্ব প্রৌঢ়ত্ব ও
বাদ্ধিক্যে। এই অপূর্ণ প্রকাশ ও ক্রম-পরিণতির কোন্‌খানটার
তুমি-আমি কর্তা? ক্ষুদ্র সারিয়ার মত বীজ থেকে বিরাট বটবৃক্ষটি
যেমন তার অন্তর্গত শক্তিতে স্বভাবে গজিয়ে ওঠে, মাছুষের এই দেহ-
বুদ্ধির পরিণতিও তেমনি স্বয়ংক্রিয়; মুক শিবঙ্গী এই দেহকে চিত্তে

পারলে ক্রমশঃ আত্মবস্তুকেও চেনা যায়, আবার স্থির শাস্ত আসনে বসে ভাবতে ভাবতে মন-বুদ্ধির পারের পরাজ্ঞানে উপস্থিত হতে পারলে তারই স্থূল পরিণতি এই দেহ ও জড়পদার্থকেও বোঝা যায়। কারণ সে পরম পদার্থ ও জড়পদার্থ দেহ এবং জগৎচরিত্র একই বস্তু। জড় কিছু শূন্য বা অভাব থেকে বা তার বিপরীত কিছু থেকে উৎপন্ন হয়নি ; অরূপের বৃক রূপ—অকাল নিরঞ্জনের বৃক কাল হুগু ছিল বলেই তা' জেগেছে। মাকে কালের পদ্যায় ক্ষণস্থায়ী বলে মিথ্যা ঠাউরেছে, তা' স্বরূপতঃ মিথ্যা নয়, কারণ সত্য থেকে মিথ্যার উৎপত্তি বুদ্ধির কথা নয়। অনির্বচনীয় পূর্ণ বস্তুকে মনই দেখেছে সত্য ও মিথ্যারূপে। আসলে সব কিছুই আত্মার বিস্তার—অগাধ স্থির সিদ্ধির একাংশে তরঙ্গলীলার মত, মনের সম্পূর্ণ মনোময় স্বপ্ন-স্রাবনার মত, শিশুর আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলার মত একই অখণ্ড শক্তিজ্ঞান-আনন্দসিদ্ধি নানা রূপে উলসিত বিলসিত হচ্ছে।

এই চিন্তাবস্তুকে প্রথমে মনের যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে বৃত্তান্তে

হয়। তার পর স্থির অপলক জ্ঞানদৃষ্টিতে জাগে এর সম্বন্ধে জীব প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আমার আমিকে নিজেই যোগ-সাধনার আরম্ভ, যাকে হাতের কাছে পাচ্ছি তাকে ধরেই স্থির প্রশান্তিতে ডুবে যাবে। চৈতন্যই—সমতাই জ্ঞানের পথ। শাস্ত সমপিত হলেই সব পাওয়া যায়, অস্থির ও অশাস্ত হলে সব হারিয়ে যায়। নিজের কৌশলই যোগস্থ ও অন্তর্মুখ হবার কৌশল; নিজের আগে যেমন আমরা সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে নিশ্চিন্ত হই এবং ঘূমের প্রতীক্ষা করি, তেমনি বাহিরের সব কিছু ফেলে দিয়ে প্রশান্ত মন নিয়ে যোগের প্রতীক্ষা করতে জানলে যোগিক ক্রিয়ায় আপনি জাগে। ভক্ত এই কাজটি করে ভক্তি ও সমর্পণ দিয়ে। জিজ্ঞাসা করে “আমি কে?” এই প্রশ্ন ধরে প্রশান্ত অপলক দৃষ্টিতে অন্তরের দিকে চেয়ে থেকে। এই সহজ চিরাত্মক ক্রিয়াকে যোগমুখী করার কৌশল ক্রমশঃ যোগসিদ্ধির পরি-চ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে সন্মার করে বিশদ করে ব্যাখ্যা করা হবে। শুধু নিজেই নয়, জীবনের সকল ক্রিয়াই যোগজ ও যোগময়, যোগ সৃষ্টি-ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

শোরব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমাতে দেখেছি আমি কলে-হাওয়া পথেতে,
জয়-মালা বিভূষিত নব জয়-রথেতে।
সজ্জিত তোরণে ও দীপাবলী আলোকে,
মণিচ্যুতি-বিধিত কিরীটের পালকে।
মর্শ্বর মুরতি ও মঞ্জিল স্তম্ভে
সৈন্তে ও সমারোহে ক্ষমতার দম্ভে।

কখনো দেখেছি রূঢ় শৃঙ্খল চরণে
পরগেতে কটি বাস নির্ভয় মরণে
লাঞ্ছনা-লাঙ্কিত নয়নের জ্যোতিতে,
বিদ্যায় দলে যায় মন্থর গতিতে
ভক্তের আঁখি-পাখী আসে সেথা ছুটিয়া
শত নুপতির ভাপ পড়ে ভূমে লুটিয়া।

দেখেছি তোমাতে কতু ভিখারীর বেশে হে,
প্রেমধন বিলাইয়া ফের দেশে দেশে হে।
তোমারি ত এ জগৎ, হরিজন তুমি যে।
শাস্তি-পিয়ালী ধরা পদতল চুমিছে—
তুমি চল তাপিতের আঁখিজল মুছাতে
স্বর্গ ও মরুতের ব্যবধান ঘুচাতে।

তুমি চির চঞ্চল কোথা কোন্ ছলেতে
নাও গজমতি হার কবে কার গলেতে।
ভালবাসো অনাদর আস নাকো আদরে,
যে তোমাতে দূরে রাখে তারে তুমি সাধ রে।
লুকাইয়া কাছে এসো—হাস মুহু মধুরে।
দূরে থেকে কাছে এসো কাছে থেকে স্নেহে

বাবু
এস

শ্রীগঙ্গেশ্বরকুমার বিদ্য

দোতলার এক প্রকাণ্ড ঘরে মোহিত

এমনি প্রত্যাহ হয়। ভূপেনের সে-দিকে কাণ ছিল না, মন তো নয়ই। সে শুধু ভাবিড়েছিল মোহিত বাবুদের কথা। দৃষ্টিভ্রমায় মাথার যন্ত্রণা আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। এ-রোগটা তাহার বহু কালের, এক-সেই জন্মই বোধ হয় কতকটা গা-সওয়াই হইয়াছে। অনেক দিন আগে বাবা একবার ডাক্তার দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার বলিয়াছিল, পুষ্টির খাতি এবং ব্যায়াম প্রয়োজন। দুইটার

কোনটাই অবশ্য হয় নাই, চিকিৎসার আর কোন চেষ্টাও সম্ভব ছিল না। তাহার স্বর প্রায়ই হয়। স্বর হইলে রাত্রিটা উপবাস দিয়া পরের দিন আবার ষ্ণারীতি ন্নান আহার কলেজ ইত্যাদি চলে। আজও তাহার তেমনি আশা ছিল—কিন্তু ভগবান যেন ইচ্ছা করিয়াই বাদ সাধিলেন। পরের দিন সকালেও দেখা গেল, মাথার যন্ত্রণা বা স্বর কোনটাই কমে নাই। সেদিন ভালো ছেলের মত শুধু জল-সাণ্ড খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, তবু অপরাহ্নে দেখা গেল স্বর কমে নাই; মাথার যন্ত্রণাও তথৈব চ।

তাহার চর্চাবনার সীমা রহিল না। উঠিবার মত অবস্থা নয়, অল্প দিন হইলে উঠিবার কল্পনাও করিতে পারিত না, কিন্তু আজ না উঠিলে চলে কি করিয়া? একেবারে দ্বিতীয় দিনে কামাই? কি তাঁহার মনে করিবেন? এই সব কথা ভাবিয়া শেষ পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল। মা ঠা-ঠা করিয়া উঠিলেন,—তোমার মাথা খারাপ হলো না কি?

অগত্যা পারিশ্রমিকের অঙ্ক চাপিয়া নূতন টুইশনির কথা বলিতে হইল। পুরাতনটি গিয়াছে, কাল হইতে নূতন টুইশনি ধরিয়াছে—আজ সবে দ্বিতীয় দিন।

মা তবু বকাবকি করিতে লাগিলেন,—অসুখ-বিসুখ হলে মানুষ যায় কি করে! তোমার যে দেখছি সাহেবের চাকরিরও বাড়ী হলো!

ভূপেন সেদিকে কান না দিয়া কতকটা মরিয়া হইয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া বুঝিল, ঠাঁটা অসম্ভব। মাথা খাড়া রাখা বাইতেছে না, পা টলিতেছে। তখন বোধ হয় স্বর একশ-চার। অগত্যা একটা রিক্সা লইল এবং সন্ধ্যাদের বাড়ী পৌছিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের অবস্থা চাকর-দারোয়ানদের গোপন করিয়া ভিতরে গিয়া বসিল।

সেদিনও আগের মত চা-জলখাবার আসিল। ভূপেন সাগ্রহে চা-টা টানিয়া লইল। সেই মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল বুঝি অজ্ঞান হইয়া বাইবে।

একটু পরেই ঘরে ঢুকিল সন্ধ্যা। ভূপেন খাবারের থালা স্পর্শ না করিয়াই চা খাইতেছে দেখিয়া একটা কড়া রকমের ভংসনা করিতে গিয়া সহসা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সন্ধ্যা থামিয়া গেল। দ্বীত ধমধমে মুখ, রক্তবর্ণ চক্ষু—চাহিলে ভয় করে!

—এ কি মাষ্টার মশাই, আপনার স্বর হয়েছে?

কাছে আসিয়া পাকা গৃহিণীর মত তাহার কপালে হাত দিয়া স্বরটা অছন্দ করিল, তাহার পর কহিল,—ইস, এ যে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে! আমি দাতকে ডেকে আনিছি।

ভূপেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—না, না সন্ধ্যা বেরো না। এ কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে এখনি। সেয়ে না মিছি মিছি!

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে! সন্ধ্যা ততক্ষণে ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। মিনিট দুই পরে মোহিত বাবুকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। মোহিত বাবু তাহার লম্বাটে হাত দিয়া বলিলেন,—সত্যই তো, ভীষণ স্বর দেখছি। তুমি এই স্বর নিয়ে এলে কি করতে বাবা? কাক্সটা ভালো হয়নি। স্বর অন্তত: তিন!

কোন উত্তর যেন ভূপেনের মাথায় আসিল না। আসল কথাটা কি করিয়াই বা বলা যায়। কিন্তু মোহিত বাবু নিজেই তাহা

অভ্যমান করিয়া লইলেন। বলিলেন,—এক দিন পরেই স্বরের অজুহাত দিলে আমরা কি মনে করবো, এই কথা ভেবেছিলে, না? একেই বলে, ছেলেমানুষ। এখন যাও, আর এক মিনিট দেবী নয়। লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়োগে।

ভূপেন যেন লক্ষ্যায় মরিয়া বাইতেছিল। কোন মতে সে বলিয়া ফেলিল,—এ রকম আমার প্রায়ই হয়। অবশ্য এতটা হয় তো হয় না।

—কিন্তু আজ তো এতটা হয়েছে, আজ বেরুলে কি বলে? তুমি মনে সন্কেচ করো না, স্বর একেবারে ভালো না হলে আসবার দরকার নেই। তুমি বরং বসো, আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, বাড়ী গিয়ে সেটা খেয়ে ফেলো।

তিনি শুধু ওষুধই দিলেন না, নিজের গাড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। ভূপেন সন্কেচে থামিয়া উঠিতেছিল, বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কথা তিনি শুনিলেন না। অগত্যা তাহার মোটের চাপিয়া ভূপেন বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং টুইশনিটা বাইবার আশু কোন আশঙ্কা নাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

ইহার পর হইতে সে যথানিয়মে পড়াইতে লাগিল। আগে পড়াইতে বাইবার নামে তাহার গায়ে স্বর আসিত, এখন ইহা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ছুটির দিনগুলিই বরং বিশ্রী লাগে। বাস্তবিক পড়ানোর যে এত আনন্দ তাহা আগে কল্পনার অতীত ছিল।

ইহার জন্ম দায়ী অবশ্য তাহার ছাত্রীই। সন্ধ্যার এমন কিছু অসাধারণ মেধা নয়, কিন্তু প্রথম সহজবুদ্ধিতে সে-অজাবটুকু ঢাকিয়া গিয়াছে। তবু এইটাই বড় কথা নয়—পাঠে তাহার ঐকান্তিক মনোযোগ ও শ্রদ্ধা দেখিয়াই ভূপেন খুশী হয় বেশী, তাহার কাজও সহজ এবং শ্রীতিকর হইয়া ওঠে। সে বাহা বুঝায় তাহা সন্ধ্যা প্রাণপণে বুঝিবার চেষ্টা করে এবং একবার মাথায় গেলে সহজে ভোলে না। জ্ঞানপিপাসা তাহার অপরিহার্য—এটুকু মেয়ের জানিবার মত এত কথা থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রব্লেমের পর প্রব্লেম-বর্ষণে সন্ধ্যা ভূপেনকে জর্জরিত করে, কিন্তু তাহাতে সে বিরক্তি বোধ করে না একটুও। কারণ, এ প্রব্লেমের মধ্যে শিক্ষককে অপ্রতিভ করার চেষ্টা নাই; আছে শুধু জানিবার জন্ম আন্তরিক আগ্রহ।

ভূপেন আগে হইতেই তাহার প্রব্লেমের জন্ম প্রস্তুত থাকে, তবু সব সময়ে তাহার রিড্ডায় কুলাইয়া ওঠে না। অবশ্য এ জন্ম অপ্রস্তুত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, তাহাদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছে। ভূপেন বই দেখিয়া আসিয়া সেই সব প্রব্লেমের জবাব দেয়। বই-এর অজাব আর নাই, মোহিত বাবু লাইব্রেরীতে সমস্ত বই-ই সে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করে। শুধু তাহাই নয়, কোন বই সে পড়িতে চায় শুনিলেই তিনি সে বই কেনেন। ভূপেনের এক-আধখানা পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল, তিনি তাহাও কিনিয়া দিয়াছেন।

পড়াশুনার মধ্যে গল্পই চলে বেশী। ইতিহাস পড়াইতে বসিয়া ভূপেন সেই ছোট পাঠ্য পুস্তকখানি হইতে বহু দূরে চলিয়া যায়। ইতিহাস ও সাহিত্যে তাহার নিজের অম্মরাগ ছিল খুব

শী, ইতিহাসের অনেক বই-ই সে পড়িয়াছে, সেই সব বই হইতে গল্প করে—পৃথিবীর নানা দেশের উত্থান-পতনের কাহিনী। দেশেরও যে সব ইতিহাস ছোট পাঠ্য পুস্তকে লেখা থাকে না তাহারও সে লেখা। আর গল্প বলে সাহিত্যের। বড় বড় ইংরেজী-এর অধ্যয়নভাগ সে এক এক দিন বলিয়া যায় আর সন্ধ্যা মন্দির চর মত বসিয়া শোনে। এ বিষয়ে মোহিত বাবুও উৎসাহ ছিল। আধাৰণ, সময় পাইলে তিনিও মজলিসে আসিয়া বসেন।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। ভূপেন বেশ ভালো ভাবে 'পারমিডিটে' পাশ করিল, যদিচ খুব নাম করিবার মত কিছু করিতে রল না। তাহার কারণ কতকটা মোহিত বাবুর লাঠিরেরী। ইংরেজী তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেও পাশের পড়ায় কিছু বাত ঘটাইত। যাহা হউক—ভূপেন বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইল, হিত বাবুর পরামর্শ-মত ইংরেজীতে অনার্স লইল। মোহিত বাবু বলেন,—তোমার সাহিত্য যা পড়া আছে, অনার্স-এর জন্য বেশী হইবে না।

অনার্স লইয়া বি-এ পড়িবে, ভূপেনের বড় দিনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন শেষে সার্থক হইল,—ভূপেন কিন্তু এ পড়ায় কোন তগ পায় না। দলেলা হইতে সে কলেজে পড়ার দিন গুণিত, মনে হইত, তাহার গৌরব আর কিছু নাই! একগাখি বই আর একগাখি খাতা বা শুধুই একগাখি খাতা লইয়া যখন পাড়ার ছেলেরা কলেজে ত, তখন সে সসঙ্গ্রহ ঈর্ষায় চাহিয়া থাকিত আর হিসাব করিত। 'র' স্কুলের পূর্বে শেষ হইবার আর দেবী কত! কিন্তু কলেজে উঠিয়া ল, সেই স্কুল ঢের ভালো ছিল। শিক্ষকদের সহিত স্নেহের র্ক ছিল, বন্ধুদের সহিত ছিল প্রীতির বন্ধন। ম্যাট্রিক পাশ বার পর তাহার কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, সে যে কলেজে ন, সেখানে পড়িল সে এক।

। যেন অরণ্য। অধ্যাপকরা এক-এক জন এক এক রকমের। কোন লাব অধ্যাপক হয়তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যংশ পড়াইতে পড়াইতে যা কেনেন, কেহ বা আসিয়াই স্তব্ব করেন তাঁহাকে গালি দিতে। ভ্রমলোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, যাবুবিজ্ঞার খেলা দেখান, স্তব্ব লেখেন এবং মক্কেল পাইলে ওকালতী করিতেও ছোটেন। দুই উপন্যাস লিখিয়া অর্থব্যয় করিয়া ছাপিয়াছেনও, যদিচ সেগুলি । হয় না। ঝাঁক পাইলে ছাত্র-মহলে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেও ন না। এক কথায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আর সবই । আর এক অধ্যাপক ক্লাসে ছাত্রদের পড়াইবার সময়টুকু যে য হয়, তাহা ছাত্রদের কাছেই স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, অধ্যাপকও আছেন, যিনি অধ্যাপকদের ঘরে বসিয়া এমন । রসিকতা করেন যে, বাহিরে তাহা ছাত্রদের পর্যন্ত কানে য়া তাহাদের কান রাঙ্গাইয়া তোলে।

সু যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়িত, তখন সাধনা ছিল যে ইহার। বের অধ্যাপক, বি-এ পড়াইবার সময় ভালো অধ্যাপকদের কাছে থ ঘূচিবে। কিন্তু খার্ড ইয়াবে উঠিয়া সে স্বপ্নও ভাঙিল। রা অধ্যাপক হ'—এক জন পাওয়া গেল, কিন্তু তাহার। এতই যে, না পাওয়া যায় তাঁহাদের সান্নিধ্য, না পাওয়া যায় কোন । যদিও তাহার। মাহিনা বেশী পান, তবু অর্কলাভ আর

যায় না তাহাদের। পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া, নোট লিখিয়া, অসংখ্য টুইশনী করিয়া নিজেদের এমন জখম করিয়া রাখেন যে, ক্লাসে বর্ষান আসেন তখন দেখা যায় তাঁহারা যেমন ক্লান্ত, তেমনই অসুস্থমনস্ক। কেহ কেহ সংবাদপত্রের আফিসে অবসর সময় সম্পাদনার কাজ করেন, কেহ আবার করেন ওকালতী। হ'—এক জনের ব্যবসায় আছে। যখন ভালো অধ্যাপক বলিয়া প্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তখনকার অভ্যাসটা মাত্র আছে হয়ত, মুখস্থ বলিবার মত বলিয়া যান, তাহার বেশী আর পৌছানো যায় না। যদি বা হ'—এক জন ছাত্রদের সঙ্গে একটু সহজ হইবার চেষ্টা করেন, ক্লাসে আসিয়া পড়ানো বন্ধ করিয়া তাহাঙ্গ। খরেন রাজনীতির চর্চা। ফলে অধ্যয়ন যে তপস্যা, তাহা ছাত্রেরাও ভুলিয়াছে, অধ্যাপকরাও ভুলিতে বসিয়াছেন।

অবশ্য ইহার মধ্যে দুই-চারি জন যে ধারালো অধ্যাপক নাই, এমন নহে, কিন্তু ভূপেন তাহাদের কাছে বৈধিতে পারে না। তাছাড়া চাষি পাশের আবহাওয়ায় তাহার। এমন বিবর্ত যে, অতিরিক্ত গাভীষের আবরণে আত্মরক্ষা ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় থাকে না। তবু এই সব অধ্যাপকের কাছে প্রাঞ্জ করিয়া ভালো রকম উত্তর পাওয়া যায়, বাকী অধিকাংশ অধ্যাপকের দৌড় সেট বিশেষ পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ পাঠ্যপুস্তকটি পর্যন্ত। তাহার বাহিরে কোন প্রাঞ্জ কবিত্তে গেলে হয় বিরক্ত হইয়া ধমক দেন, নয় কথটা কোন মতে এড়াইয়া যান। যেটুকু পড়াইবার কথা, সেটুকুই তৈরী করিয়া আসেন বা নির্ধ দিনের অভ্যাসে তাহা তৈরী থাকে, সেটার অধিক কিছু পড়াইবার সময় নাই, ইচ্ছাও নাই তাহাদের। নিজেদের বিষয়-বস্তুর বাহিরে তাহাদের জ্ঞান এমন সঙ্কীর্ণ যে, এক-এক দিন দৈবাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ভূপেনের বিষয়ের সীমা থাকে না। আবার এমন অধ্যাপকও আছেন, বাঁহারা সত্য-সত্যই দিন-রাত অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকেন, বাঁহাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সমস্বের কোন অবসর নাই, অথচ তাঁহারা একে-বাবেই পড়াইতে পারেন না। ছাত্ররা বিরক্ত হয়, গোলমাল করে, ক্লাসে সে বিষয়টাই মাটি হইতে থাকে। কর্তৃপক্ষ এই বর্ষ্যতাকে ছাত্রদেরই দুর্বিনয় এবং দুর্ভাগ্যের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, মধ্যে মধ্যে তাহাদের গালিও দেন।

কিন্তু সকলের চেয়ে বিম্বিত হয় ভূপেন ছাত্রদের দেখিয়া। বালাকালে শিক্ষকদের কাছে এবং পরে মোহিত বাবুর কাছে সে বার-বার শুনিয়াছে, অধ্যয়ন ছাত্রদের কাছে তপস্যা। কিন্তু এ কি তপস্যা? ইহার। কলেজে আসে পড়াশুনা ছাড়া আর সব কিছুই জ্ঞান। একটি কি দুটি ছেলে ছাড়া আর কেইই বোধ হয় অধ্যয়নকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে নাই। প্রথম প্রথম ভূপেন কলেজে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। শিক্ষালয় নয়, এ যেন বাজার! এত হল্লা এত গোলমাল যে কোন শিক্ষায়তনে হইতে পারে, তাহা ছিল ভূপেনের স্বপ্নেরও অগোচর। প্রীতির সামান্য স্তব্ব কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—আছে বেবারেবি ও দলাদলি। তাহার। ছাত্রসম্ব করে, সেখানেও হ'—তিনটি দল—ইনস্ট্রাক্টে বায় দলাদলি করিতে। ভোট-গ্রহণ রগড়া দলাদলি এমন কি মারামারিতে পৌছিতেও বাধা নাই। অতি সামান্য কারণেই কলেজে প্রথমট হয়, কলেজেরই উঠানে পাড়াইয়া রাজনীতি সংক্রান্ত গরম-গরম বক্তৃতা চলে এবং সভা ভাঙিলে চাকোয়ায় ভোজ কিংবা সিনেমায় যাইতে এতটুকু সঙ্কোচ থাকে না। অধ্যাপকরা নিজেদের সম্মান কোন মতে বাঁচাইয়া চুপ করিয়া থাকেন।

গোড়ার দিকে ভূপেন চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু শেষে এক সময় অসহ্য হইয়া উঠিল। দেখিত, তাহার যে সব বন্ধু পৃথিবীতে অচিরে সাম্যবাদ-স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং নিষ্পীড়িত নির্যাতিত, দরিদ্র, বৃহৎ ভোরহাসীর জন্ত বাহাদুর হুগ ও বিস্ফোজেন সীমা নাহি, তাহারাষ্ট গৌরব-কামানো মুখে মেসোদের মত প্রচুর স্রো ও পাউডার মাথিয়া সবচেয়ে পাংলা আদি কিংবা বেশমের জামা গায়ে দিয়া কলেজে আসে, মুহূর্ত্ত বিলম্বিত সিগারেট খায়, চৌরঙ্গি-পাড়ার চৌকলে জলযোগ করে এবং এক-একপালা বাংলা ছবি তিন-চার বার দেখে। তাহাতেও ভূপেনের আপত্তি ছিল না। ইহাদের বক্তৃতায় যখন দেশপূজা নেতার পর্য্যন্ত বৃন্দিত ভাবে শাস্তিত হইতেন, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। প্রজ্ঞা কথাটার সঙ্গেই যেন ইহাদের পরিচয় নাই। রাজনীতি করে কক্ক, কিন্তু নিজেরা কিছু ভাবে না, ভাবিবার চেষ্টাও করে না, তাহাতেই ভূপেনের আপত্তি। কতকগুলি বিদেশী বাঁশ বুলি আওড়ায়। বক্তৃতা করে রুশীয় সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদের তর্জমা ডিয়া—বিপ্লবের বুলি আওড়ায় উর্দু ভাষায়, শ্রোগানটা পর্য্যন্ত নিজেরা হযারী করিতে পারে না। প্রথম কলেজী-জীবনে সে-ও যে ইহাদেরই এক জন ছিল, ভাবিয়া ভূপেন আজ লজ্জা পায়।

মোহিত বাবুর সহিত এ বিষয়ে প্রায় তাহার আলোচনা হইত। ভূপেনের উত্তাপের পরিবর্তে তিনি হাসিয়া বলিতেন,—ওদের ওপর রাগ করো না বাবা, ওদের জন্ত দুঃখ করো। ওরা নিজেরাই জানে না যে ওদের বক্তৃতা কি, ওরা কি চায়। এখন যেমন দেশের দুর্গতদের, শ্রমিকদের প্রসীড়িতদের দুঃখে গভীর উত্তেজনার বক্তৃতা করে, বক্তৃতায় অজ্ঞমোচন করার পরেই বিলাতী সিগারেট, বিলাতী স্রো, বিলাতী থানা ও বিলাতী সিনেমার মধ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি বাঁচে, তেমনি এক দিন ওদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই অনায়াসে পাশের বাড়ী বা কুটুম্বদের কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়বে, অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে পড়ে থাকে। তার পর সামান্য অর্থপ্রাপ্তির আশায় বা দৈহিক প্রয়োজনে নিঃশব্দে বাপ-মায় বেছে-দেওয়া মেয়েকে বিবাহ করবে এবং যেখানে হোক একটা চাকরী যোগাড় করে শাস্তিতে ঘর-সংসার করবে। তখন আবার এরাই তখনকার দিনের তরুণদের কথ্যে গালাগাল দেবে। এখনও এরা যেমন জানে না জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি ওদের প্রয়োজন, তখনও জানবে না। ওদের ওপর কি রাগ করতে আছে!

কিন্তু মোহিত বাবু যত সহজ কথাটা উড়াইয়া দিতেন ভূপেন তত সহজে উড়াইতে পারিত না। সে তর্ক করিতে হাটত, যুক্তি দিয়া তাহাদের ভুল ভাবিবার চেষ্টা করিত কিন্তু ফল হইত বিপরীত। যে সব ছেলে বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ঘন ঘন ঠ্টাইক ও মুহূর্ত্ত বক্তৃতা করে, তাহারাষ্ট বিন্দুমাত্র প্রতিবাদে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে, অপরাধকে কিছুতেই কথা করিতে দেয় না।

অথচ ইহার মধ্যে সব চেয়ে মজার কথা এই যে, তাহার সহপাঠীরা তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিতে পারিত না। তাহার কারণ, একমাত্র সেই ক্লাসে অধ্যাপকদের নানারূপ প্রশ্ন করিত, তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিত এবং তাহারা কোন প্রশ্ন করিলে এমন জবাব দিত, যাহাতে তাহার সত্যাকারের লেখাপড়ার আগ্রহ ও চেষ্টা প্রকাশ পাইত। ভালো ছেলে বলিয়া এই সামান্য শ্রমের রটনাতেই তাহাকে দলে পাইবার জন্য সমস্ত দলের আগ্রহ ছিল প্রচুর।

অবশ্য তাহার এই ছাত্রজীবনের মধ্যে যে একেবারে কোথাও এতটুকু আলো ছিল না এমন নয়। কতকগুলি ছাত্র সব কলেজে সব ক্লাসেই থাকে, বাহ্যিক সত্যই বিজ্ঞানবোধ লইয়া আসে—তাহারা নিজস্বের প্রচার করে না, খুঁজিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হয়। ভূপেন এই শ্রেণীর ছাত্রদের সন্ধান পাইয়া যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের সহিত লেখাপড়ার চর্চা করিয়া সত্যই শিক্ষায় আগ্রহ ও অনুবোধ বাড়িল। ইহারাও রাজনীতির চর্চা করে এবং দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে, রাজনীতি ইহারা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝে। তাহাড়া অধ্যাপকরাও ইহাদের ভাল করিয়া পড়াইতে চান, খোলাখুলি ভাবে, সহজ ভাবে মেশেন। এক কথায়, এই বিশেষ দলটির আওতায় আসিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

প্রথম দিকে এক দিন সে মোহিত বাবুর কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে—সামান্য বেশী খরচায় জন্য কোন বড় কলেজে ভর্ত্তি হইলুম না—এখন আফশোষ হচ্ছে।

উত্তরে মোহিত বাবু সাধনা দিয়া বলিয়াছিলেন—সব কলেজেই ভালো অধ্যাপক আর ভালো ছাত্র আছেন বাবা, খুঁজে নিতে হয়। সে কথাই সত্যতা ভূপেন ক্রমে বুঝিতে পারিল।

এই সমস্ত তিক্ততার মধ্যে তাহার গভীর সাধনা ও শাস্তি ছিল সন্ধানের বাড়ীতে। এ সময়টায় সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার এ টুইশনি শুধু অর্থের প্রয়োজনে নয়, আত্মার প্রয়োজনেও।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পড়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভূপেনকে ঠিক ক্লাসের পাঠ্য-তালিকা ধরিয়া পড়াইতে হয় নাই বলিয়া সে সহজে এক একটা স্তর পার হইয়া গিয়াছে। ভূপেন যখন কোর্স ইয়ারে, সন্ধ্যা তখন ম্যাট্রিকের পুঁথিতে হাত দিয়াছে। ভূপেন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলিত,—তুমি যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছ সন্ধ্যা, তাতে কিছু দিনের মধ্যেই আমার চাকরীটা খাবে দেখছি।

সন্ধ্যা হাসিয়া জবাব দিত, আপনিও ছুটন আমার আগে আগে, তা'হলে আমার গরজে আপনি এক দিন তবু বিজ্ঞানবোধ হতে পারবেন।

সন্ধ্যা কিছুতেই ভাবিতে পারিত না যে, ভূপেনের বিজ্ঞান স্তরে সেও এক দিন পৌঁছাইতে পারিবে। তাহার কিশোর-মনে ভূপেনের স্থান এমনি শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।

এখন সে তর্জমা ছাড়িয়া সোজা-সুজি ইংরেজী বই-ই ধরিয়াছে। ভূপেন তাহাকে সহজ অথচ কাহিনী-প্রধান বইগুলি বাছিয়া বাছিয়া দিত। প্রথমেই দিয়াছিল ডুমার কাউন্ট অফ মর্টিজ্জার্টো। এ বইটির গল্পাংশ সন্ধ্যা বার-দুইতিন ভূপেনের মুখে শুনিয়াছিল—গল্পটা তাহার এত ভালো লাগিয়াছিল। সে বইটি শেষ করিবার পর ডিকেন্সের অলিভার টুইষ্ট। এমনি করিয়া সন্ধ্যা লেখাপড়াতে যেমন দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল, সাহিত্যেও তেমনি পাইল ডবল প্রোমোশন। মোহিত বাবু প্রশংসা করিয়াছিলেন, ছোট ছোট ইংরেজী বই কিনিয়া দিবার কিন্তু ভূপেন আপত্তি তুলিয়াছিল। মোহিত বাবু আর কিছু বলেন নাই।

ক্রমে ভূপেনের বি-এ পরীক্ষার সময় আসিল। মোহিত বাবু এক দিন ডাকিয়া বলিলেন,—বাবা ভূপেন, এবার তুমি ক'দিন পড়ানো বন্ধ করো।

ভূপেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—কেন?

মোহিত বাবু জবাব দিলেন,—তোমার পরীক্ষার তো মোটে আর একুশ দিন বাকী। এখন অতটা ক'রে সময় নষ্ট করা কি উচিত? এই একটা মাস ও নিজে নিজেই পড়তে পারবে'খন।

ভূপেন কিন্তু সববে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, না, না, এতে আর আমার কতটুকু সময়ই বা যায়। তাছাড়া দিন-রাত বাড়ীতে বসে পড়া—সে আমার ধাতে নয় না। খানিকটা তো বেড়াতেই হতো—সেই সময়টা না হয় ওকে পড়াই।

মোহিত বাবু কহিলেন,—কিন্তু এমনি ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়ানো আর সেই সঙ্গে মস্তিষ্ক-চালনা করে বকা এক জিনিষ নয়।

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল,—না না, সন্ধ্যাকে পড়ানোই একটা যিক্রিয়েশন! ওর সঙ্গে মোটে বকতে হয় না।

মোহিত বাবু হাসিয়া জবাব দিলেন,—তোমার যদি ক্ষতি না হয়, তুমি এসো—so much the better.

(ক্রমশঃ)

পদকর্তা লোচনদাস

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

লোচনদাস সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের পদকর্তার জীবনীর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিথিলায় লোচনদাস বলিয়া এক জন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তবে গবেষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের বাঙ্গালার সর্বাঙ্গপ্রিয় কবি লোচনদাসকে বাঙ্গালা মায়ের কুটার ছাড়িয়া রাজসদরবারে আশ্রয়ের প্রার্থী হইতে হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোচনদাস বর্ধমান জিলার নিকটবর্তী কোগ্রাম বা কুগ্রামে (কোণা) জন্মগ্রহণ করেন, লোচনদাস-কৃত চৈতন্য-মঙ্গলের শেষ খণ্ডের পরিশেষে আমরা গ্রন্থকর্তা লোচনদাসের একটি বিশেষ পরিচয় পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩৬ সংখ্যক পৃথিতেও আমরা ইহার পরিচয় পাই, উহার পরই গ্রন্থের সমাপ্তি হইয়াছে, আবার দীনেশ বাবু তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” বলিয়াছেন—লোচন তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সে বাহাই হউক, আমরা লোচনদাসের জীবনী সম্বন্ধে ঋষা জানিতে পারি, তাহা সংক্ষেপে এই—বর্ধমান জেলার নিকটবর্তী কুগ্রামে পিতা কমলাকবের গুরুস ও মাতা সদানন্দীর গর্ভে লোচন জন্মগ্রহণ করেন। কি মাতৃকুল কি পিতৃকুল, ছই কুলেরই লোচন একমাত্র নয়ন-মণি ছিলেন; ছোট বেলায় আদব পাইয়া তিনি এইরূপ অবস্থা হইয়া উঠেন যে, তাঁহাকে মারপিট করিয়া অক্ষর-পরিচয় করাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর নরহরি দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আদেশে ও প্রসাদে লোচন “চৈতন্যমঙ্গল” গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস।

তার পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।—চৈতন্যমঙ্গল

এই প্রবন্ধে আমরা পদকর্তা লোচনদাস সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব বলিয়া তাঁহার “চৈতন্যমঙ্গলের” প্রামাণিকতা বা কবিত্ব বিষয় লইয়া গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিব না, তবে তাঁহার চরিত্র গ্রন্থখানির কয়েকটি বিষয় কেবলমাত্র আমাদের পাঠকবৃন্দের অবগতির জ্ঞা উল্লেখ করিব। চৈতন্যমঙ্গল কবির একটু বেশী বয়সের রচনা। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা (১৪ বৎসর বয়সের)। পদকল্পতরুর স্তবোগ্য সম্পাদক সত্যীশ বাবুর মতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে এবং দীনেশ বাবুর মতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে তাঁহার গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক আবার ভণিতার পাঠ লইয়া নানা কল্পনার আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছেন, ভণিতার বহু স্থানে আমরা যেমন লোচন বা লোচনদাস পাইতেছি, তেমনি আবার বহু স্থলে ‘ত্রিলোচন’ বা ‘এ লোচন’ দেখিতে পাইতেছি, কেহ কেহ ইহাকে ত্রিলোচন পাঠ করিয়াছেন। আমি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০৩ ও ৫০৭ সংখ্যক পৃথিতে “হাসি কহে এ লোচনদাস” পাঠই বহু স্থলে দেখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থরক্ষক হরিন্দাস পালিত মহাশয়ও এই পাঠ দলিত বলিয়া বিবেচনা করেন। গৌরপদভরঙ্গীর সম্পাদক জগদ্বন্ধু বাবু বলেন—চৈতন্যমঙ্গল রচনার পর সকলে ইহাকে ত্রিলোচন বা লোচনানন্দ বলিতেন। জগদ্বন্ধু বাবু কোথা হইতে এই তথ্যটির সন্ধান পাইলেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অতএব আমরা এই কথা মানিয়া লইবার পক্ষে নহি। কাহারও নাম যে কেবলমাত্র ‘লোচনদাস’ থাকিতে পারে না, তাহাকে ভদ্রতা রক্ষার জ্ঞা হু, পদ্ম, পলাশ, কমল প্রভৃতি উপশব্দের উৎপাত সঙ্গ করিতে ইহাই এমন কোন কথা থাকিতে পারে না। স্ত্রীকে একবার না জানিয়া মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবার অপরাধে লোচন আর তাহাকে স্ত্রীরূপে জীবনে গ্রহণ করেন নাই। এরূপ ধারণাও অমূলক বলিয়া বিবেচিত হয়, আবার এই আখ্যানও প্রচলিত যে, স্ত্রীকে লোচন যথেষ্ট ভালবাসিতেন, চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই তিনি স্ত্রীর অমুমতি লইয়া লিখিতেছেন,—

‘প্রাণের ভাৰ্য্য! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা,

আশীর্ব্বাদ মাগে আগে,

যত যত মহাজাগে,

তবে গাব গৌরা-গুণ-গাথা।’

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল পুস্তকে আমরা সূত্রখণ্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই—

প্রাণ ভাৰ্য্য! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা, ইত্যাদি।

আমরা কিন্তু এই উক্তিগুলির কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না, চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে যাইয়া মঙ্গল-গ্রন্থের নিয়মামুযায়ী দেবদেবীর বন্দনা করিতে করিতে অকস্মাৎ ‘প্রাণের ভাৰ্য্য’ বলিয়া স্ত্রীর প্রতি অমুরাগ জ্ঞাপন করিবার এবং পরের পংক্তিতে মহাভাগদের আশীর্ব্বাদ মাগিবার কোন কারণ নাই বা উহাতে তাঁহার মঙ্গলাচরণের সঙ্গতিও বসিত হয় না। সন্দেহ দূরীকরণার্থে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানি পৃথিতে এই পংক্তি কয়টির সন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও ‘প্রাণের ভাৰ্য্য’ দেখিতে পাইলাম না, তবে ৫০৭ সংখ্যক পৃথিতে

দেখিলাম—“আরে ভাই বে নিবেদ নিবেদ নিজ কথা”--- ইত্যাদি। আমার মনে হয়, লোচনদাস যে শুভঙ্কণে গৌরগুণে বিমোহিত হইয়া নিজের সমস্ত কিছু মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন এবং নিজে নদীয়া-নাগরী ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, সে দিন হইতে কেবল জীবকে কেন সমস্ত নদীয়া-নাগরীকেই সেই গোবর্চাদের প্রণয়িনী-রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল সম্বন্ধে এইবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব, ইহাকে বৈষ্ণবরা চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতের নিয়ে স্থান দিয়াছেন। ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে অনেকই সন্দেহান হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার প্রতিটি ছন্দে যে সর্বল ভক্ত-হৃদয়ের নিখিল অনুরূপিত ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। দিনপঞ্জী বা কড়া হিসাবে বিচার করিলে চৈতন্য-মঙ্গল অপেক্ষা অনেক বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যে তুল্য নয়, আবার বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত অতুলনীয়, তবে যে দিক দিয়া বিচার করিলে লোচনদাস আমাদের প্রিয় হইয়া উঠেন—সেটি হইতেছে তাঁহার সর্বল, কোমল, পবিত্র ও প্রেমিক মনের বদ্যাদানের অধিকার।

চৈতন্য-মঙ্গলে আমরা সূত্রথণ্ডে দেখিতে পাই, লোচনদাস সকলের বন্দনা লিখিবার সময় বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।

জগত মোহিত বার ভাগবত গীতে ॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত রচনা ইহার পর লোচনদাস তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন, কিন্তু পরবর্তী যুগে আমরা আর লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের কোন উল্লেখ পাই না, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বৃন্দাবনদাসের ভাগবতের (চৈতন্য-মঙ্গল) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবত নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও বে ঐ সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিল, তাহা আমরা কবিরাজ গোস্বামীর সম-সাময়িক লোকনাথ গোস্বামীর ‘সঁতাচরিত্র’ হইতে জানিতে পারি। বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্য-মঙ্গল’ কেন যে ‘চৈতন্য-ভাগবত’ আখ্যা প্রাপ্ত হইল, সে সম্বন্ধেও লোচনকে জড়িত করা হইয়াছে। উভয়ের (লোচনদাস ও বৃন্দাবনদাস) গ্রন্থের নাম ‘চৈতন্য-মঙ্গল’ হইলে কলহের সৃষ্টি হইতে পারে, এই জন্ত বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী নিজ পুত্রের গ্রন্থের নামকরণ করেন ‘চৈতন্য-ভাগবত’।

পরবর্তী যুগে আমরা নরহরি চক্রবর্তীর জঙ্কিরত্নাকরে লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের কোন উল্লেখ পাই না, কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃতের সর্বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। লোচনদাসের সমসাময়িক বৃন্দাবনদাস-রচিত চৈতন্য-ভাগবতকে পাশাপাশি ঝাড় করা হইয়া চৈতন্য-মঙ্গলকে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, লোচনদাস চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের কাহিনীগুলিতে চৈতন্যদেবের দেবলীলার আখ্যানভাগই অধিক, কিন্তু লোচনদাস যে ভাবে আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্তী দেবলীলার আখ্যানগুলি যে সুসজ্জিত রন্ধা করিতে সর্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রুদ্রিণী দেবীর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মনোহরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান কহিলেন—

ভুঞ্জিব প্রেমার স্তম্ভ ভুঞ্জাইব লোকে।

দীনভাব প্রকাশ করিব কলিমুগে ॥

* * *

ঘোষণা করহ শিব ব্রহ্মা আদি লোকে।

গৌর অবতার মোর হবে কলিমুগে ॥

এই কাহিনীটি লোচনদাস সম্ভবতঃ জৈমিনিভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—

জৈমিনি-ভারতে নারদ উদ্ভব সঙ্গাদ।

শুনিয়া লোচনদাসের আনন্দ উদ্ভাদ ॥

আমার বচনে যেন প্রতীত না যায়।

বিচার করক পৃথি বক্রিশ অধায় ॥

দীনেশ বাবু বলিয়াছেন, মাছুষের মহিমাই যে প্রকৃত দেবত্ব লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আমরা তাঁহার উক্তির যথাযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ, সম্মান-থাক্ত শোক-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া পাশে প্রেমে বিভোর যে মাছুষটিকে ঝাঁড় করান হইয়াছে, তাহার অন্তরের মানবীয় কোমলতা, তাঁহার দেবত্বের ঐশ্বর্যের অপেক্ষা আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লোচনের গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া দীনেশ বাবু আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন—“লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিদের মূল পন্থা বক্র হইয়া গিয়াছে। দীনেশ বাবুর এই উক্তিটিকেও আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। মুরারি গুপ্তের কড়া, গোবিন্দদাসের কড়া প্রভৃতি বোজ-নামচার যে সমস্ত গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনী লিখিত হইয়াছিল, উহাদের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুইখানকেও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করা সম্ভব হইবে না। লোচনদাস চৈতন্যদেবের নীরস ঘটনাগুলির যথার্থ আলোচনা স্বীকৃত করিবার মানসেই যে গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না। কৃষ্ণাচরণে বিভোর, ব্রজলক্ষণের প্রেমে আত্মবিসর্গ, জগতের পাণী-তাপীর অন্তরের জ্বালা দূর করিবার বাণী-প্রচারকের কোমল অন্তরের যে ছবিটি লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাহা কি শিক্ষিত, কি মূখ, সকলের হৃদয়েই অজিব রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, লোচনদাস তাঁহার সম্ভদয়তা, তাঁহার কবিরমের ভাবুকতা মিশাইয়া যুগাবতার মহাপ্রভুর জীবনের যে অংশটি আমাদের বুঝাইতে চাতিয়াছেন, তাহা আমাদের সত্যই মুগ্ধ করিয়াছে। চৈতন্যমঙ্গলের ভাষা অলঙ্কারের প্রাচুর্যে তাহার সাবলীল গতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। কল্পনায় কৃষ্ণলীলার রূপটিকেই আশ্রয় করিয়া যে লোচনদাস তাহার প্রেমিক নাগরের চিত্রের রূপ দিয়াছেন তাহা আমাদের বিমোহিত না করিয়া পারে না। সম্মান্যের কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার প্রিয়তমকে কহিতেছেন—

তো লাগি জীবনধন রূপ নব যৌবন

বেশ বিলাস ভাবকলা।

তুমি যদি ছাড়ি যাবে কি কাজ হার জীবে

হিয়া অলে যেন বিধ জালা।

ধিক মোর জাউ দেহে এক নিবেদিয়ে তোহে

কেমনে ঠাট্টিয়া যাবে পথে ।

শিরীষ কুন্তম যেন সুকোমল চরণ তেন

পরশিতে ডর লাগে চিতে ।

প্রবোধ দিবার ছলে প্রভু তখন অতি সাধারণ মানুষের মতন
কহিতেছেন—

আমি তোকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব যায়া

এ কথা কে কহিল তোমাকে ।

যে করি সে করি যবে তোমারে কহিব তবে

এখন না মর মিছা শোকে ।

ইহা বলি গৌরহরি আশ্বাসে চুখন করি

নানা রস কৌতুক পাখারে ।

অনন্ত বিনোদ প্রেমা লীলা লাভব্যের সীমা

বিকুপ্রিয়া তুলিলা প্রকারে ।

প্রামাণিকতা ও উচ্চাঙ্গের দিক দিয়া বিচার করিলে যাহাই হউক না কেন, সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট লোচনের চৈতন্যমঙ্গল যে অতি প্রিয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । আলোচ্য প্রবন্ধে চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে আর অধিক সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না, আমরা এখন পদকর্তা বা ধামালী গানের প্রবর্তক লোচনের বৈশিষ্ট্য কোথায় সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিব ।

সমগ পদাবলী-সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদাবলীতে যে রসটি অল্পস্বত হইয়াছে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে সে রসটি ভিন্ন অপর তিনটি রসেরও বহু পদাবলী রচিত হইয়াছে । পূর্বে কেবলমাত্র মধুর রসেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পরবর্তী যুগে উহার সহিত সখা, দাশ ও বাৎসল্য রসও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । লোচনদাস অঙ্গসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন সখা, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ কতকগুলি পদ লিখিয়াছেন, যেগুলি পদাবলী-সাহিত্যের একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছে । এগুলিকে আমরা 'ধামালী' নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি । ধামালী শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবিরোধ রহিয়া গিয়াছে । চৈতন্যমঙ্গলে আমরা দেখিতে পাই, 'হরস্ব বা চতুর' এই অর্থে 'ধামাল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

"আমার ছাওয়াল বড়ই ধামাল

এ দোষ ক্ষমিবে আপনি ।"

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে ধামালী শব্দের অর্থ করিতে গিয়া 'চামালী' শব্দের সহিত তুলনা করিয়া "চতুরালি" এই অর্থ করিয়াছেন (চান্তি—লঘটতা) । পদকল্প-তত্ত্বতে সতীশ বাবু "আনন্দে মাতামাতি" অর্থে ধামালী বা চামালী শব্দ ব্যবহৃত হয় এইরূপ লিখিয়াছেন । এক্ষেত্র অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলেন—"ধামালী বা চামালী" শব্দ কুরুকৌতুকে ব্যবহৃত হইয়াছে—রসিকতা বা পরিহাস অর্থে, তাহার মধ্যে বোধ হয় একটু অশ্লীলতা বা অশ্লীলতার ইতিহাসও পাওয়া যায় । ধামালী নামক এক প্রকার তাল কীর্তন গানে ব্যবহৃত হয়, বৈঠক ধামার শব্দের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, ধামালী শব্দের অর্থও বলা কঠিন ।" বাহা হউক, বর্তমানে ধামালী অর্থে অনেক

মনে করেন, অশ্লীলতা-দোষ-হুই এক প্রকার গান, উহাতে কেবল আদি রসেরই স্বাদ পাওয়া যায় এবং বহু স্থানে শ্লীলতার গম্বুকে অতিক্রম করিয়াছে । প্রকারভেদে ধামালী গান দুই প্রকার—সুন্দর ধামালী ও কৃষ্ণ ধামালী । অনেক বলেন, সুন্দর ধামালী কৃষ্ণ ধামালী অপেক্ষা অধিকতর দোষ-হুই, আবার প্রাচীন সাহিত্যের বহু বিশেষজ্ঞের মতে সুন্দর ধামালী কৃষ্ণ ধামালী অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ আদর্শ এবং কল্পনার নিখলতায় পরিপূর্ণ । লোচনদাসকে আমরা ধামালী রচয়িতাদের পথপ্রদর্শকরূপে ধরিয়া লইতে পারি, ইহার পূর্বে যে ধামালী গান ছিল না এ কথা অবশ্য বলা চলে না, কিন্তু লোচনদাসের সময় হইতে ধামালী গানের প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ভাবে পড়িয়াছে পূর্বে সেরূপ হয় নাই । এখনও রংপুরে এক প্রকার ধামালী গান প্রচলিত আছে । লোচনদাস-রচিত যে সমস্ত ধামালী গৌরপদ-তরঙ্গিনী ও পদকল্পতরুতে দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই গৌর-গুণায়ক । লোচনদাস নদীয়া-নাগরী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন । সমস্ত নদীয়াবাসীকে তিনি গোপীভাবে ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই ভাবে নিজেও অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ নদীয়ানাগরী শ্রীগৌরাজের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সত্যই অপরূপ । উচ্চ-শিক্ষিত না হইলেও গুরু কৃপায় তিনি যে সঙ্গদয়তা ও কবিকল্পনার উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাহার সরল ভাষায়, সহজ আন্তরিকতায় ও অনুরাগের প্রগাঢ়তায় পদগুলিতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । তাঁহার এই জাতীয় পদগুলি পদাবলী-সাহিত্যের একটি অপূর্ণ অংশ হইয়া বিরাজ করিতেছে, মহাপ্রভুর নদীয়া-লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি গৌরানন্দদেবের কোমল করুণ যে নিকট আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না । এই ধামালীগুলিতে লোচন যে ভাষার অবতারণা করিয়াছেন তাহা ঐ পদগুলির বিষয়বস্তুর সুউপযোগী হইয়াছে । ইহা বাতীত কুরুকৌতুকা-বিষয়ক যে সমস্ত ধামালী পদ লোচনদাস রচনা করিয়াছেন, উহাও গৌরানন্দ-বিষয়ক পদগুলি অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর নহে (সেগুলি লইয়া আমরা বারাস্তরে আলোচনা করিব) । লোচনদাসের গৌরানন্দ-বিষয়ক ধামালীগুলির রচনাশৈলীর সুবিধার জন্য আমরা এখানে তাহার কিছু কিছু পদ উদ্ধৃত করিব । গৌরাজের রূপ-বর্ণনা করিতে গিয়া লোচন সন্তোষজনক পণ্ডিতদের স্বায় অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই । মাত্র দুই-একটি কথায় তিনি সর্বসাধারণের মনে প্রেম-পাশল আত্মবিহ্বল মহাপুরুষের যে রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা অতুলনীয় ।

নাচায় আঁখির কোণে

সদাই সবার সনে

দেখিবারে আঁখি-পাখী যায় ।

সকল পূর্ণিমা চাঁদে

বিকল হইয়া কাদে

কর পদ পহুমের গঞ্জে ।

মাত্র এই দুইটি পংক্তিতে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে, স্বভাব-কবি লোচনের কবি-দৃষ্টি কেবলমাত্র মহাপ্রভুর বাহিরের অঙ্গরূপ দেখিয়াই ফিরিয়া আসে নাই, উহা তাঁহার অনুরাগে রমিত প্রেম-ব্যাকুল অন্তরের অন্তরবহিত করুণ রূপটিও অবলোকন করিতে সক্ষম হইয়াছিল । লোচনের ধামালীর মধ্যে এমন কতকগুলি পদ রহিয়া

গিয়াছে, যাহাতে তাঁহাকে সাধারণ পদকর্তা হইতে পৃথক করিয়া চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অমর পদকর্তাদের সহিত একাসনে বসিবার অধিকারী করিয়া তুলে। বর্ণনার জাঁক-জমকে ও শব্দচয়নের আড়ম্বরে লোচনের কাব্যপ্রতিভা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয় না সত্য, কিন্তু তাঁহার সরল বর্ণনার ভিতর দিয়া মহাপ্রভুর প্রেম-হাস্তোজ্জ্বল, করুণার অশ্রুপ্লাবিত, স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত চিরহাস্তময় যে মুখখানি আমাদের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হইয়া উঠে তাহা আমাদের অন্তরকে অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়। লোচন যে তাঁহার জীবন দিয়া, সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অহুভূতি দিয়া, একান্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া নদীয়া-নাগর শ্রীগোবিন্দের প্রেমে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পলাবলী আত্মদানের পর তাহা আমরা আর অস্বীকার করিতে পারি না। লোচনের অন্তরের পবিত্রতা ও নিখলতা মহাপ্রভুর উন্নত জীবনের পরশমণির স্পর্শে আসিয়া তাহার লেখনীর মধ্য দিয়া যে অহুভূতিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, তাহার নিকট ভাষা ও ভাবের অল্লীলতার আবরণ কি করিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইবে? মদনকে তিনি মোহিত করিয়াছেন, তাহার স্পর্শে আসিয়া ইন্দ্রিয়-লালসা আর কতক্ষণ মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে? সেই প্রেমমণ্ডরাজের নৃত্যের প্রতিটি পদবিক্ষেপে ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি ভোগ-ঈশ্রিত কণা আপনা হইতেই অবনমিত হইয়া গিয়াছে।

আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেমার ভরে
শটার তুলসী গৌরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে শুনিয়া চমক লাগে
মদনমোহন নটরাজে ॥

মহাপ্রভু চলিয়াছেন, পরিধানে রাজা পট্টবস্ত্রের জোড়, পায়ে বাকমল, সোণার নুপুর মধুর বোল তুলিতেছে, মাথায় দীর্ঘ চাঁচর চুলে কুম্ভ মালতীর মালা মণ্ডিত—তাহাতে চাঁপা ফুল গোজা, অঙ্গ সুরভি চন্দন চর্চিত, প্রশস্ত ললাটে ভুবন-মোহন ললাটিকা, সুরভিত বাহু লোলাহিতে দোলাহিতে নাগর চলিয়াছেন। পরিশেষে লোচনদাস নাগরী-জাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

এমন কেউ ব্যথিত থাকে
কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভয়া দেখি রূপখানি।
লোচনদাস বলে কেনে
নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজালি আপনা আপনি ॥

অমুরাগের কষ্টপাথরে ঘাচাই করিলে লোচনের এই অহুভূতির স্থান যে কোথায়, তাহা অতি সাধারণ পাঠকেরও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। যে কোন রসজ্ঞ সমালোচক অন্তর দিয়া বিচার করিলেও লোচনের এই রূপবর্ণনার পদগুলি যে অল্লীলতা দোষে দুষ্ট, তাহা বলিতে পারিবেন না এবং আদিরসের প্রাধান্ত পদগুলিকে শ্রীলতার গণ্ডি হইতে আদৌ বিচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহাও নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন।

ইহা ব্যতীত সতীশ বাবু কর্তৃক প্রকাশিত “অপ্রকাশিত পদ-কর্তাবলীতে”ও আমরা ব্রজলীলার কতগুলি (২২টি) বিভিন্ন ধরনের

পদ পাইতেছি। ঐগুলির প্রথমে “শ্রীগোবিন্দ নদীয়া-নাগরীর উক্তি” শীর্ষক যে পদটি পাইতেছি, তাহা ভাষার লালিত্যে ও কল্পনার মাধুর্যে এইরূপ—

ঢর ঢর কাঁচ সোণার বরণ
আউলাই পড়িছে গায়।
হেরি কুলবতী রসের পাখারে
দাঁতারে না পায় যায় ॥

এই পদ পাঠ করিতে গিয়া আমাদের ভক্তকবি গোবিন্দদাসের সেই প্রসিদ্ধ পদটি মনে পড়িয়া যায়—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনি বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মূরছা পায় ॥

এই বিশ্বমোহন রূপে কে না মোহিত হইবে? নদীয়ার স্ত্রী-পুরুষ এই ভাববিভোর পুরুষকে পরমপ্রিয়, প্রাণবল্লভ বলিয়া তাঁহার অমুরাগে প্রাণমন রাজাইয়া তুলিয়া নিজেকে নাগরীজানে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আকুল হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

“রূপ দেখিবারে ছড় পড়িয়াছে
নদীয়া নাগরীর ঘটা।
“নদীয়া নগর বধু হেরি গোরা মুখ বিধু
বর বর নয়ন সদাই।
অমুরাগে বুক-ভরে পুলকিত কলেবরে
মন মাঝে সদাই জাগাই ॥”

গোরার অপরূপ মহিমায় এ সংসারের সকল বন্ধন, মনের সকল ধূলি-মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া নিখল হইয়া গিয়াছে। এই ভাবটি আমাদের একান্ত ঘরোয়া কথায় রোজকার উপমা দিয়া লোচন বেশ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পদটি আমাদের বৃন্দাবনের প্রেম-পাগলিনী শ্রীমতীর কথাই বার-বার স্মরণ করাইয়া দেয়। পদটি এত মধুর যে, উহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত না করিলে পাঠকের রসাস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটান হইবে বলিয়া মনে হয়।

আর শুদ্ধা আছে। সেই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধু কান্দা আকুল তথা ॥
হলদি বাটিতে গৌরী বসিল বতনে।
হলদি বরণ গোরচাঁদ পড়িয়া গেল মনে ॥
কিসের রাক্ষস কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাটা।
আখির জলে বুক ভাসিল ভাসা গেল পাটা ॥
উঠিল গৌরাক্স ভাব সঙ্ঘরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছায়েথারে ॥ ইত্যাদি

ইহা ব্যতীত গৌরাক্সের গুণবর্ণনা করিয়া লোচন যে সমস্ত পদরচনা করিয়াছেন, তাহার ভিতর তাঁহার অহুগত ভক্তহৃদয়ের একান্ত আত্ম-সমর্পণের সুরটি অতি মধুর ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তনের অধিদেবতাই এই ভবসিদ্ধ পারাপারের একমাত্র কর্ণধার; তাঁহার

গরপাশয় হইলে তিনি কখনও অধম জনকেও পরিত্যাগ করেন না।
এই পদগুলিতে লোচনের নিবহস্তার ও বিনয়-মধুর হৃদয়ের একটি
সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হরির নামের লৌকাথানি ঐশ্বর্য কাণ্ডারী।
সংকীর্তন কেবোয়াল হই বাহু পসারি।
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার সোপে।

অপর পদে পাইতেছি—

লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে।

গৌরানন্দদেবের সন্মাস সঙ্কেও আমরা লোচনের একটি মাত্র পদ
পাইতেছি। কবিষের বা পাণ্ডিত্যের বিচারে ইহা অতি সাধারণ
শ্রেণীভুক্ত হইলেও সরলতা ও মর্মের বেদনা স্পর্শে ইহা করুণ হইয়া
উঠিয়াছে। মহাপ্রভুর নন্দীয়া ত্যাগের কথা শুনিবামাত্রই সকলের
মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, কেবলমাত্র মধুবা-জগৎ বা জীবজগৎ
পর্যন্ত নয়, প্রেমিক নাগবের বিরহে জড়জগতেও যে বেদনার অনুরণন
জাগিল তাহা সকলের হৃদয়তন্ত্রীকে ঝঙ্কত করিয়া তুলে,—

পাষণ সমান হৃদয় কঠিন সেহো শুনি গলি যায়।
পশুপাখী ঝুরে গলয়ে পাখের এ দাস লোচন গায়।

রাধাভাবোন্মাদে নৃত্যপরায়ণ মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত রূপটি
লোচন সহজ কথায় অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আবেশে
'রাধা' 'রাধা' বলিয়া গৌরানন্দদেব নৃত্য করিতেছেন, কখনও প্রেমাবেশে
ধরণীর বৃকে লুটাইয়া পড়িতেছেন, কভু বা অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় সেই
রাইরূপ দর্শন করিতেছেন, এই পদটির সহিত লোচন কর্তৃক বর্ণিত
প্রভুর অবতারতত্ত্বের সুন্দর একটি সংযোগ রহিয়াছে—

পছ নাহি মেলে আঁখি কহে মোর কাঁধে সখী
কাঁধে পাব রাই দরশন।
কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি
ইহা বলি ভেল অচেতন।

নিত্যানন্দের প্রতি আমরা যে কেবল লোচনের অগাধ ভক্তিরই
পরিচয় পাই তাহা নহে। এখানে আসিয়া লোচন তার বিনয় বা
দৈর্ঘ্যের বাঁধ রাখিতে পারেন নাই, ভক্তি এমনি অন্ধ হইয়া গিয়াছে
যে, নিতাই-বিদেহী জনার তিনি মুখদর্শন করা ত দূরে থাকুক,
তাহার মুখে আঙুন আলিয়া দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে,
অনল আলিয়া দিয়ে তার মাখ মুখখানে।

অন্তর—

অনল ভেজাই তার মাখ মুখখানে।

নিত্যানন্দের রূপ-বর্ণনা করিতে গিয়া লোচন কিন্তু তাঁহার
পাণ্ডিত্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে ভাষা তাহার
অলঙ্কৃত না হইয়া পারে নাই। ভাবও মহান্ মহিমাময়কে প্রকাশের
উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে,—

ঐশ্বর্য-মণ্ডল ধাম জিনি কত কোটা কাম
সেনা বিচি কিসে নিরমিল,
মথিয়া লাবণ্যাসিকু তাহে নিজাড়িয়া ঈন্দু
শুশা-সায়ে দুপানি গড়িল।

নবকুঞ্জ-দল আঁখি তারক ভ্রমরা পাখী
ডুবি বহু প্রেম মকরন্দে।

নিত্যানন্দের অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লোচন পরিচিত
মতবাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—

পুরবে সে ভক্তপুত্র বিহরে নন্দের ঘরে
বোহিগী-নন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতী-সুত নিত্যানন্দ অবধূত
ভুবন-পাবন হৈল নাম।

ইহা ব্যতীত অপর দুই-এক জন গৌরভক্তবৃন্দেরও বন্দনা লোচন
দাসের একটি পদে আমরা পাই।

লোচনের একটি পদে আমরা একটু অল্প ভাবের প্রকাশ পাইতেছি
পদটি পাঠ করিলেই যেন দেহতত্ত্বের বলিয়া মনে হয়। অতি ঘনোয়
কথায় অশান্ত হৃদয়ের সামনে একটি শান্তির পথের সন্ধান লোচন
আমাদের দিয়াছেন। প্রাণমন একবার সর্কতোভাবে সেই
যুগাবতাবের পায়ে নিবেদন করিতে না পারিলে এ সংসারের দৈনন্দিন
জালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না,—

প্রাণ ছুঁ ছুঁ করে আমার মন ছুঁ ছুঁ করে।
আখ কপালে মাথার বিবে রইতে নারি ঘরে।
লোচন বলে কীদাঁছস কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায় ধর।

পদকল্পকর্ত্তে আমরা লোচনদাসের নামে কতগুলি "বিষ্ণু
প্রিয়ার বারমাস্তার" পদ পাইতেছি। ১৩০৪ সনের সাহিত্য পরিষদ
পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় জ্ঞানানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" নামক প্রবন্ধে
পরিশেষে নগেন বাবু এইরূপ বলিয়াছেন—"পদগুলি জ্ঞানানন্দের, কি
পরবর্তী যুগে লোচনদাসের কবিত্বাতি জ্ঞানানন্দকে গ্রাস করি
ফেলায়, এগুলি লোচনদাসের নামেই চলিয়া আসিতেছে।" পদগুলি
ভাষাগত ও ভাবগত সরলতা ও চিন্তাধারার আন্তরিকতার প্রতি নজর
করিলে আমাদের মনে হয়, এগুলির রচয়িতা আমাদের চৈতন্যমঙ্গলকে
কবি এবং গ্রাম্য ধামালী-রচয়িতা লোচনদাসই বটে। দীনেশ বাবুও এই
পদগুলিকে লোচনদাসের বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

চৈত্র মাসে চাতক ডাকিয়া ধাইতেছে, কোকিল কুহু কুহু ডাকিতেছে
তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া মুগ্ধিত হইয়া পড়িতেছেন। বৈশাখে নান
পুষ্পপল্লবে ধরণী সুষোভিতা হইয়া উঠিয়াছে, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর
মনে চন্দন-অম্বলিগুণ্ড, সফ্র পৈতা স্বকোপরি রক্ষিত প্রাণবল্লভের কথা
মনে হইতেছে। জ্যৈষ্ঠের প্রথর তাপে জলবিহীন মৎসের স্তায়
তাহার জীবন অসহ্য মনে হইতেছে, তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

—ও গোঁয়াস প্রভু হে তোমার নিরাকরণ হিয়া।

অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

এ দুখে কাহার হৃদয় না আঁজ হইয়া উঠে। পাষণ-প্রতিমার
বৃকেও বুঝি প্রেম-চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে। এইরূপে লোচনদাস

বিরহ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়াসেবীর আঘাত, শ্রাবণ, তাজ, আশ্বিন করিয়া বার মাসের যে করুণ আলোখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্তরকে সত্যই উদ্বেলিত করিয়া তুলে, আমাদের মনে পড়িয়া যায় বিরহাশ্রুসিক্ত বিয়োগবিধুরা শ্রীমতীর কথা। সর্বশেষে লোচন ভণিতায় বলিতেছেন—

ও গৌরঙ্গ প্রভু হে মোর লহ নিজ আশ।
বিরহ-সাগর ডুবে এ লোচনদাস ॥

পাঠক পদগুলি পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার চুংকে নিজের জীবনে উপলব্ধি না করিতে পারিলে লোচনদাস ঐরূপ অন্তরের দরদটুকু তাঁহার রচনার ফুটাইতে পারিতেন না; রচনার জাঁকজমক প্রাণকে ব্যক্ত করিতে গিয়া দেহের অলঙ্কারেই মোহিত হইয়া ফিরিয়া আসিত।

চৈতন্যমঙ্গলে লোচনদাস চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিল্লাষ তুলিয়া শঙ্কিত-হৃদয়া শচী দেবীর একটি করুণ বর্ণনা দিয়াছেন। শচী

সেবা হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছেন, পুত্রবিহীন জীবন বাপন তাঁহার নিকট একেবারেই অসম্ভব, এই আশঙ্কায় আবার দার-পরিগ্রহ করাইতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহার সর্বহারার জীবনের একমাত্র সম্ভান—তাঁহার নয়নের একমাত্র হারামণি—জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকে হারাইয়া জীবন ধারণ করিয়া কি করিবেন—

বিষ খাঞা মরিব তোমার বিজ্ঞমানে।
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনি এ কাণে ॥
আমায় মারিয়া পুত্র ঘাইবে বিদেশ।
আশুনি আলিয়া তাহাতে করিব প্রবেশ ॥

কোমল মাহুদুদয়ের পুত্র-অদর্শন জনিত ব্যাকুলতা ও দুর্ভাবনায় গীড়িতা জননীর একটি সঙ্করণ চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পুত্রের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় মাতার অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা ও করুণার ধারা বিগলিত হইয়া বৃষ্টি পাঠকের নয়নে অশ্রু জাগাইয়া তুলে।

কর্ণরহস্য

(পূর্বস্মৃতি)

শ্রীচাক্ষুঃ দর্শনাচার্য্য

শাস্ত্রে জাতিভেদ অল্পসারে কর্ণভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সর্বজনমাত্ত প্রসিদ্ধ গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিধাঃ শূদ্রাণাং চ পবস্তপ।
কর্ণাশি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভেদৈর্গোঃ ॥”

অর্থাৎ হে অর্জুন! ব্রাহ্মণ কৃত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ অল্পসারে কর্ণগুলিকে বিভাগ করা হইয়াছে, কোন কোন জাতির পক্ষে কি কি কর্ণ বিহিত তাহাও ভগবান্‌ই উপদেশ করিয়াছেন, এবং স্বজাতীয় ধর্ম-প্রতিপালনের উপকার যে অত্যন্ত উত্তম ও মহান, তাহাও তিনিই দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিহ ততন্।
স্বকর্ণণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিঃ বিস্মতি মানবঃ ॥

অর্থাৎ যাহা হইতে প্রাণিগণের কর্ণপ্রভেদ হইয়া থাকে, এবং যিনি জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, স্বজাতীয় ক্রোধের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া লোক সিদ্ধিলাভ করে, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর উত্তম ফল হইতে পারে না সেট পবনপূর্ণার্থ মোক্ষলাভ করে। ইহার দ্বারা বলা হইল যে, আমরা যাহা কিছু করিতেছি আমাদের কর্ণ করিবীর সমস্ত শক্তিই সেই পরমেশ্বর হইতেই আসিয়াছে, তাঁহার দেওয়া শক্তি লইয়াই আমরা কর্ণ করিতেছি, তিনি দয়া করিয়া যাহাকে তাঁহার অপরিমিত শক্তির এক কণা দান করেন, তাহার দ্বারাই সে যাহা কিছু করিয়া থাকে, এক তিনি যখন সেট শক্তিটুকু প্রত্যাহার করিয়া লন, তখন সে সম্পূর্ণ অকর্ণণ্য হইয়া পড়ে—একটি কথা বলিবার পর্য্যন্ত অধিকার থাকে না। অতএব কর্ণ করিয়া গর্ভ দর্প বা অহঙ্কার করিবার মত আমাদের কিছুই নাই, যিনি উন্নত কর্ণ করিয়া প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং সে জন্ত জগতে সন্মান হন, তিনি তাঁরই অল্পগ্রহে এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী

দেওয়া উচিত, এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভরে তাঁর দেওয়া শক্তিকে সর্বদা তাঁর সেবাতেই অর্পণ করা উচিত। অবশ্য তাঁহাকে কেহ প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তথাপি তিনিই জগতের যাহা কিছু, তিনি ভিন্ন বিশেষ কিছুই হইতে পারে না, পৃথক ঘূলিকগাঙলি পৃথক তিনি, বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম বাবতীয় বস্তু সমস্তই তাঁরই মহিমা, তিনিই বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, স্তবরাং মনুষ্যাদি প্রাণিগাঙলিও তিনিই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ তাহা গীতায় বলিয়াছেন—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ”

অর্থাৎ এই জীবলোকে জীবরূপ সনাতন (নিত্য) বস্তুটি আমারই অংশ, নির্বিকার বিশুদ্ধ ভগবান্ দুষ্টিগোচর না হইলেও জীবরূপী ভগবান্ মনুষ্যাদিরূপে সর্বদাই আমাদের দুষ্টিগোচর হইতেছেন, অতএব জীবরূপ ভগবান্‌কে অকণ্টকে সেবা করিলে ফলতঃ তাঁহারই সেবা করা হইল। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

“হরিঃ সর্বস্য ভূতস্য ভগবান্ আন্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কার্মনন্তেঃ দামু মানয়েৎ ॥”

অর্থাৎ ভগবান্ হরি সমস্ত প্রাণিতেই বাস করিতেছেন, এই জন্ত প্রাণিদগিকে তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা আন্তরিকতার সহিত উত্তমরূপে সম্মানিত করিবে। অর্থাৎ এমন ভাবে জীবগণকে সেবা করিতে হইবে যে, সকলেই যেন তাহার দ্বারা নিজেকে সম্মানিত মনে করেন; অবহেলা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পূর্বক দর্শিত বা অহঙ্কৃত হইয়া দান করিলে সে দান যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, তাহার দ্বারা লোক সাম্মানিত না হইয়া অপমানিত বা লজ্জিতই হইয়া থাকে। এই জন্ত সেইরূপ দান বা যে কোন কর্ণকে ভগবান্ অদামু কর্ণ বলিয়াছেন; কারণ, তাহা ইহলোকেও প্রশংসাজনক হয় না এবং

পরলোকেও মঙ্গলকর হয় না। * অতএব দাতাকে ভাবের বিস্তৃততা সহকারে দান করিতে হইবে, তিনি যেন মনে করেন, আমি যে ঐকিঞ্চিৎ দান করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিতে পাট্টলাম ইহার দ্বারা আমি ধন্য, আমার অর্থ ধন্য, আমার হস্ত ধন্য, আমার জীবন ধন্য, আমি সর্বতোভাবে কৃতার্থ হইলাম, আমি 'যে গ্রহীতাকে কৃতার্থ করিলাম, মনের কোণেও গুরুত্ব কল্পনা করা উচিত নহে তাহাতে নিজেই বঞ্চিত হইয়া যাইবেন।' অতএব গ্রহীতাকে মধুর ভাষায় সম্মানিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উজ্জ্বলভাবে দান করিতে হইবে। দানের পাত্র কি অপাত্র ইহা বিচার না করিয়া যে কোন জাতিকে যে কোন ব্যক্তিকে দান করিলেই পুণ্য হইবে।

তবে গঙ্গাতীর প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে, গ্রহণ সংক্রান্ত প্রভৃতি পবিত্র সময়ে, সদাচারসম্পন্ন ধার্মিক চরিত্রবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ দরিদ্র ভ্রাতৃপুত্র পাশ্বে যদি দান করা হয়, তাহার ফল অনন্তই হইয়া থাকে, তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—“অনন্তং বেদপারগে।”

“সর্বত্র গুণবৎ দানঃ স্বপাকাদিষুপি স্মৃতম্।

দেশে কালে বিধানেন পাঠে দত্তঃ বিশেষতঃ।”

অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে এমন কি স্নেহকে পর্যন্ত দান করিলে তাহা ফলপ্রসূ হইবে, কিন্তু পূর্বোক্ত পবিত্র স্থানে পবিত্র সময়ে ও সাংসারিক শাস্ত্রজ্ঞ বিধিপূর্বক দান করিলে তাহার ফল অত্যন্ত অধিকই হইবে। ভগবানও বলিয়াছেন—

“দেশে কালে চ পাঠে চ তদানঃ সাত্ত্বিকঃ স্মৃতম্”

অতএব নানা প্রকারে জান্নাদিগের সেবা করিলে তাহার দ্বারা সকল আত্মার আত্মা সেই পরমাচ্ছাট উপাসিত হন জানিবেন। এবং মানুষের নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি বিস্তৃত ভাবে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহার দ্বারাও ভদ্রসেবা হইবে; কারণ, এই দ্রব্যগুলি যথাসময়ে না পাঠিলে কখনই সমাজ চলিতে পারে না। যদি ব্যবসায়িগণ একমত হইয়া এক দিন পণ্যদ্রব্যগুলির বিক্রয় বন্ধ করে, তবে লোককে অনাহারে থাকিতে হইবে, অতএব ব্যবসায়িগণ খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াও সমাজরূপ ভগবানেরই সেবা করিতেছেন বুঝিতে হইবে। তবে সেই দ্রব্যগুলি বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন এবং মূল্যও সঙ্গত হওয়া আবশ্যিক, অবিস্তৃত দ্রব্য ও অজ্ঞায় মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহাতে ধন্য না হইয়া অধঃপতি হইবে। এই জ্ঞাত ভগবান বলিলেন—“স্বকম্পা তমভার্জ্যে সিদ্ধিঃ বিলম্বিত মানবঃ।” এখানে স্বকম্প বলিতে ভ্রাতৃগণাদি জাতির শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মকেই বুঝিতে হইবে। এই জ্ঞাত ভগবান এই প্রকারে ভ্রাতৃগণাদি জাতির নির্দিষ্ট কর্মগুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন। * অতএব উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যে কোন জাতি বা ব্যক্তি যে কোন কর্ম করিলে তাহার দ্বারা ভগবানের উপাসনা করা হইবে না, শাস্ত্রসম্মত কর্ম করিলে তবে তাহা ধর্ম পরিণত হইয়া মঙ্গলকর হইবে, অশ্রদ্ধা নহে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিহিত কর্মই করিতে হইবে। যেমন ধরুন, প্রাতিহিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত

“অজ্ঞাতা হন্তঃ দত্তঃ তপস্কৃতঃ কৃতঃ তু যৎ।

অসদ্বিত্ত্যচ্যতে পার্শ্বং ন চ তৎ প্রেতা নো ইহ।”—গীতা

“ভ্রাতৃগণকৃত্রিয়বিশাঃ শূদ্রাণাং চ পরম্পর।

কম্পাদি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈবুৎশৈঃ।”—গীতা

প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হয়, এবং সেই দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে হইলে তাহার জন্ত নিশ্চয় কৃষিকার্য্য করিতে হইবে, এবং কৃষিকার্য্য ও গোদুগ্ধের জন্ত গো-পালন করা অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্ত দেশে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং সে জন্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক হয়। অতএব এই সকল কার্য্যনির্বাহের জন্ত সমাজে বৈজ্ঞ জাতির অত্যন্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞাত ভগবান বলিয়াছেন—“কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষ্যং বৈশাকর্ম্ম স্বভাবজম্।”

এইরূপ অজ্ঞাত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্তও বাণিজ্যের প্রয়োজন। বাণিজ্য পরিচালনা করিতে হইলে বৃহৎ বৃহৎ কার্যালয় প্রয়োজন, আর কার্যালয়গুলিতে মানোজার, অফিসার ও কেরানী ইহঁতে আরম্ভ করিয়া শ্রমিক পর্যন্ত বহুবিধ কর্ম্মীর প্রয়োজন, অতএব এই সকল কার্য্যনির্বাহের জন্ত শূদ্রজাতির প্রয়োজন, গভর্ণমেন্ট অফিস ও বাণিজ্য অফিস প্রভৃতির কার্য্য পরিচালন করিতে কায়স্থ জাতি চিরদিনই প্রসিদ্ধ, তাহার বিশেষ দক্ষতার সহিতই এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন ও তাহার দ্বারা প্রভূত অর্থও উপাধ্বন করেন, এবং অজ্ঞাত শূদ্রগণও রাজকার্য্য, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য প্রভৃতির সাহায্য করিয়া সমাজরূপ ভগবানের সেবা করিবেন, ইহাটাই সমাজের পরিকল্পনা বলা হয়। ভগবানও বলিয়াছেন—“পরিচর্য্যাত্মকঃ কর্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্।”

এখনও গভর্ণমেন্ট অফিসে বা কোন বাণিজ্য-অফিসে কর্ম্মীর প্রয়োজন হইলে স্বাধীনপন্থের বিজ্ঞাপন দেখিয়া শত শত লোক প্রার্থী হইয়া থাকেন, দেখা যায়।

সমাজে বহু লোক একত্র বাস করিলে নানা প্রকার বিবৃদ্ধলা ও অশান্তি হইয়াই থাকে, অতএব সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুশাসনের জন্ত ক্ষত্রিয় জাতির প্রয়োজন। তাহার যেরূপ শাস্তি স্থাপন করিবেন সেইরূপ সমাজে কোথাও ঐশ্বর্য্যবিশ্রব বা জাতিবিশ্রব হইলে দৃষ্টান্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দমন করিবেন, এবং ঐশ্বর্য্যক্ষার জন্ত প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়াও সেই যুদ্ধ নিজেই প্রায় পর্যন্ত উৎসর্গ করিবেন। বৈদেশিক শত্রু হইতে রাষ্ট্ররক্ষার জন্ত অকলভরে পূর্ণাঙ্গমে যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন, এবং যুদ্ধে কখনও পক্ষাংশদ হইবেন না, সমুদ্র যুদ্ধে প্রাণদান করিলে ক্ষত্রিয় জাতির মোক্ষ হয়। * বৌদ্ধগণের কুহকে পড়িয়া ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করার ফলেই ভারতবর্ষ চিরকালের জন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। সমাজের সুব্যবস্থা রক্ষার ভারই ক্ষত্রিয় জাতির উপর অশিত ছিল, সেই ক্ষত্রিয় জাতি লুপ্ত হওয়ার জন্তই সকল প্রকার বিবৃদ্ধলা উপস্থিত হইয়াছে। যে জাতি নিজেই জাতীয়তা রক্ষার জন্ত আন্তরিক যত্নবান না হয় সে জাতি ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে চীনদেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইউ এন সাং এ দেশে আসিয়াছিলেন, তিনি তাহার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন, এই বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক লোকই হিন্দু ছিল, এবং সেই সময় বঙ্গদেশে দশ হাজার বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল ও এক লক্ষ বৌদ্ধ

* “যাকিমা পুরুষো লোকঃ স্বর্ধ্যমণ্ডলভেমিদো।

পক্কিরাট, যোগবৃক্ষক রূপ চাভিকুখো হজঃ ॥”

প্রচারক বঙ্গদেশে সর্বদা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিত। ইহার দ্বারা ই বুঝা যাইতেছে, বৌদ্ধগণের রাজশক্তির প্রভাবে পড়িয়া বহু লোকই স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় রাজাশায় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত প্রভাকর আচার্য্য বৈশাখ বর্ষক্রমে ধর্ম রক্ষা করিয়া আর্ধ্য জাতিকে জীবিত রাখিবার জন্ম মৌমাঃসাদশনের সাহায্যে প্রবল তর্কযুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই গুরুতর ধর্মবিপ্লব জাতিবিপ্লব সমাজবিপ্লব ও কর্মবিপ্লবের সমন্বয় যে অল্পসংখ্যক হিন্দুজাতি বজায় ছিল, তাহা মহাশ্বে প্রভাকরের রূপান্তরেই হইয়াছিল। সেই সময় বহু লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈশাখ বর্ষক্রমচার ত্যাগ করার ক্রমে তাহারা অনাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নানাবিধ অশুশ্রী জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ যদি নিজের জাতীয়তাকে অর্থাৎ জাতির উপযুক্ত কার্যকলাপকে স্বত্বপূর্বক রক্ষা না করে, তবে তাহারা জীবিত থাকিলেও সে জাতি আর থাকে না। পূর্বেরই বলিয়াছি, ক্ষত্রিয় জাতিই সামাজিক সমস্ত পরিস্থিতি রক্ষা করিবার অধিকারী, সেই ক্ষত্রিয় জাতির পতন হওয়ায় দেশের সকল দিকেই দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে। মুসলমান গ্রন্থকার আবুল ফজলও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্বে হইতে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে জাতি যখন জমিদার হয়, সেই জাতিই তখন দেশ শাসন করে। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এখনকার মতই এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব দেখিয়াই সেই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহু পূর্বে হইতেই ধর্মবিপ্লব ও জাতিবিপ্লব হইয়াছিল, তিনি কাহাকেও জাতিচ্যুত করেন নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় এ দেশে ব্রাহ্মণেরও অভাব হইয়াছিল, সেই জন্ম প্রায় ১২ শত বৎসর পূর্বে মহারাজ আদিশুর যজ্ঞ করিবার জন্ম কাঙ্ক্ষম হইতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ৫ জন সদাচারসম্পন্ন সাহিত্যিক বৈদ্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণই এখন রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, এবং এই কায়স্থগণের বংশধরগণই রাষ্ট্রীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হন। বাঁহারা রক্ষণশীল গোড়া হন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে জাতি ও জাতীয়তার সংরক্ষক, আর বাঁহারা উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার সেকক হয়, তাহারাও জাতীয়তার ঘাতক। জাতীয়তা বিনষ্ট হইলেই জাতি বিনষ্ট হয়, শাস্ত্রীয় ও সামাজিক কার্যকলাপই জাতীয়তা, এই জন্ম ভগবান গীতাশাস্ত্রে স্বধর্ম রক্ষা করিবার জন্ম ‘পুনঃপুনঃ দৃঢ় ভাবে উপদেশ করিয়াছেন—‘স্বধর্ম নিবন্ধঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ’ ‘শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিপণ্যঃ পরধর্মাস্ত্যং স্বহৃদিত্যং’। ভগবানের সেই মহাবাক্যকে অবজ্ঞা করিয়া স্বধর্ম ত্যাগ করার জন্মই ভগবদভিশাপ সমগ্র জাতি আজ চরম দুর্গতি ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছে—

‘অথ চেৎ স্বমহচ্ছায়াং ন শ্রেয়াসি বিমুক্ত্যসি’

অর্থাৎ তুমি যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা ‘শ্রবণ না কর তবে বিনষ্ট হইবে। যদি কখনো অধিকাংশ লোক শাস্ত্রবাক্যে আন্তরিক প্রত্যঙ্গীল হইয়া স্বধর্ম রক্ষায় স্বত্ববান হয় তাহা হইলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে জাতির পুনরুত্থাপন হইবে, অল্পখা সহস্র চেষ্টাতেও কোন উপকারই হইবে না। অতএব সমাজ ও ধর্মের সংরক্ষক ক্ষত্রিয় জাতির অভাবেই ভয়তর্ক অধঃপতিত হইয়াছে জানিবেন।

ধর্ম জিন্ন কোন জাতিই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। মানুষকে

মানুষের মত থাকিতে হইলে একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত অবলম্বন করিয়াই থাকিতে হয়। ধর্ম জিন্ন ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয় না। ধর্মই মানুষের প্রাণে শাস্তি দান করে, ধর্মের দ্বারা ক্ষমত সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে মানুষ কখনই সংযত থাকিতে পারে না। রাজ-দণ্ডের ভয়ে লোক বাহ্যিক কতকটা সাবধানে থাকিলেও অন্তর পবিত্র না হওয়ায় সামান্য লোভের বা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অজ্ঞায় কার্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, কোন লোক ২১ বার জেল খাটিয়াও পুনর্ব্বার চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে। ব্যবসায়িগণ অর্থের লোভেই খাত্তব্র্য প্রভৃতির মূল্য অত্যন্ত বর্ধিত ও দূষিত খাত্তব্র্য বিক্রয় করিয়া সমাজের সর্বনাশ করিতেছে, তাহারা অত্যন্ত অপবিত্র স্বাধ্য-হানিকর ও বিষাক্ত দ্রব্য পর্য্যন্ত খাত্তসামগ্রীতে মিশ্রিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহার প্রতিরোধের জন্ম রাজার আইন থাকিলেও এই সকল গুরুতর দোষের আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার হয় নাই। নৃপতিগণও পররাষ্ট্রলোভে মুগ্ধ হইয়া দারুণ অশান্তিকর অতি নিষ্ঠুর হন এবং নিরীহ প্রজাগণের গীড়ন করিয়া অজ্ঞায় পূর্বক নানাবিধ কর আদায় করিয়া থাকেন। যুদ্ধ প্রভৃতি কাণ্ডে ব্যাপ্ত এই সমস্ত গুরুতর অনর্থের মূল কারণই হইল ধর্মহীনতা, মানুষ অধাধ্যিক না হইলে কোন অজ্ঞায় কার্যই করিতে পারে না। এই সকল অজ্ঞায় কার্য হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ধর্মের পবিত্র সংস্পর্শে আসিলে ধর্মের অলৌকিক প্রভাবে লোকের হৃদয় পবিত্র হইবে, তখন আর তাহারা কোনরূপ অজ্ঞায় কার্য করিতে সমর্থ হইবে না। দেখা যায়, কোন লোক প্রথম জীবনে অধাধ্যিকতা বশতঃ নানাবিধ অপকর্ষ্য করিলেও যদি সে ভাগ্যবশতঃ ধার্মিক হয় তখন সম্ভাব্যতঃই সমস্ত অজ্ঞায় কার্য পরিত্যাগ করে, চেষ্টা করিয়াও তাহাকে অজ্ঞায় কার্যে প্রবৃত্ত করা যায় না, অতএব মানুষকে প্রকৃত মানুষের মত হইতে হইলে পুরম মঙ্গলকর ধর্মের শরণাগত হইতে হইবে, ধর্মই রূপা করিয়া তাহাকে দেবতায় পরিণত করিয়া দিবেন। আর এই ধর্ম আচরণ করিতে হইলে অবশ্যই শাস্ত্রের অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ শাস্ত্রই ধর্মধর্ম নির্ণয় করিয়া দেন, শাস্ত্র অনুসারে কর্ম করিলে তবে তাহা ধর্ম হয়, পূজা জপ হোম তপস্তা দান ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মকে ধর্ম বলা হয়, যিনি এই সকল পবিত্র কর্মে রত থাকেন, তিনি আর অধর্ম করিতে পারেন না; অতএব মানুষকে যথাশক্তি ধর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এই সকল কার্য করিতে হইলে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের সর্বত্র শাস্ত্র প্রচার করিয়া ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিবেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলে ধর্মনিষ্ঠ হইবেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এ দেশে আসিলে মহারাজ আদিশুর তাঁহাদিগকে রাঢ় দেশে এক একখানি নিম্বর গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিয়া ব্রাহ্মণোচিত পূজা হোম জপ তপস্তা প্রভৃতি নানাবিধ সংকর্ম করিতেন, গ্রামে গ্রামে পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়া সমাজে ধর্মপ্রচার করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া সামাজিকগণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার চরিত্র সত্যনিষ্ঠা ত্যাগ ও ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি দেখিয়া স্বেচ্ছায় সকলে তাঁহাদিগকে আচার্য্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ ব্রাহ্মণদের ঐকান্তিক প্রযত্নে

বৌদ্ধধর্মে বীতরাগ হইয়া লোক বৈদ্যোক্ত ধর্মেই শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। অতএব ধর্মরক্ষার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারসম্পন্ন ত্যাগী সত্যবাদী ও ধার্মিক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য হইয়া সমাজের সর্বত্র ধর্মপ্রচার করিবেন, এবং পৌরোহিত্য ও গুরুতা করিয়া লোকের ধর্ম-কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবেন। যেমন শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়গণেরই রাজকার্য্যে অধিকার বলা হইয়াছে, বৈশ্যগণের বাণিজ্যাদিতে অধিকার বলা হইয়াছে, সেইরূপ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণেরই পৌরোহিত্য কার্য্যে অধিকার বলা হইয়াছে। মহাভারতে শান্তিপর্বে দেখিতে পাই, “ব্রাহ্মণস্ত হি বাজনং বিধীয়তে ন ক্ষত্রবৈশ্যয়োদিজাত্যোঃ”—অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্য বিধান করা হইতেছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বিজাতির তাহা নাই। মীমাংসাস্বামীর আর্থিকাদিকরণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কেবল ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্য কর্ম্মে অধিকার আছে অন্য কোন জাতির তাহা নাই। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

“অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব যটকথাংগ্রহজন্মনঃ।”

“ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়ঃ প্রতি।

অধ্যাপনং যাজনং চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ।

বৈশ্যঃ প্রতি তর্থেবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিত্তি স্থিতিঃ।”

অর্থাৎ অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, পূজা হোমাদি সংকার্য্য, পৌরোহিত্য, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের বিহিত, এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনা, পৌরোহিত্য ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি কার্য্য নিবৃত্ত হইবে, বৈশ্যেরও ঐ তিনটি কর্ম্ম নিবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঐ তিনটি কর্ম্মে অধিকার নাই। মহাভারতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ দোমাকে পুরোহিত স্থির করিয়াছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ গণ আচার্য্য ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের কুল-পুরোহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র বিষয়ে স্তম্বে মগ্ন না হইয়া বহু কষ্টেও জীবিকা নির্বাহ করিয়া সর্বদা তপশ্চায় নিযুক্ত থাকিবেন, তাহার ফলে তিনি পরলোকে অনন্ত স্তম্ভের অধিকারী হইবেন। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

“ব্রাহ্মণস্ত তু দেহোহৈয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেবাতে।

কৃচ্ছায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তুতুখায় চ॥”

অতএব ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ কর্ম্মে অত্যন্ত অমুগ্ধ থাকিলে সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ফলে মোক্ষলাভ করিয়া ধন্য হইবেন, ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবান্ ও গীতায় বলিয়াছেন—“স্বৈ য়ে কর্ম্মণ্য-ভিরতঃ সংস্কিং লভতে নমঃ”—অর্থাৎ নিজ নিজ জাতির কর্ম্মে অমুগ্ধ হইয়া থাকিলে লোকে মোক্ষলাভ করে। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

“বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্ধ্যাদতন্ত্রিতঃ।

তন্ধি কুর্কন্থ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।”

অর্থাৎ আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যাবজ্জীবন বেদোক্ত ও শাস্ত্রোক্ত স্বজাতীয় কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্ম যথাশক্তি করিয়া লোক মোক্ষলাভ করে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে করিতে মন পবিত্র হইলে সেই বিতন্ম মনের দ্বারা আত্মদর্শন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। অতএব বুঝা গেল, মোক্ষের জন্য সন্ন্যাসের অপেক্ষা নাই। বশিষ্ঠ অত্রি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও জনক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতিগণ বিনা সন্ন্যাসে গৃহস্থ থাকিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য মোক্ষধর্মে বলা হইয়াছে—

“জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।

তত্রাদর্শতলপ্রাপ্ত্যে পশ্যত্যাত্মানমানাত্মনি।”

অর্থাৎ পাপক্ষয় হওয়ার মাঝবের আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। নির্দল দপনের সদৃশ সেই চিত্তে তিনি আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

“সত্যকার জীবন দেখা চাই। যা জানো, বোঝো—তাই লিখো। লেখা বাড়বার জন্তে খুঁড়িয়ে বেকিয়ে লিখো না।...এক কাজ ক'রো,—নিজের গ্রামের আর আশপাশের পরিচয়—গল্প হোক, কাহিনী হোক, যতটা পার সংগ্রহ ক'রে, লেখবার চেষ্টা ক'রো। আগে সেইটে ক'রো দিকি...দুর্কোষ্য ভাষায় লিখতে যেও না, বুঝা শ্রম হবে, নিজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না।... ঠাইল? ঠাইল শেখাতে হয় না—যা নিজের হ'য়ে দেখা দেবে, তাই তোমার ঠাইল; অন্যের মত ক'রে লিখতে যেও না, তাতে দু-কুল ষাবে,—আমাদের সাহেব হবার মত।...ভাল শোনাবে বলে বেশী বিশেষণ ব্যবহার ক'রো না, ঠিক বাছাই চাই, একটিই যথেষ্ট।”—বঙ্কিমচন্দ্র

তৃতীয় অধ্যায়

খ্রিশ্রবাসের হত্যার পর কিছু দিন কেটে গেছে।
কলা বাহুল্য, খনের দায় থেকে চরণদাস অব্যাহতি
পেল, কিন্তু চুরির জন্ত হ'মাস জেল হ'ল। খনীর
কিন্তু কোন পাতাই মিলল না।

এক দিন রামানুজকে আমি বললুম—
“তোমার কথা-মত ত্রিমূর্তির অস্তিত্ব যদি স্বীকার
করে নেওয়া যায় তাহলে এও স্বীকার করতে হবে
যে, তিন নম্বর হ'মাসের আঘাত করলে। অথচ
আমরা হেরে চূপ করে হাত-পা খুঁটয়ে বসে
আছি, এক-চুলও অগ্রসর হতে পারছি না।”

রামানুজ উত্তর দিলে—“অগ্রসর হচ্ছি বৈ কি। শত্রু-পক্ষ
বৃদ্ধিমান্। স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, এত বৃদ্ধিমান্ প্রতিদ্বন্দ্বী
আগে কখনও পাইনি। বৃদ্ধিমান্দের সঙ্গে যুদ্ধ অতি-সাবধানে বৃদ্ধি
খাটিয়ে করতে হয়। তার কাব্য-প্রণালী সৃষ্টির ভাবে পর্যবেক্ষণ
করে তার মনের পরিচয় পেতে হবে। আমরা তার কাব্যপ্রণালী
আর মনের পরিচয় কিছু-কিছু পেয়েছি, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তারা
কিছুই জানে না, এইটুকুই আমাদের সুবিধা।”

এমন সময় একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দীপঙ্কর ঘরে ঢুকল। পরিচয়
করিয়ে দিলে—“ইনি ধৃষ্ণটীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউ, পি, গোস্বামী
বিভাগের এক জন কেষ্ট-বিষ্ট। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।”

পরিচয়-পর্বাদি সাক্ষ হবার পর চা খেতে খেতে দীপঙ্কর বললে—
“এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। তোমার হয়তো মনে আছে
রামানুজ, তুমি এক দিন আমার বলেছিলে ত্রিমূর্তি সম্বন্ধে কিছু
জানতে পারলে তোমায় বলতে।”

রামানুজ ব্যগ্র ভাবে বললে—“হ্যাঁ, কিছু জানতে পেরেছি না কি?”

দীপঙ্কর জবাব দিল—“না, আমি পারিনি, তবে ধৃষ্ণটী বাবু
জানেন। তাই আমি তাঁকে তোমার কাছে টেনে নিয়ে এলুম।”

রামানুজ জিজ্ঞাস্য নেড়ে ধৃষ্ণটী বাবুর দিকে চাইলে।

ধৃষ্ণটী বাবু বললেন—“বিশেষ কিছু জানি না। আমি একটা
কাজে দিল্লী গেছিলাম—সেখানে এক বছর মুখে ত্রিমূর্তি-নামটা প্রথম
তুলি। কিন্তু তিনিও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না।
আপনাকে ত্রিমূর্তি সম্বন্ধে আমি কোন খবরই দিতে পারব না।
একটা অদ্ভুত ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাইতে এসেছি, যদিও
আমাদের বিশ্বাস, এখন আর করার কিছু নেই।”

রামানুজের চেহারা দেখেই বুঝলুম, সে বিলক্ষণ নিরাশ হয়েছে।
তবু মুখে বললে—“বলুন, ব্যাপারটা কি?”

ধৃষ্ণটী বাবু বললেন—“ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো—যেন
আরব্যোপক্কাশের গল্প। আমি এলাহাবাদে থাকি। সেবানকার
বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব এক জন নাম-করা কেমিষ্ট ডক্টর বিজয়লাল গুপ্ত
এক রকম অদ্ভুত মার আবিষ্কার করেছেন। সেই মার-ব্যবহারে মাটি
লম্ব গুণ উর্ধ্ব হতে আর ছাট উর্ধ্ব সময়ের মধ্যে যে অল্পকালের অবস্থা
আসে সেটাও দূর হবে। এ-সম্বন্ধে দিল্লীর বিখ্যাত কেমিষ্ট শ্রীর
মোহনচাঁদ অগ্রওয়ালের সঙ্গে তিনি দেখা করতে বান। মিসিল
হোটলে উঠেছিলেন। সন্ধ্যার সময় হোটেল থেকে বার হন, কিন্তু
বাসায় আর ফেরেননি। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই
ভদ্রলোকের জন্তই দিল্লী গিচ্ছলুম। আজ অবধি তাঁর কোন পাতা নেই।”

রামানুজ প্রশ্ন করলে—“কত দিনের কথা?”



(উপজাস)

শ্রীফান্সি রায়

ধৃষ্ণটী বাবু উত্তর দিলেন—“বাস ছই তো
বটেই, বরং বেশী হবে তো কম নয়।”

রামানুজ বললে—“ব্যাপারটা সম্ভবই ঘোরালো
রটে। আচ্ছা, এলাহাবাদে আপনারা খবর পেলেন
কি করে?”

ধৃষ্ণটী বাবু জবাব দিলেন—“শ্রী মোহন-
চাঁদের সঙ্গে দেখা করবার পর সরকারী কৃষি
বিভাগে ডক্টর গুপ্তের একটি বক্তৃতা দেবার
কথা ছিল। কিন্তু তিনি সে বক্তৃতা দেননি—
কারণ অসুস্থতায়। সেখান থেকে এলাহাবাদে
খোঁজ করা হয় যদি হঠাৎ কোন কারণে ফিরে

এসে থাকেন। মিসেস গুপ্ত জানানেন তিনি ফেরেননি। তিন-
চার দিন পরে মিসেস গুপ্ত পুলিশে খবর দেন, তাঁর স্বামী এখনও
ফিরছেন না কেন? এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অধ্যক্ষপ অম্বরোধ
করা হয়। সন্ধান করতে আমি দিল্লী যাই, কিন্তু কোন হিন্স
পাইনি। বাড়ী ছেড়ে কোন খবর না দিয়ে ঘুরে বেড়াবার মত
লোক তিনি নন। তাই আমাদের বিশ্বাস, কোন লোক তাঁর
আবিষ্কারের গুপ্ত তথ্য জানাবার জন্ত তাঁকে হয় গুম করেছে আর
না হয় জানতে না পেরে রেখে তাঁকে খুন করে ফেলেছে।”

রামানুজ কিছুক্ষণ চূপ করে চিন্তা করবার পর বললে—“ওর
স্ত্রী—অর্থাৎ মিসেস গুপ্ত এখন কোথায়?”

ধৃষ্ণটী বাবু জানানেন, মিসেস গুপ্ত কলকাতায় তাঁর স্বত্তরের
কাছে ফিরে এসেছেন। ডক্টর গুপ্তের বাবা এক জন রিটার্ডেড সিভি-
লিয়ান। দমদমায় বাড়ী। রামানুজকে ঠিকানা দিলেন। দীপঙ্কর
প্রশ্ন করলে—“কি হে রামানুজ, কি-রকম বৃদ্ধা?”

রামানুজ হেসে উত্তর দিলে—“এখনও বৃদ্ধি কিছু—শুধু
গুনলুম, সমর-মত বোঝবার চেষ্টা করব।”

দীপঙ্কর ও ধৃষ্ণটী বাবু প্রস্তান করতে হে রামানুজ বললে—“চল
ফান্সি, কলকাতার গোলমাল আর ভাল লাগছে না, একবার
দমদম ঘুরে আসা যাক।”

আমি ত্রেসে জবাব দিলুম—“শাক দিয়ে মাছ ঢাককার চেষ্টা
কেন?”

দমদমায় মিষ্টার গুপ্তের বাড়ী খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে
হল না। বিরাট প্রাসাদোপম অটালিকা। বেয়ারাকে দিয়ে রামানুজ
কাড় পাঠালে। একটু পরেই মিষ্টার গুপ্ত নিজের ড্রইং-রুমে এলেন।
রামানুজ তাঁকে আবার কারণ জানিয়ে বললে—“একবার মিসেস
গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

মিষ্টার গুপ্ত বললেন—“তা করতে পারেন, কিন্তু কোনো
ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না। হ'মাসের উপর কেটে গেছে।
পুলিশ তো কোন সন্ধানই করতে পারলে না।”

রামানুজ বললে—“তা জানি, তবে আর একবার চেষ্টা করে
দেখতে দোষ কি?”

“না, দোষের কিছু নেই। আচ্ছা, আমি বিজয়ের স্ত্রীকে পাঠিয়ে
দিচ্ছি।” এই বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চাপা স্বরে বললুম—“আমাদের আগমনে ভদ্রলোক বিশেষ সম্ভ্র
হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।”

রামানুজ উত্তর দিলে—“না হবার বিলক্ষণ কারণ রয়েছে।
পুলিশ কিছু করতে পারেনি, এ কথা ভুললে চলবে না।”

কিছুক্ষণ পরে মিসেস গুপ্ত ঘরে ঢুকলেন। নমস্কার করে বললেন—“স্বামীর যুগ্মে সব শুনলুম। আপনার নাম শুনেছি। পুলিশ বন্দন কোন সন্ধান করতে পারল না, তখনই আপনাকে ধরার সেবার কথা বলেছিলুম। কিন্তু—কিছু মনে করবেন না, বাবা বললেন যে, পুলিশ বন্দন কিছু পারলে না তখন সখের ডিক্টিক্যাট আঁর কি এমন করবে।”

রামাভুজ হেসে বললে—“মনে আর কি করব! আমি জানি, আমাদের গুপ্ত সনসাদারগণ বিশেষ আস্থা রাখে না। তবে আমরা একেবারে অকর্ণা নই, এটুকু বিশ্বাস হয়ত আপনি করতে পারেন।”

অপ্রতিভ হয়ে মিসেস গুপ্ত বললেন—“আপনার গুপ্ত আমার বিলম্ব বিশ্বাস আছে, কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে কি না, তাই—”

বাধা দিয়ে রামাভুজ বললে—“একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি! আপনি উষ্টর গুপ্তর কাছ থেকে শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলেন?”

“তা ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে চিঠিটা আছে। জানব?”

“বদি কিছু মনে না করেন—”

“না, না, মনে করব কেন? জানছি।” এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন এক মিনিট দু’হেক পরেই চিঠি-হাতে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—“এই দেখুন, সিসিল হোটেল, দিল্লী। ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৪। চিঠিটা দেখবেন?”

রামাভুজ উত্তর দিলে—“না, দেখবার দরকার নেই। শুধু তাগিদটা জানতে চাইছিলুম। আচ্ছা, ত্রিমূর্তি সফল উষ্টর গুপ্ত কখনও কোন কথা আপনাকে বলেছিলেন?”

“কৈ না! মনে পড়ছে না তো! ত্রিমূর্তি কি?”

“কি, তা আমি নিজেই জানি না! আজ উঠি। এ রহস্যের সন্ধান দিল্লীতে, এখানে নয়। আচ্ছা, উষ্টর গুপ্তর শরীরে কি কোন বিশেষ চিহ্ন আছে যাতে তাঁকে চেনা যায়?”

মিসেস গুপ্ত উত্তর দিলেন—“হ্যাঁ। বুক জড়ুলের চিহ্ন আছে।”

নমস্কার করে রামাভুজ উঠে পাঁড়াল। আমিও তার অনুকরণে এক অমুসরণ করলুম।

পাথে নেমেই প্রশ্ন করলুম—“যাবে?”

রামাভুজ উত্তর দিলে—“হ্যাঁ, আজই। যেখান থেকে উষ্টর গুপ্ত অদৃশ্য হয়েছেন, সেইখানেই ত্রিমূর্তির সন্ধান করতে হবে।”

“আমাকেও নিয়ে যাচ্ছ তো?”

হেসে রামাভুজ বললে—“নিশ্চয়ই। অবশ্য, তোমার যদি কোন অন্তরীবা না হয়।”

সেই দিন সন্ধ্যায়ই আমরা দিল্লী মেলে উঠে বসলুম। সেখানে পৌঁছে আমরাও যেখানে উষ্টর গুপ্ত উঠেছিলেন সেইখানে অর্থাৎ সিসিল হোটলে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। রামাভুজ হোটেলের ম্যানেজার এক চাকরদের দু’চারটে প্রশ্ন করলো কিন্তু তাতে কিছু ফল হ’ল না। দু’মাস আগেকার ব্যাপার কেই বা মনে রাখে! বিশেষ হোটলে—যেখানে দিন-রাত লোক আনা-পোনা করছে। তারা জানালে, উষ্টর গুপ্ত হঠাৎ উধাও হ’লেন। তিনি ১৪ই অক্টোবর রাতে এখানে এসে ওঠেন; ১৫ই সমস্ত দিন বাইরে-বাইরে কাটান—অবশ্য লাঞ্চ খাবার সময় একবার ফিরেছিলেন। তার পর রাত ন’টা নাগাদ ফেরেন—ডিনার খাননি। ভোর বেলা হোটেল ত্যাগ করেন, অবশ্য

কেউ তাঁকে যেতে দেখেনি। বিছানা দেখে মনে হয়, তিনি নিজে ঘরে রাজিবাস করেছিলেন। হোটলে এসেছিলেন একটি স্টেবল, ছোট একটি বেড়ি ও এটাটা-কেস নিয়ে। সকালে ঘর এর কিছুই ছিল না।”

তার মানে তিনি মাল-পত্র নিয়েই হোটেল ত্যাগ করেছিলেন। এতে লক্ষ্য করবার মত কিছুই নেই। অনেকেরই এমন করে থাকেন। দু’দিনের জন্য ঘর ভাড়া করে অনেক সময় দু’বটা পরেই চলে গেছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়।

সকালে নিজের ঘরে প্রাতরাশ খেতে যেতে রামাভুজ মিসেস করলে—“কিছু বুঝলে?”

উত্তর দিলুম—“এতে বোঝবার কি আছে? অতি সোজা কথা। পারের দিন ভোরবেলা উঠে উষ্টর গুপ্ত কোথাও বেরিয়ে যান আর ফেরেননি। অর্থাৎ সেদিন সকালে কেউ তাঁকে চুরি করে। এর মতো ঘোর-প্যাণ্ডর কিছু নেই।”

রামাভুজ বললে—“সরল মানুষ সবল ভাবেই সকল বিষয় চিন্তা করে। উষ্টর গুপ্ত কৃষি-বিজ্ঞানে বক্তৃতা না দিয়ে হঠাৎ লগ্ন-পতন নিয়ে ভোর হতেই চলে গেলেন কেন? ভোরে ক্লাহাবাদে যাবার ট্রেন কোথায়?”

“এমনও তো হতে পারে, হয়তো কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখে হয়েছিল। হোটেল ত্যাগ করে তার বাড়ী যাচ্ছিলেন।”

“হ’ল না বন্ধু, হ’ল না। অত ভোরে উঠে কেউ বাসা বসল করে না। তাছাড়া তিনি বন্দন নিখোজ হলেন, তখন কোন পরিস্থিতি ব্যক্তির কাছে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি পুলিশকে তা জানাতেন।”

“বেশ, স্বীকার করছি যে আমার কোন কথাই বৃত-সই হচ্ছে না। এবার তোমার কি দৃষ্টব্য, বল।”

রামাভুজ হেসে বললে—“ক’ছি, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারব না। সবই অবশ্য কল্পনা। আমার মাথায় ডিনটে আইডিয়া এসেছে। প্রশ্ন—হয়তো সত্যকারের বিজয় গুপ্ত দিল্লী শহরত্বে এসে পৌঁছতে পারেননি, মাঝ পথেই কেউ তাঁকে গুম করেছে। বিজয় গুপ্ত সেরে দিল্লী এসেছিল অস্ত্র লোক। স্বীকার—হয়তো তিনি দিল্লীতে পৌঁছে সিসিল হোটলে উঠেছিলেন; তার পর তার মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে কেউ তাঁকে সরিয়েছে। তৃতীয়—এক এইটেই বোধ হয় ঠিক যে, তার মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করে ফেরবার পথে তিনি নিখোজ হয়েছেন।”

আমি হেসে বললুম—“লজিক অকাটা ঝট। একটা নিখোজ লোক রাতে এসে খাটে দিবা আরায়ে নাক ডাকিয়ে ঘুহল! ভারী মজার ব্যাপার তো।”

রামাভুজ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে—“কিন্তু উষ্টর গুপ্তই যে হোটলে ফিরে রাতে শুয়েছিলেন, তার কোন প্রশ্ন আছে? রাতে কেউ তাঁকে ফিরতে দেখেনি। তিনি ডিনার খেতে নামেননি। ভোরে তিনি কখন চলে গেছেন, তাও কেউ জানতে পারেনি। শুধু জানা গেল, রাতে বিছানায় শোবার চিহ্ন রয়েছে। বিজয় বাবু ছাড়া অপর ব্যক্তিও তো শুতে পারে।”

বিস্মিত হয়ে বললুম—“তুমি কলতে চাও, বিজয় বাবু রাতে ফেরেননি? অস্ত্র কোম লোক নিজেকে তাঁর নামে চালাবার চেষ্টা করেছে?”

“ঠিক তাই। সেই জন্তই নিজেকে হোটেলের কর্মচারীদের দৃষ্টিতে অন্তরালে রাখবার জন্ত এত সতর্কতা। কোন সাধারণ লোকের গতিবিধি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। যাই হোক, প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথায় জোর দিতে চাই না। যাওয়া তো হ’ল, এখন চল, বেরুনো যাক।”

“কোথায়?”

রামাহুজ উত্তর দিলে—“শ্রম মোহনচাঁদের অগ্রগুদারের বাড়ী।”

কিছু সূয়েতে শ্রম মোহনচাঁদের বিরাট বাস-ভবন। সামনে কাণ্ড বাগান, অজস্র রকমের ফুল, মখমলের মত লন। যেন রাজ গিলিকা। কার্দ দিতে একটি হোকরা আমাদের ডাইরুমে বসিয়ে শ্রম মোহনচাঁদকে খবর দিতে গেল এবং একটু পরেই গৃহস্বামী স্বয়ং এসে জির হলেন।

আমাদের বক্তব্য শুনে তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—“কিন্তু এ সময়ে তো পুলিশের কাছে অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। শচেষ্টার বিষয়। ডক্টর গুপ্তের মত অমন প্রতিভাবান এক জন স্ট্রেক্ট নির্বাঞ্ছন হলেন আর পুলিশ তার কোন হিন্দু করতে পারল।! শেমফুল। আমি আর আপনাদের বেশী কি সাহায্য করতে পারব বুঝতে পারছি না।”

রামাহুজ বললে—“তারা যে প্রশ্ন করেছিল, হয়তো আমি সে প্রশ্নের কোন কথা জিজ্ঞাস্য করব না। আমি শুধু জানতে চাই, আপনারা কি সমস্যা কথাবার্তা করেছিলেন।”

অবাক হয়ে রামাহুজের মুখের দিকে চেয়ে শ্রম মোহনচাঁদ বলেন—“অস্বস্ত প্রশ্ন! তাঁর গবেষণার বিষয় ছাড়া আর কি কথা হবে?”

“ডক্টর গুপ্ত তাঁর থিওরি আপনাকে বোঝালেন?”

“হ্যাঁ। আমিও এ-লাইনেই কাজ করছি কি না। হুজনে চাই নিয়ে একটু আলোচনা হল।”

“ডক্টর গুপ্তের থিওরি কি আপনি কার্যকরী হবে বলে বিশ্বাস করেন?”

“নিশ্চয়। আমার মতের সঙ্গে তাঁর মতের অনেক মিল আছে। হু-এক জায়গায় একটু গরমিল ছিল। আমরা ঠিক করেছিলুম, হুজনে এক-সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব, কার ভুল। কিন্তু এ সব প্রশ্নের কোন অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।”

“কোথায় বসে কথা হয়েছিল?”

“এইখানে।”

“আপনি একলা ছিলেন, না, অল্প কোন লোকও আলোচনার সময় উপস্থিত ছিল?”

“আমরা একলা ছিলাম। কেন?”

“অল্প কোন লোক শুনে পাবে, সে সম্ভাবনা ছিল?”

“না। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।”

রামাহুজ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—“ধন্যবাদ শ্রম মোহনচাঁদ, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলুম। ক্ষমা করবেন।”

স্মিত হাস্তে তিনি উত্তর দিলেন, “বিলক্ষণ। যদি কোন কাজে লেগে থাকি তো নিজেকে ধন্য মনে করব।”

শ্রম মোহনচাঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় দেখি, এক জন মহিলা কটক দিয়ে ছুকলেন এবং কোন দিকে

না চেয়ে হন-হন করে ভিতরে চলে গেলেন। সামান্য এক-কলক মাত্র দেখতে পেলুম। অপরূপ সন্দরী!

পথে এসে রামাহুজ প্রশ্ন করলে—“কিছু লক্ষ্য করলে?”

উত্তর দিলুম—“দেখলুম শ্রম মোহনচাঁদকে। চমৎকার সোঁম্যা চেহারা, মুখে-চোখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি!”

বাধা দিয়ে রামাহুজ বললে—“সে কথা জিজ্ঞাস্য করছি না। যে মেয়েটি এখনি বাড়ীর ভিতর গেল, তাকে দেখলে?”

“হ্যাঁ, দেখুখম বই কি। চমৎকার দেখতে। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে অমন রং অল্পই দেখা যায়।”

রামাহুজ হেসে বললে—“তোমাদের মানে লেখকদের দোষই ওই। মেয়েদের সৌন্দর্যই শুধু চোখে পড়ে। তার ভারতবাসী—”

বললুম—“তাও লক্ষ্য করেছি বই কি! ভেরী শার্ট—”

“না, না, সে কথা বলছি না। শার্ট তো বটেই, কিন্তু যেন অতি বেশী শার্ট! যে কোন লোক বাড়ী ঢোকবার সময় যদি কোন নতুন অপরিচিত লোককে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে একবার তার দিকে চায়। কোঁতুহল বলতে পার,—মামুষের স্বভাব। তা না করলে বুঝতে হবে, সে আমাদের এড়িয়ে যেতে চায়।”

“হঠাৎ ‘সরে এস, সরে এস’ বলে রামাহুজ হিড়-হিড় করে আমার হাত ধরে টানলে। ঠিক পর-মুহুর্তেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল ভেঙ্গে আমাদের সামনে পড়ল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রামাহুজ বললে—“বাক, খুব সময়ে সাবধান হওয়া গেছে। বিলম্বে কি হ’ত, বুঝতে পারছ তো?”

“অ্যাকসিডেন্ট।”

“দেখে তাই মনে হয়! কিন্তু আমার ধারণা, কেউ ইচ্ছা করেই পৃথিবীর বুক থেকে আমাদের সরিয়ে ফেলবার জন্ত এই কৌশল অবলম্বন করেছিল।”

“কথাটা যেন একটু কষ্টকল্পনার মত শোনান্ছে।”

“তা শোনান্ছে। আচ্ছা, একটু চিন্তা করা যাক! ডক্টর গুপ্ত দিল্লীতে এসেছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে।”

প্রশ্ন করলুম—“কি করে জানলে? প্রমাণ?”

রামাহুজ হেসে জবাব দিলে—“প্রমাণ পেয়েছি। তোমার বোধ হয় মনে আছে, দমদমে মিসেস গুপ্ত আমাদের তাঁর স্বামীর চিঠি দেখিয়েছিলেন। হোটেলের খাতায় ডক্টর গুপ্তের দস্তখত দেখেছি। একই হাতের লেখা। অতএব প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হ’ল। তার পর তিনি শ্রম মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এটাও ঠিক। কারণ, এক জন জাল লোক কেমিস্ট্রীর জটিল তত্ত্ব নিয়ে তাঁকে কখনই ঠকাতে পারত না। তার পর ডক্টর গুপ্ত শ্রম মোহনচাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার হলেন। পথে যেতে যেতে হঠাৎ—ঠিক হয়েছে ফাল্গুন, চল, আবার শ্রম মোহনচাঁদের বাড়ী যাওয়া যাক।”

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম—“আবার! কেন? শ্রম মোহনচাঁদের বা কিছু বলবার ছিল, সবই তো বলেছেন।”

“শ্রম মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না।”

“তবে?”

“সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে হবে।”

প্রথম বার যে-লোকটি দ্বার খুলেছিল এবারও সে এল। আমাদের চিনতে পেরে প্রশ্ন করলে—“কিছু ভুলে গেছেন ব্যক্তি?”

রামাভুজ জবাব দিলে—“না। আমরা বিদায় নেবার পরেই এক জন মহিলা এসেছিলেন। তিনি কে?”

“সাবিত্রী দেবী। তিনি শ্রম মোহনচাঁদের চাইপিষ্ট।”

“তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।”

“দাঁড়ান, দেখছি।” বলে লোকটি চলে গেল এবং একটু পরেই এসে জানালে যে সাবিত্রী দেবী আবার বেরিয়ে গেছেন।

রামাভুজ বললে—“না, তিনি বেরিয়ে যাননি। গেলে আমরা নিশ্চয় দেখতে পেতুম। আপনি তাঁকে একবার আমার কার্ড দিয়ে বলবেন, অত্যন্ত দরকারী কাজ, তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছি, নাহলে দিল্লীর পুলিশ-কমিশনরের সঙ্গে দেখা করতে হবে।”

লোকটি আবার ভিতরে চলে গেল। একটু পরে সাবিত্রী দেবী স্বয়ং এলেন এবং আমাদের নিয়ে গিয়ে উইংসকে বসালেন।

সাবিত্রী দেবী বললেন—“মিষ্টান্ন বস্তু, আপনাকে যখন বাড়ী থেকে বেরোতে দেখলুম তখনই বুঝতে পেরেছি বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। একটা গুণ্ডাগোলের সৃষ্টি হবে।”

রামাভুজ বললে—“মিস ফেরিস—”

বাধা দিয়ে সাবিত্রী দেবী বললেন—“এখানে র্যাচেল ফেরিস নয়, সাবিত্রী দেবী। আপনার জন্তু আমায় কলকাতা ত্যাগ করে আসতে হ'ল। এখানেও আপনি ধাওয়া করেছেন। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে দেবেন না, এই আপনার উদ্দেশ্য?”

রামাভুজ উত্তর দিলে—“না, উদ্দেশ্যটা আর-একটু গুরুতর। আমি উত্তর গুপ্তর সন্ধান চাই।”

জু কুশিত করে তিনি বললেন—উত্তর গুপ্ত! নামটা যেন শোনা-শোনা ঠেকছে। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। তিনিই তো এক দিন শ্রম মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তার পর কোথায় যে চলে গেছেন—”

বাধা দিয়ে কঠোর স্বরে রামাভুজ বললে—“চলে যাননি, তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছে। এবং কোথায়, তাও জানি। পাশের বাড়ীতে, যেখান থেকে আকস্মিক হুর্ঘটনার মত একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল। হুর্ঘটনা যে স্বেচ্ছাকৃত, সেটা বোঝবার মত বুদ্ধি আমাদের আছে।”

সাবিত্রীর মুখ একেবারে শাদা কাগজের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে নিমেষে সামলে নিয়ে সহজ করেই বললে, “আপনি সবই জানেন, দেখছি। উত্তর গুপ্ত ও-বাড়ীতে নেই। কোথায় আছেন, বলুন না। তবে তাঁকে মুক্তি দিতে রাজী আছি। কিন্তু এক সর্তে।”

“সর্ত কি শুনি?”

“আমার স্বাধীনতায় যদি আপনি হস্তক্ষেপ না করেন, তবেই তিনি স্বাধীনতা লাভ করবেন, নচেৎ নয়।”

একটু চিন্তা করে রামাভুজ বললে—“বেশ, এ সর্তে আমি রাজী। আচ্ছা, ত্রিমূর্তির সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?”

সাবিত্রীর মুখে-চোখে ভীতি-ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঠোট যেন মড়ার মত নীল হয়ে গেল। রামাভুজের কথার উত্তর না দিয়ে বললে—“একবার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?”

রামাভুজ সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়তে সে একটি নম্বর মেলালো।

অটোমেটিক ডায়াল সিস্টেম—নম্বর জানতে পারলুম না।

ফোনে বললে—“রামাভুজ বস্তু এইখানে বসে। তিনি সব জানেন। হোটেল সিসিলে তাঁর ঘরেই উত্তর গুপ্তকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর, আর সকলে সরে পড়।”

রিসিভার রেখে রামাভুজ বললে—“তোমাকে আমাদের সঙ্গে হোটেল যেতে হবে।”

সাবিত্রী হেসে বললে—“তা জানি।”

হোটেল ফিরতেই ম্যানেজার বললেন—“মিষ্টান্ন বস্তু, আপনার ঘরে একটি লোক এসেছে। অস্বস্থ মনে হ'ল। সঙ্গে এক জন নার্স এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। বললে, আপনি পাঠিয়েছেন।”

রামাভুজ বললে—“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই পাঠিয়েছি।”

সাবিত্রী জিগ্যেস করলে—“আমি তবে যেতে পারি?”

রামাভুজ বললে—“না, আগে ওপরে গিয়ে দেখি, ঠিক লোক কি না।”

আমরা দ্বিতলের ঘরে এলুম। এসে দেখি, এক জন লোক খাটের উপর শুয়ে আছে। চেহারা অতি শীর্ণ, যেন বহু দিনের রোগী! রামাভুজ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলে—“আপনি উত্তর গুপ্ত?”

তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। রামাভুজ বললে, “বেশ, যদি তাই হয় আপনার জামাটা একবার খুলুন। বুকে জড়ুলের চিহ্ন আছে কি না দেখতে চাই।”

বুক খুলতে দেখা গেল জড়ুলের চিহ্ন রয়েছে। নিশ্চিত হবার জন্তু রামাভুজ সেই চিহ্নের উপর আঙুল ঘষে বললে—“হ্যাঁ, আপনিই যে উত্তর গুপ্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাবিত্রী, ধন্যবাদ, তুমি এবার যেতে পার।”

সাবিত্রী চলে যাওয়ার পর রামাভুজ উত্তর গুপ্তকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে অমরোধ করল। উত্তর গুপ্ত কিন্তু ভীত ভাবে বললেন—“বলতে পারব না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমাকে বাস করতে হবে। এক দিন আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু তবু আপনার অমরোধ রক্ষা করতে পারব না।”

সেই দিনই তিনি এলাহাবাদ চলে গেলেন।

আমরা আরও দু'চার দিন দিল্লীতে থাকব ঠিক করলুম।

সমস্ত দিন এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়াই, দর্শনীয় স্থানগুলি দেখি, রাতে হোটেল ফিরে খোসগল্প করি। এক দিন রামাভুজকে বললুম—এবার কলকাতা ফিরি, চল: এখানে বিশেষ কোন কাজ করছ বলে তো মনে হচ্ছে না।”

হেসে রামাভুজ বললে—“আর কি করব, বল?”

“পুলিশে খবর দেবে।”

“খবর তো দেব কিন্তু তাদের বলব কি?”

“কেন, ত্রিমূর্তির কথা!”

রামাভুজ হেসে উত্তর দিলে—“আমাকে পাগল মনে করবে আর তাদের বলবই বা কি? আমি নিজেই এখনও ত্রিমূর্তির সম্বন্ধে কিছু জানি না।”

“সাবিত্রী ওরফে মিস র্যাচেল ফেরিসকে আটক করতে পারলে হয়তো ওর মারফৎ কিছু হাদিস মিলত।”

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রামাভুজ বললে—“হয়তো হাদিস মিলত কিন্তু নিকপায়। তাকে কথা দিয়েছি। জান তো, কথার নড়চড় আমি করি না।”

“মিস ফেরিসের ব্যাপারখানা বুঝতে পারলুম না।”

“কলকাতায় এক জন আংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক খুন হয়েছিল।— মিস ফেরিস সেট খুনের মামলায় জড়িত ছিল। পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু সে দোষী ছিল। প্রমাণও আমি পেয়েছিলুম। তবে সে প্রমাণ জোগাড় হয়েছিল মামলা শেষ হবার অনেক পরে।”

যখন আমাদের এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ঘরের দরজায় কে যেন আঘাত করলে এবং কোন উত্তর দেবার আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। স্মাট-পরা, ওভারকোট এবং মাফলারে দেহ আবৃত, মাথার টুপিটা প্রায় জু-জবদি নামানো। এগিয়ে এসে নিম্ন স্বরে বললে—“কিছু মনে করবেন না। এ ভাবে প্রবেশ অশোভন কিন্তু কথটা একটু জরুরী বলেই আসতে হল।”

আগন্তকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে রামানুজ বললে—“দরকারী কথটা কি, বলুন। আমরা শুনতে প্রস্তুত।”

“কথটা দরকারী হলেও অতি সহজ। আপনি আমাদের জ্ঞানক বিরক্ত করছেন।”

“আমাদের, মানে? কাদের?”

লোকটি কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করে আমাদের সামনে খুলে ধরলে। দেখলুম, তাতে তিনটি সিগারেট রয়েছে। তখনই কেস বন্ধ করে পকেটে পুরে ফেললে।

রামানুজ বললে—“ও! তা আমাকে আপনার বন্ধুরা কি করতে বলেন?”

“আমাদের পরামর্শ যদি শোনে, তবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেই ভাল হয়।”

“পরামর্শটা খুবই ভাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি আমি রাজী না হই?”

কাঁধটা ঝাঁকুনি দিয়ে আগন্তক বললে—“সে আপনার অভিজ্ঞি। আপনার বুদ্ধি এবং সাহসের আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু আপনার এ হঠকারিতার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। মনে রাখবেন, মানুষ একবার মরে গেলে আর বাঁচে না।”

রামানুজ হেসে বললে—“তা জানি। আর এও ঠিক যে, মানুষ একবারের বেশী মরে না।”

আগন্তক প্রস্থানোক্ত হয়ে বললে—“আপনার কথা আমার মনে থাকবে। আশা করি, আপনিও আমার কথা মনে রাখবেন।”

আমি বলে উঠলুম—“লোকটা ভয় দেখিয়ে চলে যাবে?”

তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

লোকটা দীর ভাবে বললে—“কি করতে চান?”

আমি ঝাঁজালো কণ্ঠে উত্তর দিলুম—“পুলিশে বরদ দেব।”

রামানুজ বিধাপূর্ণ কণ্ঠে বললে—“বেশ, তাই করা যাক।”

রামানুজ যেই টেলিফোনে হাত দিয়েছে, অমনই লোকটা বাঘের মত আমার ঘাড় লাফিয়ে পড়ল। আমার শরীরে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু লোকটাকে ধরে রাখতে পারলুম না। প্রায় আঁয়ত করে এনেছিলুম, লোকটা নেতিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ আমি মুখ খুঁড়ে ছিটকে গিয়ে পড়লুম। লোকটা চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, বাইরে থেকে ছিটকিনি

রামানুজের হাত থেকে টেলিফোন কেড়ে নিয়ে ম্যানেজারের অফিসে ফোন করলুম। “দেখুন, ওভারকোট স্মাট আর টুপি-পরা এক জন লোক এখনই নীচে যাচ্ছে। তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। পুলিশ তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। আটক করুন।”

কিছুক্ষণ পরেই দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ পেলাম এবং ম্যানেজার স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই আমি প্রশ্ন করলুম—“লোকটাকে ধরেছেন?”

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—“আপনার বর্ণনার মত কোন লোককে দেখতে পেলাম না।”

“মানে, কোন লোককেই দেখতে পাননি?”

“এক জন লোককে দেখলুম বটে। কিন্তু তার টুপি, ওভারকোট ছিল না। হাতে একটা স্ম্যটকেশ ছিল। সে তো ইন্ডিওরেশের দালাল। কিছুক্ষণ আগে আমাকে একটা পলিসি গছাবার চেষ্টা করছিল।”

এতক্ষণ রামানুজ চুপ করে একটা চেয়ারে বসেছিল। এইবার সে বললে—“ঠিক হয়েছে। লোকটা অতি বুদ্ধিমান। ক্যানভাসার সঙ্গে প্রথমে নিজের পোজিশন ঠিক করে নিয়ে তবে এসেছে। স্ম্যটকেশটা তাই বিদূষ ঠেকেনি, কাজেই কেউ তা লক্ষ্য করেনি। ওভারকোট আর টুপি আসবার আর ঘাবার সময় স্ম্যটকেশের মধ্যেই ছিল।”

ম্যানেজার আমতা-আমতা করে বললেন—“কিন্তু আমি কি করে জানব, বলুন?”

আশ্বাস দিয়ে রামানুজ বললে—“না, না, আপনার কোন দোষ নেই।”

ম্যানেজার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বিষম ভাবে রামানুজকে বললুম—“দোষ আমারই। লোকটাকে হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারলুম না।”

রামানুজ হেসে বললে—“তোমার কোন দোষ নেই। শু একটা যুৎসুর পাচ।”

হঠাৎ দেখি, দরজার কাছে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। লাফিয়ে গিয়ে সেটাকে তুলে নিলুম। খুলে দেখি, তাতে লেখা আছে “সোমবার বিকেল তিনটে। জুয়া মসজিদের পাশে। ১০, সীসল গলি।”

তলায় নাম লেখা নেই—শুধু একটি সংখ্যা আছে।

কাগজখানা রামানুজের হাতে দিয়ে বললুম—“পড়ে দেখ। সৌভাগ্য বলতে হবে। আজই তো সোমবার।

রামানুজ কাগজটা পড়ে অস্বুট স্বরে বললে—“ওঃ, তাই লোকটা এসেছিল। এবার বুঝতে পারছি।”

বিরক্ত হয়ে বললুম—“সব সময়েই কেবল চিন্তা! এর মধ্যে বোঝবার এবং ভাববার কি আছে?”

রামানুজ হেসে বললে—“বন্ধু, রাফুসে গাছ দেখেছ? পাতাগুলো ঝাঁক করে থাকে। কোন পোকা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে গেলেই কাঁটা দায় ঝাঁকানি বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পোকাকরও ভলীলা সাদ হ়। রামানুজ পোকা নয়। তাকে অত-সহজে আকৃষ্ট করা যায় না। এদের বুদ্ধি আছে স্বীকার করছি কিন্তু আমিও নিবেট নই।”

বিমিত ভাবে বললুম—“কি বলছ, তুমি? কিছু বুঝতে পারছি না।”

“প্রথম থেকেই আগন্তকের আসবার কারণ খোঁজবার চেষ্টা করছিলাম। তারা সত্যই ভেবেছিল যে ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে? নিশ্চয় নয়। তবে কি করতে এসেছিল? তোমার সঙ্গে যে যুদ্ধটুকু হলো, তাতে সে বাধা দিল না কেন? ইচ্ছা করলে আগেই চলে যেতে পারত। কিন্তু বাই-বাই করে যেতে পারছিল না। কেন? কারণ, এই রকম একটা গণ্ডগোল-সৃষ্টি তার প্রয়োজন ছিল। তাই মারামারি। এবং সেই সুযোগে কাগজের টুকরোটা ফেলে দিয়ে গেল। মনে হবে যেন হঠাৎ পড়ে গেছে। এতে লেখা রয়েছে—“সোমবার বিকেল তিনটে। জুম্মা মসজিদের পাশে। ১০, সীসল গলি।” যদি এই কাগজটার কোন মূল্য থাকত পড়া হয়ে গেলেই লোকটা পুড়িয়ে ফেলত। পকেটে করে এইখানে, শত্রুর ঘরে আনত’ না। ফাস্তিনি, রামাহুজকে এত সহজে ভোলানো যায় না।”

অছুট ঘরে বললুম—“তাই তো! এতটা জবি নি।”

নিজের মনেই রামাহুজ বললে—“কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না।”

“কি?”

“বেলা তিনটের সময় কেন? দিনের আলোয় তো আমাকে চুরি করতে পারবে না। তবে? একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তিনটে নাগাদ কিছু-একটা হবে। সে-সময় আমরা সীসল গলির কাছ-বরাবর শত্রু-শিকারে ব্যস্ত থাকব। ঠিক হয়েছে ফাস্তিনি, আমাকে এখান থেকে সরাবার চেষ্টা।”

“কি করবে?”

“সমস্ত দিন ঘরে গাঁট হয়ে বসে থাকব। তিনটের মধ্যেই একটা কিছু ঘটবে, এই আমার ধারণা।”

[ক্রমশঃ]

হরিকেল রাজ্য

শ্রীবিবেশ্বর চক্রবর্তী

বিগত শ্রাবণ মাসখানি ‘মাসিক বহ্নমতীতে’ “বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে হরিকেল রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। এই রাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ আজও এক-মত হইতে পারেন নাই। স্মৃতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

একাধিক তাম্রশাসন ও বহু প্রাচীন গ্রন্থে হরিকেলের উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পবিত্রাজক উ-হিং (Wu-hing) সিংহল হইতে জলপথে উত্তর-পূর্ব দিকে আসিয়া পূর্ব-ভারতের পূর্ব-প্রান্তে সমুদ্রতটবর্তী হরিকেল রাজ্যে উপনীত হন। (১) সমসাময়িক ইং-সিং (It-sing) বলেন, এখান হইতে নালন্দ ৪০০ মাইল দূরবর্তী। (২) তিনি সমতটেরও উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতরাং সমতট ও হরিকেল অভিন্ন নহে। কাশ্মিরদেবের তাম্রশাসন ৭৫০-৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত। (৩) তাহাতে হরিকেল মণ্ডলের উল্লেখ আছে। নবম শতাব্দীতে রচিত রাজশেখরের কপূরমঞ্জরীতে আছে—‘জয় পূর্বদিগঙ্গনা-ভূজঙ্গ চম্পা-চম্পককর্ণপূর লৌলানিঞ্জিত রাঢ়দেশে বিক্রমাক্রান্তকামরূপ হরিকেলো কেলিকাবক অবমানিত কর্ণ-স্ববর্ণ দান।’ (৪) স্মৃতরাং কামরূপ হরিকেল হইতে পৃথক। ফু-শের গ্রন্থে একাদশ শতাব্দীতে রচিত একখানি প্রাচীন পুথির হইখানি লেবেল উল্লিখিত আছে। (৫) একখানি ‘হরিকেলদেশে শিলালোকনাথ’ অপরাধিনি—‘চন্দ্রদীপে ভগবতী তারা’। স্মৃতরাং হরিকেল ও চন্দ্রদীপ এক রাজ্য নহে। বিক্রমপুরাধিপ ঐচন্দ্রের রামপাল ৩ খ্রীঃ তাম্রশাসনে দশম শতাব্দীতে প্রদত্ত। (৬) তাহাতে আছে—

‘আধাবো হরিকেলরাজ ককুদুহ্মমিতানাং শ্রিয়াং যশস্রোপদে বভূব নৃপতিদীপে দিলীপোপমঃ।’ ইহাও হরিকেল ও চন্দ্রদীপের বিভিন্নত্ব প্রমাণিত করিতেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর গুর্জরবাসী জৈন হেমচন্দ্র বলেন, ‘বঙ্গান্ত হরিকেলীয়াঃ।’ তখন বঙ্গ ও হরিকেল অভিন্ন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাসুদেব কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীর “কৃত্যসার” গ্রন্থে (৭) দুইটি শ্লোক আছে :—

‘ত্রিপুরায় বধে কালে রক্তশ্রাক্ষোহপতঃস্তম্বে।

অশ্রবো বিন্দবস্তে তু রক্তাক্ষা অভবন্ ভূবি।

রক্তবামাক্ষিসমুত্তঃ রক্তাক্ষঃ কামরূপকে।

দক্ষিণাক্ষাঃসমুত্তঃ হরিকেলোভবঃ বিদুঃ।’

স্মৃতরাং কামরূপ যেমন ত্রিপুরার উত্তরে, হরিকেল তেমন দক্ষিণে। এই শ্লোক দুইটি কোন প্রাচীনতর পুথি হইতে উদ্ধৃত। পাশে লেখকের টিকা—‘হরিকেলঃ শ্রীহট্টদেশঃ।’ ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীহট্টবাসী বাদবানন্দ দাশের রূপকিত্তামণি গ্রন্থে (৮) আছে—‘শ্রীহট্ট হরিকেলিঃ শ্রাহুঃ হট্টোহপি কচিদ্ভবেৎ।’

উপরোক্ত প্রামাণ্যসমূহ হইতে দেখা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে হরিকেল সমতট, কামরূপ ও চন্দ্রদীপ হইতে পৃথক রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ ও হরিকেল অভিন্ন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট এবং হরিকেল অভিন্ন।

ভারতের পূর্বপ্রান্তের দেশসমূহের নাম সমুদ্রস্রোতের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আছে। (৯) সে সময় সমতট, ডবাক ও কামরূপ প্রত্যন্ত দেশ। হরিকেল-সমতটের পূর্ব দিকে বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম নাই। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চাং সমতটের বর্ণনা দিয়াছেন। এই রাজ্য তাম্রলিপ্ত বা বর্তমান তমলুক হইতে ১৮০ মাইল পূর্বে

Bengal III p. 4, 165, ৭। D. U. Ms. No. 2141B.
৮। D. U. Ms. No. 1451. ৯। Corpus Insc. Indicarum.

১। Takakasu Pxiwi, জাঃ মঞ্জুদেবের প্রবন্ধ—প্রবাসী, রাশিন ১৩৩, পৃঃ ৭১৫। ২। Ind. Hist. Quarterly xx to I, P 3. ৩। Mod. Rev.—1922 P 612. ৪। নির্ধা-
গর সং পৃঃ ১৩। ৫।oucher's Iconographie vol
P 200. ৬। N. G. Masumder—Inscriptions of

অবস্থিত এবং ইহার পরিধি ৬০০ মাইল। তমলুক হইতে ১৮০ মাইল পূর্বে, বর্তমান নোয়াখালি জিলার পশ্চিম সীমা। উ-হিংয়ের বর্ণনামুযায়ী হরিকেল নামক হইতে ৪০০ মাইল অর্থাৎ বর্তমান নোয়াখালি জিলার পূর্ব-প্রান্তে। সমতটের উত্তরে ডবাক এবং কামরূপ। (১০) ত্রিপুরার পর্বতমালা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী ভূভাগই প্রাচীন সমতট। উহার উত্তরে গামো, খাগিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়। তাহার উত্তরে কামরূপ ও ডবাক রাজ্য। গারো পাহাড় হইতে নোয়াখালির সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত প্রায় ২৫০ মাইল হইবে। সুতরাং হরিকেল রাজ্য ব্রহ্মপুত্র হইতে ২৫০ মাইলের মধ্যে—অর্থাৎ ত্রিপুরার পর্বতমালার পশ্চিমে হইতে পারে না।

ঐচ্ছন্দ্রের তাম্রশাসনে হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু সমতটের নাম নাই। চন্দ্ররাজ প্রথমে হরিকেল ও পরে চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিলেন (১১)। মাঝে সমতট কি হইল এরূপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি বিক্রমপুর হইতে ভূমিদান করিতেছেন, প্রদত্ত ভূমিও ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়, কিন্তু কোথাও এই ভূভাগ জয়ের উল্লেখ নাই। শাসন-রচয়িতা চন্দ্ররাজের সমস্ত রাজ্যজয়ের কাহিনী না বলিয়া প্রথম হরিকেল জয় এবং শেষ চন্দ্রদ্বীপ জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। অনেক তাম্র-শাসনেই দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত বিজয়-কাহিনী গীত না-ও হইতে পারে। দাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র ‘বঙ্গোত্তর হরিকেলীয়াঃ’ বলিয়াছেন। অনেকের মতে ইহা গ্রন্থকারের ভুল। কিন্তু বঙ্গরাজ্য হয়ত সে দিন হরিকেল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোবিন্দচন্দ্রও ‘বঙ্গাল নরপতি’। বঙ্গাল দেশ ও চন্দ্রদ্বীপ অভিন্ন। কিন্তু বিক্রমপুর হইতে তাহার নামোৎকর্ষণ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ‘রূপচিন্তামণি’র ‘ঐহট্টো হরিকেলি’ এরূপ হরিকেল রাজ্যের ঐহট্টভুক্তি বুঝাইতেছে।

হরিকেল রাজ্য কখনও বঙ্গ, কখনও ঐহট্টের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অবস্থিত ছিল ত্রিপুরার পর্বতমালার পূর্ব দিকে এবং সমুদ্রতট পর্যন্ত তাহা বিস্তৃত ছিল।

সম্প্রতি অধ্যাপক ঐযুত নীলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হরিকেল ত্রিপুরা জেলার ঐকাইল হইতে অভিন্ন। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে ‘স’ বা ‘শ’ ‘হ’তে রূপান্তরিত হয়, বিপরীত হইতে পারে না। ঐকাইল বা বরদাখাত পরগণা কুমিল্লার উত্তর-পশ্চিমে এবং ত্রিপুরার পর্বতমালার পশ্চিমে। সুতরাং ইহা সমতটের অন্তর্গত। চন্দ্রগণ বোহিতাগিরিভূজাং বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বোহিতাগিরি বর্তমান লালমাই পাহাড়। ইহাও কুমিল্লার পশ্চিমে। এখানে একটি চন্দ্রবংশের স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। (১২) তাহাদের রাজধানী ছিল কাম্ভাস্ত্র নগর বা বড় কামতা। উহা সমতটের অন্তর্গত (১৩) লালমাইর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাট্টিকেরার রণমল্ল হরিকেল দেব নামক রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। (১৪) কান্তিদেবের তাম্রশাসনখানি কুমিল্লার দুই মাইল উত্তর-পূর্ববর্তী ইটাল্লা গ্রামে ছিল শুনা যায়। (১৫) শেবোক্ত দুইটি প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, এই দুই স্থান বোধ হয় এক সময় হরিকেলপতির অধীন ছিল। হরিকেলের চন্দ্রগণ এক সময় সমগ্র সমতট এমন কি চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার কিয়দংশ সময় সময় হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি অদস্তব নহে। কিন্তু প্রকৃত হরিকেল রাজ্য বলিতে বর্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চলই হইবে।

১০। Bargaon Insc. of Mahabhati Varman
Ed. by Dr. N. K. Bhattasali in J. R. A. S. B.
১১। D. C. Bhattacharjee in I. H. Q. vol xx No 1.

১২। ভারেন্দ্রা নর্দেবরলিপি। ১৩। ১৪। Dr. N. K. Bhattasali—A forgotten Kingdom of Eastern Bengal. ১৫। D. C. Bhattacharjee—Harikela and the Ruins at Mainamati I. H. Q. vol. x No 1. page 6.

আত্মনিবেদন

ঐশ্বর্যপূর্ণতানাম চট্টোপাধ্যায়

যবে জীবনের লীপশিখা হবে ক্ষীণ আর অবসন্ন,
আগুন নিভিবে রক্তে যখন অহুভূতি হবে ক্ষীণ
হ্রল হৃদি শিহরি উঠিবে সজ্ঞাও গতিহীন,
তুমি কাছে এসো, নিকটে আসিয়া আমারে করিয়ো ধ্বজ।

ইন্দ্রিয়-ছায়ে বেদনা-মলিন অবিখ্যাত নৈশ,
ছড়ানো ধূলার মন্ত বিভব সমুদ্রের পরিচয়
জীবনের শিখা সোহল বধন উল্লাস পেলনায়,
তুমি কাছে এসো, নিকটে আসিয়া আমারে করিয়ো ধ্বজ।

ভক্তি বধন মুক্তি লভিবে হীন-বিশ্বাস জন্ত;
শেষ ফাগুনের মৌমাছি যারা গানে আর দংশনে
শেষ স্তম্ভের বাসা বেঁধে মরে—মানুষের হবে মনে,
তুমি কাছে এসো, নিকটে আসিয়া আমারে করিয়ো ধ্বজ।

সাঁকের কিনারে অমর দিনের চিত্তা যবে অবসন্ন,
অগ্নিরা উঠিবে গোমূলি বেলায় মরণের উৎসবে
পৃথিবীর পাশ নিয়ে পিঁ আমি লীন হয়ে যাব যবে,
তুমি কাছে এসো, নিকটে আসিয়া আমারে করিয়ো ধ্বজ।

কয়েক জন নবীন সাহিত্যিক শরৎ-
চন্দ্রকে খিরিয়া বসিয়াছিল।

তিনি অধমুগ্ধিত নেড়ে গড়গড়ার
নলে একটি দীর্ঘ টান দিলেন; কিন্তু
যে পরিমাণ টান দিলেন, সে পরিমাণ
খোঁয়া বাহির হইল না। তখন নল
রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—

“আজ কাল তোমাদের লেখায়
‘প্রকৃতি’ কথাটা খুব দেখতে পাই।

পরমা প্রকৃতি এই করলেন; প্রকৃতির
অমোঘ বিধান এই হল, ইত্যাদি। প্রকৃতি বলতে তোমরা কি বোঝো
তা তোমরাই জানো; বোধ হয় ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা
হয়, তাই প্রকৃতি নাম দিয়ে একটি নতুন দেবতা তৈরি করে তার ঘাড়ে
সব কিছু চাপিয়ে দিতে চাও। ভগবানের চেয়ে ইনি এক-কাঠি বাড়ী,
কাবণ, ভগবানের দয়া-মায়া আছে, ধর্মজ্ঞান আছে। তোমাদের এই
প্রকৃতিকে দেখলে মনে হয়, ইনি একটি অতি আধুনিক বিদ্যুৎ তরুণী—
ব্রহ্মডে, পড়েছেন এবং কুসংস্কারের কোনও ধার ধারেন না।
মামুষের ভাগ্য ইনি নির্দয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত করছেন, অথচ মামুষের
ধর্ম বা নীতির কোনও ভোয়াম্বা রাখেন না।

এই অত্যন্ত চরিত্রহীন স্ত্রীলোকটির তোমরা নাম দিয়েছ—
প্রকৃতি। একে আমি বিশ্বাসসারে অনেক সন্ধান করেছি, কিন্তু
কোথাও খুঁজে পাইনি। একটা অন্ধ শক্তি আছে মানি, কিন্তু তার
বুদ্ধি-শক্তি আক্কেল-বিবেচনা কিছু নেই। পাগলা হাতীর মত তার
স্বভাব, সে খালি ভাঙতে জানে, অপচয় করতে জানে। তার কাজের
মধ্যে কোনও নিয়ম আছে কি না কেউ জানে না; যদি থাকে তাও
তোমাদের ঐ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত—অর্থাৎ নিয়ম আছে বটে
কিন্তু তার কোন মানে হয় না।”

চাকর কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল, শরৎচন্দ্র নলে মুহূ মুহূ
টান দিলেন।

সব চেয়ে পরিতাপের কথা, তোমাদের প্রকৃতি আটটি নয়; কিন্তু
তোমাদের মত আটটি। তার সামঞ্জস্য-জ্ঞান নেই, পূর্বাপর জ্ঞান
নেই, কোথায় গল্প আরম্ভ করতে হবে জানে না, কোথায় শেষ করতে
হবে জানে না, নোংরামি করতে এতটুকু লজ্জা নেই, মহেশ্বরের
প্রতি বিন্মুদ্রা শ্রদ্ধা নেই—ছন্নছাড়া নীরস একঘোষে কাহিনী ক্রমাগত
বলেই চলেছে। একই কথা হাজার বার বলেও ক্লান্তি নেই। আবার
কখনও একটা কথা আরম্ভ হতে না হতে বপাং করে শেষ করে
ফেলেছে। মুট—বিবেকহীন—বসবুদ্ধিহীন—

একবার একটা গল্প শেষ জমিয়ে এনেছিল; ক্লাইম্যাক্সের
কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ ভুল করে ফেলে।

গল্পটা বলি শোনো। গৃহদাহ পড়েছে তো, কতকটা সেই
ধরনের; তফাৎ এই যে, এ গল্পটা বলেছিল তোমাদের প্রকৃতি—অর্থাৎ
সত্য ঘটনা।

পানী পুকুরের তলায় যেমন পাক, আর ওপরে শ্যাওলা, সমাজেরও
তাই। পাক কুস্তী হোক, তবু সে ফসল ফলাতে পারে; শ্যাওলার
কোনও গুণ নেই। নিম্নলিখিত লঘু নিয়ে এরা শুধু জলের ওপর
জেস বেড়ায়।

কিন্তু তাই বলে এদের জীবনে ভীষতর কিছুমাত্র অভাব নেই।



শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরঞ্চ কৃত্রিম উপায়ে এরা অমৃত্যুভিত্তিক
এমন তীব্র করে তুলেছে, যে,
পক্ষরংয়ের নেশাতেও এমন হয় না।
সত্যিকার আনন্দ কাকে বলে তা
এরা জানে না, তাই প্রবল উদ্বে-
জনাকেই আনন্দ বলে ভুল করে;
সত্যের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই,
তাই খেচ্ছাচারকেই এরা পরম সত্য
বলে ধরে নিয়েছে।

ভূমিকা শুনে তোমরা ভাবছ গল্পটা

বুঝি তারি লোমহর্ষণ গোছের একটা কিছু। মোটেই তা নয়।
ইংরেজিতে থাকে বলে চিরন্তন ত্রিভুজ এও তাই—অর্থাৎ দুটি
যুবক এবং একটি যুবতী। সেই স্বরেশ, মহিম আর অচলা।

কিন্তু এদের চরিত্র একেবারে আলাদা। এ গল্পের অচলটি স্ত্রম্বরী
কুহকময়ী ফ্লামিনী—হৃদয় বলে তাঁর কিছু ছিল কি না তা তোমাদের
প্রকৃতি দেবীই বলতে পারেন। ছিল ভোগ করবার অতৃপ্ত তৃষ্ণা
আর ছিল ঈশক, মোহ, প্রগল্ভতা—পুরুষের মাথা খাওয়ার সমস্ত
উপকরণই ছিল।

ওদিকে মহিম ছিল দুর্দান্ত একরোখা গোঁয়ার; যুদ্ধের মনস্ত্রমে
সে টাকা করেছিল প্রচুর—ধনকুবের বললেও চলে। আর স্বরেশ
ছিল অত্যন্ত স্তম্ভক, ভয়ানক কুচুটে—কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে
মধ্যবিত্ত। টাকার দিক দিয়ে মহিমের সঙ্গে যেমন তার তুলনা হত
না, চোঁরার দিক দিয়ে তেমনি তার সঙ্গে মহিমের তুলনা হত না।
দু'জনে দু'জনকে হিংসে করত; বাইরে লৌকিক ঘনিষ্ঠতা থাকলেও
ভিতরে ভিতরে তাদের সম্পর্কটা ছিল সাপে-নেউল।

এই তিন জনকে নিয়ে পানী-পুকুরের ওপর ত্রিভুজ রচনা হল।
কিন্তু বেশী দিনের জন্তে নয়। কিছুদিন অচলা এদের দুজনকে
খেলালে, তার পর ঠিক করে নিলে কাকে তার বেশী দরকার। সে
কালে কি ছিল জানি না, কিন্তু আজ-কালকার দিনে যদি কুবের আর
কন্দর্প কোনও রাজকুন্ডের স্বয়ংবর-সভায় আসতেন, তাহলে কুবেরের
গলাতেই মালা পড়ত, কন্দর্পকে তীর ধমুক গুটিয়ে পালাতে হত।

মহিমের সঙ্গেই অচলার বিয়ে হল। স্বরেশ বেশ হাসিমুখে
পরাজয় স্বীকার করে নিলে; কারণ সে বুঝেছিল, এ পরাজয় শেষ
পরাজয় নয়, মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম চক্রর মাত্র। হয়তো সে অচলার চোখের
চাউনি থেকে কোনও আভাস পেয়েছিল।

একটা কথা বলি। প্রেমিকেরা চোখের ভাষা বুঝতে পারে,
এমনি একটা ধারণা আছে—একেবারে মিথ্যে ধারণা। প্রেমিকেরা
কিছু বোঝে না। স্ত্রীজাতির চোখের ভাষা বুঝতে পারে শুধু লস্কট।

বিয়ের পরে এক দিন মহিমের বাগানে চায়ের জলসা ছিল।
জমজমাট জলসা, তার মাঝখানে স্বরেশ বললে,—“মহিম, তুমি শুনে
সুখী হবে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তবে নেহাৎ সিপাহী সঙ্গে নয়;
ঠিক করেছি পাইলট হয়ে যাব।”

একটু দ্রোণ করে মহিম বললে,—“তাই না কি। এ দুর্ঘটি হল
যে হঠাৎ?”

স্বরেশ হেসে উত্তর দিলে,—“হঠাৎ আর কি, কিছু দিন থেকেই
ভাবছি। এ দুর্ঘটনাতো তোমার আমার মতন লোকের জন্মেই হয়েছে;
অর্থাৎ আমার মত লোক যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর তোমার মত
লোক টাকার পিঁয়াদি তৈরি করবে।”

মহিমের মুখ গবম হয়ে উঠল, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারলে না ; সে ভারী একরোখা লোক কিন্তু মিঠাভাবে কথা কাটাকাটিতে পটু নয় ।

আকাশে একটা এরোপ্লেন উড়ছিল ; তার পানে অলস কটাক্ষপাত করে সুরেশ বললে,—“আমার পাইলটের লাইসেন্স আছে কিন্তু প্লেন নেই । তোমার প্লেনটা ধার দাও না—যুদ্ধ করে আসি । যদি ফিরি প্লেন ফেরৎ পাবে ; আর যদি না ফিরি, তোমার এমন কিছু গায়ে লাগবে না । বরং নাম হবে ।”

রাগে মহিম কিছুক্ষণ মুখ কালো করে বসে রইল, তার পর কড়া একগুঁয়ে স্বরে বলে উঠল—“তোমাকে প্লেন ধার দিতে পারি না, কারণ, আমি নিজেই যুদ্ধে যাব ঠিক করেছি ।”

বলা বাহুল্য, দু’মিনিট আগেও যুদ্ধে যাবার কল্পনা তার মনের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না ।

মাস দু’য়ের মধ্যে মহিম সব ঠিক-ঠাক করে, এরোপ্লেন চড়ে যুদ্ধে চলে গেল । যাবার সময় উইল করে গেল, সে যদি না ফেরে অচলা তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে ।

সুরেশের কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া হল না । বোধ করি, ধারে এরোপ্লেন পাওয়া গেল না বলেই তার যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জনে দেওয়া ঘটে উঠল না ।

বন্ধুর আকাশে তখন যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া বাজছে ; বেঁটে বীরেরা ছুঁছু করে এগিয়ে আসছে । ভারতবর্ষও গেল-গেল রব । যারা পালিয়ে আসছে তাদের মুখে অদ্ভুত রোমাঞ্চের গল্প ।

মহিম ফুটে যুদ্ধ করছে । তিন মাস কটিল । এ দিকে মহিমের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই উৎসব চলছে ; গান-বাজনা নাচ নৈশ-ভোজন ।

স্বামীর কথা ভেবে ভেবে অচলার মন ভেঙ্গে না পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তো । সে দিকে সুরেশ খুবই দৃষ্টি রাখে ; সর্বদাই সে অচলার সঙ্গে আছে ।

দুপুর রাত্রে যখন আর সব অতিথিরা চলে যায়, তখনও সুরেশ অচলাকে আগলে থাকে । যে দিন অতিথিদের শুভাগমন হয় না, সে দিন সুরেশ একাই অচলার চিন্তা-বিনোদন করে ।

ক্রমে লোকলজ্জার আড়াল-আবলগও আর কিছু থাকে না, তোমাদের প্রকৃতি দেবী ব্যাপারটাকে নিতান্ত নির্লজ্জ এবং শ্রীহীন করে তোলেন ।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহিম নিয়মিত চিঠি পায় ; বন্ধু-বান্ধবের চিঠি, অচলার চিঠি । বন্ধু-বান্ধবের চিঠিতে ক্রমে ক্রমে নানা রকম ইসারা-ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগল ।

নিতান্ত ভালমাসুকের মত তাঁরা অচলার জীবন-যাত্রার যে বর্ণনা লিখে পাঠান, তার ভিতর থেকে আসল বক্তব্যটা ফুটে ফুটে বেরোয় । মহিম গৌরৱের বটে কিন্তু নীরোহ নয়, সে বুঝতে পারে ।

অচলার চিঠিতে মামুলি শুভাকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের বাঁধা গৎ ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকে না, তাও ক্রমশঃ এমন শিথিল হয়ে আসতে লাগল যে মনে হয়, ঐ মামুলি বাঁধি গৎ লিখতেও অচলার আসতে লাগল ।

মহিমের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না । মনে মনে গর্জতে লাগল ।

সে ছুটির জন্তে দরখাস্ত পাঠাল, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হল না । যুদ্ধের অবস্থা সতীন ; এখন কেউ ছুটি পাবে না ।

এই সময় মিত্রপক্ষের এক দল বিমান শত্রুর একটা বাঁটির বিরুদ্ধে অভিযান করল ; মহিমকে যেতে হল সেই সঙ্গে । তুমুল আকাশ-যুদ্ধ হল । মিত্রপক্ষের কয়েকটা বিমান ফিরে এল, কিন্তু মহিম ফিরল না । তার অলস প্লেনখানা উদ্ধার মত যুদ্ধের আকাশে মিলিয়ে গেল ।

মহিমের মৃত্যু-সংবাদ যখন কলকাতায় পৌঁছল, তখন পানা পুকুরের মাঝখানে ঢিল ফেলার মত বেশ একটা তরঙ্গ উঠল । কিন্তু বেশী দিনের জন্তে নয়, আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল ।

অচলা কালো রঙের শোক-বেশ পরল কিছু দিনের জন্তে ; তার পর মহিমের উইল অনুসারে আদালতের অহুমতি নিয়ে তার সম্পত্তির খাস মালিক হয়ে বসল ।

সুরেশ এত দিন একটা আলাদা বাড়ী রেখেছিল, এখন খোলাখুলি এসে মহিমের বাড়ীতে বাস করতে লাগল । যার টাকা আছে তাকে শাসন করে কে ? দু’জনে মিলে এমন কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে যা দেখে বোধ করি ‘ভেলু’রও লজ্জা হয় ।

মহিম কিন্তু মরেনি । তার আহত প্লেনখানা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুরূপে এসে আসামের জঙ্গলের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল । মহিমের চোট লেগেছিল বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয় । তার পর সে কি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আশী মাইল খাঁটা-পথ চলা শেষ পর্যন্ত রেলপথে কলকাতা এসে পৌঁছল, তার বিশদ বর্ণনা করতে গেলে শিশু-সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায় ।

মোট কথা, সে কলকাতা ফিরে এল । সে যে মরেনি এ খবর সে মিলিটারি কর্তৃপক্ষকে জানাল না ; তার বেঁচে থাকার খবর কেউ জানল না ।

কলকাতায় এসে সে একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটеле ছদ্মনামে ঘর ভাড়া করে রইল ।

সেই দিনই সে স্বেচ্ছাপত্র একটা খবর দেখল—মহিমের বিধবা রেজেন্ট অফিসে সুরেশকে বিয়ে করেছে ; আজ রাত্রে তার বাড়ীতে এই উপলক্ষে লোজ ।

সহরের গণ্যমান্য সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন ।

মহিম ঠিক করল, আজ রাত্রে লোজ যখন খুব জমে উঠবে, তখন সে গিয়ে দেখা দেবে ।

ভেবে দেখা ব্যাপারটা । চরিত্রহীন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর দু’মাস যেতে না যেতেই স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীক বিয়ে করেছে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ স্বামী চলেছে প্রতিশোধ নিতে ।

গল্প জমাট হয়ে একেবারে চরম ক্লাইমেক্সের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । তার পর কি হল কও দেখি ?

কিছুই হল না ।

মহিম সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ীতে যাবার জন্তে যেই রাস্তায় পা দিয়েছে অমনি এক মিলিটারী লরি এসে তাকে চাপা দিলে ।

তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল, তার মুখখানা এমন ভাবে খেঁতো হয়ে গেল যে, তাকে সনাক্ত করার আর কোনও উপায় রইল না ।

ওদিকে অচলার বাড়ীতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভোজ চলল । গণ্য-মান্য অতিথিরা আশী টাকা বোতলের মদ খেতে রাত্রি তিনটের সময় হর্যধনি করতে করতে বাড়ী ফিরলো ।

কত বড় একটা ড্রামা শেষ মুহূর্তে এসে নষ্ট হয়ে গেল, তা তারা জানতেও পারলে না ।

তাই বলছিলাম, তোমাদের প্রকৃতি সত্যিকার আটিষ্ঠ নয় । ক্লাইমাক্স বোঝে না, poetic justice জানে না—কেবল নোংরামি আর বাজে কথা নিয়ে তার কারবার । সত্যি কি না তোমরাই বল ।”

শরৎচন্দ্র নলতা তুলিয়া গইরা তাহাতে একটা বিলম্বিত টান দিলেন ; কিন্তু কলিকাটা গড়গড়ার মাথায় পুড়িয়া পুড়িয়া নিশেষ হইয়া গিয়াছিল ।

যোঁরা বাহির হইল না ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা শুধু নয়, আফ্রিকা ও আমেরিকার প্রাচীন বর্ষের প্রেরণা বার বার অতিমানব, বিশ্বমানব বা মহামানব কল্পনায় অগ্রসর হয়েছে। তাতে করে সারা বিশ্বে সভ্যতা ও শীলতাগত একটা অধ্যাত্ম পরীক্ষণ হয়েছে শুধু ধ্যানের চরম সীমান্ত সম্পর্কে নয়—রূপ রস গন্ধের নব নব বিশ্বসৃষ্টিতে—সমগ্র মানবের ইতিহাসে। এ ইতিহাস অতি বিশ্বযজ্ঞক এবং সকলেরই অধ্যয়নের একটি চরম অর্থ।

সকল ইতিহাসেই পিতার পিতৃষ, দলপতির প্রভুষ, নৃপতির দণ্ড বা গুপ্তর নির্দেশ জমটি হয়েছে একটি উচ্চতর শক্তির উৎস কল্পনায়। মানুষ কাকেও নিজের শীর্ষভাগে রেখে অগ্রসর হ'তে ইতস্ততঃ করেনি, —প্রভু সে চিরকাল মেনে এসেছে একটি হুকৌশল অধ্যাত্ম শাসনে এবং এই প্রভুকে দেবত্ব রূপান্তরিত করে সে আশ্বস্ত হয়েছে। এর ভিতর কোথাও কোন অসংলগ্নতা সে খুঁজে পায়নি। রক্তমাংসের মানবকে দেবতার উচ্চ পাদপীঠে স্থাপন করা তার পক্ষে কোন ছেয় কাজ হয়েছে, একথা সে চিন্তাই করেনি। মানুষ দেবতা নয়—কারণ, তাকে দেহ-সীমার ক্ষুদ্র নিগড়ে অহরহ আবদ্ধ থাকতে হয়। মানুষের এই বাস্তবতার কটকশয্যা তাকে আকাশচাঁরা দিব্য হ'তে বঞ্চিত করলেও এই বাধা ও শৃঙ্খলকে মানুষ উদ্ধমানব কল্পনায় বহু স্থলে অস্বীকার করে অগ্রসর হয়েছে।

সকল সভ্যতার এই সাধনা একটা সাধারণ মধ্য বিন্দুকে স্বীকার করায় সভ্যতার সৃষ্টি ও কৃতিত্ব বিচারের পক্ষে এই রূপসৃষ্টি একটি কষ্টি-পাথরের মত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মূল্য নির্ধারণ এ প্রসঙ্গে অসম্ভব নয় এবং অজ্ঞাত সভ্যতার চরম কৃত্যকেও এ ব্যাপারে তুলনার ক্ষেত্রে বিচার করা যেতে পারে।

এটা ঠিক দেবরচনার ক্ষেত্রে নয়—দেবকল্পনা ও রচনা জমটি হয়েছে স্বর্গকল্পনা হ'তে—একটা উচ্চতর ঐশী জগৎ সম্পর্কে। মহামানব স্বর্গ ও মর্ত্যের দেতুর মত—এ ছুটি বিপরীত জগৎ মহামানবের ভিতর একা লাভ করেছে, এ জগৎ এই সৃষ্টির ইন্দ্রজাল চিরকাল মানব-সমাজকে আনন্দ দান করেছে।

গ্রীক সভ্যতা অতিমানব কল্পনার চরম সফলতায় আসতে পারেনি, এজ্ঞ মানুষকে দেবতা না করে এই সভ্যতা দেবতাকে মানুষ করেছে। তারা স্বর্গের দেবতাকে পার্থিব আবেষ্টনে স্থাপন করেছে। দেবতারা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং আহতও হয়েছে। বস্তুতঃ, গ্রীক সভ্যতায় দেবতারা মানুষের পর্যায়ে ঢুকেছে। উল্লেখ অধের ভিতর নামান হয়েছে। অধের পক্ষে উল্লেখ উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এটা গ্রীক সভ্যতার পক্ষে গৌরবের কথা নয়। মানুষরা যে “অমৃতের সন্তান”—এ জ্ঞান গ্রীকদের ধারণাতীত ছিল। গ্রীকেরা ছিল প্রত্যক্ষতার ও সাম্যোপায়ের অমুরাগী, যাকে জার্মান ভাবুক Spengler বলেছেন—“a sense of the near”。 দূরদৃষ্টি ও অক্ষুরস্ত অসীমের জ্ঞান গ্রীকদের মনঃপূত ছিল না। এ জ্ঞান অসীমত্বের মুকুট ছেড়ে গ্রীক দেবতারা সীমার জোড়ে স্থান পেয়েছিল। গ্রীকদের Hercules অতিমানব নয়—Socratesও নয়। দৈহিক বা মানসিক শক্তি সেখানে সীমার বজাঘাতে বার বার নিজেদের অক্ষমতা নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করেছে।

প্রাচ্য সভ্যতার সীমার স্পর্ধা কখনও অসীমকে সিংহাসনচ্যুত করেনি। পার্শ্বসারথি ক্রীকৃষ্ণ রথাক্ত হয়েও বিশ্বব্যাপী রূপের অধিকার

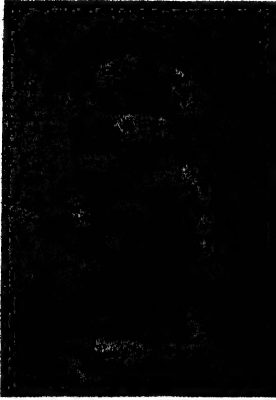
হ'তে বঞ্চিত হননি। সমগ্র জগদ্ব্যয় ক্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপকে সারথ্যকৃত্যের সীমা কখনও কুঞ্জকটিকায় ঢাকেনি। সীমার ভিতর হতেও অতিমানব অসীমের হিল্লোলিত মুকুরে অক্ষুরস্ত ভাবে বিধিত হয়েছে। অপর দিকে গ্রীক এপোলো কলিত হয়ে পড়লেন অধোজগতের মাংস-পেশীযুক্ত মানুষের মত সীমাবদ্ধ হস্তপদের নিগড়ে আবদ্ধ—কোন রকম অসীমত্বের কল্পনা গ্রীকের কল্পনা-মুকুরে বিধিত হল না। উল্লেখ জগতের দেবতা হয়ে পড়লেন অধোজগতের ভদ্রবেশী স্তম্ভকৃষ মাত্র। দেবতার এই মানবীয় মুখশ্রীতে তুরীয় জগতের কোন লীলাপ্রসঙ্গ জ্যোতিত হয়নি। এ জগৎ রাসকিন (Ruskin) বলেছেন, গ্রীক দেবতার মুখে কোন ভাবপ্রসঙ্গই নেই—একটা শূন্যগর্ভ মাংসল শ্রী আছে মাত্র :—
“A Greek never expresses a personal character.”

মিশরের সভ্যতা খুব প্রাচীন। জগতের এই প্রাচীন সভ্যতাকে বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। সব চেয়ে হুকৌশল হয়ে পড়ে মৃত্যুপ্রসঙ্গ—মানুষের বিচিত্র জীবনপথে। এই সভ্যতা ‘আত্মা’ কল্পনা রচিল কতকটা পারস্য সভ্যতারই মত একটা উড়ন্ত বিহঙ্গের মত। তাদের বিশ্বাস হল, এই আত্মা দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গেলে মানুষের মৃত্যু হয়—আবার কিছু কাল পরে এই আত্মা ফিরে আসে এবং যদি অক্ষত ভাবে মৃতদেহ বা কোন ছব্বই দেহপ্রতিমা পায় তবে তাকে আবার জীবন দান করতে পারে। এ জগৎ আত্মা যাতে ফিরে এসে মৃতদেহকে উজ্জীবিত করতে পারে, এর রকম ব্যবস্থা করতে মৃতদেহ রক্ষা বা মমির রচনায় (mummy) ব্যবস্থা করে। পাছে মৃতদেহ নষ্ট হয়ে যায়, সে জগৎ পাথরের “কামুর্ত্তি”ও রচিত মূর্ত্তি। এ সব একেবারে ছব্বই মূর্ত্তি। এর ভিতর অতিমানবত্বের প্রশ্ন নেই, মৃত্যুর জটিলতা ভেদ করার উৎসাহই এ ক্ষেত্রে সকলকে অহুপ্রাণিত করেছে। মানুষের অসীম জীবন বা অমৃতত্ব এ ক্ষেত্রে কল্লিত হয়নি।

অপর দিকে মিশর অতিমানবত্বের অপেক্ষাকৃত সন্ধান মুকুট দান করেছে নিজের নৃপতিকে। রাজরাজ খাফ্রান পিরামিড রচনা করেন জ্বরলক্ষ্য শাসনে নয়, অত্যাচারের লৌহচাপে। এ রাজার সৈন্যসামন্তাই ছিল না—মিশর তাত্ত্বিকদের গবেষণা হ'তে এর রকম অহুমান করতে হয়। শুধু নৃপতির মেহসর্কষ পিতৃষই হাজার হাজার লোককে এই কার্যে প্রেরণা দেয়—জগতের ইতিহাসে একদম দৃষ্টান্ত আর আছে কি না সন্দেহ। এই অতিমানবের রচনা মিশর কি ভাবে সকল করে? খাফ্রানের মূর্ত্তিতে আছে পিতৃষের ঐশ্বর্য, মমতা ও আত্মপ্রতীতি। কঠিন সঙ্কল্প, হলভ উত্তম এবং এক বুদ্ধকর প্রশান্ত উদারতা এ মূর্ত্তির সমগ্র বেগনৌকে আচ্ছন্ন করে আছে। এ মূর্ত্তিকে মিশরী সভ্যতার প্রতিমা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সম্পৃষ্ট হয় অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জীবনের যে স্বচ্ছ বিশ্ব মানুষকে প্রভাতোরণের মত বিরে আছে, মিশরের ঐহিক চোখে তা পড়েনি। ঐহিকতার বিপুল আয়োজনে এই মানবমূর্ত্তি মণ্ডিত সন্দেহ নেই—কিন্তু মানুষের এটাই শেষ বা একমাত্র কথা নয়। মানুষ আর একটি জগতের সূক্ষ্মতম হিল্লোলেও অহুপ্রাণিত বা তাকে ভারতবর্ষে বসতে উৎসাহিত করেছে :—ঈশাবাস্যামিৎ সর্বঃ যঃ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” ঐহিকতার কঠিন নিগড় মানুষকে ধ্বংস করে—প্রমিথিয়সের (Promethes) বিলাল কঠিন শৈলথণ্ডে আহত ও জীর্ণ হয়ে থাকাই তার শেষ অধিকার কল্লিত হয় এবং কখনও বা চক্রের মত ধূমায়িত জগতের উড়ন্ত ও চলন্ত বাস্তবতা হ'তে খলিত

হয়ে দীর্ঘনিশ্বাসে প্রতি মুহূর্তকে ফেনিল করাই হয়ে পড়ে চরম কৃত্য। খায়ানার মূর্তিতে সীমা ও অসীমের কোন মিলন-বন্ধু নেই। এই মূর্তির কল্পিত ব্যাপকতাও তাই শোনপক্ষীর মত আকাশচ্যুত হয়ে বৃক্ষ-কোটরে নিজের সনাপ্তি খোঁজে।

প্রতীচ্য সভ্যতার ইতিহাস যখন খৃষ্টীয় তত্ত্বের সহিত মিশ্রিত হ'ল, তখন সে দেশে উঠল অভিনব সমস্যা। কারণ, খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রীক ও রোমক ঐহিকতা ও মাংসল বাস্তবতাকে বন্দনা করতে অস্বীকার করে। খৃষ্ট ধর্ম জানালে "Spirit is life Flesh is death।" আবার এই ধর্ম বোষণা



খৃষ্ট (যুরোপ)

শিল্পী—সার এডোয়ার্ড বার্ণেজ জোলস



আদম (যুরোপ)

শিল্পী—এপ শিল্পী



বুদ্ধ (ভারত)

করলে "সমগ্র পৃথিবীও হারান ভাল তবু আত্মাকে বজ্রন অশ্রয়ঃ।" এ স্বকম উদ্ধৃতি বাক্যবিজ্ঞান প্রতীচ্য সভ্যতার উপর আর একটি কল্পনার হিমাত্রিক প্রতিষ্ঠা করে যা কখনও সে দেশে ছিল না।

এই তত্ত্ব জন্মশঃ একটা নূতন জগৎ বিধিত করার চেষ্টা করল অভিনব কলাকলির ভিতর দিয়ে। খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব একটা দীপশিখার মত এই ঘটনায় সকলকে উদ্দাহিত করলে। অজ্ঞ মানবের প্রস্তুত প্রতিমা রচনা করে খৃষ্টীয় তত্ত্বের একটা পর্যাপ্ত মুকুর স্থাপ্তি করাই পূর্ব-পশ্চিমের চরম সাধনা। শিল্পীরা নানা ভাবে মহামানব কল্পনায় অগ্রসর হ'ল।

ফলে কি দাঁড়াল ? ইউরোপীয় শিল্পতার চরম মনন ও অধ্যয়ন জগৎকে কি দান করল ? ইউরোপের ইতিহাসে তার দূরপাণে তিলক আছে। রিশোর্শায়ের বিখ্যাত শিল্পী রাসেল তাঁর Resurrection চিত্রে বাঁশুর যে চিত্র আঁকল তা হল একটা জন্মকাল নাট্যস্থলত আয়োজনের রূপক মাত্র। তা হয়ে পড়ল "Flesh is death" এর নমুনা, মাংসল-প্রাচুর্য ও ইন্দ্রিয়জ বহ্বারম্ভ মাত্র—তাতে সামান্য অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জক বা অসীমের নিবেদন নেই। মাইকেল এঞ্জেলো 'The Last Judgment' চিত্রে খৃষ্টকে আঁকল একটা অতিরিক্ত মাংসপেশীযুক্ত পালোয়ানের মত। শারীরিক আড়ম্বরের সাহায্যে আত্মার বিরাট প্রতিপাদিত হয় না, অথচ কোন উপায়ে এই অতীন্দ্রিয়ের ওতপ্রোত সভাকে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে, তার কোন উপায়ই এ সব রিশোর্শায়ের শিল্পীরা খুঁজে

পেল না। নূতন নূতন পরীক্ষা চলল এবং ছবি আঁকা শুরু হ'ল, কিন্তু খৃষ্টের বাইবেল-নির্দিষ্ট মূর্তি কেউ আঁকতে সক্ষম হ'ল না—সেই রূপের ভাষা পশ্চিমের আবহাওয়ায় কেউ আয়ত্ত করতে পারেনি। Giorgione ক্রশবাহী খৃষ্ট, বা অজ্ঞ শিল্পীর কাঁটার মুকুটে সজ্জিত কোথাও অসীমের কোন সীমান্তে উপস্থিত হ'তে সক্ষম হল না। এদের আংশিক সফলতা উদ্ধৃত্যের সত্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। মোজায়িক বিষয় খৃষ্ট, বাইজেন্টাইন (Byzantine) শিল্পতার জীর্ণ

ও জরামণ্ডিত অবসন্নতার পথেই গেছে। রিশোর্শায়ের ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য বিপরীত পথে গেছে মাত্র। নব্যতর শিল্পীরাও এ যুগে এ সাধনায় বার বার আত্মহারা হয়েছে ইউরোপে। শিল্পী Sir Edward Burne-Jones এ প্রমুখে একবার বলেছেন :—The more I recall the efforts I have made to express the face of Christ the more discontented I am with them. I do not think there is one which can be looked upon as any thing but a failure. এই শিল্পী খৃষ্টকে হৃদয় কেশদাম-শোভিত, প্রাচ্য পরিচ্ছদপুষ্ট করেও অধ্যাত্ম-মাধুর্য-মণ্ডিত করতে পারেনি।

নব্যতর শিল্পীরা অজ্ঞ ক্ষেত্রেও এই মহামানব বা অতিমানব কল্পনার পথে অগ্রসর হয়েছে। রোদীনা (Rodin), ব্যালজাক (Balzac) মূর্তিতে এক জন্মাত ব্যর্থতাকে প্রাণদান করেছে। একটা আড়ষ্ট আয়োজনের ভিতর দিয়ে অমৃতের সন্তানকে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত এপষ্টিনের লিষ্টার গ্যালারীতে রক্ষিত আদমের মূর্তিতে মহামানবের অজ্ঞ দেহগৌরব, ব্যাবহারিক স্বজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়-বিমুখ দার্ঢ্যকে শুধু উপাদানগত plastic ঐখ্যে রূপদান করতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাতে তা হয়ে পড়েছে নব্য আর্টের নমুনামাত্র, অথচ রসাত্মক বহুমুখী রূপাবর্তমণ্ডিত অতিমানব নয়। এই ভাবে ব্যর্থতাই যেন বিধরূপ ধারণ করেছে।

ভারতবর্ষে অতিমানবের রূপসাধনার মঞ্চে এসে সকলকে এ জড়ই



গোমতেশ্বর

সত্যি।

শ্রীশোভা বসু

কিছু দিন হ'ল কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছি—অজ্ঞাত থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া কলেজের বোর্ডিং থাকি। এখানে নিজেকে অত্যন্ত খাপছাড়া লাগিতেছিল—চলনে-বলনে অশনে-ভূষণে কোথাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে পারিতেছিলাম না। কেবল ইহাই আমার মানসিক অস্থিরতার একমাত্র কারণ বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কারণ ছুটিয়াছিল আর একটি—তিনি আমাদের বোর্ডিংএর সুপারিন-টেন্ডেন্ট স্বয়ং। আসিয়া অবধি তাঁহার মেজাজের তাল পাইতেছিলাম না। তিনি এক একদিন এমন এক-একটি মুক্তি ধরিতেন যে, তুলনায় দশমহাবিজ্ঞার ছিন্নমস্তার মুক্তি মান হইয়া যায়।

তাঁহার এই মেজাজের কারণ নির্ণয় করিবার জন্ম বহুবার মেয়েদের বৈঠক বসিয়াছে। সাইকলজি-অনার্সের মেয়েদের প্রায়ই তলব পড়িয়াছে, ইতিহাসের মেয়েরা কত ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে—প্রাক্তন ছাত্রীদের দ্বারা প্রচারিত তাঁহার পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করিয়া কত প্রমাণ খাড়া করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই।

যত দূর জানা যায়, তাহাতে তাঁহার পূর্ব ইতিহাস এই পর্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে—পিতা রেক্সন সহরের এক জন নামজাদা ব্যারিষ্টার ছিলেন। মাতুল-বংশ ধনী ও সম্ভ্রান্ত। কুরুপের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিলাত যাইবার খরচ দিয়া কছার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে জামাতা কেবল কৃতিত্বের সহিত বার-এট-ল হইয়াই ফেরেন নাই, বিলাতী আদব-কায়দায় ও নৃত্যগীতেও যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করিয়া আসিয়াছেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই বেশ পসার জমিয়া উঠিল। বিদেশী-মহলেও নিজের আসন কায়েমী করিয়া লইতে দেবী হইল না। আজ চ'এ নিমজ্জ, কাল গুণিনাচে—

রোমান্সিত হতে হয়। কোথাও কোন পৌনঃপুনিক পরীক্ষণ বা বজ্রনের চক্কল ছায়া এখানে দেখা যায় না। এ দেশে বুদ্ধমুগ্ধি কল্পনায় মাংসল ইন্দ্রিয়মুখিতা নেই, অপর দিকে ইন্দ্রিয়বিমুগ্ধ শুষ্ক বিষয় কঙ্কালিত কৌতূহলও নেই। সুপূর্ণ মাংসল দেহ অথচ আত্মসমাহিত, সংযত ও অন্তঃস্বাধীন একাগ্রতা বুদ্ধমুগ্ধিকে দান করেছে এক অপরূপ শ্রী, যাতে সীমা ও অসীমের যুগ্ম সমাবেশ হয়েছে। তেমনি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিতে আমরা পাই ব্যাপক ইন্দ্রিয়মুগ্ধকারী শ্রী মাত্র নয় এক হৃৎস্পন্দ, দুর্বোধ্য, ও অক্ষরন্ত লীলাকদম্ব—সীমার বৃত্তে অসীমের প্রকাশের মত। এতে প্রমাণিত হয়, matter ও spirit-এর এই বিরুদ্ধ ব্যঞ্জনা ভারতের তব্ধেই পূর্ণভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। নৈকট্য ও দূরত্ব যে একই দৃষ্টির দু'টি দিক মাত্র, একান্ত ভাবে কোনটাই চরম সত্য নহে, এ কথা ভারতবর্ষই জানত—

“তদেজতি তন্নৈজতি তদদৃবে তদ্বৃত্তিকে”

এই দু'টি বিপরীত দিকের সমাহার হতেছে ভারতীয় শিল্পের অতিমানব কল্পনায়। এই সোনার হরিনের পেছনে সমগ্র জগৎ ঘুরেছে—কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও তাকে 'কেউ আয়ত্ত করতে পারেনি।

হঠাৎ এক দিন দেশ হইতে তারবাগে কজাসহ শব্বরের আগমন-বার্তা পাইয়া তড়িৎবেগে বাস্তব জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। হৈমদির দৃশ-সম্পর্কীয় এক বোন তিন সত্যি দিয়া বলিয়াছেন—জামাতা বাবাজী না কি একেবারে বঙ্গ জাতিকে রাতে-দিনে মেম তৈরী করিবার জন্ম সেলুনে লইয়া গিয়া 'বব'হাঁট দিতে চাহিয়াছিলেন, জ্ঞী না কি দুই পায়ে ধরিয়া এমন জন্মদান ছুড়িয়া ছিলেন যে, তাঁহাকে অবশেষে সংকল্প ভাগ্য করিতে হয়। এই সকল কিংবদন্তী না কি রেক্সন সহরের আবালবৃদ্ধ সর্কলেট জানে। জ্ঞী পাশ্চাত্য ভাবে প্রণোদিত স্বামীর সহিত খাপ খাইতে না পারিয়া কেমন যেন বিমনা হইয়া থাকিতেন। শোনা যায়, শেষে মস্তক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। দু'টি কণ্ঠা জন্মিয়াছিল—প্রথমটি আমাদের হৈমন্তিকা দেবী, দ্বিতীয় কণ্ঠা বিকলাঙ্গ।

হৈমদি বরাবর সাহেবদের স্কুলে-কলেজে পড়িয়া বাঁটি মেম বনিয়াছেন। বাংলা বলিতে পারিলেও লিখিতে পারেন না—ইহাই তাঁহার মস্ত গর্বের কারণ। কিন্তু পিতার মৃত্যুর সঙ্গেই সংসারের চাকা সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া মোড় ফির্বিল। উত্তরাধিকার-স্বত্ব পিতৃধন সামান্য পাইলেও দু'টি জবর রকমের গুণ পাইলেন—বদ-রাগ ও স্বজাতি-বিরোধ। ইহার সহিত মায়ের রূপটুকু মিলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল।

সুতরাং 'সোসাইটিতে' প্রবেশ-মুখেই পারিবারিক বিপর্যয়ের দরুণ চাকুরীর তল্লাস করিতেই এই চাকুরী মিলিয়া যায়। তিনি না কি এমন সব কাণ্ড-কীর্তি করিয়াছেন, যাহা একমাত্র ঐতিহাসিক পুরুষেরই সম্ভব। এই সব কাহিনী বোর্ডিংএর কুড়ি বছরের পুসাতন মেইন মাসীমা আর রামী ও বামী দুই পুরাতন বি. রায়ে হৈমদির অগোচরে সালসার বসিয়া থাকে। তাহাদের জ্ঞোতা প্রথম হারিত জৈন

ছাত্রীরা। বাকীকে না কি রাগিয়া একটা চড় মারিয়াছিলেন, সেই অবধি বাকী অত্যন্ত চটিয়া আছে—সুযোগ পাইলেই বিবোলাধীন করে। তাহার প্রচারকার্য দেখিলে স্বয়ং গোয়েবলস্ও তারিফ না করিয়া পারিতেন না।

বোর্ডিং-এ আসিয়াছি এক নাম, ইতিমধ্যেই হৈমদির অভ্যাসগুলি আমাদের একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ, এমন রুটিন-বান্ধা জীবন আর বড় একটা চোখে পড়ে না। আর এই বান্ধা জীবনের বোলা জলের পাকে কত জন যে হাবুডুব খাইয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে। সান্তনা বাজিয়াছে কি ঠাক সুনীলাম, “বাকী চা আন।”

বাকী চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া ‘ট্রে’ লইয়া ঝাঁকানিতে ঝাঁকানিতে অগ্রসর হইবা মাত্র ধমক খাওয়া দ্বিগুণ ঝাঁকানি দিয়া থামিয়া গেল।

হৈমদি গজ্জাইয়া উঠিলেন, “তোমায় দিয়ে চলবে না। পথ দেখ—চা ঢেলে এ কি কাণ্ড করছে? মুইসেন। বত সব বাঙ্গাল!”

কিন্তু বাকীকেও সন্দেহের পাইয়াছে—ইহা তাহার অভ্যাসে পড়িয়া গিয়াছে।

দশটা বাজিতেই অমিরের পোষাক পরিয়া সমস্ত বোর্ডিং-এ একবার চহল দিয়া মেয়েদের খাইবার ঘরে আসেন। সেদিন রবিবার—হৈমদি আসিয়া দ্রুত চোখ ঢালাইয়া দেখিলেন সব মেয়েরা আসিয়াছে কি না। ২নং টেবিলের তৃতীয় স্থানটি খালি পড়িয়া আছে।

“কে আসিনি?” রেখার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেখা শেষ কাটাখাইবার ভক্ত জবাব দিল, “সম্ভবতঃ বাকী আজ বাড়ী গেছে, ভুল ক’রে তাদের কাকুর জায়গা করে ফেলচে।”

এমন সময় স্বপনার কণ্ঠস্বর বাথ-রুম হইতে শুনা গেল। স্বপনা কল ধুলিয়া গান ধরিয়াছে “ক্যাসে ছিপোপে অব তুম...”। হৈমদির শ্রবণে পশিবা মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কার গলা শুনিচ্? নিশ্চয় স্বপনা। ও এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।” ভাতের সঙ্গে আরও কিছু বরাদ্দ হইল।

বিকাল পাঁচটার সময় রোজই দেখা যায় ঝংঝংয়ের শাডী পরিয়া হলুদ রংএর দুই রঙের আঁটা দুটি বিলুপী ছলাইয়া বারান্দার কোণে আরাম-কেন্দারায় বসিয়া মেয়েদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছেন। মেয়েদের বুড়াকারে বসিয়া গল্প করা পছন্দ করিতেন না। মেয়েরা প্রিন্সিপালের কাছে বলিয়া তাঁহার ক্ষমতা হরণের ষড়যন্ত্র করিতেছে এই আশঙ্কা করিয়া নানা রকমের সতর্কতা অবলম্বন করিতেন।

কর্কট-লোগুপ লোকেরা আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভালবাসে। নীলিমা এই দুর্বলতা টের পাইয়া বিকালে দেখা হওয়া মাত্রই বলিল, “বা: ভাবি খুশেচে তো এই ময়ুরকণ্ঠী রংএর শাডীতে। আপনার রুটির প্রশংসা কোরতে হয়।” শুনিয়া হৈমদি দুই পাটি মকল দাঁত বিকশিত করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আমাকে কমপ্লিমেন্ট আরও অনেকে দিয়েচে।”

নিজেকেও যে সময়ে সময়ে অবিশ্বাস করিতে হয়, আত্মবিশ্বাসী লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু এই নীলিমাই হৈমদির অনেক নামকরণ করিয়াছে। শাডীতে রংএর প্রাচুর্য দেখিয়া নাম রাখিয়াছে ‘পাতাবাহার’। পাড়িয়ার-খুসিত মুখ দেখিয়া ‘হৈমন্তিকা’ নাম বদলাইয়া কুজ্জাটিকাম্বরী নাম রাখিয়াছে—উদ্ধাদেবী, অশ্বানেশ্বরী আরও অনেক নাম।

সেদিন মেয়েদের দিকে ফুট ছিল না—যেন কাহারও অপেক্ষা

করিতেছেন আর বারবার ঘড়ির দিকে দেখিতেছেন। পৌনে ছটার সময় গেট খোলার শব্দ হইল। দেখা গেল, ষাটিকোট-পরিহিত এক বাঙ্গালী সাহেব প্রবেশ করিলেন। হৈমদি খুরতোলা জুতার খট-খট করিয়া আগাইয়া আসিবা মাত্র ভদ্রলোকটি সাহেবি কায়াদায় করমর্দন করিলেন, হৈমদি আঁচল ছলাইয়া তাঁহার সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

বাঙালী মেয়েরা ‘কুড়িতে বুড়ী’ এই কথা খাস বাঙলা দেশেই প্রয়োগ করা চলে। প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়েরা যে কুড়ির পরেও যৌবনকে জিয়াইয়া রাখিতে পারে তাহার অনেক নজির আছে—আর এই রকম ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের তো কথাই নাই।

এই নবাগন্তকে লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। নীলিমা নূতন আবিষ্কারের আনন্দে চোচাইয়া উঠিল,—“ইউরেকা! ইনি নিশ্চয় হৈমদির ভাবী ভদ্রলোক। ওই সেদিনে কোন এক ফিরিস্তি মেয়ের বাড়ীতে জন্মবাসর করতে গিয়েছিলেন, সেখানে নিজের বিবাহ-বাসরের ব্যবস্থাও করে এসেছেন।” ললিতা, স্বপনা—“সত্যি রে, তাই হবে!” বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিল।

মণিকা সাইকলজি-অন্যাসের মেয়ে, প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “দুঃ, আমার ভাই বিশ্বাস হয় না। হৈমদির আর যে দেখাই থাক, এ সব মেয়েলি ভাব নেই। আর এই চলিশ বয়সে কোটিশিপ! তাদের যেমন বুদ্ধি! এ নিশ্চয় ওর কোন নিকট আত্মীয় হলেন।” যাহারা নীলিমার বেলায় ঘাড় নাড়িয়াছিল, তাহাদের অনেকেই আবার মণিকার কথায় ঘাড় ছুলাইল।

নীলিমা এক দিন অনুমানিকা করে বলিয়া বলিল, “হৈমদির কি মজা—রোজ দানাব সঙ্গে বেড়াতে যান।”

লোকটির সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক, সে কথার উল্লেখ না করিয়া হৈমদি শঙ্কার সহিত তাঁহার গুণপনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—“উনি বিলেতে দশ বছর ছিলেন। খাঁটি ইংরেজদের মত অনর্গল ইংরেজী বলতে পারেন, একেবারে ‘পারফেক্ট জেটগম্যান’।” নীলিমা চক্ষু বিফারিত করিয়া বিষয়ের ভাণ করিল।

পরদিন ক্লাসে ডেরাখি এই বিষয়ে আলোচ্যপাত করিয়া বলিল, “লোকটি সাহেবখানা করিয়া সব খোয়াইয়াছে। বিলাতের মেম-সঙ্গিনী তাহার দেউলিয়া অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ঘাড় হইতে ভুতুতা নামিয়াছে দেখিয়া সাহেবের না কি দাম দিয়ে ছাড়িয়াছে—এখন হৈমদির বাকবীর সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে।”

হৈমদি সম্বন্ধে ধারণাটা যে একেবারেই অমূলক তাহা বুঝিয়া সকলে নিশ্চিত হইয়া গেল—হইল না কেবল নীলিমা।

মণিকা বলিল, “কি রে? এত বড় আবিষ্কারটা মাঠে মারা গেল—নোবেল প্রাইজ পাওয়া আর হল না।”

নীলিমা তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া কহিল, “তাই বলে জোর খিওরও ঠিক নয়। আমি একশ’ বার বলব, হৈমদির বিয়েতে বেশ মত আছে—পাত্রের অভাব। গত বছরের বি, এ পরীক্ষার মেয়েরা যাবার সময় প্রণাম করতে গেলে হৈমদি বলেন—‘ভাল বর আনুক। আমার বিয়ের নেমস্তম্ব বাধ দেন না—আর দেখেছি, সাজের জাঁক! মণিদির বিয়েতে দেখিসুনি কত জন সাজ দেখে ক’নে বলে ভুল ক’রে দেখতে এসে চেহারা দেখে মুখ ফিরিয়ে গেছে? আর আমি লক্ষ্য করেছি যখন নামজাদা লোকদের কথা শুনে, তখন অবিবাহিত লোকদের প্রতি শুঁওর এক্সা উঠলে ওঠে! এই দেখ, না, বার্বার্ড শ’র লেখা

ভাল লাগে না অথচ এডওয়ার্ড ব'লে এক জনের একাধিক নাটক।
বাণাট শ'কে না কি ছাড়িয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করতই জানলাম
লোকটি অবিবাহিত।”

কিন্তু এতগুলি যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া নীলিমা কাহাকেও
আটকাইতে পারিল না—সকলে তাহাকে ধমকাইয়া থামাইয়া
দিল।

ইহার পর কয়েক দিন বেশ নিরুদ্বেগে কাটিয়া গেল। শনিবার
ছুটির দিন। দুপুরে কেহ লনে বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল, কেহ বা
বুকের উপর উপজ্ঞাস খুলিয়া নিদ্রা দিতেছে। নীলিমার ক্রাশের
মেয়েরা মৌন হইয়া অর্ধশব্দের ব্যাকিংএর অধ্যায়টি পড়িয়া শেষ
করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল—এমন সময় মলিনা আসিয়া
হাঁফাইতে হাঁফাইতে খবর দিল, মল্লয়ার মাকে পাওয়া যাইতেছে না।
পাঠরত্নার দল পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া সমস্তের চোচাইতে লাগিল।
ইহাতে মনে করিবার কিছু নাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষার রাত্রে ত্রোতাযুগেই
ছিল—এখন কথা রাখিতে না পারাটা এমন কিছু দোষের নয়—
মল্লযোচিত—*To err is human*. যেখানে যত চুক্তি হইয়াছে,
তাহা সর্বভঙ্গেরই চুক্তি। গানের শ্রাশ কাহারা যেন সেতারের কাণ
মোচড়াইয়া স্তব-বস্তুর পদ্ম টানটানি করিতেছে। হঠাৎ হৈমদির
পৌরুষ কণ্ঠের হাক শুনিলাম—“বেথুকা, যটা বাজাও।” অসময়ে
যটাবনি! বিপদেরই সঙ্কেত! মুহূর্ত্তে সমস্ত বোর্ডিং চূপ হইয়া গেল।

কালবিলম্ব না করিয়া সব মেয়েরা ‘হল-ঘরে’ সমবেত হইল। বহু
মহাপুরুষের পদবোত্রে পবিত্র এই ‘হল ঘর’।

এমন অসময়ে ডাকিবার কি কারণ ঘটিতে পারে? হঠাত ৪নং
স্থানের ঘরের মগ নেনং অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, কিহা কেহ
চায়ের প্লেট ভাঙিয়া দোষ স্বাকার করে নাই।

চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিলাম, হৈমদি দুই হাত পিছনে সিয়া
নামান এক পা আগাইয়া বস্তুতর ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছেন।
প্যারাউটস লাইটের অল্পবয়সের মধ্যে *Saturn* এর নৃষ্টিটি চোখের সামনে
ভাসিয়া উঠিল।

হৈমদি বক্তৃতির কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “শোনো মেয়েরা—
তোমাদের কয়েকটি দরকারী কথা বলছি, মন দিয়ে শুনবে। আমি
চাই না তোমরা আজকালকার মেয়েদের মত হও। তোমরা কলেজের
মেয়ে—এখন থেকে সংযত হয়ে ভদ্রভাবে চলবার চেষ্টা করবে।”
বক্তব্য বিষয়গুলি কাগজে নোট করিয়া আনিয়াছিলেন। ভূমিকা
শেষ করিয়া কাগজ দেখিয়া বলিলেন, “প্রথম নম্বর, আজ থেকে
তোমাদের বিলুনা সুলিয়ে কলেজে যাওয়া বাধণ হয়ে গেল—খোপা
বৈধ হেতে হবে।”

মিশনারী-স্কুলের টিচারদের মত বাঙ্গালী মেয়েদের চুল হৈমদিকেও
পেখে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে!

কবিকা নীলিমার দিকে আড়-চোখে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “কি
ছাঁদে কবরী বাঁধব?”

কবিকার কথায় উজ্জসিত হইয়া দুই বেণী ঢুলাইয়া বলিলেন,
“সে তোমাদের খুশী।” খোপার বেলায় যে আইন বাঁধিয়া দিলেন
না, তাহা দেখিয়া মেয়েরা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

নীলিমা ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, “কিন্তু নিজের বিলুনা?”

মণিকা হাসিয়া জবাব দিল, “জানিন্ তো, যৌবন একবারই
আসে, কিন্তু মানুষের জীবনে শৈশবের না কি দু'বার আবির্ভাব হয়।”

আসল কথা, হৈমদি নিজেকে অবাকালী সমাজের এক জন
মনে করেন। সে সমাজে ঘাট বছরের বুড়িরও লিপপিক্‌মাখা এক
মাথা এবং চুল থাকিলে দুই বিলুনা বাঁধিবার রীতি আছে, কিন্তু
বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের এ সখ কেন?

“ববিবারে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময়ে কেউ বারান্দায় দাঁড়াবে না।”
বলা বাহুল্য, এই দিনটিতে মেয়েরা নিজদের ‘ভিজিটর’ আসিয়াছে
কি না দেখিবার জন্য বারান্দায় অকারণেও আনাগোনা করে।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, “আমার আর
কয়েকটা কথা জানবার আছে—মুহুলা, তোমাকে মণিকা বলে যে
লোকটি চিঠি লেখেন, সে তোমার কি রকম ভাই?”

এই শোষণ প্রশ্নে অনেকের সম্মানবোধই হোঁচট খাইল।

মুহুলা স্বার্থেই রাগিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “বাবাকে
চিঠি লিখে সাত-পুরুষের বংশ-তালিকাটা আনিবে রাখলে তো এমন
সব অদ্ভুত প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হয় না।”

এমন কথা জবাবের জন্য হৈমদি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না,—
অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কারণ, একুশ বছর ধরিয়া এই বোর্ডিং
তাঁহার নিরব্রূশ শাসন অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাঁহার
কথায় সকলে শুনিয়াছে, কিন্তু কেহ শুনাইতে সাহস পায় নাই।
টোট দু'টি রাগে কাঁপিতে লাগিল, বেশী কথা মুখ দিয়া বাহির হইল
না, কেবল বলিলেন, “বেয়াড়া মেয়ে।”

কলেজে, বোর্ডিং এখন সর্বত্রই নানা প্রকার ‘ইজম’এর চর্চা
হইয়া থাকে, আর মুহুলা কমিউনিষ্ট পার্টির এক জন পাণ্ডা—কত
ভয়ঙ্কর বিপ্লব-কাহিনী গিলিতেছে রাজিদিন—এই সামান্য বাক্যবোঝে
কিছুতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে পারে না।

মুহুলা জেদের স্বরে বলিল, “বেয়াড়া শব্দটা কিরূপে মিন, নাহলে
প্রিন্সিপালের কাছে এই ঘটনা উপস্থাপন করতে হবে আমাকে।”

প্রিন্সিপালের নাম শুনিয়া হৈমদি আমতা-আমতা করিতে
লাগিলেন। কোণ বুঝিয়া মুহুলাকে কোণ বসাইতে দেখিয়া মেয়েরা
মনে মনে খুশী হইল।

হৈমদি মুহুলাকে এড়াইয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া বলিলেন,
“মণিমালা, বেরিয়ে এসো।”

মণিমালা সঙ্গ গ্রাম হইতে আসিয়াছে—ভয়ে সমস্ত হইয়া অবনত
মস্তকে তফাৎ হইয়া দাঁড়াইল। হৈমদি মণিমালার দিকে কটমট
করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেণীমাধব ঘোষকে চেন?”

মুহূর্ত্তে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, অসহায়ের মত হৈমদির
মুখের দিকে ফাল ফাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পর টোট ঈষৎ
নড়িল কিন্তু কি বলিল বুঝা গেল না। হৈমদি শীকার পাইয়া ছদ্ম্বার
দিয়া উঠিলেন, “চেন না! মিথ্যা কথা। বিধবা মেয়ের সাহস দেখ।”

বিধবা! শুনিয়া সকলেই চমকাইয়া উঠিল। বিধবা কি অথবা
বৃদ্ধিবার জো নাই বর্তমান বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের দিনে। মেয়েট কট্টোলের
কালো সর্ক পাড়ের শাড়ী পরিত—কাহারো সহিত মিশিত না, মুখখানি
সর্বদাই মলিন। আমরা ইহাকে কেবল দারিদ্র্যের ছাপ বলিয়াই
মনে করিতাম। এখন বুঝিলাম, ছলয়ের কত বড় ক্ষতের স্বাক্ষর

হইয়া সঙ্গে মিশিয়া এমন করণ করিয়া তুলিয়াছে ! উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না মণিমালাকে নিভাত্ত অসহায় পাইয়াই তিনি কৃতান্ত স্বাক্ষরিত হইল আর মুহূর্ত্তের কালও মণিমালার উপর মিটাইবেন । সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল—ব্যাপারটা আগাগোড়া না বুঝিয়া কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না ।

হৈমদি একটু খামিয়া সকলের দিকে চাহিয়া ছমকি দিয়া উঠিলেন, "আমার বোড়িঃ এ থেকে এ সব চলবে না । তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করছি ।"

এই ঘটনার পর হইতে বোড়িঃ আর গোলমাল স্তন্য গেল না । মণিমালাকে অনেক সাধিয়াও জলস্পর্শ করানো গেল না । দুই দিন পরে মণিমালার খুড়-খুড় আসিয়া হাজির হইলেন । সামান্ত জিনিষপত্র গুছাইতে বিলম্ব হইল না—হৈমদিকে প্রণাম করিয়া বিদায়ের পাখাখ মুক্তি ধীরপরক্ষেপে স্বস্তির অহুগমন করিল, একবারও পিছনেব দিকে ফিরিয়া চাহিল না । কেহ কিছু ডাকিয়া তাহার স্বাক্ষর বাধা দিল না । মণিমালার ক্লাসের মেয়েরা বাবাক্ষর বেলিঃ ধরিয়া ঠাড়াইয়া উজ্জত অঙ্গ সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিল ।

.....কিছু দিন পর বোড়িঃ আবার পূর্ব্বের জীবন ফিরিয়া আসিল । গ্রীষ্মের ছুটির দু-এক দিন বাকী—পূর্ব্বাঃ হইয়া গিয়াছে—বোড়িঃএর মেয়েরা বাস্তব গুছাইতে ব্যস্ত, হঠাৎ নৌলিমা খবর দিল, কোলদি আসিয়াছে । কোলদি গত বছর এই কলেজ হইতে বি. এ পাশ করিয়াছে । খবর পাইয়া সবাই অমনি বাস্তব-বিদ্যানা যেমন ছিল তেমনই ফেলিয়াই ছুটিয়া আসিয়া কোলদিকে ঘিরিয়া ঠাড়াইল । কোলদি পারীক্ষিক কুশল প্রভৃতি প্রাথমিক প্রশ্ন করিল, মেয়েরা যথাযথ উত্তর দিল ।

কোলদি নৌলিমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে তোমার এখনে মণিমলা বলে ছিপ-ছিপে গড়নের একটি ফণা আছে নতুন এসেছিল না ? তাকে যে দেখেছিলাম !"

নৌলিমা কি জবাব দিবে, ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে উত্তর করিল—

"হ্যা, কেন, কি হয়েছে ?"

নৌলিমা ভাবিয়াছিল, কোলদি ব্যাপারটা জানিয়াও না-জানার ভাষা করিতেছে—তাই নৌলিমাও চাপিয়া গেল ।

"একটা সুখের আছে, শুকে বলিসনে যেন ।" সকলকে অল্পরোধ করিয়া বলিল, "ওর, বুঝিল, খুব কষ্টের জীবন—বাকে বলে তিন-কুলে কেউ নেই—আছে কেবল দুই সম্পর্কের এক খুড়-খুড়—লোকটার স্বভাববিস্তার না কি একেবারে ষাটস্বাক্ষর । আমার ছোট কাকা ওর এক হামার কাছে শুনে শুকে দেখতে চাইলেন, আমি রোববার দিন 'জিজ্ঞাসিত'দের ঘর থেকে শুকে দেখিয়ে দিলাম ।"

নৌলিমা কোলদিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কল্পনাসে প্রায় করিল, "কল তো, তোমার কাকার নাম কি ? বৌমাধব খোর ?"

কোলদি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এ নাম জানলি কোলদি করে ? এ কথা তো আর কেউ জানে না ।"

নৌলিমার মুখ দিয়া কোন জবাব বাহির হইল না—সকলেই মণিমালার পরিণাম চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিল । নৌলিমা অল্প কাল করিয়া কথার মোড় ফিরাইয়া দিল ।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিয়াছে । ঢাকা মেলে শিখাল পৌছিয়াই ট্যাক্সি ঠাকরাইয়া কলেজ-গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ডাইভার 'হর্ণ' বাজাইতে লাগিল । কিন্তু দরওয়ানের সাজা পাও গেল না । অগত্যা ডাইভার নামিয়া গেটে সজ্জায় কড়াঘাত করি দরওয়ান ডান হাতে 'খৈনি' গালে ভরিতে ভরিতে বাঁ হাত দিয়ে কোন প্রকারে গেটটি টানিয়া খুলিল । ভিতরে প্রবেশ করিবে দেখি, স্তমিত্রা তাহার এক-রাশ চুল পিঠে এলাইয়া বেলিঃ উপর বসিয়া দিয়া পা চলাইতেছে । করেক জন মেয়ে হুলা করি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । একি ? এজিনের সব অংশগুলি তো ঠিক আছে, কেবল ষ্ট্রামেরই যেন অভাব বলিয়া বোধ হইল ।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই নৌলিমা হাততালি দিয়া চোচাইয়া উঠি "নতুন খবর । আগে হৈমদিকে প্রণাম করে আয়, পরে বলচি ।"

হৈমদির দরজার সামনে আসিয়া দেখি, সে গাট নীল বঃএ পকা 'নাই । উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া 'বাখ-কমের' মগ-বালি পধ্যস্ত দুইগোচর হইল । হৈমদির নাম ধরিয়া বার করেক ডাকাডাকি করিতে ভিতর হইতে চাপা-স্বরে সাজা পাইলাম, "এসা ।" চুপি একেবারে বিষয়াবিশিষ্ট হইয়া গেলাম । আসবাব-পত্র সব বদলাই গিয়াছে—কোয়ালের সাহেব-মেমের ছবিগুলি পধ্যস্ত লোপ পাইয়াছে, উন্মুক্ত দুই মেলিয়া চতুর্দিকে চাহিতে দেখি, কোণের দিকে তক্তাপোষের উপর এক ঈর্ষকর্য্য মহিলা বসিয়া আছেন । প্রণাম করি কি না ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় তিনিই প্রথম কথা কহিলেন, "আমি তোমাদের নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ।"

কোন প্রকারে প্রণাম সাধিয়া বাহিরে আসিয়া নৌলিমাকে প্রে করিলাম, "ব্যাপার কি বল তো ?"

নৌলিমা কাঁধে জোরে থাঁকানি লিঃ বলিল, "কেননা ? লাগল কি না আমার কথাটা শের্ণটায় ? বড় যে তোমাদের হৈমদির চিব-কৌমায়ে আস্থা ছিল ? হৈমদি এখন সৌমস্তিনী !"

অবাক হইয়া বলিলাম, "বলিসু কি ! গ্রীষ্মের পাণিগ্রহণও সম্ভব কিন্তু হৈমদির এ ব্যাপার নৈন নৈন চা ।"

তখন নৌলিমা সবিস্তারে বলিল, করুণার অন্তঃস্বের সময় 'জিজ্ঞাসিত' করুণাকে দেখিতে প্রায় আসিতেন, কাহারই গলায় হৈমদি মালা দান করিয়াছেন । আরও অনেকে সাক্ষ্য দিল । সকলে করুণার কাকার সহিত শেষের দিকে হৈমদিকে খুব মিশিতে দেখিয়াছে, করুণাও নৌলিমাকে এ বিষয়ে আভাস দিয়াছিল—কিন্তু কথাটি অগ্রাহ্য হইবে আশঙ্কা করিয়া কাহারও জানায় নাই । নৌলিমা হৈমদির এই পরিবর্তন না কি তাহার বন্ধ 'মলি'র বিবাহের পর হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল ।

তখনও নিজের কর্ণধরকে নিশাস করিতে পারিতেছিলিলাম না প্রতিবাদ করিয়াই বলিলাম, "শেষটায় এই মাধ্যম ব্যবহারি টাক শুদ্ধ খুটি-পাঞ্জাবী পরা বাকালী বাবু ! কেপেছিসু না কি ?"

নৌলিমা মাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাট-কোট পরা সাহেব এও শক্তা কি না ! দেশী জিনিষেরই দাম বেড়েছে, আর বিলাতী দামের তো কথাই নেই !" এ ব্যাপার লইয়া একে অজ্ঞেয় মুখ হইতে কথা কাড়াকাড়ি করিয়া এমন কোলাহল স্রষ্ট করিল যে, মণিকার আগমন কাহারও চোখে পড়িল না ।

মণিকা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "মাহেব দায় কত ?"

নীলিমা বলিল, “মাতের নাম বাই হোক, তোমার নাম ক’য়েছে।
খাউ-ইয়ারেই সাইকলজির দু-এক পাতা গিলে বড় লম্বা লম্বা কথা
হুকিল। আমি তখনই বলেছিলাম, ঠর জীবনে নিশ্চর কোন
বকসের অকৃতি ছিল—আর এই মেজাজ তাই উৎকট প্রকাশ।
কথা আছে, পুরুষের ভাগ্য আর নারীর চরিত্র।”

নীলিমাকে কথাটা বিবরণ স্বরূপে না দিয়া সকলেই সম্বরে

বলিয়া উঠিল—“হেমদি’র বিয়ে হ’য়ে গেছে কপিকার কাকার
সঙ্গে।”

হিটলার ট্যালিনের কস্তাকে বিবাহ করিয়াছে তুমিয়া যশিকা
হয়তো বিবাস করিতে পারিত! কিন্তু এ কথা কিনা-প্রমাণে স্বীকার
করিয়া লইতে তাহার যুক্তিবাদী মন কিছুতেই রাজী হইল না।
অবিস্বাসের সুরে সে বলিল, “সত্যি? ব্যাঃ!”

শিশু-পালন

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

বিগ্রহ কথা বলেন না—তার সেবা ধারাবাহিক নিয়মাবলিভাৱ দ্বারা
চলেতে পারে কিন্তু যে মানব-শিশু দিন-দিন বর্ধিত হতে থাকে এবং
ক্রম-বিকাশমান জ্ঞানের পথে এগিয়ে চলে, তার সেবা ও পালনের জন্য
বিশেষ অভিজ্ঞতা, অবস্থানময়ী পরিবর্তনশীল সতর্কতা ও কুশল
ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। জগতে মানুষ যে সকল জীব অপেক্ষা
জ্ঞান বৃদ্ধি ও সক্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ, তাহা তার বহু যুগ-যুগান্তবাপী অদমা
চরী, অমুশীলন ও অভিজ্ঞতার ফল। অনন্ত কোটি বৎসর সে চাল
পায়ে খেটেছিল মাথা ত্রিযাক জায়ে রেখে। তার পর ক্রমে ক্রমে
সে মাথা উঁচু করে উঠে ঈড়াল, পা ঠান্ডানিকে খাটালো হাতের
কাছে। মাথা উপর দিকে তোলার ফলে সে স্বাধ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র,
ছায়াপথ, নীহারিকা প্রভৃতি ভাল করে দেখতে ও বুঝতে পারলে।
ক্রমে ক্রমে তার মস্তিষ্ক উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বরতম হয়ে উঠল। জ্ঞানে সে
শ্রেষ্ঠ হলো—সত্যাক চিনিল। এ জগতে শ্রেষ্ঠ জীব বলে আখ্যা
পেল।

এই যে অনন্ত কাল ধরে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই—তার ফলে
তার মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধন হলো। এই শ্রেষ্ঠতা-সংরক্ষণের জন্য
যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। নহিলে—তার ফলে কোটি বৎসর পূর্বকার
এলোমেলো পদ্ধতিগুলো আবার একটু একটু করে মাথা চাড়া
দেবে।

যেটুকু ফল বনে ফোটে তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নেই। সে বহু
চায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎকৃষ্ট পুষ্টিতে আনা
মনোরম একটি গোলাপকে ফোটাতে হলে তার শিখনে দরকার
বিরাট অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি। এখানে ফুলটিকে উৎকর্ষের চরম নীমার
পৌছে দিতে প্রকৃতি পূর্ণ দায়িত্ব নেবে না।

শিশু কাছ ‘আসবার-পূর্বেই’ মাতা-পিতার সম্মান পালনের
প্রাথমিক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

“Perhaps a very elementary course could be
given to all girls and boys in schools on subjects
such as hygiene in the home, the services avail-
able to encourage positive health and prevent
infection, and the art of homecraft in rela-
tion to the childrens home.”—Planters’ Journal
(vol. xxxvi, No 6.)

আমাদের দেশে প্রথম-সন্তানসম্বন্ধে জননীকে বিশেষ কিছু শিক্ষা
দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁকে পঞ্চাবৃত সাধকগণ প্রকৃতি কতকগুলো লক্ষ্য-
বাহক উপসর্গের মধ্যে বেঁধে রেখে। সন্তানসি ভাবে তাঁকে শিশু-পালন

সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অথবা সে বিষয়ে কোনরূপ উপোদ-
দেওয়া হয় না—এমন কি, কালোপায়ী বলকারক আহ্বারের
ব্যবহা করা ঘটে ওঠে না অনেক ক্ষেত্রে। বাড়ীর যিনি কর্তা, তিনি
অসীতি বৎসর বয়সে শিশু-পালন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতাটুকু অর্জন
করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে নিজ কর্তৃত্বের জন্য সেটুকু নিজের মনেই
সংরক্ষিত রাখেন।

শিশুর আগমনের পূর্বে তার উষ্ণ-কোমল একাধিক শয্যা,
ন্যাতশীতোষ্ণ আবহাওয়া-পূর্ণ গৃহ-নিবাসনে, পরিচ্ছন্নতা এবং জনক-
জননীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা স্থাপন জরুরী। তাঁরা
শ্রদ্ধা করেন, জনক-জননী হবেন, এ আনন্দে তাঁরা অন্তরে অন্তরে
উৎফুল্ল হইতে ওঠেন, কিন্তু অনেকটা লজ্জার খাতিরে, অভিজ্ঞতা এবং
সুকচির অভাবেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উন্নত কার্যকালে কিংকর্তব্য-
বিমূঢ়তার সঙ্গে পর্যাবসিত হয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। ধাত্রী তাঁর প্রাথমিক কাজগুলো নিষ্পন্ন
করে নব-জন্মনীকে একটু সুস্থ দেখে চলে গেলেন। এখন পড়ল
গৃহ-কর্তা ও জননীর উপর সমস্ত ভার। এতটুকু শিশু জন্মিয়াই
কেনে ওঠে। প্রকৃতির কোলে এসেই প্রসঙ্গ বাবুর চাপে পড়ে সে।
তার পাতলা কিনিকিনে চামড়া এক নুতন খাস-প্রাণাসের যন্ত্রে প্রাণকর্তা
অন্ত সহিতে না পেরে সে কেনে ওঠে। এখন তার দেহের চাহিদা
আবৃত্ত হয়। এই সময় বর্ষা সতর্কতার অভাবে শিশুর বহুইকার,
কম্পন ও মুছা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

জননী তাঁর সজোজাত শিশুকে যখন প্রথম ক্রোড়ে নেন, তখন
তিনি কি এক অপূর্ণ স্পর্শ-গ্রন্থ অনুভব করেন। জগতে সকল
স্পর্শানন্দ অপেক্ষা সন্তান-স্পর্শ-গ্রন্থ অভিন্ন-মনোরম। নবজাত
শিশুকে লক্ষ্য করে কবি বলছেন—

“ভাগ্য আজি সেই সে মেয়ের

মা হ’ল যে তোমার মেয়ের করে

ভাগ্য আজি সেই সে ছেলের

বাপ হ’ল যে তোমার আদর করে।”

প্রথম থেকেই দেখতে হবে, শিশুর কোমল ককর ওপর সরাসরি
ভাবে জননী বা অপরের হস্তস্পর্শ যথেষ্ট জবাবে না হতে থাকে।
গরম কাপড়, তুলার প্যাড, লালনে এই সবের উপর জড়িয়ে তবে বেশ
এ-হাত ও-হাত করা হয়। কেন না, তার কটি বর্ষ-বৃশ ও গোমফুল
সহজেই অব্যাহিত জীবানু সকল আক্রমণ নিতে পারে। শিশু অনেক
পরিপ্রমেব পর ভূমিষ্ঠ হয়েচে এইবার তার বর্ষাকাল বাজের প্রথম

শিশুকে প্রথম ছ'-একদিন অনতি-আলো-বাতাসে গরম আচ্ছাদনে গৃহ-মধ্যে রাখাই বিধেয়। তবে যেন অন্ধকার ও বায়ুশূন্য ঘরে না রাখা হয়; এবং অতি যত্নে বাতিবাস্ত না করা হয়। তার এখন পরিমিত আলো-বাতাসে—দিনে অল্পত: বাইশ ঘণ্টা নিস্তার প্রয়োজন। কেন না, বাহ্যত: শিশুর এখন কোন পরিগ্রহ না হলেও প্রকৃতির সাধারণ বিধবস্তগুলো তার সত্ত্ব বিকশিত ইন্দ্রিয়গ্রামকে গ্রহণ করতে বিশেষ ক্রেশ চলছে। তার ধমনী, শিরা ও কৈশিক প্রভৃতি বক্তবাহিকা নানীগুলোর কাজ এখন দ্রুততম হয়ে উঠছে।

দ্বিতীয় কিবা তৃতীয় দিন থেকে তাকে উষ্ণ স্থানে ও রৌদ্রে পনের মিনিট থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর গায়ে প্রচুর তেল মাখিয়ে তাকে রৌদ্র-তপ্ত করা হয়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে এ বিধি মন্দ নয়, কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে শিশুকে এত বেশী সূর্য-তাপ লাগানো হয় যে, তখন থেকেই তাকে কর্ণদাহিত হতে হয়, ফলে স্বাস্থ্যহানি না হলেও মস্তিষ্কের উর্ধ্বরতা হ্রাস পায়। অতি শীতে, রৌদ্রে, আর্দ্র বাতাসে অথবা শান্তিপূর্ণ প্রচুর নিস্তার অভাবে শিশুকে বড় বেশী অশুষ্কতা ভোগ করতে হয় এবং যতই তাকে ক্রেশ ভোগ করতে হয়, ততই তার নার্ভ-তন্ত্র (Nervous tissue) ওপর বেশী পীড়ন হয়, ফলে তার ঝুল বৃত্তিগুলো প্রবল হয়ে হুম্ব ও আঘাত্য বৃত্তিগুলোকে দুর্বল করতে থাকে। দীর্ঘ-দরিদ্র ঘরের শিশুদের প্রাণময়তার অভাব—এর এক দৃষ্টান্ত।

শিশু ক্রমে ক্ষুধার অভাব অনুভব ও প্রকাশ করতে শেখে, তার দর্শন ও শ্রবণশক্তি প্রয়োগ করে, হাত-পা ছুড়ে খেলা করে। এই যে তার ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমবিকাশমানের পথে চলছে, এখন থেকেই তার আহাৰ, আনন্দ বেড়ে ওঠবার অব্যক্ত উৎসাহের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত দুগ্ধ, ক্যালসিয়ামঘটিত শর্করা প্রভৃতি খাত্তের ব্যবস্থা অনেক স্থলে হয় বটে, কিন্তু সন্তান জননীর দেহ-দুগ্ধ অক্ষপা শিশুর পক্ষে অপর কোন উৎকৃষ্টতম খাদ্য নাই। তবে জননী পীড়িতা হলে, মাতৃ-দুগ্ধের অভাব ঘটলে পূর্বোক্ত বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য ব্যবস্থাই বিধেয়। তবে আহাৰে নিয়ম, স্বয়ং ও পরিচ্ছন্নতা সর্বদা প্রয়োজন। বারে বেশী এবং পরিমাণে অল্প খাওয়ানোই বিধেয়। ব্যোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ম ক্রম-পরিবর্তন সাপেক্ষ।

শিশু প্রথম দর্শন-বিশ্লেষণে বর্ণ-বিশ্লেষণ করতে পারে না। দৃষ্টির গভীরতা তখনও আসে না বলে উজ্জ্বল বর্ণগুলোই তার চোখে ধরা পড়ে। লাল রঙ তার ভালো লাগে। সাদা, কালো এসব রঙে তার স্মৃতি হয় না। লাল রঙের ফুল-ফল, খেলনা তার চোখের সামনে রাখতে হয়। সেগুলো একটু নাড়া দিলে এসিব-এসিক চোখ ফিরিয়ে দেখবার আগ্রহ তার বাড়়, অলস অবস্থায় সে একটা কাজ পায়। রস ও রূপ নিতে শিখে ক্রমে শব্দ চায়। হাততালি দিলে উৎকর্ষ হয়ে শোনে, আদর করলে ক্ৰিক্-ক্ৰিক্ করে হাসে, হাতে বুম্‌বুম্‌ দিলে একটা নুতন অবলম্বন পেয়ে অসংখ্য ভাবে হাত দুলায়ে আনন্দ প্রকাশ করে, হাত-পা ছুড়তে, বুকখানা উঁচু করতে থাকে। এতে জ্বর ব্যায়াম ও মনে নুতন নুতন আনন্দ-রসের সকার হয়।

এখন দেখতে হবে, তার গাত্রাবরণ অথবা তার পোষাক যেন তার নুতন খেলার পথে বিঘ্ন না ঘটায়। আল্পা কাঁকা-কাঁকা পোষাক

দেওয়া উচিত। শিশু খেলুক, মনের আনন্দে হাত-পা ছুড়ুক, শবে ও বর্ষে সে উৎসাহ হয়ে উঠুক, প্রকৃতির বিরাট দানকে সে একটু-একটু করে চিহ্নক, উপভোগ করুক।

বাত্তে শিশু ও মাতার শয্যাবচনা বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রধানত: শিশুর শয্যা মাতার শয্যা থেকে পৃথক থাকাই বিধেয়। একই মশারির মধ্যে পাশাপাশি শিশু ও জননীকে শুতে দিলে শিশুর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। মাতার পরিত্যক্ত নিশ্বাস মশারির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে শিশুকে ঐ বিযুক্ত নিশ্বাসের (carbon dioxide) কতকাংশ গ্রহণ করতে হয়। তবে যেক্ষেত্রে পৃথক শয্যা করা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে শিশুর কাছ থেকে জননীর শোবার স্থান অন্তত: দেড় হাত দূরে এবং জননী যে স্তরে শোনে তা থেকে শিশুকে অন্তত: পাঁচ-ছ' ইঞ্চি উঁচু বিছানায় শোয়ানো উচিত। এতে শিশু ও জননী উভয়েই বিভিন্ন স্তর থেকে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া উত্তর অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে শয়ন করলে শিশুর দেহে মাতৃদেহের উত্তাপ সারাবারি শোষিত হতে থাকে, তাতে শিশুদেহের বৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। পশু-শাবকের মাতৃদেহ-তাপ প্রয়োজন হয় একটু বেশী; কিন্তু মানব-শিশুর পক্ষে অতটা নিস্ত্রয়োজন।

প্রকৃতির নিয়মাধানে শিশুর অবদর ও কার্যকলাপের দ্রুত পরিবর্তন চলতে থাকে। তিন মাসের মধ্যে ভালো ভাবে উপুড় হতে, ছ' মাসের মধ্যে উঠে বসতে ও হামা টানতে শিখে নেয়। এই ছ' মাসের পর থেকে জননীর দায়ির বাড়ে অনেক বেশী। শিশুর খাদ্য নির্বাচন, খাত্তের সময়-নিকপণ, ব্যায়াম-শিক্ষা ও ক্রীড়া, আমোদ—এ সকল বিষয়ে এখন থেকে জননীকে উগ্রতর ও পরিবর্তনশীল পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

এখন থেকে আর উপর্যাপরি এবং অতিরিক্ত আহাৰ করানো চলবে না। নিয়মিত সময়ে অর্থাৎ অন্তত: তিন ঘণ্টা অন্তর পরিমিত আহাৰ বিধেয়। অতিরিক্ত আহাৰে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, পাকস্থলিতে প্রবল চাপ পড়ায় আহাৰ পরিপাক হতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে। এত দিন সে যে সব খাদ্য খেয়ে এসেছে, তার উপর এখন থেকে তাকে একটু একটু করে প্রটিন (Protein) ও ভিটামিন-জাতীয় খাদ্য এবং আঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি স্বর-কঠিন ফল দেওয়া যেতে পারে। শীত উঠলে ঠাঁতের ব্যবহারের জন্ত তাকে আম, আপেল, নামপাতি প্রভৃতি ফল কামড়ে খাবার জন্ত দেওয়া চলে। আমাদের দেশে এই খাদ্য-হালিকা পরিবর্তনের জন্ত ছ'মাসে অল্পপ্রাণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অল্পপ্রাণের উৎসবের সঙ্গেই শিশুর প্রতি ইতিকর্তব্য শেষ করে ফেলা হয়—তার খাত্তের ক্রম-পরিবর্তনশীল চাহিদার দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা হয় না।

শিশুকে এই বার একটু বেশী করে বাহিরমুখ্য করতে হবে। ঠোঙ্গা-গাড়ীতে অথবা তার অভাবে কোলে করে উষ্ণ বাতাসে, মাঠে, পার্কে ও বাস্তায় তাকে সকালে-বিকালে অন্তত: এক ঘণ্টার জন্ত নিয়ে বেড়ান প্রয়োজন। ঐ সবুজ ঘাসে-ভরা বিস্তীর্ণ মাঠে, ঐ সুহৃৎ-প্রসারী পথ, আকাশের গা-বেয়ে ওঠা ঐ বড় বড় তাল নারিকেল গাছের শ্রেণী, ঐ উষ্ণ উদার আকাশ দেখতে ও উপভোগ করতে শিশু উৎসাহ হয়ে আছে! তুমি মা, তুমি বাবা, তোমরা আন্তর-স্বজন—তোমাদের ঐ নবাবগত শিশুর অনন্ত কালের উদাত্ত

বাসনার পরিভূক্তি করাবে না? যে বিশ্ববীজ-সমষ্টি ও বিশ্ব-আত্মা থেকে তার উৎপত্তি, যে নিবা-দৃষ্টি উপভোগ করবার জ্ঞান জড়সেমে পূর্ণশক্তি নিয়ে তার আসা, তাকে তুমি সেন্দীর্বা থেকে বঞ্চিত করো না। তাকে বাহিরে আনো, গাছ-পালা, মাঠ, পথ, বন, ফুল, ঐ ছুটে যাওয়া জন্তু, ঐ উড়ে যাওয়া পাখী দেখাও। ওর দৃষ্টি কিবিয়ে ঐ আকাশের চাঁদ, অনন্ত নক্ষত্র দেখতে উৎসাহ দাও। শিশু ঐ অনন্ত দৃষ্টি দেখতে দেখতে উৎফুল্ল হয়ে উঠুক, অহুভব করতে শিখুক সে কত বড় হয়ে উঠছে, কি অভিনব বস্তু সব দেখছে। ঐ সব দেখাতে দেখাতে তার সঙ্গে তুমি কথা কও, ছড়া কাটা, অঙ্গভঙ্গি কর—তাতে সে বুঝবে তুমি তার বড়, তার মনোবৃত্তি-আদান-প্রদানের সহায়ক। এমনি করতে করতে তার চিন্তা-বৃত্তি গঠিত হবে, উৎকর্ষের দিকে ধাবে, আর সব জানবার, শেখবার এবং দেখবার জ্ঞান শিশু ব্যগ্র হবে।

শিশুকে বাহিরে না আনলে পাঁচটা প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত বিরাট ক্ষেত্র না দেখালে জীবনের প্রথম দিনের উৎস-পথে সে বাধা পেয়ে পেয়ে ক্রমে অলস, অচঞ্চল ও কাঁচন হয়ে পড়ে। এই সব ছেলে বড় হয়ে ওঠে তবুই বাড়ীর বাইরে কোন জোক বেরিয়ে যাবে দেখলেই কান্না শুরু করে, সর্বদা একটা অস্বস্তির ভাব দেখায় এবং তাদের মধ্যে প্রাণমনদ্বার অর্থাৎ লজ্জা হয়।

আমাদের দেশে দরবারে শিশুকে এক কোল থেকে অন্য কোলে লওয়া হয়। এই সময় অনেক ক্ষেত্রে শিশুর নেতনার এবং যিনি লন তাঁর আগ্রহ—এই দুই মিশে যে একটা মৃত বস্তুটির সৃষ্টি হয়, তাতে শিশুকে এক থেকে অন্তরে দেহে পৌঁছাতে একটা আঘাত সহ্য করতে হয়। এ আঘাত অতি মৃদু হলেও শিশু এমনি ছাঁসাত বার সহ্য করতে করতে তার বুকের সাধারণ বৃত্তির ব্যাঘাত ঘটে। সে জ্ঞান বান্ধাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে কোলে নেবার সময় অতি স্বল্প বেগে প্রবেশ করে তবে নেওয়া উচিত।

শিশু শিশু এক বছর ঠাঁড়তে এবং তার হৃৎ-এক মাস পরেই ঠাঁড়তে দেখে। তার এই কথনকমতার অগ্রগতিতে সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক উন্নতির দিকে বিশেষ যত্নরান হতে হইে। নানা উন্নততর খেলনা ও নানা ভাবে খেলায় ও আনন্দে তাকে নিযুক্ত রাখাই হলো এর উপায়। তবে তার খেলনা এবং তাকে কথনকম রাখার মধ্যে যেন একঘেয়ে ভাব না থাকে। এখন আর চুসীকাটি, ঝুমঝুমি দিলে চলবে না—অথবা কাঁকা খান্ডের বরে তার আগ্রহশূন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চলবে না। এখন সে অনেক চিনেছে, অনেক দেখেছে, বহু অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এখন লাল রঙটা তার তেমন ভালো লাগছে না। নিকেল-করা সিগারেট কেস, টা-লাইট, দম-দেওয়া গাড়ী, ছোট বাল, ছড়ি, পশমের ও কড়ির পুতুল তার ভালো লাগে। তার সমবয়স্ক অথবা তার চেয়ে অল্প-বড় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হাত-পা ছুঁতে খেলা করতে তার ভালো লাগে। সে এখন হৃৎকমে চলতে পারে—কখন ক্রম হামা টেনে, কখনও বা টলতে-টলতে ধেঁটে। একটা বাটি উপড় করে লম্বা সিমেণ্টের মেঝেতে দিলে সে সেই বাটিটার উপর ভর দিয়ে ক্রম হামা টেনে ছুটেতে পারে। এতে তার দৃষ্টিসাহসিকতার অভ্যাস আসে। কিছু দূরে একটা লাল ফল,

একটা ভালো পুতুল নিয়ে ঠাঁড়ালে সে টলতে-টলতে গুল্লোকে নিতে আসবে। তাতে তার ব্যায়াম হবে। তবে অতিরিক্ত হাঁটতে দিলে বিরক্তি আসবে—একঘেয়ে হয়ে যাবে। এখন তাকে কিছু কিছু ছুঁতে দেওয়া ভালো। একবার যদি সে একটা কাচের পুতুল মাটির খেলনা ভাঙতে পায়, তার পর থেকে সে বলাটা পুতুলটা ছুঁতে আরম্ভ করে। পুতুলটা ভেঙ্গে গেল বলে অথবা তোমার ঠিক মনোমত খেলাছে না বলে তাকে যেন ধমক দেওয়া, বাগ দেখানো, নিকৃৎসাহ করা না হয়। কান্না থামানোর জ্ঞান ভয় দেখিয়ে, ছুঁতে, ছুঁতে প্ররোচিতের কথা বলে কোন ভয়সূচক অনতিপ্রোত অবস্থার বর্ণনা তার হানসপটে বহা উচিত নয়। শিশুকে ভয় দেখালে তার চিন্তা অত্যন্ত নিতেন্ত্র হয়ে পড়ে।

শিশু যেখানে চাকর অথবা পরিচারিকার কোলে মাছুর হয়, সে ক্ষেত্রে ভ্রমক-ভ্রমনার ঐ সব দাস-দাসীর উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কেন না, অলক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রে তারা শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার উপর উৎসীড়ন করে, বাধাপ্রযুক্ত বড় লয় না।

শিশুকে তার উৎস-স্থানে অন্ততঃ দু'বছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ বাধা-নিষেধ দিতে নেই। সে চলুক, ছুটুক, ফেলুক, ভাঙুক, ভুল করুক, খুঁটুটু হোক। দেশ-কাল ও অবস্থানভেদে সন্তোষপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, নন্দী-বাক্য, স্ববিশীর্ণ প্রস্তাবে মাঝে মাঝে তাকে মিলে গেলে তাতে অত্যন্ত তৃপ্ত লাগে। এতে শিশুর মন উজ্জ্বল ও সাহসিকতাপূর্ণ হয়।

ঐ যে ক্রমবর্ধমান শিশু—ও আত কিছুই জানে না—তুমি জানে চকলতা। কিন্তু ঐ চকলতার যে নিবা পরিণতি হতে পারে, তা কে জ্ঞান? তুমি হয়ত সাধারণ পিতা কিম্বা মাতা, কিন্তু তোমার ঐ সোনার চাঁদ যেন দুটু শিশু যে এক দিন বুদ্ধ, চৈতন্য, বরীন্দনাথ, ভগদীশ, আন্ততোর, প্রজ্ঞান হবে না, তা কে বলতে পারে?

তোমার-আমার বোধ-শক্তি নিয়ে শিশুর তুল-নির্ভুল পরিচালনা করা যায় না। আমরাও কত ভুল করেছি—তুল শিখেছি, তুল শিখিয়েছি। তুল করেই মানুষ সত্যকে চিনতে পারে। তুল ও সত্যের তুলনা করতে গিয়ে কবি বলছেন—

"He has been hindered and delayed and deceived by angers and prophets by popes and priests. He has been betrayed by saints, misled by apostles and Christs, frightened by devils and ghosts, enslaved by chiefs and kings, robbed by alters and thrones. In the name of education his mind has been filled with mistakes, in the name of religion he has been taught humility and ignorance."

Let children have some daylight at home and do not commence at the cradle and shout—Don't—Don't—Stop!"—Col. Ingersol.

(Ingersol's Lectures)

বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ যেমন বৃন্দাবন,
যুবকদের তেমনি আগ্রা—এই
আমার বিশ্বাস। সেখানে হিন্দু,
মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পারসী
মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সকল
জাতির, সকল সম্প্রদায়ের যুবক
এক। তাদের এক ধর্ম, এক
নাম! সে শুধু নিখিল বিশ্বের
যৌবন! ফুলে ফুলে বিছানো
তার পথ, রঙে রঙে ছাওয়া তার



শ্রীসুমনাথ ঘোষ

অগ্রসর হলুম, তখন আমার
বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরগুলে
যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল,
বুঝি এখনি আমার সেই বহু
প্রতীক্ষার ধন, সেই পরম প্রিয়ের
দর্শন পাবো! কখন দেখবো
তাজমহল। জানলা দিয়ে বাইরে
তাকিয়ে রইলুম।

সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত যেন
আমার দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়! দূর

আকাশ, গাছে বিলম্ব তার সমীপ, কল্পনায় শিহরিত তার
প্রতিটি মুহূর্ত! তাই আগ্রার নাম শুনলে সহসা যুবকদের
মন কেন যেন সকলের অজ্ঞাতে একবার চমকে ওঠে। মোমাছির
পায়ের শব্দে যেমন ফুলের পাপড়ি কাঁপে, স্তরের স্পন্দনে
যেমন সেতারের তারে তারে মূর্ছনা ওঠে—এ যেন সেই রকমের
একটা শিহরণ, যা কেবল অহুভব করা যায়—কিন্তু ভাষায়
প্রকাশ করা যায় না। আগ্রা ত নয়, সে যে তাজমহলের দেশ।
সম্রাট সাজাহানের দীর্ঘশ্বাসে ভরা রাজত্ব। বিরহ-বেদনার সর্বশ্রেষ্ঠ
ইতিহাস। প্রেমকাব্যের বাস্তব রূপ। যুগ যুগ ধরে মানুষ কেবল
কৈদেছে—বিরহে প্রেমে, কিন্তু কখনো কি দেখেছে সে কালো কেমন!
কি সুল্লর, কি মধুর, কি সুশোভন তার মূর্তি! দেশ-বিদেশে অনেক
কাব্যগাথা রচিত হয়েছে এই বিরহ-প্রেমের কাহিনী নিয়ে, আর তারা
অমর হয়ে আছে মানুষের বেদনার তত্ত্বাতে তত্ত্বাতে। কিন্তু সেই
সুমনাথ বেদনাকে কি কেউ কখনো চাক্ষুষ করেছে? পৃথিবীর আর
কোন দেশে কি তার কোন প্রমাণ আছে? তাই দেশ-বিদেশ
থেকে লোক ছুটে আসে সেই প্রেম-কাব্যের বাস্তব রূপ দেখে চকু
সার্থক করতে!

শুধু যুবক-যুবতী নয়, আমি বহু প্রোট-প্রোট, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অবসিক-
সুরসিককেও দেখেছি আগ্রার কথা বলতে গিয়ে যাদের চকু স্বপ্নালস
হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর আবেগে বুজ আসে। কেউ আগ্রায় গিয়েছে শুনলে
আমি আর স্থির থাকতে পারতুম না, ছুটে যেতুম শুধু তাকে চোখে
দেখবার জন্তে। আমার কাছে তারাই ছিল যেন একটা পরম বিশ্বাসের
বস্তু। ছেলেবেলা থেকে কেন জানি না, এই স্থানটির সবচেয়ে আমার
মনে সব চেয়ে দুর্বলতা ছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পাড়ার
লোক, কেউ আগ্রা দেখে এসেছে শুনলে আমি তার কাছে গিয়ে আগে
জিজ্ঞেস করতুম, কেমন দেখতে সেই তাজমহল, কত বড়, কত সুল্লর?
ছবিতে যেমন দেখি, বইয়ে যেমন পড়ি, ঠিক সেই রকম কি না?
কেমন দেখতে সেই যমুনা, যার বুকের ওপর তাজমহলের প্রতিবিম্ব
দিন-রাত নীরবে বুমায়? ছেলেবেলায় ইতিহাসে যত রকমের কাহিনী
পড়েছি—সবগুলো একসঙ্গে তখন মনের দুয়ারে ভাঁজ ক'রে আসতো।
তাদের মনে যেমন লেগেছে তারা তেমনি ভাবে উত্তর দিলেও আমার
কিশোর-মনের কল্পনা বুঝি তাতে তৃপ্ত হতো না—আরো কিছু
চাইতো, আরো কিছু প্রত্যাশা করতো। এমনি ক'রে যত দিন বেতে
লাগল, আমার মনে আগ্রা সবচেয়ে তত কৌতূহল বাড়তে লাগল।

অবশেষে এক দিন এলো সে সুযোগ। তখন আমার বয়স
বাইশ কি তেইশ। আমার মনের কুঞ্জবনে সবে ফুল ধরেছে।
আগ্রার টিকিট কেটে আমি ট্রেনে চাপলুম।

পরদিন টুঙলা থেকে যখন গাড়ী বদল ক'রে আগ্রার দিকে

থেকে যেন সর্বপ্রথম সে আমার চোখে পড়ে। আর সামান্য দূরে
আগ্রা, মাত্র তিনটে মাইল।

গাড়ী যত ছুটে চলে, আমার চোখ তত ব্যাকুল হয়ে ক'কে খোঁজে?
ধু-ধু করছে মাঠ ছ'পাশে। পশ্চিমের তৃণতাহীন বিস্তৃত প্রান্তর
যেন আকাশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। কোন্ দিকে তাজ, তা জানি না।
কয়েকটি মাত্র যাত্রী আমার কামরায়। তারা বোধ হয় সকলেই স্থানীয়
লোক। কারো মুখে তাই তাজ দেখবার কোন আগ্রহ লক্ষ্য করলুম
না। যে যার নিজেদের কাহিনী নিয়েই ব্যস্ত।

প্রথম শরতের নীল আকাশে তখন মধ্যাহ্নের রৌদ্র স্তব্ধ হয়ে
আছে। মনে হচ্ছিল আমার, যেন আকাশ তার দীর্ঘ নীল নয়ন ছ'টি
বিচ্ছারিত ক'রে চেয়ে আছে এই পৃথিবীতে ক'কে দেখবার জন্তে।

গাড়ী চলছে তেমনি গতিতে।

সহসা দূর চক্রবালে যেন সাদা মেঘের মত এক টুকরো দেখা গেল।
গাড়ীর মধ্যে কে এক জন বলে উঠলো উর,দুতে, 'উম্মো তাজ'—ওই
তাজমহল!

আমার চোখ যেন তখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যিই
সে তাজ দেখছে। সেই অমল-খল রজত-শুভ্র কান্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে
স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হলো, এ ত তাজমহল
নয়—এ যে এক তবী, সুন্দরী, যুবতী, নীলওড়না তার গায়ে জড়ানো
আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তবে কি 'ও তাজমহল নয়—ও
মমতাজ। সমাধি-মন্দির ছেড়ে কি সে এখনো যায়নি কিংবা ও তারি
আত্মার মন্দির রূপ।

যমুনার পুল পেরিয়ে ট্রেন এসে থামল আগ্রাফোর্ট স্টেশনে।
নামলুম সেখানে। তাজমহলের কোল ঘেঁষে চলে গিয়েছে যে যমুনা,
তার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। যমুনার সে জলকল্লোল
আর নেই, এক দিন সাজাহানের অজ্ঞাতে যার ছ'কুল করতো ছল-ছল।
এখন যমুনা যেন বৃদ্ধা পিতামহীর মত তার কল্ললসার দেহানাকে
নিরে তাজমহলের মুখের দিকে চেয়ে আছে আর তার লোলচর্চ
কোটারগত চকুতে এখনো কিছু অশ্রু জমে রয়েছে।

যমুনার ধার দিয়ে একে-বেকে তাজমহলে যাবার রাস্তা। তার
ছ'ধারে কাউবন আর উঁচু উঁচু মাটির টিবি পাহাড়ের মত। এ
রাস্তাটা বড় অন্ধৃত! যত এগিয়ে বাওয়া যায় তাজমহলের দিকে, তত
আর তাকে দেখা যায় না—কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়—শেষে হঠাৎ
ফটকের সামনে গেলে বিকশিত হয়ে ওঠে যেন পবিত্র মূর্তিতে!
সমগ্র ভাবে দেখতে পাওয়ায় যেমন একটা চমক লাগে, তেমনি সহসা
যেন বুকের মধ্যটা হুলে ওঠে যেন কিসের ব্যাথায়!

বাই হোক, সেই রাস্তাটা দিয়ে চলতে চলতে আমার মনে হতে
লাগল, সম্রাট সাজাহান কি এই পথ দিয়ে যেতেন। তিনি কি আমার

মত বন্ধে এমন স্পন্দন অনুভব করতেন তাকে দেখতে বাবার সময়?

এমনি করে যেতে যেতে হঠাৎ একবারে ফটকে ঢুকই মন এবং মুখ দুইই শুক হয়ে গেল। সামনে তাজমহল! নীরব নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ চারি দিকে। মধ্যাহ্নের তপ্তরৌদ্র যেন সচকিত!

আমি চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার পা যেন নিশ্চল হয়ে গেল। সম্মুখে শ্বেতমর্ম্মরখচিত যেন এক বিরাট প্রেমকাব্য ছন্দে মাধুর্য্যে রূপে রসে অনবদ্য কল্পনাতীত! কারুশিল্পের চরম নিদর্শন তাজমহল। লোক দেখছে বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে। শুধু কি তার গঠন-বৈচিত্র্যে তারা মুগ্ধ! তারা কি ভাবছে, এমন নিখুঁত স্থাপত্যকলা পৃথিবীর আর কোথাও নেই? তারা কি সেই পাথরের অন্তরালে রয়েছে যে শিল্পীর চোখের জল তাকেও অনুভব করছে আমার মত?

এমনি কত কি চিন্তা করতে করতে আমি ধীর-পদে ভিতরে প্রবেশ করলুম।

আগে বাইরে থেকে তাকে দেখলুম—মত রকমে দেখা সম্ভব। দূরে থেকে, কাছে থেকে, মাঝখান থেকে, কোণ থেকে ঘুরে ফিরে, দাঁড়িয়ে, বসে সর্বপ্রকারে; দিনের আলোয় তার বাস্তবিক রূপ হ'চকু দিয়ে শুভে নিয়ে তার পর গেলুম ভিতরে।

ভিতরের অত্যন্তর্য্য রূপ দেখে শেষে একটা ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে আমি তার গন্তের মধ্যে প্রবেশ করলুম। এ যেন তাজমহলের অন্তঃকরণ। আলো-ছায়াময় একটী ঘর—সেখানে পাশাপাশি সাজাহান আর মমতাজের সমাধি, শ্বেতপাথরের স্ফটিকাকার কাঁকড়া-খচিত একটি প্রকাণ্ড জাকবীর দিয়ে ঘেরা।

বাগান থেকে কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করে পকেটে রেখেছিলুম। 'গাইড'টা দেখানিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন্টা কার সমাধি বলে একবার চেষ্টা করে উঠলো তার ডাক্তার-গলায়—'আল্লা-জো-আকবর'!

সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে গেল সেই হিমশীতল পাথরের নীরব নিশ্চলতায়। আমি ফুলগুলো সেই সমাধি-স্তম্ভের ওপর ফেলে দিয়ে মাথা নীচু করে নীরবে অভিযান করলুম। আমার মন তখন বলে উঠলো, ধর্ম্ম তুমি সাজাহান, ধর্ম্ম তোমার প্রেম! কত নবাব, কত সম্রাট, কত রাজা-উজীর এই পৃথিবীতে জন্মেছে কিন্তু পঙ্কজপ্রেমের এমন জলন্ত উদাহরণ আর কে রেখে গেছে?

সেই দিনই অপরাহ্নে আগ্রার দুর্গ দেখতে গেলুম। সাজাহানের কক্ষে গিয়ে মাথা কিম্ব কিম্ব করতে লাগল। যমুনার ওপারে তাজ আর এপারে এই দুর্গ। তবু দিন-রাত তাজমহল দেখে বুঝি সম্রাটের আশা মেটেনি, তাই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে যে অসংখ্য ফুল লতাপাতা চিত্রিত তার মধ্যে এমন ভাবে সব হীরা-মণি-মুক্তা তিনি বসিয়েছিলেন যে, ওপার থেকে তাজমহলের সম্পূর্ণ ছবিটি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে অহিনিশ সাজাহানের চক্ষে বিরাজ করতো। ঘুরতে ফিরতে যখন যে দিকে তিনি চাইবেন যেন প্রিয়তমা পত্নীর সেই চন্দ্র, নিম্নলিখিত স্থিতি তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে রাখে।

নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ সাজাহানের এই কক্ষের এক কোণে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম ওপারে তাজমহলের দিকে। কেবলি আমার মনে হতে লাগল, প্রেমের এমন অভিব্যক্তি জগতের আর কোথাও কি আছে?

সেখান থেকে বেরিয়ে আবার গেলুম তাজ দেখতে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কত রাত পথান্ত্র বসে রইলুম।

এর পর তাজকে কত রকমে দেখলুম তার ঠিক নেই। ঘোর অন্ধকারে দেখলুম, কীর্ণ চাঁদের আলোয় দেখলুম, সন্ধ্যায় দেখলুম, অধিক রাতে দেখলুম—যত দেখি তত যেন দেখা ফুরায় না। এ যেন নিত্য নব আবিষ্কার, নিত্য নব বিষয়। সুন্দরী রমণীর মত তাকে যখন যে অবস্থায় দেখি যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখে দেখে আশা আর মেটে না। অক্ষয় সৌন্দর্য্য আর অমর প্রেমের সে মহামিলন।

পূর্ণিমার পরিপ্লাবিত জ্যোৎস্নায় তাজ দেখবো, অনেক কালের বাসনা। কয়েক দিন পরে সে সুযোগ আসতে মন নৃত্য করে উঠলো। সন্ধ্যার দিকে দশকের জীড় থাকে বেশী, তাই একটু বেশী রাত করে গেলুম। সেই বিশাল প্রাঙ্গণে অল্প হু-চারটি লোক আমার নজরে পড়লো। কেউ শুক হ'য়ে তাজমহলের দিকে চেয়ে বসে আছে, কেউ নিঃশব্দে যেন ছায়াব মত পায়চারী করছে পাছে তাজমহলের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে সশঙ্কিত, কেউ বা তাজমহলের চক্রে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

আমি ধীরে ধীরে বাগানের যে নিকট সব চেয়ে নিঃশব্দ সেখানে গিয়ে বিলম্বী ব্যাট গাছের তলার ছায়ায় অবলম্বিত একটি শ্বেত পাথরের বেষ্টিতে বসলুম। সামনে তাজমহল। আশে-পাশে বজ্রটা দেখা যায় তার মধ্যে অপর কোন লোক দেখতে না পেয়ে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো।

সম্মুখে সেই তুষারধবল শ্বেত-মর্ম্মরের উপর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাতে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের সৃষ্টি হয়েছিল আমি তার দিকে চেয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল, এ তাজমহল যেন পৃথিবীর নয়, সে কল্পনার অতীত কোন্ এক-মায়া-লোকের স্বপ্নসৃষ্টি।

কতক্ষণ এই ভাবে বসেছিলুম জানি না, হঠাৎ আমার পাশে একটা ভারী-পায়ের আওয়াজ শুনে আমার চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখি, আমার পাশে এক শাস্ত্রী-পাহারা দাঁড়িয়ে আছে—লম্বা একহারা চোরা, মাথায় রঙীন পাগড়ি, সর্ব্বাঙ্গে মূল্যবান পাথর আর কোমর থেকে বুলছে চকচকে খাণে মোড়া এক তলোয়ার।

এই সময় একটা মৃতিমান বেরসিককে সামনে দেখে সমস্ত মনটা যেন বিধিয়ে উঠলো। কঠিন দৃষ্টিতে এক বার তার দিকে চাইতেই সে সরে গেল অঙ্গ দিকে।

আবার আমি আমার ভাবরাজ্যে ডুবে গেলাম। কিন্তু একটু পরে দেখি, সেই লোকটি এসে একবারে আমার বেষ্টিতে আমারই পাশে বসেছে। আশে-পাশে আরো কয়েকটা বেশি খালি পড়েছিল, সেগুলোতে না গিয়ে আমার এই ভাবে বিরক্ত করতে আমি মনে মনে তার মৃগপাত করতে করতে সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লুম এবং সেই ভাববিরোধী, তলোয়ারধারী শাস্ত্রী-পাহারার সর্গর্গ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিশ্রীত দিকের একটা বেষ্টিতে গিয়ে বসলুম।

সেখানে বসে বসে আবার তাজের দিকে চেয়ে কখন যে আনন্দ-বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলুম জানি না। কিন্তু হঠাৎ আমার কানের কাছে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস শুনে চমকে উঠে দেখি, সেই মৃতিমান আবার আমার পাশে। অগ্নির দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে যেমন

উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি সে বলে উঠলো পরিষ্কার উরু ভাষায় কি বাবুজি, আমার ওপর কি আপনার গোসা হলো ?

বললুম, হবে না ? এত জাংগা থাকতে একটা মানুষের ঘাড়ের ওপর এসে বসলে কোন ভদ্র লোকের মেজাজ ঠিক থাকে ?

সে বললে, একলা আমার ভাল লাগছে না তাই আপনার কাছে বসতে এলুম।

তার মুখ থেকে এই কথা শুনে ভারী রাগ হলো, বললুম, একলা ভাল লাগছে না তা আমি কি করবো—একটা সঙ্গী কোথা থেকে ধরে আনলে পারতে।

সঙ্গী! বলে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে লোকটা চুপ করলে। আমিও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললুম, তোমার স্ত্রী নেই ?

সে কোন জবাব না দিয়ে তেমনি নীরব রইল।

আমি বললুম, তা যদি ভাল না লাগে ত চলে গেলেই ত পারো এখান থেকে।

এইবার সে কথা বললে। বুকের মধ্যে যেন একটা গভীর নিশ্বাস চেপে নিয়ে বললে, এখান থেকে চলে যাবার আমার হুকুম নেই।

বললুম, হুকুম নেই ? কেন ?

সে বললে, আমাদের বেগম-সাহেবা এসেছেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাজমহল দেখাতে। তিনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন আমাদেরও ততক্ষণ থাকতে হবে।

বিস্মিত কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলুম, বেগম-সাহেবা !

সে বললে, হ্যাঁ, ফের্দৌসগড়ের বেগম-সাহেবা। ফের্দৌসগড়ের নাম শোনেননি ?

বললুম, হ্যাঁ শুনেছি। তুমি বুকি এখানে প্রহরীর চাকরী করো ?

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে সে উত্তর দিলে, আমি বেগম-সাহেবার হারেমের খোজা প্রহরী।

খোজা প্রহরী! অসুচি শব্দে আমার মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরিয়ে পড়লো। তার পর তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, সত্যিই ত কোথাও কোন দাড়ি-গোঁফের রেখা নেই অথচ ক্ষুর দিয়ে কামানোও নয়। এর পর কি প্রশ্ন করবো ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেলুম, সেও আর কোন কথা না বলে তেমনি নীরবে বসে রইল।

এই চন্দ্রালোকিত রজনীতে, তাজমহলে এসে এক জন খোজা প্রহরীর পাশে বসে আছি, এই কথাটা মনে করে তখন কেমন যেন গাটা ঝিন্-ঝিন্ করে উঠলো। আমি সেখান থেকে উঠে দূরে আর একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। সেই বেঞ্চিটা ছিল কতকগুলো ঝাউগাছের ঝোপের আড়ালে। সে আমাকে উঠে যেতে দেখে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না, শুধু তেমনি ভাবে বসে কি যেন ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আবার আমার পাশে তার উপস্থিতি অমূল্য করে চমকে উঠলুম। কেমন করে কখন নিঃশব্দে সে যে আমার পাশে এসে বসেছে জানতে পারিনি। এবার বিরক্তির মুখে তার দিকে তাকাতে গিয়ে কিন্তু অবাক হলুম। এ ত সেই খোজা প্রহরী নয়—

এ যে এক নুশরী রমণী! চক্ষে তার বিলাস কটাক্ষ, কণ্ঠের বহিম ভঙ্গীতে পুরুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের প্রবাহ খেলে যায়—মাখায় কালো চুলের রাশ।

আমার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে সে মুহূর্তে বললে, বাবুজি, আমি খোজা নই, আমি জেনানা!

বললুম, কিন্তু বানশাহের হারমে ত জেনানা প্রহরী থাকে না! সে এইবার একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বললে, তা ঠিক, তবে আমি জোর করে খোজা সেজে আছি, কেউ জানে না যে আমি জেনানা।

এই কথা শুনে আমার বিষয় আরও বেড়ে গেল। বললুম, স্ত্রীলোকের পক্ষে খোজা কি জোর করে সেজে থাকা সম্ভব!

সে উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

আমিও তার মত কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার প্রশ্ন করলুম, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে ত বলো না।

এইবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে বললে, বাবুজি, তুমি যদি কোন দিন কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে, তাহলে বুঝতে পারতে তার জন্তে সব কিছুই করা যায়।

বললুম, তার মানে ? তুমি ত বেগমের হারমে থাকো ?

সে বললে, হ্যাঁ, বেগমের হারমে এই চাকরী নিয়েছি শুধু বাদশাহাদাকে চোখে দেখতে পারবো বলে।

বললুম, তুমি কি তাহলে বাদশাহকে ভালবাস ?

সে বললে, হ্যাঁ।

কেমন করে তা সম্ভব!

সে বললে, তরুণ বাদশা যখন ঘোড়ায় চেপে আমার কুটারের সামনে দিয়ে প্রতাহ ভোরের বেড়াতে যেতেন, আমি তখন ঘুম ভেঙ্গে উঠে জানলার পাশে বসে তাকে দেখতুম। তার পর একদিন কেমন করে যে তাঁকে আমার সমস্ত প্রাণমন এটো দেখার ভেতর দিয়ে সমর্পণ করেছিলুম জানি না। যে দিন থেকে তিনি সেই পাথে যাওয়া বন্ধ করলেন, সেই দিন থেকে আমি অমূল্য বসে রইলুম যে, তাঁকে চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বাঁচবো না। তাই এই খোজা প্রহরী সেজে হারেমের চাকরী নিয়েছি। উঃ, সে কি যন্ত্রণা! আমার চোখের সামনে তিনি বেগম-সাহেবার ঘরে যান তাও আমি সহ্য করি, কিন্তু তবু তাঁকে না দেখলে কিছুতেই বাঁচতে পারবো না। তাই সূর্য্যোদয় বাজার বজর কেটে গেছে আমি এখনো এ চাকরী ছাড়তে পারিনি। এই বলে সে যেন উদ্গত অশ্রু সংবরণ করতে করতে সহসা সেখান থেকে উঠে দ্রুতপদে এক দিকে চলে গেল।

আমি বজ্রাহতের মত বসে রইলুম। সেই তাজমহল তখন আমার চোখের সামনে থেকে কোথায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল আর তার স্থলে সেই খোজা প্রহরীর মূর্তিটি বিলম্বিত হয়ে উঠলো সেই পাথরের ইমারতের বুকে! মৃত তাজমহল যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করলে।

সে দিন সাঝা রাত আমার চোখে ঘুম এলো না। মনে হ'লো, এত দিনে সার্থক হলো আমার তাজমহল দেখা।

নদীর তীরে স্থল্লর তপোবন। ত্রিষ্টি শ্ববি বরুণের সাধনাক্ষেত্র। শ্ববির কঠোর তপশ্চালক ব্রহ্মজ্ঞান বহু শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মসঙ্কল্পকে এই পুত্র তপোবনে আকৃষ্ট করিয়াছে। জ্ঞান বিতরণে শ্ববির এতটুকু কাৰ্পণ্য নাই। এক দিন শ্ববিশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থিগণ সহ জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত আছেন, পুত্র ভূগ আসিয়া বলিলেন, “অধীহি ভগবো ব্রহ্মক্ৰি” (ভগবন, আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে শিক্ষাদান করুন)। পিতা দেখিলেন, পুত্রের প্রার্থনার মূলে কোন পার্থিব কামনা নাই। অল্প কোন বিভালাভের ইচ্ছা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। একেবারে পরাবিজ্ঞা শিক্ষালাভের সংকল্প ! বশের আদর্শ আজ পুত্রকে অমুপ্রাপিত করিয়াছে। ইহা ভাবিয়া পিতা পুত্রসৌরব অমুভব করিলেন। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে পিতা বলিলেন, বৎস, ব্রহ্ম উপদেশের বিষয় নয়। উহা গভীর অমুভূতির বিষয়। অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য এই সমুদয়ই সেই ব্রহ্মোপলব্ধির স্বরস্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুর কি, তাহার ও সঙ্কেত পুত্রকে প্রদান করিলেন। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তথিজিজ্ঞাসস্ব। ‘তদ্ ব্রহ্মক্ৰি’ (যাহা হইতে প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে, জন্মলাভ করিয়া যাহা দ্বারা জীবনধারণ করে, এবং প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করে বা লীন হয়, তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর। তিনিই ব্রহ্ম, তুমি তপস্তা কর।

পুত্রের শুভানুধ্যায়ী একাধারে পিতা ও আচার্য্য—পুত্রকে ব্রহ্মের সংজ্ঞা উপলব্ধির উপায় ও পথনির্দেশ করিলেন। পুত্র বিশ্বসত্যের অমুভূতির জ্ঞান তপস্তা করিতে গেলেন। দুর্বল ইচ্ছাকে তপঃ সতেজ করে। পুনঃ পুনঃ অমুশীলনে সাময়িক সদিচ্ছার স্থায়িত্ব লাভ হয়। “আত্মবিজ্ঞা তপোমূলং,” “তপসা চায়তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ঋতিবাক্য তপস্তাকে সত্যোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। “শুচো দেশে ভূতিঃ সমুদ্রঃ যদধীয়ানঃ সদ্ব্যপী সদ্ব্যপী সদবাজী শ্রাং”। গিরি, নদী, পুলিন এবং গুহাদি স্থানের জায় পবিত্র স্থানে উপবেশনপূর্বক পবিত্র ও প্রসন্নচিত্ত, সঙ্গ্রহ অধ্যয়নকারী, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, ব্রহ্মসাধনায় রত হইবেন। ইহাও সেই ঋতির নির্দেশ। পিতার বাক্য শ্রবণ গ্রহণ করিয়া পুত্র ঋতি-নির্দেশিত স্থান ও উপায় অবলম্বনে তপস্তা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল। তপস্তার বিরাম নাই। তপস্তায় ভূগ এই অমুভূতি লাভ করিলেন যে, রেতোবীজ-রূপে পরিণত অন্ন হইতে জীব জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর নিজ নিজ জাতির উপযুক্ত অন্ন দ্বারা প্রাণধারণ করে এবং মৃত্যুকালে অন্নাস্বাদিকা পৃথিবীতে লীন হয়। স্রুতরায় অন্নই ব্রহ্ম। নব ধারণার কথা ভূগ পিতাকে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ পিতা দেখিলেন, পুত্রের অমুভূতি জাগিয়াছে। কিন্তু উহা স্থূল অমুভূতি। পিতা পুত্রকে পুনরায় তপস্তা করিতে বলিলেন। “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।”

পুনঃ পুনঃ তপ ও ধ্যান দেখে মনের মালিকা দূর করে। তপস্তায় সূপ্ত শক্তি জাগ্রতি হয়। সঙ্গে সঙ্গে আসে একাগ্রতা। তপস্তায় ষড়্বিকুমাৰ পুনরায় এক নব অমুভূতি লাভ করিলেন। অন্ন অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণও অন্ন প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্রই আধার ও শক্তির একত্র সমাবেশ। একের অভাবে অষ্টটি ক্রিয়াশীল হয় না। এই জগৎ জগৎকে অগ্নিবোমাস্বক বলে। (স তপস্তুপ্তা। স মিথুনমুৎপাদয়তে—রয়ি, চ প্রাণং চেতি)। প্রাণশক্তি স্পন্দন দ্বারা ক্রিয়া করে। জগৎ

ব্যাপারে সর্বত্রই প্রাণের এই আদান-প্রদান পরিলক্ষিত হইতেছে। উবার মনোহারিণী জ্যোতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিধ ব্যাপিয়া এক অপূর্ব স্পন্দন অমুভূত হয়। আদিত্যমণ্ডল হইতে সবিতার প্রাণ-রূপী সহস্ররশ্মি দিকসমূহ সমুজ্জ্বল করিয়া দুর্বীর বেগে ছুটিয়া আসে ধরাতলে। সেই প্রাণরশ্মি পানে ধগ্ন হয় প্রাণি-জগৎ। অপূর্ব রূপছটা ও বর্ণস্বৰমা বৃকে লইয়া তরু, লতা ও পুষ্পরাজি বিকসিত হয়। মানবনয়নে কুটিয়া উঠে অপূর্ব দীপ্তি। প্রাণিদেহে প্রকাশিত হয় নূতন স্পন্দন। তপ্ত সমীরণে জাগে দুৰন্ত চাক্ষ্য। বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতেরও এই প্রাণ-স্পন্দনের হৃদামগ্নতা রহিয়াছে। ভূগ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাণ হইতে প্রাণীর উদ্ভব। প্রাণশক্তিতে তাহার জীবন এবং পরিশেষে প্রাণেই প্রতিগমন। অতএব প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণতত্ত্বের এই নব অমুভূতি পুত্র পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন। বরুণ ভূগুর সাধনার ক্রমোন্নতি দর্শনে প্রীত হইলেন। দেখিলেন, পুত্রের সাধনার একাগ্রতায় তাহার মধ্যে হৃদ্মাহুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। পিতার আদেশ পূর্ববৎ। “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্মক্ৰি”। পুত্র আবার তপস্তায় গমন করিলেন। হৃদ্মাহুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আসিল গভীর তন্ময়তা। এই তন্ময়তা নব-নব তত্ত্বের পরিস্ফুটন-ভূমি। ইতস্ততঃ প্রবহমান চিন্তারাপি তপস্তার দ্বারা হৃদ্মাহুভূতির ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত হইলে, সাধক সাধনার নব নব স্তরের সন্ধান পায়। ভূগুর মনে হইল, কত চিন্তা না মন হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। উদ্ধৃত হইয়া মনে পরিস্ফুট লাভ করিতেছে এবং তৎপরে মনেই লীন হইতেছে। অতএব মনেই ব্রহ্ম। নব অমুভূতির বার্তা পুত্র আবার পিতাকে নিবেদন করিলেন। পিতা দেখিলেন, পুত্রের অমুভূতি হৃদ্ম হইতে হৃদ্মতর হইতেছে। পিতা আবার ইঙ্গিত করিলেন, ‘তপ কর’। পুনঃ পুনঃ তপ দ্বারা আত্মশোধন হয়। আত্মশোধনের ভিতর দিয়া অসীম শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। এই শক্তি সঙ্কেতে সাধক অন্তর্মুখী হয় ও বীৰ্যবস্ত্র অমুভূতি লাভ করিতে থাকে। দেহরাজ্য, প্রাণরাজ্য ও মনোরাজ্য জয়ে সাধক সাধনার উচ্ছগতিতে আর এক নব রাজ্যের সন্ধান পাইলেন। ইহা বিজ্ঞানরাজ্য। প্রাণের পশ্চাতে মন এবং মনের পশ্চাতে আর এক মহাশক্তি। ইহা নিশ্চয়াস্বিকার জ্ঞানশক্তি। এই বিজ্ঞানময় রাজ্যে আসিয়া সাধক এই জ্ঞান শক্তিকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। “হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যত্ব পিহিতং মুখম্”। সত্যের মুখে আপাত মনোরম হিরণ্ময় আবরণ দেখিয়া তাহাকে সত্য ভাবিয়া তাপস বিভ্রান্ত হয়। আবার পিতার নিকট নিবেদন। আবার পিতার পূর্ববৎ ইঙ্গিত। “তপঃ ব্রহ্মক্ৰি”। আবার কঠোর তপস্তা। এবার অমুভূতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাপস আনন্দের আতিশয্যে বহুদূর স্বরে ঘোষণা করিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। “নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।” সর্বত্রই আনন্দ।

আনন্দ-তরুতে বসি, পাখী গায় আনন্দের গান
আনন্দের ফুল দোলে, বরে যায় আনন্দ-ভূতান।

উপনিষৎ এই আনন্দের জয়গানে ভবপূর। “যুবা শ্রাং সাধু যুবাধ্যায়ক আশিষ্টো দৃষ্টিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তত্ত্বস্য পৃথিবী সর্বা বিভক্ত পূর্ণা শ্রাং। স এক মাত্বয় আনন্দঃ। তে যে শতঃ মাত্বয়া আনন্দাঃ, স এক মম্বয়গন্ধর্বানমানন্দঃ”। ইত্যাদি। রূপ, বোধন, চরিত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৃঢ় বলবান শরীর, এবং সম্পদ ও ভোগোপকরণ-পরিপূর্ণ সমগ্র

ধরণীর একচ্ছত্র লাভ মানবের কাম্য, শ্রেষ্ঠতম আনন্দ। একপ শতগুণবর্ধিত আনন্দ এক মহাব্যগকর্ষের আনন্দ। শত গন্ধর্কের একীভূত আনন্দ এক দেবগন্ধর্কের আনন্দের সমতুল। একপ শতক্রম-বর্দ্ধনশীল পিতৃগণের, দেবতাগণের, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি ও হিরণ্যগর্ভের আনন্দ। কিন্তু সকল আনন্দের আধার সেই ব্রহ্মানন্দ, সেই ভূমানন্দ। যেখানে সর্বপ্রকার আনন্দের পরিসমাপ্তি, সেই নিত্য বিজ্ঞানানন্দই ব্রহ্ম সংখ্যা, কাল ও সীমার দ্বারা পরিমাপক ও পরিচ্ছিন্ন হয় না। উহা অনন্ত ও অপার।

তাহাকে জানিলে জীব হয় মুক্ত-পার।

অয়নের তরে অজ্ঞ পথ্য নাহি আর।

* * *

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ।

আনন্দঃ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদানন্দ।

ভূত্বয় তপস্তা একটি সহজ সাধনার ইতিহাস। অমরত্ব, ইন্দ্রিয় ও ত্রিলোকের অধিপত্য লাভের জন্ম বা কোন দেবতার যজ্ঞভাগ ও অধিকার হরণের জন্ম এ তপস্তা অমুদ্বিতীয় হয় নাই। বিভূতি লাভ বা ব্রহ্মাশ্রয় প্রভৃতি মাংসাত্ম লাভ এ তপস্তার উদ্দেশ্য নয়। স্তবরাং এই তপস্যার বিদ্যুৎঘটাবার জন্ম আশ্রম-পটভূমিকায় কোন শক্তিত দেবতার প্রেরিত কোন প্রলোভনময়ী রূপজীবিনীর আবির্ভাব হয় নাই। কোন অলৌকিক ঘটনার নাটকীয় ঘাত ও প্রতিঘাতে সাধনার রহস্য গভীর হইতে গভীরতর হয় নাই। ইহা সহজ মায়াবের

সরল সাধনার ইতিহাস। আত্মবিকাশের আত্মোপলব্ধির ইতিহাস। পিতার নিকট পুত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা নিবেদন করিলেন। পিত্তা সেই সাধনার সহজ পথ নির্দেশ করিলেন। অন্ন, প্রাণ, শ্রোত্র, মন ও বাক্য সেই সাধনার স্বায়ংস্বরূপ। কেন, জবাব প্রভৃতি উপনিষদের স্বস্তিঘটনে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। “ও আপায়ন্তু মমাক্ষানি, বাক্ প্রাণ চক্ষুঃ শ্রোত্রমহা বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বত্র ব্রহ্মোপ-নিষদং” (আমার অঙ্গসমূহ, বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সর্ব উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)। ব্রহ্ম লাভ করিতে হইলে আপনাকে সর্বতোভাবে ব্রহ্ম অমুভূতিযোগ্য করিয়া গঠন করিতে হইবে। “পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব।” ইহাও সেই শ্রুতির অলুপ্যাসন। পিতার আশীর্বাদ, গুরুর উপদেশ সফল করিয়া পুত্র ও শিষ্য সাধনার পথে অগ্রসর হইলেন। তপস্যায় ক্রমশঃ অমুভূতি জাগিতে লাগিল। স্থল হইতে সাধনার একাগ্রতায় স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে স্বপ্নতর স্তরের অমুভূতি আসিতে লাগিল। এই সাধনার কালে সাধক যখন নিজের ক্ষমতার রিক্ততা অমুভব করিয়াছে, তখনই ত্রিকিষ্টি গুরুর একটি উপদেশ, একটি ইঙ্গিত ও একটি স্পর্শ শিষ্যের শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নব শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছে। পাইয়াছে সত্যের নব নব তত্ত্ব। সন্ধান পাইয়াছে কোশের পর কোশ অতিক্রম করিয়া স্থিতি ও প্রলয়ের মূল, আলোড়ন, বিবর্তন ও পরিবর্তনের আদি উৎস সেই সং, চিৎ ও আনন্দময় ইন্দ্রিয়ত মহাবস্তুর।

একটি বিকাল

শ্রীহরচন্দন মুখোপাধ্যায়

সারা দিন ষাটুনির পর উঠানের একটি ভাড়া চোয়ারে হেলান দিয়ে বৈকালিক আমেজটুকু উপভোগ করছিলাম। বাড়ীর ভেতরে চলছিল বুড়ো চাকর রমজানের সাথে আত্মজিনীর বচসা। সেটাও আমার আত্মপ্রসাদের মস্ত-বড় মাল-মশলা। কারণ, রমজান অলকার বাপের বাড়ীর চাকর, অলকারে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে সে। তাই অলকার গিন্নীপণা তার যেমন অসহ—আবার অজ্ঞ দিকে রমজানের কর্তৃত্বও অলকার তেমনি বিস্মূহ। কেউ কারো তোয়াক্বাও করে না, অথচ একের বিহনে অস্ত্রের চলাও মুশ্বিল।

খোঁটার দেশ, নেহাৎ চাকরীর জন্ম টিকে থাকা। চকিশ ঘটার মধ্যে বৈচিত্র্য একটি মুহূর্তেও নেই, যন্ত্রচালিতের মত পার হয়ে যায় একটির পর একটি শনিবার, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগুপ্তের দপ্তরেও পড়ে যায় লাল কালির দাগ।

পাশের বাড়ীর এক মাস্তাজী ভদ্রলোকের হিন্দুস্থানী চাকর হাতে খৈনী টিপতে টিপতে শিলু রাগিণীর পিতৃশ্রদ্ধ করছিল, সেটাও কাশে এসে উপস্থিত মন্দ শোনাচ্ছিল না। ঘণ্টাখানেক পূর্বেই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ভিজ্জ-মাটির সোঁদা গন্ধটুকু মনের মাঝে এনে দিচ্ছিলো হুমের নেশা, সামনের বাগানে ফুলগুলি এখনও জলে টলমল করছিল, বিরহ-বিধুর আঁধার মত আর বুড়ো অশ্বখগাছটা কক্কাকে ঠেকছিলো ঠিক বাঁধানো-ধাঁতের হাসির মত। যেহালা মনের এত-গুলো খোঁরাক পেটুকের মত আত্মসাৎ করছি, হঠাৎ মাথার

ওপর দিয়ে ভেসে গেল একরাশ ধবধবে মেঘ যেন ব্যাধতাড়িত হস-বলাকা উড়ে পালাল, ভয়ে ক্রোধে ফুলতে ফুলতে।

পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো চুম্বার হয়ে গিয়ে মনের মাঝে এনে দিলে বহু কালের কতগুলো দুরন্ত মরিচাধরা কাহিনী। সেই কবে বর্ষার দিনে পাঠশালার পড়া তুলে বৃষ্টিতে ভিজ্জ ভিজ্জ মিনটু আর আমি লুকোচুরি খেলেছি, মাথায় বাজ-পড়ার ভয়ে মিনটুর কচি মুখখানি যখন আরও বাড়া হয়ে উঠতো, তখন সাহস পেয়েছে শুধু আমার মুখ চেয়ে। মনে পড়ে, এক দিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামলো, মিনটু তখনও বাড়ীতে নেই দেখে সকলকে উদ্ভোক্ত করে তুলেছিলাম বাড়ী-ফাটানো চাঁৎকারে, তার পর বুড়ো-শিবতলা থেকে ছুটে ছুটে—কত মার্ত বাঁশবন পার হয়ে তালপুকুরের গায়ে এসে দেখি, একটা হেলানো খেজুর গাছের তলায় বসে বসে মিনটু ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। আমায় দেখে তার মুখে ফুটে উঠলো হাসির বিজলী, বাঁপ দিয়ে আমার কোলে চড়ে বসেছিলো, “তুমি কি করে এলে রত্না? তোমার ভয় করে না? দেখছ না, মেঘগুলো সব ছুটে ছুটে আমাদের দিকেই আসছে।”

সে দিন মেঘ আমার কাছে এসেছিলো কিংবা মিনটুকে অতি নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়েছিলুম জানি না, কিন্তু এর পর বছর কয়েক বর্ষার দিনে মেঘের খেলা আমার এই দুর্কলতার স্বেগে নিয়ে অন্তরকে পীড়া দিয়েছিলো কতিন ভাবে। অনেক দিন পরে আঁকা-বঁাকা অক্ষরে

লেখা মিনটুর এক টুকরো চিঠি পেয়েছিলুম,—“রত্না, তুমি ম্যাটরিক পাশ করেছ শুনে খুব খুসী হয়েছি।”

ভালোবাসার তত্ত্বমা দিয়ে মিনটুকে প্রকাশ করা যায় না, সে পাঠশালায় কচি মেয়ে, জ্ঞানবিহীন সজ্ঞাজাত কুঁড়ি, ভ্রমরের প্রায় এখানে অবস্থার। তবু ছদ্মের সাথে ছদ্মের বিনিময় যে হয়েছিলো এটা জানি, তাই বর্ষার ভেজা আমেজটা আমার চিরকালই লাগে মধুর—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও মোচড় দিয়ে ওঠে বেদনার কুণ্ডলী পাকিয়ে।

এর বছর চারেক পরে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে আর এক বর্ষায় দেশে গিয়েছিলুম মাসখানেকের জঙ্ঘ। সে-বার মিনটুকে বেশ বড়-সড়ই দেখেছিলাম। আমাকে তখনও ভোলেনি, তবে পাড়ার চোখে আমার সান্নিধ্য তার পক্ষে আজ-কাল আর মোটেই নিরাপদ নয়, তাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ে ওর দেহ, আমার সহস্র যুক্তি ফিরে আসে পরাজয়ের পতাকা বহন করে। ভেবেছিলাম, ছেলেবেলার সে মিনটু আর নেই, হয়তো বা মনটাকে বদলে ফেলেছে, কিন্তু এ ভুল ভাঙলো আমার ওখান থেকে চলে আসার দিন। সমস্ত দিনটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার পর লজ্জা-সরম বিসম্মত দিয়ে আমার কাছে এসে বলেছিলো, “রত্না, এতো শীগগির যে চলে যায় তার না আসাই ভালো।” সে দিন তার বেদনার একটা কিছু পাশ-করা প্রসঙ্গ হয়তো দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ বুঝতে পারি, কত দিনের পুঞ্জীভূত ভালোবাসার পুষ্পাঞ্জলি সে সাজিয়ে রেখেছিলো আমার জঙ্ঘ আর কত বড় বুক-ভরা অভিমান আর ব্যথা প্রকাশ পেয়েছিলো তার ওই ছোট কথাটিকে কেন্দ্র করে। তাই আজও বর্ষার প্রতিটি জলের ধারার মাঝে দিবাক্ষে দেখতে পাই, মিনটুর বিদায়-বেলার ছল-ছলে চোখ দুটি।

আমার বর্তমান বিবাহিত এবং পুরোদস্তুর সাংসারিক জীবনের মাঝে মিনটুর প্রসঙ্গটা হয়ে যায় নেহাৎ থাপছাড়া, তবু জাগতিক আদান-প্রদানের আড়ম্বরবাহুল্যে সব-কিছুকে এড়িয়ে চলেও অন্তরের নিভৃততম স্তরে যে গোপন ভালোবাসাটুকু লুকিয়ে থাকে, তাকে স্মৃতির কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটু কঠিন। নীরস হাব-ভাব দেখিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুমত শুধু নিয়মের মোড়কে বাঁধা নিছক অভিনয় করা খুবই সহজ, কিন্তু আত্মীয়তার কোমল তত্ত্বাগুলো বেখানে মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর হয়ে বাঁধা হয়ে যায়, সেখানে ইচ্ছা করলেই তাকে বেস্বরো করা যায় না। তাই বিগত দীর্ঘ জীবনের চঞ্চল মরীচিকার নিরাশ হয়ে যখন মুসড়ে পড়েছি, তখনও বুকের মাঝে দোলা দিয়েছে মিনটুর প্রাণভরা আবেগের গভীর পরশ। তার পর ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যখন শুধু অতীতকে সঞ্চল করে জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জঙ্ঘ ভারতের অন্ধ প্রান্তে চলে এলাম, তারও মাঝে স্মৃতির স্বপন দেখছি শুধু মিনটুর সেই চির-চেনা মুখখানি কল্পনা করে।

চিন্তাস্রোতাটা বাধা পড়ে গেল আমার সাত বছরের খোকা স্বপনের গলা শুনে। বেচারি বোধ হয় সমস্ত দিন স্কুলে আটক থাকার ফল অভ্যাসটাকে জাহির করছিল মায়ের সাথে কুক্করের যুদ্ধাধিয়ে, হঠাৎ কান-কান মুখে বাইরে এসে আমার বলে, “বাবা, তামায় গুলী করবো।” মস্তব্যটিতে বেশ একটু হকচকিয়ে গেলাম, খুঁতলে দেখি, বাবাজীর হাতে একটি জাপানী ছোট খেলার বন্দুক। দলের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, “এখন গুলী-গোলা থাক বাবা,

আরও একটু বড় হও, তার পর ও-সব করো।” পলকের মধ্যে নিজেই ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল সামনের বাগানে, তার নিজের হাতে-রোয়া মালতী গাছটার তলারক করতে।

রমজান এক পেয়াল চা দিয়ে গেল, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে গরম চায়ের মিলটা রাজকোটক বলেই মনে হল। ওপরে সাধা ওড়না-গায়ে মেঘের অভিনায় ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, মাঝখানে ফুটে উঠেছে নীল আকাশের স্বচ্ছ চাদোয়া। মূগ ফিরিয়ে দেখি, রমজান অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে; ভাবলাম, হয়তো বা হতভাগা চাকুর অলকার কাছে কতকগুলো মিঠে-কড়া বিশেষণ লাভ করে আমার কাছে তাইই নালিশ জানাতে এসেছে—যেমন মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন হয়। কড়া সুরে বললাম, “কি রে, কি বলছিস?”

মুখখানা পাণ্ডু করে—কাকুতি জানিয়ে বললে, “বাবু, ভুলে গেছি।”

“ভুলে গেছি কি রে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।”

ভূমিকার আতিশয্যে আমার ঠৈষ্যের বাঁধন ছিঁড়ে গেল, জোর-গলায় বললাম, “বেরো এখান থেকে।”

ধীরপদে ঘাবরে মধ্যে চলে গেল। নিজের কর্কশতার জঙ্ঘ হুম্বিতও হলো, লোকটা বোকা হলও অতিরিক্ত সরল আর ততোধিক অমায়িক। খানিক পরে সমস্ত হাতে একখানা রঙীন খামের চিঠি সামনের টিপরে বেধে দিয়ে গেল। সে যে কি ভুলে গিয়েছিলো তা বুঝলাম এতক্ষণে। আফিস থেকে ফেরার অবাবহিত পরেই চিঠিখানা হাতে তুলে দিয়ে মনিবের কঙ্করাস্ত্র মনটাকে খুসী করতে না পারার জঙ্ঘ তার এই গভীর অম্মতাপ।

চিঠিখানা লিখেছে লতিকা। কলেজের হালকা দিনগুলির মাঝে যখন ছুনিয়াটাকে দেখেছিলাম রঙীন চোখে, সেই সময় আলাপ হয়েছিল এই ‘আপটু-ডেট’ মেয়েটির সাথে। প্রথম জনাশোনার হালকা বাতাসে, আমার মানসিক দুর্বলতাটুকু লতিকার আধুনিক উঁচু আবহাওয়ার দরজায় কি ভাবে এবং কতটুকু প্রবেশ-পথ করে নিয়েছিল তা জানি না, কিন্তু পাউডার-ঘষা মুখখানার সাথে হাই-হিল-এর সামঞ্জস্য আমারও মনে ধরিয়ে দিয়েছিলো চমক, হয়তো মিনটুর স্মৃতিটা মনের মাঝে চুপ-স্বরকি দিয়ে গাঁথা না থাকলে ভবিষ্যতে হয়ে দাঁড়াতো আরও জটিল। এখনও মাঝে মাঝে পত্রালাপ করে, ভাষাটা বিরহীণীর হা-হুতাশ-ভরা ভাঙা ভাঙা দরদ মাঝানো কথার টুকরো। ভাগ্যক্রমে অলকার হাতে চিঠিখানা পড়েনি, তাহলে আমার বাড়ীতেও আরম্ভ হত নতুন করে মাথুর-লীলা।

চিঠিখানা খুলে দেখি, আমার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে লতিকার ধারণা খুবই উঁচু, এমন কি, আমার তরফ থেকে সাহেব বনে বাওয়ার কথা। আর বাংলা ভুলে যাওয়ার বিলীখিকা তার মনে এসে গেছে ঠিক একটা সন্দেহের নির্ভাগোয়ুথ কুলাকির মত।

আবার মনে পড়ে গেল মিনটুকে। আমার সম্বন্ধে তার ধারণাটা ছিল সম্পূর্ণ উলটো। সে জানতো যে, মাতৃভাবাই ছিল আমাদের ধ্যান, ধারণা, তপস্যা এবং প্রাণের চেয়েও প্রিয়। মিনটু এটাও টের পেয়েছিলো যে, জীবনের জোয়ার-ভাঁটা তার নিজেকে হারিয়ে ফেললেও বাংলা ভাষা থেকে বাঁচে আমার অস্থিমজ্জার সাথে মিতালী পাকিয়ে একত্রীভূত হয়ে।

জন্মভূমির ওপরেও তেমনি ছিল আমার একটা অবিচ্ছিন্ন দরদ। সেই সুখলা, সুফলা, শশুশ্যামলা মায়ের চিন্ময় মুষ্টিটিকে যেন আমার বুকের মধ্যে জলন্ত অঙ্করে রেখেছে খোঁদাই করে। সেই মন-ভুলানো ভাষা আর প্রাণ-মাতানো গান আজও আমার কর্ণরঞ্জে অমুরাগভরে পোলা দিয়ে যায় বসন্তের দক্ষিণ বাতাসের মত। তাই নকলী ভাষা আর নকলী পোষাকের সঙ্গে নিরন্তর বোঝাপড়া করতে হলেও এ পোকানপারীর ঠাট আমার মনটাকে দেয় বিধিয়ে। ঢের ভাল সেই বাংলার উনার মাঠে নয়দেহে ভিজ়ে মাটির ওপর “আথো আলো আথো ছায়াতে” চাঁদের প্রতীক্ষা। কর্ণের তড়নে উদ্ভাস হয়ে ব্যক্তিত্বকে বিশঙ্কন দিয়ে স্বর্গে বাস করার চেয়েও ঢের ভাল সেই পাড়াগাঁয়ের মালেরিয়ার বাতাস, অপেক্ষাকৃত বাহ্যনীয় তাদের কুটিল মনোভাব। বরা বকুল, ফোটা পদ্ম, কোকিলের কুহেলী আর উৎসবের মাধুর্য্যে বেথানে জীবন্ত, থাক না সেখানে কুটিল মনোভাব, তবু ‘ডাল-কটী’র উৎকট আবহাওয়া সেখানের ভিজ়ে মাটিতেও প্রবেশ-পথ না পেয়ে ফিরে আসে পরাজয়ের ঘ্রানিটাকেই মুকুটের মত মাথায় চড়িয়ে।

ঐর্ধ্যসংকারে চিঠিখানা শেষ করলাম। শেষের দিকে লিখেছে, ‘মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যদি কোনখানে আমার চিহ্ন খুঁজে পাত, তাহলে উত্তরটা দিও।’ এমনিই তার ভাষা, এমন কি, চালচলনটাও এমনিই হৈয়ালিতে ভরা। মিনটুর সাথে লতিকার সবচেয়ে বড় অসামঞ্জস্য ঘোষণে পড়েছিলো এইখানটাতেই। তাই লতিকাকে চিঠির জবাব দিতে হয় ভদ্রতারক্ষার দোহাই দিয়ে, কিন্তু মিনটুর হাসিটি সময়ে অদম্যে বুকের মাঝে জেগে ওঠে অমানিশার বিজলীর মত। দূরে থাকার বিবাদময় মরীচিকায় প্রাণটা যখন ডুকরে ওঠে শুধু সেই হাসিটিকে কেন্দ্র করে, তখন সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে, পরিবর্তনশীল জগতে বৈচিত্র্যই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণতার দিকে। সংসারের সাবলীল গতির মধ্যে অলস ভাবে গা ঢালে দিলে ক্ষণিক আনন্দ মনকে বিভোর করে তোলে বটে, কিন্তু সেটা হয়ে যায় গতানুগতিক। তাই মিনটুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার করুণ সুরের মুছনায় আমার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে নিরন্তর বিধিয়ে তুললেও শুধু একটা চিন্তা আমার এই পরিণতবয়স্ক দোহুলামান অন্তরে আনন্দের রেখা জাগিয়ে তোলে যে, আমিও হয়তো তার কলিজার কঁাকে কঁাকে হুঁ-একটা আঁচড় কেটেছিলাম। বর্ধার সরস-মধুর আবহাওয়ার আমার স্মৃতিটুকু তার মনকে করে তুলবে তাক্সা, ঠিক টাটকা ফুলের মত।

অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, আমার বড় মেয়ে মালতীকে

ঠলেতে ঠলেতে অলকা এই দিকেই তাকে নিয়ে আসছে। মালতীর অন্ততঃ আব মার-খোর খাবার বয়সটা নেই, কাজেই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে উজ্জতফণা ফণিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিলাম। অলকা রাগে মুগ্ধখানার রঙ, আরও একটু টকটকে করে বললে, “তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর পরকালটা খেলে, কিন্তু লোকে যে যাচ্ছেতাই করছে, সেটা কি কাণে যায় না?”

একটা অম্লত কিছু আশঙ্কা করে চোখ দু’টা বৃজে ফেললাম।

—“এতো বড় মেয়ে, এখনও বিধিগণা করে ছোঁকরা-মহলে খেলাধুলা, গান-বাজনা করে বেড়ান, শুধু কি তাই? আবার অভিনেত্রী, সভ্যনেত্রী কতো কি! তাতেও আমি কিছু বলিনি, কিন্তু এবার লোকের মুখে কি চাপা দেবে দাও।”

মালতীর আধুনিক হালচাল অলকা বরদাস্ত করতে পারে না। ভাবলাম, তাইই একটা জলন্ত আকোশ বরন একটা সামাজ্য থুঁতকে কেন্দ্র করে প্রকাশ হতে চাইছে। গলায় জোর দিয়ে বললাম, “এতো হাদ্ধামা করছো কেন, কি হয়েছে?”

অলকার রাগের আগুনে ঘির পরিবেশন হয়ে গেল,—“কি হয়েছে, তা তোমার ঐ গুণবতীকেই জিজ্ঞেসা কর।”

মালতীর মুগ্ধখানা গম্ভীর, চোখ দু’টা থেকে বার হতে চাইছে নালিশের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ। অপরাধ সম্বন্ধে সেও বোধ হয় অলকার মত এতোটা সজাগ নয় বলেই মনে হয়, তবু অলকার ভয়ে সে নির্বাক ঝাঁড়িয়ে রইলো কাঠের পুতুলের মত।

অলকা বার-দুই মেয়ের পানে আড়চোখে তাকিয়ে বলতে লাগলো, “এই যে ও-পাড়ার সুধীরের সঙ্গে এমন মেলামেশা, রাত নেই, দিন নেই, ওর না হয় লজ্জা-যেন্না সবই গেছে, কিন্তু পাশের বাড়ীর সরকার-গিন্নী কি বলেছে জান তো? বলে,—‘এবার ওদের দু’জনের—’”

সরকার-গিন্নীর মন্তব্য শোনবার মত ঐর্ধ্য আমার আর নেই। এই কুংসিত আলোচনাটার পরিসমাপ্তি ঘটলেই যেন হাঁফ ছাড়ি। তাছাড়া আজকালকার মেলামেশাটা এমন কিছু জীবন-মরণ সমগ্রাণ্ড নয়। বাধা দিয়ে বললাম, “যাক, এখন ছেড়ে দাও ও-সব কথা। তুমি ভেতরে যাও, আমি ওকে সাবধান করে দেব এখন।”

অলকা হুম-হুম করে পা ফেলে ভেতরে যাবামাত্র মালতী স্পষ্ট গলায় বললে, “আমি ‘সুধীরদা’কে ভালোবেসেছি বাবা, এমন কিছু অজ্ঞান্য তো করিনি।”

সর্জনশ! আমি প্রমাদ গণলাম। শৈশবের যে ধাক্কা আমি আজ এই শেষ জীবনে গিলিত-চর্চণ করে আয়াম অমুভব করছি, ও মেয়েও আমার সেই পথের যাত্রী! আমি নিরুত্তর।

“যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিস্তৃত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির সম্ভাবনা নাই।...যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে?—বঙ্কিমচন্দ্র

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন দেশের জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূল শিল্প প্রবর্ধন ও সমুন্নয়ন-পরিচালনা কার্যকরী হইতে পারে না। অর্থনীতি রাজনীতির একটি বিশিষ্ট ও প্রকৃষ্ট অঙ্গ। রাজনৈতিক স্বাভাব্য এবং স্বাধীনতা ব্যতীত কোন দেশেই অর্থনৈতিক স্বাভাব্য ও স্বাধীনতা সম্ভবপর নহে। পরাধীন দেশে অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির বশীভূত; এবং যে দেশে পর-পরিচালিত রাজনীতি রাজশক্তির বিশিষ্ট অথবা স্বতন্ত্র স্বার্থ সাধনার্থ যত কূটমার্গ অবলম্বন করে, সেই পরাধীন দেশে শিল্প-প্রবর্ধন ও সমুন্নয়নের মাধ্যমে (medium) অর্থনৈতিক উন্নতি তত প্রতিহত হয়। এই নিমিত্ত পরাধীন ভারতে শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বহু বৎসরব্যাপী শিল্প-প্রবর্ধন ও সমুন্নয়ন-প্রচেষ্টা পদে পদে প্রতিহত হইতেছে।

নিম্নরূপ দুঃখ-দুর্দশা-পূর্ণ বহু বৎসরব্যাপী প্রচেষ্টা এবং তীব্র ক্রেশকের সাধনার ফলে ভারতের রাজনৈতিক স্বাভাব্য ও স্বাধীনতার দাবী আজ সমগ্র জগতের মতে অবিসংবাদিত। কিন্তু ভারতের শাসন-প্রণালী যে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, সে শক্তি দুর্ভাগ্য ভারতকে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; কারণ, ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা তাঁহাদের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে। পরন্তু, বর্তমান যুদ্ধে ভারতের সর্বপ্রকার আর্থিক ও কার্যিক সাহায্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব এত অধিক যে, মিশ্রশক্তির উচ্চ-বিঘোষিত যুদ্ধের মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ভারতের নিরঙ্কুশ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীকে আর অধিক দিন প্রতিহত করিয়া রাখা সহজকর।

কিন্তু স্বার্থ চিরদিন পরার্থ অপেক্ষা প্রবল; সুতরাং শাসন-শক্তির পক্ষে এই কঠিন সমস্যার সমাধান সাধনার্থ কূট কৌশলের আশ্রয় ব্যতীত গতান্তর নাই। এই হেতু দুর্ভাগ্য ভারতের প্রতি চির-বিমুখ সাম্রাজ্য-নীতি-প্রমত্ত চার্লিস-শাসিত ব্রিটিশ শাসন-শক্তি ভারতের নব-নিযুক্ত সৈনিক বড়লট ওয়াডেলের মাধ্যমে ভারতের প্রতি কূট কৌশল প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ভারতের প্রতি নব-প্রযুক্ত কূট নীতি এই যে, শিল্প-সম্বর্ধন ও সমুন্নয়নের অছিলায় ভারতের তীব্র আকাজিক রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্নকে প্রতিহত না হউক, সুদূরপর্যন্ত করিতে হইবে। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় যেতান্ধ বণিক-সংস্কার বার্ষিক অধিবেশনে লর্ড ওয়াডেল তাঁহার অভিভাষণে সেই নীতি দৃঢ় করিয়াছেন। গত বর্ষে ঐ সম্মেলন-বার্ষিকে তিনি তাঁহার বড়লটরূপে প্রথম প্রকাশ্য অভিভাষণে এই নব নীতি—সূচনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং পরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রসভার যুগ্ম অধিবেশনে তাহা বিশদ করিয়াছিলেন। 'মাসিক বহুমতী'র পাঠক-পাঠিকাদিগকে সে পরিচয় যথাসময়ে পূর্বেরি দিয়াছি।

সম্প্রতি ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ক্যাকসটন হলে, ইষ্ট ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক সভায় ভারত-সচিব মিঃ আমেরী এই নীতির প্রতিপত্তি করিয়া একটি চমকপ্রদ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসন-শক্তি এবং ব্রিটিশ শিল্পপতিগণের ঐকান্তিক বাসনা যে, ভারত যথাসম্ভব শীঘ্র চরম শিল্পোন্নতি লাভ করুক। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ আদৌ মনে করেন না যে, ভারতে শিল্পে অনুন্নতির ফলে ব্রিটিশ রপ্তানী-বাণিজ্য সম্বন্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু অতীতের ইতিহাস ইহার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য প্রদান করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হইবার ফলে, ভারতের শ্রেষ্ঠ বর্ষিষ্ঠ গণিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ

শিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া কিরূপে অপঘাত মুহূর্তলাভ করিয়াছিল এবং ভূরি ভূরি ভারতীয় কাঁচা মাল অতি স্বল্প মূল্যে বিলাতে রপ্তানী হইয়া ব্রিটিশ শিল্পগুলিকে স্বেচ্ছ-পুষ্টি ও বলিষ্ঠ করিয়াছিল, বহু ব্রিটিশ ইতিহাস-লেখকও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ঢাকাই মসলিন আজ উপকথায় পরিণত হইয়াছে। মিঃ আমেরী এই প্রসঙ্গে একটি অতি রহস্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ-পণ্যের বিক্রয়বৃদ্ধির নিমিত্ত ভারতীয় শিল্পকে পঙ্খ করা হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণার মূল কারণ এই যে, গত শতাব্দীতে ব্রিটেন অবাধ বাণিজ্যের মোহে এরূপ বিমুগ্ধ ছিল যে, সে মনে করিত, অবাধ বাণিজ্য সর্বত্র সর্বদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং শুভকর। বাহা হউক, পরে নিজদেশের দেশে অবাধ বাণিজ্য প্রবল রাখিয়া ব্রিটিশ শাসন-শক্তি ভারতে শিল্পসংরক্ষণ নীতির প্রস্তর দিয়াছেন। এখন ব্রিটিশ শিল্পপতিমায়েদেরই শুভ ইচ্ছা এই যে, ভারতে চরম শিল্পোন্নতি ঘটুক, তাহাতে তাঁহাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণের অভিমত এই যে, ভারতের যত শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ভারতবাসী সাধারণ ক্রেতাদের আবশ্যক ব্র্যাদি এবং ভারতের কল-কারখানার নিমিত্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্ম ভারতকে ততই বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে; অর্থাৎ বিলাতী ব্র্যাদির ভারতে কাটুতির পরিমাণ তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। তবে বিলাতের শিল্প-পতিগণের মনে রাখিতে হইবে যে, তাহারা ইতঃপূর্বে ভারতে যে সকল ব্র্যাদিমাগ্নী বিক্রয় করিয়াছে, ভবিষ্যতে ভারত ঠিক ঠিক সেই সকল ব্র্যাদি কিনিবে না; সুতরাং ভারতের নিত্য নব প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলে, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্ববিধার অভাব ঘটিবে না; এমন কি ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিল্পপতিগণের মধ্যে সহযোগ-সাহচর্যের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ব্রিটিশ শিল্পপতিগণের এই শুভবুদ্ধি কি পূর্বে ছিল না? অথবা প্রয়োজনের অভাবে উদ্ভব হয় নাই? এমন পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধির এই বর্তমান শুভোচ্ছার পশ্চাতে কি কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত নাই? পূর্ব-গোলার্ধে যুদ্ধপরিচালনার ভারতে বহু সামরিক ও অ-সামরিক শিল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য হইয়াছে। এই প্রয়োজনের সুযোগে ভারতের প্রবল শিল্প-প্রবর্ধন এবং তার প্রস্তর দিয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত ও সুদূরপর্যন্ত করিবার প্রচেষ্টা প্রচল থাকিলেও অতি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ যেমন দুঃসাধ্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভও তেমন দুষ্কর। উত্তর ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ শাসন-শক্তি তাহার বহুদিনাজিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কোনক্রমে ধর করিতে ইচ্ছুক নহে। তবে ঘটনাচক্রে এবং দুঃসময়ে অপরিহার্য প্রয়োজনের তাগিদে শিল্প-সম্বর্ধন-সমুৎসুক ভারতবাসীকে শিল্প-সমুন্নয়ন প্রচেষ্টায় যৎকিঞ্চ সাহায্য করিয়া, ভারতবাসীর তদপেক্ষা বহু গুণে গুরুতর রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব এবং যত দিন সম্ভব ব্যাহত করিবার সঙ্কল্পই ব্রিটিশ কূটনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। পরাধীন ভারতের কোন স্বাধীনতা নাই; সুতরাং অপরিহার্য প্রয়োজনের তাগিদে ব্রিটিশ কূটনীতিপ্রমত্ত শিল্প-সম্বর্ধন ও সমুন্নয়ন প্রস্তরে আমরা কতটুকু স্বার্থ সাধন করিতে পারিয়াছি এবং যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বে পারিব, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য।

রাজনীতির মোহজালে নিবিষ্ট-চিত্ত ভারতবাসীকে মোহবিমুক্ত করিয়া শাসনশক্তির পক্ষে কলহপক্ষ। কম অনিষ্টকর তাহার শিল্প-সম্বন্ধন ও সমুন্নয়ন-অকাঙ্ক্ষাকে কথকিং প্রশ্রয় দিবার প্রলোভনে তাহাকে যথাসাধ্য লক্ষ্যবস্তুর দ্বিবার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়াডেল তাঁহার দ্বিতীয় অভিভাষণে কয়েক জন ভারতীয় শিল্পবর্ধকে বিলাতে যুদ্ধ-কালীন শিল্পপ্রচেষ্টার পরিচয় লাভ করিবার নিমিত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী বাঙ্গালার শ্রীযুত নলিনীধর সরকার-প্রমুখ কয়েক জন নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং অচিরে তাঁহারা যমুদযাত্রা করিবেন। ইতিমধ্যে কয়েক জন সবিধাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিলাতে ও আমেরিকায় গিয়াছেন। তাঁহারা তথাকার ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তথাকার সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা ও আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। ভারতের বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও প্রগতির সহিত ব্রিটিশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকদিগকে পরিচিত করিয়া উভয়ব সময়ে ভারতের কল্যাণজনক নতন বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের উপায় অবলম্বন করিবেন। কিছু দিন পূর্বে প্যারিস-মন্টে মহাসভার সভা, পরল সেসোয়াটব সেক্রেটারী সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এ. জি. হিল ভারতের বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানের বর্তমান প্রগতি পূর্ণকোণে করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুমোদনে এবং আগ্রহাতিশয়ে ভারত সরকার ভারতের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে বিলাতে ও মার্কিনে যাইবার সন্মোহ প্রদান করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক-সম্মেলন নেতা ভারত সরকারের শিল্প-উপদেষ্টা স্যার শান্তিসুন্দর ভট্টাচার্য এবং বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি ডাঃ মেঘনাদ সাহা, বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ জে. এন. হুগার্ড ও ডাঃ এস. কে. মিত্র ইহার অন্তর্গত সভা। কয়েক মাস ভারত পরিভ্রমণ করিয়া অধ্যাপক হিল এই অভিনব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও বাহ্যসমস্তার সমাবল্য করিতে হইলে ভারতকে প্রভূতরূপে শিল্পায়িত করিতে হইবে। তন্নিমিত্ত উন্নততর রাস্তাপথ, রেলপথ, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ও অধিকতর পরিমাণে বস্ত্রপাতি, কল-কারখানা এবং সার সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে আর স্থলভে অধিকতর পরিমাণে বৈজ্ঞানিক শক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ডাঃ মেঘনাদ সাহাও সম্প্রতি বিলাতে এক অভিভাষণে দুঃস্বপ্নে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে প্রভূত পরিমাণে শিল্প-সম্বন্ধন ও শিল্প-সমুন্নয়ন ব্যতীত দুঃস্থ ও নিঃশর ভারতবাসীর জীবনব্যাহার ধারা কখনই উন্নত হইতে পারে না।

যুদ্ধপূর্বের যে সকল জাতি শিল্পে অনুরক্ত ছিল, যুদ্ধকালে তাহারা কিছু কিছু শিল্পোন্নতি সাধন করিয়াছে; এবং যুদ্ধান্তে তাহারা অধিকতর পরিমাণে বহুবিধ শিল্পে সমুন্নত লাভ করিতে কৃতসম্বল। কিন্তু পাশ্চাত্যের শিল্পে সমুন্নত প্রবল পথক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তিগুলির একান্তই তাহা অভ্যস্ত্রান্ত নহে। মুখে তাহারা যত মধুর বাণীই নিঃসরণ করুক না কেন, অন্তরে তাহাদের আঁধারস্বার্থ-সংক্ষপ-মূলক বিষয় ছুরি লুক্কায়িত। যুদ্ধপূর্বের যে সকল দেশ তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে বাঁচা মাল যোগাইত, তাহাদের অভ্যপ্রায়, যুদ্ধান্তেও যেন

তাহাই করে; নতুবা তাহাদের দেশের শিল্পের সমুন্নতি স্থগিত। এই নিমিত্ত এখন হইতেই নানা অছিলায় নানা বিষয়ে আন্তর্জাতিক বৈঠকের সমারোহ ঘটানো। সম্প্রতি আমেরিকায় নিউইয়র্কের নিকট রাই সহরে একটি বেসরকারী আন্তর্জাতিক কার-কারবাব-বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠক আমেরিকার চারটি অতি সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেসরকারী ভারতীয় বণিক ও শিল্পসম্ম হইতে ছয় জন প্রতিনিধি কয়েক জন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টার সহিত উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়গুলি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিবরণিত হইবে। ইতিমধ্যে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুদ্ধান্তে মার্কিন ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতম ভাবে কার-কারবারে লিপ্ত হইতে আন্তরিক ভাবে প্রস্তুতশীল। মন্দভাগ্য মহাচানের ঝায় তৃতীয়া ভারতভূমিও বিশাল, বিরাট ও বিচিত্র দেশ। যেমন জনসংখ্যা, তেমনি শিল্প-সম্পদে ইহার সমুন্নত; অথচ ইহাদের ঝায় শিল্পে অধুনা হতু বিপুল বিদেশী পণ্য-ক্ষেত্র জগতে আর তৃতীয় নাই। আফ্রিকা মহাদেশের ঝায় এই উভয় দেশকেও করায়ত্ত করিতে জগতের সর্বশক্তিমান জাতি সর্বদা বন্ধ-পরিবর্তন। রাষ্ট্রিক অধিকার না হউক, ইহাদের বিপুল জনমণ্ডলীর বিশাল ক্রয়শক্তিকে আয়ত্ত করিবার প্রলোভন সর্বজাতির পক্ষে অতি তীব্র। তাহারই শলা-পরামর্শ সর্ববিধ আন্তর্জাতিক বৈঠকের মূল ও মূখ্য উদ্দেশ্য। এই কার-কারবার-বৈঠকে বাঙ্গালী হইতে শ্রীযুত গগনবিহারী মেটা গিয়াছিলেন; কিন্তু কোন বাঙ্গালী সদস্যকে নির্বাচিত করা হয় নাই। মিঃ মেটা বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালার গৌরব কেহ রক্ষা করেন নাই। যদিও বিগত মহাযুদ্ধ কালে এবং তাহার অবসানে আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ও মধ্যম শিল্পে অনেকটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি বর্তমান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমরা শিল্পে সমুন্নত পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে প্রচুর পরিমাণে অতি সস্তমূল্যে বাঁচা মাল যোগাইয়েছিলাম। বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আমরা যথোপযুক্ত সদ্যবহার করিতে পারি নাই। শাসন-শক্তির জাতীয় স্বার্থ-হই উপদ্রাব এবং স্বদেশবাসীর চির আত্মপ্রিয় আত্মঘাতী শৈথিল্যই ইহার মূল কারণ। কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিযানের তীব্র ও তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা সরকার ও জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া শিল্প-সমুন্নত ব্যক্তি-বর্গের মন চৈতন্যকে কঠিন ও কঠোর ভাবে উদ্ভুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্বার্থ এবং পরদেশী শাসন-শক্তির স্বার্থ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। বিরোধ এইখানে—এই পরস্পরের জাতীয় স্বার্থ-সংঘর্ষ। তথাপি উভয় সম্প্রদায়ই মনে-প্রাণে বৃথিতে পারিয়াছে যে, বর্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ও গুরু লঘু সর্ববিধ শিল্পে সমুন্নত এবং যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিতে না পারিলে কোন পক্ষেই মঙ্গল নাই।

শাসন-শক্তির প্রবল কায়দা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম পরিচালনা এবং বহুবিধ বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা বর্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু ক্ষুদ্র এবং মধ্যম শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছি। প্রয়োজনের তাগিদে সরকারও যথাসম্ভব অর্থ-সামগ্র্য সাহায্য করিতেছেন এবং কয়েকটি মূল ও স্থল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বকিঞ্চিৎ সন্মোহ-সবিধায়িত স্বীকৃত হইয়াছেন। জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ, রেলপথের নিষ্টির্ণ এঞ্জিন, যাত্রী ও মালগাড়ী নির্মাণ এবং গুরু রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংক্রিয় হইয়াছে।

শিল্পই জাতির প্রাণ। শিল্প ব্যতীত কৃষিও যথেষ্ট উন্নতি
করিতে পারে না। পাট-শিল্পই পাট চাষের উন্নতির মূল। কৃষি
শিল্পকে কাঁচা মাল যোগায় এবং শিল্প তাহাকে বহু ভাবে ব্যবহারো-
পযোগী করিয়া আমাদের জীবনযাত্রা সুন্দর করে। উভয়ে উভয়ের
উপর নির্ভরশীল, অষ্টাঙ্গ-পাশে। যন্ত্রপ্রাচীর শিল্পের উৎকর্ষই
যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত করিয়াছে। ভারত যদি কৃষি ও শিল্পে তাহার
সম্পূর্ণ সম্পদ ও সামর্থ্যের সমতুল্য উন্নতি লাভ করিতে পারিত—
জোকার এমনিও বলল পরিচয়। নিজের অধিকসমর্থতার সঠিক ব্যক্তি

পারিত, তাহা হইলে হয়ত জাপান বর্থা ও মালয়েব নিকটে আসিতে পারিত না। এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহের নিরাপত্তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে চীন ও ভারতের শিল্প-সমুন্নয়নের উপর। যদি এই দুইটি দেশ উপযুক্তরূপে শিল্পসমুন্নয়ন লভে করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অল্প কোন শক্তিমান জাতি অথবা জাতিসমূহ হইতে ইহাদের অনিষ্টাশঙ্কা বহুল পরিমাণে তিরোহিত হয়। বর্তমান জগতের রাষ্ট্র-শক্তি শিল্পশক্তির অঙ্গস্বরূপ করে। পৃথিবীর শক্তিমান জাতিগণের মধ্যে অল্পতমরূপে পরিগণিত হইতে হইলে, ভারতকে আন্তঃশিল্প-সম্প্রদায় ও শিল্প-সমুন্নয়ন নীতির আশ্রয় লইতে হইবে। শিল্প-সম্প্রদায় ও শিল্প-সমুন্নয়ন ব্যতীত জাতির সর্বজনীন সমুন্নতি সম্ভবপর নহে। আপামর সাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিতে হইলে, এবং সেই উন্নতি ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, শিল্পোন্নতিই এক মাত্র উপায়। শিল্প-সমৃদ্ধির দ্বারা অর্থ-সামর্থ্যের স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিতে পারিলে স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ সুকর হয়।

বর্তমান যুদ্ধের স্রোত্রে একমাত্র পরাধীন ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের অসংখ্য প্রত্যেকটি দেশই তাহার উৎপাদন-সামর্থ্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতবর্ষের উৎপাদন-সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা দশ অংশ। গত পাঁচ বৎসরে অতি অল্প ক্ষেত্রেই শিল্প-সমুন্নয়ন অথবা সম্প্রদায়বর্ধন নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকার যুদ্ধ-পরিচালনার্থে যে আট শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার বহু ক্ষেত্রে যে, চাহিলার তুলনায় যোগান কম হইবে, তাহাতে বিশ্বাসের অবকাশ নাই। চীন, ইরাক, ইরান, আরব ও তুরস্ক প্রভৃতি আমাদের প্রতিক্রমী দেশসমূহে ইতিমধ্যে কিরূপ অভাব-অনটন ঘটিয়াছে তাহা সর্বজনবিস্মিত নহে। এই সকল দেশের কোন কোন স্থানে দ্রব্যমূল্য পঞ্চাশ হইতে এক শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তি সত্ত্বেও ভারতের শিল্পগুলি যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী যোগান দিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীর কর্মতৎপরতা ও উৎপাদন-সামর্থ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

সাময়িক শিল্পে নিঃশেষে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজনের ফলে অ-সাময়িক শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং লোকসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু চাহিলার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। পঞ্চাশত্বে, উৎপাদনের স্বল্পতা এবং সমুন্নতপথে আমদানীর প্রতিরোধ হেতু যোগানের বিশেষ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। ফলে, জনসাধারণের নিত্য-দৈনন্দিনিক আহাৰ্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য অথবা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অশন-বসনের অভাবে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু রহস্তের বিষয় এই যে, বর্তমান যুদ্ধে বাহারা প্রধান প্রতিপক্ষ সেই বুটেন ও মার্কিনে আহাৰ্য্য ব্যবহার্য্যের যোগান যুদ্ধ-পূর্বে অপেক্ষা যুদ্ধকালে শ্রেষ্ঠতর ভাবে চলিতেছে। সুতরাং এই সকল দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। মোটর গাড়ী এবং এলিনিয়ারী দ্রব্য-সামগ্রী ব্যতীত অসংখ্য সর্বপ্রকার দ্রব্যের ব্যবহার বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জন-সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং যোগান অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও যে এই দুই দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার কারণ অসাময়িক ক্ষেত্রে কর্মীর অভাব এবং সর্বসাধারণের ক্রয়-শক্তির বৃদ্ধি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, যুদ্ধ-শিল্পে ও অসাময়িক শিল্পে ভারতবর্ষ যুদ্ধকালে যেরূপ শক্তি-সামর্থ্য ও তৎপরতা দেখাইয়াছে, তাহার ব্যত্যয় ঘটিলে দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাইত এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকিত না।

আমাদের দেশের বিস্তৃত কৃষির উন্নতির সহিত তাহার সমামুপাতে শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার ব্যতীত জাতীয় অত্যাশ্রয় ও অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় উপায় নাই। কৃষি ও শিল্পের সমবায়-সমুন্নতি ব্যতীত জাতীয় জীবনযাত্রা নির্বাহের ধারা উন্নত হইতে পারে না। কৃষির স্রোত্রে স্রবীণা যেমন আমাদের দেশে প্রচুর, শিল্প-সম্প্রদায় ও সমুন্নয়নের স্রোত্রে স্রবীণাও তেমনি বিপুল। কারণ, শিল্প-পরিচালনার্থ সাধারণতঃ যে সাতাইশ প্রকার মৌলিক কাঁচা মালের প্রয়োজন, তন্মধ্যে বাইশ প্রকার আমাদের দেশে সহজপ্রাপ্য এবং অসংখ্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট সুলভ। অব্যাহতগতি শিল্প-প্রয়োজ্যের সহিত স্বায়ত্ত-শাসনের শুভ সংযোগ ঘটিবেই আমাদের মুক্তি। নাস্ত: পন্থা:।

জাতিদ্রষ্টা

ত্রিবেণু গঙ্গাপাধ্যায়

রমারে দেখেছি ক্রক পরা হ'তে, মোটের উপর লাগিত ভালো।

করঞ্জাকী ছোট্ট মেয়েটি, যদিও তাহার রঙট কালা।

বহর দশেক বয়েস হইতে খুলে গেল তার গানের গলা।

সুকা বিকেলে স্কিপিং করিত, সদাই নৃত্য-ছন্দে চলা।

আরো গেল দিন, রঙ তুলি দিয়ে কাগজের বকে আঁচড় কাটে;

ঠাণ্ড মনের মাধুরী মিশিয়া আঁচড় ছবির রূপেতে ফুটে।

গগনের চাঁদে বন্দী করিল খাতায় কথার মালিকা গাঁথি।

স্বপন-প্রিয়ের স্তিমিত খোয়ানে জাগিয়া কাটাল মাধুরী রাত।

এখন তাহার গানের খাতায় খোপার হিসাব হতেছে লেখা,

স্বন্দর-গগনে খোর অমানিশা, উঠে না বুঝি রে চাঁদমা-রাকা।

ছবির খাতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খোকনের দুধ গরম করে।

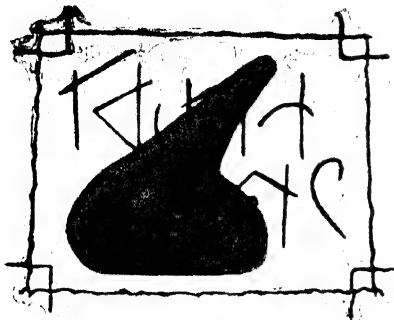
হাট-বাজারের জমা-খরচেতে 'স্বরসিপি' বই গিয়েছে ভরে।

সুরেলা বেহালা ভেঙে গেছে কবে, ভাঙা কাঠগুলি উঠনে গুঁজি,

দশটা-পাঁচটা কেবাবী-স্বামীর ভাত রেখে দেছে নয়ন বুঝি।

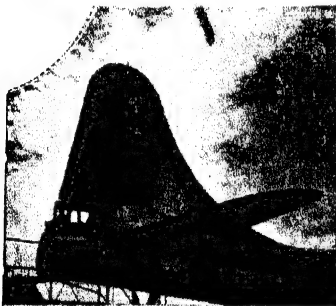
গন্ধ তেলের শিশিতে এখন খুকীর জ্বরের গুণ্ড থাকে।

বাস্তব আজ হার মানায়েছে সব দিক্ দিয়া কল্পনাকে।



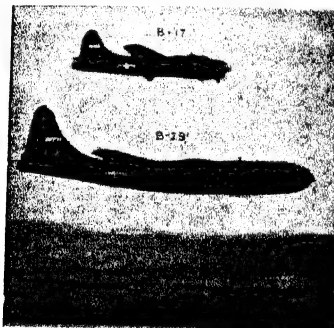
উড়ন-কেল্লার চরম

বহু বৎসরের সাধনায় আমেরিকার বোয়িং এয়ারক্রাফট কোম্পানি 'বী-২৯' মার্ক যো বিমান-পোত তৈয়ারী করিয়াছে, সে যেন তাঁবুর মধ্যে লুকানো দ্বিতীয় বিহবরাস অন্ধ-গিরি! এত 'বী-২৯' বিমান-পোতকে 'সুপার ফোর্ট্রেস' বলা হয়। এটিতে চারখানি এঞ্জিন সংলগ্ন আছে। অল্প সব পোতের চেয়ে এ বিমানপোত অনেক বেশী



খজা-নাসা বমার

উঁচুতে উঠিতে এবং অনেক বেশী বেগে উড়িতে পারে। এ বিমান-পোতে ভারী-ভারী যে-সব বোমা অনায়াসে বহন করা যায়, সে-সব বোমা বহিব্যব সামর্থ্য এ পর্যন্ত অল্প বিমান-পোতের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই উড়ন-কেল্লা হইতে ২০-মিলিম্ কামানে এবং ৫০-কালিবার মেশিন-গানে লিপক্ষ প্লেনগুলিকে নিমেষে এবং অমোঘ ভাবে



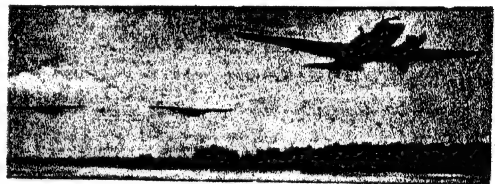
উপরে ফ্লাইং ফোর্ট্রেস; নীচে সুপার ফোর্ট্রেস (বী-২৯)

চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যায়। আকারের বিরাটত্ব এবং ষড়গ-নাসিকা ভিন্ন প্রকারের বহিবরবলে আর কোনো বেশিষ্ঠ্য নাই। ইহার এঞ্জিন-গুলির প্রত্যেকটি ২২০০ অশ্বশক্তি-সম্পন্ন এবং সবগুলিকেই ঠাণ্ডা

রাখিবার ব্যবস্থা যা আছে, চমৎকার! পাশা লম্বে ১০০ ফুট; সাড়ে আট হাজার অশ্বের শক্তি-সামর্থ্যে ড্রিভিত এ বমারের পাশে ফ্লাইইং-ফোর্ট্রেসকে দেখায় যেন শিশু! এ বিমান পোত চলে বৈজ্ঞানিক-শক্তিতে। ৫০০০ ঘণ্টার পরীক্ষায় এ বমার যে-কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া রায় দিয়াছেন, 'সব দিক্ দিয়া নিখুঁৎ।

অভিনব গ্লাইডার

'বী-২৯' উড়ন-কেল্লার পর এক অভিনব গ্লাইডারের সৃষ্টিও মার্কিন সমর-বিভাগের দ্বিতীয় কীর্তি! এ গ্লাইডারের শক্তিও অসামান্য—ইহার সঙ্গে নাইলনের তৈরী যে-কাছি আছে, সেই কাছি-সংলগ্ন ছকে



গ্লাইডারে বাধা হাউজার

প্লেন, হাউজার, গ্যাংট-টান্ধ-কামান এবং ট্রাক্টর—সব একসঙ্গে বাধিয়া ফ্লাইয়া অনায়াসে বহন করা চলে! এ জাতের বহু গ্লাইডারকে এমন কৌশলে পাশাপাশি উড়াইয়া পরিচালনা করা হয় যে, কাহারো গায়ে-গায়ে ধাক্কা লাগিবার আশঙ্কাও অনুভূত হয় না; পাশাপাশি বহু গ্লাইডারে বাধিয়া গোটা বারুদখানা-কেই বহা যায়, এবং তার ফল কতখানি সাংঘাতিক, অল্পমান করা কঠিন নয়।

জখমী বিমান-পোত

ইংলেণ্ড এবং উত্তর-আয়ারল্যান্ড বিমান-পোতের ব্যাধি সারাইবার



বমার-পরীক্ষার এক-বে যন্ত্র

সেগুলিকে আবার সম্পূর্ণ স্বস্থ এবং নিখুঁৎ করিয়া ডিউটি-সাধনে পাঠানো হয়।

জন্ম বহু কারখানা বা বিমানপোত-হাসপা তা ল তৈয়ারী হইয়াছে। কোনো বমাক বা লড়াই-প্লেনের সঙ্গে জখম ঘটিলে বা সেগুলির অংশ খোয়া গেলে এই সব হাসপাতালে তাদের আনা হয়। আনিয়া তার পর কার সঙ্গে কি চোট-জখম, 'এক-বে' করিয়া তাহার পরীক্ষা চলে, এবং নির্দ্ধারণমাত্র দেখেই টুটা-ফাটা-ক্ষোয়া সারাইয়া

তরী, না, তীর !

শান্তিমোহনের প্লেন মার্টিন কোম্পানি এক-রকম তরী বা ছুটার তৈয়ারী করিয়াছেন, সে-ছুটার দেখিতে যেন ডানা-কাটা শীপ্লেন ! এ ছুটার ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে চলে। দু'খানি পোনটনের উপরে ইহার দেহখানি সম্বন্ধিত; বসিবার জায়গাটুক বিমান-পোতের বিবক-আসনের মত। শীতকালে দেহের আধার ঐ-পোনটন



তারবেগ তরী

দু'খানি খুলিয়া লইয়া ও-জায়গায় দু'খানি স্বাই আঁটিয়া দিলে জমাট বরফের উপর দিয়া তীরের বেগে এ ছুটার পাড়ি জমাইতে পারে ! ছুটারখানি চলে ২৭ অশ্বশক্তি-যুক্ত মোটর-এঞ্জিনে। ছুটারে দু'খানি হাল আছে—মোটরের কনট্রোল হুইলের অনুরূপ। আসনে বসিয়া যাত্রী হুইলের সাহায্যে ছুটারকে আপন থলী-মত পরিচালনা করিতে পারেন। ছুটারের খোলে আট গ্যালন পেট্রোল ধরে; তার দৌলতে তিন ঘণ্টার পাড়ি যেমন অনায়াস, তেমনি নিরাপদ।

বোটে তুলিয়া গ্রাম সরানো

আমেরিকার কাণ্ড ! পদ্মেট প্রেজাণ্ট হইতে ইউনিয়ন টাউন—ওহিও নদী-পথে ব্যবধান অল্প নয় ! বোটের উপরে ত্রিশখানি গৃহ-সমেত গোটা



বোটের বুক গ্রাম

পদ্মেট প্রেজাণ্ট গ্রামখানিকে ইউনিয়ন-টাউনে সরানো হইয়াছে। বারো-খানি বোটকে গায়ে-গায়ে বাঁধিয়া তাহাবই উপরে গোটা গ্রামখানিকে তোলা হইয়াছিল। জোয়ার-ভাঁটার দক্ষ নদীর বুক সব সময়েই তরঙ্গ-বিকুল থাকায় বাড়ীগুলিকে অটুট ভাবে নামাইতে তিন সপ্তাহ সময়

লাগিয়াছিল। বাড়ী বলিতে খেলার ঘর-বাড়ী নয়; বাড়ীগুলি প্রত্যেকখানি প্রায় পাঁচ-সাত কামরাংয়োলা—এবং লম্বে ৪৬, প্রস্থে ২৪ এবং উচ্চতায় ১৫ ফুট। এই সব বাড়ী-ঘরকে যেমন অটুট ভাবে বোটে তোলা হইয়াছিল, পথে বাহিয়া আনিতে বা নতুন আন্তনায় নামাইতেও তেমনি কোন বাড়ী-ঘরে এতটুকু ফাট ধরে নাই বা চিড় খায় নাই !

ব্রাশ-বাল্‌ব্‌

ক্যামেরার লেন্সে, বিশেষ করিয়া ফিল্ম-ক্যামেরার লেন্সে এবং ফিল্ম-প্রোজেক্টরে যে মিহি ধূলা জমে, সে ধূলা চক্ৰক্ষে দেখা যায় না—



লেন্সঝাড়া ব্রাশের বাল্‌ব্‌

সে জন্মও ধূলা লেন্সের গায়ে থাকিয়াই যায়; তার ফলে ছবি তোলায় বা ফিল্মের ছবি দেখানোয় নানা বিঘ্ন ঘটে। লোক-লোচনে প্রত্যক্ষ এই মিহি ধূলি-জঙ্ঘাল ঝাড়িবার জন্য উটের লোমের ব্রাশের সঙ্গে বাল্‌ব্‌ আঁটিয়া অভিনব ধূলা-ঝাড়া ব্রাশ, বা ব্লোয়ার নিশ্চিত হইয়াছে। বাল্‌ব্‌, টিপিবামাত্র অণু-পরমাণুর মত মিহি ধূলা নিমেষে ঐ ব্রাশের বাল্‌বে পৌছে ও সম্পূর্ণ ভাবে দাক হইয়া যায়।

পেট্রোলের ব্যাগ

বে-সব গভীর জঙ্গলে কিছা দুর্গম দেশে ঢৌক চলে না, সে সব স্থানে বিমান পোতের জন্ত পেট্রোল জোগানো এত কাল শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব ছিল। সে-অসম্ভবকে আজ সম্ভব এবং সহজ করা হইয়াছে পেট্রোলের জন্ত জল-নিবারক ক্যান্ডিশের থলির প্রবর্তনায়। এই থলির ভিতর দিকে প্রান্তিকের লাইনিং দেওয়া হইয়াছে; সে লাইনিং আঙুলে পোড়ে না; এবং এ প্রান্তিক শীত এবং তাপ-প্রতিরোধে সমর্থ। ব্যাগের মধ্যে ধাতু-পাত্র আছে; সেই ধাতু-পাত্রে পেট্রোল ভরিয়া রাখা হয়। উচ্চ আকাশ হইতে নীচে থলি ফেলিয়া দিলে ভিতরকার পেট্রোল-ভরা পাত্রে-পাত্র ফাটে না বা তুণ্ডাইয়া যায় না। আবার থলি ব্যাগ ত্যাগ জাহাজে পাঠাইতে বেশী সময়

১

পড়ার ঘরে বোধ হয় ডাকাত পড়েছে।

সিঁড়ির ওপর থেকে বাবুলের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো নীচে। একরাশ লাল, নীল, হলদে, নানা রঙের নানান রকমের ইংরেজী আর বাঙলা ছবির বই এনে ফেলল বাবুল তার পড়ার টেবিলে, আরো বই এলো চাকরের হাতে। বইএর ধাক্কা লেগে উঠে গেলো টেবিল-ল্যাম্পের সবুজ সেউটা।

শুধু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। বাবুলের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ঘরের চেহারা গেলো বদলে। টেবিল উঠে ভাঙ্গা-পা-চেরারকে কাং করে সোফার ফাটা বালিশটাকে আরো ফাটিয়ে তার তুলে। চার-দিকে ছড়িয়ে বাবুলের বাবুচেহারা সেই ছত্রাকার তুলোর মধ্যে ঝাঁড়িয়ে ধ্বন ভালকের মত হয়ে এসেছে—তখন পক্ষার পাশে দেখা গেলো মিমিকে।

বাবুল, বিশ্বাস কোরতে ইচ্ছে হয় না। আট বছরের বাবুল তার ছোট-বোন মিমিকে, যে আসছে আবারে ছ'এ পড়বে তাকে শুল্লো ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেবার হুঁসাধ্য চেষ্টা কোরতে পারে। হ্যাঁ, সত্যিই পারে। এই মুহূর্তে বাবুল সব পারে, সমস্ত অসম্ভবকেই সম্ভব কোরতে পারে।

শুল্লো উঠে গিয়ে মিমির বিপুল চাঁৎকারে চটে গেলো বাবুল। নীচে নামিয়ে নিয়ে এসে ঠাস কোরে মারলে এক চড় তার গালে। বৈশাখের সেই গরম বিকল বেলাতেই সঙ্গে সঙ্গে মিমির গাল বেয়ে তার চোখ থেকে শ্রাবণের বর্ষার মত নামল কান্না।

কাঁদতে কাঁদতে মিমি পালাচ্ছিলো—বাবুল তাকে ধরে ফেলে হাত বাড়িয়ে। ধরে এনেই বলল, “নে, এই বইটা নে।” বিশ্বাস কোরতে পারছে না—প্রকাণ্ড সেই ছবির বইটা কাঁপছে মিমির এক হাতে—আর এক হাতে কান্না মুছে তার।

—“ওঃ, বিশ্বাস কোরতে ইচ্ছে হচ্ছে না বুঝি, বোকা মেয়ে।” সবুজ পাকীরটা খুলে—বড় বড় কোরে লিখলে বাবুল প্রথম পাতায়—

“মিমিকে দিলাম

—বাবুল দাদা।”

কান্না থেমে গেল—হাসির বিলিক দিলো মুক্তোর মত পাঁতে।

“তুই আমায় কি দিবি?”

—“এই যে দিচ্ছি।” বাবুলের লম্বা আর কালো কৌকড়ানো চুলে এক টান দিয়ে পালালো মিমি।

পেছনে পড়ে রইল প্রাইজ-ডে-তে পাওয়া বই, ছুটলো বাবুল মা'র কাছ।

—“মা, ওমা, এবারও first হয়েছি আমি।”

চুপ থেতে থেতে মা বললেন, —“এই কাল আমরা পুরী যাব রে।”

—“পুরী!” কোল থেকে লাফিয়ে উঠল বাবুল। “মিমি—মিমি”—গলার স্বর শুনেই পালিয়েছে মিমি।

—“কি বোকা! মারবো না রে—এই মিমি, আমরা পুরী যাচ্ছি রে কাল—এই শোন—”

হুঁজনকে আবার মিলতে দেখা যায়—দরজার আড়ালে। এক জনের পিঠ উঠে আরেক জন আড়াড় পাড়ছে তখন।



দীপেন্দ্রকুমার সান্ডাল

২

গাড়ী ছাড়বামাত্র, মিমি আর বাবুল দু'জনেই বললো—তার বুঝবো না।

হরদয়াল বাবু ছেলে-মেয়ের কণ্ঠস্বর হাসলেন।

হুঁপাশে তাকাতে তাকাতে—অবাক হয়ে যায় ওরা দু'জন। এত দূর এর আগে আর

কোথায় গেছে?

ট্রেনে চড়ে সেই ত একবার সেই মায়ার বাড়ী,—আর এত অনেক দূর—কত বড় সমুদ্র সেখানে। রাত বাড়তে না বাড়তেই দেখা গেলো দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে কখন!

পুরীতে পৌঁছে প্রথম ক'দিন তোলপাড় কোরলে বাবুল। আনন্দে আর উত্তেজনায় বাবুল আর মিমি ঝগড়া কোরতেও ছুলে গেলো।

সমুদ্রে চান করতে প্রথম প্রথম ভয় কোরতো, এখন মজা লাগে খুব। সন্ধ্যা হতে না হতেই—সমুদ্রের ঢেউগুলো জলতে থাকে। বাবা বলেন,—“ভত্রে না কি ফসফরাস আছে বলে রাতে জ্বলে।” বাবুল জানে—তা নয় সমুদ্রের নীচে অনেক হীরে আছে। তারাই রাতের বেলায় ঢেউয়ের মাথায় জ্বলতে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ বুকে ঠাণ্ডা লেগে বাবুল পড়ল অসুখে। মইয়ে এলো সব। মিমির ভালো লাগে না একা একা সমুদ্রে চান কোরতে। বাবুলের মাকে হরদয়াল বাবু বোঝান,—তবুও তাঁর নিজের মন বুঝতে চায় না।

অবশেষে ব্যাপার বঁকে পীড়ালো। হরদয়াল বাবু, ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী বিখ্যাত ডাক্তার পুরীতে এসেছে শুনে তাঁর কাছেই গেলেন।

ভদ্রলোক একটু অস্বাভাবিক ধরণের। প্রথমে নানান কথা-বার্তার পর—বেই হরদয়াল বাবু বলেন—“আমার ছেলেটি মাত্র আট বছরের—ও'র কিছু হলে ওর মা আর বাঁচবে না।” বাস, এই শুনেই ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী ক্ষেপে গেলেন, বলে দিলেন—“না, ছোট ছেলের চিকিৎসা আমি করিনে।”

ফিরে এলেন হরদয়াল বাবু। ভেবে পেলেন না, কেন ডাঃ চৌধুরী অত ক্ষেপে গেলেন। আগে ত বেশ ভয় ব্যবহার কোরছিলেন। ‘ছোট-ছেলে’ শুনেই ওরকম পাগলের মত হয়ে গেলেন কেন? বোধ হয় মাথার গোলমাল।

হ্যাঁ—সত্যিই মাথার গোলমাল।

হরদয়াল বাবু চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী। মনে পড়ে গেলো—মেঘনার বছর পাঁচেক আগে—সেই ঝড়ের কথা। সেই ঝড়ে গেছে তার একটি মাত্র ছেলে—তার পর থেকে কোন ছোট ছেলের কথা শুনেই তাঁর মাথায় খুন চেপে যায়।

৩

কিরে যাচ্ছেন হরদয়াল বাবু। বাবুল এক দিন মা'র কোলে মাথা রেখে সেই যে চোখ বুজলো আর খুলল না। মিমি তাকে অত করে ডাকল, তবুও নয়। হরদয়াল বাবু যাবার আগের দিন একাই বেরিয়েছেন সমুদ্রের পারে বেড়াতে। সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনে হল, সমুদ্রের ওই নীল জল—বাবুলকে পাগল করে দিত, সমুদ্রের বেশজা তাই বোধ হয় তাকে ডেকে নিলেন।

—“এই যে”—হরদয়াল বাবু কার ডাক শুনে ঘাড় কেরালেন—
সারে ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী।

—“ডাঃ চৌধুরী—আপনি গেলেন না—আমার ছেলে আর
বাঁচল না।”

চুপ করে রইলেন ডাঃ চৌধুরী। কোথায় যেন তাঁর লাগল।

—“আজ আপনাকে বলি ডাঃ চৌধুরী।” আবার বলেন হরদয়াল
বাবু—ও আমার নিজের ছেলে নয়—মেঘনার বড়ে কুড়িয়ে পাওয়া
ছেলে—

—“কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া!” অসম্ভব কাঁপছে ডাঃ চৌধুরীর গলা।

—“মেঘনায়, বছর পাঁচেক আগে।”

হরদয়াল বাবুর হ’ হাত ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় এই ক’টি কথা
বেকুল ডাক্তার চৌধুরীর মুখ দিয়ে—“কী,—কী নাম ছিল তার?”

—“নাম, সেও তার বাপ-মায়ের দেওয়া, আমার নয়।” হরদয়াল
বাবু পকেট থেকে একটা আংটি বার করে ডাক্তারের হাতে দিলেন—
“এই আংটিতে তার নাম লেখা ছিল, ওই নামেই তাকে আমরা
ডাকতাম”—‘বাবুল।’

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে কোলকাতার সেরা ডাক্তার সঞ্জীব চৌধুরী
বািলির ওপর বসে পড়ে পাগলের মত হাসতে লাগলেন।

চোখের পলক পড়ছে না হরদয়াল বাবুর।

তার সাম্নে এই যে বৃদ্ধ উদ্দাদ পাগলের মত হাসছে, সেই যে
বাবুলের বাবা ডাঃ সঞ্জীব চৌধুরী,—এ কথা কী কোন দিন জানতে
পারবে কেউ?

তত্ত্ব-তাবাশের ইতিকথা

পুরাকালে আমাদের দেশে বিবাহ দিয়া কজাকে যখন বহু দূরে তার
খবর-পুছে পাঠানো হইত, তখন যান-বাহনের মোটেই সুবিধা ছিল না।

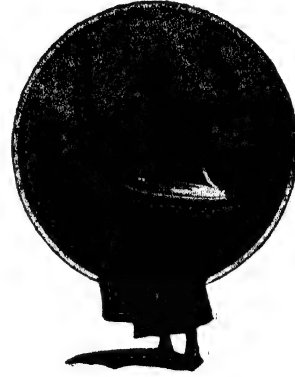


বোতার-যন্ত্র (১১০০)

তার উপরে ছিল পথে দস্যু-তরুর উৎপাত; এ জন্ত কজা-জামাতার
খবরাখবর নেওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। কোনো মতে মেয়ের মা-বাপ যদি
মেয়ে-জামাইয়ের সংবাদ লইবার জন্ত লোক পাঠাইতেন, তাহা হইলে সে
লোকের সঙ্গে খাজাদি পাঠাইতেন। খাজাদি পাঠানো ছিল গৌণ
উদ্দেশ্য; লোক-পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ছিল মেয়ে-জামাইয়ের তত্ত্ব বা
সংবাদ লওয়া। সংবাদ আনার সঙ্গে খাজাদি পাঠানোর ব্যাপার

এমন বিজড়িত হইয়া যায় যে আজকাল ট্রেন-মোটর-স্ট্রীমারের যুগে
মেয়ে-জামাতার সংবাদ মেলে চিঠি-পত্রে, টেলিগ্রামে,—খাজাদি
উপঢৌকন পাঠানোর নাম দাঁড়াইয়াছে তত্ত্ব-তাবাস।

আজ আত্মীয়-বন্ধুরা যত দূর-দেশেই যান, তাঁদের খবরাখবর
নেওয়া-দেওয়ায় সুখ-সুবিধা ঘটিয়াছে। এই সুখ-সুবিধা ঘটিবার পূর্বে
সুদূর আত্মীয় বন্ধু বা রাজ্য-সাম্রাজ্যের সংবাদাদি গ্রহণের জন্ত কি ভাবে



ঢাকের বাজারে (আফ্রিকা)

সংবাদ সভ্য জগতে অজানিত থাকিত না! সংবাদ-প্রেরণ বা
আনয়নের জন্ত তখন ব্যবস্থা ছিল যেমন বিলম্বিত, তেমনি অনিশ্চিত।
সংবাদ-প্রেরণের এ সুখ-সুবিধা ঘটিয়াছে আজ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর মাত্র।

মার্কিনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম যখন পূর্ণ তেজে চলিয়াছে, তখন
ভূ-ভাগে তাহার সংবাদ চলিত যোড়-সপ্তাহের দূতের মাধ্যমে। উত্তর-
আমেরিকা, আফ্রিকা, মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চলে ঢাক বাজাইয়া জরুরি
সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ঢাকের বিভিন্ন বোলে আশা,



আগুন জালিয়া রেড-ইণ্ডিয়ানের সংবাদ প্রচার

নিরাশা, জয়-পরাজয়, সুবিধা-অসুবিধা—বিভিন্ন সঙ্কেতে জানানো হইত।
রেড-ইণ্ডিয়ানরা সন্ধ্যার পর বিরাট অগ্নিকুণ্ড রচনা করিত; তাহাদি
গগনম্পর্শী শিখায় বিবাদ-বিসম্বাদের বার্তা দিক্-দিগন্তের প্রচারিত
হইত। পায়রার গলায় চিরকুট বাঁধিয়া বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা সভ্য
জগতে পূর্বে যেমন প্রচলিত ছিল, এখনও তেমনি আছে।
প্রাচীন গ্রীসে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সংবাদ পাঠানো হইত দূতের

মারফৎ—আলোক-বস্ত্রের মারফৎ। খুইট-জয়ের ২৭৮ বৎসর পূর্বে সোলার বড় বড় পাত্র তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যে বাঁশের চোঙার মধ্যে সংবাদ-বিবরণাদি লিখিয়া সেই সোলার পাত্র জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত!—পত্রের সাঙ্কেতিক পরিভাষা থাকিত—শরুপক্ষের হাতে সে-বিবরণ পড়িলে তাহদের পক্ষে অর্থ নির্ণয় কাজেই সম্ভব ছিল না; স্বপক্ষ সাঙ্কেতিক সম্বন্ধে বুঝিয়া পত্রার্থ সঠিক অবধারণ করিত। এ ভাবে সংবাদ-প্রেরণে যে নিশ্চয়তা ছিল না, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই!

রোমানরা বহু স্থানে সম্বন্ধ-টাওয়ার নির্মাণ করাইয়াছিল; সেই টাওয়ারের উপর দিনের বেলায় ধূমবাস্প সৃষ্টি করিয়া এবং রাত্রে তীব্র আলো আলিয়া সংবাদের আদান-প্রদান চলিত। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা সর্ব প্রথম বায়ব-

তার পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে টেলিফোন-ব্যবস্থা হুঁমাইল দূরে সংবাদ পাঠানোর সাধনা সফল এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এ-বাত্তির এমন উৎকর্ষ সংসাধিত হয় যে তার ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় পারে সংবাদ-বহন-সংসাধন সার্থক হইয়া গঠে। টেলিফোনে তখন খুব চড়া গলায় কথা কহিতে হইত, নহিলে তাহা স্পষ্ট শুনান যায় না।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এ একটি সারিয়া টেলিফোন আধুনিক রূপে গড়িয়া গঠে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হোয়াইট হাউসে বসিয়া সহজ কণ্ঠে কথা কহিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট কুলিজ বাণী পাঠাইয়াছিলেন সমগ্র যুক্তরাজ্য; কানাডায় এবং যুরোপের যুক্তরাজ্যের নানা প্রদেশে।

বেতালের সাধনা আংশিক ভাবে সফল হইয়াছিল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। তখনকার দিনে বেতোর বাতী-যন্ত্রের আকার যেমন অদ্ভুত ছিল, তার প্রয়োগ-প্রণালীও ছিল তেমনি জটিল। আর এখন?

সেমাফোন টেলিগ্রাফ

তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ পৃথিবী ছড়িয়া শব্দ-তরঙ্গ ছুটিয়াছে—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাণী। কোটি কোটি বাণী বন্ধে বহিয়া সংবাদ চলিয়াছে; এই বিপুল বাহু হইতে যার যেটি প্রয়োজন, সেটি সে কি করিয়া গ্রহণ করিতেছে, সে-কাহিনী আরো উপভোগ্য। বারাস্তরে সে অপরূপ কাহিনী বলিবার ইচ্ছা রহিল।

গরীবের ছেলে

নেপোলিয়নের
আমলে

টে লি গ্রা ফে (aerial telegraph) বার্তা-প্রেরণের ব্যবস্থা করে। এ রীতিতে ন'-দশ মাইলের বেশী কোনো বার্তা-প্রেরণ অসম্ভব ছিল। এ-টেলি-

ম্যাট্রিক ক্লাশের একটি ছেলে সেদিন হুঃখ করে বলছিল—আমার বাবা গরীব মানুষ—মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পান,—বাড়ীতে খেতে-পরতে অনেকগুলি, যে-সব বই পড়ানো হয়, তার অর্ধেকের উপর আমার কেনা হয়নি, কেনার সঙ্গতি নেই! এর-তার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে পড়ি, তাতে এগজামিনে পাশের আশা রাখি না। আমার মনের সাধ, আমি বড় হবো, খ্যাতিমান হবো, কিন্তু সে আশা মিথ্যা।

এ-কথায় মন অভিভূত হয়! বন্ধন ভাবি, একটি ছেলে স্পষ্ট করে একথা বলেছে, 'তখন একথা তুচ্ছও নয়! আমাদের গরীব দেশে ক'জন লোকের সঙ্গতি আছে যে একালে ছেলেরের স্থল-কলেজে পড়িয়ে মানুষ করে তোলেন! অর্থের যেখানে অভাব, সেখানে রোগ-শোকের মধ্যেও এত রকমের বিশ্ব-বিপত্তি এত-মুর্তিতে এসে উদয় হয় যে ছাত্রানার অধ্যয়ন-তপ:, সে-তপস্যার নিষ্ঠা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছিলাম, এমন সময় ক'জন মহা-পুরুষের জীবনীগ্রন্থ পড়বার সুযোগ মিললো। সে সব জীবনী পড়ে দেখছি, জগতে মানুষ খাড়া হয়েছে ছটি বস্তুর উপর ভর দিয়ে। তার একটি হলো ভালো স্বাস্থ্য এবং অপরটি মনের জোর। দেহ-মনের স্বাস্থ্য এবং শক্তি রক্ষা করতে হলে গোড়া থেকেই কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা উচিত—নিয়ম-পালনকে অভ্যাসে পরিণত

জানকি মাস।



সেমাফোনের চক্র-চালনী

গ্রাফ-পদ্ধতির নাম ছিল সেমাফোন টেলিগ্রাফ। উচ্চ একটি টাওয়ারে ঘড়ির মত প্রকাণ্ড একটি বস্তু সংলগ্ন থাকিত; এবং সেই ঘড়ির কাঁটা বিধি-অনুযায়ী ঘুরাইলে ঘড়ি বাজিয়া উঠিত—ন'-দশ মাইল ব্যাপিয়া ঘড়ির সে শব্দ শুনান হইত; এবং বিশেষজ্ঞেরা ঘড়ির শব্দ-সংখ্যা গণিয়া সঠিক বার্তা সংগ্রহ করিত। এ পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্রায়ে প্রাসিয়ান এবং ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ-বাত্তির প্রবর্তন ঘটে।

বৈজ্ঞানিক জগতে ধীরা বড় বড় সত্য বা তথ্য বা বস্তু আবিষ্কার করছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ১১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাত কক্ষের সুযোগ পাননি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধীরা তকমা নিয়ে বেরিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ১০ জন অর্থোপার্জনের সাধনায় মনকে ডুবিয়ে হারিয়ে দেন। বাকি বলে inventive genius, সে বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে প্রায় তুলত। দীন-দরিদ্রের মধ্যেই সে প্রতিভার বীজ বেশী লক্ষ্য বায়। তবে এ বীজকে কাজে খাটাবার মত মন চাই।

এ হেনরি ফোর্ডের নামে পৃথিবী আজ শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়ায়, তিনি ছিলেন ডেট্রয়ের এক কারখানায় সামান্য এক জন মিস্ত্রী। কোনো মতে দিনের কাজ সেবে মনিবকে তুষ্ট করে নিজের পাওনা-গুণা দানারের দিকেই তাঁর মন ছিল না। কলকল্লা নিয়ে নতুন কিছু হুজুর সাধনায় তিনি নিমগ্ন থাকতেন। চালাতে চালাতেই বৃদ্ধি খোলে! তাঁর বৃদ্ধি খুলে গেল এবং সেই বৃদ্ধির জোরে তিনি আজ মস্ত এক জন লব্ধী পুরুষ। যে এডিশনের বুদ্ধি-কৌশলে পৃথিবী পেয়েছে গ্রামোফোন, রাডিয়ো-প্রভৃতি, ১৮৬১ খ্রিঃকে কপর্দক-হীন অবস্থায় তিনি নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন। পড়ার বইগুলিকে দেনার দায়ে বোষ্টনে বাঁধা দ্রোণে রেখে হয়েছিল। বাড়ীতে পড়ে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞানে তাঁর মনের দ্বার খুলে যায়।

আমাদের বেশে পয়সার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ বাদে ভাগ্যে অগ্রসর হয় না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ কল-কারখানায় চুকছেন—উদ্বাস্তের সংস্থান করিতে। হুঃ এই যে ঝুল-কালি মেখে বিড়ি ছুঁকে তাঁরা শুধু নিগণত পাশকর্য করছেন! মাথা খাটির ঐ অস্বাভিক আদ্যো সহজ-সুলভ করে' তোলা, কিংবা নতুন কিছু গড়ে

তোলার দিকে তাঁদের লক্ষ্য কে? অথচ যখন-যেন ঐ কল-কারখানায় ধীরা কাজ করতে চুকছেন, মনের জোরে বুদ্ধিকৌশলে তাঁরা নব-নব তথ্য আর সত্য আবিষ্কার করে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করে পারেন! গরীবের ছেলের পক্ষে ধন-সম্পদ লাভ কেন সম্ভব হবে না তবে তার জন্য চাই একাগ্র সাধন। বৈজ্ঞানিক ক্রাফলিন বলে গেছে: জ্ঞান কখনো নিফল হয় না—তা সে জ্ঞান যে বকমেরই হোক; কেন! Investment in knowledge always pays its best interest.

'জ্ঞান' বলতে বা বুদ্ধি, সে-জ্ঞান ঝুল-কালেজে মেলে না, ঝুল-কালে থেকে মনকে তৈরী করে বেরবার পর জীবনের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে হয়ে আমাদের জ্ঞানলাভের আসল জায়গা। শিক্ষা সম্বন্ধে মস্ত এক ব বৈজ্ঞানিক বলে গেছেন—শিক্ষা-বিজ্ঞানের আসল অর্থ, মানুষ কিছু জানতে চায়, সেই জানার সম্বন্ধে যে-বিজ্ঞান সহায়তা করে।

ঝুল-কালেজে বাঁধা কঠিনে বাদে মন যেনে না কিংবা পয়সা অভাবে ঝুল-কালেজে চুক লেখাপড়া করবার সুযোগ বাদে মিলবে = তাদের নিরাশ হবার কারণ নেই! তারা বাড়ীতে বসে পড়ো—যে বই পাবে, পড়ো। জ্ঞানাতপূরতরো ন হি। পড়া ছেড়ে বসে থাক মানে, অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন থাকো—মনে তাতে মরচে ধরে; বুদ্ধি গোড়ায় হুণ ধরে যায়! যদি ভেবে থাকো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার সামর্থ্য নেই পয়সার জন্ত, অতএব জীবনে কৃতিত্ব লাভে সম্ভাবনা নেই, তাহলে জ্ঞানকে সে চিন্তা বা ধারণা ফুল! জগতে কৃতিত্বের পথ সকলের সমুদয় উন্মুক্ত আছে। মনের জোরে একাগ্রতা যে-কোনো ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের গুণে সকলেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন!

বসুভূমি

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পাখী

কে, এম, শরসের আলী

কাকনগিরি-সুচুটীর্ষে, চরণে সাগর বর,
বকে কোয়ার তীর্থ-বাহিনী করে কল্লোল বর।
মহামহিমার বিপুল ছন্দে
ভর-কিশলয় সেলে আনন্দে
হয় বহু নাচে ঘিরিয়া তোমার অমল শ্যামল অঙ্গ।
সুগে হুগে তুমি বীর-প্রসবিনী
জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-শোভিনী
দেশে দেশে তব পৌর্যকাহিনী বাজার বিজয়-শব্দ।
শ্যাম কাষেজে ব্রহ্ম মালয়ে
চীন তিরুতে অক্ষর হয়ে
কীর্তি তোমার মণ্ডিত,—তুমি দুর্বার নিঃশব্দ।
আর্য্যত্র্যবিদ্য সিংহ-স্রীর
শোশিত্তে তোমার বজ্রিত তীর
বায়ু-বুঝতে এক করে যা গো রচেরা-মিলন-সঙ্গ,

অমল মধ্যাহ্ন বেলা তাকাইয়া তুমি পূর্ণনে
স্রোতের জলধারা নবনীত শুভ্র মেঘস্তরে
কি যেন হুঁজিতেছি নিশ্চলকে একান্ত নহনে,—
সহসা ডাকিল পাখী নাতিলুয়ে তরুশাখা 'পরে।
আমার অন্তর হবে অনাবিকা প্রেরণীর লাগি'
মরতের হুঃ-গ্রানি অবহলে করি' বিসম্বল
ধনচািরী-ধানে আত্ম-জোলা বৃত্ত অহরাসি,—
তুমি কোথা হ'তে আসি' অনার্য্যে জুড়ালে গ্রন্থ।
আকাঙ্ক্ষার বস্ত কিছু কিংবা বস্ত নিঃশব্দ হিয়ার
সহসা ভরিয়া গেল মনে লর গুণাকর্ষ গানে;
আলোরায় শিখে হাঁটা বুকিলায় নিদারুণ ফুল।
বরষীর বুলিমাটা স্তম্ভ-পোজ, তরলতা ফুল
কান্না হাসি হাওয়াব সব যেন একান্ত আমায়,—
মুহুর্তে সবিং হলো, দীর্ঘ আদ্যে লজ্জিত পরায়।

প্রথম অধ্যায়

৭

সঙ্কেতঃ—১১১ শ্লোকের প্রথমার্ধের পর বরোদা-সংস্করণের পাটটাকার মত একটি পাঠান্তরে ছয়টি নতুন শ্লোক পাওয়া যায়। এই সকল শ্লোক বরোদা-সংস্করণের মূলমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই—অল্প কোন সংস্করণেও ঐগুলি পাওয়া যায় না। তথাপি এগুলি শ্লোক (যদিও তাহার প্রকৃতি বন্দিয়াই গণ্য হয়) অনুদিত না হওয়াও অস্বাভাবিক—এই বিবেচনায় নিম্নে উহাদিগের ভাষান্তর প্রদত্ত হইল। শ্লোকগুলির পাঠ বহু প্রমাণ-কর্তৃক—এ কারণ অনেক স্থলে যোজনা করাও যায় না। সেই হেতু এস্থলে ভাবমুখ্য মাত্র প্রদত্ত হইল।—

(নাট্য) দুঃখিতগণের প্রমত্ত অংশ, শোকার্ভ তপস্বীগণের (হিতোপদেশজনক—নানাবহাস্তরাস্ত্রক। প্রকৃতিগণ নানা-শীল-বিশিষ্ট; (আব) শীল হইতেই নাট্য বিনিমিত হইয়াছে। অতএব, নাট্য-বস্তুগণ-কর্তৃক লোকপ্রমাণানুসারে (নাট্যকলা) কর্তব্য।

সেবতা-স্ববিভাজ্য ও কুটুংগণের কৃতাহুকরণ লোকে নাট্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বাহ্য মতাজিলা-সম্পন্ন, বিমদ, যৌবনস্বয়শালী, তীহাদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত এই নাট্যবিধি প্রযোজ্য।

প্রায় সকল লোকেরই স্বভাবতঃ নৃত অভ্যাস। আর মানসিক বলিয়া এই নাট্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রসব, লাভ, বিবাহ, হর্ষ, নানাবিধ অভ্যাসে ও রাজগণের প্রধান সময়ে এই নাট্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

চিহ্ন—দুঃখিতগণের প্রমত্তাংশ—প্রমাদ বা অনবধানতাই দুঃখের মূল কারণ। তাই ‘দুঃখিতগণের প্রমত্তাংশ’ অর্থে—দুঃখিত-গণের দুঃখকারণ যে প্রমাদ, তাহার বস্তুকৃৎ অংশ প্রদর্শনীয়, তাহাই নাট্য। এক্ষণে অর্থ কোন বস্তুতে টানিয়া করা চলে। ‘প্রমত্তানাং’ পাঠ হইলে অর্থ ভাল হয়—প্রমত্তগণের। দুঃখিত, প্রমত্ত, শোকার্ভ, তপস্বীগণের হিতোপদেশ-স্বরূপ নাট্য। তপস্বী—বাহ্য তপস্তা করেন—এ অর্থ এ স্থলে ঠিক লাগে না। এ ক্ষেত্রে অর্থ—বোকা, poor হইলেই ভাল হয়। অভিনব কিন্তু পূর্বোক্ত অর্থ করিয়াছেন—পরে উহা প্রদর্শিত হইবে। নানাবহাস্তরাস্ত্রক—নানাবিধ অবস্থা-ক্ষেপে বাহ্যে প্রদর্শিত হয়। শীল—স্বভাব, চরিত্র। নানাশীলাঃ প্রকৃতকঃ—প্রাপ্তক সাধারণতঃ বিভিন্ন স্বভাব ও বিভিন্ন চরিত্রের হইয়া থাকে। শীলাং নাট্য বিনিমিত্ত্ব (মূল)—লোকচরিত্র অবলম্বনেই নাট্য-কলা হইয়া থাকে। লোকপ্রমাণানুসারে নাট্য কর্তব্য—লোকসমাজে বৈদ্য চরিত্র প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে চরিত্র-চিহ্ন নাট্যে প্রদর্শনীয়। কৃতাহুকরণ—কৃত কথের অনুকরণ। সংকেতঃ (মূল)—মহাভিপ্রায়-বিশিষ্ট। বিমদ—পণ্ডিত ও বসিক, oceanisaur অর্থ-সিদ্ধেয় (মূল)—‘অর্থ’—প্রয়োজন; প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ। প্রয়োজ্য—প্রয়োগ কর্তব্য। নৃত—মহর্ষি ভরত নৃত ও নৃত্যের জ্ঞে প্রদর্শন করেন নাই। এই শ্লোকটিতে তাহার আভ্যন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, নৃত স্বভাবতঃ লোক-মাজেরই প্রিয়। আর নাট্য কেবল কল্যাণকর মতে, অবিকৃত মানসিক ব্যাপারও কটে। প্রসব—পুত্রাদির জন্ম। লাভ—স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদিত। সেবতা—সেবা। কুটুংগ—কুটুংগ। কৃতাহুকরণ—কৃতাহুকরণ।

রাজগণের যুগ্মভিধান-কালে। এই সকল কালে মাল্য আচার বলিয়া নাট্য-প্রয়োগ কর্তব্য।

এই পর্যন্ত পাটটাকার শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা। অতঃপর মূলমুখ্য প্রদত্ত হইতেছে।

মূলঃ—[নাট্য—অর্ধোপজীবীগণের অর্থ, উচ্ছিন্নচিত্তগণের বৃত্তি (ধৈর্য)।—]

(উহা) নানাতোষোপসম্পন্ন, নানাবহাস্তরাস্ত্রক। ১১১।

সঙ্কেতঃ—নানাতোষোপসম্পন্ন—নানাতোষযুক্ত। নানা ভাব—বর্তিত-ভাস-শ্লোক ইত্যাদি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। নানা বহাস্তরাস্ত্রক—নানাবিধ বিভিন্ন অবস্থার স্বরূপ-বর্ণনাই নাট্যের প্রাণ।

মূলঃ—লোকবৃত্তের অনুকরণ-স্বরূপ এই নাট্য সংকর্তৃক কৃত হইয়াছে।

সঙ্কেতঃ—নৃত—আচরণ, চরিত্র; লোকবৃত্ত—লোক-চরিত্র, লোকের আচরণ, লোকে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সেই সকল ঘটনা। অভিব্যক্তিতে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—এই নাট্য-ক্রীড়া লোকবৃত্তানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ, লোকে কদাচিৎ আশ্চর্যস্বরূপে পরিস্থিত হয় না অর্থাৎ লোকে কদাচিৎ প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞান অসম্ভব—শাস্ত্রমুখে বা আশুত্বাক্যমুসারে ধর্ম বা অধর্মের স্বরূপ-জ্ঞান করিতে হয়—নিজ-বুদ্ধিতে কদাচিৎ নির্ণয় করা যায় না।—এই হেতু কদাচিৎ আশ্চর্যকৃত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ যে সব চরিত্র (বধা—ধার্মিক বলিয়া প্রথিত ঈশ্বরমত-বুদ্ধিগণ), সেই সকল চরিত্রেই নাট্যে অনুকরণার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

মূলঃ—উত্তম-অধম-মধ্যম নরগণের কদ্বালিত্ত্ব—। ১১২।

হিতোপদেশক, বৃত্তি-ক্রীড়া-স্বাধিকৃত—ইহা বস-সমূহে লব-সমূহ ও সকল কর্তব্যকরণ—। ১১৩।

সকল প্রকার উপদেশ-জনক নাট্য লোকে হইবে।

সঙ্কেতঃ—কাদী-সংস্কারণ পাঠ অনুসারে ভাষান্তর করিলে কীড়ার উত্তম-অধম-মধ্যম নরগণের কদ্বালিত্ত্ব, হিতোপদেশ-জনক হইবে এই নাট্য। বস-সমূহে ভাবসমূহে ও সকল প্রকার কর্তব্যকরণ সর্বপ্রকার উপদেশজনক হইবে এই নাট্য।

১১২। কদ্বালিত্ত্ব (মূল)—কদ্বং সঞ্জিত অর্থাৎ সঞ্জিত। উত্তম অধম ও মধ্যম প্রকৃতির নরগণের কদ্বালী অবলম্বনে রচিত—নাট্য।

১১৩। হিতোপদেশজনক (মূল)—হিতোপদেশ-স্বরূপ। বৃত্তি-ক্রীড়া-স্বাধিকৃত—বৃত্তি (ধৈর্য), ক্রীড়া ও সুখ ইত্যাদি উপভোগ করে। কাদীর পাঠে এ অংশটুকুর পরিবর্তে পাঠান্তর—‘নানাতোষ ভবিষ্যতি’। সর্বকদ্বালিত্ত্ব (মূল)—সকল প্রকার কর্তব্যকরণের প্রকৃতির উপদেশ নাট্যে পাওয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য।

১১৪। সর্বোপদেশজনক (মূল)—সর্বপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকে (নাট্য); অথবা—‘সর্বোপদেশ’ বলিতে বৃত্তিতে হইবে—সকলের উপদেশ; সকলকেই উপদেশ দেয় এই নাট্য।

মূলঃ—দুঃখার্ভ, অস্বাভাবিক, শোকার্ভ, তপস্বীগণের—। ১১৪

কালে বিমোহিত-জনক হইবে এই নাট্য।

বদগণ হইতে অপ্রমত্ত, বদগণ, আদর্শিক, বিদগণ, বৃত্তি-বিবর্তক—। ১১৫

লোকের উত্তম-অধম-মধ্যম হইবে এই নাট্য।

সংকট :- ১১৪। পান্টকার স্রোকে 'তপস্বী' শব্দের অর্থ করিবার সময় বলা হইয়াছিল যে—তপস্বী বলিতে তপস্বীকারী—একপ অর্থ না করিয়া 'ইতভাগ্য—বোচা'—এইরূপ অর্থ করিলেই অধিকতর শোভন হয়। কিন্তু এই স্রোকে অভিনবগুপ্ত 'তপস্বী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অনবরত কৃচ্ছ-চাত্রাধ্যাপির আচরণকারী—তপস্বীকারী।

অভিনব বলিয়াছেন—নাট্য প্রেক্ষাগৃহের বিশ্রান্তিজনক। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে বাঁহারা ব্যাধি প্রভৃতি জনিত দুঃখে স্রিষ্ট, কিংবা পুষ্ক-গমনক্রেমাণি-জনিত শ্রমে প্রাপ্ত, অথবা বন্ধু-মরণাদি-জনিত শোকে আর্জ, আর যে সকল তপস্বী অনবরত কৃচ্ছ-চাত্রাধ্যাপির আচরণে অভিশয় হুর্ল-শরীর ও খিন্ন-হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন, নাট্য তাঁহাদিগের সকলেরই বিশ্রান্তিজনক অর্থাৎ—তাঁহাদিগের এই সকল নানাবিধ দুঃখ বাহাতে বাড়িতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করে—এক কথার দুঃখ বাহাতে বাড়িতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করে—এক কথার দুঃখ-প্রসারের বিঘাতক। আবার বাঁহাদিগের দুঃখ প্রতিহত হইয়াছে, তাঁহাদিগের যথাব্যোগ-ভাবে আত্মদ-প্রতি ইত্যাদি উৎপাদন করে। দৃষ্টান্ত-রূপে বলা যায়—নাট্য শোকার্দের প্রতি (মৈত্র্য), প্রমার্দের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে; তপস্বীগণের মতি ও বিবোধ জন্মাইয়া দেয়।

১১৫। কেবল ইহাই নহে—কালান্তরে নাট্য-কৃত উপদেশ পরিপাকস্থ স্বয়ং উপলব্ধ করে। অর্থাৎ—নাট্য-দর্শনে যে তাৎকালিক স্বয়ং উপলব্ধ হয়, তাহা তৎক্ষণ-মাত্র-স্বারী নহে—পরন্তু পরিণামেও সুখকর হইয়া থাকে। এমন অনেক সুখ আছে (যথা—বিষয়েন্নিহ-সুযোগ-জনিত সুখ, যথা—অতিরিক্ত মিষ্টান্নভোজনের যে সুখ), তাহা আপাততঃ সুখকর বলিয়া মনে হইলেও পরিণামে উহার ফল-দান-কালে (বিপাক-কালে বা পরিপাক-সময়ে) অত্যন্ত দুঃখের জনক হইয়া থাকে। নাট্য সেরূপ সুখের জনক নহে। ইহা হইতে যে সুখের উপলব্ধি হয়—তাহা দুঃখিতের দুঃখ-প্রশমন-পূর্বক আপাততঃ সুখ-রূপে ত গণ্য হয়ই, অধিকন্তু কালান্তরেও নাট্য-কৃত উপদেশ সুখ-লায়ক হইয়া থাকে। ১১৫ স্রোকে যে 'কালে' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে—উহার তাৎপর্য উক্তরূপ—কালান্তরেও এই নাট্য দুঃখার্দি প্রমার্দি শোকার্দি ও তপস্বীগণের বিশ্রান্তিজনক (দুঃখ-প্রসারের বিঘাতক) হইবে।

আর বাঁহারা অদুঃখিত—বহু সুখে লালিত-পালিত (যথা রাজ-পুত্রাদি), তাঁহাদিগের ধর্ম্মদি-বিষয়ে বৃদ্ধি-বৃদ্ধি করে এই নাট্য। স্রোকারিত এই সকল ধর্ম্মাদি উপায়বর্গ—নাট্যোপদেশের ফলাফল। তাৎপর্য এই যে—বাঁহাদিগের দুঃখ ভোগ করিতে হয় না—চিরদিন সুখভোগে অভ্যস্ত, নাট্য তাঁহাদিগের দুঃখ প্রশমন করে না বটে, কিন্তু নাট্য-কৃত উপদেশ-দ্বারা সকল স্রোকে আচরণীয় ধর্ম্মদি-বিষয়ে তাঁহাদিগের মতি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নাট্য ইহাদিগকে কল্প-জ্ঞায় উপদেশ দেয় না—এই কাহাটি ধর্ম্মজনক, অতএব ইহা কর, বা ইহা অধর্ম্ম, ইহা করিও না; পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম-বিষয়ে আন্তরিক প্রবণতা বা নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া দেয়—অন্তর হইতেই ধর্ম্মদি-বিষয়ে এই আকর্ষণ বা প্রেরণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে—উহার নিমিত্ত বাহিরের কোন নির্দেশ বা উপদেশের অপেক্ষা থাকে না। এই যে আন্তরিক নিষ্ঠাবৃদ্ধি, ইহা শুভবিষয়িণী নিষ্ঠা—অনুভববিষয়িণী বৃদ্ধি নহে ('বৃদ্ধি' বিবর্তন, ব্রহ্মভিদ্ভাসেব; তাদৃশী; বিবর্তনীয়ার্থঃ। ন চ সা দৃষ্টা-বিবর্তন্যাহ—হিতব—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)। কারণ—ইহা হিতকর—

কেহু হিতকরী বৃদ্ধির জনক। তাহার হেতু—ইহা বহু বহু হইতে অবিচ্ছিন্ন—ব্যয়াদ্বয়। বসন্ত—বসন্ত বলিতে বৃষ্টির স্রোত প্রসিক্তিলাভের হেতুভূত অদ্বৈত-বসন্তকর বহু, বহা, জীবাশ্রয়-সমুদ্র-ভাঙ্গ-বিধকরণাদি। এবদ্বৈত বসন্তের স্রুত উপদেশকর—এই নাট্য আদ্য—আদ্য বলিতে বৃষ্টিহেতু—আদ্য ব্রহ্ম হেতুভূত আচা সমুহ। সেই সকল আদ্য ব্রহ্ম স্রোতের স্রুত উপদেশকর এই না (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)।

১১৬। স্রোকাপদেশজননম্ (মূল)—'স্রোক'-শব্দের ৩ স্রোকবৃত্ত বা স্রোক-চরিত্র। বিচিত্র স্রোক-চরিত্রের যথার্থ চিত্র স্রোকাপদেশজনন—(অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)।

স্রোকাপদেশজনন—স্রোকবৃত্তের পরিচয়-প্রদান। অথবা—স্রোকের উপদেশ-জনক—একপ স্রল অর্থও করা বাইতে পারে।

তাঁহা হইলে স্রোকের উপর ষাড়াইতেছে এই যে—নাট্য বহু কি দুঃখিত কি অদুঃখিত উভয়েরই সমভাবে গ্রহণযোগ্য। তৎসং প্রকার—শারীর ও মানস। শারীর দুঃখও আবার ত্রিবিধ—দৈবক, স্বয়ংকৃত ও পরকৃত। স্বয়ংকৃত দুঃখ আবার কোন ফলাভের আশ কৃত অথবা অন্তরূপ (ফলাশায়ী) হইতে পারে। এইরূপ বিবেচ্য বৃষ্টি বায়—দুঃখবর্গ ও দুঃখিতবর্গ সম্বন্ধে অনেক। এই কার দুঃখার্দিগণের—এই বহুবচন-প্রয়োগ-দ্বারা বহু শ্রেণীর দুঃখ স্রিষ্ট না ব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪১)।

এই প্রসঙ্গে অভিনব আরও বলিয়াছেন—১০৮ স্রোকে "দে ধর্ম্মপ্রবৃত্তানাম্"—এই বাক্যটি কেহ কেহ মধ্যে অকার-প্রশ্নের কবি সন্ধি-দ্বারা সেটিকে লুপ্ত-অকার-রূপে প্রদর্শন করেন, যথা—ধর্ম্মোহং প্রবৃত্তানাম্। বাঁহারা অধ্যায়ে প্রবৃত্ত—তাঁহাদিগের পক্ষে এই না ধর্ম্মোপদেশ-দ্বারা ধর্ম্মজনক—ইহাই তাৎপর্য। আর এইরূপ ৩ করিলেই ১১৫ স্রোকে 'ধর্ম্ম' পদটির সার্থকতা হয়। কারণ, ১০ স্রোকে বলা হইয়াছে ইহা অধ্যাপক-প্রবৃত্তগণের ধর্ম্মজনক আর ১১৫ স্রোকে বলা হইল যে—বাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপথে আছে তাঁহারা বাহাতে ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট না হন, নাট্য সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকে—অর্থাৎ ইহা ধর্ম্মিকগণেরও ধর্ম্মোপদেশ-জনক। এইরূপ অর্থ করি আর পুনরুক্তি-স্রোকের সম্ভাবনা থাকে না। আবার কেহ কেহ বলেন না, তাহা নহে—ধর্ম্মে প্রবৃত্ত জনগণের নিকট ইহা (নাট্য ধর্ম্মোপদেশ-দ্বায়ক বলিয়া গণ্য হয়। স্রুগত অভিপ্রায়ের একতানতা হেতু ধর্ম্মিকগণ মনে করেন—'নাট্য যেন আমারই ধর্ম্মকথা (অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশ) প্রকাশ করিতেছে'। যিনি রূপে ভাবের ভাবুক তিনি নাট্যমধ্যে সেইরূপ ভাবেরই স্রুগ দেখিতে পান। তাই একা নাট্যবস্ত্র বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ভাবের উৎস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

আচাধ্য অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—কি ধর্ম্মিক, বি অধ্যাপক—উভয়েরই উপদেশ (অর্থাৎ উপদেশার্থ)—এই কারণ 'ধর্ম্মো ধর্ম্মপ্রবৃত্তানাম্' ইত্যাদি বলিবার পরও 'ধর্ম্মো' ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। আর একটি কথা—কেবল প্রাচীন পুরুষগণের প্রতি এই উপদেশ প্রযোজ্য নহে—অথবা, পুরুষার্থের (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষের) উপায়মাত্র-সম্বন্ধে এ উপদেশ—এমনও নহে, কিন্তু যৎ কিছু উপায় (means) ও উপায় (end) থাকা সম্ভব—সে সকল সবকিছু—এ উপদেশ (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪২)।

মূল :—এমন কোন জ্ঞান নাই, এমন কোন শিক্ত নাই, এমন কোন বিজ্ঞা নাই, এমন কোন কলা নাই—১১৬।

এমন কোন বোগ নাই, এমন কোন কথ্য নাই—বাহা এই নাট্যে দৃষ্ট না হইয়া থাকে।

(সকল শাস্ত্র ও শিল্প, আর বিবিধ কৰ্ম্ম ১১৭।

এই নাট্যে সমস্ত—অন্তএব ইহা সংকল্পিত কৃত হইয়াছে।)

সমস্ত :—১১৬—১১৭। সপ্তদ্বীপ-গত ভাবানুকীর্ণ-অবশ্য এই নাট্যে বাহা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ—ছন্দ-গোচর হয় না, তাৎপন্য জ্ঞানাদিরই অভাব নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। ১১৬। জ্ঞান—আজ্ঞান; ইহার দৃষ্টান্ত বৈদ্যসংহারে—“আজ্ঞারামা বিচিত্ররতনো নির্বিকল্প সমার্থো” (১২৩)—বাহারাম আজ্ঞারাম, নির্বিকল্প সমার্থিতে নির্বিচলিত ইত্যাদি।

শিল্প—চতুঃকোণী ললিত-কলার অন্তর্গত কব-কৌশলারূপ—মালা-চিত্র ইত্যাদি।

বিজ্ঞা—দণ্ডনীতি ইত্যাদি। আয়ৌজিকী, ত্রয়ী, দণ্ডনীতি ও বাস্তব—চারিটি বিজ্ঞা। এতদ্ব্যতীত চতুর্দশ বিজ্ঞা-স্থান ইত্যাদি।

কলা—শিল্প ও কলার ভেদ অতি স্থূল। শিল্প—কব-কৌশলাদি শারীরিক পটিলম ও নিপুণতা মাত্র বাহাতে প্রকাশ পায়, বধা মালা-গ্রন্থনাদি। কলা—বাহাতে প্রতিভা, মনন-শক্তি, বুদ্ধি-কৌশলের প্রকাশ,

বধা গীত-বাছাদি। ইহাই অভিনয়ের অভিজ্ঞার। পক্ষান্তরে, বহির্বিষয়-বাহ্য-কৃত কামদ্ব্যাদি প্রভেদ চতুঃকোণী ললিত-কলা-ভালিকার মধ্যে মালা-গ্রন্থনাদি শিল্প ও গীত-বাছাদি কলা—এতদ্ব্যতীত একত্র সম্বন্ধেই দৃষ্ট হয়—শিল্প ও কলার কোন ভেদ সে সকল প্রভেদ করা হয় নাই।

বোগ—বোজন। বোজন দুই প্রকার—(১), শিল্প বিজ্ঞা ও কলা—এই চারিটি বিভাগের এক একটির নামাধিগ উপবিভাগ আছে। যে কোন একটি বিভাগের অন্তর্গত একটি উপবিভাগের সহিত সেই বিভাগেরই অন্ত একটি উপবিভাগের বোগ—প্রথম প্রকার বোজন—ইহা স্বগত ভেদ-বিশেষের সহিত স্বগত ভেদান্তের বোজন—বধা—গীতের সহিত বাস্তব বা নৃত্যের বোগ। গীত-বাচ-নৃত্য—তিনই একটি বিভাগের (কলার) স্বগত উপবিভাগ মাত্র। (২) একটি বিভাগের একটি উপবিভাগের সহিত বিভাগান্তর-ব্যবহৃত কোন উপবিভাগের বোগ—অন্তান্ত-ভেদ-বোজন; বধা—স্বাক্ষর-কল্প বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞার বোজন (দৃষ্টান্ত অভিনব শিষ্যজ্ঞান, অঃ ভাঃ, পৃঃ ৪২)।

কথ্য—বুদ্ধ, বাছ-বুদ্ধাদি ব্যাপার। মূল—() ব্যাকটের মধ্যবর্তী ১১৭-১১৮ শ্লোক প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়; কারণ, অভিনব উদাহরণ নাই। কিন্তু কাশী-সংস্করণে উহা ১১৪-১১৫ শ্লোকস্থলে পাঠিত হইয়াছে। [কথন:

ক্রম ও সৃষ্টি

শ্রীমদ্বলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চিরসার্থী

শ্রীঅন্ততত্ত্বের সাক্ষ্য

বিশ্বের মাঝে নিঃস্ব করিয়া নিজেদের দিয়াছ ঢালি
অষ্টা তোমার সৃষ্টির মাঝে লুকানো রূপের ঢালি।

মহিমা তোমার অগাধ অপার
চন্দ্র-সুখ্য গ্রন্থ-পারাবার

তোমাকে ঘিরিয়া করিছে নৃত্য, করিবে চিরকালই
তুমি রবে চিব-অজ্ঞাত প্রভু বৈষ্ণবশাসী।

দুবনে দুবনে নিত্য তোমারে বিস্ত করিবে দান
কণ্ঠে কণ্ঠে ধনিয়া ভাটিবে তোমারই জয়গান।

তোমারি করুণা হস্তে লাগে
জড়িত রহিবে শিশুর আশ্রয়ে

তব নামসুখ্য করিবে কন্যা চাতকের সম পান
অজ্ঞের মাঝে রহিবে গো চির ভক্তের ভগবান।

সৃষ্টির মাঝে আছ আচরিত নিতু নব নব সাজে
রূপে, রসে আর গন্ধে স্পর্শে তোমারি সত্তা রাজে।

দয়া, মায়া, প্রেম, অমৃত্যু, প্রীতি
মহতী করুণা মহত্তর রীতি

অভিনব তব অভিব্যক্তি হবে, দুঃখে লাগে
বিশ্বরূপেতে বিশ্ব সেজেছ বিবাহতার বরসাজে।

মোরা গুঁজি হায় তীর্থে তীর্থে, বিগ্রহে, দেবালয়ে
তুমি থাক নাথ সৃষ্টির মাঝে অষ্টার রূপ লয়ে।

সদা আছ তাই তুমি সনাতন
সচ্চিদানন্দ তাপসের ঘন

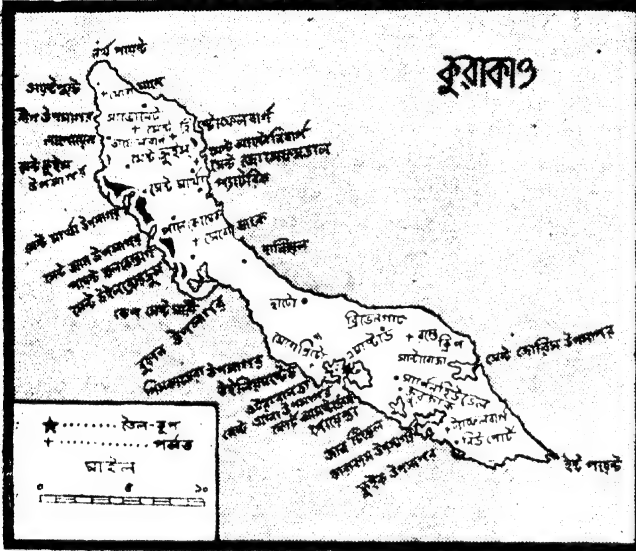
গর্ব্বের মাঝে অমৃতধারা মা উড়ে মরণ-ভয়ে
সৃষ্টিহিত-প্রলয় কাশ তুমি আছ এক হয়ে।

দুঃখের নিশায় সবে গিরেছিল ফেলি
ধর্ম্মীর এক প্রান্তে মোরে অবহেলি।
ডেকেছিল কত—কেহ দেখনি উত্তর,
প্রলয়ের ঘনঘটা মাধার উপর!
শিহরিয়া উঠেছিল হেরি দীপ্যমান
দামিনীর ছটা! শুধু শরণের স্থান
খুঁজিয়া ফিরিতেছিল আকুল এ প্রাণ!
অলখে বহিয়া কোথা দয়াময় স্বামী,
বলেছিলে “ভর নাই—এই আছি আমি!”
চুপসহ শোকের মাঝে শুধু অমূল্য
আহত ক্রোড়ের মত ক’রেছি ক্রন্দন।
কেহ আসে নাই ছুটে—দেখনি সাধনা,
জাগে নাই কারো বৃকে করুণার কথা।
হাহাকারে কাটাইয়া নিদ্রাহীন রাত,
খুঁজোছি স্থাখার বাখী—স্বপ্নের মাখী!
সে ঘোর দুর্ধর্মে মোর দয়াময় স্বামী,
ব’লেছিলে “ভর নাই,—এই আছি আমি!”
এক দিন হবে যত্না নিশ্চয় সে জানি,
জীবনের যবনিকা ধীরে ধীরে টানি’।
এ ধরার ভূতশপট শেষ হবে দেখা,—
একাকী এসেছি ভবে—যেতে হ’বে একা!
অজানা অন্তরে দেশে নিঃসঙ্গ ছায়
খুঁজিয়া ফিরিবে সাথী সকল সময়।
সে দিন ঠাঁড়াসে পাশে করিবে কি স্বামী—

আরুবা-কুরাকাও

নামটা শুনাইতেছে হেয়ালির মত। কিন্তু হেয়ালি নয়। আরুবা, কুরাকাও এবং বোনায়ার তিনটি দ্বীপ। কলম্বিয়া-ভেনেজুইলার উত্তরে, হাইতি-কিউবার দক্ষিণে এবং পানামা-কেনালের পূর্বে দিকে

জাখানি ডাচ-শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে উজোগী হইয়াছিল, তখন ব্রিটিশ এবং ফরাসী-শক্তি বিপুল উত্তমে আরুবা এবং কুরাকাওয়ের পেট্রোল-ভাণ্ডার-রক্ষার্থে বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। তারা তখন



প্রভূত ফৌজ পাঠাইয়া এই আরুবা এবং কুরাকাওকে দুরধিগম্য করিয়া তুলিয়াছিল। পরে ক্রান্তের পতনে ফরাসী-ফৌজ এ দুই দ্বীপ হইতে অপসারিত হয় এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন ফৌজ গিয়া ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইয়া এ দুই দ্বীপের রক্ষা-ভার গ্রহণ করে। এখনো পর্যন্ত মার্কিন এবং ব্রিটিশ-ফৌজ এ দুই পেট্রোল-ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছে। ডাচ গভর্ণমেন্টের আবহানেই অবস্থা এ ব্যবস্থা হইয়াছে ব্রিটিশ ও মার্কিন ফৌজের আগমনের সংবাদ পাইয়া ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী জাখানরা এখানকার জলপথে টপেডো চালনা এবং আরুবার পেট্রোলের ভাণ্ডারে ও গুদামে শেল বর্ষণ করিয়া ছিল। তার ফলে মিত্রপক্ষের কতকগুলি ট্যাঙ্ক মার নষ্ট হইয়াছিল—কোনো শেল পেট্রোল-ভাণ্ডারে আঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তার পর হইতে আজ পর্যন্ত এ দুই দ্বীপ-রক্ষায় সশস্ত্র মার্কি

কারিবীয়ান সাগর; সেই সাগরের বুকে আরুবা, কুরাকাও এবং বোনায়ার দ্বীপের অবস্থান। কথায় বলে, ভূমি লক্ষ্মী! আজ এই যুদ্ধের মরশুমে এই তিনটি দ্বীপ নানা বৈশিষ্ট্যে মিত্রপক্ষের বিজয়-লক্ষী-লাভে পরম সহায় হইয়াছে।

নিখুঁত যে, জাখান-বোমা এ দুই দ্বীপের কাছেও কখনো ঘেঁষিবে পারে নাই।

জাখানরা পরে হলাও অধিকার করিয়াছে এবং ডাচ-ইণ্ডিও আজ জাপানের হস্তগত; কিন্তু এখানকার কয়টি দ্বীপে আজো ডাচ শক্তি অক্ষত অটুট আছে। এই কয়টি দ্বীপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে সুরিনাম ও ডাচ-গায়ানা মাত্র এখ ডাচের হাতে অবশিষ্ট আছে।

কুরাকাওয়ের ক'মাইল দূরে বোনায়ার দ্বীপ এবং ফু সুবা, সেট ইয়সটেটিয়াস এবং লৌওয়ার্ড দ্বীপবলীর সেট-মার্টি নামক দ্বীপের অংশও ডাচ-হস্ত হইতে বিচ্যুত হয় নাই শেবোস্ত দ্বীপের বাণিজ্য সম্পর্কিত মূল্য সামান্য এবং এগুলিতে লোকের বসতিও খুব অল্প।

কুরাকাও, আরুবা এবং সুরিনাম—এই তিনটি দ্বীপ হলাণ্ডের সম্পদ-লক্ষ্মী। পেট্রোল, বক্সাইট এবং এলুমিনিয়াম—এ কয় সম্পদে তিনটি দ্বীপ রীতিমত সমৃদ্ধ। তাই এ সম্পদ রক্ষার জন্য হলাও আজ সর্ব্বশ পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে আরুবার এবং কুরাকাওয়ে পেট্রালের খনি নাই; মার কাইবো হ্রদ এবং দুই শত মাইল দূরবর্তী ভেনেজুইলা উপকূল হইতে প্রচুর পেট্রোল আনিয়া এ দ্বীপগুলির বিপুল ভাণ্ডারে তাহা সংরক্ষিত হয়। সাগরের দেহ এখানে শীর্ণ—

সে জন্ত মারাকাইবো বা ভেনেজুইলার উপকূলে বড় বড় জাহাজ চা না; আরুবার চারি দিকে জল বেশ গভীর এবং বন্দর হিসাবে কুরাকা অতুলনীয়। এই কারণে ভেনেজুইলা ও মারাকাইবো হ্রদ হইতে পেট্রোল আনিয়া এ দুই দ্বীপে ভাণ্ডারজাত করা বিশেষ সুবিধাজনক। মারাকাইবো হ্রদের পরিসর বিপুল। হ্রদের চারি দিকে ঘ



আরুবা এবং কুরাকাও—এ দু'টি দ্বীপ ডাচ-শক্তির অধিকার-ভুক্ত। এ তিনটি দ্বীপে পেট্রালের পাখার আছে—এবং সে পেট্রোল আজ মিত্রপক্ষের গ্যেন, ট্যাঙ্ক এবং ভাহাজগুলিকে সজীব ও সচল রাখিয়া ফৌজ এবং রশদপত্র জোগানোর কাজকে করিয়াছে যেমন সহজ, তেমনি নিষ্কল্যাণ। চার বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে—সে সময়ে

অৱণ্য। হুদেৰ জল ও তাঁৰ-ভূমিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৪০০০ বৰ্গ-মাইল
এক এই বিস্তীৰ্ণ অংশেৰ নীচে পেট্ৰোলিয়ামেৰ বিৰাট স্তৰ।

দ্বীপগুলিৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি দেখিলে মনে হয় হুলাণ্ডেৰ ক্ষুদ্ৰ
সংস্কৰণ। উইলেমষ্টাড কুৰাকাওয়েৰ প্ৰাচীন সত্ৰ ও ৰাজধানী।



এখানকাৰ বাড়ী-ঘৰ পথ-ঘাট ডাচ আদৰ্শে বিনিৰ্মিত হইয়াছে—
পথৰ নাম, মহল্লাৰ নাম ডাচ। ডাচ আকৃতি-প্ৰকৃতিৰ জন্ত বিম্বায়েৰ
কিছু নাই। তাৰ কাৰণ, ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ দ্বীপগুলি আছে
ডাচ-অধিকাৰে। সত্য সমুদ্ৰ নিউ-ইয়ৰ্ক যখন নিউ-নেদাৰ্ণাণ্ড নামে
পৰিচিত ছিল এবং সেখানে যখন বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান জাতি লুপ্ত



দ্বীপমালা

কৰিত, তখন কুৰাকাওয়েৰ ডাচ গবৰ্ণৰ কুৰাকাও হইতে ফৌজ
পাঠাইয়া সেখানকাৰ অশান্তি-উৎপাত দমন কৰিতেন। ১৬৪৬
খৃষ্টাব্দে গবৰ্ণৰকে অতিৰিক্ত ডিউটি দেওয়া হয়—কুৰাকাও, আক্ৰবা,
বোনায়াৰ দ্বীপগুলি শাসনেৰ উপৰ নিউ-ইয়ৰ্কৰ শাসন-পালনেৰ দায়িত্ব
বহন কৰাৰ। এই গবৰ্ণৰেৰ নাম ছিল পীটার লুডোভিক। আজ
আমেৰিকা সে ষণ শোধ কৰিতেছে আক্ৰবা কুৰাকাও এবং
বোনায়াৰ ৰক্ষাৰ জন্ত মাৰ্কিন ফৌজ পাঠাইয়া।

বন্দৰ হিসাবে উইলেমষ্টাড অতুলনীয়। তাৰ কাৰণ, ইহাৰ গায়েই
সেট আনা উপসাগৰ। এই উপসাগৰটি স্থগভীৰ এবং ইহাৰ স্থলীৰ্ণ দেহ
বহু দূৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃত; তাৰ পৰাই স্কোটেগাটে আৰ একটি উপসাগৰে

গিয়া অঙ্গ মিশাইয়াছে। এখান পৰ্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে
যাতায়াত কৰিতে পাৰে। এই দুই উপসাগৰেৰ সমগ্ৰ তাঁৰ-ভূমি বড়
বড় অসংখ্য ট্যাকারে আঙ্গ সুরক্ষিত। ট্যাকারগুলি এমন ভাবে রাখা
হইয়াছে যে, বাহিৰ হইতে সেগুলিৰ চিহ্ন দেখা যায় না। বন্দৰেৰ
কূলে বহু পেট্ৰোল-ভাণ্ডাৰ। সেগুলিও এমন ভাবে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰে
সংৰক্ষিত এবং আচ্ছাদিত রাখা হইয়াছে যে, বাহিৰ হইতে
তাদেৰ অবস্থান-নিৰ্ণয় হুসাধা ব্যাপাৰ।

উপসাগৰেৰ বুকৰ উপৰ দিয়া পোনটুন-সেতুযোগে
উইলেমষ্টাড পোৰেস্তা এক নতুন সত্ৰ অণুবাধা বনিষ্ট ভাবে
সংবদ্ধ। বড় জাহাজ উপসাগৰেৰ কূলে আসিবামাত্ৰ লোহাৰ
মোটা শিকলে পুলটিকে উঁচু কৰিয়া তোলা হয় এবং জাহাজ
উপসাগৰেৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰে। পুল তোলা এবং ফেলাৰ
কাজ দিলে বহু ব্যৰ কৰিতে হয়; কাৰণ, এ উপসাগৰে জাহাজ-
যাতায়াতেৰ বিৰাম নাই। এ-পথে বছৰে প্ৰায় ছ'হাজাৰ
বড় জাহাজ যাতায়াত কৰে। এই ৬০০০ জাহাজেৰ ওজন
পাঁড়ায় মোট ২১০০০০০ টন! এ জন্ত মোটৰ-বাইক-বাড়ী,
ও পথ-চলা পথিকের পক্ষে এক সত্ৰ হইতে অপর সত্ৰে
যাতায়াতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। পূৰ্বে কলিকাতাৰ হাজ্জা
পোনটুন ব্রীজ যে ব্যবস্থা ছিল—পুল খোলা থাকিলে মোটৰ-বোটে,
নৌকাৰ বা ষ্ট্ৰিমাৰে চড়িয়া পাৰ হওয়া—এখানে তেমনি মোটৰ-বোটে
পাৰাপাৰেৰ ব্যবস্থা আছে।

পোৰেস্তাৰ কাছে সাগৰেৰ মুখে প্ৰাচীন আমষ্টাডাম দুৰ্গ।

বন্দৰমুখী জাহাজকে এই দুৰ্গেৰ প্ৰস্তৰ-
পৰিখা হইতে সিগনাল নিৰ্দেশ কৰা হয়।

পুল-প্ৰকাৰেৰ পৰেই গবৰ্ণৰেৰ
বাসগৃহ। গৃহেৰ সমুখে বিস্তীৰ্ণ প্ৰাঙ্গণ।
প্ৰাঙ্গণেৰ চাৰি দিকে বহু সরকারী অফিস,
ডাকঘৰ এবং গিৰ্জা। গবৰ্ণৰেৰ বাস-গৃহেৰ
পাহাৰাদাৰী কৰে ডাচ প্ৰহৰীয়া। তাৰে
কাঁখে খোলা সন্ধীৰ, মাথায় খড়ৰ বটিকাৰ
টুপি।

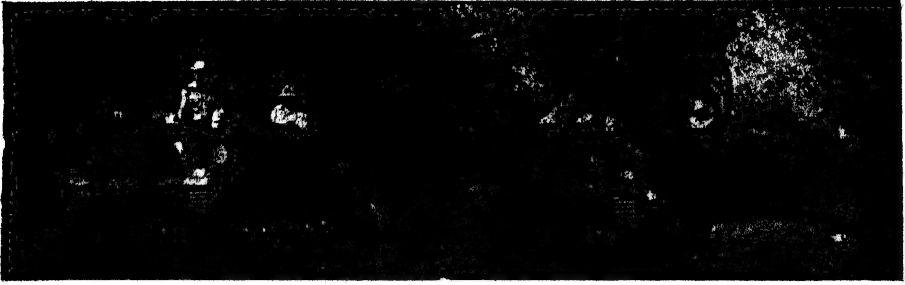
এখানকাৰ পুলিছ-প্ৰহৰীয়া শিৰ্ঠ
বন্দুক ৰাইফেল তুলিয়া পথে-ঘাটে পাহাৰা
দেয়। তাৰেৰ উৰ্দ্ধাৰ স্তম্ভ সৰু—মাথায়
টিনেৰ হাট। এখন মাৰ্কিন পুলিছও
পাহাৰাৰ কাজ কৰিতেছে। পথে জীপ

এবং লৱিৰ বিৰাট ভিড়। কুৰাকাও দ্বীপেৰ লোক-সংখ্যা প্ৰায়
৬৫০০০। ইহাৰ অৰ্দ্ধেক লোক উইলেমষ্টাডে বাস কৰে; বাকীৰ
মধ্যে অধিকাংশেৰ বাস এমাষ্টাডে—পেট্ৰোল-ভাণ্ডাৰেৰ কাছাকাছি।
এখানকাৰ অধিবাসীরা বৰ্ণসঙ্কৰ। প্ৰাচীন কালে কুৰাকাও ছিল দাস-
ভিগো—চাৰু-আবাসেৰ কাজ কৰিত নিগ্ৰোৰ দল।

এখানে একটি হিজ্ৰ-মহল্লা আছে। বহু ইহুদী আসিয়া আক্ৰবা-নীচ
বাঁথিয়া ছিল। আধুনিক ইহুদীরা তাৰেৰ বংশস্ৰুত।

এখানকাৰ বাজাৰ ইষ্ট-ইণ্ডিয়ানদেৰ হাতে। পেট্ৰোল-ব্যবসাৰেৰ
জন্ত নানা জাতি এখন এ দ্বীপে আসিয়া আত্মনা পাতিয়াছে।

জাৰ্মান-অভিনানেৰ পূৰ্বে আক্ৰবাৰ প্ৰায় ৪১টি বিজ্ঞ জাতিৰ



কুরাকাওয়ের পথে মার্কিণ কৌজ

নর-নারী বাস করিত। আরুবার জন-সংখ্যা কুরাকাওয়ের সংখ্যার আধেক।

এখানকার সরকারী ভাষা ডাচ। আদিম অধিবাসীর ভাষা পালিয়ামেটো অর্থাৎ স্প্যানিশ, পোর্টুগিজ এবং ডাচ ভাষার খিচুড়ী। এমন বিচিত্র মিশ্র ভাষা পৃথিবীর আর কোনো প্রদেশে নাই।

ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সব গৃহই রঙ-করা। সাদা রঙের বাড়ী এখানে আদৌ নাই। কোন ডাচ গবর্ণর না কি বাড়ীর সাদা রঙে যৌক্তাংশ বেশী বলিয়া সহিতে পারেন নাই, তাই ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে বাড়ীর সাদা রঙ ঢাকিয়া বস্ত্রান করিতে বাধ্য করেন। সে জন্ত সব বাড়ীর রঙ হয় নীল, নয় সবুজ, নয় হলুদ। গবর্ণরের গল্পটি সত্য কি মিথ্যা জানা যায় নাই, তবে সরকারী অফিসগুলিতেও সাদার ছোপ কোথাও নাই! সেগুলি নানা রঙে রঙান্ন রামধনুর মত দেখায়!

ব্র্যাক-আউটের জন্ত বাড়ী-ঘরের এই রঙে দারুণ সমস্তার সৃষ্টি হয়। এখানে দিন-আর-রাত্রির লৈখ্য সমান—দিন ছোট, রাত বড় কিম্বা দিন বড়, রাত ছোট—সে বালাই নাই, কিন্তু সন্ধ্যা হইবামাত্র মানুষ গিয়া বিছানায় চুকিবে, সে বড় কষ্টকর; অন্ধকার জেনাকির মত মিট-মিটে আলোকে মানুষ জীবনান্তিপাত করিতেছে।

করটি দীপেই মনসা-গাছের স্বগভীর জঙ্গল আছে। বাতাস বহিতেছে অবিরাম একঘেয়ে ভাবে উত্তর-পূর্বে। এই বাতাস ট্রেড-উইণ্ড নামে অভিহিত। প্রকৃতির গুপ্ত ভাব এ সব দীপে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই ট্রেড-উইণ্ড না থাকিলে কেহ বহুদূর ভাবে বাস করিতে পারিত না। পোইল পরিতৃষ্টির কারখানাগুলিতে আজ যে রাশি-রাশি কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইতেছে, এই অবিচ্ছিন্ন অবিরাম ট্রেড-উইণ্ডের (মহাশয়ী হাওয়ার) কল্যাণে সেখান নীচে নামিতে বা থিতাইতে পারে না, সে জন্ত আকাশ নির্মল থাকে, লোকের শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না।

এখানে জলের কষ্ট অত্যন্ত বেশী। বৃষ্টিপাত কদাচিৎ হয়। খুব বোঁ বৃষ্টি হইল তো বছরে তার পরিমাণ বড় জোর বিশ ইঞ্চি মাত্র। হ'বছ চার বছর হয়তো এক-বিন্দু বৃষ্টিও পড়িল না, এমন ঘটনা বিরল নয়—তবে ডাচ উইণ্ডমিল আছে; সেগুলির সাহায্যে কুপ হইতে, জা তুলিয়া সেই জল ক্ষেতে সোচন করা হয় এবং মানুষ সেই কুপের জল থাইয়া প্রাণধারণ করে। তাছাড়া এ সব দীপে এক-জাতের গা আছে, সে-গাছের ডাল-পালার জল-পরিতৃষ্টি-শক্তি অসাধারণ—সেই



পোনটুন ব্রিজ—ফোর্ট আমষ্টারডাম

ডাল-পালা দিয়া সমুদ্রের জল এবং অপরিষ্কার জল পরিশুদ্ধ ও লবণমুক্ত করিয়া পানের জন্ত ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ের কোলে বা ছায়ায় ছাড়া অস্ত্র-কোথাও গাছ-পালা জন্মায় না। ফুল-ফলের বাগান তৈরী করিয়া সে সব বাগানে জল দিবার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে এ সব দীপে ফুল বা ফল ফলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানে যে সব ফল-ফুল খাদ্যার্থে ব্যবহৃত হয়, সে সব চালান আসে ভেনেজিউলা হইতে। কুরাকাওয়ে কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। লেবুর খোলা কিন্তু সবুজ থাকে, হলুদ-বরণে পাকিয়া ওঠে না। সেই সবুজ খোলা শুকাইয়া তাহা দিয়া সুরাকে সুরভিত করা হয়। মদের ডাঁটি সব হলোগে; লেবুর শুক খোলা বস্তাবন্দী হইয়া হলোগে চালান যায় এবং আমষ্টারডাম ও হামবুর্গের ডাঁটিতে সে সব খোলা হইতে সুরভি নিষ্কাশিত করা হয়।

দ্বীপগুলির ভৌগোলিক অবস্থানে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে— উপসাগরের শাখা-প্রশাখা ভূভাগের মধ্যে এমন ভাবে প্রসারিত যে, গভীর অভ্যন্তর-ভাগেও বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এ দিক দিয়া কোটেগাট সব বিষয়ে অতুলনীয়; এবং বন্দর হিসাবে সর্বোত্তম। এ সব জায়গায় প্রবেশ সাগর-পথে। প্রবেশ-পথ সঙ্গীর্ণ, একটু পরেই কিন্তু দিগন্ত-প্রসারী জল-বিধার। এই কারণে এ বন্দরে একসঙ্গে বড় বড় বহু জাহাজের স্থান-সকলানে এতটুকু অগ্রবিধা ঘটে না।

কুরাকাওয়ে বারোটি পাহাড় আছে; সেগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পোষ্ট ক্রিষ্টিফেনবার্গ সব চেয়ে বড়—প্রায় ১২০০ ফুট উঁচু। অপর প্রান্তে অতি-উচ্চ পাহাড় টাফেল বার্জ বা টেবিল পাহাড়—ক্যালসিয়াম ফসফেটের স্তূপ। এ পাহাড়টি কারাকাশ ও ফুটক উপসাগরের বক্ষালীন হঠাৎ বিদ্যমান। পাহাড় কাটিয়া কুলি-



ফী-মনসার ঝোপের আড়ালে ফৌজের ছাউনি

মজুরের দল গাভী বোকাই করিয়া ক্যালসিয়াম-ফসফেট আনিতেছে সাগরের কূলে; সেখান হইতে জাহাজে করিয়া চালান যায়।

এখানে পেট্রোল-ভাণ্ডার খুলিবার পূর্বে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১০ জন লোক শুধু টুপি তৈয়ারী করিয়া দিন-গুজরান করিত। মারাকাইবো অঞ্চলে এক-জাতের তাল গাছ জন্মায় অজস্র-পরিমাণে—পামেটো। সেই পামেটোর পাতা কাটিয়া আনিয়া তাহা দিয়া ছাট তৈয়ারী হইত। এখন পেট্রোলের কারখানায় মজুরী মেলে অনেক বেশী, তাই টুপির বাজার পড়িয়া গিয়াছে।

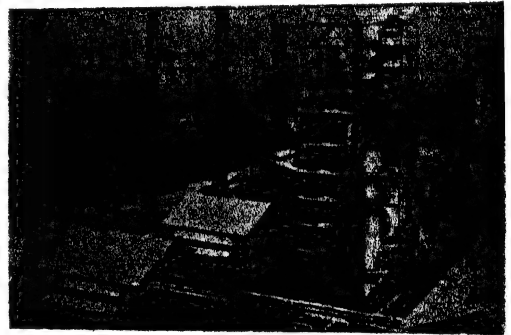
ডাচ-আমলের পূর্বে যখন এখানকার অধিবাসীদের নানা ভাবে ভুলাইয়া দাস-রূপে পণ্য-হিসাবে চালান দেওয়া হইত, তখন এখানে ইকু এবং তামাকের চাষ প্রচলিত ছিল; কিন্তু বৃষ্টির অভাবে এবং আরো নানা কারণে সে-চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিন এখানে পেট্রোলের সন্ধান মিলিয়াছে, সে দিন হইতে দৈন্য-বারিষ্ট্রের যেমন অবসান হইয়াছে, তেমনি নানা দেশ হইতে বহু লোক আসিয়া জন-সংখ্যাকেও বিপুল করিয়া তুলিয়াছে। পেট্রোলের কাজে কুলি-মজুর আসিয়াছে শ্রমিনাং এবং গ্রেটে ইণ্ডিজ হইতে।

এখানকার করটি দ্বীপ -বাসলে কিন্তু কাঁটা-মনসার আড়।

এত জাতের কাঁটা-মনসার দেখা মিলে যে, শুধু এই কাঁটা-মনসা তহাফুলনেই এখানে বহু জ্ঞানী-গুণীরা আনাগোনা আছে উইলেমটাডে যে মার্কিন ভাইস-কনশল আছেন, কাঁটা-মনসায় তাঁ-এত বেশী অহুবাগ যে, নিজের বাড়ীর বাগানে তিনি ৬৩ জাতের কাঁটা-মনসা লাগাইয়া সমস্তে তাদের লালন করিতেছেন।

গাখা এখানে প্রধান বাহন। গাখা এবং ছাগল এত যে, পথে ঘাটে বেওয়াবিশ গাখা-ছাগল ঘুরিয়া বেড়ায় এবং হার খুলী ঘুরিয়া পুথিতে বা পণ্য-হিসাবে বেচিয়া ছ'পয়সা উপাঞ্জন করিতে পারে সম্প্রতি মার্কিন সেনারা প্রমোদ-বিচরণের উদ্দেশ্যে গাখার পিঠে চড়িয়া বেড়ায়। কাঁটা-মনসার জঙ্গলে অসংখ্য মার্কিন ছাউনি পড়িয়াছে; সে-সব ছাউনিতে মার্কিন ফৌজের বাস। কাঁটা-মনসার ঝোপের আড়ালে ছাউনিগুলি নিরাপদ। ছাউনি ঢাকিবার জন্ত নকল আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয় নাই।

এখানকার ডাচ এবং মার্কিন নৌ-বাহিনী সম্মিলিত ইউনাইটেড



পেট্রোল-রিফাইনারী—কুরাকাও

ষ্টেটস নেভির অধীন। হল্যান্ডের পতন হইলে সমস্ত ডাচ সলাগরী জাহাজ এই সব দ্বীপে আসিয়া জমিয়াছে; ডাচ বিমান-বিভাগের প্রধান অফিসও কুরাকাওয়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আকুবা হইতে কুরাকাও, বোনায়ার এবং মারাক দ্বীপ পর্যন্ত ৭৫ মাইল পথে বিমান-পোতের পাড়ি চলিয়াছে অবিরাম। এ-সব জায়গা হইতে বিমান-পোতে সামরিক ও বেসামরিক যাত্রী দল নিত্য জ্যামেকার যাত্রায়ত করিতেছে।

কুরাকাওয়ের খ্রিস্ট মাইল পূর্বে বোনায়ার। সপ্তাহে কুরাকাও হইতে দু'দিন এখানে বিমান-মেল-যোগে ডাক যাত্রায়ত করে। বোনায়ারে পেলিকান পাখীর বাস। এখানে লোক-সংখ্যা ৫০০০ মাত্র। তাহাদের জীবন-ব্যাপনের প্রণালী খুবই সাদাসিধা। এখানে পেট্রোলের ভাণ্ডার নাই—তাই ঘাঁটি পাহারারও প্রয়োজন নাই। বোনায়ারে বহু জাখানকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের পাহারাদারীর জন্ত এক দল সশস্ত্র ফৌজ আছে। এখানকার অধিবাসীরা সমুদ্র হইতে লবণ সংগ্রহ করে; সেই লবণ চালান দেয়। ক'জাতের গাছ গাছড়া এখানে পাওয়া যায়; সে সব গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। সে সব গাছ-গাছড়া সংগ্রহ এবং চালান দেওয়া—এ-কাজেও অর্থ উপাঞ্জন মন্দ হয় না।

বোনায়ারের প্রধান সহর ক্রালেশডাইক্—ছোট গ্রাম। এই গ্রামে ছোট লাটের আশ্রয়।

আরুবা—আয়তনে ৬১ বর্গ-মাইল মাত্র। এখানে পেট্রলের জালার আছে। এখানকার লাগো অয়েল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি এবং ষ্টার্ভার্ড অয়েল কোম্পানির জাহাজ ও কারখানা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরুবায়ে এখন প্রায় ২৫০০ আমেরিকানের বাস। প্রধান সহর ওরানজেন্ডাড। এখন সামরিক ঘাঁটি, ট্যাক ও আর্ম'ড কারে বোঝাই।

এ সব দ্বীপে ডিভি-ডিভি নামে এক জাতের গাছ আছে—একঘেয়ে



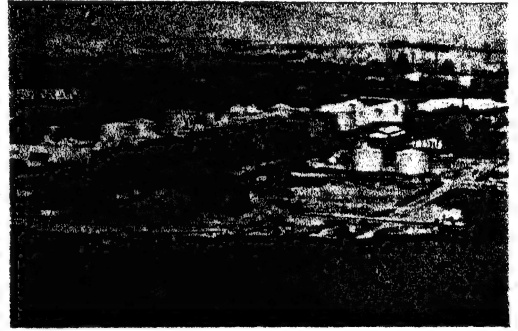
ফোট আমঠার্ডামে ডাচ নৌ-বাহিনী

ট্রেড-উইণ্ডের জন্ত সেগুলির ডালপালা এক বিচিত্র রূপে বাড়িয়া ওঠে। দেখিলে মনে হয়—গাছ যেন বাতাসে আঁচল মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ গাছের এক-রকম গুঁটি হয়। সেই গুঁটি ট্যানিংয়ের কাজে লাগে বলিয়া জাহাজ-বোঝাই হইয়া চালান যায়।

আরুবায়ে আরো এক জাতের গাছ জন্মায়, সে গাছের পাতার নির্ভ্যাস বিরেকক হিসাবে চমৎকার। আগাছার মত এ গাছ অজস্র পরিমাণে জন্মায়। এ গাছের পাতা কাটিয়া লোকে সেই পাতার নির্ভ্যাস সংগ্রহ করে; সংগ্রহ করিয়া ছাল দেয়; ছাল দিবার পর যে জমাট কাই তৈয়ারী হয়, সেই কাই চালান দেয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বিরেকক হিসাবে এ কাই সমাদরে গ্রহণ করেন।

শতাব্দিক কংসর পূর্বে আরুবায়ে স্বর্ণের সন্ধান মিলিয়াছিল। শুধু জলে নয়; পাহাড়ের গায়ে, পাথরের বৃকেও স্বর্ণরেণু মিলিয়াছিল, সে জন্ত নানা স্বর্ণ-স্বামী কোম্পানি বহু বার এখানে কাঁদ ঘাড়ে করিয়া আসিয়া আশ্রয় পাতিয়াছিল; তবে দু'-শ বছর পরে সকলেই আশ্রয় তুলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। কারিবারানের বৃকে যে কয়টি দ্বীপ পাশাপাশি অবস্থিত, সেগুলির মধ্যে চাষ-আবাদের যোগ্য উর্বর ভূমি আছে শুধু এই আরুবায়ে। এখানকার অধিবাসীরা প্রাচীন আরাকুয়াক বংশসম্বৃত। ইহাদের গায়ের বর্ণ বাদামী, মুখ-চোখ নিগ্রো ছাঁদের।

এই সব নগণ্য দ্বীপের পরিচয় জগৎ-সভায় সকলের অজ্ঞাত ছিল—আজ যুদ্ধের দৌলতে এই সব নগণ্য দ্বীপ গণ্যমাত্র ও পাণ্ডিত্য হইয়াছে।



সার-সার পেট্রোল-ট্যাক—কুরাকাও বিমানঘাট

পানামা-কেনাল হইতে এ দ্বীপগুলি মাত্র ৭০০ মাইল দূরে। কুরাকাও এবং আরুবা যে যথাসময়ে সচেতন হইয়া আত্মরক্ষায় উত্তত হইয়াছিল, তার ফলে জাহাজের প্রতাপ অনেকখানি খর্ব হইয়াছে, মিত্রপক্ষও পেট্রোল প্রভৃতির জোগান অব্যাহত রাখিয়া নিজদের দুর্ব্বল করিতে পারিয়াছে। এ জন্ত আরুবা এবং কুরাকাও এ যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

“হুইট মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা; আর এক, হিন্দুধর্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা যোরতর অনিষ্টকর বনে করি।”—বঙ্কিমচন্দ্র

উলুন্দীতে বোঁ-ভাতের নিমন্ত্রণ। মাখন গাঙ্গুলি হাইবেন না। মেয়ের বোঁ-ভাতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়ার রীতি এ বংশে নাই। সুশীল গিয়া ঘরিল পরেশ মামাকে; বলিল,—নেহাং আমরা বত ছেলে-ছোকরার দল যাবে, ভাতে আপনাদের গাঙ্গুলি-বংশের মান থাকবে কেন মামা? আপনাদের যাওয়া চাই-ই! পরেশ বাবুর গৃহে যজ্ঞ আসন্ন...যদি গোলযোগ বাধায়! তাই তিনি সুশীলের কথায় 'না' বলিতে পারিলেন না।।...

গ্রামের ক'জন মাতব্বরকেও পাওয়া গেল। বড়-মামুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ-বাওয়ার গৌরব! তাহাতে মান বাড়ি! শিবকৃষ্ণও সাজিয়া গুজিয়া তৈয়ারী হইল...কেশক-ঠাকুরও। এক...অর্থাৎ দলটি বেশ পুরু হইয়া উঠিল।

সেখানে আড়ম্বরের অন্ত নাই। নদীর ঘাট হইতে বাধা বেশ-নাইয়ের ব্যবস্থা। ঘাট হইতে বাড়ী নেহাং কাছে নয়—মোড়ে-মোড়ে নহবংখানা...বাত্ত-সমারোহ...কুটুবিদের লইয়া যাইবার জন্ত গাড়ী-পালকি...

দেখিয়া ঢালশার দল বলিল—হ্যাঁ, ঘটা জানে বটে!

বাড়ী লোকারণ্য। শুধু উলুন্দীর নয়, পাশাপাশি পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক একেবারে ঝাঁটিয়া জড়ি। হইয়াছে। সামিয়ানা-ঢাকা বিরাট প্রাসঙ্গে বাই-নাচের আসর। কলিকাতা হইতে আসিয়াছে আখতার জন্। তার খ্যাতি এখন দিল্লী-বোম্বাইকেও না কি টেকা দিয়াছে। সে আসরে জাঁকাইয়া বসিয়াছেন মোটা তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া বিরাটেশ্বর। সুশীলকে দেখিয়া বিস্ময়ভরিত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাকে টানিয়া তিনি পাশে বসাইলেন।

আখতার'জানের নাচ বেশ জমিয়াছে। তবু যে জন্ত আসা...ভোজন—সেই ডাকটির জন্ত রবাহুতের দল অধীর!

বিরাটেশ্বর বলিলেন,—বানরামি আর কাকে বলে! ছেলের বিয়ে দিচ্ছ, দাও...তা বলে'এ বকম রাজস্বয় যন্ত্রের কি দরকার বলতে পারো, বাপু?

হাসিয়া সুশীল বলিল—বড়মামুষ বলে নাম-ডাক আছে, কাজেই।

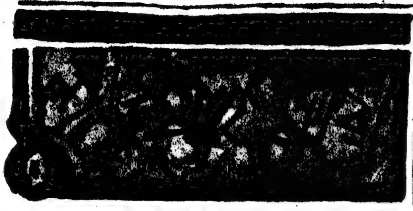
বিরাটেশ্বর বলিলেন—এমনি করে গোটা তিন-চার ছেলের বিয়ে দিতে হলে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বও বিকিয়ে যায়, এ তো কুজালাপি ক্ষুদ্র দেবশ মুণ্ডো!

সুশীল বলিল—আপনি বুঝিয়ে বললেন না কেন?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—বলেছি বৈ কি। তা আমার কথা কি গ্রাহ্য করে? আমরা বলে গুঠান, বলে ব্রাহ্ম। বলে, তোমার ছেলেমেয়ে নেই; ছেলেমেয়ের বিয়ে তুমি দেবে না। টাকা তুমি খরচ করতে জানো শুধু নাচনাউলি আর মনের পিছনে। আমি এর কি জবাব দি, বলা তো?

সুশীল কোনো উত্তর না দিয়া সন্কোচকে চাহিয়া রহিল বিরাটেশ্বরের পানে।

বিরাটেশ্বর বলিলেন—আমি জবাব দি...মানে, আমার হলো আত্মার তৃপ্তি। একা মামুষ...কার জন্ত টাকা-কড়ি রেখে যাবে? বলে, ছেলে



(উপজ্ঞাস)

শ্রীশৌরীজমোহন মুখোপাধ্যায়

নেই, পুষ্টিপুস্তর নাও! আমি বলি...বটে! অর্থাৎ কার ঘর থেকে কে এসে আমার সব লুট্টিরে দেবে! ও-সবে আমি নেই। বলে, বংশ-রক্ষা! শুনে আমি হাসি। বংশ কি শুধু ছেলে হলেই রক্ষা পায়? ছেলে যদি ছেলের মতো হয়, তবেই...না হলে বা দেখছি, বড় বড় ঘরগুলো চুরমার হয়ে যাচ্ছে ছেলের হাতে। বংশ-রক্ষা করবে, তার মতো ছেলে তৈরী করছো কৈ?...আমার কি মত জানো

বাবা? মামুষ যে হয়, বংশ যে রক্ষা করে, সে নিজের মন আর শিক্ষা দিয়েই তা করে। তোয়াজ করে ছেলের জন্ত বিবস্ত্র-সম্পত্তি রেখে গেলেই হয় না।...তা সেদিকে কারো নজর নেই!

কথা শুনিয়া সুশীল চমৎকৃত হইল। বুঝিল, কথাগুলো সহজ মস্তিষ্কে উৎসারিত নয়। কথার পিছনে তরল সুরার রঙীন প্রেরণা আছে। তবু তার মোহে বিহ্বল হইয়া গহিত পাঁচটা কথা না বলিয়া যিনি এমন কথা বলেন...বিরাটেশ্বরকে সুশীলের প্রথম দিন হইতে ভালো লাগিয়াছিল...আজ এ কথা শুনিয়া তাঁর উপর ঋণিকতা শ্রদ্ধা হইল।

বিরাটেশ্বর বলিতে লাগিলেন—এ-চাল না বদলালে সব যাবে। টাকা খরচ করতে চাও ছেলের বিয়ে...দীর্ঘি বোঁভো, ইচ্ছল তৈরী করো, ডাক্তারখানা খোলো, জঙ্গল কেটে বাস্তা বানাও, রেহতদের খাজনা মাপ করো...তা নয়...হুঁ:।

সুশীল বলিল—কিন্তু এতেও বহু লোক প্রতিপালন হচ্ছে তো! এই যে সব বাজনদার, বাজিওয়াল, ঘরামি-মিস্ত্রী, ময়রা-মুদি...এদের চলা চাই তো। আপনাদের এত পয়সা...এ-সব ব্যাপারে ওরা যদি কিছু না পায়, ওদের দশা কি হবে, বলুন?

বিরাটেশ্বর বলিলেন—ও একটা দিক আছে, আমি মানি। কিন্তু সব-কিছুর সীমা থাকা দরকার। পড়োনি সেই গল্প...খ্যাত ছাতি ফুলোতে গিয়ে কেটে মরেছিল? আমার কথা, ঘটা করো, বেশ, কিন্তু ঘটা করতে গিয়ে ধার নিয়ে পুঁজি জড়ো করো না বাবা নাশ বাজিয়ে বাহাদুরী কেনবার লোভে! আজ ধারা ভজ দেখে বাহবা দিচ্ছে, দু'দিন বাদে ও-ভড়ডে যদি সব ভেঙ্গে চুর করে পথে ঝাঁড়াও, তখন ঐ ওরাই জেনো সবার আগে হেসে টিটকিরি দেবে।...আমার সব সয়...শুধু বোকা বলে কেউ টিটকিরি দেবে, এইটুকু সঙ্গ করতে পারি না বাবা!

সুশীল বলিল—তা যদি বললেন, তাহলে অল্পমতি পেলে আমি একটা কথা বলি...

—বলো, বলো...নিশ্চয় বলবে, বাবা। তোমরা একালের ছেলে...লেখা-পড়া শিখেছো...বদস হয়েছ, জ্ঞান হয়েছ।...তোমাদের কথা বলবার অধিকার আছে...নিশ্চয়!

বিনম্র কণ্ঠে সুশীল বলিল—আপনি যে এই নেশায় এক আরো পাঁচ বকমে টাকা নষ্ট করছেন, এ নিয়ে যদি কেউ...

সুশীলের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বিরাটেশ্বর বলিলেন—যদি কেউ বলে, বিরাটেশ্বরটা বিরাট বোকা, এই তো? তার জবাব তো বলেছি বাবা, আত্মার তৃপ্তি! নাচে-গানে আমার সখ আছে। আর তুমি বা বলেছো...মানে, বাগান-বাড়ী? তুমি ভাগ্য হয়েছে।

বাবা...প্রাপ্ত তু ঘোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্রের মতো, ...বলি তাহলে, স্ত্রী ছিলেন নেহাৎ মাটার পুতুল...কথা করে আরাম পাইনি কোনো দিন। তিনি জানতেন শুধু শাড়ী আর গহনার দাম। মাছবের দাম বোঝবার মতো শিক্ষা তিনি পাননি তাঁর বাপের কাছে। আমার বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন সাহেব-মাষ্টার রেখে। বাবার সাথ ছিল, ঠংরিজি বিজ্ঞা শিখে সাহেবী চালে সাহেবদের তুষ্ট করে আমি রাজা-মহারাজা টাইটল নিয়ে বংশের মান-মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবো! কিন্তু ওসিকে আমার চোখ খুললো না—আমার চোখ খুলে গেল ঘর-সংসার সমাজকে সন্মর দেখার ইচ্ছায়। বাবা ভুল করলেন বিয়ে দেবার সময় মন্ত বোনদী ঘর থেকে একটা মুখ্য বৌ নিয়ে এসে আমার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে। জমিদারীর মধ্যে মুখ গুঁজে আমি থাকতে পারলুম না। পৃথিবীটাকে আমি ভালো করে দেখতে চাইলুম। পৃথিবী কাকে বলে, স্ত্রী তা জানেন না। আমার সঙ্গে তিনি চলতে পারলেন না। কাজেই আমি...

এই পর্যন্ত বলিয়া বিরাটের চূপ করিলেন...চাহিলেন আখতার জানের পানে, কহিলেন,—বা: বা:। কেয়াবাং! আচ্ছা, ঐ যে আখতার নাচছে...আসরে এত লোক হাঁ করে তাকিয়ে যেমন ওর নাচ দেখছে, আমিও তেমনই দেখছি। কিছু মনে করো না বাবা, বলেছি তো, ঘোড়শ বর্ষে পুত্র তুমি আমার মিত্রবৎ...তাই বলতে লজ্জা হচ্ছে না। আমি বলছি, আখতার দেখতে খাশা...ওর ঐ অঙ্গভঙ্গি খাশা...আমি তা দেখছি না। আমি দেখছি, ওর ঐ অঙ্গভঙ্গিতে সাতটা স্তর আর তালগুলোকে কি আশ্চর্য লীলায় ফুটিয়ে তুলছে!...এ হলো মন্ত আট। ক'জন আট বুকে এনাচের তারিক করে, বলে তো? তারা দেখে খাশা দেখতে ঐ স্ত্রীলোকের অঙ্গভঙ্গি!...তোমাদের হয়তো ভালো লাগছে না। সে জন্ত দোষ দিই না। নাচ দেখা গুণী লোকের কাজ। সকলে নাচ বোঝে না! নাচ কিয়া ভালো ছবি—কি সকলে বোঝে? নাচে কি আনন্দ, নাচকে যে না ঠাণ্ডি করেছে, সে তা বুঝবে না।

সুশীল কোনো জবাব দিল না...চূপ করিয়া চাহিয়া রহিল বিরাটের পানে। তার মনে হইতেছিল যে-লোকটিকে শুধু ইয়ার বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাঁর মধ্যে এত সামগ্রী আছে...আশ্চর্য!

বিরাটের বলিলেন—কথাটা যখন তুললে, তখন বলি...স্ত্রী ছিলেন...বড় ঘরে যেমন আসবাব-পত্তর থাকে, তেমনি। বোনদী ঘরের মেয়ে—হীরে-জহরতে গা মোড়া...পাঁচ জনের কাছে পরিচয় দিতে বেশ। কিন্তু সব আসবাব কি কাজে লাগে? তবু যেমন ঘরে থাকে, তেমনি আর কি! আমার মধ্যে মন বলে বস্তু আছে...সেই মনের সঙ্গে তিনি মন মেলাতে পারেননি...মেলাবার চেষ্টাও কখনো করেননি। অনেক স্ত্রী আছেন, ধারা স্বামীর মনের সন্ধান রাখেন না...তা না রাখলেও স্বামীর জন্ত খাবার-দাবার তৈরী করেন, স্বামীর সেবা করেন। আমাদের বড়মায়েদের বাড়ী...দাস রানী প্রভৃৎ...আমার তোমার-তেল থেকে পরমা-কড়ি-ঘড়ি পর্যন্ত গুছিয়ে দেওয়া—সব কাজ চলে চাকর-বাকরের মারফৎ। সুখ-দুঃখের কথাতো ও চাকর-বাকর। এর মধ্যে স্বামীর প্রয়োজন থাকে না...হাজেই নিঃসঙ্গ মন নিয়ে...বুঝলে দ্বারা, বাগান-বাড়ীর আসল স্বর্ষ। ঐ যে তুমি বিবাহ করোনি এখনো...সেদিন সেবু বলছিল, গাঙ্গুলি মশাইয়ের ভাগনেটির বয়স হয়েছে, এখনো বিবাহ হয়নি।

ওরা আশ্চর্য হন...আমি হই না, তার কারণ, আমি বৃষ্টি। তে মধ্যে মন আছে, সজীব মন। স্ত্রী মানে শুধু শাড়ী আর গহনা নয় একটি জীবন্ত মন। তোমার মনের সঙ্গে তারে-তারে মিলে বাবে, মন! তেমন মন পাওনি নিশ্চয়, কাজেই বিবাহ করোনি। এ এই নয় কি, এ্যা?

সুশীল জবাব দিল না। একথার কি জবাব দিবে? বিরাট তার চেয়ে বয়সে বড়।...বুঝিল নেশার ঝোঁকে মনের কপাট ভ করিয়াই মুক্ত করিয়াছেন। কথা কহিয়াই বিরাটের তৃপ্তি পা জবাবের এতটুকু তোয়াক্কা না রাখিয়া দিল খোলশা কা বকিয়া যাইতেছেন...খা মনে আসিতেছে, তার কোথাও রাখা নাই!...

কথাগুলো সুশীল মন দিয়া শুনিতেছিল। নেশাখোরের ক মত উড়াইয়া দিবার মতো কথা নয়! এ সব কথায় চিন্তা করি অনেক জিনিষ আছে!

সে-রাত্রে কাহারো ফেরা হইল না। অতিথিদের রাত্রিবা জন্ত ব্যবস্থা ছিল এমন যে কাহারো অশ্রদ্ধা ঘটিবার কথা ন সে-কালের বনিয়াদী ঘরে বাহবা পাইবার আকাজ্ঞা য থাকুক, আদর-আপায়নে প্রাণের সংবোধ-স্থাপনে তিলমাত্র কুপণ ছিল না!

২৮

ফিরিয়া আসিবার পরের দিন সুশীলকে পাইয়া মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন,—তোমার সঙ্গে বৈধিক কথা আছে সুশীল। তোম বাবার কাছ থেকে বহু কাল আগে বিগ হাজার টাকা ধা নিয়েছিলুম, সে-দেনা আজ পর্যন্ত মাথায় চাপানো রয়েছে! এখ দেনার ভার নামিয়ে আমি মাথা হাল্কা করতে চাই।

সুশীল চাহিল মামাবাবুর পানে...হৃৎচোখের দৃষ্টিতে কোঁতুল মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—মানখানি পরগণার দাম হবে ঐ ত্রিশ হাজার টাকা...ঐ পরগণা বন্ধক দিয়েই টাকা নিয়েছিলুম ও পরগণাখানি তোমার নামে কোবালা লিখে দেবো। তোমাকে তার জন্ত কিছু দিতে হবে না।

সুশীল কহিল—কিছু মামাবাবু...

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—না বাবা, আমি তোমার কথা সুনবে না। তুমি যা বলবে, তা আমি বৃষ্টি। সরো আমাকে এক দি বসেছিল। বসেছিল, তুমি না কি ওটার রিজ-নামা লিখে দেবে তুমি দিলেও আমি তা নেবো কেন? তোমাকে আমার দেবার কথা...আমি মামা। তুমি দেবে আর আমি হাত পেতে তোমার কাছ থেকে নেবো...এ সম্পর্ক তোমায়-আমায় নয়, সুশীল।

সুশীল বলিল—কিন্তু আপনার অনেক কর্তব্য আছে মামাবাবু। আপনার ছেলেরা...তাছাড়া বিজ্ঞানার ঐ বাচ্ছা...

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—দেনা শোধ করা সবচেয়ে বড় কর্তব্য। তাছাড়া বয়সের তেজে এক দিন যে সব কথা মনে জাগেনি, এখন বয়স গেছে বলে সেই সব কথা বেশী করে মনে জাগছে!...সকলকে মানতে গিয়ে আমি যা ত্যাগ করেছিলুম, এখন বসে বসে সেই সব কথা ভাবি, সুশীল। এত করে জ্ঞাত বাচিয়ে

আমি কি পেয়েছি? সকলকে ত্যাগ করে। যন যে পাথর হয়ে গেল। নেহায়া জিনিবগুলো কি এতই হেলা-ফেলার?

মাখন গাঙ্গুলি নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর বলিলেন—কথায় কথায় রাজা রামচন্দ্রের নাম করি। সীতাকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন...করে কি লাভ হয়েছিল তাঁর? বা তাঁর অযোধ্যাপুরীর? সীতা গেলেন পাভালে...তার পর রামায়ণও গেল ফুরিয়ে। কাল রাত্রে সরোর সঙ্গে বসে কথা হচ্ছিল। সরো বললে, সীতাকে বনে পাঠাবার পর অযোধ্যায় সুখ ছিল কতখানি, রামায়ণে সে কথা তো পাই না দাদা! বললে, পাই না তার কারণ রামচন্দ্রই শুধু সুখে জ্বাজ্বলি দেননি...সারা অযোধ্যা থেকেও ঐ সঙ্গে সুখের ছায়া মিলিয়ে গিয়েছিল। বললে, রাজার সুখের জন্ত সীতাদেবীকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন...ত্যাগের পর রাজ্যে যদি তেমন সুখ থাকতো, নিশ্চয় বাধ্যকি মুনি তাহলে সে সুখের কথা লিখতেন। তা যখন লেপেননি...

বলিতে বলিতে কঠ গাঢ় আত্ম হইয়া আসিল। মাখন গাঙ্গুলি গাঢ় স্বরে বলিতে লাগিলেন—সুখ যে অযোধ্যায় ছিল না, আমি তা বুঝি, স্ত্রীল। আমিও সুখের জন্ত ত্যাগ করেছি...ছেলে...স্ত্রী! ত্যাগ করবার পর থেকে সুখ কাকে বলে, ভুলে গেছি। কর্তব্য করে যাচ্ছি। যাকে বলে, শুদ্ধ কর্তব্য! এককর্তব্য করার সঙ্গে প্রাণের যোগ কোথায়? এই যে মেনির বিয়ে দিলুম...খরচ-পত্র করলুম। কিন্তু শুধুই খরচ!...ছেলে-মেয়ের বিয়ের মাহুয যে আনন্দ পায়, সে-আনন্দ পেয়েছি কি? কজাদার ঘৃণা, এইটুকুই সান্তনা!...

মাখন গাঙ্গুলি চুপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—তোমার কাছে এ কথা না বলে থাকতে পারলুম না! বললুম এই জন্ত...কাজ চুকলে চলে যাবে...বদি আর দেখা না হয়...পাছে ভাবো, মামাবাবু মাহুয ছিল না! সেই জন্তই তোমাকে আজ একথা বললুম।

স্ত্রীল বুকিল। বোঝে, বিজয়কে ত্যাগ করিয়া, মামীমাকে নিক্সাসনে পাঠাইয়া মামাবাবু কি-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। নিজের মাকে দেখিয়া মাকে জানিয়া মামাবাবুর মনের পরিচয় বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে, মামাবাবু মাহুয...নিজের সুখ-দুঃখের উপর অপরের সুখ-দুঃখকে মানিয়া আসিয়াছেন চিরকাল। জানে, এমন ধাঁদের মন, ভীবনে তাঁরা কতবেশী দুঃখ ভোগ করেন। নিজের ধারা উঁচু করিয়া ধরেন না, দুঃখ-ভোগ ছাড়া তাঁদের উপায়ও নাই!

বলিল,—বিরাট বাবু বললেন, তিনি এক দিন আসবেন...শীগগির। কুটুম্বিতা করতে নয়, মামাবাবু। তিনি আসবেন, মামীমাকে প্রশ্রয় দিতে।

অবিচল নেত্রে মাখন গাঙ্গুলি চাহিয়া রহিলেন স্ত্রীলের পানে... স্ত্রীল বলিল—আর আসবেন মামীমাকে এ-বাড়ীতে এনে আপনাকে জ্ঞাতে তুলতে।

বিরাটের আসিলেন। কজা-জামাতা জোড়ে আসিল, তাদের সঙ্গে। সেদিন শ্রাবণের ২৩ তারিখ।

ওদিকে পরেশ গাঙ্গুলির বাড়ীর সমরে নব্বৎ বসিয়াছে। বাজনা শুনিয়া বিরাটের বলিলেন—তবু ভালো। ওনবৎ এ-বাড়ীতে বাজছে না! আমি ভেবেছিলাম...

মুহু হাসিয়া স্ত্রীল বলিল—কি ভেবেছিলেন?

—ভেবেছিলাম, বিয়ের সে-খটোর জের এখনো চলেছে!

মাখন গাঙ্গুলি চাহিলেন বিরাটের পানে। চেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি!

বিরাটের বলিলেন—কতগুলি খশলো, বেয়াই মশাই? আমি

কুটুম-মাহুয বলে এ-প্রশ্নে হয়তো বিরক্ত হবেন। হয়তো ভাববেন, আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু কুটুম্বিতা চাড়া আতো যে বড় জিনিষ আছে, মাহুযে-মাহুযে সম্পর্ক...তার উপর বোনেদি ঘর...জমিদারী ভোগ করার নিগ্রহ...ইচ্ছা বা সামর্থ্য না থাকলেও বহু ক্ষেত্রে বহু অপব্যয় করতে হয়...এই যে এক সূত্রে গাঁথা...যাকে বলে, মেদ্বাস অঙ্ক, দি সেম গাঙ্গ...সেই সম্পর্ক ধরে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করছি, যা খশলো, তাতে কত দিকে কত বড় বড় কাজ করা যেতো, ভেবে দেখেছেন? প্রজাবর্গের স্থায়ী মঙ্গল? স্ত্রীল বাবাজীর কাছে শুনিছিলুম, গ্রামে ভালো ইষ্টুলের অভাব...সে-অভাব পূরণ করলো খুঠান পাঙ্গরী সাহেবরা এসে!...আমরা বসে বসে জমিদারী করছি আর তলে তলে হাত থেকে সব বেরিয়ে যাচ্ছে! আমার ওখানে হঠাৎ এক দিন হাটে গিয়ে দেখি, ভূমিমালা কিনে নিয়ে যাচ্ছে মাডোয়ারের বীরের দল। তাদের নিয়ে আমরা নাটক লিখে রাজপুত-মহিমা কীর্তন করছি, আর সেই রাজপুতের বংশধররা এসে আমাদের ক্ষেত, আমাদের ফসল মাটার দরে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে আমার নেশা কেটে গেল! হিন্দু-মুসলমান চাষীদের ডেকে মানা করে দিলুম, ওদের মাল দিস্ নে...ওরা যে দাম দেয়, সে-দামের উপর শতকরা বিশ টাকা করে বেশী দাম আমি দেবো। ওই সব চাল-ডাল আমার গুদামে জড়ো করছি। সখ বা নেশা করি, অস্বীকার করবো না। কিন্তু গ্রামে একটা ইষ্টুল খুঁলেছি...লেখাপড়া শিখে সকলে বুঝি পাকাক্!

মাখন গাঙ্গুলির হুই চক্ষু বিক্ষারিত হইল। তিনি বলিলেন,—ঠিক কথা! কিন্তু রায় মশাই, আমার সে-ছাতি ভেঙ্গে গেছে!...ছাতির জোর ছিল...যখন, এ-সব কথা তখন মাথায় ঝাঙতো না; আচার-বিচার নিয়ে তারি মধ্যে ডুব ছিলুম!

বিরাটের বলিলেন—শাস্ত্র-পুরাণ পড়িনি বেয়াই মশাই...তবে হিন্দুর ঘরে জন্ম, দেখে-শুনে মোটামুটি বুঝেছি যে সত্য যুগে যা চলতো, ত্রেতাযুগ তার বহৎ অদল-বদল হয়ে ছিল, ত্রেতার সঙ্গে ছাপরের মিল ছিল না। এ হলো আমাদের কলিযুগ। এ যুগে ছাপরকে মেনে নরাণাঃ সহস্রবর্ষপরিমিতঃ পরমায়ুঃ—আর কলিতে সেই পরমায়ু হয়েছোঃ বিংশত্যধিকশতবর্ষঃ!...কলিতে স্ত্রীরা হয়েছেন অতি-দুর্দান্তা কর্কাঃ কলহে রতাঃ! ত্রেতাযুগে লক্ষণ গিয়েছিলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে...বড় ভাইয়ের সেবা করবেন বলে...সুখভোগ আরাম ছেড়ে, নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে! আর এই কলিযুগে স্ত্রীকে খুশী করতে লক্ষণ-ভাইয়েরা রামচন্দ্রের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা করতে কোমর বাঁধে। সে সব দিকে কি করছেন বুঝিয়ে দিন তো আমায়! জমন ভাইকে সমাজে শাসিত করা চুলায় যাক, কে বিলেত গেছে, কে হাড়ি-ডোমদের মন বুঝে তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করছে, সে তাদের ঘাড় ধরে বার করে। কি লজিক, আপনি বলুন...

মাখন গাঙ্গুলি কোন জবাব দিলেন না। বুঝিলেন, বিরাটের

...সুশীল বা বলিয়াছিল...মাছের মতো মাছ, সত্যিই! এমন সব কথা কেহ বলে না তো!

সুশীল বলিল—আসলে সুশীল কি হয়েছে জানেন, রায় মহাশয়? পড়াশুনা, চিন্তা এসব আমরা ছেঁটে দিয়েছি, টোলগুলো উঠিয়ে দিয়েছি, হুজাদের দিয়েছি বিদায়। মানে, পড়াশুনা করতে সে কালে আরবী-ফার্সী শিখতে হতো! না হলে দরবারে আসন মিলবে না! দলিল-নস্টাবেজের কাজ জানা চাই! এখন ইংরেজী শিখতে হবে। না হলে কেউ পুঁছবে না। কোনো মতে ইংরেজী গ্রামারখানা রপ্ত করে' ইডিয়ম শিখে নিয়ে সাহেবদের কাছে যান রাখতে পারবে কিসে, এই চিন্তা! ওদিকে অদল-বদল করছি স্বার্থের খাতিরে...সাহেব যদি শেক-হাও করে, তাতে জাত যাবার ভয় থাকে না...আর বিজয়দার বেলায়...মানে, কি রাখা দরকার, কতখানি রাখা আর কতখানি ছাটা দরকার বাঁচার জন্ত, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই ভাবি না!...

বিরোটেশ্বর বলিলেন,—এত কথাই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, এই যে অজ্ঞান আপনি করেছেন নিজের উপর স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে...তার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার!...আপনার জনকে যে ত্যাগ করবেন, তাদের অপরাধ কি, ডেবে দেখবেন না? আমার প্রার্থনা বোয়াই মহাশয়, মেয়ে-জামাই এসেছে...তাদের খাতিরে কাল হাম-গুদ সকলকে করুন নিমন্ত্রণ। সকলে এলে তাঁদের সামনে জোব-গলায় বসুন, বেয়ান-ঠাকুরের উপর যে মহাপাতক করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন...সসমানে। কে বীকা কথা কয়, দেখি...তাঁকে আমি ছেপে ধরবো। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিল কাকে ক্ষি-জ্ঞে সমায়ে শিরোমণি করে রাখবো, আর কি দোষ হলেই বা কাকে আমরা বঞ্জন করবো!...আমার ছেলে-মেয়ে নেই। এ-সব চিন্তা করতে হয় না...মাঝে মাঝে একলা বসে এই সব কথা ভাবি। জেবে যেন দিশাহারা...মনে হয়, আমি তো একটা বখা মাভাল...হামতোপাখার...আমার কথাই কি বা দাম? কে বা শুনবে?

সুশীল বলিল—আপনি যা বললেন, তাই হোক। কাল এখানে নিমন্ত্রণ-সভা ডাকুন। আপনি আছেন...আপনার পিছনে বলেন যদি, আমিও থাকবো। তার পর...

হাসিয়া বিরোটেশ্বর বলিলেন—নিশ্চয় থাকবে, বাবা। তোমরা না থাকলে চলবে কেন? আমাদের তো পালা শেষ হয়ে এসে...তোমরা করবে পালা শুরু। সে-পালা যাতে সতেজ হয়, তার ব্যবস্থা তোমাদেরই করা দরকার!...

নিমন্ত্রণের আসর তেমন জমিল না। তার কারণ, এখানে এই ব্যবস্থা করিয়া মাখন গাঙ্গুলিকে লইয়া বিরোটেশ্বর চলিলেন বিদ্যুমতীর কাছে।

বিদ্যুমতী স্নহ হইয়াছেন। সরস্বতী ছিল বিদ্যুমতীর কাছে।

বিদ্যুমতীকে প্রশ্ন জানাইয়া বিরোটেশ্বর বলিলেন—মেয়ে-জামাই বাড়ীতে,—আর আপনি এখানে থাকবেন, এ কি ভালো দেখার? বোয়াই-মহাশয় মন্ত অপরাধ করেছেন...সে জন্ত তিনি যে দুঃখ ভোগ করছেন, জানি। আজ আমরা দু'জনে সে অপরাধের জন্ত ক্ষমা

প্রার্থনা করে আপনাকে মাখায় করে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি আপনাদের ঘরে আপনি ফিরে চলুন...ঘর আশান হয়ে আছে।

বিদ্যুমতীর মনে কোভ, অভিমান, দুঃখ মিলিয়া বিপর্যয় ঘটাই তুলিল। মনে পড়িল বিজয়ের সেই মুখ—বিদায়-কালে বোম সেই ছল-ছল স্নান দু'টি চোখ। কি দুঃখই না তারা সহিয়া গিয়াছে তাদের তিনি বেগু-হে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন না! সে-গৃহে তিনি আজ ফিরিবেন কোন মুখ লইয়া! আজ নতুন ন-সে-গৃহ আশান হইয়া আছে সেদিন হইতে, যেদিন বিজয় ওগু ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল...সে-আশানে তাঁর আর ফিরিবার সাধ নাই!

দু'চোখে অশ্রু-ধারা 'মোছিল। বিদ্যুমতী বলিলেন—আমাকে মাগ করুন, আমি এখানে ভালোই আছি। এই ঘর থেকেই তার জন্মের মতো চলে গেছে। শত দুঃখে এই ঘরে তারা শান্তি-স্থ গড়ে তুলেছিল! এ-ঘরের ইট-কঠিগুলো তাদের চিহ্ন রয়েছে আমাকে এখান থেকে আপনারা যেতে বলবেন না...এ-ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। এ-ঘর আমার স্বর্গের বাড়ী। বিরোটেশ্বর অনেক মিনতি করিলেন...সুশীল অনেক বুঝাইল বলিল—বাঁধা চলে গেছেন মামীমা...ইন্দের জন্ত দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু যারা আছে, তারা না দুঃখ পান, দেখবেন না আপনি! আঁচলে চোখের জল মুছিয়া বাপুজি কণ্ঠে বিদ্যুমতী বলিলেন,—থেকে যখন কারো দুঃখ ঘূরতে পারিনি বাবা, ফিরেই বা কার দুঃখ ঘূটাবো, বোলা?

মাখন গাঙ্গুলি কোনো কথা বলিলেন না...জিহ্বাক ঝাঁড়াইয়া রহিলেন...যেন পাথরের পুতুল!

বহু মিনতির পর বিদ্যুমতী শেষে বলিলেন—বেশ, আপনারা বজছেন, আপনাদের অসম্মান করবো না...বাঁধাতে যাবো...গিয়ে মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করে' চলে আসবো...আশীর্বাদ সব সময়েই করছি। তবু আপনারা যখন বলছেন, বাড়ী গিয়ে আশীর্বাদ...বেশ, তাই হবে!...

এ কথাটা কোন ঘরভেঁরা বিভীষণের মুখে-মুখে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অনেকে ভাবিল, কি জানি, মাখন গাঙ্গুলি হয়তো এক চাল চালিয়াছেন...নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া শেষে গৃহিণীর হাত দিয়া অন্ন পরিবেষণ! দোষ তাহাতে আছে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু ভয়! কি জানি, কেবে কোন স্ত্রীর ভবিষ্যতে এই ব্যাপার লইয়া ছেলেমেয়ের বিবাহে যদি বিভ্রাট বাধিয়া যায়!...

পরে গাঙ্গুলি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিল—বৌঠাকরুণ বাড়ী আসবেন, তাতে আমার নালিশের কি-বা আছে। তবে বিলাসপুরের ওরা যদি এর অল্প রকম মানে বুঝে গোলমাল করে? কাজ কি আমার ও-ক্যাশাদে!...

এ-সম্বন্ধে তার প্রধান মন্ত্রী শিবকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণ বলিল,—জয়রাম মুখ্যের ভরানক নিষ্ঠা...আমাকে বাহ-বাহ জিজ্ঞেস করছিলেন, মেয়ের বিয়েতে মাখন গাঙ্গুলির পরিবার বাড়ী আসেননি তো? আমি বলেছি, রামচন্দ্র! উনি জমিদার আছেন এ জমিদারই...তা বলে এ-সবের ওঁর কথা লোকে শুনে কেন? (ক্রমশঃ)

শক্তি ও সৌন্দর্য

বিনি সৌন্দর্য চান, শরীর-গঠনের দিকে তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রমণীকে আমাদের প্রাচীন কবির গুণ রূপময়ী বলিয়া বর্ণনা করেন নাই,—শক্তিময়ীও বলিয়াছেন। এবং সেই জন্তই অতি-বড় দানব—সেবতারা সেবসৈন্য লইয়া যে-দানবদের নিপাত করিতে পারেন নাই, তাদের নিপাত সাধন করিয়াছিলেন শক্তিময়ী দেবী! আমাদের পরম উপাস্তা, আমাদের সকল আদর্শের ললামভূতা দেবী দুর্গা শুভ

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য

সেবী দুর্গা শুভ
রূপোচ্ছল নন;
তিনি শক্তিময়ী,
দশ ভুজে দশপ্রহ-
রণ-ধারিণী। দেব-



১। কোমর হইতে মাথা পিছন দিকে

তার কল্পনায় রূপের সঙ্গে একতথ্যনি শক্তির সমাবেশ আমাদের দেশের শাস্ত্রে-পুরাণেই দেখিতে পাই। শক্তি-সাধনা প্রাচীন ভারতে ছিল শ্রেষ্ঠ সাধনা।

এই সব দিক দিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখিব, যেখানে

শক্তি, সেইখানেই সৌন্দর্য—এ কথা এদেশের প্রাচীন কবির কবিতা-ছিলেন। এদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিব, যত দিন নর-নারী শক্তির সাধনা করিয়াছিলেন, ততদিন দেশে ছিল সৌন্দর্য্য। তার পর শক্তি-সাধনা ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নর-নারী সৌন্দর্য্য হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

দুর্ভল সেই ব্যাধির নাটশালা। ব্যাধি সৌন্দর্যের ঘর। সৌন্দর্য্যই দুর্ভল দেখকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। যে-দেহে শক্তি-সামর্থ্য, সেই দেহেই শুধু সৌন্দর্য্যের বিকাশ।

আজ যে কয়টি ব্যায়াম-প্রণালীর কথা বলিতেছি, সে কয়টির সাধনায় দেহে সৌন্দর্য্য ও শক্তি বিকশিত হইবে; এবং নিত্য-নিয়মিত এ ব্যায়াম-সাধনে দেহের সৌন্দর্য্য ও শক্তি

কোনো দিন অস্বাস্থ্য বা আহত হইবে না।

প্রথম বিধি—সিঁথি খাড়া পাঁড়ান। তার পর দুই পা অটল স্তম্ভ রাখিয়া কোমরের কাছ হইতে উঠ-সেহ

পিছন দিকে নোয়াইয়া দুই হাত সামনের দিকে ১নং ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিন—মাথা থাকিবে ছবির মত। এমনি ভাবে থাকিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ পর্যন্ত গণিবেন। তার পর বীয়ে বীয়ে মাথা তুলিয়া আবার সিঁথি খাড়া হইয়া পাঁড়াইবেন। এ ব্যায়াম পর্যায়ক্রমে দশ বার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়—সিঁথি খাড়া পাঁড়ান। তার পর বাঁ পা স্তম্ভ রাখিয়া ডান পা ডান দিকে ২নং ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিন, সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত মাথার পিছনে আনিয়া মুঠি বন্ধ করা এবং মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত ডান দিকে হেলাইয়া ২নং ছবির মত পাঁড়ান।

পাঁড়াইয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণিবেন; পূবার পর ডান পা স্তম্ভ অটল রাখিয়া বাঁ পা বাঁ দিকে প্রসারিত করিয়া ঐ ভাবে আবার বাঁ দিকে হেলাইয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণা। এ-ব্যায়ামও পর্যায়ক্রমে দশ বার করা চাই।

তৃতীয়—দুই পা সংলগ্ন করিয়া সিঁথি খাড়া পাঁড়ান। তার পর দুই পা স্তম্ভ অটল রাখিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত ডান দিকে হেলাইয়া দুই হাত ঠিক ঐ ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিবেন। ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণিবেন। তার পর বীয়ে বীয়ে বাঁ দিকে এমনি ভাবে তুলিয়া দুই হাত বাঁ দিকে প্রসারিত করিয়া ৪নং ছবির মত পাঁড়ান। এ-ব্যায়ামও পর্যায়ক্রমে দশ বার করা চাই।

চতুর্থ—এবার দুই পা জুড়ি করিয়া পাঁড়ান। তার পর কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত ৪নং ছবির ভঙ্গীতে নোয়াইয়া ডান হাত দিয়া ভূমি স্পর্শ এবং বাঁ হাত ঐ ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিবেন। ১, ২, ৩, ৪, ৫ গণিবেন। গম্ভীর পর এই রীতিতেই বাঁ হাত দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া ডান হাত ঠিক প্রসারিত করিবেন। এ-ব্যায়ামও পর্যায়ক্রমে দশ বার করিবেন।

এ কয়টি ব্যায়ামে শিঠির মাজা বেশ শক্ত-সমর্থ হইবে এবং দেহের কোথাও মেদ জমিবে না; মেদ জমিয়া থাকিলে তাহার বিলোপ ঘটিবে।

বস্তু ও কল্পা

কথাটা অদ্ভুত হলেও অস্বীকার করা চলে না যদি বলি, ছেলের ক্রিয়-স্বাধার পর বী এলে বৌকে ছেলের মায়ের মতো শতকরা দশ জন মাত্র মা ঠিক পেটের ছেলে-মেয়েদের মত গ্রহণ করতে পারেন; বাকী নব্বই জন বৌয়ের ছল-ছুতো ধরে নিজেরা নানা অশান্তি ভোগ করেন, ছেলে-বোয়ের মনেও সে অশান্তির কাঁটা বেশ ভালো করেই বিধত থাকেন। বৌয়ের সবচেয়ে মায়ের মনে আতঙ্ক—ছেলে আমাদের পর হয়ে গেল। রসরসক অন্তঃকাল এর চমকিত হবি একে পেছন তার "প্রাণ বিদ্যাট" নাহক অপর্যব্রহ্মন।

অনেকে বলবেন, এর জন্ত দোষ ছ'পক্ষই আছে। শান্তিভী যেমন বোনের উপর অপ্রসন্ন হন, তেমন শান্তিভীকে স্নানজলের চেয়ে নারী।

একথা মনে নিলেও আমরা বলবো, মা-বাপ ছেড়ে বৌ আসে নতুন সংসারে। সকলেই কিছু রিষের বিধে মন ভরে আসে না। নতুন সংসারে এসে সে যদি গোড়া থেকেই ভালোবাসা পায়, দোষ-জটিল হলে স্নেহের শানন পায়, স্নেহ বা বাঁকা শাসনের সঙ্গে তার পরিচয় না হয়—তাহলে বৌয়ের পক্ষে হঠাৎ বৈকে বসবার কারণ থাকতে পারে না। বাকি কি না তা বলে? বাকি। যাদের মনের গড়ন বাঁকা, বাপের বাড়ীতেও তারা বিয়ের আগে মনের এ-বাঁকা ভাব ঢেকে রাখতে পারে না। ছোটখাট স্বার্থ নিয়ে ভাই-বোনদের করে হিংসা, মা-বাপকে পদে পদে অমান্য করে, আলায়। ও-সব মেয়ের কথা হলো আলাদা। সাধারণ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস, উপরওয়ালাদের দিক থেকে যদি সত্যকার স্নেহ পায়, তাহলে তাদের সত্য কি, শান্তিভীর উপর বিরূপ হবে!

এবার শান্তিভীদের কথা বলি।

ছেলের উপর মায়ের অতি-স্নেহ থেকেই এ বিবের সৃষ্টি! বিয়ে হলে ছেলেমেয়ের মনে বেশ ঝানিকটা ওলট-পালট ঘটে। এ শুধু কাব্য বা রোমান্স নয়! মাতৃবির তরুণ মনে আবেগের বশেই তা ঘটে। ছ'টি তরুণ মন পরস্পরকে পেয়ে মুগ্ধ বিবশ হবে, তাতে বৈচিত্র্য নেই। তবে এ বিবশতার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, বিশ্ব-পৃথিবী কারো বা চোখের সামনে থেকে মুছে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ-সব ছেলের আবেগ খুবই জল্প। এদের আবেগকে লক্ষ্য করেই প্রাচীন কবি বলে গিয়েছেন—‘ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ!’ এরা যেমন নতুন বৌ পেয়ে মাকে আজ তুচ্ছ করছে, তেমনি বৌ পুরোনো হয়ে গেলে তাম-পাশা নেশার নতুন মোহে আচ্ছন্ন হবে—বৌয়ের ভাগ্যে তখন অনাদর হেনস্থা!

শান্তিভী-বৌয়ে যদি মনের মিল না হয়, তাহলে সংসার অরণ্য হয়ে ওঠে। কাজেই আমরা বৌমাকে বলি,—তোমার মাকে যদি তোমার স্বামী অগ্রাহ্য করে, তাহলে সে-অগ্রাহ্যি! যেমন তোমার মনে বাজে, স্বামীর মাকে তুমি অগ্রাহ্য করলে স্বামীর মনেও তেমনি

বাজবে—এ কথাটুকু মনে করে স্বস্তির-শান্তিভীকে মানতে শেখো। আর শান্তিভীকে বলি,—নিজের প্রথম বয়সের কথা ভুলে যান কেন? ছেলের বিয়ে দেছেন, মন খুলে ওদের একটু নিজস্বের মত করে বাঁচতে দিন! ঝানিকটা স্বাধীনতা দিন। আপনার ক্ষমি মেয়ে থাকে, আর সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে থাকেন, তা হলে সেই মেয়ের কথা



৪। বাঁ হাত উঠে, ডান হাত মেয়ে

৩। ডান দিকে হেলাইয়া

পাঁচ জনের বৌ-বিকে যদি স্নেহে আপন করে নিতে আপনার না বাধে, নিজের বৌকে আপন করে বুকে টেনে নিতেই বা কেন বাধবে? ছেলেকে যদি সত্যি সত্যি নিজের প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন, তাহলে যে-বৌ নিয়ে ছেলে তার জীবন সুর করছে, সেই বৌকে কেন ছেলের সঙ্গে এক করে মিলিয়ে নিয়ে ভালোবাসবেন না,—বলুন তো?

নৃতনের নতুন বলিয়াই একটা আদর আছে। পুত্রাতন পরীক্ষিত, নতন অপরীক্ষিত—যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অসীমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নৃতনের গুণ অনেক সময় অসীম বলিয়া বোধ হয়।—বঙ্কিমচন্দ্র

সুখ-সাহাব্যার্থ ক্রিকেট- প্রদর্শনী

বিগত ১৬ই ইংরেজী ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ইডেন উডানে সৈকতের তহ-বিলের সাহাব্যকল্পে এক বিশেষ ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়। বাড়লা গভর্নর দলের বিরুদ্ধে মিলিত সৈকত-দলের এই খেলায় গভর্নরের দল এক ইনিংসের খেলায় পরাজিত হয়। বিজয়ী পক্ষে হার্ডটাক, কম্পটন, সিম্পসন প্রভৃতি খ্যাতনামা বিলাতী খেলো-য়াড় দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। কম্পটন ও হার্ডটাকের শতাধিক রাণ করার মধ্যে মারের বিভিন্ন কায়দা ও কৌশল দেখা যায়। কি ভাবে আউট হইবার সুযোগ না দিয়াও বোলারকে ব্যর্থ করিতে হয়, এই খেলায় তাঁহাদের মিলিত ও এককালীন অববোধ-প্রণালী এবং আশ্চর্য্যক প্রয়াসে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এই ছুটার স্ট্রাণ নেওয়ার কৌশল প্রত্যেক ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের অমুল্যবর্ণ করা উচিত।

ভাল ব্যাটসম্যান হইতে হইলে অল্প দূরের মধ্যে 'ফুট ওয়ার্ক' যে প্রধান তাহা তাহাদের খেলা হইতে প্রতীয়মান হয়। সিম্পসনের খেলা প্রত্যেক প্রথম ছুটার খেলোয়াড়ের আদর্শস্থানীয়। গভর্নর পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে এন, চাটাজী, পি, সেন, এন, সেন, এম, মিত্র, পি, বি, দত্ত, ল্যাংফোর্ড ও ডি, জে, রীমার। নিজে ১১৫ রাণ করিয়া ও আগ্রাণ চেষ্টার ফলেও নিজ দলকে তিনি ইনিংস পরাজয়ের দ্বারি হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন নাই।

গভর্নর একাদশ—টি, সি, ল্যাংফোর্ড (অধিনায়ক), কুচবিহারের মহারাজা, এন, চাটাজী, এ, চাটাজী, পি সেন, এন, চৌধুরী, এম, সেন, এম, মিত্র, পি, বি, দত্ত, ল্যাংফোর্ড ও ডি, জে, রীমার।

মিলিত সৈকত একাদশ—হার্ডটাক (অধিনায়ক), কম্পটন, সিম্পসন, হচকিন, গ্রে, ক্রানমার, জাজ, ডোত্রীকারী, মেজর কেটল, ইংগ্রাম জন্সন ও প্রেস্কট।

গভর্নর একাদশ :—১ম ইনিংস—১৪৩ রাণ (এন, চাটাজী ৩৬, এ, চাটাজী ৩৬, ক্রানমার ৫২ রাণে ৭টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৩২৭ রাণ (এন, চাটাজী ১১৫, জাজ ১০ রাণে ৪টি, ডোত্রীকারী ৪৮ রাণে ২টি ও কম্পটন ৬৩ রাণে ২টি উইকেট)

মিলিত সৈকত একাদশ :—১ম ইনিংস—৪৭১ রাণ (হচকিন ৬৮, সিম্পসন ৭৪, হার্ডটাক ১৫৩, কম্পটন ১০১, এন, চৌধুরী ১০৩ রাণে ৫টি উইকেট)

গভর্নর দল এক ইনিংসে পরাজিত হয়।

ল্যাংগডেন স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস

বাড়লা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এ বৎসর কয়টি আকর্ষণীয় খেলার বন্দোবস্ত করিয়া ক্রীড়াঙ্গণে জনসাধারণের দৃষ্টিবাসের পাত্র হইয়াছেন। বাড়লা খেলোয়াড়গণও অমূল্যলব্ধের অপূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। বাড়লায় ক্রীড়া-জগতে যুগপৎ খেলোয়াড় ও কর্মী হিসাবে সুপরিস্ফুট পরলোকগত মি: আর, বি, ল্যাংগডেনের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞি খ্যাতনামা খেলোয়াড়, অধুনা ভারতবর্ষে অবস্থানকারী কয়েক জন নামজাদা বিলাতী খেলোয়াড় ও সিংহলী প্রেস্ট খেলোয়াড়গণের সহযোগিতায় ইডেন



এম, ডি, ডি

উডানে এক বিশেষ প্রদর্শনী-খেলার বন্দোবস্ত হয়। প্রাকৃতিক দৃষ্ট্যাপ বশত: খেলাটি ৩ই জানুয়ারী বধাসময়ে আরম্ভ না হইয়া ৭ই জানুয়ারী বেলা ২টায় শুরু হয়।

রঞ্জী প্রতিযোগিতা

রঞ্জী প্রতিযোগিতার পূর্বাঙ্কনের সেমিফাইনালে বাড়লা কোনক্রমে মাত্র ৭৫ রাণে যুক্তপ্রদেশকে হারাইয়া

দিয়াছে। ইডেন উডানে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাড়লা—কুচবিহারের মহারাজ (অধিনায়ক), কে, ভট্টাচার্য, এন, চাটাজী, এ, চাটাজী, পি, সেন, এম, সেন, পি, বি, দত্ত, এক হাকীম, পার্শ্বসারথি, এন, চৌধুরী ও ডোত্রীকারী।

যুক্তপ্রদেশ—বালেন্দ্রস (অধিনায়ক), রাজেন্দ্রনাথ, এস, গান্ধী, খাজা, ফাফালকার, তেলাং, রামচন্দ্র, জালালুদ্দিন, মজিদ, সৈয়দুল্লা ও জে, মেহরা।

বাড়লা দলের খেলোয়াড়গণের পরিচয় নিম্নরূপে। যুক্তপ্রদেশ পক্ষে একমাত্র রাজা ও ফাফালকারের ব্যাটসম্যান খ্যাতি ছিল। অপেক্ষাকৃত হীনবীৰ্য্য যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধেও বাড়লা মোটেই আশা-হীনপা খেলিতে পারে নাই। তবে কথায় আছে, 'যোগ্য যোগ্য'। হয়ত উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আমাদের খেলোয়াড়েরা বধ্যবধ ও স্মৃতিচ পরিচয় দিবেন।

রঞ্জী প্রতিযোগিতার আলোচ্য খেলায় বাড়লায় ব্যাটসম্যানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আর বোলিং ঠিক মত পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বশতঃ, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ব্যাটসম্যানের পক্ষে বিপর্য্যে পর্যবসিত হয়।

বাড়লা—১ম ইনিংস—২৪৮ রাণ (পি, বি, দত্ত ৫৩, পি, সেন ৬৩, গান্ধী ১৭ রাণে ৫টি ও মজিদ ২৫ রাণে ৪টি উইকেট)

২য় ইনিংস—১৫৭ রাণ (পার্স্বসারথি ৩০)

যুক্তপ্রদেশ :—১ ইনিংস—১৭৬ রাণ (ডোত্রীকারী ৪৮ রাণে ৩টি, এন, চৌধুরী ৪০ রাণে ৩টি, কে, ভট্টাচার্য ২৫ রাণে ২টি উইকেট)

২য় ইনিংস—১৫৪ রাণ, (ফাফালকার ৪০ নট আউট; এন, চৌধুরী ৪১ রাণে ৫টি, এম, সেন ২৮ রাণে ৩টি ও কে, ভট্টাচার্য ৩৪ রাণে ২টি উইকেট)

বাড়লা—৭৫ রাণে জয়লাভ করে।

বাড়লায় গভর্নর-দামশের সহিত মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্টের দামশের এই খেলায় তাঁহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শেখোক্ত দল ৭ উইকেটে পরাজিত হয়।

গভর্নর-দামশ : লে: ক: সি, কে, নাইডু (অধিনায়ক), অমরনাথ, মুস্তাক আলী, সি, এস, নাইডু, নিম্বলকার, মানিক, শতাব্দী, এম, সেন, ডোরাইস্বামী, কে, ভট্টাচার্য, আদোয়ার হোসেন ও ভায়া।

মে: জেনারেল ষ্টুয়ার্ট-দামশ : কুচবিহারের মহারাজ (অধিনায়ক), হার্ডটাক, কম্পটন, সর্বাভে, গিরিধারী, এন, চৌধুরী, জয়বিক্রম, এন, চাটাজী, এ, চাটাজী, পি, সেন, হিন্দেলকার, ডোত্রীকারী।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ষ্টুয়ার্ট-দল মাত্র ১৩৬ রাণ করে। দ্বিতীয় অবস্থা বোলারগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়। এই দিন

এস, নাইডুর বোলিং-চ্যুত্ব্য সুপরিচ্ছট হয়। তাঁহার বলে একমাত্র হার্ডষ্টাক ব্যতীত কেহই নির্ভয়ে খেলিতে পারেন নাই। কিন্তু হুঠোগ্য বশতঃ হার্ডষ্টাকও রাণ আউট হওয়ায় এত অল্প রাণে তাঁহাদের প্রথম দফার খেলা শেষ হয়।

প্রত্যুত্তরে বিজয়ী গভর্ণর-দলও ২২৮ রাণ করে। এই রাণ-সংখ্যায় মধ্যে নিম্নলিখকারের ১২ রাণ ও শতশিবিরের ৫৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। অধুনা বাড়লার অষ্টম খ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পর পর বলে মানকড়, মুস্তাক আলী ও অমরনাথের দ্বারা বিখ্যাত ব্যাটসম্যানত্রয়কে আউট করিয়া হ্যাট্রিক সম্পাদন করেন ও ভারতীয় ক্রিকেটে এক রেকর্ড স্থাপন করেন। প্রাক্তন সিন্ধুপ্রদেশের ও বর্তমানে ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া ট্রস্ট অসোসিয়েশনের অঙ্গগত ঢোলপুরের গিরিধারীর কুতিত্বপূর্ণ বোলিং-এর বিরুদ্ধে গভর্ণরপক্ষের শেষ খেলোয়াড়গণ কেহই ঝাঁড়াইতে পারেন নাই।

ষ্টয়ার্ট দল দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ৩১৫ রাণ করে। হার্ডষ্টাক ৭৩ রাণ করিয়া আউট হইলেও তাঁহার খেলায় প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পক্ষে শিক্ষণীয় অনেক মারের কৌশল দেখা যায়। কম্পটন খুব ভাল খেলিয়া ১২৩ রাণ করেন।

শেষ দিনের খেলা খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হয়। উভয় দলই রাণ তোলার ব্যাপারে বহুপরিকর। কিন্তু গভর্ণর-দল মাত্র ৪ জন আউট হইয়া প্রয়োজনীয় রাণ-সংখ্যা অর্জন করায় সাত উইকেটে পরাজিত করে। আউট না হইয়া ৮৬ রাণের মধ্যে মুস্তাক আলী তাঁহার খেলার বৈশিষ্ট্য দেখান। অমরনাথ খুব বেশী রাণ না করিলেও তাঁহার খেলা অপূর্ব উদ্ভাসনার সঞ্চার করে। এরূপ উদ্ভাসনাপূর্ণ ক্রীড়াচ্যুত্ব্য একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সম্ভব। ৪ জন আউট হইয়া ২২৬ রাণ করিলে এই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মে: জেনারেল ষ্টয়ার্ট দ্বাদশ : ১ম ইনিংস—১০৬ রাণ (অমরনাথ ৩০ রাণে ৪টি ও সি, এস, নাইডু ৭৭ রাণে ৬টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৩১৫ রাণ (কম্পটন ১২৩, হার্ডষ্টাক ৭৩, জয়বিক্রম ৪১, অমরনাথ ২৫ রাণে ৩টি, মানকড় ৮৮ রাণে ৫টি, সি, এস, নাইডু ৫৫ রাণে ২টি উইকেট)

গভর্ণর-দ্বাদশ : ১ম ইনিংস—২২৮ রাণ (শতশিবির ৫৬, নিম্নলিখকার ১২, সি, কে, নাইডু ৪০, গিরিধারী ৬০ রাণে ৮টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৪ জন আউট হইয়া ২২৬ রাণ (মুস্তাক আলী আউট না হইয়া ৮৬)

গভর্ণর-দল ৭ উইকেটে বিজয়ী হয়।

নাইডু সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব

বাড়লার অগ্রণী দলের সেরা মোহনবাগান ক্লাব সম্প্রতি ভারতের খ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় লে: কর্ণেল সি, কে, নাইডুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছে। বীরপূজা এক প্রাচীন রীতি। সি, কে,র দ্বারা জনস্বাস্থ্যধারণ ক্রিকেট-প্রতিভার সম্মাননা করিয়া মোহনবাগান নিজেদেরও সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উজ্জম ও প্রয়াস প্রশংসনীয়।

ক্রিকেট খেলার বাড়লা অধুনা পঞ্চাশপদ হইলেও বাড়লার ক্রিকেট-স্বাস্থ্য-সম্পন্ন খেলোয়াড়ের অভাব নাই, নাইডুর এই সর্ধ্বনা

তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। নাইডু যে কেবল নিজেই কুতী খেলোয়াড় তাহাই নহে, বস্ত্তঃ, তিনি স্বয়ং একটি ক্রিকেট-প্রতিষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার হাতে-গড়া ও উদাহরণ অনুপ্রাণিত বহু খেলোয়াড় আজ ভারতীয় ক্রিকেট-গগনের উজ্জ্বল তারকা। তাঁহার ক্রিকেট-প্রতিভার এই সমাদর সুসঙ্গত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা না বলিয়া পারা যায় না। আজ বাড়লা ক্রিকেট-কেন্দ্রের সর্ধ্বনা করে, মোহনবাগান নাইডুকে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু মোহনবাগানের নিজস্ব বিখ্যাত বাঙালী কুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠী পালকে বা অল্প কাহাকেও তাঁহার নিজের ক্লাব অনুরূপ সমাদর করিলে কি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইত! কথায় বলে, 'গৈয়ো যোগী ভিখ পায়ে না।'

যাক, মোটের উপর নাইডুর অভিনন্দন-উৎসব মনোজ্ঞ হইয়াছে। মোহনবাগান ক্লাব তাহাকে রৌপ্যাধার উপহার দিয়াছেন, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে আপ্যায়িত করিয়াছেন। লে: ক: নাইডু তাঁহাদের আতিথেয়তার যোগ্য ও সমুচিত উত্তর দিয়াছেন।

মোহনবাগান ক্লাব এই উপলক্ষে এক বিশেষ প্রদর্শনী খেলার বন্দোবস্ত করেন। সিংহলী খেলোয়াড়দ্বয় শতশিবির ও জয়বিক্রম ব্যতীত নাইডুর হোলকার দলের কয়েক জন খ্যাতনামা সচর এই খেলায় যোগদান করেন। মোহনবাগানের সভাপতি মি: জে, এন, বহুর দ্বাদশ সি, কে, নাইডুর দলের নিকট ১০ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করে।

বোম্বাই পেটাস্কুলার খেলায় অবশিষ্ট দলের পক্ষে শতশিবির এই বৎসর মুসলিম দলের বিরুদ্ধে শতাধিক রাণ করেন। উভয় ইনিংসে তাঁহার সাবলীল ক্রীড়াভঙ্গী সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। প্রবীণ সিংহলী খেলোয়াড় জয়বিক্রম বিলাতী কায়দায় খেলেন। প্রত্যেক বল নিরীক্ষণ করিয়া স্বৈর্য ও বৈধ্য সহকারে খেলিয়া তিনি ১ম ইনিংসে ১২৩ রাণ করিতে সমর্থ হন। 'রক্ষণ' ও আক্রমণের কৌশলে অপূর্ব সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্বক খেলিয়া তিনি ক্রীড়ামুগ্ধদের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সর্বোত্তম যুগপৎ ব্যাটিং ও বোলিং-এ কুতিত্ব দেখান। প্রথম ইনিংসে পতনের মুখে দূরত্ব-পূর্ণ ব্যাটিং করিয়া মাত্র দুই রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় দফার খেলায় তিনি ১৩৩ রাণ করিয়া এই গৌরব অর্জন করেন। নিম্নলিখকারের ধীর ও সংযত খেলা লক্ষ্য করার বস্তু। প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁহার খেলা সমদ্রোণযোগী হয়। পার্শ্ব খেলোয়াড় জে, এন, ভায়াব অনবদ্য ফিল্ডিং যে কোন ক্রিকেটদলের পক্ষে মহামূল্য অবদান। সি, এস, নাইডু এই খেলায় মাত্র ১১৪ রাণে ১৫টি উইকেট দখল করেন। এই খেলায় বাঙালী খেলোয়াড়গণের দুর্বলতার বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়। সি, এস, নাইডু বা সর্কাতের বলে প্রথম দফার খেলায় কিছুটা খেলিলেও শেষ বার তাহার নৈরাশ্যের পরিচয় দেয়। বস্ত্তঃ, হোলকারের বিরুদ্ধে খেলিতে বাড়লাকে আরও কত সংযমের ও বুদ্ধিমত্তার সহিত খেলিতে হইবে, তাহার আশঙ্কা পাওয়া যায়। এই খেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য—শেষ দিন বহু-দলে এ, দেব, মহারাজা ও এস, ব্যানার্জীকে পর পর উইকেট রক্ষা করিতে দেখা যায়।

জে, এন, বহু দ্বাদশ : কুচবিহারের মহারাজা (অধিনায়ক), এন, চাটার্জী, এম, সেন, শতশিবির, জয়বিক্রম, এস, ব্যানার্জী, এস, দত্ত, এ, দেব, এস, দেব, এন, জোধুরী, কে, ভট্টাচার্য্য, ও বলটু মিত্র।

সি, কে, নাইডু দ্বাদশ : লে: ক: সি, কে, নাইডু, (অধিনায়ক) সি, এস, নাইডু, মুস্তাক আলী, ভায়া, সর্কাতে, নিম্বলকার, গাইকোয়াড, এ, মুখার্জী, ডি, দে, এ, হাজরা, এস, রায় জৌধরী ও ভাণ্ডারকর।

জে, এন, বসু দ্বাদশ :—১ম ইনিংস—৪৩৭ রান (এম, সেন ৫৪, শতশিবম্ ৮০, জয়বিক্রম ১২০, কে, ভট্টাচার্য ৪০, সি, এস, নাইডু ১৩৫ রানে ৮টি উইকেট)

২য় ইনিংস—১৬৮ রান (শতশিবম্ ৪২, এম, সেন ৩০, সর্কাতে ও সি, এস, নাইডু যথাক্রমে ৫১ রান দিয়া ৪টি ও ৭টি উইকেট)

লে: ক: সি, কে, নাইডু দ্বাদশ :—১ম ইনিংস—৩২১ রান (সর্কাতে ১৮, ভায়া ৮৪, এস, ব্যানার্জী ২৩ রানে ৩টি, এম, সেন ৪৪ রানে ৩টি ও জয়বিক্রম ৩৩ রানে ৩টি উইকেট)

২য় ইনিংস—৫ জন আউট হইয়া ৫২৫ রান (নিম্বলকার ১৮৬, সর্কাতে ১৩৩ ও মুস্তাক আলী আউট না হইয়া ১০১)।

সি, কে, নাইডুর দল ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া লন্টেনিস্ চ্যাম্পিয়ানসিপ

সাঁউথ ক্লাবের প্রবর্তনায় অসামান্য বৎসরের ছায় এ বৎসর উডবার্শ পার্কে উক্ত প্রতিযোগিতা অসংগঠিত হইয়া গিয়াছে। বহু বিশ্বয়কর ও অভাবনীয় পরিণতির ফলে শেষ পর্যন্ত প্রবীণ খেলোয়াড় জিমি মেটা উদীয়মান তরুণ স্তম্ভ মিশ্রকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী আখ্যা লাভ করেন। এ বৎসর ভারতীয় ২নং খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদ, যুগিষ্ঠির সিং, ইরসাদ হোসেন, মনোমোহন ও দীলিপ বসু প্রভৃতি এই খেলায় যোগদান করেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নবীন খেলোয়াড় মিশ্রের নিকট ইফতিকার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অপর দিকে যুগিষ্ঠির বিজয়ী ইরসাদকে পরাজিত করিয়া মেটা ফাইনালে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পান। চরম মীমাংসার ফলে প্রবীণের ত্রয়োদশিতার নিকট নবীনের পরাজয় দেখা যায়। দুর্দ্বর্ষ ও শক্তিমান খেলোয়াড় হইয়াও মিশ্র এই দিন মেটার চাতুর্ঘ্যের আন্দাজ

করিতে পারেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত 'প্রেসিং' মিশ্রকে অস্থির করিয়া তোলে।

মেটা ও মিশ্র যুগ্ম-প্রতিযোগিতায় ইফতিকার ও মনোমোহনকে অনারাস হারাইয়া দিয়া বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হন।

প্রদর্শনী খেলায় মিশ্র আবার ভারতীয় পেশাদার খেলোয়াড়দের শীর্ষস্থানীয় আজিজুল হককে পরাজিত করিয়া ভারতীয় টেনিস-জগতে নিজের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

টেবিল টেনিস

সম্প্রতি কলিকাতায় বেঙ্গল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রেণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক খেলোয়াড় ব্যতীত খ্যাতনামা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাপন্ন দুই জন খেলোয়াড়—এরোসেন ও বেলাক্ যোগদান করিয়া এই অমুহুর্তের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করেন। ইহার দুই জনেই আমেরিকান। বেলাক্ ও অপর এক জন বিখ্যাত খেলোয়াড় বার্ণা কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়া সকল কেন্দ্রে তাঁহাদের অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বেলাক্ ডাবলসে জগতের মধ্যে এককালীন সেরা দুটির অন্যতম। এখানকার খেলায় সিঙ্গলসে এরোসেনের নিকট তিনি পরাজিত হন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার খেলাই অধিকতর উপভোগ্য ও দর্শনীয় হয়। ডাবলসে বোম্বারের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় চন্দ্রাণার সাহচর্যে বেলাক্ ও কে, ব্যানার্জীকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজিত করেন।

ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলস্—

এরোসেন ১৮-২১, ১৩-২১, ২১-১৭, ২১-১১ ও ২১-২০তে বেলাক্কে পরাজিত করেন।

ভেটোরেনস্ সিঙ্গলস্—

এস, ব্যানার্জী—২১-১৩, ২১-১৯, ২১-১২তে এ, মুখার্জীকে সহজে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস্—

এরোসেন ও চন্দ্রাণা বেলাক্ ও কে, ব্যানার্জীকে ২১-২০, ২১-১৮, ১৮-২১, ১৮-২১, ২১-১৯এ পরাজিত করেন।

আজ ও আগামী

ত্রিপ্রশান্ত দত্ত

তোমার বীণাতে বন্ধুর তোলা আজি !

এ-যুগের বীণা বিউগল হল না কি ?

কোথায় কোকিল, কই কোটে ফুলরাজি ?

বাকদে-বোমায় পৃথিবী ফেলেছে ঢাকি।

মদের বোতলে রক্ত দেখেছ কত ?

ভাঙার নেশায় আজিকে মত্ত মাধব—

মিলনের গান তুমি গেয়ে যাও তবু—

উড়ে চলে যায় কত যে কথার ফাল্গুন !

বাঁশীতে তুলিছ নিভা নূতন রাগ

রাইফেল বুলি দৌঁহার দিতেছে তার !

দোসের দিনেতে এবার মাখিনি ফাগ,

পিচকারী কই বেরনোই আজি সার।

আগামী যুগের ইতিহাস লেখো আজ :

মৌন অতীত, নীরবে নিবিয়া যাও ;

ধ্বংসের দেব, খুলে ফেলা তব রাজ—

হে নবীন, তুমি বিজয়ের গান গাও !

মানব-জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি জাতীয় সাধনার যত কিছু ক্রিয়া-কৌশল আছে, তৎসমস্তের প্রসূতি আমাদের বেদমাতা সরস্বতী। বেদমাতা কেবল হিন্দুদিগের মাতা নহেন, তিনি জাতিবর্ণ-নির্কিশেবে সর্ব-জাতির মাতা। মাতার সর্বপ্রধান ধর্ম সন্তান-পালন। এই পালনী শক্তি দেবী সরস্বতীতে যেরূপ স্তম্ভ-ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট, এরূপ অগ্নি কুর্য্যাপ দেখা যায় না। কারণ, সর্বসাধারণের জীবন ধারণের মূল যে জ্ঞান—যে বিদ্যা, তাহার একমাত্র পবিত্র উচ্চতর উৎস বিজ্ঞানিষ্ঠাতা দেবী সরস্বতী।

সরস্বতী মাতার আর্ধ্য সন্তানেরা তাঁহাকে মহাপ্রকৃতির অত্মতম প্রতীকরূপে শাস্ত্রালাবার অত্মতম শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়া থাকেন। শাস্ত্রালাবার শক্তিগণ কালী, তর্গী প্রভৃতি দেবতা প্রায়শঃ শাসন-অমুশাসনাদির অন্তর্গত অমুরক্তা থাকিয়া স্বষ্টি-স্থিতি-সংহারের সৌকর্য সাধন পূর্বক শাস্ত্রি সংস্থাপন করেন। কালবশে যুগযুগে স্বল্পকালে হয় অমুরাদির প্রাতঃসেব, ও দেবতার স্বল্প। সেই অমুরমারগাদি কার্যে থাকে তাৎকালিক সাময়িক শক্তি-অবতারণের আবশ্যক। সারস্বতী শক্তির কিন্তু সেরূপ লীলা-বাচস্পের—সেরূপ কার্যকলাপের প্রয়োজন তত প্রচুর ভাবে পরিদৃষ্ট হয় না। একবার বত অতীতের অষ্টাংশি-যুগে তাঁহার তথাবধি অবতারের আবশ্যক হইয়াছিল।

স্বষ্টির প্রাবল্য হইতে আজ পর্যন্ত ভারত যত প্রকার যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে, তত্বগো দেবযুদ্ধ প্রধান। এই যুদ্ধ হয় হিমালয়ে শুষ্ক-নিম্নস্তরের সহিত দেবী দুর্গার। এই যুদ্ধে দুর্গাদেবীর পক্ষ হইতে ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী প্রভৃতি পৃথক পৃথক শক্তির সহিত সারস্বতী শক্তির ডাক পড়িয়াছিল। তর্গী দেবী চিরসিদ্ধা গৌরী। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একবারে কৃষ্ণবর্ণী হইয়া যান। “কৃষ্ণাভং সাপি পার্শ্বতা” ইত্যাদি উক্তি সেই যুদ্ধ প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে।

দেবী সরস্বতী ঋতবর্ণী। ক্রোধের অত্যন্ত অভিযুক্তিতে যে বর্ণ কৃষ্ণ বা নীল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। দেবী সরস্বতীও তদ্রূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া নীলবর্ণী হইয়া যান। সেই অবস্থায় তত্ত্বশাস্ত্র তাঁহার সংজ্ঞা দিয়াছেন নীলসরস্বতী। পুরাণে কিন্তু আমরা তাঁহার তাৎকালিক-নাম দেখিতে পাই ভদ্রকালী। সেই দেবী দৈত্যযুদ্ধে সমরে অমরগণের ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পূজার তলীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মন্ত্র দেখা যায়—

“সরস্বতীয়ে নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যে নমো নমঃ”

তাঁহার আকার গুরু—তিনি বিমুক্ত ঋতবর্ণী। তাঁহার আচার গুরু, তিনি ঋতপদ্মে সমাসীন। তাঁহার আচার গুরু, তিনি ঐ পূর্বোক্ত একটি সমরক্ষেত্রে ব্যতঃ মারগ-শাসনাদি অন্তর্গত অর্থাৎ হিংসাত্মক কৃষ্ণ কথ্যে কুর্য্যাপ রত নহেন। তাঁহার ব্যবহার গুরু, তাই তিনি সর্বগুণা সরস্বতী। নিরস্তুর বেদাদি ব্রহ্মবিদ্যা দানে নিরতা বলিয়া অভিধানে তিনি “ব্রাহ্মী” নাম ধারণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার বদন-চতুষ্টয় হইতে ঋন বেদধ্বনি নিনাদিত হয়, তখন মর্ত্যে ঋষি-মহর্ষিগণের হৃদয়-যন্ত্র উহার বন্ধার আসিয়া পৌছে। ব্রহ্মার বদনযন্ত্রের যত সমান শক্তিসম্পন্ন যত যত যন্ত্র যে যে স্থলে ছিল, ওয়ারলেস তার-বার্তার মত সর্বত্র উহা প্রতিধ্বনিত হয়।

তই সকল যন্ত্র হইতেছে ঋষিগণের হৃদয়যন্ত্র। সে যন্ত্রের তুলনা নাই, ব্রহ্মাণ্ডিক তুলনায় সহিত সে যন্ত্রযন্ত্রের—ঋষিহৃদয়স্থিত আশ্বিক

যন্ত্রের তুলনাই হইতে পারে না। তথাপি ঐ যন্ত্রযন্ত্র সহজে বুঝিবার জন্য এ কালের ওয়ারলেস যন্ত্র অর্থাৎ তারহীন টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সহিত তুলিত হইল।

একটি ওয়ারলেস তারযন্ত্র যদি কোথাও বাজিয়া উঠে, তবে উহার তুল্য শক্তিসম্পন্ন অগ্নি যাবতীয় যন্ত্র তাহার বন্ধার হয়। এই সব যন্ত্রের যেমন শক্তি, তারতম্যামুসারে তাহার পাল্লাও তেমনি সূত্র-প্রসারী হয়। ব্রহ্মার হৃদয়যন্ত্র ও অমুদ্রিত বেদ-বেদাঙ্গ-বিজ্ঞানসাধক ঋষিগণের হৃদয়যন্ত্র উভয়ই অনন্ত অক্ষরন্ত শক্তিসম্পন্ন, তাই ব্রহ্মলোকের বেদধ্বনি মর্ত্যে মুর্ত্তিমান হইয়া ঋষি-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। ঋষিগণ সেই বিদ্যা জ্ঞান প্রভাবে স্ব স্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সকল বেদধ্বনির মধ্যে যাবতীয় বিদ্যা অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, তাহার সমষ্টি চতুঃষষ্টি। তত্ত্বগো বেদাদি মুখ্য বিদ্যা চতুঃষষ্টি, এতদ্ভিন্ন চতুঃষষ্টি কলাবিজ্ঞার অবশিষ্ট অগ্নি সকল গৌণ। এই সকল বিজ্ঞার প্রসূতি সরস্বতীর আর্ধ্য উপাসকগণ সরস্বতীপূজা প্রসঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্তের বন্দনাই করিয়াছেন—

“বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিজ্ঞানেন্ভে এব চ।”

এক দিকে যেমন জ্ঞানিগণের প্রধান উপাশ্রয় বেদ, অগ্নি দিকে তেমনই কশ্মিগণের অন্তঃস্থ সাধনীয় কলাবিদ্যা। এই কলাবিজ্ঞার অন্তর্গত বার্তা অর্থাৎ বাণিজ্যাদির প্রধান উপকরণ শিল্পজাত যাবতীয় বিষয়-বস্তু। এই বার্তাবিজ্ঞাই সর্বজগতের আন্তিহাণিগী। আজ কাল কলাবিজ্ঞারই সমধিক ব্যাপকবৃত্তি। বর্তমান কালে ক্যামিকেল অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারী বাহা অর্থসাধনের প্রধানতর পথ-রূপে সর্বজনবিদিত—সর্বজন কর্তৃক উচ্চগ্রাণীয় উদ্ভোধিত, তাহাও এই বার্তাশিল্পের অন্তর্ভুক্তি এবং সর্বমানবের উপকারক।

যুদ্ধাদি বিজ্ঞা—বাহা দ্বারা আজ বিজ্ঞান-প্রধান বিজ্ঞ-সমাজ বিমুদ্রাশিত—বাহার আলাপ-আলোচনায় আজ সর্বদিক্ মুখরিত, ইহাও বেদের অন্তর্গত অসাধারণ এক অংশ। ইহার অপর নাম উপবেদ। অতীত যুগে যুদ্ধাদি দ্বারা দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন যথাযথ হইত, এজন্য শাস্ত্রে যুদ্ধকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। যজ্ঞশব্দার্থ যেমন পূজা, যুদ্ধশব্দার্থও তদ্রূপ পূজাবিষয়ক ব্যাপার। তাই চণ্ডীতে “যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুভ্রঃ নিমুক্তকঃ হনিষ্যসি” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ দেখা যায়।

সঙ্গীতবিজ্ঞাও বেদের অন্তর্গত। সাত্ত্বিক রসসাধক কশ্মিগণের প্রধান উপাশ্রয় এই সঙ্গীতবিজ্ঞা কলা-বিজ্ঞার এক অংশ। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার বদনে যে সারস্বত-বিজ্ঞার প্রথম প্রকাশ, তাহারও আদি-কারণ সঙ্গীত স্বর। ব্রহ্মার বদন হইতে বেদধ্বনি নিনাদিত হইতে থাকিলে তাহাই সরস্বতী স্বর-সংযোগে গান করেন। ঋষিগণ সেই বেদ-সঙ্গীত স্বরশাস্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সামবেদের প্রায় সর্বত্রই ঋষি-সমাজে সঙ্গীতরূপে গৃহীত ও গীত। আর এই সঙ্গীত-সাধনা বেদোপনিষদ্ সাধনার সহিত সমান আসন প্রাপ্ত, তাই ভক্ত সারস্বত সাধকের সত্যিক্ত প্রাণী—

বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যং।

ন বিহীনঃ যদ্যে দেবি তথা মে সত্ত্ব সিন্ধবঃ।

এই প্রসঙ্গে সঙ্গীত সাধনার সম্বন্ধে একটি সঙ্গত উক্তির উল্লেখ এখানে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

সঙ্গীত-রত্নাকর ও সঙ্গীত-দামোদর নামক গীতি-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—যে গান ভবভঙ্কর অর্থাৎ জীবের জন্ম-প্রবাহ নিবোধ করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করে—তাহাই ঐক্যত সঙ্গীত; আর যাহা ভবভঙ্কর অর্থাৎ কেবল কেলিকলার প্রকাশক শব্দবিকাশে গ্রথিত হইয়া—প্রোতোর চিত্ত রমাল ও চঞ্চল করিয়া তোলে, তাহা জন্মের নিরবচ্ছিন্ন প্রোত-বিস্তারক বেণ্ডা-সঙ্গীত তুল্য। এই প্রবন্ধে আলোচ্য সঙ্গীত—বেদান্তমোদিত বেদবিহিত সাধু শব্দ ও সাধুভাব-সমবিত; অত-এব ভবভঙ্কর—ভবরঙ্কর নহে। তাই সারস্বত মন্ত্রমধ্যে স্থান প্রাপ্ত। বীণাসিযোগে নারদাদি দেবর্ষি ও তুষ্ক প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের কণ্ঠে দেব-ঋষি প্রভৃতির সভায় গীত হইত। বীণাবাঞ্ছ সহকারে সরস্বতী সেই সকল সঙ্গীত ব্রহ্মা-সভায় গান করিতেন। এ জন্ম তিনি বাণধারিণী।

সমস্ত জ্ঞানের বিকাশ বা বিস্তার হয় বাক্য দ্বারা। অকারাদি অক্ষর দ্বারা বিজ্ঞাস হয় সেই বাক্যের। উক্ত বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী। স্তবরাং দেবী সরস্বতী বাম্বায়া, পঞ্চান্তরে অক্ষরময়ী। অকারাদি অক্ষর-সমূহ তাঁহার স্বরূপ। সেই অক্ষর-পাণ্ডি দ্বারা বেদ উপনিষদাদি সর্বশাস্ত্র সন্নিবদ্ধ। সেই অক্ষররাজ্যের নাম মাতৃকা; তাই মা আমাদের মাতৃকা-বর্ণমালিকা।

বর্ণবলী মাতৃকাঙ্কিকা—মাতার জায় কাথ্যকারিণী। এই সকল বর্ণই আমাদের পদোক্ত ভাবে পালন করে। বাল্যে অকারাদি বর্ণ লিখনে বিন্যাসিকার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার পর উত্তরোত্তর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা যাবতীয় মানব জাতির নির্বাহ করে।

দেবী সরস্বতী সেই অক্ষরমালারূপে আবির্ভূতা, স্তবরাং সর্ব-জগতের—সর্বমানবের মাতা। সনাতন তত্ত্বমতে কলাশাস্ত্র-সম্বত সেই অক্ষরের সংখ্যা। পঞ্চাশ—“পঞ্চাশ্লিপিভির্কিত্ত্বমুদোঃ” ইত্যাদি। উক্ত শাস্ত্র অকারাদি পঞ্চাশবর্ণ মাতৃকাদেবীর একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী।

জগতে যত কিছু ধর্ম আছে, সকল ধর্মেরই এক একটি স্বাধীন বর্ণমালা বিদ্যমান। সকলেই ইহাকে সংক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব সুবিধা-অনুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সর্বসম্প্রদায়ের সর্ববিধ জাতীয় অক্ষরের উল্লেখ অসম্ভব—বাহ্য-ভাতিও তাহার অগত্য হেতু। অল্প সব বাদ দিয়া কেবলান্ন বর্তমান শিক্ষায় দক্ষিণগণের বহুল ভাবে ব্যবহৃত ইংরেজী বর্ণমালার অতি সংক্ষেপ মাত্র ২৬টি অক্ষরের আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়—ঐ সকল বর্ণ আমাদের তত্ত্বোক্ত অক্ষরাদির বর্ণের অন্তর্গত। অ আ প্রভৃতি স্বর ও ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন-বর্ণের অনুকরণে ইংরেজী প্রায় সকল বর্ণ ভবন মিলিয়া যায়। ঐত-এব ভারতী মাতা কেবল ভারতের কেন, সর্বদেশের সর্বজাতির দশিকী মাতা বলিয়া অবাধে গণ্য হইতে পারেন। কারণ, সেই

অক্ষর-ব্রহ্মক বিদ্যাই কালে উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া সকলের অন্তরবস্তুর সংস্থান করিয়া আজন্ম-মরণ পালন করিয়া থাক।

দেবা জ্ঞানদা অক্ষর-ব্রহ্মরূপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার প্রথম ও প্রধান জ্ঞানী সন্তানগণের জ্ঞানদানে রূতাধতা সম্পাদন করিয়াছেন; বর্ণমালিক অক্ষররূপে অবতারণা হইয়া কয়ী সন্তানদিগের কৃতকাব্যতা নির্বাহ করিয়াছেন। ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত নহেন, সেই অক্ষর-মালার লিপি নির্বাহের জন্ম মস্তাধার দোয়াত ও লেখনী নাম লইয়া লিখন-কার্যের সৌকর্য্য সমাধান করিয়াছেন—যাহার প্রসাদে সর্বজগৎ লিখিয়া পড়িয়া মানব-পদবাচ্য হইতে সমর্থ হইয়াছে।

দক্ষিণায়নে জীবের জাড়া সমরিক প্রবল থাকে, সে সময় সাধনার দিক হঠাৎ ভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। এই পৌষের অবসানে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তির অব্যবহিত পরেই উত্তরায়ণ, দেবী ভারতী মাতা এবারও জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া ভারত-সন্তানের দৃষ্টিপথে সমুপস্থিত। তিনি ভারতীয় জ্ঞানশিক্ষার ভাণ্ডার বেদাদি গুরুত্ব, মস্তাধার লেখনী, বীণাদি যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ লইয়া উপস্থিত। এই মহানুভোগ সকলেরই—তাঁহার সন্তানমাতারই সোব্য।

শীত-বসন্তের সন্ধি সময়ে বর্ষে বর্ষে সংস্কৃতির শুভাগমনের সাড়া পাইয়া ঋতুরাজ বসন্ত তদায় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দানের ত্রব্যসম্ভারে অবহিত হইয়া থাকে। যব-কবিশ, আত্মকুল, স্রুত কল্লার ও কুল কুসুমের সস্তার যোগ্যবিহার জন্ম বসন্ত সাতশয় ব্যগ্র হয়। এই সময়ে বসন্তের অভিব্যক্তি কুসুমরূপে বস্তিত বসন পরিধান করিয়া বালক-বালিকা যুক্তকরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে প্রবৃত্তবান। ঢোল, চতুশ্রী, ফুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষামন্দির পুষ্পাঞ্জলি-দান মন্ত্রে মুখ্যরত হয়। সাধু ভাবের সঙ্গীত-সঙ্গতে সর্বদাক্ষ উদ্ভাসিত থাকে। এই ভাবে বাল্যলার সারস্বত মহোৎসব বয়ে বয়ে স্তম্ভমাহিত হইয়া হিন্দুমাত্রের মনে আনন্দ দান করে। সে দৃগ্ অতি মনোহর—অহিংশয় চিত্ত-চমৎকারক।

এই ভাবের দেবা সাবনায় দেবী ভারতীর প্রসাদলব্ধ মহাকবি কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুলে ভারতের সারস্বতবৃত্ত পরিপূরিত হইয়াছিল। তার পর মধ্যযুগেও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবির অধ্যাপক-রূপে ভারত-ভূমি বিশেষ করিয়া বঙ্গভূমি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তদন্তিমে অনন্ত রকমের বাঙ্গালা কবির প্রাচুর্যে কবি-পদবী প্রোচ্ছল ও কবি-গৌরবের গরাদা কাতি-পতাকা। কবিকাব্যগগনে উজ্জ্বল ছিল। সে যুগের সে কবি-গৌরবের বিষয় ভাবিলে—আলোচনা করিলে কে না আনন্দে উৎফুল্ল হয়?

হে সারস্বত পঞ্চামী যুবকগণ! বিবিধবিধরূপে সরস্বতীর পদদেবা কর—তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা কর—

লক্ষ্মণেরা ধরা তুষ্টিগৌরী পুষ্টি: প্রভা বৃতি:।

এতাবি: পাহি তহুধিষ্ঠাতির্মণ্য সরস্বতি:।

সুভাষিতাবলী

(বিদেশী কবিদের ভাবাহুসরণে)

ক্রীকালিদাস দ্বায়

রমণী যখন প্রেমের স্বপ্ন হেবে, পুরুষ তখন যশের পিছনে ধায়।

পুরুষ যখন প্রেমভূমি ফেরে মা হ'য়ে রমণী অবসর নাহি পায়।

প্রাণের সম্মতি লয়ে হাতে হাতে হয় যে মিলন

তাতেই বিবাহ বলে মন্ত্র পড়ি হয় না বন্ধন।

চোখের ভাষা অক্ষরকা ঠাঁয়ের ভাষা হাসি।

ঐ রসনার ভাবার চেয়ে এদের ভালবাসি।

আশাহীন কণ্ঠ যেন দেহহীন ছাদ।

কাগাহীন আশা তা'ত মরীচিকা মায়া

যাহার জীবনে নাই ভয় তথা আশা,

নাহি গৃহ-সংসারের মেহ-ভালবাসা।

দিনান্তে পায় না গৃহে হাতের মাধুরী

সে জীবন স্বর্ঘ্যহীন অন্ধকার পুরী।

যুদ্ধের পরে—

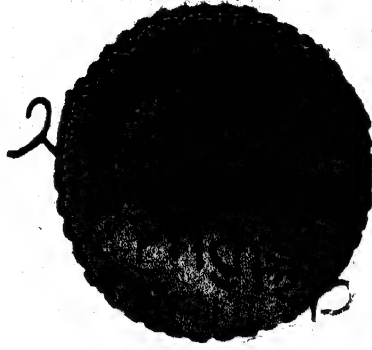
পঁচিশ বৎসর পূর্বে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর যুরোপের যে দশা হইয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধের পর—মাত্র যুরোপ নহে, সমগ্র পৃথিবীর দশা কি একই প্রকার পাড়াইবে না? পঁচিশ বৎসর পূর্বে যুরোপের জাতিগুলি এক দিকে যেমন আমেরিকার অর্থ-নীতিক ক্রীতদাস হইয়া পড়ে অল্প দিকে তেমনি মাফিক বণিকদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছিল। আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত রপ-স্বপ্নের দুর্ভিক্ষ বোঝা বহিয়া

তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে। যুদ্ধের পর পাণ্যের ক্ষুধা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের অর্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছিল বলিয়া যুরোপের শ্রমশিল্পগুলি প্রসারিত হইলেও মাফিক শ্রমশিল্পের প্রতিযোগিতা শীতলায়ক হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া যুরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমশিল্পে আমেরিকার লম্বা কারবারের স্তব্ধ বহিবার সামর্থ্য কোন দেশের হয় নাই। তাই পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই যুরোপের ধনিক ও বণিক সম্প্রদায় (বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্মানীর) অখিল যুরোপ আন্দোলন (Pan Europa Movement) আরম্ভ করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে European Customs Union ক্লাবের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রস্তাব করেন—

"Are you of opinion that an economic understanding between the nations of Europe would enable them to resist more effectively the growing pressure exercised upon them by the United States?".....কেহ প্রস্তাব করেন—"America Conquers Britain and Who Will Be Master—Europe or America?"

সে বার আমেরিকার জায় যুরোপের নিকরায় জাতিগুলির অপর শত্রু ছিল সোভিয়েট রুশিয়া ও এশিয়ার জাতি সমূহের স্বাভাবিক-সংগ্রাম। এশিয়া যুরোপের শ্রমশিল্পের মালিকদের পণ্যবিক্রয়ের বাজার। গত মহাযুদ্ধের অন্তে এক দিকে আমেরিকা যেমন যুরোপের এই ধনিকদের আপনাদ কর্তৃত্ব করিয়া রাখিয়াছিল, অল্প দিকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যুরোপের এই ধনিকদের তথা ধনিক-প্রভাবাবিস্তৃত যুরোপীয়দের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন প্রবল হয়। এই সময় রুশিয়ার ধনসাম্রাজ্যবাদী আন্দোলন এই ধনিকদের অন্তরে ত্রাসের স্রষ্টা করে। তাহারা বলিতে থাকে—"The Soviet Union has become an utterly alien Asiatic or semi-Asiatic empire, more dangerous in that it offers thereby a natural ally to the rising tide of Asiatic nationalism."

যুরোপীয় জাতিগুলি পঁচিশ বৎসর পরেও যেমন আমেরিকার অর্থ-নীতিক ও বণনৈতিক ক্রীতদাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, অল্প দিকে তেমনই বিজয়ী সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব যুরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত ও বণিক সম্প্রদায়কে তাহাদের দৈবাবিকার (the divine rights of the bourgeoisie) হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।



ক্রীতদাসানাথ রায়

জার্মানদের বিপদ—

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীয় পাক্ষের প্রধান হেতু ছিল যোগ্যে রক্ষার সঙ্কট। বর্তমানেও জার্মানীয় এ সঙ্কট ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। ৫ বৎসর পূর্বে জার্মানী ইম্পাত ব্য হারের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, ব্যবস্থা-সৌকর্যের সুযোগ মিত্রপ লইয়াছে। সে সময় ইহাই ব্যবস্থা হি যে, প্রথমে সাবমেরিন, দ্বিতীয় বিমান-বিশ্বাসী কামান, তৃতীয় ট্যাঙ্ক এবং সর্বশেষে রেলপথের ও ইম্পাতের বরাদ্দ হইবে। মি

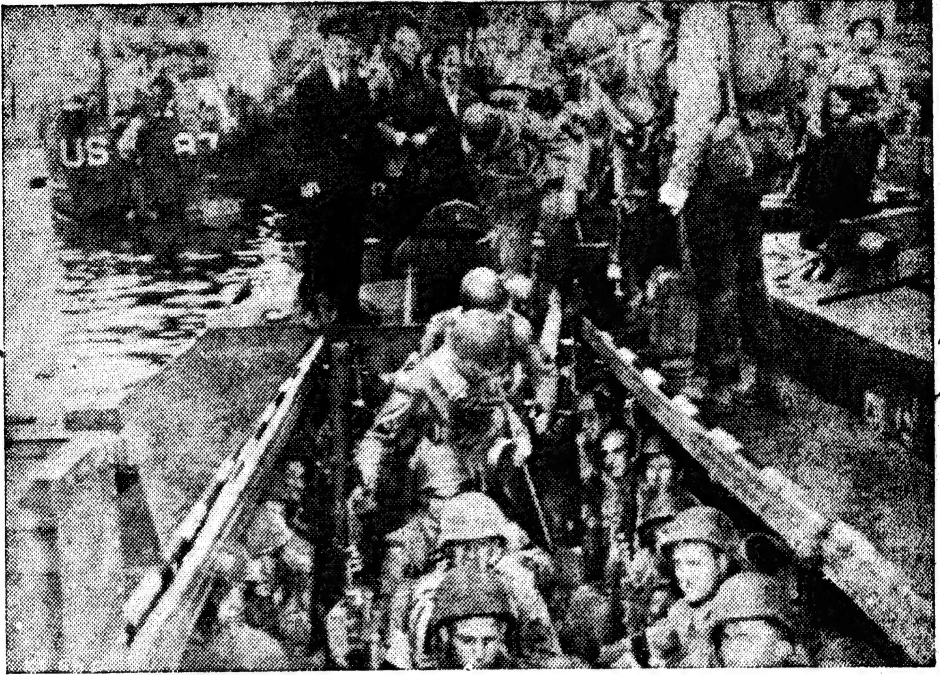
পাক্ষের বিমানবহর পশ্চিম-যুরোপে জার্মান সামরিক ব্যবস্থার দুর্বল স্থল রেলপথের উপর আক্রমণ করে। দুই বৎসর পূর্বে মিত্রপ প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় ২-৩ টি রেলপথের উপর বোমাবর্ষণ করে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল সুরক্ষিত করিবার জন্য জার্মানরা রেলপ বিস্তার করিলে তাহা ইংরেজ বিমান বহরের আক্রমণ পাল্লার মা আসিয়া পড়ে।

তাহার পর জনবল। জনবলের অভাব জার্মানদের আজ প্র: সঙ্কট। জার্মান বিশেষজ্ঞ পল হাগেন তাহার "Will German Crack?" গ্রন্থে এই সঙ্কটের আভাষ দিয়া বলিয়াছেন: "The shortage of labour has now become the Nazi's most desperate problem...It has not been solved and cannot be, for reasons beyond Nazi's control." কি পূর্বে কি পশ্চিম বণক্ষেত্রে জার্মানিকে। জনবলের অভাবে গত দুই বৎসর দিনেব পর দিন পরাজিত হই হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে ঠিক এই সময়ে জার্মান প্রচার-বিশেষ লে: জেনা: কূট ডিটমার বেতারে বলেন—রুশিয়ায় আরও জা: সৈন্ত চাই, রুশরা রিজার্ভ সৈন্ত ব্যবহার করিতেছে "The Russia are far ahead of us in exploiting their manpower reserves...This year (1943) their drives a more concentrated more exhausting and more dangerous than last."

দৈন্যপ্রবাহ ও কম্যুনিজম—

ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং হল্যান্ডের কতক অংশ হইতে জার্মান বিতাড়িত হইলেও, এ সকল মুক্ত দেশের অবস্থা আনন্দ করিবার নহে। নাৎসীরা এ সকল অঞ্চল ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দা দারিদ্র্য ও অন্নাতাবে জনসাধারণ মরিয়া হইয়া পড়িয়াছে। তা: উপর এ বৎসর যুরোপের শীতের তীব্রতা অসম্ব। মুক্তি-প্রাপ্ত নরন যেন জোর করিয়া মুক্তির আনন্দ করিতেছে। বেলজিয়ামের চাই, বস্ত্র চাই, আলানী চাই! মিত্রপক্ষ প্রথম মাসে শত শত খাজ দিয়া প্রধান মন্ত্রী ছবটি পিয়েরলটের সরকারকে রক্ষা করি চেষ্টা করিলেও, ফ্রান্সের জায় বেলজিয়ামেও কম্যুনিষ্ট-প্রভাব পাইয়াছে। তাহারা বুটিন-সমর্থিত এই সরকার মানিতে চাহিতেছে =

মিত্রপক্ষের অন্নসাহায্যে হল্যান্ড কোন মতে পাড়াইয়া আ: সে অন্নও পর্যাপ্ত নহে। বিভালয়গুলি বন্ধ, হাসপাতালগুলি ঔষধও নাই—চিকিৎসকও কম। লণ্ডনের রাষ্ট্র উইলহেলমিনা সন্ন



ফ্রান্সের উপকূলে মিত্রসৈন্যের অবতরণ

রিপোর্ট পাইয়াছেন—“Communism had gained no converts in Holland but old conservative parties were being radicalised. From Dutchmen in Holland, Dutchmen in exile did not know what to expect.”

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে নাৎসীরা ২০ হাজারের অধিক ওলন্দাজ দেশভক্তকে হত্যা করিয়াছে; তবু শুণ্ড বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। লণ্ডন হইতে নির্বাসিত স্বদেশবাসীরা নাৎসী-নিয়োজিত ওলন্দাজ শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে থাকে—“Commit acts of sabotage whenever a chance arises……damage high-ways, rail-roads, water ways……your chance is here to do your part in the liberation of your country.”—নির্বাসিতা ওলন্দাজরাণী উইলহেলমিনা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ পিটার গারডিয়াগু স্থির করিয়াছেন, দেশে ফিরিয়াই তাঁহারা বিপ্লবী নেতৃত্বকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিবেন এবং জনসাধারণ যে প্রকার শাসন-তন্ত্র চাহিবে তাহাতেই তাঁহারা সম্মত হইবেন।

এই পীতে বুটেনের কষ্টও কম নহে। গৃহহীন সহস্র সহস্র নরনারীকে আজ সরকারী ‘শেণ্টারে’ রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে। বোমাবিক্ষেপ্ত প্রায় আট লক্ষ গৃহকে বাসোপযোগী করিবার জন্য প্রায় লক্ষ শ্রমিককে শ্রম করিতে হইতেছে। তবে ব্রিটিশ নরনারী স্বশৃঙ্খল-মের্যে এ সকল কষ্ট বরণ করিতেছে। এখন পর্যন্ত বুটেন

কম্যুনিজমের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু যুরোপে আজ যে ভাব-তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার প্রাবল বুটেন বোধ করিতে পারিবে কি না ভবিষ্যৎই জানে। ‘নিউজ ক্রনিকেল’ সম্পাদক লিখিয়াছেন—“This has become the common man’s war. Man is trying to find the equation between individual liberty and economic order. Communal control without too great sacrifice of personal freedom seems to be the common denominator of all resistance movement.”

রুশিয়ার কৌশলনীতি—

প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সাংবাদিক মিঃ সেসিল এক মেলভিল “The Russian Face of Germany” নামে একখানি বই লিখেন। এই বইয়ে জাৰ্মান-সোভিয়েট বড়বন্ধের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, লেনিনের সময় হইতেই জাৰ্মান রণনায়কদের নীতি হইয়াছিল, যুরোপের পশ্চিম সীমান্তকে বলশেভিক শক্তি দ্বারা বিপন্ন করিয়া সেই সুযোগে জাৰ্মান অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করা ও তৎপরে জাৰ্মানিয়ার চিরন্তন শত্রুগুলিকে সাম্রাজ্য করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রুশিয়ার জাৰ্মান তত্ত্বাবধানে গ্যাস, বিমান ও অস্ত্রকারখানা স্থাপিত হয় এবং জাৰ্মানি হইতে প্রভূত পরিমাণ অস্ত্র রুশিয়ার চালান যায়। জাৰ্মান রণনায়কদের সহিত রুশ লালাফোজের এই বড়বন্ধের উদ্দেশ্য সঘর্ষে লেখক লিখিয়াছেন—“In this hellish alliance between Oligarchic Germany and Communist Russia it is plain that each party

believes it can double cross the other the Kremlin thinks to use Germany in the cause of world revolution, the Reichswehr to use the Red Army to give it European hegemony."

রুশিয়া যে জাথাগীর মাধ্যমে কাঁটাল ভাস্কিয়াছে তাহা যুরোপে প্রভাব বিস্তার হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে। জাথাগীর গঠনশক্তির সাহায্যে রুশিয়া যুদ্ধের পূর্বে হইতেই, যে দুজ্জয় সামরিক শক্তির ধর্মিকারী হইয়াছে, সে শক্তির বলই সে মাত্র যে জাথাগীর প্রভাবই চূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, দক্ষিণ-যুরোপেও আপনার প্রভাব-গুণ্ডার বিস্তার করিয়া সাম্রাজ্যবাদী বুটেনের কতকটা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে জাথাগণ প্রতিরোধ—

এ মাসে পূর্ব-যুরোপের যুদ্ধে জাথাগণের পান্টা প্রতিরোধ লক্ষ্যেও হ্রাস পায় নাই। সোভিয়েট সৈন্য এ পর্যন্ত বৃদ্ধাপেক্ষ দখল হ্রাসিত সক্ষম হয় নাই। ড্যানিউব উপত্যকায় জাথাগণ-প্রতিরোধ রম হইয়াছে। পূর্ব-প্রশিরা ও পোলসামান্তে দারুণ শীত পড়ায় যুদ্ধ বিধেয় চলিতেছে না।

পোল্যান্ডে রুশ-প্রভাব—

পোল্যান্ডের রুশ-প্রভাব ইংরেজরা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। জেনারেল সোসলোভি প্রমুখ লণ্ডনস্থ পোলগণ এই রুশ-প্রভাব মানিয়া লইতে অসম্মত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, তাহারা আর স্বদেশে ফিরিবে না, ব্রেজিলে গিয়া বসবাস করিবে। রুশবিদ্বেষী জেনারেল বোর ও তাঁহার দল যেন জাথাগণ বন্ধ-নিবাসে শুল্ক গণনা করিবেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব সহকারী স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ সামনার ওয়েলস পোল্যান্ডে সন্ধে ইঙ্গ-রুশ আপোষের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে,—পোল-সম্রাট সন্ধে যে ইঙ্গ-রুশ সমাধান প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহার বিশেষ পরিবর্তন (major surgical operation) না করিলে মধ্য-যুরোপে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা স্বরক্ষিত হইবে না।

রুম্যানিয়ায় রুশনীতি—

রুম্যানিয়া চিরদিনই সোভিয়েট-তন্ত্রের বিরোধী। আজ সেই মনোভাব তীব্রতর হইয়াছে। এখানে কম্যুনিষ্ট দল তত প্রবল না হইলেও বিজয়া রুশসৈন্যের সমর্থন তাহারা আপনাদিগকে শক্তিশালী মনে করিতেছে। তবে সরকারী ভাবে সোভিয়েট-তন্ত্র রুম্যানিয়ায় কম্যুনিষ্টদিগকে সমর্থন করিতেছে না। গত বৎসর এপ্রিলে রুশ-পরাষ্ট্র-সচিব মলোটভ ঘোষণা করেন—রুশিয়ার বাহিরে সোভিয়েট যুনিয়নের কোন দেশলিপ্সা নাই, অথ রাষ্ট্রের রাজনীতিক বা সামাজিক কাঠামোর অদল-বদল করিবার বাসনাও তাহার নাই—("The Soviet Union has no territorial ambitions beyond its own frontiers, no intention of changing the social or political structure of other nations.")—তবু রুম্যানিয়ানরা এই আশ্বাসে আশস্ত হইতে পারিতেছে না।

ভূমধ্যসাগরে রুশ শক্তি—

শত শত বৎসর যুরোপের বড় বড় রাষ্ট্র বন্ধন রাজ্যভাঙ্গার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া আপনাদের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া

আসিয়াছে। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের "Eastern Policy" গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই দেশ ও দ্বীপগুলির মধ্যে একটা আকৃত্ত্ব স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। সোভিয়েট রুশিয়া এই ভাবের পূর্ণপাষক।

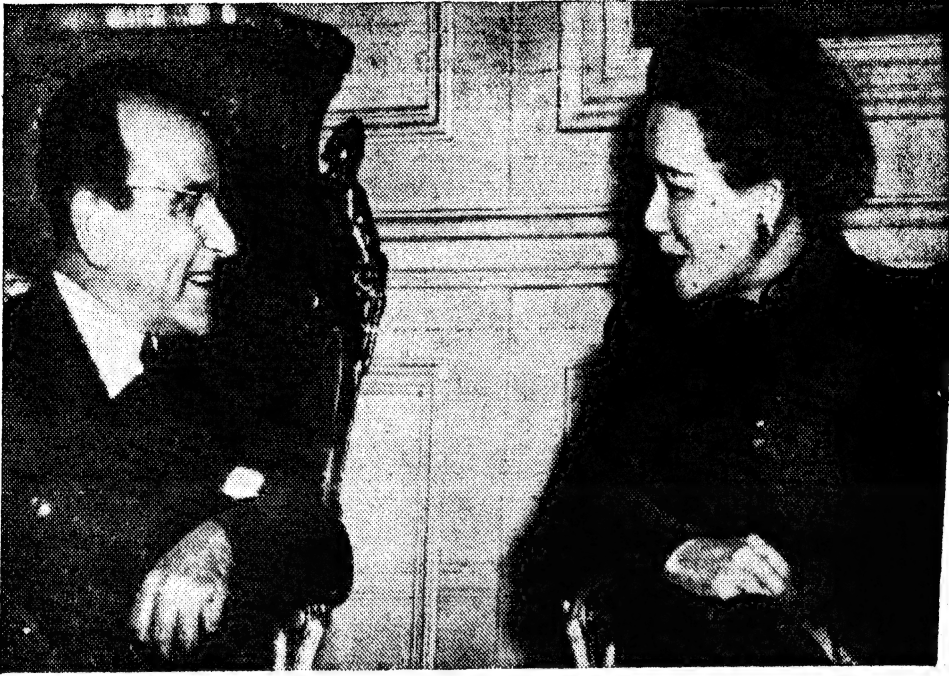
মস্কো বৈঠকে সিদ্ধান্তই হইয়া গিয়াছে যে, রুশিয়াকে বন্ধনে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে। গ্রীস-বুটিন প্রভাব গুণ্ডার মধ্যে থাকিবে। যুগোস্লাভিয়ায় আপন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির প্রয়োজনের খাতিরে ইংরেজ সোভিয়েট সমর্থিত মার্শাল টিটোকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিজয়া রুশ কিন্তু অতি-দাবধান নীতি অবলম্বন করিয়াছে। আপনাদের অধিকৃত বন্ধন অঞ্চলগুলিতে তাহারা এখনও সোভিয়েট-তন্ত্র প্রবর্তিত করে নাই। এমন কি, মার্শাল টিটোর অমুমতি লইয়াই তাহারা যুগোস্লাভিয়ায় ডেনিউব নদের পরপারে সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু ইংরেজরা বন্ধনে বিপন্ন হইয়াছে। এ স্থানে তাহাদের বহু শতাব্দীর কূটনাজির খেলা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। তাহার খাস তালুক দাস-খণ্ড ভারতের তোরণ সুর্যেজের দ্বারদেশে সোভিয়েট-প্রভাবপূর্ণ বন্ধন রাষ্ট্রসম্মত বুটেনের ত্রাসস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যুগ-যুগ ধরিয়া রুশিয়া একটু "গরম দরিয়া" পাইবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছিল, ভূমধ্যসাগর-তটের অঙ্গতম শক্তি হইয়া, আজ তাহার সে চেষ্টা সফল হইতে চলিয়াছে। বুটেন এই বিপদের কথা মস্তে মস্তে বুঝিতেছে, কিন্তু কি করিবে! সাংবাদিকরা বলিতেছেন—"Britons would be less than Empire builders if they were not aware that, in the cold blooded language of politics, the Balkans had become a Russian sphere of influence. As such it undid the work of a hundred years of British statecraft. The area of decision for the Eastern Mediterranean had been snatched from the British lion by the blacksmith's boy from Klanjec."

গ্রীসে রুশপন্থার অসম্ভব

গ্রীসে বুটিন-কবরুত প্রধান মন্ত্রী পাপানদ্রু পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তৎপরিবর্তে রিজেন্সা জেনারেল প্রাঙ্কাসের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত সমস্তা সমাধানের জন্য এক সম্মিলন হয়। এ সম্মেলনে গ্রিক বামপন্থী কম্যুনিষ্টদল E L A S যে গণ-নির্বাক্তান ও গণমত গ্রহণের প্রস্তাব করেন তাহা গৃহীত হয় নাই। বুটিন প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্লিল ও পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এড্রিন ইডেন এ উপলক্ষে গ্রীসে গিয়াছিলেন। গ্রীসের বামপন্থী জনৈক সৈন্য গুলি ছোড়ে, চার্লিল আহত হন নাই। গ্রীসে রিজেন্সা স্বর্গাপত হইবার পরেও বামপন্থারা অস্ত্র ত্যাগ করে নাই। নূতন মন্ত্রিসভা আপনাদের পরিবর্তনায় বামপন্থাদের অস্বস্তিত প্রধান প্রধান নীতি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশ্বাসের বিষয় এই যে, ২৮শে পৌষ বামপন্থীদের সহিত গ্রীস ও মিত্রপক্ষের একটা রফা হইয়া গিয়াছে।

ইটালীতে এখনও যুদ্ধ—

ইটালীতে জাথাগণ-প্রতিরোধ শক্তি এখনও চূর্ণ হয় নাই। সার্কিও উপত্যকায় প্রবল জাথাগণ আক্রমণে মিত্রসৈন্যকে সামান্য



আমেরিকা-যাত্রার প্রাণ্ণালে মাদাম চিরাং কাইশেকের সহিত ব্রেজিলের রাষ্ট্রপতির আলাপ

হাট্টিয়া আসিতে হয়। মিত্র-অধিকৃত ইটালী হইতে বিমান-বাহিনী জাখ্যাণ-অধিকৃত উত্তর-ইটালীর সেতু সমূহ, যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেই ইয়ার্ড এবং অষ্ট্রিয়ার তৈলকলগুলির উপর বোমা ফেলে। শুনা যাইতেছে, জাখ্যাণী নবম্বে হইতে ৮ হইতে ১০ ডিগ্রিশন সৈন্স লইয়া গিয়া ইটালী ও অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে নতুন বক্ষা-ব্যবস্থা করিতেছে।

জাখ্যাণীর প্রতিরোধ

গত জুনের শেষ ভাগে দুই জন ভ্রমণকারী তুরস্কে পৌঁছিয়া প্রকাশ করেন যে, জাখ্যাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ আশা করেন, পশ্চিমে মিত্রশক্তির অগ্রগতি স্তব্ধ করিবার জন্য জাখ্যাণের সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে ও মিত্রসৈন্যগণকে সমুদ্রোপকূলে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিবে। ইহাতে দুই বৎসরের মধ্যে তাহার বৃটিশ ঘাঁটি হইতে পুনরায় আক্রমণ করিতে পারিবে না। ইহার ফলে জাখ্যাণেরা না জিতিলেও একটা থমকা ভাবের উদ্ভব করিতে পারিবে। তখন জাখ্যাণ সামরিক আলানস্বরূপ আশা করেন—“In that event the occupied countries of Europe would again fall into dispair. The U. S and Britain would be shake beyond repair; Roosevelt and Churchill would surely fall. With its war won anyway Russia would make its own peace with the Reich.”

কুশিয়ার সহিত জাখ্যাণী কি করিবে না করিবে, তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন रहিলেও বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, জাখ্যাণেরা “পিহুডুমি” বক্ষা করিবার জন্য সর্ব সর্ক হইতে আক্রান্ত হইয়াও একক সর্ব দিকে মরিয়া হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে।

সিগফ্রিড লাইনের বরাবর ফিলড মার্শাল রুনষ্টেড পাণ্টা আক্রমণ করিতেছেন। আলশাস ও সার নদীর পূর্বপারে তীব্র আক্রমণ করিয়া জাখ্যাণেরা যেন চেষ্টা করিতেছে যে, মিত্রশক্তির বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সৈন্যবাহিনী পুনরায় আর সম্মিলিত হইতে না পারে। জাখ্যাণ-আক্রমণের ফলে রাইন নদীর পশ্চিমে ২০ মাইল জাখ্যাণ এলাকা হইতে আমেরিকান সৈন্যদলগণকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছে, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ বণাঙ্গনে এবং উত্তর-আলশাস বণাঙ্গনে জাখ্যাণীর এই পাণ্টা আক্রমণের ফলাফলের উপরেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করিতেছে বলিয়া মনে হয়। হিটলার তাঁহার সেনাপতি মার্শাল রুনষ্টেডকে বলিয়াছেন—“পশ্চিম সীমান্তে ঐতিহাসিক এই আক্রমণে যুদ্ধের চরম সিদ্ধান্তের জন্য আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব, স্থির করিয়াছি। যদি জাখ্যাণ সৈন্যদল বিজয়ী না হয়, তাহা হইলে আমার এই বাণী যেন বিদায় বাণীরূপে গ্রহণ করা হয়।” ইহার সঙ্গে সঙ্গে ১৫০ মাইলব্যাপী বণাঙ্গনে জাখ্যাণ সৈন্যের তীব্র আক্রমণ আরম্ভ হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের নব বর্ষের বক্তৃতার প্রকাশ পাইয়াছে যে, জাখ্যাণীর সাবমেরিনের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং আটলান্টিক মহাসাগরের যুদ্ধে অবিরাম সতর্কতার প্রয়োজন। গত ডিসেম্বরে সাবমেরিনের উৎপাত বৃদ্ধি পায়; ফলে মিত্রশক্তির বাণিজ্য-জাহাজের ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।

ইজ-মার্কিন মনোমালিন্যের কথা—

রুরোপের পশ্চিম বণাঙ্গনে জাখ্যাণীর কথকি প্রতি-আক্রমণ সাফল্যে শক্তি হইয়া উঠেছে। মার্কিন সৈন্যগণ

চুক্তির অধিনায়ক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সেনাপতির মধ্যে বন্টন করিবার প্রস্তাব করিতে পারে, এই সম্ভাবনা দেখিয়া “নিউইয়র্ক টাইমস” প্রকাশ হইতেই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। মার্কিন সমর-লচিব মিঃ হিউসন স্বার্থপর প্রতিআক্রমণ সম্বন্ধে জেনারেল আইজেনের নিকট রিপোর্ট তুলব করিয়া বলিয়াছেন যে, এ ব্যাপারে কোন সামরিক কণ্ঠ-চারীর ক্রটি হইয়া থাকিলে তাহার নাম চাই। গ্রীস ও ইটালীর বিশদ্বাসিগণের জন্ত প্রেরিত মার্কিন রসদ-বন্টন ব্যাপার লইয়াও ইঙ্গ-মার্কিন মনোমালিন্ত চলিতেছে বলিয়া এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বুটেন না কি আমেরিকার অধিক রসদ বিতরণের বিরোধিতা করে।

অজ্ঞাত ব্যাপারেও ইঙ্গ-মার্কিন মনোমালিন্তের আভাষ পাওয়া গিয়াছে। পোল্যান্ড, বেলজিয়ম, ইটালী, ভারতবর্ষ, ও গ্রীস চাঞ্চিল সবকারের কাছের প্রতিবাদ করিবার দাবী আমেরিকানগণ করিয়াছে ইংরেজ সাংবাদিকরা (বিশেষতঃ Economist) মার্কিন-নীতির সমালোচনা করিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মার্কিন স্বেচছপত্রগুলি তাহার পাণ্ডা জ্বাবে অনেক অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন। মার্কিন প্রতিনিধি-সভার জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন—“Why should not we criticise Mr. Churchill and his Cabinet for their activities in Belgium, Italy, India and Greece? This is imperialism running riot. We are now bearing the brunt of fight on the Western front, while Mr. Churchill masses the British Tommies to kill Greek patriots. We are fighting this war to defeat Fascism and Mr. Churchill consistently butters General Franco, while Pandit Nehru languishes in gaol in India.” ইহার উপর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এক বিবৃতিতে নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, বহু-প্রচারিত আটলান্টিক চার্টার আন্দোলিত হয় নাই। মাত্র মার্কিন জাতি নহে, এই সংবাদে সমগ্র পৃথিবীর ধাণা কাটিয়া গিয়াছে।

প্রাচ্য রণাঙ্গন—

বুটেন দাবী করিতেছে যে, তাহার বড়দিনের সময় পর্য্যন্ত উত্তর-অক্ষের প্রায় ৩০ হাজার বর্গ-মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপ-পরিভ্রাতা আকিহারা দ্বীপে ইংরেজ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। ইন্দোচীন উপকূল, স্রমাত্রা, ব্যাঙ্কক, ফ্রান্সোজা, ও জাপ দ্বীপপুঞ্জ নিয়মিত ভাবে বিমান আক্রমণ চলিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল হইতে আমেরিকানরা জাপানকে প্রায় ৩০০০ মাইল হটাওয়া দিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লুজন দ্বীপে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে।

চীনে জাপানের নবোত্তমের গতিরোধ করিবার জন্য ক্যান্টো-বিরোধী মার্শাল চিরাং কাইশেক অবশেষে ক্যান্টো-বিরোধী সহিত যুদ্ধ করিতে আগ্রহী হইয়াছেন। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ-চীনে ৩ লক্ষ জাপ-অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য চীনকে উদ্বিগ্ন হইতে হইতেছে।

তত্ত্ব লণ্ডন হইতে রায়ের সামরিক সমালোচক গত ৩০শে ডিসেম্বরে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষে সমর-বিশেষজ্ঞগণ এক মনে করেন না যে, জাপানকে অনায়াসে পরাজিত করা বাইবে জাপানে আভ্যন্তরীণ গোলামাল না হইলে, সে দেশকে পরাজিত করিতে অসম্ভব; প্রায় দুই মাস সময় লাগিবে। কারণ—

১। জাপানের সৈন্যবল অটুট আছে। নূতন সৈন্যবলও সংগৃহীত হইতেছে। জাপ-সৈন্য প্রায় ৪০ লক্ষ। ২০ লক্ষ সশস্ত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নূতন। প্রতি বৎসর জাপান ২ লক্ষ নূতন সৈ-সংগ্ৰহ করিবে।

২। বিমান-বল জাপানের যথেষ্ট। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল জাপান রকেট বিমান ব্যবহার করিতে পারে। ইতিমধ্যেই এক জাপ-বেলুনকে মার্কিন-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে দেখিয়া আমেরিক-সাবধান হইয়াছে।

৩। জাপানের নৌশক্তি বহুতাবৃত। এত জাপ-বলত নিমজ্জিত হইয়াছে যে, মনে হয়, জাপানের আর বণতবী নাই। কি মিত্রপক্ষ মনে করে যে, জাপানের এখনও বহুতব নৌবাহিনী আছে।

৪। অনেক মনে করিতেছেন যে, জাপানী পরাজিত হইবে জাপান আত্মসমর্পণ করিবে। কিন্তু এরূপ মনে হয় না। জাপ-মনে করিতেছে যে, জাপানীর পরাজয়ের পর এংলো-স্রাজ্ঞন শক্তিসম-মনে করিবে, প্রধান আপদ গিয়াছে, এইবার জাপানকে নিবৃত্ত করি-পাবিলেই হয়। তখন অতিক্রান্ত মিত্রপক্ষ বাধা হইয়া মিকাডে সহিত সাক্ষি করিবে।

৫। গোদ জাপ-দ্বীপপুঞ্জও বোম্বার্বণ প্রারম্ভ চলিতে জাপানের প্রায় সকল শ্রমশিল্পী পুরা মাল উৎপন্ন করিতেছে।

৬। জাপান প্রথমে চীনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া মিত্রপক্ষ-বিপন্ন করিতে চাহিতেছে। মাঝবিত্ত হইতে বহু সৈন্য লইয়া গি-সে মধ্য ও দক্ষিণ-চীনে সমবেত করিয়াছে।

৭। সমুদ্রে দূরবর্তী ষাঁটগুলির প্রতি নজর না দিয়া জাপ-গৃহপার্শ্বে সুরক্ষিত বকাগণী স্থাপন করিতেছে। মিত্রপক্ষের দি-দিয়াও সাত সদুদ্ব ঘুরিয়া জাপান-আক্রমণের উপযুক্ত মালমসলা সৈন্যাদি লইয়া যাওয়ার অসুবিধা আছে। কুশিয়া জাপান সম-মনোভাবের পরিবর্তন না করিলে, এংলো-স্রাজ্ঞন জাতিসম্মেলনই এ-সকল অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইবে। সোভিয়েট সরকার জাপানকে শীঘ্র ষাঁটাইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

বপ ও বাস্তব

এক দিন বৌদ্ধের শ্রদ্ধ-প্রাপ্তে স্বপন-মহির
স্বপ্নের ভ্রামল রূপ দেখেছিল এই পৃথিবীর!

শ্রীকবির মহাশয় এল বাস্তবের বাস্ত-প্রতিবাস্ত

দেখিল মিথ্যার বিব-ভ্রম-বহু বুদ্ধকার ছবি

শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায়

ভাতা বুদ্ধি

যুদ্ধের ব্যতীতে এখন সকল প্রকারই দাম ঠিকিরাছে, তখন ব্যবস্থা-পরিষদের ভাতার হার বুদ্ধি না পাইলে চলে কি করিয়া? নাকি বুদ্ধির সচিব-মণ্ডলীর বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিরোধী দলের আপত্তি সত্ত্বেও গৃহীত হইয়াছে। নতুন আইন অনুসারে সমস্ত গণ মাসিক ১০০ টাকা হইলে ২০০ টাকা এবং দৈনিক ১০ টাকা বরলে ১০ টাকা পাইবেন। আদর জানি, সমস্তদের কষ্ট দূর করিবার জন্য এই ব্যবস্থা, কিন্তু ভুল গোকে কাণ-ধূবা করিতেছে—নিজের দল কাম্বো ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের মস্তকে কাঁটাল ঢাকা হইতেছে। ব্যয়বৃদ্ধির ভার তে! জনসাধারণকেই বহন করিতে হইবে। সচিব-মণ্ডলীর কার্য-কলাপ আলোচনার বহির্ভূত। চূপ করিয়া থাকাই ভাল। আমাদের মনে হয়, এই সঙ্গে সচিব-মণ্ডলীরও বেতন বৃদ্ধি করা উচিত। আর যদি কখনও তাঁহারা সিংহাসনচ্যুত হন (কারণ, প্রকৃতি চির-পরিবর্তনশীল), তবে তাঁহারা যেন একটা মোটা বকমের গ্র্যাচুইটি বোনাস পান। দুর্ভিক্ষের জন্য সাবধান হওয়া ভাল। অনেক দেশে, বঙ্গোপস্রব সবই হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছে। ও সব নিশ্চুকের কথা। আর যদি সত্যও হয়, তবে এই মুদ্রাস্ফীতির সময়ে আরও যদি তাঁহাদের হু' পয়সা হয় তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইবার কিছুই নাই। তাঁহাদের সুব্যবস্থা ও সুপরিচালনার মূল্য দিতে হইবে না? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁহারা সশ্রু শরীরে সুদীর্ঘ কাল সচিব করুন। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই হাতে। জনসাধারণ মরে মরুক, ক্ষয়, বস্ত্র, শিক্ষার অভাব ঘটে যটুক, তাঁহাদের যেন কোন কষ্ট না হয়। বাঙ্গালা বলিতে তো তাঁহাদেরই বুঝ, জনসাধারণ কে?



সম্প্রদায়িক খেল

পরাধে দান অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। পরের দ্রব্য দান করার মত আনন্দ আর কিছুতে নাই। বাঙ্গালী দেশের লোক পেট ভরিয়া বাইতে পাইতেছে না, কিন্তু "অভিশর বিবর্ত" হইতে ভার গিয়াছে, বাঙ্গালা-সরকার ভারত সরকারের

নিকট হইতে অধিকতর চাউল দাবী করা দূরের কথা, তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট প্রচুর পরিমাণে চাউল বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, রপ্তানীর ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হইবে। ইহা ছাড়া আরও জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার কলিকাতার খাদ্য যোগানোর অর্থ ত্যাগ করিতে চাহেন। ষ্ট্যান্ডিং ফুড এন্ডভাইসারী কমিটির সকল সদস্যই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। এমন কি, বাঙ্গালা দেশের সমস্তরা পর্যন্ত সতি করিয়াছেন। এ যে কি খেল, বোকা শক্ত।

এ দিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সমস্তদের প্রেরণারও জানা গিয়াছে যে, (১) বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলায় সরকারী একেটকে যে দামে চাউল ক্রয় করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে, তাহারা চাষীদের নিকট হইতে নিশ্চিষ্ট মূল্যের অনেক কম দামে ক্রয় করে। (২) পল্লী অঞ্চলের গুলাম সমূহ ভরিয়া বাওয়ার জন্য একেটকের চাউল কিনিবার অধিকার হইতেছে। (৩) একেটকরা গুলাম স্থানান্তর বলিয়া চাউল কিনিতেছে না; কল চাউলের দাম অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

খাজ-সচিব বলিয়াছেন, এই সকল কারণে যদি বাঙ্গালার মুক্ত নিশ্চিষ্ট সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম দামে, তাহা হইলে সরকার তখনই সমস্ত চাউল কিনিয়া লইয়া মুসোর অধোগতি বন্ধ করিবেন। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কম মূল্যে মাল বরাদ্দ করিয়া লইবেন। যিনি গরীব চাষীরা আর বুনাফা করিবে সরকার আর একেটকরা। এ-ও এক খেল।

বালকদের মোট্রিনিকেশ খেলার ডেকের প্রাথমিক হইয়াছিল, এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

ফুড কমিশন

বাড়িতে আশ্রয় লাগিলে প্রথমে গৃহবাসীদের বাঁচাইয়া পরে আশ্রয় লাগিবার কারণ নির্ণয় করা কর্তব্য। আজ-কাল সবই উট্টা। দুর্ভিক্ষ মিটিয়া গেলে কমিশন বসে। কার দোষ নির্ণয়ের জন্য অর্থ ও বুদ্ধি ব্যয় হয়। দুর্ভিক্ষের সময় সবাই চূপ-চাপ থাকে। কিছু দিন কাটে রিপোর্ট তৈয়ারী করিতে, কিছু দিন কাটে সরকারী লগুদখানার পেশ করিতে। তাহার পর সেই রিপোর্ট খাইলের ভলায় চাপা পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ সেই রিপোর্টে বিশেষ কোন ফল হয় না। শুনা বাইতেছে, দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট মার্চ মাস নাগাদ প্রকাশিত হইবে। তাহাতে না কি বাঙ্গালা ও ভারত সরকারের দোষ দালনের চেষ্টা করা হইয়াছে। "তাঁহারা দেখাইতে চাহিবেন যে, এমন কতকগুলি অবস্থার জন্য এই দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছে যে, কোন একটি কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলে না।" কথাটা খুবই জায়া। দোষ জনসাধারণের। তাহারা মরিল কেন? ইহা শ্রেয় সরকারের বিরুদ্ধে বড়বস্ত্র। ইচ্ছা করিয়া দল বাঁধিয়া তাহারা না বাঁধিয়া মরিয়াছে। এই ধরনের একটি রিপোর্টেরই আশা করিতেছি। শুধু অপেক্ষা করা প্রয়োজন, বহি সূত্রে যেওয়া কল।

"কিন্তু"

বুটেলের সত্তর শেষ করিয়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিমিথিলপ আমেরিকায় গিয়াছেন—সেখানকার বৃত্তান্ততন শিল্পাভি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-কার্য লক্ষ্য করিতে। ফুডোত্তর ভারতের পুনর্গঠনে এই সব শিক্ষা অনেক কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু—এই "কিন্তু" সম্বন্ধে ডাঃ মেঘনার সাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রশংসনযোগ্য এবং অত্যন্ত ঠাট্টা কথা। তিনি বলিয়াছেন যে, শিল্পোন্নতিই সমৃদ্ধির মূল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই শিল্প নিয়ন্ত্রণের মৌলিক কর্তব্য জাতির নিজের হাতে থাকা আবশ্যক—আর সেই কর্তৃত্বলাভ স্বাধীনতা লাভেরই নামান্তর। এই "কিন্তু"র সমাধান আজ অবধি হয় নাই। যুদ্ধের পরও হইবে কি না, সে বিষয়ে বিলম্ব সন্দেহ আছে।

ভুলাতাইএর দোতা

আমেরিকার বিদ্যায় সম্বন্ধে কয়েকজন বাঙালীর কথা

মুখোশে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। ইংরেজী নববর্ষের প্রারম্ভেই এই জাতিয়ারী শ্রীযুত ভূলাভাই দেশাই ওয়াছাঁর মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সংবাদ-পরিবেশকগণ অনুমান করিয়াছেন। অনেকে এমন অনুমানও করিতেছেন যে, গান্ধীজীর সহিত এই সাক্ষাতের ফলাফলের উপর কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মুক্তিলাভ নির্ভর করিতেছে। সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অঙ্কমতিও তিনি লাভ করিয়াছেন। শ্রবণ থাকিতে পারে যে, কেন্দ্রী পরিষদের নভেম্বর অধিবেশনের সময় পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত ভূলাভাই দেশাইয়ের সহিত ভারতের রাজনীতিক সঙ্ঘটন সব্বকে বড়লাটের আলোচনা হয়। বড়লাট না কি সে সময় শ্রীযুত ভূলাভাইকে বলেন যে, তিনি ভারত আইনের ১৩ ধারা প্রয়োগের অবসান ঘটাইয়া বিভিন্ন প্রদেশে গণ-নিরীক্ষাচিত মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত দেখিতে আগ্রহবান। তিনি এ আশ্বাসও না কি দেন যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া কেন্দ্রী সরকারের কংগ্রেসের দাবীগুলি স্বাভাসম্ভব মানিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। তবে ভারত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গল-বঙ্গল করিতে বৃটিশ পার্লামেন্ট নারাজ।

সে সময় শ্রীযুত ভূলাভাই না কি বড়লাটকে জানান যে, গণ-প্রতিনিধি হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে কংগ্রেস সর্বদাই সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। ইহা না হইলে সমর-প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া যাইবে না। কংগ্রেস দল বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পুনরায় প্রস্তুত কি না, সে সব্বকে শ্রীযুত ভূলাভাই বলেন, এই বিষয়ে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিই মত প্রকাশ করিতে পারেন; তবে তিনি বড়লাটকে এ কথা জানান যে, আপনাদের দাবী পূরণের জন্য কংগ্রেস কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সমর্থন করেন নাই। কংগ্রেস সর্বদাই ইংরেজদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াই অতীষ্ট লাভ করিতে চাহেন। সুতরাং বড়লাটের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে—কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদিগকে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সুযোগ দান করা।

পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে না, বড়লাট এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে শ্রীযুত ভূলাভাই দেশাই না কি বলেন যে, যখন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁহার সাম্প্রতিক বিরুদ্ধিতা হস্তে সম্পূর্ণ ভাবায় এ সব্বকে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এরূপ প্রতিজ্ঞার আর প্রয়োজন হইবে না। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি গান্ধীজীর পরামর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না।

বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের গোষ্ঠী-চ্যুত হইবার অধিকারোন্মোশ করিলেই ক্রিপসু-প্রস্তাব কতকটা চলনসই হয়। শ্রীযুত শাস্ত্রীর মতও উহাই। কতটুকু অঙ্গল-বঙ্গল করিলে ক্রিপসু গ্রহণযোগ্য হয়, সঙ্কট-কমিটি তাহাবই তথ্যানুসন্ধান মনে করিয়াছেন। ইংরেজ বলিয়াছিল যে, যুদ্ধ চলিবার সময় তাত্ত্বিক কোন পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু এ যে অচল, তাহা টানের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় মহাসঙ্ঘটনের মধ্যেও মার্শাল চিহ্নাঃ কাঠশেক ব্যাপক শাসন সংস্কার-সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মুখোশের পিছি দেশেও গুরুত্বপূর্ণ শাসনতাত্ত্বিক পরিবর্তনে অনেক ক্ষেত্রেই ই সম্মতি দিতেছে। অথচ এ দেশে তাহারা গণদাবী উপেক্ষা বিভিন্ন প্রদেশে ১৩ ধারার জোরে স্বৈর-শাসন চালাইতে কুচিত্রিত হ্রবে থাকুক, সেই স্বৈরতন্ত্রকে সাহায্য করিবার ভক্ত হইতনামাঃ অবস্থিত হইতে বলিতেছে।

অধ্যাপকের কুতিত

আশুতোষ কলেজের ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রেমচাঁদ আইচাঁদ বৃত্তি পায়ক্যামণ্ডিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ছন্দ সম্পর্কে গবেষণা 'বঙ্গীয় ছন্দো-মীমাংসা' নামে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে প্রবন্ধ তিনি কবিতাছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ তাহাতে ভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হইতেছে এই যে, এত দিন এ বৃত্তি-পরীক্ষার কক্ষ পরীক্ষক ইংরেজীভেদী প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন, কিন্তু তারাপদ বাবু ই রচনার গন্ত্যগতিক গৌরবের প্রাক্কান্য রাখা কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষার হ্রাসে তাঁহার এই সংসাহস এবং সাফল্য একটি পবিত্র ঘটনাকালি অজ্ঞাত হইবে না।

পাঠকদিগের শ্রবণ ধাক্কা দান, ইতিপূর্বে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য বঙ্গভাষাতেই লিখিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রথম পি-আ তারাপদ বাবু এবং প্রথম পি-এইচ-ডি বিমানবিহারী বাবুর দু' অনুপ্রাণিত হইয়া বিদগ্ধজন দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিস্তার মাড়ুভাষা আলোচনা করুন, ইতাই কামনা।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ১০তম অধিবেশন কানপুরে ৭ নভেম্বর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের ১৪শে হইতে ২০ তারিখ পর্যন্ত অধিবেশনের কার্য চালান হয়। অধিবেশনের কার্য নিয়ে প্রস্তুত হইল।

২৪শে ডিসেম্বর, রবিবার—মূল সম্মেলনের উদ্বোধন ও বিটি মূল সভাপতি—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা শাখা ও প্রদর্শনী—সভাপতি শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ।

শিল্পশাখা ও প্রদর্শনী—সভাপতি শ্রীযুত অরুণকুমার গা পাধ্যায়।

২৫শে ডিসেম্বর, সোমবার—সকাল ১টা সাহিত্যসাধার অধিবে

ক্রিপসু-প্রস্তাব চলনসই করিবার চেষ্টা

অত্র দিকে সার তেজবাহাদুর সফর কমিশনিয়েসন কমিটি (আপোষ সমিতি) যেন এক দিকে কংগ্রেস ও সরকার এবং অত্র দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ মনোবৃত্তির পুষ্টি করিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এক মূল সূত্র নির্ণয়ের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আবার ক্রিপসু-প্রস্তাবগুলির কথাও বিশিষ্টদের মুখে মুখে শুনা যাইতেছে। শ্রীযুত রাজাগোপালাচাচারি ত বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন যে, প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া অমান্যনীয় রাজনীতিক ভুল হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাঁহার দলে কংগ্রেস দলের আরও দুই-এক জন ভিড়িয়াছেন। ডাঃ ভায়াপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বড়দিনে হিন্দু মহাসঙ্ঘার বৈঠকে

—সভাপতি ঈশ্বর তারারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যশাখার
অন্ত্য শাখার অধিবেশনও এই সঙ্গেই হয়।

অপরায় ২১০ মিঃ—সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি শাখার অধিবেশন

—সভাপতি ঈশ্বর ধুর্ভটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অপরায় ৪১০ মিঃ—ইতিহাস ও সংস্কৃতি-শাখার অধিবেশন—

সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অপরায় ২১০ মিঃ মহিলা-শাখার অধিবেশন—শিশু ও কিশোর-
সম্মেলন।

২৬শ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—সকাল ৯টা বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার
অধিবেশন—সভাপতি রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ।

অপরায় ২টা বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন—সভাপতি ডাঃ মহম্মদ
কুদরত এ খান।

নাখল ভারত হিন্দু মহাসভা

ডিসেম্বর ২৪শে হইতে ২৬শে তারিখ পর্যন্ত বিলাসপুর সহরে ডাঃ
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার
২৬তম অধিবেশন হয়। বার সভারকর তিন দিনের প্রকাশ
অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন। বিলাসপুর ডাঃ মুন্সের জগদ্বান।
বক্তৃত্ব-প্রসঙ্গে বার সভারকর বলেন—এমন এক সময় ছিল যখন
ডাঃ মুন্সে হিন্দু সম্মেলনের জন্য সমস্ত ভারতের ১২১৪ জন লোককে
একত্র করিতে হিম্মতম বাইয়া ব্যতীতেন। আজ তাঁহারই অনুস্থানে
মহত্ম মহত্ম যুগের তাহারই মতবাদে দীক্ষিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে,
এ দৃষ্ট দেখিবার পর ডাঃ মুন্সে শান্তিতে মরিতে পারিবেন। স্বাধীন
ভারতের,—মহাসভার প্রস্তাবে বাহার নাম হিন্দুস্থান হইবে,—ভাবী
শাসনতন্ত্রের মূল গঠন্য নীতি সম্বন্ধে ও স্বাধীন ভারতের অধিবাসীদের
মূল নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবগুলিই বোধ হয় এই
অধিবেশনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতি-বন্ধ-নিষ্কলিষে
সকলের সমান নাগরিক অধিকার ও সংখ্যানুপাতে ব্যবস্থা সভায়
প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার থাকিবে। ‘হিন্দুস্থান’ সর্বভোভাবে
এক এবং তাহাকে ব্যবচ্ছেদ করা চলিবে না। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম,
সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ভাবী রাষ্ট্র স্বত্ব ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের
স্বার্থরক্ষা ও শোষণ হইতে অব্যাহতি দানে কৃতসংকল্প। বেকারদের
জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

আমেরিকায় অপপ্রচার

আমেরিকায় ইণ্টারন্যাশনাল বিজনেশ কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধি-
দের ডেপুটি লিডার মিঃ মেটা ভারতে ফিরিয়া জানাইয়াছেন যে,
অপপ্রচার দ্বারা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, বিশেষতঃ কংগ্রেস সম্বন্ধে
মার্কিন-মহান বিষাক্ত করা হইয়াছে। লর্ড হাটফোর্ডের পরিচালনে
বৃটিশ দৌত্যবাসী এই অপপ্রচারের জন্য ভারতবাসীর কষ্টাঙ্কিত লক্ষ
লক্ষ মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতেছে। ভারত সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য
আমেরিকাকে জানিতে দেওয়া হয় না। এমন কি, মিসেস পার্ল বাক,
সাহার স্বামী মিঃ ওয়ালস্, মিঃ লুই ফিলার, মিঃ লিন-মুতা, মিঃ
নথান টমাস প্রভৃতি বাহারা ভারত-বৈতন্য, তাঁহারাও অভিযোগ
করিয়াছেন যে, ভারতের কোন খবরই তাঁহারা পান না। মিঃ মেটা

জানাইয়াছেন যে, ভারত হইতে কেহ আমেরিকার গেল যাকি
জনসাধারণের সহিত তাঁহাকে পরিচিত হইবার কোন সুযোগই দেওয়া
হয় না। ‘হিন্দু’র লেখন্য সংবাদমাতাও এই অভিযোগ করিয়া
বলিয়াছেন যে, মার্কিন সরকারের বাহারা ভারতীয় ব্যাপারের সহিত
সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা মাত্র বৃটিশ সরকারী বা বর্ধ সরকারী ভরব হইতে
প্রাপ্ত সংবাদই মূল্য প্রদান করেন।

ভারত-বিজ্ঞান-কংগ্রেস

ভারতের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশন নারপুরে অনুষ্ঠিত হয়।
৩রা জানুয়ারী ১৯৪৫ হইতে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত অধিবেশন
চল। সার শান্তিবর্ষণ ভাটনগর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি
জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদের সহিত ইলেক্ট্রন থাকার তাঁহার
প্রেরিত অভিভাষণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু পাঠ করেন। কার্ণহুস্তী
নিরে প্রদত্ত হইল।

৩রা জানুয়ারী, বৃহস্পতি—পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার, নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব
শাখার, চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ।
বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনা।

৪টা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—রসায়ন-শাখার, গণিত ও সঙ্খ্য-
বিজ্ঞান-শাখার, উদ্ভিদবিজ্ঞান-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ।
বিভাগীয় আলোচনা।

৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার—ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাতুবিজ্ঞান-শাখার, কৃষি-
বিজ্ঞান-শাখার, শারীরবিজ্ঞান-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ।
বিভাগীয় আলোচনা।

৬ই জানুয়ারী, শনিবার—প্রাণিবিজ্ঞান ও পশুবিজ্ঞান শাখার,
ভূতত্ত্ব ও ভূগোল-শাখার, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সভাপতিদের
অভিভাষণ। বিভাগীয় আলোচনা।

৭ই জানুয়ারী, রবিবার—রামতেক খিনসি ও মানসার ব্যাবানীজ
খিনিতে ভ্রমণ।

বিভিন্ন শাখার সভাপতি

গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞান—ডাঃ বি.এন.প্রসাদ, (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)

পদার্থ-বিজ্ঞান—ডাঃ আর. সি. মজুমদার (দিল্লী)

রসায়ন—ডাঃ কে. বেক্ট রমন (বোম্বাই)

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল—মিঃ এন. এন. চ্যাটার্জী (প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা)

উদ্ভিদবিজ্ঞান—অধ্যাপক জি. পি. মজুমদার ()

প্রাণিবিজ্ঞান ও পশুবিজ্ঞান—ডাঃ এইচ. এন. রায় (ইম্পিরিয়াল
জেট্রিনিয়ারি কুমারন)

নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব—ডাঃ এ. আইয়ারায়ান (গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম, মাদ্রাজ)

চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান—অধ্যাপক এস. ভল্লিউ, হাম্বুর

(ওমানিয়া মেডিকেল কলেজ হাম্বুর্গাবাদ)

কৃষিবিজ্ঞান—অধ্যাপক এন. ডি. বোশী (মাদ্রাজ কলেজ, পুণা)

শারীরবিজ্ঞান—ডাঃ বি. মুখার্জী (বাইও-মিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন
লেবরেটরি, কলিকাতা)

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান—মিঃ বি. এ. স্বামী (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়)

ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাতুবিজ্ঞান—রায় বাহাদুর এ. এন. খোসলা

(পাঞ্জাব স্টেট বিভাগ, পাঞ্জাব)

আমেরিকা ও ব্রুটেন প্রচার

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকায় গিয়া এই ভারত-বিষেব বুদ্ধি কথঞ্চিৎ প্রশমন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিষ্টার রুজভেল্টের পত্নী মিসেস রুজভেল্ট হোয়াইট হাউসে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীকে অভ্যর্থিত করিতে অসম্মত হইয়াছেন, তবু ডাঃ তারকনাথ দাস, মিঃ জি এল কাল-প্রমুখ ইণ্ডিয়ান লীগ অব আমেরিকার সদস্যগণ নিউইয়র্ক-প্রবাসী ভারতীয়দিগের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীকে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, গ্রাহ্যের খাতিরেও ব্রিটিশ সরকার যদি আরও কয় জন প্রকৃত ভারতীয় নেতাকে এদেশে আসিতে দিতেন!

ভারতবাসীর প্রতি এংলো-শাস্ত্রান্ন শ্রেষ্ঠাসদের বিধেব আজ নূতন নহে; তবু ইহাদের চিত্ত-চিপটিত রসসিক্ত করিবার জ্ঞান কি আমেরিকায় কি ব্রুটেনে প্রবাসী ভারতবাসীর বাক্যবিস্তার দ্বারা যত দূর সম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতে সাংবাদিক মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে এবং মিঃ রেজিনাল্ড রেনল্ডস প্রভৃতির ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম ক্যাম্পেইন আসন্ন ব্রিটিশ পালামেন্টের নিকটস্থ। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। বাক্য দ্বারা সম্রাট জাতির চিত্ত ও রক্ত হইতে সাম্রাজ্যবাদ বন্ধুরা লুপ্ত করিতে পারিবেন কি?

জাতিগত বিশেষত্ব

শ্রীযুক্ত গগনবোহরী লাল মেটার দৃষ্টিশক্তির তারিফ করিতে হয়। সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় তিনি না কি একটি ছোট গল্পের দ্বারা বিভিন্ন জাতির বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশেষত্বটি সত্যই উপভোগ্য। গল্পটি নিয়ে প্রসন্ন হইল। ঘুরাপের কোন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতির ছাত্র একত্রে অধ্যয়ন করিত। এক দিন শিক্ষক তাহাদের হস্তী সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা করিতে দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্র লিখিল, হস্তী-শিকার সম্বন্ধে। ফরাসী রচিল হস্তীর প্রেমবিলাস সম্বন্ধে একটি কবিতা। পোল্যান্ডবাসীর প্রবন্ধ, হস্তী ও পোলিশ সম্রাট। জাখ্যাণ রচনা করিয়া ফেলিল, ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি স্মৃতিগ্রন্থ, নাম দিল, হস্তীতত্ত্বের ভূমিকা। আর মার্কিন লিখিল, বৃহত্তর ও উন্নততর হস্তী উৎপাদনের সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। বিদ্যালয়ে আজকালকার ভারতীয় ছাত্র থাকিলে হস্তী ও পাকিস্থান সম্পর্কে অন্ততঃ একটি প্রবন্ধ যে পাওয়া যাইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বুদ্ধির গুঁড়ি

ঢাকার সরকারী গুনামে রক্ষিত ৪২ হাজার মণ পাচা আটা জিলা ফুড কমিটি কর্তৃক নষ্ট করিয়া ফেলিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য প্রথমে বিক্রয় করিবার বহুবিধ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকাবাসী কেহই তাহা খরিদ করিতে রাজী হয় নাই। অগত্যা! লোকে অনাহারে, অধ্বাহারে মরিতেছে। সেই সময় এত আটা গুনামজাত করিয়া, বিক্রয় করিয়া, অবশেষে নষ্ট করিয়া ফেলা অসম্ভব! আর এই ব্যর্থতার বহন করিবে কে? সচিবদের বুদ্ধির গুঁড়ি মাশিবার মত মেজাজি টেপ মেলা কঠিন!

শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা

২৭শে পৌষ বৃহস্পতিবার সকালে সিনেট হলে ডাঃ শ্রামা মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদিগে সভায় শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্ব মুক্তির সম্মান পাইবে। সকল নিকট দাসত্ব একই বস্তু। ইহাকে কখনও ভাগ করিয়া লওয়া না। স্বতরাং শোষকের করাল গ্রাস হইতে নিখিল বিশ্বের নিঃমানবকে মুক্ত কর। তোমাদের শিক্ষা যেন সে পথে প্রসারিত মহান ও উদার আদর্শ লইয়া মানবতার মুক্তির জন্য অগ্রসর ভৌগোলিক বাধা-বন্ধন যেন তোমাদের অগ্রগতি প্রহত না করে

ডাঃ সরসীলাল সরকার

অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সার্জন ডাঃ সরসীলাল সরকার ১০ই পৌষ রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ হইয়াছিল। তিনি এনএসসি ও এফএ পদাধিকার বৃত্তি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এল-এম-এস লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করেন। ১৮৯৯ সহঃ-সার্জন হিসাবে সরকারী কার্যে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৫ সিনিয়র সার্জন পদে উন্নীত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিন বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরস্কার বোধ হয় একমাত্র তিনিই লাভ করিয়া ডাঃ সরকারই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, বেরিবারি রোগে বাজারের সরিষার তৈল। গত দুইশকের সময় আর্তসেবা সভাপতি হিসাবে তিনি দুর্গত জনগণের প্রত্নত সেবা করি কেবল চিকিৎসাবিহীন নহে, সাহিত্যেও তাঁহার অগ্রগতি ছিল। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত “মনের কথা” ও “রবীন্দ্রী পরিকল্পনা” তাহারই রচিত। তাঁহার দ্বী, দুই কল্পা ও বর্তমান। আমরা তাঁহার শোকান্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মনোবী রোম্যা রোল

জগদ্বিখ্যাত মনোবী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক রোম্যা রোল ১৫ই পৌষ পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক মাস যাব নিখোজ ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার তাহাকে খুঁজিয়া পান। তাঁহার তিরোধানের বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাত্রেই ব্যথিত। রোম্যা ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। কিন্তু এ সবার উপর তিনি দার্শনিক, মানবপ্রেমিক, সার্বভৌম শান্তি ও বিশ্বমেত্রীর তাঁহার এই বিশ্বশ্রীতির জন্য তাঁহাকে জীবনে বহু বিড় করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিজের মতবাদ ও আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার সাধনার প্রতি তাঁহার স্বগভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধার ভ করিয়াছেন তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের জীবনী লিখিয়া। বিনোদ আমাদের বৃকে পরমাত্মীয় বিনোদের মতই আঘাত

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ‘বহুমতী’ রোটারী বেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত



সাম্প্রদায়িক সমতা অর্থাৎ
হিন্দু মুসলিম সমতা-স্বপ্নী
বিবরু ভারতের মাটি থেকে জন্মগ্রহণ
করেনি। এর আয়ুও বেশী দিনের
নয় আর আপনা হতেই প্রাকৃতিক
দুর্বিপাকে এর জন্ম নয়। মানুষের
দ্বারাই এর সৃষ্টি এবং পুষ্টি।

১১০৭ খৃষ্টাব্দে বাইট অনাবেবল হিজ হাইনেস দি আগা খান
জদানীস্তন বঙলাট লর্ড মিন্টোর নিকট মুসলিমদের জঙ্গ পৃথক্
নির্ব্বাচন চাই এই উদ্দেশ্যে দরবার করেন। এই দরবার
সম্বন্ধে তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মোলানা মহম্মদ আলি
বলেন—এটা একটা 'হুকুমী দরবার'। অর্থাৎ এই যে, উচ্চতর
রাজশক্তির নির্দেশে (হুকুমে) এই দরবার শেষ করা হয়েছিল।
সেই সময় রাষ্ট্রমন্ডিত ছিলেন লর্ড মর্লে, লিবারাল দলের নেতা। তিনি
এই হীন বড় যন্ত্রে অর্থাৎ পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকতে
রাজী ছিলেন না। তাই বড়লাটকে তিনি লিখে পাঠালেন—
"I won't follow you again into our Mohametan
dispute. Only I respectfully remind you once
more that it was your early speech about their
extra claims that first started the Moslem here."

পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথা আবিষ্কারের জঙ্গ রাজশক্তিই সর্ব্বতোভাবে
দায়ী ছিল। উদ্দেশ্য ভারতের গণমত এবং জাতীয়তা গঠনের
অস্ত্রবায় সৃষ্টি করা। প্রমাণ ভুটে গেল অতি অল্পত ভাবে। সেডি
মিন্টোর ডায়েরী থেকে একটি পত্র পাওয়া গেল। মুসলিমদের জঙ্গ
পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে এক জন অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি
লিখেছেন—"I must send your Excellency, a line to
say that a very big thing has happened today,
a work of statesmanship that will affect India
and Indian history for many a long year. It
is nothing less than the putting back of sixty

সাম্প্রদায়িক সমতা ও সমাধান

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

two million of people
from joining the ranks
of seditious opposition."

ইনি মনে করেছিলেন—'ডিভাইড
এণ্ড রুল'-নীতিই ভারতবর্ষে অব-
লম্বনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি। এই যে
মুসলিমরা পৃথক্ নির্ব্বাচনের ধ্বা

তুলেছে এর পিছনে আছেন কোন কূটনৈতিক রাজকর্ম্মচারী।
মুসলিমদের এই পুতুল-নাচের সূতো ধরা আছে ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের
হাতে। ষ্ট্যাচুটারী সাইমন কমিশনের ইণ্ডিয়ান সেক্ট্রাল কমিটির
রিপোর্টেও এ কথাই স্বীকারোক্তি আছে।

"That there was no spontaneous demand by
the Moslem at that time for separte electorate
but it was only put forward by them at the insti-
gation of an official whose name is wellknown."

এ কথা মরণ রথতে হবে যে, সেই ডেপুটেশনকে লর্ড মিন্টো
পৃথক্ নির্ব্বাচন অধিকার দিতে রাজী হয়েছিলেন এক সর্ভে। যেখানে
মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ, কেবল মাত্র সেইখানেই এই প্রথা প্রযোজ্য।
কিন্তু সেই থেকেই ভারত জুড়ে মুসলিমদের জঙ্গ পৃথক্ নির্ব্বাচনের
দাবী নিয়ে হেঁচ-চৈ আরম্ভ হয়ে গেল; আর তাতে তারা প্রকাজ্ঞে
এবং পর্দার আড়াল থেকে সাহায্য ও উৎসাহ পেলে ব্রিটিশ রাজশক্তির।
ভারতের রাজনীতির মাটিতে চিরকালের জঙ্গ বিবরুকে রোপিত হ'ল।
পৃথক্ নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এলো ব্যবস্থা সভায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের
প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও তাদের সংখ্যা-নির্ণয়ের প্রশ্ন। ভারতবর্ষকে
ফালি ফালি করে বিভক্ত করলে সেই বিবাক্ত ছুরি। যার ফলে শেষ
পর্যন্ত আজ পাকিস্তান পরিকল্পনা এসে উপস্থিত হ'ল।

পাকিস্তান পরিকল্পনা সাম্প্রদায়িক সমতার সমাধান করতে চায়
দুই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়ে। ভারতকে দুই ভাগে
বিভক্ত করে এক ভাগে থাকবে কেবল হিন্দু আর এক ভাগে কেবল
মুসলিম। তাহলে নাগরিক অধিকারের জঙ্গ আর আপোষে বন্ধ

হবে না। কিন্তু এই পরিকল্পনা কখনই কার্যকরী হতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে কোন দিন কেবল মাত্র একটি সম্প্রদায় নিয়ে জাতি অথবা রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। সর্বত্রই বহু সম্প্রদায় নিয়ে জাতি এবং রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অপর সম্প্রদায়গুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ সমতা চিরকালের, প্রতী দেশের। কালির এক আঁচড়ে তার সমাধান হয় না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিলিত চেষ্টায় এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। জাতিধর্ম-নির্কিশোষে নিজেদের মনোমালিন্য ভুলে একত্র হয়ে দেশের সকলকে নিয়ে করতে হবে তার সমাধান।

ভারতবর্ষের অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সমস্যা রুশিয়া ও যুক্তরাজ্যকেও এক সময় বিব্রত করে তুলেছিল, কিন্তু তারা আজ অনেক পথমাণে গার সমাধান করে এনেছে। ভারতবর্ষ আজ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করছে, তখন তাদের নিয়মতন্ত্রের অনুকরণ করতে দোষ কি? ভাগাভাগি, পৃথক্ নির্বাচন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ইত্যাদির গণ্ডগোল যুক্তরাজ্যে শেষ হয়ে গেল Civil War-এর সঙ্গে সঙ্গে এবং তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিংকনের এক কথায়—“The Union of the State is perpetual.”

রুশিয়ার সমাধান-পদ্ধতি কিন্তু অনুরূপ। সেখানকার সম্প্রদায়-সমস্যা ভারী গোলমালে। এক শত আশী বিভিন্ন জাতি, এক শত একাদ্র ভাষা, তেত্রিশটি রিপাবলিক। প্রত্যেকের আবার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি। কিন্তু এত বিভক্তি সত্ত্বেও রুশিয়া এক। এক রাষ্ট্রই পরিচালনা করছে সবাইকে। কতখানি কৃতিত্ব! সেই কৃতিত্বের পরিচয় আজ পাওয়া যাচ্ছে রবান্দনে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

সামরিক শক্তিকে আজ তারা করেছে কোণ-ঠাসা। নিজেদের মনের প্রাণের মিল না থাকলে তা কখনই সম্ভব হ'ত না।

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা মাছুষের দ্বারা সৃষ্ট এক পৃষ্ঠ সমস্যা সেদিনের। ভারতের সরস মাটিতে ঐ ধরনের বিবিকল কখনও জন্মায়নি। আর এই সমস্যা রুশিয়ার মত এত দুরূহ তার চেয়ে অনেক সোজা। অথচ সমাধান হচ্ছে না কেন? এই সর্বনাশী বহির ইন্ধন জোগাচ্ছে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিবাদ। চি ভারতের লোকেরা ভারতবাসী নামেই পরিচয় দিয়ে এসেছে। সেদিন আবিস্কৃত হল ভারতের বাসিন্দা ভারতবাসী নয়। তা বিভিন্ন জাতি—হিন্দু আর মুসলিম। ধর্ম দিয়ে জাতীয়তা নাগরিক অধিকার বিচার করা চলে না। হিন্দু অথবা মুসলিম ধর্ম বদল করে তবু তারা ভারতবাসীই থাকবে। যা ক্রটি সম্ভব হয়েছে তা ভারতবর্ষেও সম্ভব হবে। সে জন্ম জ ভাঙ্গবার দরকার নেই, দেশকে ব্যবচ্ছেদ করবার প্রা নেই। যদি এমন এক ফেডারেল কন্ট্রোলের সৃষ্টি হয়, যে সেই সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে যা জাতিধর্ম নিতি প্রত্যেকেরই সমস্যা; যেমন—মিলিটারী, ডিফেন্স, শুল্ক, যান ব্যবসায়িক চুক্তি, মুদ্রা ও তার বিনিময়ের হার ইত্যাদি, অথচ সম্প্রদায়ের অথবা ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না তবেই সমাধান হতে পারে। কিন্তু ভারতে তা কি সম্ভব হবে মিলনের ভিত্তির উপর একে গড়ে তুলতে হবে তারই মূলে কুঠারাবাত। তবু ভারতকে এক হয়ে চেষ্টা করতে হবে সমা ভূলে যেতে হবে সকল আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য। স্বাধীন ভাে তুলে বাঁচতে হলে, এ ছাড়া অল্প কোন পথ নেই।

কে?

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কি জানি কেমন ছোঁয়া সে—

মেঘে ও মাটিতে ভুল হয়! হেরি

চাঁদিনী দিনের আকাশে।

জনতায় মরু সে আনে :

স্বপ্নেতে ডুবায় খেয়ানে,

কি-সুর বাজায় পাতার নুপুরে

অশখ-বনের বাতাসে!

বুঝি না সে ছায়া-লীলায়ে—

ধরিবারে ঘাই, পলাকে হারাই

—হলায় ভাঁটা ও জোয়ারে

ধুলিরে করে সে ধরনী,

তরু হ'তে চায় তরঙ্গী,

মাগব-বারতা ব'য়ে আনে যেন

শিশির-কোঁটার আভায়ে

“নববলমধুপানমন্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, দ্বিজিত, কামোদমন্ত, আপাদমস্তক সুবাসিত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাসী, জড়সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ পরখনাপহরণপরাধ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাঙ্ঘ-বান্ধ, দেহপোধৈকজীবন :—ভারতবাসীর চক্ষু পাশ্চাত্য অশ্বর।”—বিবেকানন্দ

শরৎচন্দ্র

তারারন্ধর বন্দোপাধ্যায়

মাহুঘের ইতিহাসে এক একটা কাল এক এক জন মাহুঘের প্রভাবে এমন প্রভাবান্বিত হয় যে, সেই কাল বা নিরবচ্ছিন্ন কালের সেই খণ্ডাংশ সেই মাহুঘের নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে—মানে হয়, কালের প্রভাব সেই মাহুঘের মধ্য দিয়ে রূপ গ্রহণ করেছিল। সেই মাহুঘের নামকে সগৌরবে নিজের আগে স্থান দিয়ে কাল স্বীকার করে যে আমাকে সে জেনেছিল—আমাকে সে চিনেছিল—তাই আমি তার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম—তাই সে আমার সঙ্গে একান্ত হবার গৌরব লাভ করেছে। মরণের মধ্যেও সে তাই অমৃতত্ব লাভ করেছে।

বাঙালীর বিগত দু'শো বৎসরের জীবনক্ষেত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই কালে বাঙালীর জীবন বিকাশ লাভ করেছে—সাহিত্যে, সমাজক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতে। পরাধীন জাতির জীবনকে বন্দী মাহুঘের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে বিমুগ্ধতা ভুল হবে না। গরাদে ঘেরা জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনকে দূরে স্রুয়ে প্রসারিত করে দিয়ে সে জীবনকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, বাইরের মুক্ত পৃথিবীর কল্পনা করেছে, আকাশের নীলের বার্তাকে সে সঙ্গীতে পরিণত করেছে, বৃহত্তর মহত্তর মুক্ত জীবন ভাবনায় ভাবিত হয়ে সে বন্ধ জীবনেই তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্রের পক্ষীরাজের অভিযানের কাহিনী রচনা করেছে, আবার ক্রম-উপলব্ধির ফলে—বন্দীশালায় নিজেদের জীবন-ব্যতীর কথা নিয়ে গান কাহিনী রচনা করে সমগ্র বন্দীশালায় তুলেছে নূতন ভাবের আলোড়ন, সেই বাস্তব দুঃখের করুণ গানের আনন্দ-রসে জীবনের বেদনাকে সুখাস্বাদী সঞ্জীবনীতে পরিণত করতে চেয়েছে। এই বাঙালীর সাহিত্য। রাজনীতি—সমাজ-ধর্ম—এ হুটি ক্ষেত্রে বাঙালীর জীবন-বিকাশের কথা আজ আমার আলোচ্য নয় তবুও এ কথা অবিসম্বাদী ভাবে সত্য যে, এই দুই ক্ষেত্রের জীবন-বিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ—অতি ঘনিষ্ঠ।

বাঙালীর এই দু'শো বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাস এমন কয়েক জন কালজয়ী মাহুঘের দ্বারা চিহ্নিত; তাঁদের মধ্য দিয়েই বাঙালীর সাহিত্যের কালাংশ রূপ লাভ করেছে এবং তাঁদের নামেই এই কাল নিজেকে চিহ্নিত করে তাঁদের অমৃতত্ব লাভের কথা সগৌরবে ঘোষণা করেছে।

আমরা এই দু'শো বৎসরের যুগ বিভাগ করে থাকি পাঁচটি নামে চিহ্নিত করে। বিভাগাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এই সঙ্গে আরও একটি নাম যুক্ত হওয়া উচিত। পণ্ডিত জন এবং ঐতিহাসিকেরা তাঁর নাম ঘোষণা করেও থাকেন। তিনি রামমোহন রায়। রামমোহন এবং বিভাগাগর বাঙালীর নব জীবনের বীজ। দ্বিধল বীজের মত এই দুই মহাপুরুষের জীবন সাধনার পুষ্টিতে নব জীবনের অঙ্কুরোদয় হয়েছিল। ইতিহাসে বাঙালীর জীবন-বিকাশের রাজনৈতিক এবং সমাজ ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রের মত এ কথাও থাক। আমার আলোচ্য এই দু'শো বৎসরের সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালীর জীবন-কাল যে কয়েক জন মাহুঘের দ্বারা চিহ্নিত—বাঁদের নাম পূর্বে করেছি—তাঁদের শেখোক্ত জন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙালীর কাছে তাঁর উপাধি নিম্নপ্রয়োজন—কুল-পরিচর বাহলা, তিনি বর্তমান থাকতেই তাঁর নামের স্ত্রী বাদ দিয়েছিল বাঙালী—তিনি সর্ববাহ্যব্যবহিত

আত্মশক্তির গরিমায় মণ্ডিত হয়ে শরৎচন্দ্র নামেই বাঙালীর ক্ষুদ্রে আসন লাভ করেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটা যুগ। একালের পূর্ববর্তী কাল যেখান পর্যন্ত গণনা করি আমরা—তিনি সেই যুগ। শরৎচন্দ্রের তিরোধান হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে, তবুও বাঙালী-জীবনের সাহিত্যের ভাব-ধারায় শরৎচন্দ্রই আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাব-ধারা। কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন আছে। নতুবা কবিগুরু প্রতি আমি অসম্মান প্রদর্শন করছি এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে আমি 'বাঙলার অন্ততম' শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। তাঁর বহু মূল্যবান 'আধুনিক সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের বইয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের আলোচনা-প্রসঙ্গ লিখেছেন—“বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথকে আমরা এখন কতকটা বৃত্তিতে পারিতেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটা অতিক্রান্ত, অপ্ৰত্যাশিত—আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে।”

“আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে,” এই বাক্যটির আমি পুনরুক্তি করছি; এবং শরৎচন্দ্রের ভাবনার ধারাটি যে আধুনিক সাহিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ধারা—এই কথাটাই আমি বলতে চাই! শরৎচন্দ্রকে তাঁর কোন এক জন ভক্ত রবীন্দ্রনাথ দুর্বোধ—তাঁর রচনা অপেক্ষা আপনার রচনা শ্রেষ্ঠ—এই জাতীয় উক্তি করেছিলেন। তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন—ও কথা উচ্চারণ কর'র না। রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জ্ঞতা, আমরা লিখি তোমাদের জ্ঞতা। আমিও সেই কথাই বলি। রবীন্দ্র-সাহিত্য স্বর্গলোকের ধারা; শরৎচন্দ্র সে ধারা ধরিত্রী-বক্ষে-বাহিনী হয়েছে। মোহিতলাল বলেছেন—“রবীন্দ্রনাথের দূরারোহিণী কল্পনার উল্কাধায যে ফুল গুঞ্জে-গুঞ্জে ফুটিয়া উঠিল—তার সবটুকু শোভা সকলের চোখে ধরিল না বটে, কিন্তু সেই ফুলের বীজ নিম্ন-ভূমিতে একটি নূতন রূপে অঙ্কুরিত হইল। তাই হঠাৎ যখন দেখা গেল, একেবারে পথের ধারেই লতা-গুন্মের বেড়াগুলি এক নূতন ধরণের ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে—তার বর্ণ-গন্ধ যেমন চমকপ্রদ, তেমনি অতি সহজেই প্রাণ-মন অভিভূত করে, তখন আর বিষয়ের সীমা রহিল না। এ যে চিরদিনের দেখা জিনিষ—অথচ এমন করিয়া কখনও তো দেখি নাই।”

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার যে রূপ দেখে লিখেছিলেন—সুজলা-সুফলা-শস্ত্রশ্যামলা মলয়জশীতলা, অমলা-কমলা-সরলা সুরমিতা-দুর্ভিতা—বাঙলার সে রূপ তখনও বজায় ছিল। সাধারণ বাঙালীর জীবনে ভাঙন ধরলেও পল্লীর অবস্থা শোচনীয় হলেও যে-কূলে রবীন্দ্রনাথ জন্ম লাভ করেছিলেন—যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি মানসিক পুষ্টি লাভ করেছিলেন—তাঁর কবি-মনের উদ্বোধন হয়েছিল—তাতে পৃথিবী তার অপরূপ সৌন্দর্যের দিক দেখিয়েই নিজের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিল; এবং সেই পরিচয়ের ক্ষণে যে মন্ত্র পাঠিত হয়েছিল, সে মন্ত্র উপনিষদের বাণী! প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ধারায় তাঁর কাব্যলব্ধার সঙ্গে সপ্তপদী যাত্রা লাভ্যময় সম্পাদ হয়েছিল। তা

ছাড়া তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা—সে জন্ম-জন্মান্তরের সাংনায় পরিণতি বুলুন—অথবা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ঋণধারার মহা-পরিণতি বুলুন—অথবা সাধারণ জীবন নিয়ম কারণ অনির্ণীত ব্যক্তিক্রম বুলুন—সে যাই বুলুন—রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই লোকোত্তর প্রতিভা এক মহা সত্য।

শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে এক কালের সমৃদ্ধ সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ কয়েকখানি পল্লীর মধ্যে; মজ্জ বাঙা সব্বভারতীয় ক্ষীণ পঙ্কিল শ্রোতের কূলে, ঘন জঙ্গলে ভরা চারি দিক, মহামারী ম্যালেরিয়ায় পূর্ণ স্থায়ী বাসা গেড়েছে সেখানে, প্রাচীন সংস্কৃতির নামে অন্ধ সংস্কারে সমস্ত অন্ধত্ব, দারিদ্র্যের কালিতে কালো হয়ে আসছে চারি দিক, মা বা ইহা ছেঁদে—অর্থাৎ ছাত্তসর্বস্বা নরিকার বেলীর সম্মুখে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল পৃথিবীর সঙ্গে। ধরিত্রীর রূপের মধ্যে যে আকাশের নীলে গ্রহ-তারকার দীপ্তিতে স্বর্ঘ্য-চন্দ্রের রশ্মিজালে, ফুলের বর্ণসম্ভারের মধ্যে যে চিরন্তন অপরূপের বাস—তাঁর সন্ধান তিনি পাননি। তাই শরৎ-সাহিত্য মাটির সাহিত্য।

বাঙলা দেশে ছেলে-ঘুমপাড়ানী ছড়া আছে—

“আর চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়ালে দুখ দেব;
সোনা রূপোর বাটী দেব, তাইতে দুখ খাবি—
ঘুম দিয়ে যা রে চাঁদ—পাখা দিয়ে বাতাস দেব—
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছাওয়ায় ছাওয়ায় বাবি।

অবোর এ ছড়াও আছে—

আয় রে ঘুম যাই রে, বাউরীপাড়া দিয়ে
বাউরীদের ছেলে ঘুমলো কাঁধা মুড়ি দিয়ে।

একটিতে অপরূপ রূপের কাব্য-শোভা। কিন্তু সে ছড়া-রচনা সম্ভবপর হয়েছে—সেই করতে পেরেছে—যার গোয়ালে গাই আছে, সোনা রূপোর বাটী দেবার সামর্থ্য আছে, আম-কাঁঠালের রাগান রচনার জমি আছে, কমা আছে।

বাউরীর ছেলে-ঘুম-পাড়ানোর কালে বাউরী-মায়ের চাঁদের কথা মনে হয়নি, মনে হয়েছে কাঁধার কথা।

বাঙলার আদি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে আমরা এক মহাবাহীর সন্ধান পেয়েছিলাম। “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।”

এই যে মহা-মানবতার বাণী,—এই বাণী শুধু বাঙলা সাহিত্যেরই বাণী নয়। সমগ্র পৃথিবীর মর্যবাহী—এই বাণী পৃথিবীর সকল সাহিত্যের আদি কথা।

আকাশের নীল, আলো, অন্ধকার, জ্যোতির্লোক, ফুলের শোভা, পানীর কলধর, ঝেঁঝনের গান, সমুদ্রের কল্লোল, নদীর কলতান, গন্ধসম্ভার, সুরকোমল স্পর্শ—জীবনময়ী ধরিত্রীতে ধরে ধরে বিকাশ লাভ করেছে, তাইই মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে অব্যক্ত। এই বর্ণ-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগ বা উপলব্ধির ভিত্তি বহু কোষ মিলনের ফল। দৈব জীবন দেহ থেকে দেহান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে মানব। মানব-রূপের মধ্যেই জীব-জীবনে প্রকাশমান হয়েছে মননময় চেতনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টি-বৈজ্ঞানিক-সঙ্গে মানব-চেতনের

মিলনের ফলে যে আনন্দ—সেই আনন্দের অকণ্ট অভিযুক্তিই প্রথম সাহিত্য। সেই আনন্দ থেকে মহানন্দে মানুষ উপনীত হল তাঁর আত্ম-চেতনাকে উপলব্ধি করে। মানুষ আত্মাকে চিনে—চিনলে সমগ্র সৃষ্টিকে, অল্পভব করলে স্রষ্টাকে। এই মহানন্দময় উপলব্ধিই ভারতীয় সাধনার স্তরে স্তরে বিকাশ লাভ করেছে। মানুষ এই সাধনায় অপরূপ অরূপের গুণন মোচন করে প্রমাণ করেছে—সবার উপরে মানুষ সত্য, কারণ, সেই সব সত্যের আবিস্কর্তা। রবীন্দ্রনাথ সেই সাধক। তাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেপে চেতনা-বিলুপ্তির মধ্যেও তাঁর চৈতন্য বলেছিল শব্দহীন ভাষায়—

হে পূষণ সংবরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল এবার প্রকাশ কর
তোমার কল্যাণতম রূপ।

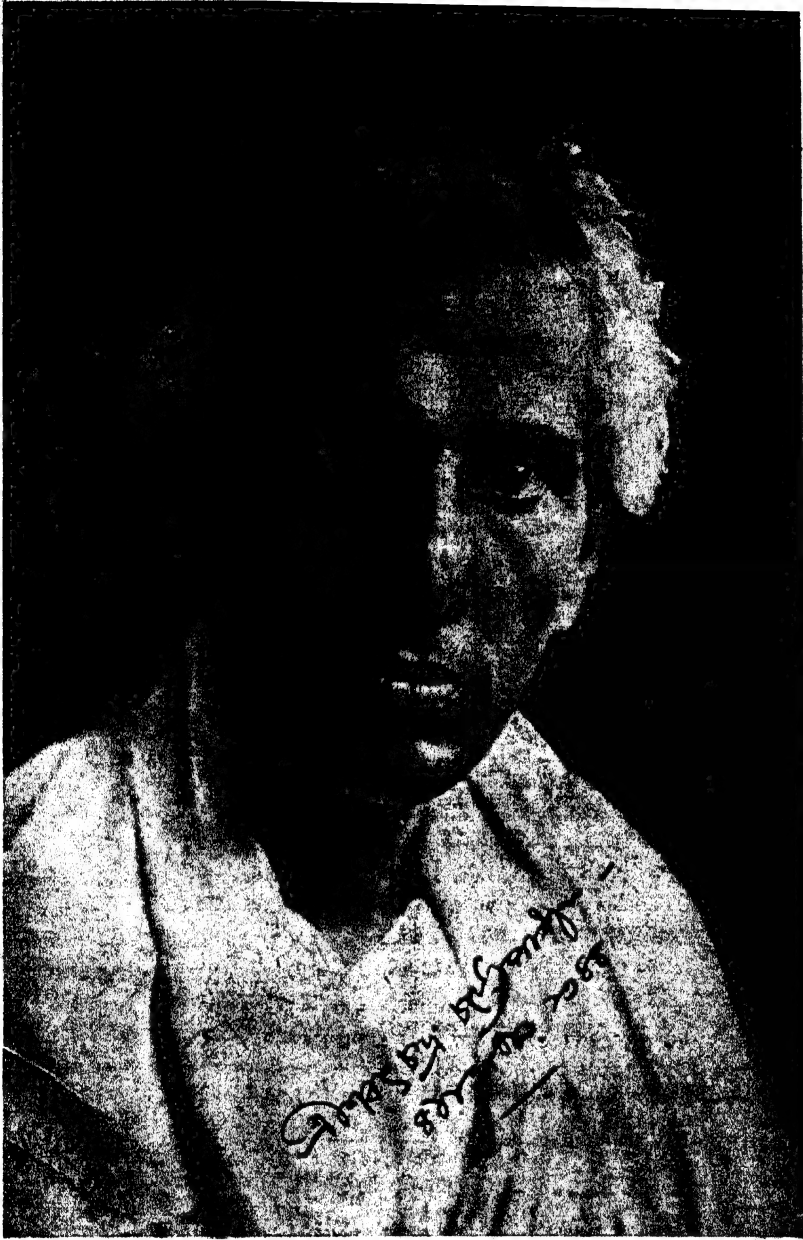
ঈশোপনিষদের

পূষেক্ষকে ঘম সূর্য্য প্রাজাপত্য বাহ রশ্মিন্।

সমুহ তেজো যন্তে রূপঃ কল্যাণতমঃ তত্তে পশ্যামি।

বাঙালীর নব জীবনে ভারতীয় সাধনার বাণী রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোধ করি শেষ দীপ্তি লাভ করেছে—যার প্রতিফলনে সমস্ত মানব-চৈতন্য এক ভিন্ন উপলব্ধির পথে যাত্রা-মুখে সচকিত হয়ে উঠেছে—সমস্ত যে মাথা নত করে বলেছে—তুমি সত্য—তোমার বাণী মহাসত্য।

ভিন্ন উপলব্ধির পথে যাত্রা রবীন্দ্রনাথের জীবনদশাতেই আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপে ব্যবহারিক বিজ্ঞান আবিস্কারের ফলে সমগ্র পৃথিবীতেই এল মানব-সত্যতার নব পর্যায়। যন্ত্রশক্তির কাছে পরাভূত হল মানুষের প্রমশক্তি। অল্প দিকে সৃষ্টির বাস্তব রূপের মধ্যে সৃষ্টি-রহস্যকে উদ্ঘাটন করে বিজ্ঞানের পথে মানব-সংস্কৃতি হল ধাবমান। একদা ষ্টিম-ইঞ্জিন-চালিত জলযানে বাহিত হয়ে ভারতবর্ষের উপকূলে যন্ত্র-নির্মিত পণ্যের সঙ্গে এল সেই নূতন পথের বার্তা। এ দেশের মানুষ সে বার্তা গ্রহণ করতে চায়নি; কিন্তু সে পণ্য গ্রহণ না করে পারেনি। পণ্যগ্রহণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙন ধরল। রাজবংশের পর রাজবংশ ভেঙে পড়েছে, রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে, ধর্মবিপ্লবের পর ধর্মবিপ্লব হয়েছে, জাতির পর জাতি এসেছে অভিযানে, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, সর্বশেষে এল ইংরেজ—তবু এ দেশের স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙেনি। এই ইংরেজ আমলেই ছিঁড়াতবুে মস্তুর হয়েছিল, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আবার মানুষ সামলে উঠেছিল—এই সমাজ-ব্যবস্থার গুণে। সেই সমাজ-ব্যবস্থা এবার ভেঙে পড়ল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যন্ত্র-শক্তির সংঘাতে। এত বড় যে শক্তি, কে তাকে বলবে মিথ্যা? ভারতীয় সাধনার সাধক রবীন্দ্রনাথও এক উপেক্ষা করতে পারেননি। তাকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন—দুই জীবন-ধারার সময় সাধন করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা এই শেষোক্ত জীবন-ধারার আবেগে প্রবাহমান হয়ে ওই রবীন্দ্র-সাধনা-সমুদ্র বাঙলা সাহিত্য থেকেই নূতন খাত কেটে চলেতে চেয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উৎস থেকেই শরৎ-সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যে বাস্তব রূপের প্রথম আবেগ—প্রথম শ্রোত। আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বাঙলা দেশের মানব-জীবনের ভাবপ্রবাহ বাস্তবমুখী। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্তমানেই শরৎচন্দ্রের তিরোধান ঘটলেও শরৎ-সাহিত্যই বাঙালীর সাহিত্যের ভাবধারার অব্যাহত-পূর্ব ভাব-ধারা।



রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গনা-সমৃদ্ধ ভাষা, রবীন্দ্রনাথের মহাচৈতন্য থেকে প্রকাশমান হৃগভীর প্রেম, রবীন্দ্রনাথের চুষ্টি থেকেই লাভ করা রূপবোধ নিয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন—চঃসং-প্রসীড়িত দুর্গত পতিত জীবনের পটভূমিতে মানুষের সেই সত্য—যে সত্য সবার উপরে সত্য। প্রস্তুত অতীন্দ্রিয় লোকের অভিজ্ঞ শরৎ-সাহিত্যে একেবারে নাই তা নয়—তু শরৎ-সাহিত্যে বাস্তব জীবন প্রধান। ঐকান্তে অমাবস্তার রাত্রিতে অশ্রুপূর্ণ অন্ধকারের রূপকর্ণন অপূর্ণ কবিত্ব; সেখানে

লেখকের অনুভূতির গভীর আয়তনও অনুভব করি অন্ধকারের এক অতীন্দ্রিয় রূপলোকের স্পর্শ, তবুও সে ভাবানুভূতি ঐকান্তে গোপন।

পূর্ববর্তী জীবন-ধারা থেকে নতুন কালের জীবন-ধারায় প্রেরণের কালে যে বিপ্লব অবশ্যস্বাভাবী, জাগতিক জীবন-ধারণ-ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কালে বা আমাদের মধ্যেও সঞ্চারমান হয়েছিল—অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পানিছিল না, তার আবেগ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে।

পৃথিবীর নবতাবের সংঘাতে পুরাতন সমাজে ধ্বংসের কম্পন তখন হয়েছে, বাঙলা দেশের সমাজ-ব্যবস্থার তিন কোণ ভেঙেছে—এক। ঠেকে আছে বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খলার ঠেকায়, দ্ব্যর্থ শাসন শোষণে মাত্মম্ব হচ্ছে হৃতসর্বস্ব, ভট্টসর্বস্ব, দীনতায়, হীনতায়। শীর্ণ, মামুষ কাণ্ডাল, চোখে তার লুক্ক দুটি,—তাদের কথাই শরৎ-গীতো মুখা।

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে এসেছিল বিনোদিনী! শরৎ-গীতো এসেছে সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী।

বিনোদিনী বিদেহ-বশে নিষ্ঠুর ভাবে যে খেলা আরম্ভ করেছিল খেলা সে শেষ করেছে বৈরাগ্যের মধ্যে, সে তীর্থ যাত্রা করেছে ক্ষুণ্ণে উজ্জলকে দুটি নিবন্ধ করে, বিহারীর প্রেম-নিবেদন তার বকে যখন পরিপূর্ণ করে দিল, তখন সে চলে গেল রক্ত-মাংসের নৈব উজ্জলকে। কিন্তু সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী! জীবন-মরণের খেলা,—সে খেলায় তাদের বিয়োগান্ত পরিণতিতে বেদনায় তাদের অন্তরে অঙ্গসাগর উথলে উঠেছে তাতেই তাদের কার সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে—যার বলে মামুষে সবার উপরে। সে সত্যও চিরন্তন সাহিত্যের প্রাণশক্তি, অথচ সে বাস্তব। এবং সত্য উপলব্ধির বেদনায় মামুষের চোখে নামল যে উত্তপ্ত অঙ্গুর তার মধ্যে আছে বিপ্লবের আবেগ। শরৎ-সাহিত্যের নারীদের যেও সেই উত্তপ্ত অঙ্গ। শুধু কি ওই চন্দ্রমুখীর দল? রমা, অন্নদাদি, মনের মেয়ে, অচলা, বিলাসী, একাদশী বৈরাগীর ভাইঝি—এদের দ্বয়ের যে সত্য রূপকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র পাঠকের অন্তরে তিষ্ঠিত করেছেন তারও মধ্যে বিপ্লবের ধ্বনি জেগে উঠেছে। গজের বিধি-বিধানের অমূল্যনকে অতিক্রম করে দেহের গুণী দিয়ে নারীর আত্মিক মূল্য ঘোষিত হয়েছে, তার সত্তা স্বীকৃত হচ্ছে। এ স্বীকৃতি তুচ্ছ নয়। এ এক বিপ্লবাত্মক স্বীকৃতি। সত্যীদাহ বোরণে আইনের প্রয়োজন হয়েছিল, আইনের সমর্থন লাভ করেও ধবা-বিবাহ সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করেনি; সেই দীর্ঘকালের সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ঠাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের বাণীর মধ্য দিয়ে যখন ধ্বংসাত্মক ঘোষণা উচ্চারণ করেন তখন তা স্বীকৃত হ'ল। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙালীর নারী-সমাজ যে বিস্ময়কর পরিবর্তন লব্ধা দিয়েছে, তার বীজও ছিল বীজের মত। তার একটি দল হল শরৎ-সাহিত্যে নারীর আত্মিক রূপ-মহিমার প্রকাশ, অপরটি হল ১২১ সালে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনে নারী-শক্তিকে গণশক্তির মত স্বীকার করে যেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী-গঠন।

শুধু নারী-জীবন সম্পর্কেই শরৎ-সাহিত্যে বিপ্লবাত্মক নয়। তাঁর দুটি এই দেশের বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনের সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল—সর্বত্রই তিনি ঘোষণা করতে চেয়েছেন বিপ্লব! ভাব-ধারার বাণী। অজ্ঞান-ভ্রমায় আচ্ছন্ন দেশ, কোটা কোটা মামুষ ভাবহীন মুক, অন্নহীন—অর্জন, জীর্ণ শতছিন্ন আশ্রয়ের তলদেশে তারা জলে ডেকে বোদে পোড়ে, শীতে কাঁপে; একমাত্র সম্পত্তি গরু—সে গরুর খাবার ঘাস নাই, জল নাই; সমস্ত হারিয়ে সে চল কষ্টার হাত ধরে কলের পথে—সেই গরুরের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। মহেশের প্রতি ভালবাসা তার নিজের কণ্ঠকে উপেক্ষা করে মহেশের কণ্ঠ বড় করে দেখার মধ্যে নিরঙ্কর দরিদ্র চাবীর অন্তরের যে সত্য সর্বোত্তম সত্য, তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে ছিল যে মহাবিপ্লবের বীজ, সে বৈদেশিক ভাবধারা থেকে সংগৃহীত নয়—সে তাঁর অন্তরোদ্ভূত সত্য। সে বিপ্লবের বীজ আজ অঙ্কুরিত।

নিষ্ঠুর সত্যকে কোন দিন অগ্রিয় বলে গোপন করেননি, তাই শরৎচন্দ্র নিজে বিপ্লবী—তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।

কর্তমানকে একমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশে ভাববার প্রেরণায় তিনি কিছু করেননি, মামুষকে ভালবেসে বর্তমানের জীর্ণতাকে নিরাসক্ত ভাবে বর্জন করে নব কল্যাণে যাবার কামনার আবেগ, শরৎচন্দ্রের মধ্যে সে আবেগে উদ্ভূত তাঁর সাহিত্য তাই তিনি বিপ্লবী, তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।

সে দিনের বাঙালীর জীবনের অন্তর্গত বিপ্লবের আবেগ—যার সম্পর্কে সে দিন বাঙালীর স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই উচ্ছসিত হয়ে রূপ নিতে চেয়েছে শরৎ-সাহিত্যে, তাই শরৎ-সাহিত্যে সত্য এবং সেই কারণেই শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের একটা যুগ। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে তাঁর তিরোধান ঘটলেও তিনিই আধুনিক যুগের অব্যবহিত-পূর্ববর্তী যুগ। কারণ, বাঙলা সাহিত্যে সমগ্র ধারা আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে জীবন-বিপ্লবের খাতে প্রবাহমান।

মামুষের জীবন এই বিপ্লবের খাত খনন করে সার্থকতার সাগর-সঙ্গমে যাবার স্বপ্ন দেখছে, বাঙালী পরাধীন দরিদ্র হলেও রামমোহন, বিজ্ঞাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সেবকদের চিন্তে পৃথিবীর সে স্বপ্ন ছায়াপাত করেছে; শরৎচন্দ্র কালো কালির তুলিতে প্রথম এঁকেছেন সে ছবি। সে ছবি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং উঠবে বাঙলা সাহিত্যে। মনে হয়, সে বিপ্লব দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হলেও সার্থক হবে, তারই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর শরৎচন্দ্র সার্থকতার হয়ে উঠবেন।

একটি কবিতা

অবস্খী সাথাল

তুমি চলে গেলে বহু দূর সেই আসামের একপ্রান্তে
মুহূর্ত্তগুলো বিবাদ তাই। পৌষের ভোরে নামলো
কালার মত বৃষ্টির ধারা, বরফের কুচি ঝাপটা।
জানদার ধারে নিমডাল যত বাতাসের বেগে কাঁপছে।
পূর্বত দেশে এই দুর্ঘ্যাণে টেন ত এবার থামলো।
ছন্দ আমার উচ্চকোমল ছন্দের হোঁচল ভাবছে।

তুমি চলে গেলে পাইন-কারের উপত্যকার রাজ্যে
সেদিন দুপুরে, তার পর আর কতটা সময় মাত্র!
তবু মনে হয় কত মাস যেন কত বৎসর কাটল
মুহূর্ত্তগুলো ভারী হয়ে শুষ্ক-বুকের উপরে চাপছে।
এমন করে ত ভাবিনি তোমাকে কোন দিন কোন রাত্রি।
আজ এই ভোরে তোমারই দৃষ্টিতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

“আমি কি ভাবছি
বলো তো?”

জিজ্ঞেস করল অণিমা।

অণু কখন যে কি ভাবে
তার অণুমাত্র ধারণা-শক্তি
প্রাণকেষ্টের নেই; তবু সে
আন্দাজ করার চেষ্টা পায়:

“কি ভাবচ বলবো?”

আচ্ছা, ভেবে দেখি—

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই ওর

মোড়। খতিয়ে দেখলে ওতে ক্ষতির অবশিষ্ট কিছু নেই, তবে
এ-হেন চিন্তাশীলতায় লাভও নাশি। শেষ পর্য্যন্ত অণিমাকেই প্রকট
হয়ে নিজের মহিমা প্রকাশ করতে হয়। এক সিন্ধি থেকে আর এক
স্বয়ং-সিন্ধিতে এগুতে হয়।

তাই অণিমাই ব্যক্ত করল—

“ভাবছিলুম যে, দু’জনে যখন ভালোবাসায় পড়ে, এই ধরো, যেমন
তুমি আর আমি,—তখন বে-খা করে’ ঘর-কন্না করার আগে তাদের
একটু রিহাসাল দেয়া—অন্ততঃ বছরখানেক ধরে অভ্যাস করা উচিত
নয় কি? দাম্পত্য-জীবনটা কিরূপ হবে, আগে থেকে একটু চেষ্টা
রাখলে কেমন হয়?”

“চেষ্টা রাখলে?”

“মানে আমি বলছিলুম কি, তারা ভাবখানা দেখাবে যেন তাদের
বিয়ে হয়ে গেছে।” অণিমা ব্যাখ্যা করে’ দেয়—“বামা করা কিবা টাকা
নেয়ার মতই অনেকটা। ভাবী নিরাপত্তার জগ্রেই।”

“কিদের নিরাপত্তা?” প্রাণকেষ্ট ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

“একটি ভালো-মেয়ের নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার
অধিকার আছে কি না?” অণিমা বলে, “বিশেষতঃ এটা, বলতে
গেলে, একটা যাবজ্জীবনের ব্যাপার যখন।”

“ও!” প্রাণকেষ্ট বলে, “হ্যাঁ, তা বটে।”

“নিছক মুখের কথায় নির্ভর না করে’ একটু বাজিয়ে দেখা
ভালো নয় কি? চোখে দেখলে তবেই তো বিশ্বাস হবে?” অণিমার
এই হচ্ছে বক্তব্য।

“তা বটে। কথায় বলে পরীক্ষিত সত্য।” প্রাণকেষ্ট সায় দেয়।

বলে বটে, কিন্তু মনে তার খটকা লাগে। যে পরীক্ষিত সত্য
এক জন্মের লভ্য নয়, যাকে জন্মে জন্মে লাভ করতে হয় (এক
জনমেজয় লাভ করেছিল বলে’ মহাভারতে না কি লেখে,) সেই বস্তু
এই জীবনে, একমাত্র দাম্পত্য-জীবনে লাভযোগ্য কি না তার সন্দেহ
জাগে। লাভজনক কি না সে তো আরেক প্রশ্ন।

“তোমার মাকে বলেছ কথটা?” প্রাণকেষ্ট জিজ্ঞাসা করে।

“কোন কথার মাকে বলব?”

“এই বাজিয়ে দেখার কথটা। বিয়ের আগে বাজিয়ে নেয়ার
যে কথা তুমি তুলছ।”

“মা নিজে দেখে-শুনে পছন্দ করে বাবাকে বিয়ে করেছিলেন, তা
জানো?” অণিমা প্রকাশ করে। “পর পর কুড়িটা সন্তান নাকচ
করে’ অবশেষে বাবাকে—”

“বলো কি?” প্রাণকেষ্ট বিহ্বল হয়ে পড়ে।

তাও আবার বিয়ে করে বাবার সঙ্গেও যখন বদিবর্না হোলো না
তখন বাবাকেও তিনি নাকচ করে’ দিলেন।”



শ্রীমদ্রাম চক্রবর্তী

“কি করে’?” কোতুহল

হয় প্রাণকেষ্টের।

“বিধবা হয়ে।”

“ও—বাবা!” প্রা
কেষ্টের চোখ কপালে উ
যায়।

“তাই বলছিলুম, বিয়ে
পরে মনের মিল হবে কি না
সেটা বিয়ের আগেই যাচাই
করে নেয়া ভালো, তাই নয়

কি? এ কি, তুমি এমন কাঁপচ কেন? শীত করছে না কি?”

“না, কাঁপব কেন!” প্রাণকেষ্ট অবশিষ্ট থাকার প্রয়াস পায়।
কষ্ট-পাথরের ঘামাজার ফলে এশ্বার ওশ্পার বা কিছু হবার আগে
ভাগেই হয়ে যাওয়া মন্দ নয় তার মনে হয়। নইলে, বিধবা হবার
দায়টা কেবল অণিমার থাকলেও, কেন বলা যায় না, নিজেও সেই
দায়িবে বিভাজিত বলে তার জ্ঞান হতে থাকে। আর, এ রকম
জ্ঞান, তমোগুণ আর ক্লোদোক্ষের মতই, কেমন করে’ যেন মানুষকে
আচ্ছন্ন করে’ অজ্ঞান করে দেয়।

“তাহলে এ বিষয়ে তোমার মত কি?” প্রশ্ন তোলে অণিমা।

“আমার অমতের কি আছে?” প্রাণকেষ্ট জানায়, “আর সকলের
মতামত নিয়ে কথা। পাড়াপড়শীরা কি বলবে সেই কথাই আমি
ভাবছি।”

“পাড়াপড়শী?” অণিমা অবাক হয়, “তাদের এ ব্যাপারে কথা
বলবার কি অধিকার আছে শুনি?”

“মানে, আমরা যখন এই পরীক্ষামূলক দাম্পত্য-জীবন বাপন
করব, ওরা তখন কানায় আরম্ভ করতে পারে।” প্রাণকেষ্ট বিশ্ল
করার চেষ্টা করে: “তাদের এটা অনধিকার-চর্চাই বটে, তবু এটাকে
ওরা অবৈধ জ্ঞান করবে বলে’ মনে হয়—ওদের পাপ মন তো।”

অণু বদেছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল—“প্রাণকেষ্ট বাবু, আপনাত



সাহস তো কম নয়! আমি কী এমন কথা বলেছি যে আমার
সামনে একপ অন্তর ইঙ্গিত করতে মুখে আপনার একটুও বাধলো না?”

“অু, বাগ কোরো না। ঠাণ্ডা হও। আমি কিছু বলছি কি ? মটা হলে পাড়াপড়শীরা কি বলবে সেই কথাই আমি বলছি। হার আমার—তু'জনের ভালোর জন্যই বলছি তো।” প্রাণকেষ্ট । “বিয়ের আগে দাম্পত্য-জীবন যাপন করা যে ভালো নয়, সেই ই তো বলছি আমি।”

“তাই বলছ ? তাছাড়া কিছু বলছ না তো ? ভেবে জাম্বো।” তখনো অণু কট-মট করে তাকিয়ে—“তাছাড়া যদি আর কিছু থাকে, বলা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমি বলি যে নেমা মিত্রকে তুমি সে ধরণের মেয়ে পাওনি। তাহলে এ বাড়ীতে আর আর না আসাই আমার বাঞ্ছনীয় হবে।”

“আহা, অত চট্ট কেন অণু ? কখন আমি সে কথা বললাম ? ঐ একেবারে আমাকে উলটো বুঝলে। তুমিই তো ওই সব বাজিয়ে পার কথা তুলেচ। আমি তো তার প্রতিবাদে—যাতে তোমার ঈর্ষা চিরন্তন কোনো কলঙ্ক স্পর্শ না করে—আমাদের দু'জনের সম্বন্ধ শুধর সৎ এবং পবিত্র—মানে, এখন যেমন সেই রকম চিরদিন কে—সেই কথাই তো এতক্ষণ ধরে বলবার আমি চেষ্টা করছি।”

“ঠিক বলছ ?”

“নিশ্চয়।”

“তাহলে তোমার কোনো দোষ নেই। তোমাকে এবার মাপ দিচ্ছি। আমার কথা বলার বেকায়দায় তোমার মনে ঐ ভুল ধারণার হয়েছিল, বুঝতে পারছি আমি। আমারই দোষ। সেই জন্তেই সমায় মাপ করলাম। আর কক্ষণো কিন্তু এমন কথা বোলো না।”

“কক্ষণো না।” প্রাণকেষ্ট ঘাড় নাড়ে। “প্রাণ থাকতে নয়, হু—এবং আমি বলিও নি।”

“তুমি খুব লক্ষ্যী ছেলে।” অণু ওর চুলগুলো এলোমেলো করে ধর, এবং হয়ত বা তার আদর একটু মাত্রা ছাড়ায়, কিন্তু সে কথা বলতে যাওয়া বৃষ্টি বিপজ্জনক। প্রাণকেষ্টও অণুর আদরের ভিত্তিতে কিছু বলে না। নিজের অনুবাদ অগ্নান বদনে সজ্জ করে।

আদরের পালা মাস হলে অণু জানায়, “তাহলে তো আজ থেকেই আমরা শুরু করতে পারি।”

“কিসের শুরু ?”

“যে কথা বলছিলাম। তুমি আর আমি এমন ভাব দেখাব মন আমার একটি স্ত্রী-দাম্পত্য। অবশ্য আমাদের নিজেরদের ঘোষে। পাড়াপড়শীদের জানতে হবে না। আজ থেকে তুমি নামকে তোমার সহধর্মিণীর চক্ষে দেখবে। এবং তোমার যা কিছু বাতাম-হেঁড়া জামা-টামা আছে সব এর পর থেকে এখানে নিয়ে এসে। সমস্ত আমি বোতাম বসিয়ে দেব। আমার কর্তব্যও আমি দখল করা করতে চাইনে।”

“সে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।” প্রাণকেষ্ট জানায় : “আমাদের বাসার বি আছে, তাকে পরয়া দিই, সেই টেকে দেয়।”

“তাই না কি ?” অণিমা টিগনি কাটে : “তাহলে তোমার বলি, জেনে রাখো। ও সব বি ফি আর চলবে না। এমন কি, সাক্ষী-মার্কি বি হলেও—বুকে ? তাছাড়া, এমন করলে আমিই বা এই ধারো মাস ধরে পাত্তিত্রস্তের পরীক্ষা দিই কি করে ? বৌ থাকতে কি কেন ? অতএব ফি শনিবার তুমি সার্ট পাজারী সব এখানে আসবে।”

“বোতাম-হেঁড়া না থাকলেও ?...বেশ, তুমি যখন বলছ, আনু। বোতাম ছিঁড়েই আনু না হয়।” প্রাণকেষ্ট অকাতরে আশ্ব সমর্পণ করে।—“অপরের সুখের জন্ত আমি কি না করতে পারি ? সকলকে বাধিত করতে সব সময়েই আমি তৈরি আছি।”

“এই তো গেল দাম্পত্য-জীবনের প্রথম ভাগ।” অণিমা পাতা ওলটায়, “এর পর দ্বিতীয় ভাগে আসা যাক। দ্বিতীয় ভাগে হচ্ছে ঘরকরা।”

“ঘরকরা ?”

“হ্যা, হার নাম গেরস্থালি। তার প্রথম কাজ হচ্ছে মাসকাবারে তুমি যা মাইনে পাবে তার সমস্ত আমার হাতে এনে ধরে দেবে। এর যেন অন্তথা না হয়।”

“কি বললে ?” প্রাণকেষ্টর নিজের কানের ওপর অবিশ্বাস জন্মায়।

“ভয় খেয়ো না। তোমার হাত-খরচের মত সামান্য কিছু তার



থেকে অবশ্য দেব তোমায়। ভেব না সেজ্ঞা।” অণিমা ওর দুর্ভাবনা দূর করার চেষ্টা পায়।

“হ্যা, কি বলছ ?” তথাপি প্রাণকেষ্ট সঠিক বুঝতে পারে না।

“কিসে কিসে কি খরচ করতে হবে না হবে আমি তার হিসেব রাখব। আমার কাছে তার জমা-খরচ থাকবে।”

“তুমি যদি ভেবে থাকো যে আমার সমস্ত বেতন তোমাকে সঙ্গে দিয়ে আমি নিজে কুতুর হয়ে থা করে বোড়ার তাহলে তুমি বড় ভুল বুকেচ। আমি সে বান্ধাই নই, আগেই তোমাকে বলে রাখি। আর, এ রকম একটা প্রস্তাব আমার কাছে করার সাহসও তো তোমার কম নয় দেখছি।”

প্রাণকেষ্টকে অত্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। তার মনে হতে থাকে, দ্বিতীয় ভাগ ছাড়িয়ে তৃতীয় ভাগে—একেবারে কথামালায় গিয়ে সে পৌঁছেছে—বেথানে একজনের হচ্ছে কথা বলা—হরম বলা কেবল—এবং আরেকজনের হচ্ছে কথা শোনা—শুধু শুনে যাওয়াই নয়—বলবামাত্র চুপটি করে শুনে মুখটি বুজে পালন করবার জন্ত দরকার হলে প্রাণপাত পর্যন্ত !

“বাঃ, তোমার টাকা যদি আমাকে না দাও তাহলে কি আমি তোমার সংসার চালাবো বলা তো? তাহলে গৃহিণী হওয়া কি জ্ঞে? আমাকে যদি সামান্য টাকা দিয়ে বিশ্বাস না করতে পারো তাহলে আমাকে বিয়ে করবে কি করে?” অনিমা বিম্বিত হয়।

“অবশ্য, সে কথা যদি বলো—” প্রাণকেষ্টকে একটু কাবু হতে হয়।

“সেই কথাই তো বলছি। বলছি না, এটা আমাদের দাম্পত্য-জীবনের আত্ম পরীক্ষা? ঘর-গেরস্থালী করতে হলে কি কি চাই, কি কি কেনা দরকার, কি কি না হলেই নয়, সে সব কি আমাদের জ্ঞানতে শিখতে হবে না? তোমার টাকা হাতে নিয়ে আমি দোকানে বাজারে ঘুরব, অবশ্য কিনব না কিছুই, কেনবার ভাণ করব কেবল। তার পর তোমার টাকা আবার তোমায় ফিরিয়ে দেব।”

“ও! এটা তাহলে মিছি মিছি? তাই বলা! তা যদি হয়, তাহলে অবশ্য—”

তাহলে অবশ্য প্রাণকেষ্টের টাকা ধরে’ দিতে কোনো বাধা নেই জানা যায়।

“তা’বলে’ সবটাই কি মিছি মিছি? স্বামীর যত্ন-আশ্রিত করতে হবে না? তার স্বাস্থ্যের দিকে, খাওয়ার দাওয়ার দিকে, ভিটামিনের দিকে নজর দিতে হবে না? তোমার ওই টাকা থেকেই মাছ মাংস আলু পঁয়াজ ইত্যাদি কিনে আনা হবে। তোমার জন্ম মাংসের সিঁড়া, মাছের কচুরি আমি বানিয়ে রাখব, আপিস থেকে ফিরে এসে তুমি খাবে।”

“সত্যি বলছ? সত্যি-সত্যি বলছ? সত্যিকার সিঁড়া-কচুরি—না কি, সেও মিছি মিছি?” প্রাণকেষ্টের যেমন লালসা তেমনি সংশয় হয়: “সত্যি খাবো, না, কেবল খাবার চেষ্টা করব মাত্র?”

“সহজে যদি খেতে পারো সেইটেই ভালো। নাহলে চেষ্টা করে’ খতে হবে বই কি। নইলে আমি দুঃখিত হব না? তোমার প্রাণের বাঁ কতো কষ্ট করে’ সারাদিন ধরে’ তেতে পুড়ে রে’খেছে।”

“তা বটে।” কথাটা প্রাণকেষ্টের প্রাণে লাগে।

“তার পর তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে আমার সুভাষকে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরুব।”

“এই সুভাষ হতভাগাটা কে, তুনি একবার?” প্রাণকেষ্ট আবার বেগে উঠে।

“আহা, কে সুভাষ উনি যেন জানেন না! সুভাষ—আমাদের ছোট্ট খোক—আমাদের ডেলুডেলোটা।” অনিমা ঘোষণা করে; “তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে তাব পর সুভাষকে নিয়ে আমি হাওয়া খেতে বেরুব।”

“দাম্পত্য জীবন, তা যতই আদর্শ এবং নিখুঁত হোক,—মাত্র বারো মাসের মধ্যে ভ্রাম্যমান সুভাষকে পাওয়া যাবে কি না আমার সন্দেহ আছে।” প্রাণকেষ্টকে দিগ্বাষিত দেখা যায়।

“পেলে খুব সুখের হোতো,” অপুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, “কিন্তু পাবার আশা আমিও করি না। আমাদের সত্যিকারের বিয়ের আগে কি করে’ তা হতে পারে?”

ভবিষ্যতের ভাবনা ওইখানে এসে মূলতুবি থাকে। অপুর কাছে বিদায় নিয়ে প্রাণকেষ্ট বাসায় ফেরে সেদিনের মত।

পরদিন সে আপিসে বসে’ কাজ করছে,—অপুর চাকর এসে একখানা চিঠি দিল তার হাতে।

তাতে লেখা:

“তোমার বাড়ী যখন আমার বাড়ী, তখন আমার বাড়ীও নিশ্চয় তোমার বাড়ী—তাই না? আমাদের বাড়ীর তিন কোয়ার্টারের ট্যাক্সো বাকী পড়েছে, সেটা পত্রপাঠ তুমি মিটিয়ে দেবে, আমি আশা করি। দিলে খুব সুখী হব। ইতি, তোমার অণু।”

অপুর এই অনুরোধের সঙ্গে কর্পোরেশনের একটা বিল জড়ানো—সাতান্ন টাকা সাত আনার দাবী! প্রাণকেষ্টকে দাবীয়ে দেয়ার পক্ষে তাই ব্যর্থ ছিল, কিন্তু সেইখানেই শেষ হয়নি, তার পরেও অপুর পুনশ্চ আছে:

“আমার গয়নার ফর্দাটা আর এবারে পাঠালাম না। সে আস্তে মাসে হবে’খন। কি বলা?”

“আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মহুঘ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মহুঘ্যের স্থায়ী স্মৃতির অস্ত্র মূল নাই। এখন যেমন লোকে, উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতীতি ধাবিত হয়, এক দিন মহুঘ্যভ্রান্তি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের স্মৃতির প্রতীতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে।”—বঙ্কিমচন্দ্র

গুণরাজ-উপাধিক মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অপরূপ সম্পদ। “বোধ-গান ও দোহা”র ভাবকে বাংলা বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয়। চণ্ডীদাস-নামাক্তি কোন পদগুলি শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী, কোনগুলি বা পরবর্তী, তাহা নিরূপণ করা হইল। কৃত্তিবাসের কাল এখনও নিঃসন্দেহরূপে নির্ণীত হয় নাই। তাহার নিজের রচনা বলিয়া কথিত “আত্ম-বিবরণ” যে পুথিতে ছিল বলিয়া স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহাশয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। দত্ত মহাশয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক বই সম্বন্ধেই চমকপ্রদ তথ্য জোগাইয়াছিলেন, অথচ তাহার প্রমাণ চাহিতে গেলেই বলিতেন, “মূল পুথি হারাষ্টয়া গিয়াছে, শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু আমি টুকিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া তাহা বন্ধ পাইয়াছে।” কৃত্তিবাসের “আত্মবিবরণে”র বেলায় যেমন, তেমন মালাধর বসুর “শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের” সম্বন্ধেও দত্ত মহাশয় যে রচনা-কাল-জ্ঞাপক পথ্যর বাহির করিয়াছিলেন, তাহা আর কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এই গ্রন্থের যে প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি আটখানি সম্পূর্ণ ও সাতখানি অসম্পূর্ণ পুথির কোনখানিতেই “শ্রীকৃষ্ণবিজয়”-রচনার কালজ্ঞাপক পথ্যর পান নাই। রায় বাহাদুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের নিম্নলিখিত উক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় নিঃসংশয়ে প্রাক্চৈতন্য যুগের রচনা :—

কুলীন গ্রাম্যের কহে সম্মান করিয়া।

প্রত্যক্ষ আসিবে যাত্রায় পট্টভোরী লইয়া

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।

“নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ”।

এই বাক্যে বিকসিত তার বাশের হাত

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫৩)

কিন্তু ইহা ছাড়াও “শ্রীকৃষ্ণবিজয়”কে প্রাক্চৈতন্য যুগের রচনা বলিবার আর একটি কারণ আছে। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ রূপাপাত্র বলিয়া কথিত জয়ানন্দ তাহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

“রামায়ণ করিল বাস্তবীক মহাকবি।

পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অমূল্যবি।

শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়ে।

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে।

জয়দেব বিভাগপতি আর চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।”

যদিও ডাক্তার শ্রুতুমার সেন বলেন যে, “কৃত্তিবাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না” তথাপি এই প্রমাণের বলে জোর করিয়া বলা যায় যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় উভয়েই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বের রচনা। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণের আসল ভাষা ও বিবরণ কি ছিল তাহা হ্রস্ব করা এখন কঠোর ব্যাপার, কেন না, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ

নানা কবি, গায়ক, পুথিলেখক ও আধুনিক সম্পাদকের যথেষ্ট হস্তক্ষেপে বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয়েরও পুরাতন রূপটি কি ছিল, তাহাও জানা ছিল না। শ্রীচৈতন্য ৪০১ অব্দে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে “শ্রীযুক্ত বাবু কেশরনাথ দত্ত ডাক্তারিনোদ মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে সভাত্তক শ্রীরামিকা প্রসাদ দত্ত কর্তৃক” যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন ভাষাকে আধুনিক আকারে ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে নকল করা পুথিকে আদর্শ করিয়া ভাষা ও বাগান অবিকৃত রাখিয়া এবং অল্প দুইখানি পুথির পাঠান্তর ধরিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই ভ্রম অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এই সংস্করণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” (পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১১৫, ১৫৫) শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে ভাগবতের অনুবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু যথার্থ বলিয়াছেন যে “মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ভাবে কাব্য রচনা করিয়াছেন।” নির মহাশয় তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্মৃতিভূত ভূমিকার শেষে ভাগবতের কোন কোন শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পথ্যর রচিত হইয়াছে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মালাধর বসু কোথায় শ্রীমদ্ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন, কোথায় তিনি মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়াছেন, কোথায় বা মূলের ভাবকে বিবর্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। তাহার ভূমিকার পরিপূরক হিসাবে এ তিনটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভ্রম এই অবতারণা।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের খুব অল্প স্থানেই ভাগবতের শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এ প্রচেষ্টা কত দূর সফল হইয়াছে তাহা কয়েকটি উদাহরণ লইয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক।

(১) নলকুবের মণিগ্রীবী শ্রীকৃষ্ণের স্তব কবিত্বছেন—

বাণী গুণ্যকথনে শ্রবণে কথায়ঃ

হস্তে চ কন্দম্ব মনস্তব পাদয়োনেঃ।

মৃত্যু্য শিরস্তব নিবাস জগৎ-প্রণামে

দুঃখঃ সত্যঃ দর্শনেহস্ত ভবন্তনুনাং। ১০। ৩৮

মালাধর বসু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

বলিব তোমার গুণ সেই হউক বাণী।

সেই কর্ণ হউক তোমার কথা শুনি।

সেই হস্ত হউক তোমার কন্ড করে।

সেই মস্তক হউক যে তোমায় নমস্কারে।

সেই দুঃখ তোমায় দেখে নিরন্তরে।

বহুত প্রণতি দুঃখ করিল সঙ্গরে। (৪০২—৪)

এই অনুবাদে মূলের “মন সেন তোমাকে শ্রবণ করে” এবং “নরন যেন তোমার মূর্তিরূপ সাধু দর্শন করে” এই দুইটি ভাব নাই।

(২) কেশবধরের উপমা ভাগবতে—

তক্ষহস্তঃ ককটিকাকলোপমাদৃ

ব্যসোবশাক্ত্য ভুজঃ মহাক্রুরঃ। ১০৭।

মালাধর শুল্কর ভাবে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

ফুটি কাকুড়ি জেনে হৈল খান খান ।
বাহির করিল কৃষ্ণ আপন হস্তখান ।

(৩) কৃষ্ণকে শুল্করী বানাইবার পূর্ব সে যখন শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় ধরিয়া তাঁহাকে তাহার গৃহে যাইবার জন্ত আহ্বান করিল, তখন—

এক দ্বিধা যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্ত পশ্যতঃ ।
মুখং বীক্ষ্যামু গোপানাঃ প্রহসন্তামুবাচ হ ।
এযামি তে গৃহং সূত্র পুসামাধিবিকর্ষণম্ ।
সামিতার্থেহিগৃহাণাং নঃ পাতানাং ঙ্গ পরায়ণম্ ॥৪২।১।১২

মালাধরের অনুবাদ—

“কৃষ্ণির বচনে কৃষ্ণের হস্ত উপক্সিল ।
ডাहिने চাহিতে ভাই বলাই দেখিল ।
লক্ষিত হইয়া তাহে বলে গদাধর ।
করিব সম্ভোধ তাহে আজি যাহ ঘর ।
পাখকের প্রাণ তুমি পখিকের নারী ।
তোম ঘরে রহিয়া যাব গোফুল নগরী ॥” ১৪২-৫১

এখানে “রামস্ত পশ্যতঃ” অর্থে বড় ভাই বলাইকে দেখিয়া কৃষ্ণের সঙ্গোচের ইঙ্গিত করিয়া মালাধর শুল্কর ভাবব্যঞ্জনা করিয়াছেন । কিন্তু এখানে “অগৃহাণাং” (‘অকৃতনরাণাং’ শ্রীধর) শব্দের অর্থ বাদ পড়িয়াছে । মাধবাচাৰ্য এই শ্লোক দুইটির ভাবার্থ-প্রকাশে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—

বিস্তারনে দেখ গোপগণ জ্যেষ্ঠ ভাই ।
মুগ্ধপানে চাহিতে অধিক লাজ পাই ।
হাসি প্রবোধনে তাহে পরিহাসসজ্জলে ।
জন জন ওগবতী না হও উত্তরোল ।
আমি সব পরবাদী অন্যর দুই জন ।
শতক প্রকারে তুমি করিব পালন ॥ (পৃঃ ১৪২)

শেষ চরণে “তুমি করিব” না করিয়া “তোমা করিব” পাঠ ধরিলে অধিকতর সঙ্গত হয় ।

(৪) কংসভয়ে বিভিন্ন ভাবের লোক শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ কি ভাবে দেখিতেছেন, সে সম্বন্ধে ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি এই—

মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং মহো মুত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোহসত্যঃ ক্ষিত্তিভূতাঃ শাস্তাঃ স্বপিত্রোঃ শিত্তাঃ ।
মৃত্যুভীষ্মপাতেরিরাচরিত্বাঃ তস্যঃ পরঃ গোপিনাঃ
বৃক্ষনাঃ পূরদেবতেনি বিনিতোঃ রসঃ গভঃ সাগ্ৰভঃ ॥৪৩।১৪
মালাধর লিখিয়াছেন—

“হাসিতে নাচিতে তুহু করিল গমন ।
সেই কালে নানা মুক্তি ধরে নারায়ণ ।
মল্ল সব দেখে যেন বজ্রের সমান ।
ধাঙ্গিক রাজা দেখে শুল্কর মুত্তিমান্ ।
স্ত্রীগণ দেখে যেন অভিন্নব মদন ।
নন্দ আদি গোপ দেখে যেন শিত্তগণ ।
রাজা সব দেখে যেন গুপ্ত হস্তে কাল ।
বৃক্ষদেব দেবকী দেখে কোলের ছাওরাণ ।

প্রাণ নিতে যম আসে দেখে কংস বার ।

যোগসিদ্ধগণ দেখে যোগসিদ্ধময় ।

যতবংশ বৃক্ষবংশ দেখিল ততখাই ।

কুলের প্রদীপ মোর শুল্কর কানাই ॥” ১৪৩-১৫-২

এখানে গুণরাজখান “নৃণাং” অর্থে ধাঙ্গিক রাজা, ‘পূরদেবতেনি’ অর্থে ‘কুলের প্রদীপ’ করিয়াছেন এবং ‘বিরাজিত্বাঃ’ (‘অবিধান’ লোকের নিকট জড়) এই ভাবটি বাদ দিয়াছেন । ইহা ছাড়া অনুবাদ শুল্কর হইয়াছে ।

(৫) শ্রীমন্তাগবতের ষষ্ঠ স্বন্ধে ভাগবতধর্ম কে কে জানেন, তাহা যম বলিতেছেন—

স্বয়ম্ভূনারদঃ শত্ৰুঃ কুমারঃ কপিলো মহুঃ ।
প্রহ্লাদো ভলকো ভীষ্মো বলির্বৈ রাসকিবৈ রম্ ।
ছাদশৈশ্বেতে বিজানীমো ধর্মঃ ভাগবতঃ ভট্টাঃ ॥ ৬।৩২.১২১

ইহার অনুবাদ করিবার সময়ও মালাধরের সামনে ভাগবত ছিল না । তিনি লিখিয়াছেন—

ত্রুকা মহেশ্বর আর নারদ মুনিবর ।
সভা এ আছ এ আর বলি নৃশবর ॥
সনক আদি জানে আর ভূগু মুনিবর ।
শুক জানে, আমি জানি স্তন দূতবর ॥
বশিষ্ঠ কনক জানে সঙ্গার ভিত্তবর ।
কেমতে জানিব দূত তুমিত তাঁহারে ॥

মূল ‘কুমার’ শব্দের অর্থ সনৎকুমার ; মালাধর তাঁহাকে ‘সনক’ করিয়াছেন । তিনি ভূগু ও বশিষ্ঠের নাম করিয়াছেন, উহা মূলে নাই ; অনুবাদে মূলর কপিল, মহু, প্রহ্লাদ, ও ভীষ্মের নাম বাদ পড়িয়াছে । ভাগবতধর্মের ইতিহাসে ভাগবতান্তক ও ১২টি নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গুণরাজখান ১২ জনের জায়গার দশ জনের নাম করিয়াছেন ।

নামের এইরূপ গোলমাল মালাধরের গ্রন্থে আরও অনেক আছে । দশম স্বন্ধের ৮৪ অধ্যায়ের ৩, ৪, ৫ শ্লোকে যে সব ঋষির নাম আছে, শ্রীকৃষ্ণ যিজয়ের ৪৬৭০-৪৬৭০ পদ্যের নামের সহিত তাহা মেলে না । এইরূপ দশমের ৭৪ অধ্যায়ের ৭-১ শ্লোকের নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ৩৪৭১-৩৪৭২ এর মিল নাই ।

এই সব অমিল দেখিয়া মনে হয় যে, “শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে” ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি শ্লোকের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ থাকিলেও মালাধর সশ্রু মোড়ের উপর অনুবাদের চেষ্টা করেন নাই । এমন কি, অনেক স্থলে তিনি গ্রন্থ লিখিবার সময় চোখের সামনে ভাগবত রাখেন নাই । এই জঙ্গ তাঁহার গ্রন্থে কতকগুলি ভ্রমশ্রমাদ চুকিয়াছে । কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি ।

(ক) মালাধর ছায়াংশ অবতার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

অষ্টমৈত জড়রূপে ভ্রম অবতারি

ভাগবতের ১।৩।১৩ শ্লোকে ঐ স্থানে নাভির পুত্র স্বয়ংক অষ্টম অবতার বলা হইয়াছে । ভাগবতের মতে (৫।৪।৮) ভ্রত স্বয়ংক পুত্র । এ স্থানে পিতার অবতারও পুত্র আরাপিত হইয়াছে ।

(খ) দশমের ৩৪ অধ্যায়ে দেবদাত্তা উৎসবের কথা আছে, মালাধর (১২২৩ পদ্যে) উহাকে কাত্যাবনী মহোৎসব লিখিয়াছেন ।

(গ) ভাগবতের ১০।৫।১২ মতে নবক (ভৈম) প্রাগ-
জ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা ; মালাধর তাঁহাকে মধ্যদেশের রাজা
দ্বিরাজেন (২৬৪১ পয়ার)।

(ঘ) ভাগবতে (১০।৫।৫৭) মঙ্গলদেশের রাজার কথা আছে,
মালাধর বা লিপিকার তাঁহাকে ভদ্ররাজ (২৬০০ পয়ার) করিয়াছেন।

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ৪১৪-১৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, বলদেব
গোকুলে দ্বিবিদ বানরকে বধ করেন ; ভাগবতের ৬৭।৮ শ্লোক
অনুসারে ঐ ঘটনা রৈবতকে ঘটিয়াছিল।

(চ) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ৩৩২০ পয়ারে আছে যে, পৌণ্ড বাসুদেবের
ও কাশীরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ধারকানগরে হইয়াছিল,
ভাগবতের ১০।৬৬।১০ অনুসারে ঐ যুদ্ধ কাশীতে হইয়াছিল।

(ছ) ভাগবতের (১১।৭।২১) বহু-অবধূত সংবাদকে মালাধর
ভরত-অবধূত সংবাদ করিয়াছেন (৫১৮৬)।

(জ) ভাগবতের চতুর্বিংশতি গুরু-প্রসঙ্গে আছে—

কচিং কুমারী স্বাম্যান বৃণানান গুহমাগতান্।

স্বয়ং তানহয়ামাস কাপি যাতোবু বহুয়্।

তেবামভাবহারার্থং শালীনু বহসি পার্থিব।

অবরুন্ত্যঃ প্রকোষ্ঠিহাশচকুঃ শখাঃ শ্বনং মহং।

সাত্ত্বগুণসিতং মধ্য মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।

বভর্জৈকৈকশঃ শঙ্খানু যৌ যৌ গোণ্যরশেষয়ঃ। ১১।১।৫-৭

ইহার অনুবাদ :—এক অবিবাহিতা কস্তার বহু (আত্মীয়-স্বজন)
গৃহে উপস্থিত না থাকার সময়, তাহাকে বরণ করিবার জন্য (পাকা
সেবা দেখিতে) তাহার গৃহে আগত লোকজনকে নিজে অভ্যর্থনা
করিয়াছিল। পরে তাহাদের থাইতে দিবার জন্য কিছু শালীধান
লইয়া গোপনে উদ্ভুলে কুটিতে লাগিল। সেই সময় তাহার হাতের
শাখায় বড় আঙাজ হইতে লাগিল। অতিথি আসিলে চাল
তৈয়ারী করা বড় লজ্জার কথা ভাবিয়া সে বাপাশাটা গোপন করিবার
জন্য এক এক হাতে দুই দুই গাছি চুড়ি রাখিয়া আর সকলগুলি
খুলিয়া ফেলিল।

মালাধর বহু এই ঘটনাটি এই ভাবে লিখিয়াছেন—

দম্পতী ঘর করে লঞা কস্তাখানি

(অথবা পাঠান্তর) (সকল প্রত্যেকেরএ চোর আছে কস্তাখানি)

কস্তা বিভা দিলে পিতা নিজ ঘরে আনি।

অতিথি আনিঞা ঘরে গেলা ভিক্ষাটনে।

জল আনিবারে মাতা করিল গমনে।

ছিয়া লৈয়া কস্তা সেই ধাতু কোটে ঘরে।

দুই হাতে সখা বাজে লজ্জা বড় করে।

হ'গাছি সখা এড়ি কাড়িয়া পেলিল।

তথাপি তাহার সখা বাজিতে লাগিল। (৫২৭-৭০)

বহুনাথ ভাগবতাচার্য্য উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটি অনুবাদ করিয়া
লিখিয়াছেন—

এক দ্বিজ ঘরে এক আছিল কুমারী ;

তাঁহাকে বরিতে আইল জনা দুই চারি।

পিতামাতা বহুগণ না ছিল মন্দিরে।

আপনে আত্মপ-কস্তা পুজিল আসরে।

মালাধরের রচনা মূল্যবান না হইলেও, এই স্থানে মাধবাচার্য্য
তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

অতিথি করিতে পিতা গেল ভিক্ষাটনে।

জল আনিবারে মাতা করিল গমনে।

ছোয়া লক্ষ করি ধান্য কুটি শূন্য ঘরে।

দুই হাতে শখা বাজে লজ্জা হেন করে। (পৃ: ৩৩০)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনেকগুলি স্তবস্ততি আছে। সাহিত্য-
ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ঐ স্তবস্ততি সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। মালাধর
বহু জনসাধারণের জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্তবস্ততি তাহাতে দার্শনিক
তত্ত্বের অবতারণা করিলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া তিনি
দুর্লভ দার্শনিক মতবাদ সর্বত্র বাদ দিয়া গিয়াছেন। ভাগবতের ৪০
অধ্যায়ে অক্রুরের স্তব ও ৮৭ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিস্ততি সন্ধ্যাে আমাদের
কবিকে নীরব থাকিতে হইয়াছে। এইরূপে মালাধর বহু দেবকীর
স্তব (৩১২৪-৩১), কংসের দার্শনিক মতবাদ (৪১৭-২২) নারদকর্তৃক
দারিদ্র্য-প্রশংসা (১০।৮-১৮), যমলঙ্কনের স্তব, (১০।২১-৩৭), ব্রহ্মার
স্তব (১৪১-৪০) গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ (৩২।১৭-২২),
নারদের স্তব ও ভবিষ্যদ্বাণী (৩৭।১-২৭), অক্রুরের ভক্তিময় ভাবনা
(৩৮।১-২৩), বৃন্দাবনে উদ্ধবের সাধনাপ্রদান (৪৬।৩০-৩৩, ৪৭।২১-৩৭,
৪৭।৫৮-৬০) মুচুকন্দের স্তব (৫১।৪৫-৫৭), শিবজয়ের স্তব (৬৩।২৫-
২৮), ক্রুরের স্তব (৬৩।৩৪-৪৫) এবং নৃগের স্তব (৬৪।২১-৪৪) বাদ
দিয়াছেন।

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন যে
শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে ব্রজের মধুর রস আশ্বাদন করা
জীবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। তাই দেখিতে পাই যে, মালাধর
বহু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের লীলাসমূহ অতি সংক্ষেপে সারিয়া
বীরসের উপর জোর দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত বেণুগীত
(২১ অধ্যায়), ভ্রমরগীত (৪৭।১২-২১) প্রভৃতি মাধুর্য্যসের আকর-
স্বরূপ অংশগুলি মালাধর বাদ দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের দেশের সাহিত্য-
মুরাঙ্গীরা শ্রীকৃষ্ণলীলা কি ভাবে আশ্বাদন করিতেন তাহা জানিতে
শুধু চণ্ডীদাস বিজাপতির গীতি কবিতা আলোচনা করিলে চলিবে না ;
গুণরাজধানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অনুধাবন করা
প্রয়োজন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা
করিতে শেষে শ্রমস্বীকার করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নূতন
গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি মধ্যযুগের বাংলা,
হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণচরিত সমূহের
মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের স্থান কোথায়, তাহা বিশদ ভাবে তুলনামূলক
আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা,
পাঠান্তরাদি ও শব্দমুদ্রা সহ খুব কম বাংলা বইষ্ট এ পর্যন্ত সম্পাদিত
হইয়াছে।*

* শ্রীকৃষ্ণ বিজয়—মালাধর বহু, অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ;
মূল্য দশ টাকা।

ভূপেন সদ্যানে বি-এ পাশ করিল।
শুধু-যে ফাষ্ট ক্লাস অনার্স পাইল
তাহা নয়, তালিকায় তাহার নামটা গোড়ার
দিকেই ছাপা হইল !

এ সম্বন্ধে তাহার মনের মধ্যে একটু
ভয়ই ছিল। সে পরীক্ষার আগের দিন
পর্যন্ত ত পড়াইতে গিয়াছেই, পরীক্ষার
মধ্যেও কামাই করে নাই। মোহিতবাবু
বার বার নিবেদন করা সত্ত্বেও সে শোনে
নাই। ফল বাহির হইতে সে তাড়াতাড়ি
মোহিতবাবুকে সবাবটা দিয়া প্রণাম করিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন,
ঐ সময়টা বেশী পড়লে ফাষ্ট হ'তে পারতে !

ভূপেনও হাসিয়া জবাব দিল, বলা যায় না। এখানে না এলে
হয় ত সিনেমায যেতুম। তাতে ফল আরও খারাপ হ'তো।

পরীক্ষা দিবার পর তাহার এক মাসীমা লক্ষ্যে হইতে চিঠি
দিয়াছিলেন সেখানে বেড়াইতে যাইবার জন্ত, খরচা তিনিই দিবে
এমন প্রতিশ্রুতিও ছিল চিঠির মধ্যে, তবু ভূপেন যায় নাই। সে
কোথাও না যাওয়াতে তাহার বন্ধু-বান্ধবরা একটু বিম্বিতই হইল।
অবশ্য সে ক্ষতি তাহার পূর্ণ করিয়া দিলেন মোহিতবাবুই। তিনি
দিন-পনেরোর জন্ত দার্কজিলিং গেলেন, সঙ্গে সন্ধ্যা ও ভূপেন দু'জনকেই
লইয়া গেলেন। ভূপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহার সন্ধ্যাকে
বাধিতেছিল কিন্তু সন্ধ্যা দুই ধমক দিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল; কহিল,
আমাদের সঙ্গে যাবেন তাতেও বুঝি আপনার আত্মসম্মানে বাধে ?
তার মানে এখনও আমাদের আপনি পর ভাবেন।

মোহিতবাবুও খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। সে-ত যাইতেই
চায়, দার্কজিলিং ও কাঞ্চনজঙ্ঘা—কত দিনের আশা তাহার! তাহার
উপর মোহিতবাবুর সঙ্গে একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ বাহাকে বলে।
সে রাজী হইয়া গেল। বন্ধু বিস্তার বাড়ী হইতে দুই-একটা গরম জামা
ও নিজের পৈত্রিক শাল সংগ্রহ করিয়া বন্ধু-বান্ধব সকলকেই প্রায়
সংবাদটা পৌছাইয়া দিয়া সে এক দিন দার্কজিলিং মেলে চড়িয়া বসিল।
সেকেণ্ড-ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া কোন দিন সে দার্কজিলিং যাইতে
পারিবে, এ ছিল তাহার কল্পনারও অতীত। শুধু এই যাওয়াটাই
তাহার জীবনে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আর দার্কজিলিং! পৃথিবীতে এত সন্দের স্থান যে আছে তাহা
সে কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই। মেঘ ও কুয়াশার সহিত
আলোকের সেখানে নিত্য লুকোচুরি চলে, মনে হয় তাহার আচ্ছ
মেঘল্লাকের উল্কে, বাকী সমস্ত পৃথিবীটা পড়িয়া আছে অনেক নীচে,
তাহাদের পায়ে তলায়। ফুলের মেলা চারি দিকে, বাস-ফুলের
মতই অজস্র গোলাপ ফুটিয়া আছে। সাধারণ একটা বন-ফুলের সৌন্দর্য্য
দেখিয়া সে দিশাহারা হইয়া যাইত এক-একদিন। তাহার মনে
হইত, এই যদি স্বর্গরাজ্য না হয় ত স্বর্গ ইহার চেয়ে খারাপ জায়গা
নিশ্চয়ই।

মোহিতবাবু সন্ধ্যাকে পাঠ্যপুস্তক কিছুই লইতে দেন নাই।
সে শুধু একখানা 'সবর্গদাতা' লইয়াছিল, মোহিতবাবু ভূপেনকে
বলিয়াছিলেন— অবসর সময়ে দুই একটি কবিতা বুঝাইয়া
দিবার জন্ত। এক এক দিন তাহার বই হাতে করিয়াই বাহির
হইয়া পড়িত। হয়ত জলা-পাহাড়ে উঠিবার পথে কোন একটা



(উপস্থাপন)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

বেষ্ণের উপর নয়ত বোটানিক্যাল গার্ডেনে
বাসের উপর বসিয়া চলিত তাহাদের কাব্য-
চর্চা। তাহাকে চর্চা বলিলে ভুল বলা
হইবে, সন্ধ্যা এক-একটি কবিতা বাছিয়া
মিত, ভূপেন সেই কবিতাটি একবার আবৃত্তি
করিয়া লইবার পর বুঝাইয়া দিত। তাহার
সৌভাগ্যক্রমে দু'একটি নাম-করা অধ্যাপকের
সঙ্গে পাওয়াতে বরীন্দ্রনাথের কবিতা সে
অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছিল—কিন্তু তবু
যেটুকু হয়ত তাহার নিজে হইতে কোন
দিনই বোঝা সম্ভব হইত না, সেটাও অনেক

সময়ে সন্ধ্যার প্রসঙ্গে যেন তাহার মানস-চক্ষুর সামনে স্বচ্ছ ও
পরিষ্কার হইয়া যাইত। এই মেয়েটির কাছে কোন ব্যাপ্যাকেই
কীকি চলিত না, সেই জন্ত কি পাঠ্য কি কবিতা পড়াইতে বসিয়া
সর্বদা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ-সতর্ক রাখিতে হইত।...এমনি
করিয়া সেই চিরতুবারাবৃত্ত মোন হিমালয়-শিখরের সামনে বসিয়া
বহুক্ষণ ধরিয়া চলিত তাহাদের কাব্য পাঠ—ভূপেন আপন মনে বলিয়া
যাইত আর সন্ধ্যা তাহার শ্রদ্ধাপূর্ণ শাস্ত চোখ দু'টি মেলিয়া জন্ত হইয়া
বসিয়া থাকিত। যে দিন মোহিতবাবু তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন
সে দিন ভূপেন কিছুতেই পড়িতে চাহিত না, কারণ, তাহার সম্বন্ধে
সম্বন্ধের সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল তাহার মনে, মোহিতবাবু নিজেই দুই-
একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনাইতেন। তাহার কণ্ঠস্বর ছিল
মিষ্ট এবং বাচনভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট ও অর্থবোধক—ভূপেন তাহার
আবৃত্তি হইতেই অনেক জিনিষ বুঝিতে পারিত যা এত দিন বার-বার
পড়িয়াও নিজে বুঝিতে পারে নাই।...

এমনি করিয়া দিন-কুড়ি কাটিয়া গেল। অবশেষে যখন বিদায়ের
সময় ঘনাইয়া আসিল তখন ভূপেন প্রথম আবিষ্কার করিল যে, তাহার
তিন সপ্তাহ হইল এখানে আসিয়াছে। সে থানিকটা চুপ করিয়া
থাকিয়া কল্পণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমাদের তাহ'লে কালই যেতে হবে।
মোহিতবাবু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, কালই নামতে হবে।
পরন্তু আমার একটা জরুরী কেস আছে, না গেলে তারা অত্যন্ত বিপদে
পড়বে, তা ছাড়া আমারও কথার খেলাপ হবে।

অগত্যা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভূপেন সেই 'স্বর্গ' হইতে
বিদায়ের জন্ত প্রস্তুত হইল। সে-দিন সে হৃপ্ত-বেলাই একা থানিকটা
ঘুরিয়া আসিল। হৃপ্তবেলা দার্কজিলিংয়ের নির্জন রাস্তায় কেমন
একটা মায়া আছে—বাহারা সে সন্ধান পাইয়াছে তাহার। এমনি
করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে। অনেকখানি ঘুরিয়া ক্লাস্তসেই যখন
সে ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা অল্পবেগের স্বরে কহিল, বাঃ রে,
আপনি ত বেশ লোক মাষ্টার মশাই, দিবিয়া একা-একা ঘুরে এসেন।
আজই ত শেষ দিন, আমি বুঝি আর বেরোব না ?

অপ্রতিভ ভাবে ভূপেন জবাব দিল, বেশ ত চলো না, আর
থানিকটা ঘুরে আসি—

সন্ধ্যা কহিল, হ্যাঁ, তাই বই কি! আপনি কত ঘুরে এসেন,
এখনও হীপাচ্ছেন—আবার এখনই বেরোলে আপনার কষ্ট হবে।

ভূপেন জিন্ ধরিয়া কহিল, কিছু কষ্ট হবে না। আর তা ছাড়া
আজই ত শেষ, কষ্ট একটু হ'লই না হয়, তবু যতটা বেড়িয়ে নিতে
পারি।

তবে একটু দাঁড়ান, আপনার জন্ত এক পেয়ালা চা ক'রে আনি।

ভূপেন বিমিত হইয়া কহিল, সে কি, এখনও ত তিনটেই বাজেনি, এরি মধ্যে চা ?

সন্ধ্যা জবাব দিল, হ'লই বা এরি মধ্যে। এক কাপ না হয় বেশীই খেলেন। কি রকম পরিশ্রমটা হয়েছে, তা ত আপনি বুঝেন না—এই শীতে এখনও ঘামছেন।

কথাটা বলিতে-বলিতেই সে চলিয়া গেল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না। বানিক পরে নিজেই এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিয়া কহিল, নিন, চট করে খেয়ে নিয়ে চলুন ঘরে আসি। দাড়কে বলে এসেছি—পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসে চা খেয়ে আবার কেবাব সবাই মিলে।

ভূপেন 'চলো' বলিয়া উঠিয়া ঠাড়াইয়া কহিল, বই নিলে না ?

সন্ধ্যা কহিল, আজ থাক মাষ্টার মশাই—আজ শুধু দেখব।

অনেকক্ষণ হুজুনে নিশাঙ্কে ঠাট্টার পর বার্ট হিলের রাস্তায় পড়িয়া সন্ধ্যা অতৃপ্ত হয়ে কহিল, না, আপনাকে টেনে আনা অস্বাভাবিক, আপনি দস্তবস্ত রাস্তা হয়ে পড়েছেন।...আর গিয়ে দরকার নেই, এইখানটাতেই একটু বসি আসুন—

ভূপেন সত্যিই এত প্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রতিবাদ-মাত্র না করিয়া বসিয়া পড়িল। দুই জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সন্ধ্যাই আবার কথা কহিল, মাষ্টার মশাই, বি-এ ত পাশ করলেন এবার নিশ্চয়ই এম-এ পড়বেন। তার পর কি করবেন ?...

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তার পর যে কি করব এখনও স্থির করিনি। বাবার ইচ্ছে আমি তাঁর অফিসে ঢুকি। এম-এ পড়ারও কোন অর্থ নেই তাঁর কাছে—তিনি এই পরীক্ষা সত্ত্বেও সন্তোষের সঙ্গে দরখাস্ত করতে বলছিলেন—এ যাত্রা কোন বকসে ঠাড়াটা কাটিয়েছি।

সন্ধ্যা বেন একটা রুঢ় আঘাত পাইল, কহিল, আপনি অফিসে চাকরী করবেন ?

ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, করবই যে তা এখনও ঠিক হয়নি—তবে করবাই ত কথা।...আমার মত অবস্থার শতকরা সাড়ে নিরেনকই জন ছেলেরই ত ঐ গতি।

সন্ধ্যা বেন একটু শিহরিয়া উঠিয়া জবাব দিল, না মাষ্টার মশাই, আপনি কেরাণীগিরি করবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

ভূপেন কহিল, তোমার দাছ বলছিলেন যে, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনটা পড়ে ফেলতে, তাহ'লে উনি আমার পসারের একটা উপায় করে দিতে পারবেন। কিন্তু ওকালতীও আমার ভাল লাগে না।

বয়স্ক অভিজাবিকার মতই ঘাড় নাড়িয়া সন্ধ্যা কহিল, না না, শুভে বড় মিথ্যা কথা বলতে হয়, তা ছাড়া ও সংসর্গাই ধারাব। আমি বলব, আপনি কি করেন ?

বলো।...ভূপেন সর্কোভুক দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, আপনি অধ্যাপক হবেন কোন কলেজে। আপনি পড়ানা ছাড়া অল্প কিছু কাজ করছেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

ভূপেন মাথা নীচু করিয়া একটা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, অধ্যাপকের কাজ পেলে আমিও আর কিছু চাই না, কিন্তু সে কি আর হবে ? কত এম-এ পাশ ছেলে ঘরে ঝেঁড়াচ্ছে, প্রোফেসরের চাকরী

আর কটা। তা ছাড়া, আমার তেমন কেউ জানাতেনো লোকও নেই যে, তদ্বির করে কোন কলেজে ঢুকিয়ে দেবে।

সন্ধ্যা আশ্বাস দিয়া কহিল, সে আপনি কিছু ভাববেন না মাষ্টার মশাই, বাহ্যিক করে একটা উপায় হয়েই যাবে। না হয় আর একটা এম-এ পাশ দিয়ে নেবেন। ডবল এম-এ হ'লে অনেকটা জোরে হবে না ?

ভূপেন তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, দেখা যাক।

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, ঐ কথাই ঠিক রইল ; অধ্যাপক আপনাকে হ'তেই হবে। আর কোন কাজ আমি করতে দেবো না।

ভূপেন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমরা বড় গরীব সন্ধ্যা ! বাংলা দেশে আমাদের মত গরীব অথচ ভ্রম-ঘরের ছেলেরা যে কত অসহায় তা তুমি শু আজ নয়, কোন দিনই বুঝতে পারবেন না। ইচ্ছে করলেই আমিও কিছু হতে পারি না। সমস্তটাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

কথাটা তাহার বুখিবার কথা নয়, তবু ভূপেনের কথার স্বরে সন্ধ্যা স্তব্ধ হইয়া গেল, আর জবাব দিতে পারিল না।

ভূপেনের ঐ কথাটা যে কি মধ্যাহ্নিক সত্য, তাহা বোধ হয় সে বলিবার সময় নিজেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিল আরও মাস-কতক পরে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই এক দিন।

দাঙ্কিলিঃ হইতে নামিয়া যথারীতি সে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিল। ইদানীং মোহিতবাবু তাহাকে চল্লিশ টাকা করিয়া বেতন দিতেন—একটা কেরাণীর বেতন। স্ততরাঃ বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি হইতে তাহার বাধে নাই। তাহার সব খরচ সে নিজেই চালায়, উপরন্তু সন্ধ্যারও কিছু দেয় বলিয়া তাহার বাবা একটু সমীহ করিয়াই চলিতেন। কিন্তু মাস-কয়েক সহজ ভাবে কাটিয়া যাইবার পর সহসা এক দিন মোহিতবাবু তাহাকে নিজের অফিস-ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, দেখ বাবা, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আজ আলোচনা করব।

ভূপেন চুপ করিয়া জিজ্ঞাসুনেজে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি কথা তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই, শুধু মোহিতবাবুর কঠোর ক্রোধ কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মোহিতবাবু মুহূর্ত্ত কয়েক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে বাবা। হঠাৎ তুমি কোন জবাব দিও না, বা মন স্থির করো না। আমি বা বলব মন দিয়ে শুনবে আর তার সব অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করবে—এই আমার অনুরোধ। অর্থাৎ আমার ভাল বুঝো না।...ঠিক ত ?

ভূপেন একটু হাসিয়া জবাব দিল, আপনার অতি তুচ্ছ কথাও আমি মন দিয়ে শুনি, স্ততরাঃ সে দিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওটা আমার অভ্যাসে ঠাঁড়িয়ে গেছে।

মোহিতবাবু তবুও যেন বানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কথাটা সন্ধ্যাকে নিয়েই। সন্ধ্যা পনেরো পূর্ণ হয়ে বোম্বয় পড়েছে—এই পত আশ্বিন মাসে। ঠিক অতটা বয়স ওর দেখার না বটে, কিন্তু আমাদের দেশের হিসেবে ওটা বিবেচনায়োগ্য বয়স।...তা ছাড়া

আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে মেয়েদের মন এই বয়সেই পকিভিত্তি দিকে বা পরিণত ধারণার দিকে মোড় ফেরে—সুতরাং এই সময় থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মোহিতবাবু আরও একবার চুপ করিলেন। তাঁহার বক্তব্যটা ঠিক কি বুঝিতে না পারিলেও একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভূপেনের বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সেও কথা কহিতে পারিল না।

মোহিতবাবু আবার শুরু করিলেন, সন্ধ্যা তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তা আমি জানি, অত শ্রদ্ধা সে এখন আমাকেও করে কি না সন্দেহ। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রেহ মেশানো। যাক—কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যে আরও কিছু দিন গেলে সেটা অজ্ঞ দিকেও মোড় ফিরতে পারে। এবং সেটা আমি চাই না।

এই সুবাদ, এই আশঙ্কায় ভূপেনের কাছে এতই অভাবনীয় যে, সে রীতিমত একটা বিষয়ের আঘাত অনুভব করিল। সন্ধ্যাকে এত অল্প বয়স হইতে দেখিয়াছে, এবং তাহাদের সম্পর্কটা প্রথম হইতেই এমন একটা মধুর যে, সেখানে অজ্ঞ কোন গভীরতর সম্পর্কের সম্ভাবনাই তাহার কোন দিন মনে পড়ে নাই। সে কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করিল না, কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাবে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মোহিতবাবু বলিয়াই চলিলেন, এই না চাওয়ায়ও একটা ইতিহাস আছে বাবা। তোমাকে আমি ভাল ছেলে বলেই জানি, তোমার ওপর আমার অনেক আশা আছে। যদিও তোমরা ঠিক আমাদের পালাটি ঘর নও, তবু সে রকম প্রয়োজন হ'লে আমি তোমার হাতে তাকে তুলে দিতে একটুও ইতস্তত করতুম না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। ওর মাকে আমি একটা সংপাত্র দেখে গরীবের ঘরে দিয়েছিলুম—বোধ হয় সে কিছু দুঃখ পেয়েছিল তার ফলে।...খাই চোক, মরবার সময় আমাকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে তার মেয়েকে আমি যেন কখনও গরীবের ঘরে না দিই। এই কথাটা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার—আমার সমস্ত ফিলজফীর বিরোধী এটা—কিন্তু আমি তার কথাটাও ঠেলতে পারব না বাবা, বিশেষ করে সে ঐ কথাটাই আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে—আপনার মেয়েকে আপনি যেখানে খুশী দিয়েছিলেন, আমার মেয়েকে আমি তা দিতে দেবো না।

মোহিতবাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ করি কন্ঠার মুত্যাশয়ার ছবিটাই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণের জ্ঞান অভিবৃত্ত করিয়া দিয়াছিল।...মিনিট তিন-চার পরে যেন তল্লা ভাসিয়া জাগিয়া উঠিলেন, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছো বাবা?

এতক্ষণ পরে ভূপেন কথা কহিল, কিন্তু এ সম্ভাবনা যে একটুও আছে, তাই যে আমার মনে হয় না—

সম্ভাবনা আছে কি না জানিনে বাবা, আশঙ্কা আছে। আর সেটা যখন আছে তখন আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভাল নয় কি? আজ যৌতু অসম্ভব আছে, কাল যদি সেটা সম্ভব হবে পড়ে, তখন ত আর ফেরার পথ থাকবে না!

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, আপনিই তাহ'লে বলুন কি করা উচিত।

মোহিতবাবু বলিলেন, সন্ধ্যা বা পড়াশুনো করবে তাতে এখন

থেকে ও নিজেই পড়তে পারবে বলে মনে হয়—ও বলছিল, পরীক্ষাগুলো একে একে দিয়ে রাখতে চায়—কিন্তু সে-ও ও নিজে নিজেই দিতে পারবে।...কিন্তু একটা কথা, তোমার পরীক্ষাটাও দেওয়া দরকার। তোমার কথা তুমি সবই আমাকে বলেছ, সেই জুড়ই সাহস ক'রে একটা অনুরোধ করছি—আর স্নেহেরও একটা অধিকার আছে আমার, এম-এ পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত তোমার খরচ আমার কাছ থেকেই নিতে হবে।...তোমার ওপর অনেক আশা আমার, মিথ্যা অভিমানের বশে নিজের কোন ক্ষতি ক'রো না, এই অনুরোধ।

মোহিতবাবুর কথা বলার ধরণে প্রথম হইতেই ভূপেন একটা বড় রকমের আশঙ্কা করিতেছিল বটে, তবু আঘাতটার আকস্মিকতা তাহাকে কিছু কালের জন্য যেন জড়, অনড় করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে, প্রাণপণ চেষ্টায় বর্ধস্বরকে স্বাভাবিক করিয়া কহিল, কিন্তু সেটা কি সম্ভব? আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি এ লিঙ্ক নিতে পারতেন?

মোহিতবাবু মাথা নীচু করিয়া জবাব দিলেন, তুমি খুবই ক্লান্ত হয়েছ বলে এত বড় কথাটা বললে বাবা, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের ঠিক এতটা দূরত্ব আর নেই। বেশ, তুমি এই টাকটা ঋণ বলেই নাও, এর পরে তোমার সময়মত শোধ দিও। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা মাটি করো না!

শেষের কথাগুলি মোহিতবাবু কতকটা মিনতির স্বরেই বলিলেন। ভূপেন নিজের রূতায় নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, ধানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সন্ধ্যাকে বলেছেন এ কথা?

মোহিতবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না। তাকে পরে বলব। সে আঘাত পাবে নিশ্চয়ই—কিন্তু আমার ওপর তার বিশ্বাস আছে, সে আমাকে ভুল বুঝবে না।

ভূপেন ঠেট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, আমাকে মাপ করবেন। এ সমস্ত কথাগুলোই এত আকস্মিক আর অভাবনীয় যে, আমি এখনও কিছু স্থির করে ভাবতেই পারছি না।

মোহিতবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি ভূপেনের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, এই ভুলটাই এত দিন আমাকে শীড়া দিচ্ছিল যে তুমি আমাকে ভুল না বোঝো। তুমি এখন বাড়ী যাও, ভাল করে সব ভেবে চাখো। শুধু এইটে মনে রেখো যে, এখন যদি তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দাও তাহ'লে আমার আত্মীয়-বিরোধের মতই তা প্রাণে লাগবে।

ভূপেন উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল, আমি সব কথা আর একবার আগাগোড়া না ভেবে আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না।

সে আর অপেক্ষা করিল না। তাহার মানসিক জড়তা এখনও কাটে নাই বলিয়া আঘাতের তীব্রতাটা সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; কিন্তু একটা অপরিণাম দৈহিক দুর্বলভাবে পা দুইটা যেন ভাসিয়া পড়িতেছিল। কোন মতে সিঁড়িটা পার হইয়া রাস্তার পড়িয়া সামনেই যে রিক্সাটা দেখিতে পাইল সেইটাতোই চাড়িয়া বসিল। একটা ভয় ছিল পাছে এই অবস্থাতে সন্ধ্যার সামনে পড়িতে হয়—নানা রকমের জবাবদিহি এবং পাড়াপাড়ির কথা তখন সে ভাবিতেই পারিতেছিল না—কিন্তু দৈবক্রমে সে পরীক্ষার আর তাহাকে পড়িতে হইল না।

[ক্রমশঃ]

বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতবাদ প্রধানতঃই নীতিমূলক। পারমাধিক-তত্ত্বের আলোচনা সেখানে নেই। বস্তুতঃ যে কোন প্রকার তত্ত্বালোচনায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিমূৰ্ণ ও মৌন। এই জীবন দুঃখ-ময়, কিংবা এই দুঃখের নিবৃত্তি হয় ও জীবনে পরম শান্তি লাভ করা যায়—এই দিকেই ছিল বুদ্ধদেবের লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এই মৌনতাকে কেন্দ্র করেই একটি সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্ন হলো, এই মৌনতার—অর্থ কি? বাস্তবিকই কী তিনি নিয়ত পরিবর্তনশীল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের বাইরে কোনো শাশ্বত সত্যকে স্বীকার করেননি? অথবা স্বীকার ক'রলেও তাকে নিজেই উপলব্ধি ক'রতে পারেননি? অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তরকে অবলম্বন ক'রে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠলো। নাগার্জুন-প্রচারিত 'মূলবাদ' তাদের সত্তম।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সাত শ' বছর পরে গৃহীত দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে দক্ষিণ-ভারতের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে নাগার্জুনের জন্ম হয়। বুদ্ধদেব নিজের নীতিশাস্ত্রকে মধ্যপন্থা বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, যেকোনো প্রকার একান্ত সিদ্ধান্ত বা মতবাদকে তিনি অস্বীকার ক'রতেন। নাগার্জুন বুদ্ধদেবের এই দিকটাই গ্রহণ করে গড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব দার্শনিক পদ্ধতি। একান্ত 'হা' ও একান্ত 'না'—'জগৎ-ই একমাত্র সত্য' অথবা 'জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা'—এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে তিনি তাঁর দার্শনিক বিচারে এক অপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁর প্রচারিত মতবাদের আর এক নাম 'মধ্যমিক' দর্শন। নাগার্জুন গোড়াতেই সত্যের একটা সংজ্ঞা ঠিক করে নিয়েছিলেন। যার মধ্যে অর্থ-সঙ্গতি নেই ও বা দ্বয়ঃ সম্পূর্ণ নয়—তা কখনই সত্য হতে পারে না। অর্থসঙ্গতি ও দ্বয়ঃ-সম্পূর্ণতা—সত্যের এই মানদণ্ড নিয়ে তিনি তাঁর বিচার শুরু করলেন। ফলে দেখা গেল, কোনো কিছুই সত্য নয়। কারণ, কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত এই জগতের কোনো কিছুই স্বকীয় অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক কার্য বা পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করে কতকগুলি সমসাময়িক কারণ ও অবস্থার উপর। উপযুক্ত কারণ ও অবস্থার অভাব ঘটলে ঐ কার্য বা পদার্থেরও বিনাশ অনিবার্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জগতের কোনো বস্তুই আত্মস্থ নয়। আর, বা আত্মস্থ নয় তা' সত্যও নয়। কাজেই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু তাই বলে সে অস্তিত্বহীন নয়। জগতের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার মূল বা সত্য এখানে নেই। এখানে অর্থাৎ এই ব্যবহারিক জগতে বা আছে তার সমস্তই অর্থ-সঙ্গতিহীন ও অব্যবহার্য; আমরা চলি, ফিরি, উঠি, বসি—আমাদের মধ্যে গতি আছে। কিন্তু এই গতি জিনিষটি আসলে কি? নাগার্জুন প্রমাণ ক'রলেন যে, গতির ব্যাখ্যা হয় না। অর্থাৎ চিন্তা ক'রে দেখতে গেলে গতির ধারণা অস্বাভাবিক। একটি পদার্থ একই মুহূর্তে দুই স্থানে থাকতে পারে না। চলবার সময় যে-পথকে আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি, সে-পথে আমরা চলি না; অথচ যে-পথকে অতিক্রম ক'রতে এখনও বাকী আছে, সে-পথেও অবর্তমান, অর্থাৎ নেই। কিন্তু পথকে ষাট দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অতিক্রান্ত ও অতিক্রম্য। প্রথমটি শেষ হ'য়ে গেছে, আর দ্বিতীয়টি নেই। অতএব অতিক্রম বা গতি বলে কোনো বস্তুই নেই (মধ্যমিক শাস্ত্র ২: ১)।

অতিক্রমণ এখন নেই, তখন অতিক্রমণকারী—কোনো ব্যক্তিও নেই (মা, শা, ২: ৬-৮)। দাধ্যমিক শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাগার্জুন এই ভাবে গতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অসঙ্গততা প্রমাণ ক'রলেন। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি নিলেন যৌগিক পদার্থ (সংক্ৰান্ত—composite substance)। আমরা জানি, যৌগিক পদার্থের জীবন বা অস্তিত্ব তিনটি মুহূর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ—উৎপত্তি, স্থিতি, ও বিনাশ (উৎপাদ-স্থিতি-লয়-সমাহার-স্বভাবম্) অর্থাৎ এই তিনটি পর্বেই একত্র সমাহার বা সমাবেশকেই যৌগিক পদার্থ বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু একই সময়ে এদের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। যেকোনো পদার্থেরই উৎপত্তি-মুহূর্তে তাব স্থিতি বা বিনাশ অসম্ভব। আবার স্থিতি ও বিনাশের মুহূর্তেও ঠিক তাই—উৎপত্তি সেখানে অসম্ভব। তাই হল বলতে হয় যে, উৎপত্তি, বা স্থিতি বা বিনাশ, এদের কোনো অবস্থাতেই যৌগিক পদার্থ বলে কোনো কিছু নেই, কেন না, যেকোনো মুহূর্তেই তিনটি মুহূর্তের একত্র সমাহার নেই। যৌগিক পদার্থও তাই সত্য নয়।

নবম অধ্যায়ে নাগার্জুন 'আত্মা' সম্বন্ধে বিচার ক'রলেন। আত্মার কাজ হ'লো দেখা শোনা ও অনুভব করা। এই ক্রিয়াগুলিকে বাদ দিলে আত্মাকে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ নাগার্জুন বলতে চাইলেন যে, আত্মার, এদের নিষ্পেক্ষ কোনো পূর্ব-অস্তিত্ব (Prior existence) নেই; অথচ এমনও বলা চলে না যে, সে অস্তিত্ব লাভ করে এই ক্রিয়াগুলির পরে (Posterior existence)। কেন না, দেখা, শোনা ইত্যাদি যদি আত্মাকে বাদ দিয়েই সম্ভব হয় তবে আত্মা নামে কোনো কিছুকে এই জটিলতার মধ্যে টেনে আনাই বুঝা। আত্মা বলে যদি কিছুকে অভিহিত করাতেই হয়—তবে মুহূর্তগত মানসিক অবস্থা (momentary mental states) সমূহের বাইরে কোনো কিছুর সম্বন্ধে তা চলেবে না। কেন না, বিজ্ঞ চেতনা (Consciousness as such) বা আত্মার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। নাগার্জুন অবশ্য এমন কথা বলেননি যে, গতি, বা যৌগিক পদার্থ বা আত্মা নেই। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, এই ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা কোনো বস্তুর সত্যরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। অর্থসঙ্গতি ও বোধগম্যতা যদি হয় সত্যের মাপ-কাঠি, তাহলে আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বীরা আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা দেখবেন যে, ইংরেজ দার্শনিক ব্রাডলে (Bradley) ও তাঁর দর্শনে এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তাঁর চিন্তাধারার কেন্দ্র হ'লো: 'Ultimate reality is such that it does not contradict itself. 'Reality is consistent.' 'The world...contradicts itself, and is therefore appearance, and not reality.' এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি নাগার্জুনেরই মতো গতি, বস্তু, আত্মা—ইত্যাদি ধারণার অব্যবহার্যতা প্রমাণ করেছেন। অবশ্য ব্রাডলের দর্শনে যুক্তির যে গঠন-কৌশল ও প্রয়োগ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত হৃদয় ও হৃদয়পূর্ণ। যদিও নাগার্জুনের মধ্যে এতোটা চমৎকারিতা ও উৎকর্ষ হয়তো পাওয়া যাবে না, তবু এটা ঠিক যে, সত্তের শ' বছর আগে নাগার্জুনের এ মতবাদ ও আধুনিক জগতে ব্রাডলের

দর্শন—পদ্ধতির দিক থেকে এদের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্যই নেই। নাগার্জুনের মতে, আমরা দেখেছি, এই ব্যবহারিক জগৎ বিরুদ্ধ-প্রাতিপক্ষ, আপেক্ষিক ও মায়াময়। ‘কার্য-কারণ’ ‘অংশ-সমগ্র’ ইত্যাদি যে সব ভিত্তির উপর জগতের অস্তিত্ব, তাদের সবই অর্থহীন ও আপেক্ষিক। ফলে, তাদের ভিত্তিতে যে জগৎকে আমরা অনুভব করি তা প্রকৃত সত্য নয়, প্রতীতিমাত্র সত্য ও সংহতি বা ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ জগৎ আছে অথচ তার যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যাখ্যা নেই—একেই নাগার্জুন বলেছেন ‘শূন্য’।

আমরা আগেই দেখেছি যে, নাগার্জুনের মতে এই জগতের কোনো কিছুই স্বকীয় অস্তিত্ব নেই। বুদ্ধদের তাঁর ‘প্রতীতিসমুৎপাদ’-এর দ্বারা এই কথাই বলেছিলেন। কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত এই জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল, অনিত্য ও কতকগুলি মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র। একের পর এক মুহূর্তের উৎপত্তি ও লয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই বিনাশশীল জগতের বৈচিত্র্য। একটি মুহূর্তকে জানতে হলে আমাদের যেতে হবে তার কারণস্বরূপ তার পূর্ব মুহূর্তটিতে, কিন্তু সেখানেও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, কারণ, তারও অস্তিত্ব নির্ভর করছে তারও পূর্বতর মুহূর্তটিতে। এই ভাবে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে যেতা দূরেই যাওয়া যাক না কেন, এই গতির আর শেষ নেই। অর্থাৎ কোনো বস্তুই স্বভাব-সম্পন্ন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। নাগার্জুন এই সত্যটিকে আরও বিশদ করে প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, যদি মনে করা যায় যে, বস্তু তার স্বভাবেই অবস্থান করে তাহলে বলতে হয় যে, তার অস্তিত্বের কোনো কারণ নেই। কেন না, স্বভাবে বা আত্মভাবে থাকার মানেই হ’লো কারণ বা অঙ্ক যে কোনো-কিছুর নিরপেক্ষ হয়ে স্বাধীন অস্তিত্ব (মা, শা, ২৪, ১৬)। বস্তুকে যদি কারণ-সমুচ্ছৃত বলেই মানতে হয়, তাহলে তার স্বভাব বা স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আবার যদি বলা যায় যে, কোনো বস্তুই অঙ্ক-নিরপেক্ষ নয়, স্বাধীন ও স্বভাবসম্পন্ন, তাহলে কারণহীন-বাদ মানতে হয় ও কারণ, কার্য, কর্তা, করণ, ক্রিয়া, জন্ম ও মৃত্যু এদের সকলকেই স্বীকার করতে হয় (মা, শা, ২৪, ১৭)। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো তা নয়। এমন কোনো ধর্ম নেই যা কারণ সমুচ্ছৃত নয়, অতএব এমন কোনোও ধর্ম নেই যা নিয়ত পরিবর্তনশীল নয় বা ‘অশূন্য’ (মা, শা, ২৪, ১৯)। নাগার্জুনের মতে, তাহলে এই জগৎ স্বভাবহীন, নিয়ত পরিণামী ও অবোধ্য। ‘শূন্যতা’ দ্বারা নাগার্জুন এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

‘কার্য-কারণ-সমুৎপত্তিকেই আমরা ‘শূন্যতা’ বলে থাকি’ (মা, শা, ২৪, ১৮)। শূন্যতার অর্থ, তাহলে, অস্তিত্বহীনতা নয়—নাগার্জুনকে ঠিক মতো বুঝতে হ’লে এই কথাটা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যিক। জগতের ঘটনা যে ভাবে বর্তমান রয়েছে, ‘শূন্যতা’ তারই বর্ণনা মাত্র। এই জগৎ ‘শূন্য’—মানে, বিরুদ্ধভাবাপন্ন, পরিণামী ও অসত্য। স্বয়ং-বুদ্ধদেরও এই ধরনের নেতিমূলক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু জগৎ ও জীবনের ইতিমূলক সত্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো মতবাদ তিনি প্রকাশ করেননি। আর, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই ইতিমূলক দিকটিকেই কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠেছিলো। ব্যাবৃত্তিক জগতকে অসত্য প্রমাণ করে নাগার্জুন এই কথা বলেন

যে, জীবনের মূল সত্য এখানে নেই। সে রয়েছে দেশ-কাল ও কার্য-কারণ বহির্ভূত নিরপেক্ষ এক অস্তিত্বের মধ্যে। কারণ, বিন্দু নেতি বলে কিছু থাকতে পারে না। নেতির পশ্চাতে যদি ‘ইতি’ না থাকে তাহলে সমস্ত চিন্তাই ভিত্তিহীন। নেতির ভিত্তিস্বরূপ তাই ইতি থাকতে বাধ্য। নাগার্জুন বলছেন, বুদ্ধদের উপদেশ দুইটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—একটি ব্যাবহারিক ও অঙ্কটি পারমাধিক। যারা এই দুয়ের পার্থক্য না বুঝেছেন, তাদের পক্ষে বুদ্ধোপদেশের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব (মা, শা, ২৪; ৮-৯)। নাগার্জুনের এই মন্তব্য বিশেষ অর্থপূর্ণ। কারণ, এর থেকে তাঁর চিন্তা ও মতবাদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শুধু মাত্র এই ব্যাবৃত্তিক জগতের অসম্পূর্ণতা ও অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করেই যে তিনি নিশ্চিত ছিলেন তা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো এই পরিণামী ও আপেক্ষিক অস্তিত্বের অন্তরালে কোনো একটি নিরপেক্ষ শাস্ত সত্তা আবিষ্কার করা। এই ব্যাবহারিক জগৎ যদি হয় মিথ্যা, তাহলে তার বাইরে সত্য বলে নিশ্চয়ই কিছু থাকবে। কেন না, সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যার কোনো অর্থ থাকা সম্ভব নয়। অতএব যুক্তির দিক দিয়ে কোনো পারমাধিক শাস্ত সত্তাকে আমাদের স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের মন ও তার মননরীতি এই জগতেরই বস্তু, সেই হেতু পারমাধিক সত্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ অচল। কোনো প্রকারেই সেই সত্যকে বর্ণনা করা বা প্রকাশ করা যেতে পারে না। “চোখে দেখা যায় না, মনে ধারণা করা যায় না, মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না,—সেই হ’লো সব চেয়ে বড়ো সত্য। যেখান থেকে সমস্ত কিছুকে এক সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা যায়, বুদ্ধদের তাকেই বলেছেন পরমার্থ বা পরম সত্য। তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।”

এই হ’লো নাগার্জুনের চিন্তাধারার ইতিমূলক দিক। একে বাদ দিয়ে জগতের বন্ধনা করা যায় না। নাগার্জুন একেও বলেন ‘শূন্য’, কোনো জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে একে জানা যায় না বা বর্ণনা করা যায় না। প্রজ্ঞাপারমিতায় বলা হয়েছে, “শূন্যতা বলতে তাকেই বোঝায়, যার কোনো কারণ নেই; যা চিন্তা ও ধারণার অতীত; যা অস্পষ্ট, অজ্ঞাত ও অপরিমেয়।” কুমারজীব তাঁর ভাষ্যে বলেন, “এই শূন্যতাই হ’লো একমাত্র মূল যার থেকে সমস্ত সম্ভব হয়েছে এবং একে বাদ দিলে জগতের কোনো কিছুই সম্ভব নয়।” নাগার্জুনের মতে তাহলে শূন্যতার দু’টি দিক। ব্যাবৃত্তিক (Phenomenal) জগতের ক্ষেত্রে এর মানে হ’লো কিয়ৎ পরিবর্তনশীলতা ও স্বভাবহীনতা; আর পারমাধিক জগতের ক্ষেত্রে শূন্যতা বলতে বোঝায় পরম অসীমতা (absolute unrestrictedness)। পারমাধিক সত্য অব্যক্ত। তাকে জানতে হ’লে আমাদের ব্যাবহারিক জগতের সমস্ত বৃত্তিকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। “সে অস্তিত্বময়ও নয়, আবার অস্তিত্বহীনও নয়। অস্তিত্ব অস্তিত্ব এদের দুইকে নিয়েও সে নেই, আবার এদের বাদ দিয়েও সে নেই” (মাধবাচাধ্য সর্বদর্শনসংগ্রহ; বাধাকল্প থেকে)। একে অস্তিত্বময় সত্তা বলা ভুল, কারণ একমাত্র সম্পূর্ণ (concrete) সত্তারই অস্তিত্ব আছে; আবার একে অস্তিত্বহীন অসত্তা বলাও ভুল, কেন না, যার কোনো প্রকাশ অস্তিত্ব নেই, যে অসৎ, তার থেকে সত্যের উদ্ভব হতে পারে না।

অথচ গোড়াতেই জগতের শাস্ত কার্যবহুত্ব একে আমরা মনে নিয়েছি।

অতএব এর সন্ধে যে কোনো প্রকার বর্ণনা এড়িয়ে চলাই সব চেয়ে নিরাপদ। নাগার্জুনের মতে সৃষ্টি ও ভাবার সার্থকতা শুধু মাত্র এই ব্যবহারিক জগতেই সীমাবদ্ধ। ফলে, আমাদের দৃষ্টিতে পারমাণবিক সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দৃষ্টিতে সে তাই শূন্য। তাই বুদ্ধদেব বলছেন, যে জিনিষকে বর্ণমালার কোনো অক্ষর দিয়েই প্রকাশ করা যায় না, তার সন্ধে কোনো প্রকার বর্ণনা কি করে সম্ভব? এমন কি, এই যে বলা হ'লো যে, বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে একে প্রকাশ করা যায় না, এও সেই বর্ণমালারই সাহায্যে সেই অনির্কটনীয় পারমাণবিক সত্য, শূন্যতা শব্দের দ্বারা থাকে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে, তারই সন্ধে বলা হ'লো। পারমাণবিক সত্য সকল প্রকার আপেক্ষিকতার অতীত ও জাগতিক দৃষ্টিতে শূন্য—এই ধারণাটা, মনে হয়, অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দার্শনিক ডানস্ স্কোটাস্ (Duns Scotus) বলেছেন, ঈশ্বরকে যে 'শূন্য' বলা হয় সেটা অসঙ্গত নয় (God is not improperly called nothing)। আধুনিক যুগে ভাউলো বলেছেন; 'যা সম্বন্ধগত আপেক্ষিক নয়, চিন্তার পক্ষে তা 'শূন্য' (For thought, what is not relative, is nothing)। পরম সত্যকে ধারণা করবার অক্ষমতা থেকে তাঁর এই অস্বীকার ক'রলে অজ্ঞান হ'বে। তাঁর সপক্ষে একমাত্র প্রমাণ এই নির্কণ-স্বথ। জগৎ-প্রপঞ্চের উপশম ও পরম আনন্দময় না, সেই হলো নির্কণ।

চেতনার কেন্দ্রে আমরা দৈনন্দিন জীবন যাপন করি, গানে জগৎ-প্রপঞ্চের সাথে আমাদের চেতনা অবিস্মিত ভাবে ঝুঁত হ'য়ে র'য়েছে এবং সে এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে এই জগতের মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পরম জ্ঞান দর্শন সেতে হ'লে চেতনার সৃষ্টি আবশ্যিক। জগৎ-পঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে চেতনাকে তার স্বতন্ত্র স্বরূপ উল্কাটন করা—এই হ'লো জগতের উপশম ও আনন্দময় চেতনা। এক দিকে বস্ত্তিক জগৎ, আর অন্য দিকে পারমাণবিক জগৎ—এই হ'য়ের এক কে নিষ্কমণ ও অস্ত্রে প্রবেশ, এই নিয়েই নির্কণ। আমরা খেঁচি, নাগার্জুন তাঁর শূন্যতার ব্যাখ্যার সময়েও এই দুই গং ও সত্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শূন্যতা ও নির্কণ ক্রতপক্ষে একই বস্তু। বাস্তবিক (objective) স্বেত্বে বা 'শূন্য'

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তাই নির্কণ। শূন্যতার এক অর্থ হ'লো সংসার গতির যথাযথ বর্ণনা, নির্কণের ত এক অর্থ তাই। এই জগতেই নাগার্জুন বলেন, সংসার ও নির্কণ একই বস্তু (মা, শা, ২৫, ১১)। যদি মনে করা যায় যে, জগতের বিনাশ সাধনই নির্কণ, তাহলে নির্কণ হয়ে পড়ায় এক আপেক্ষিক তত্ত্ব। কেন না, তাহলে বলতে হয় যে, জগতের বিনাশের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। আবার যদি বলা যায় যে, নির্কণের পূর্বে জগৎ ছিল, কিন্তু নির্কণের পর আর থাকে না, তাহলে সে হবে অসৌন্দর্যিক। কেন না, তাহলে বলতে হয় যে, বুদ্ধদেবও কোনো দিন নির্কণ লাভ করেননি, কারণ মৃত্যুর দিন পর্যন্তও তিনি যে কণ্ববাস্তব জীবন যাপন করে গেছেন তা থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে যে, জগতের অস্তিত্ব তাঁর কাছে থেকে কোনো দিনই লোপ পায়নি। এই প্রকার চিন্তা থেকে নাগার্জুন বলেন যে, ব্যবহারিক ও পারমাণবিক সংসার ও নির্কণ—এদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কার্য-কারণের দিক থেকে দেখলে, এই জগতকে আমরা ব্যবস্তিক ব'লে থাকি। আবার কার্য-কারণ ও অস্ত-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে একেই আমরা পরমাণবিক বলে থাকি (বাস্তবত্বগত থেকে)।

যতক্ষণ কার্য-কারণের দিক থেকে এই জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করছি, জীবনের দুঃখ কষ্ট ব্যাধি ইত্যাদি আমাদের কাছে শুধু তত্ত্বগতই সত্য। কিন্তু যিনি পারমাণবিক দৃষ্টিলাভ করেছেন তাঁর কাছে এদের সবই মিথ্যা, এবং কোনো প্রকার নীতিজ্ঞানও তাঁর কাছে অর্থহীন। কেন না, ভালো-মন্দের সমস্তা থেকেই নীতিজ্ঞানের উদ্ভব। কিন্তু পারমাণবিক দৃষ্টিতে ভালো-মন্দের পৃথক সত্য একেবারেই বিলুপ্ত। আমরা পূর্বেই উল্লেখ ক'রেছি যে, বুদ্ধদেবের শিক্ষার মধ্যে নাগার্জুন দু'টি সত্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন—ব্যবহারিক ও পারমাণবিক। আমাদের যতো কিছু সমস্তা, প্রস্তু, প্রযত্ন—সবই এই ব্যবহারিক সত্য-সংক্রান্ত। পারমাণবিক সত্যের আলোকে এরা এক নূতন রূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। তুলনা ক'রে ব্যবহারিক সত্যকে যদি বলা যায় সুপ্ত অবস্থা, পারমাণবিক সত্য তাহলে হবে জাগ্রত অবস্থা। সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্ন-জগৎ একান্ত সত্য ব'লে প্রতীয়মান হয়। জাগরণে তা আর হয় না। কিন্তু তাই ব'লে সে একেবারে মিথ্যা হ'য়েও যায় না। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার একান্ত রূপটি দূর হ'য়ে গিয়ে সে আর এক অর্থ ও রূপ পরিগ্রহ করে।

হের-ফের

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ইহুসে যবে বিরোধ ঘটেছে কখনো কাহারো সাথে,
সেই হুল করিয়াছি ত্যাগ তার পরদিনই প্রাতে।
হান-হিস্যাকেই সম্ভব ছিল, ধারি নি কো কারো ধায়,
অবিসে যে আত্ম এক লায়না—কি করেছি প্রতিকার?

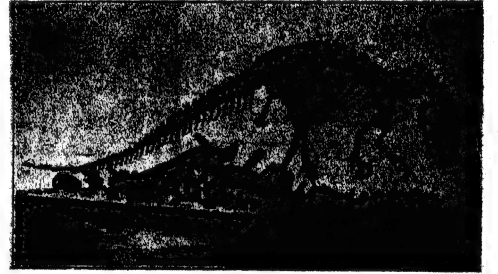
“ফোসিল” শব্দটি ল্যাটিন কথা “Fossilia” হ’তে এসেছে।

“Fossilia” কথাটি আবার “Fodere” কথা হতে উদ্ভূত। “Fodere” কথার অর্থ “খনন করে তোলা।” ফোসিল তা’হলে হ’লো এমন একটি বস্তু যা মাটি খনন করে তুলতে হয়। ফোসিল কথার সংজ্ঞা অনেকে অনেক রকম দিয়েছেন। তবে, ফোসিল বলতে সচরাচর যা বোঝায় সেটি হ’চ্ছে প্রস্তরীভূত কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ বা দেহের কোন অংশ। কোন কালে সে প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবিত ছিল। এই পৃথিবীরই জল, বায়ু, রোদ সেবন করে এই পৃথিবীর বুকেই সে বেড়ে উঠেছিল। তার পর কোন ক্রমে, জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পরে মাটির স্তরে চাপা পড়ে যায়। মাটির স্তরের পর স্তর তার ওপর জমা হয়ে এক বিপুল ভাবের সৃষ্টি করে। ওদিকে মৃতদেহের জৈব পদার্থগুলি ধীরে ধীরে মাটি শুষ নেয়। তার পরিবর্তে মাটির অজৈব পদার্থগুলি ধীরে ধীরে ওর ভেতর ঢোকে। ক্রমে ক্রমে জৈব-পদার্থের পরিবর্তে অজৈব পদার্থ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ করে ফেলে। সাধারণতঃ উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের কঠিন অংশই “ফোসিলে” পরিণত হয়। প্রাণিদেহের মাস, পেশী ও অপেক্ষাকৃত কোমল অংশগুলি গলিত হয়ে মাটি হয়ে যায়। হাড়ের ভেতরের মেদ ও মজ্জা ধীরে ধীরে বাহির হয়ে মাটিতে মিশে যায়, আর ঐ সমস্ত জৈব পদার্থের স্থানে অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ বা ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, সিলিকা প্রভৃতি বস্তুর কণা প্রবেশ করে কালক্রমে হাড়ের ভেতরের শূন্য স্থান পূর্ণ করে ফেলে। ঐ জৈব ও অজৈব পদার্থের স্থানান্তর এত ধীরে ধীরে হয়, ও ঐ পদার্থের কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, হাড়ের বাইরের আকার প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কাজেই রাসায়নিক পদার্থের আমূল পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও,—হাড়ের আকার ও গঠনের আদৌ কোন পরিবর্তন হয় না।

এক জায়গায় হয়ত এক দিন একটি বিরাট বনানী ছিল; হঠাৎ এক বিরাট ভূমিকম্পের ফলে বড় বড় গাছগুলি ভূমিসাৎ হ’লো; মাটির বিরাট গহ্বরের ভেতর তার কতক কতক ঢুকে গেল। তার পর গাছ আপনান্ন ভাবে আপনি মাটির নীচে নামতে শুরু করল। কালক্রমে মাটি ওপর থেকে তাদের সমাধিস্থ করে ফেললে। আগ্নেয়-গিরির গলিত ধাতু-নিঃস্রাব, লাভা, ছাই, ভস্মও অনেক সময় ওপর থেকে তাদের আবৃত করে ফেলে। বহু কাল এই ভাবে তা’রা ভূগর্ভে শায়িত রইল, তার উপরে আবার নতুন গাছপালা জন্মে স্থানটিকে এমন করে ফেললে, যাতে পরিবেশ হ’তে সে স্থানটিকে পৃথক করার আর কোন উপায়ই রইল না। হঠাৎ এক দিন এক দল লোক এসে, নতুন বসতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই হোক আর খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যেই হোক বা অপর কোন কারণেই হোক সেই স্থানের মাটি খুঁড়ে তুলে শুরু করল। সহসা খনন-যন্ত্র এক কঠিন জিনিষে গিয়ে ঠেকে ঝন-ঝন শব্দে ঠিকরে ফিরে এল। খননকারীর দৃষ্টি পড়ল, কঠিন বস্তুটির ওপর—অতি সাবধানে তার চার পাশের নরম মাটি খুঁড়ে—কঠিন পদার্থটি অতি সতর্কপণে পরিষ্কার করা হ’ল—কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেটি একটি গাছের গুড়ি,—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তার সমস্ত গা, কাণের মতন কঠিন পদার্থে তৈরী, আকার গঠন সাধারণ গাছের বড়লের মত হলোও,—সাধারণ গাছের গায়ে বারাল অঙ্গের বা দিলে বা যেমন বসে যায়, তার গায় বা তেমন বসে না—অবিকল

পাথরের মত অঙ্গের ধার ভোঁতা করে দেয়, অঙ্গ ঠিকরে ফিরে আসে—সাধারণ গাছের মত ইহা অঙ্গে কাটে না, কাণের মত ভেঙ্গে যায়।

এর ওজনও কাণের চেয়ে বহু গুণ বেশী ভারী। এর নাম হ’লো প্রস্তরীভূত গাছ বা গাছের ফোসিল। ভূতত্ত্ববিদেরা এ স্থানে এসে গাছের অজৈব খনিজ পদার্থের সময় এবং ভূমির ওপরের স্তর হ’তে এগুলি কত নিম্নে প্রোথিত হয়েছে, তা দেখে বলে দেবেন,—কত কাল পূর্বে ঐ গাছগুলি জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীর মাটির একেবারে ওপরের স্তরে ছিল। প্রাণিদেহের কঠিন অংশও ঠিক এই ভাবেই প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। ভূতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদেরা এ রকম কত ফোসিলের আবিষ্কার করেন, তার ইয়ত্তা নেই। নৃতত্ত্ববিদেরা জাতীয় পিথিকান্থ থোপাস্ নামক মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার এক ইহার অমূল্য পৃথিবীর অপরাপর অংশের মানুষের সম্পূর্ণ বা আংশিক কঙ্কালের ফোসিল হ’তে আজ মানব জাতির পূর্বপুরুষদের আকৃতি কিরূপ ছিল তার প্রায় সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। এইরূপ পর পর ধারাবাহিক কতকগুলি ফোসিল থেকেই বোঝা যায়,—একটি ছোট জলহস্তার মত মুখবিশিষ্ট ইয়োসিন্ যুগের মিরিথেরিয়াম নামক প্রাণী হ’তেই আজকের বিরাটকার হস্তার উদ্ভব হয়েছে; এই আদি জীবটির আদৌ কোন গুড়ি ছিল না। এইরূপ ধারাবাহিক ফোসিল-কঙ্কালের



ডিনোস্তর

আবিষ্কার হতেই জানা গেছে,—আজকের অর্থ যত বড়, এর পূর্ব-পুরুষরা এত বড় ছিল না। এদের আদি-বংশধরটি ছিল একটি অতি ছোট জীব—তার আজকের ঘোড়ার মত খুব ছিল না,—তার পরিবর্তে ছিল পাঁচটি নখবিশিষ্ট পাঁচটি আঙ্গুল, এখনকার অঙ্গের দাঁতের সঙ্গেও তার দাঁতের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্রাচীন ভূখণ্ডের (উত্তর আমেরিকার) নিম্ন-ইয়োসিন্-স্তরে এই জীবটি পাওয়া যায়; ইহার নাম “ইয়োসিহান্সাস্”; অল্প-বংশের ইহারই পরবর্তী পর্যায়ের যে জীবটি আমরা পাই, তার নাম হ’লো “অরোহিহান্সাস্”; এটির ফোসিল-কঙ্কাল পাওয়া গেছে ইয়োসিন্-স্তরের মধ্য-ইয়োসিন্-স্তরে। এর পায়ের একটি আঙ্গুল কম। এর আকারও ইওহিহান্সাস্ থেকে বড়। তার পরের পর্যায়ের উত্তর আমেরিকার মধ্য-ওলিগোসিন্-স্তরে, মেসোহিহান্সাস্ নামক একটি জীব পাওয়া যায়,—সেট আকারে আরও বড়; মুখের আকৃতি অঙ্গের আরও কাছাকাছি। এদের পায়ের আরও একটি আঙ্গুল কম অর্থাৎ তিনটি, এইরূপ আরও কতকগুলি মধ্যবর্তী অবস্থার ভেতর দিয়ে নেবরাকার ট্রিয়ারোসিন্-স্তরে ট্রিওহিহান্সাস্ নামক একটি জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়; এর অবনয়, দাঁত, পায়ের খুর

অবিকল আধুনিক কালের অশ্বেরই মত। এদের আকারও আদি পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক বড়, তবে আধুনিক অশ্বের চেয়ে কিছু ছোট। এই রকম ফোসিল কঙ্কাল হ'তেই আমরা জানতে পারি,—সরীসৃপ হ'তে আধুনিক উড্ডয়নশীল পক্ষীর উদ্ভব হ'য়েছে। ব্যাডেরিয়াস্থ সোলেনহোফেনের লিথোগ্রাফিক্ "চুনা-পাথর"-স্তর থেকে ছুটি পাখীর মত বিচিত্র জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন, এই দুটিই হ'লো জুরাসিক যুগের জীব। এর একটির নাম "আরকিওপ্টেরিক্স-লিথোগ্রাফিকা" ও অপরটির নাম আরকি-অব-নিথেন্স। এই দুটি প্রস্তরীভূত পাখীর কঙ্কাল প্রমাণ করে,—সরীসৃপ হ'তেই আধুনিক পক্ষী জাতির উদ্ভব। এদের মুখে সরীসৃপের মত দাঁতের চিহ্ন আছে; পাশ্বে সরীসৃপের মত নখ আছে,—ডানার ওপরে সরীসৃপের সামনের নখযুক্ত পা দুটির চিহ্ন এখনও স্পষ্ট বর্তমান,—এবং এদের লাঙ্গলের অস্থিসারি অবিকল গিরগিটির মত। আবার লাঙ্গল ও ডানায় পাখীর পালকের মত বড় বড় পালক আছে। কিন্তু এদের ল্যেঞ্জের পালক-সম্ভায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক পাখীর ল্যেঞ্জের পালকগুলি জাপানী পাখা বা তালপাতার মত চতুর্ভুজিক



ম্যামথ

বিন্যস্ত ভাবে ছড়ান থাকে, দাঁঘ ল্যেঞ্জের দু'পাশে পালকগুলি নারিকেল পাতার মত সাজান। এ পাখী দুটি এক দিকে সরীসৃপ অপর দিকে আধুনিক উড়ন্ত পাখীর মধ্যবর্তী জীব। পাশাপাশি দুটি সম্পূর্ণ ছজাতীয় জীবেরই লক্ষণ যুগপৎ এদের দেহে বর্তমান রয়েছে। এই ফোসিল দু'টি হ'তে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "শীতল-রক্ত, চতুষ্পদ শব্দ্যবৃত্ত, ডুচর, জলচর বা উভচর "গিরগিটি" জাতীয় জীব হ'তেই উষ্ণ-রক্ত, দ্বিপদ, পালকবিশিষ্ট উড্ডয়নশীল আধুনিক পক্ষীর উদ্ভব হয়েছে।" এরূপ ফোসিল পাওয়া গেছে বলেই আজ আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'চ্ছি; এ প্রমাণ ব্যতীত, সম্পূর্ণ, বিপরীতধর্মী সরীসৃপ হ'তে পক্ষীর উদ্ভব হয়েছে এ কথা বললে লোকে পাগল বলেই উপহাস করত। এই পাখী দুটির প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অতি স্থল "লাইম-ষ্টোনে" বা চুনা পাথরে প্রোথিত থাকায় ফোসিলগুলি এত চমৎকার আছে যে, অস্থির ত কথাই নেই এদের সমস্ত পালকগুলি পর্যন্ত অবিকৃত আছে। এই ত গেল সাধারণ ফোসিলের কথা, কিন্তু সব ফোসিলই এ রকম হয় না। ফোসিল নানা ভাবে হতে পারে।

কি কি উপায়ে ফোসিল বা জৈবদেহের সংরক্ষণ হতে পারে এবার তার আলোচনা করা যাক।

১। (ক) বরফে ও স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণ

পৃথিবীর শীতপ্রধান অঞ্চল,—যেমন সাইবেরিয়ার আর্টিক তুন্দ্রার বরফের চাণ্ডের মধ্যে কিংবা মাটির ওপর বরফ চাপা অবস্থায় অনেক জীব-জন্তুর মৃতদেহ পাওয়া যায় একেবারে অবিকৃত অবস্থায়। লেনা 'ব'-রাপে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে একটি জন্তুর ফোসিল পাওয়া যায়; লেলিংগ্রাড গ্যাকাডেমিতে এখন জঙ্ঘটি সংরক্ষিত আছে। এর মাথা ও পায়ের চামড়ার লোমগুলি পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ১১০১ খৃষ্টাব্দে সাইবেরিয়ায় বেরিং প্রণালীর ৮০০ মাইল পশ্চিমে এই রকম একটি জন্তু পাওয়া যায়। এটিকে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, জীবাট দুটোতে দুটোতে স্বাভাবিক ভুগর্ভে পড়ে যায়, তার পর বরফ চাপা পড়ে। জঙ্ঘটির একটি সামনের পা ও পাহার হাড়, ভাস্ক্রা, বুকের নিচে খানিকটা জমা রক্ত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকতে দেখা যায় এবং বন্ধ দাঁতের কঁকের ভেতর তখনও অজুস্ত কতকগুলি ঘাস ছিল। জঙ্ঘটি যখন চরছিল, সম্ভবতঃ কুকুর অথবা অপর কোন হিংস্র জন্তু তাকে তাড়া করে; বেচারী দুটোতে দুটোতে গর্ভে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার পর বরফে ওর দেহ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে যায়। এখন এটি লেলিংগ্রাড, যাহুথরে সংরক্ষিত আছে।

(খ) তেল, মোম, পিচ্ প্রভৃতিতে সংরক্ষণ

স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণের আর একটি উপায় আছে। এটি হলো তেল, মোম বা পিচ্ দ্বারা। বরডোজ্যানিতে পোল্যান্ডের ইস্টার্ন গোসিল্লার বিস্তীর্ণ তেল ও মোমের খনি আছে। ১১০৭ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি গুটার নিখুঁত, স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং এই অঞ্চলেই,—প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় সংরক্ষিত একটি ম্যামথও আবিষ্কৃত হয়।

নিউ-মেক্সিকোর আয়েয়গিরির গহ্বরে সমস্ত পেশী ও লোম-সম্বিত একটি স্তন্য পাওয়া গেছে; এটি বাহুড়ের বিষ্ঠায় এইরূপ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এর দাঁঘ লোমের হ'লদে রং পর্যন্ত এখনও অবিকৃত আছে। ইয়েল পি-বডি যাহুথরে এটি সংরক্ষিত আছে। তবে এ জাতীয় সংরক্ষণকে ঠিক ফোসিল বলা যায় না।

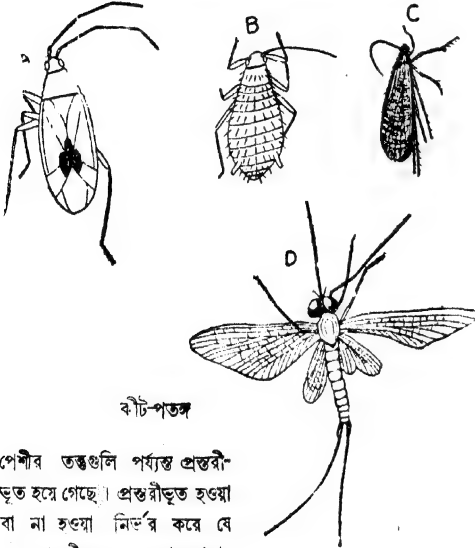
(গ) ম্যাগ্নেটাইট বা রজনেনে সংরক্ষণ

রজন বা ম্যাগ্নেটাইট হ'লে ছোট ছোট জীব-জন্তু এবং কীট-পতঙ্গ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। পিসিয়া সাক্সিনিফেরা নামক এক রকম পাইনগাছের রস বা আঠা গাছ হ'তে বার হওয়ার সময় বেশ তরল থাকে, কিন্তু পরে বাতাস লেগে কঠিন হয়ে যায়। তরল অবস্থায় এই আঠাল রস ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের দেহের ভেতর অতি সহজই প্রবেশ করে; চার পাশ হতে ওদের দেহ আবৃত করে ফেলে, তার পর কঠিন হয়ে কালক্রমে কাচের মত হয়ে যায়; কঠিন অবস্থায় এই আঠাকে ম্যাগ্নেটাইট বলা যায়। ম্যাগ্নেটাইট কীট-পতঙ্গের ডানা, শোঁয়া প্রভৃতির মত অতি স্থল অংশগুলি পর্যন্ত একেবারে অবিকৃত অবস্থায় থাকতে দেখা গেছে। ওলিগোসিন্ যুগের ম্যাগ্নেটাইট সংরক্ষিত প্রায় হ'াজার জাতের কীট পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাকড়সা ও অপরূপ প্রাণীও অনেক পাওয়া গেছে। প্রায় এক শত বিভিন্ন জাতের ঘি (বীজ) পত্রী অর্থাৎ উদ্ভবের চারা গাছ

দ্বাধারে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। জাফালীর বাস্‌টিক উপকূলের বাস্‌টিক-দ্বাধার বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে।

২। প্রস্তরীভূত হয় কেমন করে?

জীবজন্তু ও গাছপালা কি করে প্রস্তরে পরিণত হয় আগেই সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। পূর্বেই বলেছি যে, সাধারণতঃ গাছ ও জীবজন্তুর দেহের কঠিন অংশ অর্থাৎ অস্থি, দন্ত, শব্দের খোল, কাঁকড়া জাতের জীবের খোলা প্রভৃতি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে,—অপেক্ষাকৃত কোমল অংশ যে একেবারেই প্রস্তরীভূত হয় না, এ কথা বলা যায় না। বাস্‌ফোর্ড ডীন্‌ ওহিওর ক্লিভল্যান্ড-স্তর হ'তে একটি জন্তুর ফোসিল আবিষ্কার করেছেন; তা'তে



বীট-পতঙ্গ

পেশীর তন্তুগুলি পর্যন্ত প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। প্রস্তরীভূত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে যে বস্তু প্রস্তরীভূত হবে তার রাসা-

য়নিক সমন্বয় ও তার পরিবেশের মাটার খনিজ পদার্থের ওপর। তবে, প্রস্তরীভূত হওয়ার মাত্রা সময়ের ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে—সাধারণতঃ যত কাল যায়, তত রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বাড়ে ও ফোসিল কঠিন হ'তে থাকে। কালক্রমে ফোসিল এমন এক অবস্থায় এসে পড়ে, যখন এর সমস্ত অংশটি অতি কঠিন কাঁচ বা সিলিকায় (Silica) পরিণত হয়; এ সম্বন্ধে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফোসিল-তত্ত্ববিদ্যার রিচার্ড স্যোয়ান্স লাল বলেছেন—“Petrification implies interstitial addition, or an extremely gradual replacement, molecule for molecule, as the original substance is lost through disintegration. The resultant fossil retains therefore, not only the external form, but the histologic characters.” অতি ধীরে ধীরে অণু অণু করে। উদ্ভিদ বা জীব দেহের মৌলিক পদার্থের অন্তর্দান ও তার জায়গায় নতুন রাসায়নিক পদার্থের আগমনকে আর এক কথায় বলা হয় “হিষ্টোমেটাবেসিস”। হিষ্টন্‌ অর্থে “চিহ্ন” এবং “মেটাবিস” অর্থে বিনিময়। এই ভাবে যে ফোসিলের সৃষ্টি হয় তাকেই বলা যেতে পারে আসল ফোসিল। এই জাতীয় ফোসিলে বাহিরের ও তেতরের আকার ও গঠন হুইই থাকে

অপরিবর্তিত। পরিবর্তন যা হয়, সেটা কেবল পদার্থের, আকারের নয়। “Petrification preserves histology as well as morphology” কাজেই অতীতের জীব বা উদ্ভিদ দেহের নিখুঁত আকৃতির ইতিহাস আবিষ্কারের পক্ষে এ জাতীয় ফোসিল অমূল্য সম্পদ। ভেতরের গঠনও অবিকৃত থাকায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের পরীক্ষার পক্ষেও এগুলি অতি মূল্যবান অতীতের সাক্ষ্য।

আদিম কালের “cycad” গাছের আভ্যন্তরীণ গঠন কেমন ছিল, তা নিয়ে উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা এক দিন কঠিন সমস্যা পড়েন। তার পর বৈজ্ঞানিক ওয়াইল্যান্ড এই জাতীয় সিকোড, গাছের প্রস্তরীভূত একটি ফোসিল পান;—অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ফোসিলের আভ্যন্তরীণ গঠন পরীক্ষা করে এই অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করেন। অবশ্য এই জাতীয় পরীক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কাঠের মত কঠিন পদার্থকে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করতে হ'লে অতি সূক্ষ্মপণে ও বহু পরিশ্রমে প্রথমে ফোসিলকে খুব পাতলা পাতলা ফালিতে পরিণত করতে হয়, ঠিক যেমন করে হাকাক (যারা হীরে কাটে) মূল্যবান মণি জহরাদি কাটে; তার পর ঐ ফালিগুলিকে ঘষে ঘষে অতি সূক্ষ্ম কিল্লীর মত সেকস্ত্রানে পরিণত করা হয়; অতঃপর পালিস্‌ করে ঐ “সেকস্ত্রান”-গুলি স্বচ্ছ করা হয়; যাতে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষার সময় ওদের ভেতর দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে আলো প্রবেশ করতে পারে। এর পর সূক্ষ্ম হয় পরীক্ষা। এক এক দিক হ'তে এক এক সেট সেকস্ত্রান কেটে পরীক্ষা চলে; তার পর এই খণ্ড ইতিহাসগুলি বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের মত একত্রিত করে, পরীক্ষা-বস্তুর আভ্যন্তরীণ গঠনের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়।

উদ্ভিদ-দেহে প্রচুর পরিমাণে কঠিনজাতীয় বস্তু থাকায়, ফোসিল অবস্থায় ওদের দেহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত হয়; গাছের বাইরের আকার অবিকৃতই থাকে, কিন্তু প্রাণিদেহের বাইরের কোমল মাংস, পেশী প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়, আর অস্থি, দন্ত, খোলা প্রভৃতি কঠিন অংশগুলি ফোসিলে পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে সব ক্ষেত্রেই যে প্রাণিদেহের কোমলাংশ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তা স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায় না; অনেক ক্ষেত্রে প্রাণিদেহের অতি কোমলাংশও প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ফোসিল দেহে “Replacing substance” হ'তে পারে iron-pyrites, iron-oxide, sulphur, malachite, magnesite, কিংবা carbon. কাঠের “চিহ্ন” বা তন্তু, শাবুরের চূণ-জাতীয় পদার্থের খোল, প্রবালের চূণ-জাতীয় পদার্থের পঞ্জর, সিলিকা (silica)-জাতীয় পদার্থের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। যে ক্ষেত্রে বাহিরের আকার অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ গঠন বদলে যায়,—সেখানে এই রকম ফোসিলকে “সিউডোমর্ফ” বলে। এইমাত্র বলা হ'লো,—চূণজাতীয় পদার্থ সিলিকা দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, আবার একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সিলিকা রচিত পঞ্জরবিশিষ্ট ‘স্পোঞ্জ’দের ফোসিল অবস্থায় সিলিকা স্থানান্তরিত হয় আর তার স্থান পূরণ করে চূণ-জাতীয় পদার্থ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় ফোসিলের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়; ফোসিলে পরিণত হওয়ার অল্প কাল পরে অনেক ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ গঠন হুবহু থাকে। কিন্তু যত কাল যায়, তত বাহিরের পদার্থের সমাবেশের জট তিলে তিলে আভ্যন্তরীণ আকারের একটু

একটু পরিবর্তন হ'তে হ'তে ক্রমে এমন পরিবর্তন হয়ে যায় যে, ফোসিলের ভেতরের আদি আকার কি রকম ছিল তা ধারণা করা হই কঠিন হয়ে পড়ে যায়। অবশ্য আভ্যন্তরীণ গঠনে এ রকম "obscurity" আসতে অনেক সময় লাগে। কেন এ পরিবর্তন আসে? রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় হয় "crystal" এর আকারে। "Crystallography"র নিয়ম অনুসারে, এই সব "crystal" কালের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে কিন্তু ওদের নিজ নিজ আকার ঠিকই থাকে। ওদের বিজ্ঞাসে ও সংস্থানে যথেষ্ট পরিবর্তন আসার কারণেই কালক্রমে ফোসিলের আভ্যন্তরীণ গঠন বদলে যায়।

(৩) স্বাভাবিক ছাঁচ।

ফোসিল শিরোনামার অধীনে আর এক দল অতীতের সাক্ষী আসে। এগুলিকে বলা হয় "Natural moulds বা casts." এই জাতীয় ফোসিলে আদিবস্তুর কিছুই থাকে না, থাকার মধ্যে থাকে কেবল একটি ছাঁচ। কোন জীবজন্তুকে তার পারিপার্শ্বিক পদার্থ চতুর্দিক হ'তে একেবারে ঘিরে ফেললে, তার পর পারিপার্শ্বিক পদার্থ কঠিন হয়ে গেল। তার পর "Percolating water" পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর অতি শূন্য ছিদ্র পাথে ঢুকে ধীরে ধীরে জন্তুর দেহের গলন ঘটতে লাগল; ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে জীবদেহের সমস্ত হাড়, মাংস, পেশী প্রভৃতি যাবতীয় জান্তব পদার্থ গলিত হয়ে অতি শূন্য ছিদ্র-পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল; অবশেষে রইল কেবল একটি শূন্য ছাঁচ। এই কঠিন ছাঁচে সমাধিস্থ জীবদেহের ছাপটি হুবহু সংরক্ষিত রইল। পম্পিআইয়ে এই রকম অসংখ্য ফোসিল ছাঁচের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই পম্পিআইকে অনেক বিদ্বের "Fossil city" আখ্যা দিয়েছেন। কেন পম্পিআইকে "ফোসিল-সিটি" বলা হয়, সে সবকিছু একটু বলি।

১৯ খৃষ্টাব্দে ভিয়েতনামের এক ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে সমস্ত পম্পিআই সহর ভষ্মাভূত হয়ে যায়; সমস্ত নগর এক পুরু আয়েয়-গিরির ভষ্মের আবরণের তলায় চাপা পড়ে। অতি শূন্য ছাইয়ের কণা ঘর বাড়ীর জানালা দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকে সমস্ত ঘর-পোর, আসবাবপত্র, জীব-জন্তু, মানুষ সব প্রাণীত কর ফেলে। প্রথমে কয়েক জায়গা খুঁড়ে কতকগুলি কঙ্কালের ফোসিল পাওয়া যায়; তার পরে ঐ মিহি ছাইয়ের ভেতরে "Natural mould" এর সন্ধান পাওয়া গেল; ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ ও বৈজ্ঞানিকরা এক অতি বিরাট গবেষণার ক্ষেত্রে পেলেন। ভষ্মের মধ্যে কেবল অজস্র ছিদ্র। সেই ছিদ্রের মুখে জল। গলা প্রাণীর-অব-প্যারিস্ ঢেলে দিয়ে দিয়ে প্রাণীর, কঠিন হয়ে গেলে পর চার পাশের ছাই সরিয়ে ফেলে পাওয়া যেতে লাগল কাঠের দরজা, জানালা, আসবাব-পত্র প্রভৃতির অবিকল অনুল্লুতি। এই ভাবে অসংখ্য মানুষের অনুল্লুতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সমস্ত প্রাণীর-কাঠে ইউরেশিয়ান, এথিওপিয়ান প্রভৃতির সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় প্রাণীর, ঢেলে দিয়ে পাওয়া গেছে অনেকগুলি শূন্যের অনুল্লুতি। তার মধ্যে কতকগুলি পুরু ও কতকগুলি নারী; স্পষ্ট বোকা যায়, কতকগুলি ইউরেশিয়ান ও কতকগুলি এথিওপিয়ান। তাদের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল, সেটি আগুনের ভষ্মে প্রাণীত হয়ে গিয়ে মৃত্যু-বন্ত্রণায় হই-কই করছে যেমন দ্বারা যায়, তার সেই আড়ষ্ট অবস্থার ভঙ্গিমার অনুল্লুতিই অবশিষ্ট প্রাণীর

কাঠে হুবহু ফুটে উঠেছে; পায়ের আড়ষ্ট ভঙ্গিমা ও যন্ত্রণালিষ্ট ধাঁ করা মুখ দেখে স্পষ্ট বোকা যায়, জীবন্ত অগ্নি-সমাধিতে জীবিত কি জ্বপাই না পেয়েছে। কুকুরের গলার চওড়া বগলসূটি পর্যন্ত প্রাণীর, কাঠে উঠে এসেছে। এরও বহু সহস্র বৎসর পূর্বের মেরুদণ্ডী জীবের অনেকগুলি ফোসিল ছাঁচের সন্ধান পাওয়া গেছে। কানেক্টিকাট-ভালাতে জলের "পারকোলেশনে" ঐ জীব-জন্তুর দেহের সমস্ত অংশ গলে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এখন কেবল হুবহু নিখুঁত ছাঁচগুলি পড়ে আছে। "প্রাণীর কাঠ" করে এখন ঐ সব মেরুদণ্ডী জীবের কঙ্কালের হুবহু অনুল্লুতি পাওয়া যাচ্ছে। কঠিন অংশ ছাড়াও, অনেক সময় কোমলাংশের ছাঁচও এই ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং প্রাণীর, কাঠ করার মত, প্রকৃতিই নানা বস্তু দিয়ে ঐ ছাঁচ ভরিয়ে তুলে "Pseudomorph"য়ের সৃষ্টি করে। জেলিস্কি ও শামুকের মাংসল অংশের মত অতি কোমল বস্তুরও এই রকম "Pseudomorph" আবিষ্কৃত হয়েছে এবং একাধিক ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডী জীবের মাথার খোলসের মধ্যে সমস্ত মস্তিষ্কের কোমল বহিরাবরণের সম্পূর্ণ ফোসিল অনুল্লুতি পাওয়া গেছে।



'পম্পিআই'এর কুকুর

এই মস্তিষ্কের ফোসিলে অতি শূন্য গঠনগুলি পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় আছে, যথা, ব্রায়মুল-বিভিন্ন ব্রায়র পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গমস্থল সমস্ত সুস্পষ্ট ভাবে এই "Natural cast"এ ফুটে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে মাটির ওপরের স্তরের ভাঙে এই সমস্ত ছাঁচের আকার পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে যায়।

(৪) পদ-চিহ্ন ও ট্রেল।

ফোসিল-বিশারদরা ফোসিলের সঙ্গেই পদ-চিহ্নের বর্ণনা করলেও ফোসিল নামের কোন সার্থকতা এতে নেই। পূর্বে কখনো "Natural moulds"এ যেমন সমস্ত জীবের ছাঁচটি সংরক্ষিত থাকে এতে তেমনি অতীতের জীব-জন্তুর কেবল পদ-চিহ্নটির ছাপ সংরক্ষিত থাকে। যে সমস্ত জীব বুক ভর দিয়ে চলে তাদের "Trail" বৃষ্টির জলের ছাপ, ঢেউয়ের ভাগ, নদীর স্রোতের পালিমাটির ফাটল, চারপাশের অবস্থা ও অঙ্গ-বদলের অনেক তথ্য এতে মেলে। পদচিহ্ন দেখে পক্ষিচার বোঝা যায়, কোন জীবের পায়ের পাতা, আঙুলের সংখ্যা কি রকম ছিল, তাদের দেহের ভার কি রকম ছিল

প্রভৃতি। পায়ের চাপ হ'তে দেহের ভার এবং দেহের ভার হতে দেহের আয়তন অনুমান করা অতি সহজ। কিন্তু এই যে ফোসিল এ হ'লো জীবের জীবিত অবস্থায় জীবন্ত কালের নিদর্শন,—বাকী আর সব জীবের মৃত্যুর পরের ছাপ মাত্র। জীবিত অবস্থায় জীব কেমন গতিভঙ্গিমা করে' কেমন ভাবে চলা-ফেরা করত তার হুবহু নিদর্শন মেলে এই ধরনের ছাপে।

ফোসিল-সৃষ্টির মূলে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার হ'চ্ছে সমাধিষ্ণু হওয়া। যে সমস্ত ফোসিল পাওয়া যায় তার অধিকাংশই জলের স্রোতে তলিয়ে গিয়ে, জীব বা উদ্ভিদটি চাপা পড়ে সমাধিষ্ণু হয়। অপর নিমজ্জনের ক্ষেত্র হ'লো তেল বা পিচের খনি।

ভারী জন্তুদের বিপদ অনেক; পাক, খনির ধার বা ঐ জাতীয় জমির ওপর দিয়ে চলবার সময় কোন ক্রমে যদি অসাবধানে, যে ভূমি তার দেহের ভার রাখতে না পারে,—তার ওপর পা পড়েছে, কি মরেছে। দেহের ভাবের জন্তু এরা হাঙ্গা দেহের হরিণ বা খর-গোসের মত লাফিয়ে পালাবার কোন উপায় পায় না। যত ভরবার চেষ্টা করে ততই নিজের দেহের ভারে, আরও গভীর ভাবে যায় ডুবে।



সিকিড

নিউইয়র্ক ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চোরা-বালি ও পাকের মধ্যে এই কারণেই ম্যাস্টোডন নামক অতিকায় হস্তিশিশ্যের এত ফোসিল পাওয়া গেছে! আয়ারল্যান্ডের পিঠেগে এই ভাবেই অতিকায় "Irish elk"রা নিমজ্জিত হয় এবং নিজেদের উদ্ধার করতে না পারায়, আজকের বৈজ্ঞানিকরা তাদের এত ফোসিল পায়। মিরিয়াম এই অঞ্চলের ফোসিল সহজে বলেছেন,—মাটির নীচে "asphaltic oil"য়ের পুরুত্বের মত আছে; মাটির কাটলের ভেতর দিয়ে ঐ তেল ওপরে উঠে, বাতাস ও রোদে চিট, চিটে হয়ে যায়; এই তেল এত আঠাল হয়ে যায় যে, এলিকাস্, ম্যাস্টোডন প্যারাসাইলোডন প্রভৃতি অতিকায় জীবও ওতে পড়ল আটকে যায়, আর নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। মাঝখানে ক্রমাগত নতুন তেল উঠে ভরতে থাকে, কিন্তু ধাব বেশ শক্ত হয়ে যায়। ওর ওপর ধূলা-বালি পড়ে পড়ে এমন রং ও আকার ধারণ করে যে পারিপার্শ্বিক মাটি থেকে ঐ অংশ আবিষ্কার করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। যত মাঝের দিকে যাওয়া যায়, তেল তত গভীর, নরম ও আঠাল। কোন জন্তু ছুটে ছুটে মাটি-স্তরে ধূলা-বালি ঢাকা ঐ তেলের ওপর এসে পড়ে—মাটির মত শক্ত হওয়ায় ওর-পিচের পৃষ্ঠবিশী বলে জানতে পারে না,—বতকণ পঙ্খ ভাঙ তার নিজের ভারে সে লেগে না বাস।

যখন নেমে যাচ্ছে, সে সময়, হঠাৎ যদি লাফিয়ে উঠে পালাতে যায় তাতে তার বিপদ হয় আরোও বেশী; পালাবার চেষ্টা করে আরও বেশী করে ঐ কাদে ঢুকে যায়। কোনক্রমে একটি নিরীহ উদ্ভিদ ভোজী একবার এই ভাবে আক্রান্ত হ'লে—অনেক মাংসানী জীবকে সে সেখানে আকৃষ্ট করে আনে। জীবাট আটকে গিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে প্রাণ ভরে চিৎকার করে; ক্ষুধার্ত মাংসানী জীবেরা ভোজের সোভে সে শব্দে সেখানে ছুটে আসে। তার পর তরুণ ও ভক্ষ্য উভয়েই মারা পড়ে। ওপর থেকে মাটির স্তর তাদের দেহ একেবারে ঢেকে' ফেলে। পরে ওদের দেহ ফোসিলে পরিণত হয়। কিছা মাটির স্তরের ভেতর দিয়ে জল ও অম্লজল ঢুকে ঐ জীবদের দেহ গলিত করে ফেলে। অবশেষে আগের বর্ণনার মত ভূগর্ভে ওদের একটি ছাঁচ মাত্র থাকে। ঐ ছাঁচের ভেতর নানা রকম খনিজ পদার্থ ঢুকে ঢুকে ক্রমে পূর্ণ করে ঐ জন্তুদের অনুরূপ।

ফোসিলের প্রয়োজনীয়তা যে কত ব্যাপক তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। চীনদেশের, অস্ট্রেলিয়ার ও স্পেনের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফোসিল-নর-কদাচল—মাছুবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা কি মূল্যবান সম্পদই না দিয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম লক্ষ লক্ষ বৎসরেও পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু জীব-জগতে যুগে যুগে আসে বহু পরিবর্তন। এই কারণেই মাটি এবং ভূগর্ভের খনিজ পদার্থ অপরিবর্তিত থেকে বিভিন্ন যুগে জীব ও উদ্ভিদদেহে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তার ফোসিল স্তরে স্তরে বখাষত ভাবে সংরক্ষিত রেখে আজকের ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদের গবেষণার পথ সুগম করে দিয়েছে। জীব ও উদ্ভিদ-জগতের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসের অনেক missing linkই আজ আর "missing" নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত ফোসিলগুলি আজ জীব ও উদ্ভিদ-জগতের অনেক লুপ্ত ইতিহাস সম্পূর্ণ করেছে। ফোসিল না থাকলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জীব মাছুবের পূর্ব-পুরুষরা কেমন ছিল তার ইতিহাস রচনা করা কতদূর সার্থক হ'ত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঐ ফোসিল হ'তেই যথেষ্ট বোঝা যায়, আধুনিক জীবদের পূর্বপুরুষরা কেমন ছিল, তাদের আকৃতি ও গঠন হতে তাদের পরিবেশের প্রকৃতি বোঝা যায়, তার থেকে তখনকার কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা, আবহাওয়া প্রভৃতির স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়। এক কথাই ফোসিল না থাকলে জীব, উদ্ভিদ এমন কি পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের ইতিহাস রচনা অতি কঠিন হ'ত!

সৃষ্টি অবিরত ভাবে তার সৃষ্টির কাজ চালিয়ে চলেছে। এক দিকে পুরনো লয় পাচ্ছে অপর দিকে নতুনের সৃষ্টি হচ্ছে। যে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ এক দিন ঐ পৃথিবীর তল-বায়ুতেই বৃদ্ধি পেয়ে জীবন ধারণ করে এসেছে তাদের সৃষ্টি থেকে লোপ করলেও সেই সমস্ত অস্তিত্বের জীব ও উদ্ভিদের লুপ্ত অস্তিত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ তাদের দেহের কিছু কিছু অংশ পুরোনো ফোসিল আকারে সংরক্ষিত হয়েছে। যে জীব বা উদ্ভিদ একবার ফোসিলে লাভ করেছে, বায়ু, রোদ, বৃষ্টি, তার আর কিছুই করতে পারে না। ক্রমান্বিত কাল হতে বিশ্বের সর্বত্র যে জন্তু-ব দেহের এক বিরাট পচন বা গলন ক্রিয়া চলে আসে ফোসিল একেবারে তার প্রভাবের বাইরে। পৃথিবীর বুকের

মুকান এই অতীতের ইতিহাসের পাতাগুলি অনেক ক্ষেত্রে নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে,—(যথা ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত) বিকৃত হ'লেও আজ নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা তার থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পৃথাম্পূঙ্খরূপে অতীতের পৃথিবীর এক অখণ্ড ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন।

মাত্র একশ' বছর আগেও অনেক বড় বড় পণ্ডিতের ধারণা ছিল,—প্রত্যেকটি জীব পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এই মতের ভিত্তির উপর "Theory of special creation" গড়ে ওঠে। কিন্তু যে দিন ফোসিলের অস্তিত্ব আবিষ্কার হ'ল সে দিন সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর পড়ল এক নতুন আলো; বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন, এ যুগের জীব ও উদ্ভিদের সঙ্গে সে যুগের লুপ্ত জীব ও উদ্ভিদের ফোসিলের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; শুধু তাই নয়, এই সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ আজ যে অবস্থায় এসে পৌছেছে তার পূর্ববর্তী অনেক "Successive



পাখীর পূর্বপুরুষ

stages" পাওয়া গেছে এই ফোসিল-ধ্বংসাবশেষে। ক্ষুদ্র এক পাঁচ-আঙুলবিশিষ্ট শিয়ালের মত আকারের তৃণভোজী জীব হ'তে আজকের অশ্বজাতির উদ্ভব—চতুর্পদ সর্পসংপজাতি হতে আজকের উড়ুকু পাখীর উদ্ভব—এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে—এ সমস্ত জীবের আদি ও বর্তমান প্রতিনিধির মধ্যবর্তী ফোসিল-সাক্ষ্য পাওয়ায়। এই ফোসিল-সাক্ষ্যগুলিই প্রমাণ করে, প্রকৃতিতে হঠাৎ কোন জীবের সৃষ্টি হয়নি; ক্রমে ক্রমে তিলে তিলে একটু একটু করে বিবর্তন ঘটে এক জীব হতে অপর জীবের সৃষ্টি হয়েছে এই ফোসিলের আবিষ্কারই "Theory of special creation"য়ের মূলে কুঠারঘাত করে এবং "Theory of Evolution"কে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

শিল্পী—বৈজ্ঞানিক লিওনার্ডো ডা-ভিন্সি এই উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত কঙ্কালের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাঁর বহু পরে কুভিয়ে আন্তোনে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। "Paleontologist"এ "Paleobotanist"রা প্রস্তরীভূত জীব ও উদ্ভিদের সম্পর্ক শ্রেণীবদ্ধ করেছেন কোন বিশেষ জীব বা কোন বিশেষ উদ্ভিদ হ'তে। কোন্ কোন্ স্তরের ভেতর দিয়ে আজকে বিশেষ

কোন্ জীব বা উদ্ভিদের বিকাশ ঘটেছে তা এই শ্রেণী-বিভাগ হতে আজ স্পষ্ট বোঝা যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা এক এক কালের জীব ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অমুশীলন করেই সৃষ্টির কাল বিভাগ করেছেন। ফোসিলকে অবলম্বন করে যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তা অঙ্কশাস্ত্রের মত নির্ভুল।

একবার প্রাণিতত্ত্ববিদ আণ্ডয়েনের কাছে অস্ট্রেলিয়া হতে মাটি খুঁড়ে পাওয়া এক ফুটের কিছু কম লম্বা এক টুকরা হাড় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই হাড়ের টুকরাটিকে অবলম্বন করে, আণ্ডয়েন একটি জীবের সমগ্র কঙ্কাল গঠন করেন,—তার দৈর্ঘ্য প্রায় নয় ফুট। আণ্ডয়েনের সেই হাড় অবলম্বনে গড়া এক কঙ্কালের মত কোন জীব যে অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে পারে, এ ধারণা পূর্বের কারোই ছিল না। কাজেই ও দিকে বিশেষ কারো নজর পড়ল না। এর কিছু কাল পরে হঠাৎ অস্ট্রেলিয়ার মাটির অনেক নীচু থেকে একটি পাখীর প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হল। এই পাখীর প্রস্তরীভূত কঙ্কালের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আণ্ডয়েনের তৈরি কঙ্কালের ছব্ব সাদৃশ্য দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন; কাজেই বিজ্ঞানের এই শাখাটি একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের মত স্থির সত্য।

ফোসিল-সাক্ষ্য থেকেই আজকের বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির সমগ্র সৃষ্টিকে একটা অখণ্ড "progress" বলে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এবং এক জীব বা উদ্ভিদ হতে ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে আর একের উদ্ভব হয়, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছেন। মেকনগু-হীন জীবের সহস্র সহস্র বৎসরের ক্রমবিকাশের ফলেই উচ্চস্তরের মেকনগু জীব এবং প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের উদ্ভব; নিম্নস্তরের অপুঙ্পক বসন্তের ক্রমবিকাশেই আজকের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধময় পুষ্পপ্রসূ গাছের (Flower's plant) উদ্ভব হয়েছে। সৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ফোসিল যে কত বড় অমূল্য সম্পদ, সাধারণ লোকের পক্ষে তা অমুমান করাও সম্ভব নয়।*

* এ প্রবন্ধ লিখতে নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহ হ'তে উপকরণ ও তথ্য নেওয়া হয়েছে :—

- (১) Organic Evolution by R. S. Lull.
- (২) A Text Book of Zoology by Schuchert.
- (৩) Extinct Animals by E. Ray Lankester.
- (৪) Evolution of Vertebrates by Newman.
- (৫) Organic Evolution by Dendy
- (৬) Historical Geology by Schuchert.
- (৭) Geographical Distribution by Wallace.
- (৮) Encyclopaedia Britannica.
- (৯) Fossil-man of Spain.
- (১০) The Ways of Life by R S Lull.
- (১১) The Evolution of Earth and Man by G. A. Baisell.

সারানি হাড়ালা খাটনি !

ধরমুখো বাঙালী হইয়াও

ঘরে ফিরিবার উৎসাহ ছিল না।

কিছু আহার্য আর এক কাপ

চা সম্মুখে ধরিয়া দিয়াই গৃহিণী মন্ত

বড় এক ফর্দ নাখিল করেন।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, চারি

দিক্‌ সিঁথিয্য করিয়া বেড়াইতে

হইবে। বেশন, যানির তেল, কয়লা, কেরোসিন, এ সব সংগ্রহ

তো আছেই, তা' ছাড়া ডাক্তারখানা, ধোপার তাগালা, মেয়ের

বিয়ের প্রস্তাব, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, কোনো কাজ বাকী নাই।

গৃহকর্মের কাকে কাকে তিনি আমার কথতালিকাটি ভাট করিয়া

রাখেন। অকস্মাৎ মনে বৈরাগ্য চাড়া দিয়া উঠিল। 'কা তব কাস্তা

কন্তে পুত্রঃ' শঙ্করচাণ্যের মোহমুগ্ধণর! 'সংসারোহমতীত্ব বিচিত্রঃ'

চমৎকার লিখিয়া গিয়াছেন শঙ্করচাণ্য! দুস্তোর, ঘরে ফিরিব না,

লেকের ধারে একটু ঘরিয়া বৈরাগ্যাটা পাকা করিয়া আসি।

বাস্তায় ভীড় জমিয়াছে। একটা খোলা মাঠের চারি দিকে ঠাসা-

ঠাসি করিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা সহরে ভীড় জমানো

একটা নেশা, স্তম্ভরাং সে নেশা হইতে অব্যাহতি পাইলাম না।

ব্যাপার কি, দেখিবার জগ্গ অগ্রসর হইয়া গেলাম, কিন্তু চুকিতে

পারিলাম না, জনতা এমনি জমাট। চান্দ্র্য না জানিলেও বাচনিক

জানিবার ইচ্ছায় এক জন বয়সী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার

কি? কোনো স্বদেশীওয়ালী বক্তৃতা করিতেছে কি?' স্ত্রীলোকটি মুখ

না ফিরাইয়াই বলিল 'না, না, বক্তৃত্তে নয়, ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই!'।

সে আবার কি? বুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা মহাভারতে পড়িয়াছি।

রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা রামায়ণে লেখা আছে জানি। বর্তমানে সমগ্র

ইউরোপে লড়াই চলিয়াছে, সে কথা প্রতি মুহূর্তে তরুণব করিতেছি।



অনেক আমুদে লোক ত্রিতির পক্ষের লড়াই দেখিয়া আমোদ করে,

এ তো সব জানা কথা, কিন্তু ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই। জোর করিয়া

ভীড়ের মধ্যে মাথাটাকে হুকাইয়া দেখিলাম, রক্তক্ষয় হই জন লোক

পরস্পরের দিকে এমন করিয়া তাগ করিয়া আছে যে, মহাভারতে

দুর্যোধনের উল্লঙ্ঘনের চিত্র মনে পড়িয়া গেল। এক জন ছুসোদর,

ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই

ত্রিভুজটি সেনগুপ্ত

বেঁটে মুখে জমকালো গৌন্দাডী,

মাথার টাকটি চক-চক্ করিতেছে ;

পরনে মালকোটা মারা বুতী,

গায়ে বোতাম-ছেঁড়া একটা কোট।

অপরটি দীর্ঘাকার, শীর্ণ, লিকলিক্

করিতেছে, গৌন্দাডী কামানো,

ময়লা হাফ-প্যাট ও গেঞ্জি পরিয়া

আসরে অবতীর্ণ।

বুঝিলাম, ইহারাই ন'কড়ি, ছ'কড়ি। কিন্তু লড়াই করিতেছে

কেন? ডায়েথন সূচ্যগ্র মেদিনী দিতে গররাজী হওয়ায় বুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধ হইয়াছিল, সীতা-হরণের ফলে রাম-রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, রূপসী

নাবী হেলেনের জগ্গ লড়াই করিয়া ট্রয় ধ্বংস হইয়াছিল, দিগ্বিজয়

করিবে বলিয়া আলেক্সান্ডার সংগ্রাম করিয়াছিল, সমস্ত বিশ্বে না কি

শান্তি ও স্বাধীনতার জগ্গ বর্তমান মহাযুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু ইহাদের

লড়াইয়ের তেতু কি? লক্ষ্য কে? জাতি-শত্রুতা নয় তো?

আর একটু ভিতরে চুকিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সূচ্যগ্র মেদিনী

ছাড়িবে না বলিয়া সকলেই যেন পণ করিয়াছে। কাছেই এক ভ্রল্লোক

দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমার মত তাঁহারও কেশে কালের পরশ লাগিয়াছে

দেখিয়া ভরসা হইল। বিগলিত স্বরে বলিলাম, 'ব্যাপার কি দাদা?

এগ লড়াই ক'রছে কেন?'

ভ্রল্লোকটির ভ্রততা-বোধ আছে, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'ন'কড়ি

ছ'কড়ির লড়াই হ'চ্ছে দাদা!'

বুঝিলাম। 'কিন্তু ন'কড়ি ছ'কড়ি লইয়া লোকে খেলে এই তো

জানি, খেলুড়েরা বরং লড়াই করিতে পারে, কিন্তু—'

তিনি বলিলেন, 'ঐ যে মোটা দৈত্যের মত লোকটা, ওর নাম

ছ'কড়ি। ছেলেবেলায় ওর খুব কাঁড়া ছিল ব'লে ওর মা ছ'কড়ি

নিয়ে ওর মাসীর কাছে ওকে বেচে দিয়েছিল, আর ওই যে রোগা-পটুকা

পাঁকাটির মত লোকটা, ওর মায়ের না কি ছেলের উপর রাছর দৃষ্টি

ছিল, তাই ওর মা ন'কড়ি নিয়ে ওর পিসীর কাছে ওকে বেচে

দিয়েছিল। তাই নিয়েই লড়াই।

সব যেন জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। কবে কার মা পাঁজি

দেখিয়া কয় কড়ি দিয়া কাণ কাছে বিক্রয় করিয়াছিল, তাই লইয়া

এখন লড়াই কেন? বর্তমান সময়ে লড়াই করিতে হয়, খাজ লইয়া

কর, বস্ত্র লইয়া কর, ঔষধ লইয়া কর, বাড়ীভাড়া লইয়া মহালড়াই

করিলেও আপত্তি নাই, কিন্তু—'ও দাদা!'

দাদা জুকাটি করিলেন।

'ডিস্টার্ব করছেন কেন মশাই!'

দাদা ডাক মশাই'তে পরিণত

হইতে দেখিয়া আর ভরসা রহিল না। গৌফ ওঠে নাই, অথবা

ক্রমাইয়া ফেলিয়াছে, এমনি একটা চ্যাণ্ডা ছেলেকে কিছু বলিবার

পূর্বেই সে আমার ব্যগ্র-দৃষ্টি দেখিয়াই চট করিয়া বলিল, 'দেখছেন না,

ন'কড়ি ছ'কড়ির লড়াই হচ্ছে।'

'সে তো দেখছি, কিন্তু লড়াই করছে কেন?'

আমার অজ্ঞতা দেখিয়া সে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, 'কেন আবার

কি? লড়াই, মানে লড়াই, যুদ্ধ, সংগ্রাম, fight সোজা কথা

বোঝেন না, কি আশ্চর্য! একটা চ্যাণ্ডা ছোঁড়া, মুখ সিয়া এখনো

হৃদয়ের গন্ধ ছাড়ে, সে-ও শিক্ষকের মত চোখ রাজাইয়া লইল।

'সংসারোহমতীত্ব বিচিত্রঃ!'

সঙ্কচিত হইয়া বলিলাম, 'লড়াই শব্দের অর্থ জানি, কিন্তু লড়াইয়ের

কাণ কি?'

‘তা-ও জানেন না?’—ছেলেটা রূপা-দুট্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, ন’কড়ি ছ’কড়ির লড়াইয়ের হেতু না জানার মত মুখতা বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। তার দুষ্টির সম্মুখে একেবারে বোকা বনিয়া গেলাম! আমার অবস্থা দেখিয়া তাহার করুণা জন্মিল। ‘ওই যে ধোঁকা মোটা লোকটা, সে ভীড় ঢেলিয়া আঁচুল দিয়া দেখাইল, “ওই যে, যার ইয়া গৌফ, আর মস্ত টাক, ওকে নেচেছে ছ’কড়ি দিয়ে, আর ঐ যে প্যাকাটির মত লোকটা দেখেছেন তো? ঐ যার পেটে পিঠে লেগে গেছে, গাল দুটো কে যেন চড়িয়ে ডেস্ক দিয়েছে, ওকে বেচেছে ন’কড়ি দিয়ে। বলুন তো এতে রাগ না হয় কার?” কার রাগ হয় জানি না, কিন্তু রাগ না হইয়া আমার হাসিই পাইল, গম্ভীর হইয়া বলিলাম ‘সে তো বটেই।’

উৎসাহিত হইয়া ছেলেটি বলিল, ‘হেবে যাবে ওই কোমর-ভাঙ্গা ন’কড়ি, আর হারাই উচিত। ওই তো ছেলের ছিরি, সারা শরীরে এক তোলা মাংস নেই, ওর দাম আবার ন’কড়ি। ছো—ওর পিসীরও

তেমনি আক্কেল! কিনতে গেছে ন’কড়ি দিয়ে। ওকে এক কড়ি দিয়ে কিনলে ঠিক হত।’

বিচারকের মত তার স্বর গুরু-গম্ভীর! ভয়ে ভয়ে বলিলাম, ‘তা’ সে তো অনেক দিন হ’য়ে গেছে, তাই নিয়ে এখন লড়াই ক’রে লাভ কি?’

‘বাঃ—ছেলেটি কথিয়া উঠিল ‘আপনি তো আচ্ছা লোক দেখি। বিংশ শতাব্দীতে জন্মেও আপনার কোনো জ্ঞান নেই! শক্তির পরীক্ষা হবে না? দেখেছেন না, শক্তির পরীক্ষায় সারা পৃথিবীতে লড়াই চলছে! আছেন বেশ! বলি, ঘরে বৃষ্টি চাল-কয়লা মজুত আছে? যোগ্যতার মাপ-কাঠি দিয়েই জগৎ চলছে, বলে, যুদ্ধ কেন? বাগাসু—’

দেখিলাম, আর একটা লড়াই শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। বয়স হইয়াছে, শক্তি পরীক্ষায় জয়ের আশা নাই। বৈরাগ্য ফিকা হইয়া আসিয়াছিল, ‘সংসারোত্তরমতী’র বিচিত্র! গৃহের দিকে পা বাড়াইলাম।

সাধনার কথা

ঐতিহ্যবাহিনী

অনন্ত কর্মের আধার এই বিশ্বজগতে কর্মতৎপর জীবের কর্ম-প্রবাহে শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হওয়াই সাধনা। ইহাতে ত্রিবিধ বস্তু বর্তমান—সাধক, সাধ্য ও সাধনা। সাধন-কার্য্যভাসকারীই সাধক, সাধনার লক্ষ্য বস্তুর নাম সাধ্য ও সাধ্য বস্তু লাভের জন্য আয়াস বা যত্নই সাধনা। সাধনার প্রথম কার্য্য আত্মসমর্পণ। উপদেষ্টা বা সত্যপথ-প্রদর্শকের নিকট আত্মনিবেদনই কর্মস্বত্বের আদি সোপান। আশ্রয়প্রাপ্ত সাধকের কর্মস্বত্ব হেতু আশ্রয় অনুসন্ধান বা কর্মপথ-লাভের আশায় পথপ্রদর্শক বা উপদেষ্টার আশ্রয় লাভ হেতু মানসিক ব্যস্ততাই সাধক-হৃদয়ের প্রথম উদ্বেগ। সেই ব্যস্ততার বর্ণনা করিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, ‘দীপ্তশিরা জলরাশিমিব শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুম্ উপস্থত্য তম্ অনুসরতি।’ মাথায় আগুন ধরিলে সেই অগ্নি নির্বাপণ হেতু জল প্রাপ্তির আশায় জীব যে ব্যস্ততা সহকারে ধাবমান হয়, সাধক সাধনার প্রারম্ভে উপদেষ্টা বা গুরু অনুসন্ধানে আপন হৃদয়ে সেই ব্যাকুলতা অনুভব করে। ব্যাকুলতার পরিমাপ অনুসারে গুরু লাভ ঘটিয়া থাকে। ‘গুরু’ এই কথার সাধারণ অর্থ ‘ভারী।’ সাধক নিজেকে লঘু মনে না করিলে গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। নিজেকে ভারী মনে করিয়া থাকিলে তাহার জ্ঞান-পিপাসার সার্থকতা কোথায়? সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের অভাববোধই জ্ঞানপ্রদাতার সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা উদ্বেক করে।

গুরু শব্দের তাৎপর্য্যার্থ—‘গ’কারত্বকর: শ্রাং ‘র’কারত্ব নিরোধক:। সাধক-হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশকারী জ্ঞানালোক-প্রদাতাই গুরু। ‘সাধক’-হৃদয়ের সমস্ত মোহান্ধকার দূর করিয়া যিনি জ্ঞানালোক দ্বারা আশ্রিত সাধকের হৃদয়াকাশ উজ্জ্বলিত করেন, তিনিই ‘গুরু’। ‘গুরু’ উপদেষ্টা, পথপ্রদর্শক, কর্মভাসের সন্ধানদাতা, সাধকের চিত্ত-দৌরল্যনিবারণ ও সর্ব কর্মে শক্তিপ্রদাতা ও প্রবোক্তা।

সাধারণের নিকট এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ‘গুরু মিলে না’ কিন্তু আসল কথা, গুরুলাভের অধিকার প্রাপ্তি হয় নাই। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারীর কথা বলিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, ‘নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তকর্য্যাদ্বষ্টানেন নিগতনিখিলকথনতয়া

নিত্যান্তনিখিলদ্ব্যস্ত: সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন: প্রমাতা।’ নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত কর্মাদ্বষ্টানের দ্বারা সমস্ত পাপ দূর হইলে সম্পূর্ণ নিখিলদ্ব্যস্ত: করণ-বিশিষ্ট চতুর্বিধ সাধনক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হয়। কেবলমাত্র আলস্য আশ্রয় করিয়া বসিয়া থাকিয়া ‘গুরু না মিলিবার’ দোষ দিলে হয় না। গুরুলাভ করিবার বাহ্যতে অধিকার আসে তাহারই চোখা করিতে হয়। যে কাষ না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, তাহাকে নিত্যকর্ম বলে। কোন বিশেষ বস্তু প্রাপ্তি হেতু অমুষ্টিত কর্ম ‘নৈমিত্তিক’। অপরাধ প্রশমন হেতু কর্ম ‘প্রায়শ্চিত্ত’। চতুর্বিধ সাধন যথা (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, (২) ইহামুক্ত ফলভোগবিরাগ, (৩) শমদমাদি যুগ্মসম্পত্তি (৪) মুমুক্শুত্ব। (১) নিত্যানিত্য বিবেক, যথা—‘নিত্য’ ও ‘অনিত্য’ এই উভয়বিধ বস্তুর মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান বিচার। ‘নিত্য’ বলিতে ‘ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু তদন্তদধিলমনিত্যম্’। ‘ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু, তাহা ছাড়া সমস্তই অনিত্য। ‘নিত্য’ অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল; যে বস্তুর কাল ও অবস্থান্তরে কোন পরিবর্তন নাই, বাহ্য গুণ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বভাব তাহাই নিত্য। আর কাল ও অবস্থান্তরে বাহ্য পরিবর্তন হয় তাহাই অনিত্য। বাহ্য জন্মগ্রহণ করে, বর্ধিত হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও নানা প্রকার বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে তাহাই অনিত্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট সমুদয় পরার্থের কাল ও অবস্থান্তরে পরিবর্তন হয়। জীবের কোমর, বোঁবন, জরা ও দেহান্তরপ্রাপ্তিরূপ পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞাবী। অপরিবর্তনশীল অনাত্মনস্তকালস্থায়ী বিকার-শূন্য বস্তুই নিত্য। (২) ‘ইহামুক্ত ফলভোগবিরাগ’—ইহকালে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ও অমৃত অর্থাৎ পরকালে বা জন্মান্তরে সর্ববিধ ভোগ-প্রাপ্তির বিষয়ে বিরাগ বা বিতৃষ্ণা। (৩) শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয় প্রকারকে যুগ্মসম্পত্তি বলে। অন্তরীন্দ্রিয়কে অস্ত্র বিষয় হইতে সরাইয়া যথার্থ বস্তুতে নিয়োজ্য করাকে শম বলে। মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার এইগুলিই অন্তরীন্দ্রিয় বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে ফলপ্রয়োগের দ্বারা অনিত্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয় নিত্য বস্তুর দিকে ধাবমান করার নাম দম। বাহ্যেইন্দ্ৰিয় বিবিশ-কর্মেইন্দ্ৰিয় ও জ্ঞানেইন্দ্ৰিয়। ইহার উভয়েই পঞ্চবিধ—বাক, পাণি, পা

পায় ও উপস্থ। এই পাঁচটি কৰ্মেজিয় ও শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসনা ও জ্ঞান ইহার জ্ঞানেন্দ্রিয়। শীতোষ্ণাদি কল্পসহিত্তাকে তিতিক্ষা বলে। শীত, বাত, আতপ প্রকৃতি নৈসর্গিক প্রভাব যাহাতে এ দেহ সস্থ করিতে পারে অর্থাৎ তাহার কন্ধ্যামুঠান বিষয়ে তোমার দেহ ও মনে বিশ্ব উৎপন্ন করিয়া কন্ধ্যামুঠান বাধাবরূপ না হয়, তজ্জন্ম ঐ নৈসর্গিক প্রভাবগুলি সস্থ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। অশ্রান্ত বিষয়প্রাপ্তি বিষয়ে অপ্রবৃত্তির নাম উপরতি। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসেয় নাম শ্রদ্ধা। ধ্যেয় বস্তুতে বৃত্তিশূন্য ভাবে চিন্তের স্থিরতাকে সমাধান বলে। মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছাকে মুমুকুত্ব বলে। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটিকে পুরুষার্থ বলে, ইহারের মধ্যে 'মোক্ষ'কে 'পরম-পুরুষার্থ' বলা হয়। ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ লাভের জন্ম মাহুষ কত না পরিশ্রম করে। কিন্তু মোক্ষ হইতেছে পরম-পুরুষার্থ। ইহা লাভ করিতে কত জন্ম-জন্মান্তর পরিশ্রম করিয়া বাইতে হইবে। এই পরম-পুরুষার্থ লাভের জন্ম প্রকৃত ইচ্ছা হৃদয়ে জাগরিত হইয়া জীবকে তৎপ্রাপ্তি পথে ধাবমান করিবার জন্ম ব্যাকুলতায় পরিণত হইলে তবেই জীব পরমার্থ লাভ করিবার অধিকারী হয়। আত্মাত্মিক দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তিকেই পবম-পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলে। এতগুলি গুণসম্পন্ন হইবার পর সাধকের হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের স্বাক্ষান করিবার অধিকার আসে। সাধারণ জগতে মাহুষ অর্থাভাবের জন্ম সদা বাস্ত থাকে; এই অর্থের মূলে ধর্ম থাকা প্রয়োজন। সত্য পথে সত্য আশ্রয় করিয়া অর্থ উপাঞ্জন করিলে তবে তাহাকে পুরুষার্থ বলিয়া ধরা যায়। সেই কারণ পুরুষার্থ চতুর্দয়ের আদিতে ধর্ম কথার প্রয়োগ আছে। ধর্মের দ্বারা অজ্ঞিত যে অর্থ সেই ধর্ম বা সত্যপথাজ্ঞিত অর্থের দ্বারা যে কাম বা বাসনার নিবৃত্তি হয় তাহাই পুরুষার্থপদ বাচ্য, অপরবিধ কাম পুরুষার্থ নহে। যে কামনার ভোগের পর অবসান হয় না এবং যাহা অগ্নিশিখার চতাত্ত্বিত প্রয়োগে বৃদ্ধির দ্বায় বাড়িয়াই চলে, সে কামনাকে পুরুষার্থ বলা যায় না। গন্তব্য বা লক্ষ্য স্থানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পথশ্রান্ত পথিকের অবিরাম পথভ্রমণের দ্বায় অধঃপ্রাজ্ঞিত অর্থ প্রয়োগে কামনাভোগের অবসান হয় না। অর্থাভাবের জন্ম পরিশ্রম করিয়া বিফলতা ঘটিলে পুনঃ পুনঃ উত্তমের প্রয়োজন হয় এবং সাধারণ জীব অভ্যাস বশতঃ সংসারদশায় কত দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাটাওয়া থাকে। আর যে অর্থের পূর্বে একটি পরমশক্তি যুক্ত আছে সেই পরমার্থ লাভের জন্ম সাধককে বিফলতা দূরে ঠেলিয়া পুনঃ পুনঃ এ দেহ ও দেহান্তরের পরিভ্রম করিয়া বাইতে হইবে। জন্ম ও মৃত্যু দেহ ও দেহান্তরের ব্যবধান মাত্র। বহু জন্ম ও জন্মান্তর নইয়া জীবাত্মার জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। 'গুরু পাওয়া যায় না' এই উক্তির সাধারণ সংসার দশায় যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহারই প্রতিবাদ ও নিরসন করিতে গিয়া সাধকের অধিকারিত্ব ও সাধনার দাঙপাদের কিছু আভাস দেওয়া হইল।

আমরা সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে প্রকৃত পথপ্রদর্শক বা গুরুর দাশ্রয় গ্রহণ করি। জন্মগ্রহণের পর হইতে আমরা সমস্তই দেখিয়া ও নিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। 'মা' বোল হইতে আরম্ভ করিয়া ত বলা ও চলা প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া—যত বিদ্যা ও শিক্ষা সমস্ত বিষয়ই আমরা শিক্ষকের আশ্রয় হইতে শিক্ষা করি। জন্ম-লাভের পর হইতে এমন কোন দৈহিক বা মানসিক ব্যাপার নাই

যাহা আমরা গুরু ভিন্ন অস্ত্র লাভ করিতে শিখিয়াছি। অতএব যখন সমস্ত ব্যাপারেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়, তখন আত্ম-জ্ঞান লাভ করিবার জন্ম সাধন প্রয়োগে গুরুর প্রয়োজন অবশ্যস্বাভাবী। সাধনবিষয়ে আদ্য অমুঠান গুরুকরণ অর্থাৎ 'গুরু' নির্দিষ্ট করিয়া তন্নিয়োজিত কথ্যে আত্মনিয়োগ বা আত্মনিবেদন। "গুরোরাজ্ঞা গুরু: যত:" গুরুর আজ্ঞামুসারে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত নিযুক্ত ভাবে কাধ্যামুঠান করিয়া যাওয়ার নামই সাধনা।

একটি কথা বিশ্বাস। অনেকে বলে থাকেন, '—হঠাৎ না দেখে, শুনে বা বুঝে কি করে বিশ্বাস করা যায়?' "গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস: শ্রদ্ধা" পূর্বে বলা হয়েছে বটে কিন্তু প্রথমেই বিশ্বাস কি করিয়া হয়? আমরা সংসারদশায় সমস্ত অমুঠানের আদিতে বিশ্বাসনীতির আশ্রয় করিয়া চলি। প্রত্যেক কথ্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে অন্ধবিশ্বাস আশ্রয় করিয়াই চলিতে হয়, সেইরূপ কোন অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তন্নিয়োজিত কথ্যে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সফলতা লাভ হইলে তখন আর বিশ্বাস থাকে না। তখন থাকে অপরোক্ষাহুতি। প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের পূর্বে বিশ্বাস আশ্রয় না করিয়া উপায় নাই। অতএব ইহা সংসারে সমস্ত বিষয় লাভের জন্ম বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়; সেইরূপ সাধনমার্গে গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অমুঠানে প্রবৃত্ত না হইয়া উপায় নাই।

কথ্য আরম্ভ করিয়াই আমরা ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কন্ধ্যারস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ফলপ্রাপ্তি হয় না। ভোজন করিলেই যে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় তাহা নয়। সুখাত্ত ভোজনের পর মনের তৃপ্তিসাধন হয় বটে কিন্তু বহু পরে যথাকালে পুষ্টির অমুভূতি হয়। সাধন ব্যাপারেও তাহাই। 'মুমুকুত্ব' লাভ বহু ভাগ্যের কথা। সময় হইলে সাধকের জদয়াকাশে ভগবৎকৃপাক্রপ অবতাস বহিবার প্রয়োজন হইলে, সাধকের ব্যাকুলতার পরিপক্কতা লাভ হইলে ভগবান গুরুরূপে আপনি আসিয়া উপস্থিত হন। 'গুরু' পাওয়া যায় না বলিয়া নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। শ্রীভগবান তাঁহার প্রিয় সমর্থ শিষ্য অর্জুনকে ফলপ্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া কালক্ষেপ করিবার আশঙ্কা হইতে নিবারণ করিবার জন্ম আদেশ করিতেছেন— "কশ্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" কন্ধ্যামুঠানে প্রবৃত্ত থাকিবার জন্মই তোমার অধিকার, কখনও ফলের দিকে লক্ষ্য করিও না, তাহাতে তোমার অধিকার নাই। পাছে অর্জুন ফলের দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া আপন একাগ্রতা ও নিষ্ঠা হারাইয়া ফেলেন তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, তোমার ফলের দিকে লক্ষ্য করিবার কোন অধিকার নাই। কাধ্য করিতে করিতে তাহার সফলতা আপনি আসিবে, তাহার জন্ম পৃথক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত করিলেই যে ইচ্ছামুখারী ফল পাওয়া যায়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কর্ষণ করিলে ক্ষেত্রের এই উপকার হয় যে, বর্ষণ হইলে ভাল শস্য হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ষণ করিলেই যে বর্ষণ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। তার পর দাঙ চারা হইলেই যে শস্য ফলিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? সময়ে বর্ষণ চাই এবং শস্যের ক্ষীর উৎপাদন হেতু শিশির-বিষ্ণুপাত আবশ্যক। তদভাবে শস্যের ক্ষীর উৎপন্ন হইবে না। তেমনিই সাধকের সাধনা জীবনে ভগবৎকৃপাক্রপ বর্ষণ ও শিশির-বিষ্ণু পাত প্রয়োজন। শীতের মধ্যে পুষ্পফুল

কদাচ ফুল ফুটিয়া থাকে; শীতের প্রকাশে বৃক্ষাদি শ্রিয়মাণ হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু শীতের অবসানে যেমন বসন্ত-বায়ু প্রবাহিত হয়, অমনি সমস্ত পুষ্পবৃক্ষ ও লতা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে নবপল্লব ও কুসুমনিচয় প্রকাশ করে, শিশু-হৃদয় যুবতী-যৌবনের মগ্ন বৃক্ষে না, কিন্তু যেমন ঐ শিশুর যৌবনোদ্যম হয় তখনই তাহার হৃদয়ে যুবতী-যৌবনের আশ্বাদের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়, পৃথক্ ভাবে কাহারও অপেক্ষা করে না। সাধক-শিশুর হৃদয়ে যখন সাধন-যৌবন উপস্থিত হয়, তখন তাহার হৃদয় সমস্তমিলন আকাঙ্ক্ষায় নান্দিত। উঠে, সাধক-হৃদয়ে পরম স্বামী! সমাগমের অভিসার ঘটনের জঙ্ঘ দূতের অন্বেষণ করিয়া থাকে। এই দৌত্যকাণ্ডের নায়ক 'শ্রীগুরু-কুপা'। এই কুপাই 'অঘটনঘটন-পটীয়া' গুরুকুপাই সত্য এবং সেই গুরু শক্তিই সাধক-হৃদয় মুকুলিত করিয়া পরমাত্মজ্ঞান বা ইষ্টদর্শনরূপে পথাবসিত হয়।

অনেকে বলেন, সঙ্গারের কখনো মন বড় চঞ্চল, সর্বদাই অনিত্য ক্ষুণ্ণে প্রধাবিত হয়—এই মন লইয়া কি করা যায়? এরূপ ভাবিয়া নরায় হইবার কোন হেতু নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বপ্রণয় শিষ্য অর্জুনকে উপদেশ দিবার কালে তাহার সমাধান করিয়াছেন। ঐদ্যাকেশ অর্জুন সাধনার অমুঠান শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। মন বড় চঞ্চল, এ মন লইয়া কিরূপে শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন করা সম্ভব। তাই তিনি যুক্তকরে শ্রীভগবানের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছেন—

“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্‌চম্।

তস্তাহং নিগ্রহঃ মন্ত্রে বায়োরিব স্তদুৎকরম্ ॥”

অর্জুন বলিতেছেন,—হে ভগবন! গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যথা-বিহিত আদেশ করিতেছেন। কিন্তু মন এরূপ চঞ্চল ও এমন প্রবল ভাবে দ্রুততার সহিত পীড়া দান করে যে, তাহাকে নিজের বশে আনিয়া কায়ে নিযুক্ত করা অতি কঠিন। বায়ুকে যেমন হস্তশক্তি-মধ্যে আনিয়া বাধ্য করা অতীব কঠিন, ইহাও তদ্রূপ। দয়াময়! ইহার প্রতিকারের উপায় কি, তাহা জানিবার জঙ্ঘ ভবদায় সন্মানে প্রার্থনা করিতেছি। পরম-কারুণিক শ্রীভগবান তাহার উপায় বলিতেছেন,—

“অসংশয়ং মহাবাহো মনোহুর্নিগ্রহঃ চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥”

অর্জুনকে শ্রীভগবান মহাবাহু বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অর্জুন শক্তিত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভরসা দিতেছেন তোমার ভয় কি? তুমি যে মহাবাহু অর্থাৎ বীরপুরুষ, তুমি মনের সহিত যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। মন যে চঞ্চল ও অতি কঠে নিগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চয়ই। সমর্থ সাধক অর্জুনের ধারণা যথার্থ। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণের সুন্দর উপায় আছে। আবার উপায় বলিবার সময় কুন্তীপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, হে অর্জুন! তুমি বিদগ্ধহৃদয়া নিষ্ঠাবতী সৎসম ও সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপা সম্রাজ্ঞী কুন্তীদেবীর পুত্র। তুমি এক দিকে অভ্যাস ও অপর দিকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চঞ্চল মনকে নিজ বশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। এক দিনে হইবে না; মনকে নিত্য বস্তুর প্রতি দাবমান করিতে বন্ধ করিতে থাকিবে ও অনিত্য বস্তুর দিক্ হইতে নিরলস করিতে থাকিবে। ভগবান বলিতেছেন, অভ্যাস কর, যত্ন করিতে থাক। মনকে বশে

আনয়ন এত সহজসাধ্য নয়। ইচ্ছা করিলাম আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া গেলাম আর মন স্থির হইয়া গেল তাহা নয়, তাহা কখনও কোন কালে সম্ভব হয় নাই। আদি-গুরু শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মত বীর ভক্তকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বৈরাগ্য সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে এক দিন সে দৌত্যগোদয় হইবে, মন বশে আসিবে বা লয় প্রাপ্ত হইয়া আশ্বার তুরীয়াবস্থা আনয়ন করিয়া দিবে, তখন আশ্বার স্বরূপ উপলব্ধি নিয়ত বর্তমান থাকিবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, “তত্র স্থিতৌ যন্তো অভ্যাসঃ” তত্র সেই ব্রহ্মবস্তুরে বৃত্তিশূন্য মনের অবস্থিতি বিষয়ে শ্রীগুরুপদে মত শৃঙ্খলা সহকারে যত্ন বা চেষ্টা বা পুনঃপুনঃ অভ্যাস। আর “দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বৃত্তস্য বশীকারণজ্ঞা বৈরাগ্যম্” দৃষ্টে অর্থাৎ ইহলোকে মানবদৃষ্টির গোচরীভূত এবং অনুশ্রবিক অর্থাৎ পরলোকেস্থিত বিষয়সমূহে বিতৃষ্ণা বথন স্থায়ী ও বশীভূতা হইবে তখনই তাহাকে বৈরাগ্য বলে। মাত্র স্বপ্ন কালের জঙ্ঘ কোন বিষয়-সঙ্গ লাভের জঙ্ঘ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেই বৈরাগ্য হইল না। ইহকালে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ আছে এবং পরলোকে কন্দাম্বাবায়ী যে ভোগ্য বিষয় আছে, এই উভয়বিধ বিষয় হইতে মনকে একেবারে দূরে আনিয়া নিত্যবস্তুরে সংলগ্ন করিতে হইবে। সেই লগ্নতা অঙ্গস্থায়িত্বের জঙ্ঘ নয়, তাহা চিরস্থায়ী হইতে হইবে। প্রকৃত সন্ন্যাস বৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা আসে। গুরুপদিষ্ট পথে নিষ্ঠা সহকারে অনন্তজ্ঞে ভাবে অকৈতব হৃদয়ে চলিতে চলিতে পরমস্বামী পরমাত্মসাক্ষ্যকার বা প্রতিনিয়ত-ভগবৎ-প্রেম-মুতাপলব্ধি হইতে থাকিবে। ভগবান গুরুদেব বলিয়াছেন—

“যত্র যত্র জাতোহস্মি স্ত্রীযু বা পুরুষেষু বা।

দেহি তত্রালাং ভক্তিং ত্রাহি মাং মরুত্মদন ॥

হে ভগবন! বিশ্বত্রাণানিয়ন্তা, আমার প্রতি এই দয়া কর, আমি স্ত্রী বা পুরুষ ভাবে যে দেহেই অবস্থান করি সেইখানে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি প্রদান কর, ইহার সরলার্থ এই—একান্তমুগ্ধভক্তিকেই ভক্তি বলে। যে দেহেই আমার আত্মা অবস্থান করুক সেখানে কোন ক্ষণের জঙ্ঘ তোমার প্রতি অমুগ্ধভক্তির বিরাম না ঘটে। যদি নিজ দেহ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ তুলিয়া আমার আত্মচৈতন্যে তোমার পরম চৈতন্য শক্তির স্থিতি লইয়া অবস্থান করে, তখন দেহাদির অবস্থানের প্রভাব কোথায়? এই অবিরাম স্থিতির কথা বলিতে গিয়া বেদান্তের শ্রীভাষ্যকার শ্রীরাধামুজ্জাচাৰ্য্য “অবিরাম তৈলধারাবৎ” ভগবৎ-স্থিতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জলের ধারার বিরাম সম্ভব কিন্তু তৈল-ধারার বিরাম নাই। এই অবিরাম পরমাত্ম-স্থিতিই সাধকের প্রাপ্তব্য বিষয়। বিশ্ববিশ্রুত ভক্ত প্রহ্লাদ ইষ্ট দর্শনান্তে প্রার্থনা করিতে আদিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘ভগবান, প্রভু, মদেকসদয়, যদি আমার প্রতি কুপাই হয় এই কুপা হউক যেন সাধারণ বিষয়ী ব্যক্তি যেমন বিষয়ে অমুগ্ধ থাকে হে দয়াময়! তুমি আমার বিষয় হও, আর তোমায় লইয়া আমি বিষয়ী হইয়া থাকি।’ তাই স্তোত্রে আছে—

ন জানামি ভক্তিং ন চ দেব মুক্তিঃ

চরণপঙ্কজে দেহি মে শরণম্।

শরণাগত-হৃদং কাম্যমহম্

প্রণমামি পরাপরানন্দধরম্।

আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে ভারতের সহযোগ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধ ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বহুবিধ ক্ষেত্রে নিযুক্ত বহু সংখ্যক লোকের কর্ম-বিচ্যুতি ঘটিবে, বেকার-সমস্যা প্রবল হইবে এবং তাহার ফলে সকল দেশেই জনসমষ্টির ক্রয়শক্তি (Purchasing power) বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। সুতরাং সর্ব দেশেই অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটিবে। এই নিমিত্ত যুদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক যুধ্যমান এবং যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ অতি সুনিশ্চিত যুদ্ধান্তের বিপর্যয়ের প্রশমন ও প্রতিকার কল্পে প্রতিবিধানমূলক বিধি-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় মনঃ-সংযোগ করিয়াছেন। যুদ্ধান্তের পুনর্গঠন ও সংগঠন-সমুদয়ন পরি-কল্পনায় ইহাই মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য। যেমন যুধ্যমান তেমন যুদ্ধে নির্লিপ্ত, এই উভয় শ্রেণীর দেশের পক্ষেই এইরূপ পরিকল্পনা অবশ্য প্রয়োজন। কারণ, যাতায়াত ও আদান-প্রদানের ক্রম-বর্ধমান সুযোগ-সুবিধার ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে এরূপ ঘনিষ্ঠ অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে যে, কোন একটি দেশে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় ঘটিলে, তাহার প্রতিক্রিয়া ঐ দেশের সহিত কর্মসূত্রে বদ্ধ অজ্ঞাত দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করিয়া প্রায়শঃ সমগ্র জগতের অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটায়। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে এই বিপ্লব তীব্র ও তীব্ররূপ ধারণ করিয়াছিল। বর্তমান মহাযুদ্ধ বিগত মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বহুগুণে ব্যাপক এবং ভীষণ ধ্বংস ও ধ্বংসমূলক ; সুতরাং বর্তমান যুদ্ধের অবসানে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় ঘটিবে বহুল পরিমাণ অধিক গুণে এবং তাহার প্রতিকার কল্পে এখন হইতেই বিধি-ব্যবস্থা নিদ্বিধিত করিয়া না রাখিলে যুদ্ধান্তে সহসা-সমুপস্থিত পরিস্থিতিকে শাসনের বশীভূত করিতে পারা যাইবে না।

সংগ্রামের অবসানেই শান্তি ও শৃঙ্খলার যথাযোগ্য বিধান করিতে না পারিলে, অপারিসম মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতির পন্থাতে আসিবে প্রচণ্ড বেকার-সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিয়া অনতিবিলম্বে অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ পূর্বক স্থায়ী শান্তি সংস্থাপিত করিতে হইবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রাখিয়া মিত্রশক্তি নায়কগণ সম্প্রতি কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হট্টিস্মের খাজ বিয়ক বৈঠক এবং ব্রেটন উডসের অর্থ সম্বন্ধীয় বৈঠক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উভয়েরই আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। মিত্রশক্তি সহতির কর্তৃবাধীনে আহূত এই সকল আন্তর্জাতিক বৈঠক ব্যতীত গত নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কের সল্লিকট 'রাই' সহরে মার্কিনের চারিটি প্রধান কারবার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে একটি আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠক বসিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টা; এবং নিখিল জগতের ইতিহাসে ইহা প্রথম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমিতির আমেরিকান শাখা, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সমিতি, শিল্প-কারিকর সম্মেলনের জাতীয় সভা এবং জাতীয় বৈদেশিক ব্যবসায়-সংসদ—এই চারিটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানই এই বৈঠকের উজ্জ্বলতা ও আস্থায়ক। ইহারাই মার্কিন রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রতিনিধিত্বানীয়। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধ-পূর্বে সক্রিয় ছিল এবং ইহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল প্যারিসগণের। ভারতীয় জাতীয় সমিতির মার্কতে ভারতবর্ষও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সমিতির সভ্য ছিল। এই ভারতীয় জাতীয় সমিতির কার্যালয়

ভারতীয় বাণিজ্য শিল্প-সমিতি সমবায়ের কার্যালয়ে অবস্থিত এবং ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সমিতির ভারতীয় শাখারূপে পরিগণিত।

আন্তর্জাতিক বৈঠকগুলি স্বাধীন দেশ সমূহের মন্ত্রণাগার; এই সকল বৈঠকে ভারতের যোগদান মুখ্যতঃ অল্পগ্রহণমূলক। কারণ, ভারত স্বাধীন দেশ নহে। ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় ব্রিটিশ শাসন শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ভারত সরকারের আভিমত অনুযায়ী এবং তাহার সর্বত্রই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের স্বাধীন ভাবে জাতীয় স্বাধের অল্পমূল মতামত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। ব্রেটন উডসের আর্থিক বৈঠকে ইহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। এই বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে যখন যুদ্ধান্তের সংগঠন সমিতির সাধারণ নীতি-নির্ধারণক শাখা-সমিতিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের আলোচনা হয়, তখন ঐ সমিতির বেসরকারী সমন্বয়গণ দৃঢ়রূপে প্রস্তাব করেন যে, সরকার কর্তৃক নির্বাচিত সরকারী প্রতিনিধিদের সহিত কয়েক জন বেসরকারী সদস্য প্রেরিত হওয়া অতীব আবশ্যক। অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইস্ম্যান এই অতি সমীচীন প্রস্তাবের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে না পারিয়া তাহাতে সন্মত হইলেন। ফলে, অর্থ-সচিবের নায়কবাধীনে সরকারী সদস্যদের সহিত দুই জন স্বাধীনচেতা বেসরকারী প্রতিনিধিও প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মণ্ট্রলের সাধারণতন্ত্র বিমান-পরিচালন বৈঠকে এবং নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক অ-সামরিক বিমান-পরিচালন বৈঠকে এই নীতি রক্ষিত হয় নাই। এই দুই বৈঠকেই প্রতিনিধি ছিলেন খাস সরকারী।

মার্কিনের চারিটি বেসরকারী বাণিজ্য-সমিতি কর্তৃক আহূত আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে যোগদান করিবার নিমিত্ত যখন ভারতকে আমন্ত্রণ জানান হয়, তখন খেতাজ বণিক-সম্মেলন প্রতিনিধি-দের সহিত ভারতীয় বণিক ও শিল্প-সমিতি সমবায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে স্থির হয়। ভারতীয় সজ্জ ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলেন যে, ভারতীয় বণিক ও শিল্প-সমিতি সমবায়ই ভারতের জাতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং খেতাজ বণিক সম্মেলনের স্বার্থের সহিত তাহাদের জাতীয় স্বার্থ কখনই একীভূত হইতে পারে না। মার্কিনের বাণিজ্য সমিতি চতুর্ভুজ এই আপত্তির যথাযথ অনুভব করিয়া তাহাতেই সন্মত হইলেন। ফলে, কার-কারবার বৈঠকে ভারতের জাতীয় বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিনিধিগণ কয়েক জন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদের সহিত উপস্থিত ছিলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই বৈঠকের ক্ষুদ্রাঙ্গ ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টা; কিন্তু ইহাতে আলোচ্য বিষয়গুলির গুরুত্বে ইহা কোন-অংশে সাম্মিলিত-জাতি-সজ্জ কর্তৃক আহূত কোন সরকারী আন্তর্জাতিক বৈঠক অপেক্ষা নান ছিল না। অবশ্য ইহাতে পরিগৃহীত প্রস্তাবগুলি কোন রাষ্ট্রসরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে; ইহার সুপারিশগুলি উপদেশ ও অনুমোদনমূলক মাত্র। বস্তুতঃ পক্ষে, সাম্মিলিত-জাতি-সজ্জ কর্তৃক আহূত আন্তর্জাতিক বৈঠকগুলিতে পরিগৃহীত প্রস্তাব সকলও কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে; পরন্তু, প্রত্যেক স্বাধীন দেশের শাসন-পরিষদ অথবা সচিবমন্ডলীর অনুমোদন-সাপেক্ষ। কিন্তু সর্ব স্বাধীন দেশেই শিল্পী ও বণিক

—প্রাচ্যের প্রভাব রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণবর্গের উপর অপরিণীম। যুক্তরাষ্ট্রে 'স্ট্রিপ' প্রভাব যুক্তরাজ্যের শিল্পী বণিকদিগের প্রভাব অপেক্ষাও বিকতর প্রবল হইবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের যে চারিটি শিল্প-বণিক তিষ্ঠান এই আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠক আহ্বান করিয়াছিল, হারা স্বরাষ্ট্রে অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতাপশালী। ভারতের পক্ষে বশ্য স্বতন্ত্র বিধান। আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্র আমাদের আয়ত্বাধীন হ; এবং আমাদের শিল্প-বাণিজ্য-ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের শীভূত নহে। আমরা পরাধীন জাতি; সর্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রের উপর পান প্রতিপত্তি নাই। অথচ এই আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে যে সকল সমস্যার সমাধান আলোচিত হইয়াছিল, তাহা কেবল ত্রি শিল্প-বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কে নহে; রাষ্ট্রেরও তাহাতে নিষ্ঠ সম্পর্ক। কারণ, এই বৈঠকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা অর্থনৈতিক এবং তাহার সহিত সমগ্র দেশের সর্ব-প্রকার লোকের প্রকৃষ্ট স্বার্থ বিজড়িত।

নিখিল জগতের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের কার-কারবারে নিযুক্ত রক্ষিবর্গের এই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল,

(১) বিভিন্ন জাতির বাণিজ্য নীতি; (২) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কীয় সঙ্কট; (৩) আন্তর্জাতিক ধর্ম বিনিয়োগের নিয়মনীতি এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি ধর্ম কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে বিনিযুক্ত মূলধনের রক্ষাবক্ষণ; (৪) নতুন নতুন ক্ষেত্রে শিল্প প্রবর্তন ও প্রবর্ধন; (৫) স্থলপথে, শুল্কবন্ধে ও বিমান-মার্গে-যাত্রী ও মাল পরিবহনের সুবন্দোবস্ত; (৬) কাঁচামাল ও খাজদ্রব্যের আন্তর্জাতিক যোগান; (৭) কার-কারবারে বেসরকারী উদ্যম (Private enterprise); এবং (৮) প্রতিযোগিতা রুদ্ধ করিয়া দ্রব্য মূল্যের উচ্চহার রক্ষা করিবার নিমিত্ত একাধিক কারবার প্রতিষ্ঠানের চক্রান্ত (Cartels)। যেমন আমাদের দেশে তেমনই অন্যান্য দেশে এই আটটি বিষয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পুরুষাত্বক্ষেপে এই আটটি বিষয় লইয়াই বিরোধ চলিতেছে; এবং এই বিরোধই বর্তমান যুদ্ধের মূলোদ্ভূত কারণ। যুদ্ধান্তে বাহাতে এই বিরোধের অবসান ঘটে, এবং প্রত্যেক জাতি বিভিন্ন জাতির সহিত নির্বিবাদে কার-কারবার চালাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন। এই নিমিত্ত বায়ানটি জাতি এই অল্পটানে যোগদান করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক কার-কারবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন জাতিই নিখিল জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, স্বতন্ত্র জাতি সমূহের আন্তর্জাতিক অল্পটানে পরাধীন ভারতেরও যোগদান করিবার বিশেষ সার্থকতা আছে। আন্তর্জাতিক সর্ববিধ বৈঠকে জগতের অন্যান্য বিভিন্ন জাতিকে ভারতের অভাব-অভিযোগের সহিত পরিচিত করা যেমন প্রয়োজন, ঐ সকল বৈঠক হইতে বিভিন্ন জাতির গতিবিধি আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কাঙ্ক্ষাপ্রণালী সঙ্ক্ষেপে ভারতের অভিজ্ঞতা লাভও তেমনই প্রয়োজন। ব্রেটন উডসের আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠকে ভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই বটে; কিন্তু জগতের অন্যান্য স্বাধীন শক্তিশালী জাতিগণ, ভারতীয় বেসরকারী প্রতিনিধিদের মারফতে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে

জানিতে পারিয়াছেন। ইহাও আমাদের পক্ষে কম লাভ নহে। আমরা কাহারও সাহায্যপ্রার্থী নহি, কিন্তু জগতের বিভিন্ন জাতির সহিত কার-কারবার পরিচালনার নিমিত্ত তাহাদের সহায়ত্ব ও সহায় সহযোগ আমাদের অবশ্য প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতির বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা এই প্রয়োজনের গুরুত্ব তুলুভব করিতে পারিব। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে আমরা প্রকৃত পরিমাণে রপ্তানী-বাণিজ্য চালাইয়াছিলাম—এই উদ্দেশ্যে যে আমাদের আমদানী বাণিজ্যের মূল্য দিয়াও বাহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-জমাখরচে আমাদের উদ্বৃত্ত জমার অল্প বিলাতের প্রাপ্য (Home charges) মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। এখন এই পরিণতিভর আমূল পরিবর্তন ঘটয়াছে। বর্তমানে যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিচালনা অস্থায়ী নিয়মিত ভাবে কলকাতা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানী করিতে না পারি, তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি তরুণ তাত্র লক্ষ্য দিবার প্রয়োজন থাকিবে না। কারণ, কোন কোন অর্থনীতিবিদ এই মত পোষণ করেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশেষতঃ যুক্তরাজ্য তাহাদের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থা-বাবস্থার নিমিত্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনকে অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি মনে করে। আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠকে ভারতের বেসরকারী প্রতিনিধি আর সমুদান টোকে কোন দেশের উৎপাদন-সম্পদের সম্ব্যবহারই যে সেই দেশের আর্থিক পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এই মূল তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বিলম্ব বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভারতের জায় দেশে অভ্যন্তরীণ সাম্য এবং স্বভাবজাত সম্পদ সম্ব্যবহারের অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংরক্ষণ তরুণ প্রয়োজন, যেমন যুক্তরাজ্যের পক্ষে প্রয়োজন তাহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি। উভয়ের উদ্দেশ্যের পার্থক্য এই যে, গত পাঁচ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অভিঘাতে আমাদের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির অর্থাৎ বণিক পণ্যের প্রকার এবং তাহাদের বিক্রয়-ক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতেছে। যুদ্ধের পূর্বে আমরা যে পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইতাম, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম কাঁচা মাল আমরা রপ্তানী করি। ইহার প্রধানতঃ তিনটি কারণ। প্রথম, আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার হেতু আমরা পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক কাঁচা মাল কলকারখানায় ব্যবহার করিতেছি; দ্বিতীয়, যুদ্ধের নিমিত্ত সমুদ্র-পাণের বহু দেশের সহিত আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং তৃতীয়, মাল পাঠাইবার নিমিত্ত মাল-চালানী-জাহাজ চলাচলের বিঘ্ন-বিপত্তি। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার হেতু আমরা পূর্বে যে সকল ও যে পরিমাণ পাকা মাল আমদানী করিতাম, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম পাকা মাল আমদানী করি এবং শুধু তাহাই নহে, আমরা এখন অনেক শিল্প-জাত পাকা মাল বিদেশে রপ্তানী করি। যুদ্ধান্তে আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্প সমুদয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। যুদ্ধপূর্বে যে যে দেশে আমাদের বিবিধ পণ্য চালান যাইত, এখন তাহাদের অধিকাংশের সহিত আমাদের সম্পর্ক-বিচ্ছ্যত হইয়া দুই একটি নতুন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিস্থিতি বিশেষ বিবেচ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে দুইটি বিষয় আমাদের

প্রশিধানযোগ্য। আটলান্টিক সন্দের চতুর্দিক সর্বত্র এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উভয়ের পবম্পর সাহায্যের যে চুক্তি তাহার সপ্তম সর্বত্র—যে সকল দেশ মার্কিনের ইজারা-স্বত্ত্ব বন্দোবস্তে আবদ্ধ, এই দুইটি সর্বত্রের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই দুইটি সর্বত্র বিশেষ প্রশিধানযোগ্য। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে বুটেন ও মার্কিনের মতি-গতির পরিচয় ইহাতে প্রকট। এই দুইটি সর্বত্রের একটি উদ্দেশ্য হইতেছে, শুদ্ধ প্রশমন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত সর্ব দেশে বিদেশী পণ্যের প্রতি নিষ্কারিত শুল্কের হ্রাস। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, নিখিল জগতের কাঁচা মালের উপর সমস্ত জাতির অবাধ ও সমান অধিকার। ভারতের জায় প্রচুর কাঁচা মালের উৎপাদক, অথচ শিল্পে অল্পমাত্র দেশের পক্ষে এই দুইটি উদ্দেশ্যের কোনটিই কল্যাণজনক নহে। ভারত অবশ্য ইজারা-স্বত্ত্ব বন্দোবস্তের পক্ষভুক্ত। কিন্তু মার্কিনের সহিত আমাদের কোন অস্ত্রোক্ত-সাপেক্ষ চুক্তি নাই, কারণ, ভারত উক্ত চুক্তির সপ্তম সর্বত্রের শুদ্ধ-প্রশমন-নীতি মানিয়া লইতে সমর্থ নহে। যুক্তরাষ্ট্রে এই গুরুতর সমস্যা ভারতের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইবে। ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অনিষ্টকর এই সমস্যা ব্যতীত আমাদের আর একটি গুরুতর বিচাধ্য বিষয় হইতেছে যে, বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বিপক্ষীয় অথবা বহুপক্ষীয় কিরূপ চুক্তি ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ঠালিং-সংস্থিতির ভবিষ্যৎ বিশেষ বিবেচ্য। যদি আমরা আমাদের ঠালিং-সংস্থিতিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত মূল্যায় পরিবর্তিত করিতে না পারি, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের সহিত বহুপক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই সংস্থিতির উদ্ধারের নিমিত্ত আমাদের পক্ষে কিছু কালের নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দুই পক্ষীয় চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কারণ, সে দিনও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহকারী মিঃ এটলি বৃটিশ অর্থ-সচিব হ্রার জন এণ্ডারসনের ঘোষণার প্রতিধ্বনি করিয়া পার্লামেন্টে মহাসভায় বলিয়াছেন যে, মার্কিনের সহিত অস্ত্রোক্তসাপেক্ষ চুক্তিতে যে প্রকার সর্বত্রই থাকুক না কেন, বুটেন কখনও সাম্রাজ্যিক শুদ্ধ-প্রশমন-নীতি অর্থাৎ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহের সহিত অপেক্ষাকৃত কম শুদ্ধ আদান-প্রদান নীতি পরিহার করবেন না। প্রধান মন্ত্রী চার্লিলও কিছু দিন পূর্বে তাহার একটি অতি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মার্কিন-ও এই সর্বত্র সম্মত হইয়াছেন; কারণ, বুটেন চলতি ব্যবস্থাগুলিকে অল্পস্থ রাখিয়াই আটল্যান্টিক সন্দের ও পরম্পরের সাহায্যকারী চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, যুক্তরাজ্যের জায় প্রভূত পরিমাণে শিল্পে সমুন্নত এবং শক্তিশালী জাতির পক্ষে যদি যুক্তরাষ্ট্রে তাহার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করলে সাম্রাজ্যভাঙত্রে কম শুদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারতের জায় শিল্পে অল্পমাত্র দেশের পক্ষে রক্ষণ-শুল্কের অপরিহার্য প্রয়োজন পরিহার একান্ত অসম্ভব। ভারত সরকার বিশেষরূপে অল্পসন্ধান এবং বিবেচনা না করিয়া কোন রক্ষণ-শুল্কের প্রবর্তন করেন না, কারণ, ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্র জাতীয় শাসনতন্ত্র নহে এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থ বহু ক্ষেত্রে শাসন শক্তির স্বার্থের অল্পস্থ হইতে পারে না। সাম্রাজ্যিক শুদ্ধ-প্রশমন প্রথা সর্বথা ভারতের অল্পস্থ নহে; কারণ, আমাদের রপ্তানী পণ্য একপ বিবিধ প্রকারের যে, সেগুলির রপ্তানী কেবলমাত্র সাম্রাজ্যান্তর্গত অথবা কোন

বিশিষ্ট দেশে নিবন্ধ রাখা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে যে, যুক্তকালে আমরা যে সকল দেশের সহিত রপ্তানী-বাণিজ্যের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছি, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস না পায়। এই প্রকার পক্ষপাত অথবা অল্পস্থ-মূলক শুদ্ধ-প্রশমন প্রাথম্য ভারত সম্মত হইতে পারে—যদি তাহার কোন বিশিষ্ট স্বার্থের হানি না ঘটে এবং তাহার নিজস্ব প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোন বিঘ্ন না ঘটাইয়া একপ পক্ষপাত অথবা অল্পস্থ তাহার স্বাধীন বৈজ্ঞানিক উপর নির্ভর করে। আমাদের আত্মস্বার্থ সংরক্ষণার্থ আমরা যে সকল অনিষ্ট নিবারণকর বিশি-বিধান দাবী করি, আমাদের আত্ম-স্বার্থ-পরায়ণ প্রাপ্তিপক্ষপাত তাহার অপব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর স্বাতন্ত্র্যের অভিলষি। আমাদের অল্পমাত্র অবস্থার নিমিত্ত যে আত্ম-স্বার্থ-সংরক্ষণ-মূলক ব্যবস্থার অতীত প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের দাবী আমাদের অল্পমাত্র অবস্থার নিমিত্ত সম্পূর্ণ সম্মত এবং যুক্তিসম্মত। আমাদের এই দাবী সামরিক শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে; পরন্তু আমাদের অল্পমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি দ্বারা জন-সাধারণের অতি হীন জীবনব্যতীর দ্বারা উন্নতি সাধন হেতু অত্যাধিক ও অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতির জায় বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন মানের মুদ্রা প্রকরণের মধ্যে একটি স্থিতিশীল বিনিময় সম্পর্কের প্রসঙ্গ বিশেষ প্রবল। আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠকে এ বিষয়ে ভারত তাহার সমস্তার কথা বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক বৈঠকে অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধান হয়—রাজনৈতিক স্বার্থের কুটিল চক্রে। তাহাতে বিভিন্ন জাতির বিশেষতঃ অল্পমাত্র দেশের প্রতি কড়া সুবিচার হয় না। শক্তিমান্ জাতিগুলির স্বার্থসংঘর্ষে তাহাদের জায় অধিকার বিবর্তিত হয়। এই নিমিত্ত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের পরিচালক-মণ্ডলীতে ভারত স্থায়ী আসন পায় নাই। চীন ভারত অপেক্ষা শিল্পে সমৃদ্ধ নহে, তথাপি চীন একটি স্থায়ী আসন পাইয়াছে; এবং মার্কিনের প্রভাবে ল্যাটিন আমেরিকা পাইয়াছে দুইটি আসন! যেহেতু, ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন, সেই হেতু ভারতের পক্ষে স্বতন্ত্র আসন সম্ভবপর নহে। আমরা কোন জায় অধিকার দাবী করিলেও আমাদের শাসনকর্তাদের মতে আমাদের জায়সম্মত অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিষ্ট হয়; কিন্তু সমস্ত স্বাধীন দেশে এবং প্রত্যেক আন্তর্জাতিক বৈঠকে অর্থনৈতিক নিয়মনীতি রাজনীতির কুট কৌশলে নিরূপিত ও পরিচালিত হয়। কর্তৃপক্ষের অভিমত না হইলেই আমাদের অর্থনীতির অপব্যাখ্যা হয়। এই হেতু আমাদের ঠালিং-সংস্থিতির জায়সম্মত ভাবে আমাদের স্বার্থের অল্পস্থ আদায়ের প্রয়াসও নিশ্চিত। আমাদের উদার-সংস্থিতির সমষ্টি কত এবং তাহা কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। যাহা ইউক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আমাদের স্বার্থের অল্পস্থ জায় অধিকার দক্ষা করিতে হইলে আন্তর্জাতিক অর্থ-বিনিময় ও সমর্থন-ভাণ্ডারে যোগদান আমাদের অবশ্য প্রয়োজন।

শিল্পোপযোগী অর্থ-সম্পদ ভারতের প্রচুর, কিন্তু ভারতবাসী চির-চরিত্র। শিল্প-বাণিজ্যের সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের

জন প্রতি অতি-বল্য় আয় এবং জনসাধারণের অতি হীন ও হেয় জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিয়া আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপন নহে। এই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মূলধনেরও প্রয়োজন। সুতরাং আন্তর্জাতিক অর্থ-বিনিময়ের জায় আন্তর্জাতিক মূলধন বিনিয়োগের বিধি-ব্যবস্থার আমাদের যোগদান বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অধিকতর প্রবল। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে রপ্তানী-বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করিতে হইবে, সুতরাং তাহার পক্ষে অত্যন্ত দেশে অর্থ-বিনিয়োগ সম্ভবপন নহে। পঞ্চাশত্রে, যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিনের প্রচুর অর্থ থাকিবে বিভিন্ন দেশকে ঋণ নিবার এবং বিভিন্ন দেশে শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগের নিমিত্ত। আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের নায়ক স্যার চুগীলাল মেটার অল্পমানে একই অর্থের পরিমাণ ২০০০ মিলিয়ন ডলার। ভারতের বর্তমান আন্তর্জাতিক আর্থিক অবস্থা বিশেষ হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অল্পকূল। আমাদের দেশে কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের নিমিত্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন, অথচ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ভারতে প্রাপ্য নহে। সুতরাং বিদেশে ঋণ গ্রহণ যুক্তি-সম্মত—যদি ঋণের সহিত কূট রাজনৈতিক প্রভাব এবং দূত-প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক স্বার্থের প্রভুর আমদানী না হয়। আন্তর্জাতিক শক্তিশালী শিল্প-ব্যবসায়ীর সর্বগ্রাসী চক্রান্ত যে কত মারাত্মক, তাহা আমরা জানি। আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে আমাদের জাতীয় প্রতিনিধিগণ দৃঢ় ভাবে এইরূপ চক্রান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত শক্তিশালী জাতিগুলি চিরদিন শিল্পবাণিজ্যে অগ্রসর হইতে স্বল্পমূল্যে প্রচুর কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া সেই সব দেশেই তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া স্বদেশে শিল্পপুষ্টি করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে। এই নিমিত্ত নিখিল জগতে জায়সকল ভাবে কাঁচা মালের বটন প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বার্থ সংগঠিত। ভারত প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল উপাদান করে এবং তাহার প্রকৃষ্টাংশ রপ্তানী করে। ইহাতে আমাদের শিল্প প্রসার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। এ সম্বন্ধেও আমাদের প্রতিনিধিগণ 'রাই' বৈঠকে আমাদের জাতীয় স্বার্থের অল্পকূল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শিল্পে সমুন্নত শক্তিশালী জাতিগুলির শ্যেন দৃষ্টি নিবন্ধ ভারতের জায় কাঁচা মাল-সম্পদে সমৃদ্ধ, অথচ শিল্পে অগ্রসর দেশগুলির প্রাথমিক উপর দ্রব্যজাতের প্রতি। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে জেনেভার জাতিসংঘের বৈঠকে ভূতপূর্ব ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর (অধুনা লর্ড টেম্পল উড্) নিখিল জগতের কাঁচা মাল বটন সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—প্রধানতঃ হিটলার ও মুসোলিনীকে খুশী করিবার নিমিত্ত। আটলান্টিক সনদেও এইরূপ বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং

শক্তিশালী জাতিসমূহের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে যুক্তোত্তর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা সহজেই অল্পময়ে। আন্তর্জাতিক কার-কারবার বৈঠকে ভারতের জাতীয় প্রতিনিধিগণ তাহাদের দূরভঙ্গি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের পন্থাও নির্দেশ করিয়াছেন। অনেকেই জানেন না যে, গত দুই তিন বৎসর হইতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের যুগ্ম শাসনে কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য একটি সংযুক্ত-মণ্ডলী লিগু রহিয়াছে। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক অর্থনৈতিক শাসন বিভাগ তাহার বিভিন্ন শাখার মারফতে দৃশ্যপ্য ধাতু এবং কূট প্রয়োজনীয় (strategic) কাঁচা মালের সন্ধান লিগু আছেন। সুতরাং আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধে যোগদান করিতে হইবে; নতুবা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি স্তব্ধ-পর্যন্ত হইবে। আমাদের দেশের কৃষিজ, বনজ ও খনিজ কাঁচা মাল আমাদের দেশে সম্ভাব্য ও প্রচলিত শিল্পে সদ্যবহার করিয়া বাহা উন্নত হইবে, মাত্র তাহাই আমরা হস্তান্তরিত করিব। তাহার অধিক নহে।

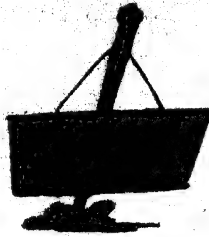
জলপথে স্থলপথে ও শূন্যমার্গে বাত্মী ও মাল পরিবহনায় যানবাহনের যথাযোগ্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আমাদের স্বদেশের স্বার্থ ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। জাহাজ ও বিমান পরিচালনে আমরা শৈশবাবস্থায় আছি। এই দুইটি বিষয়ে পরদেশী-প্রাধান্য আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অল্পকূল নহে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সর্বশেষে সর্বাপেক্ষা জটিল ও কূটিল প্রশ্ন হইতেছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে বে-সরকারী প্রচেষ্টা। এই বিষয়ে ভারতের শিল্পী বণিক সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে মতবৈধের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। প্রায় সর্ব স্বাধীন দেশেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি বিস্তৃত। ভারতের জায় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর ও অসহায় দেশে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সাহায্য সহায়তা এবং সহযোগিতা ব্যতীত আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপন নহে। বে-সরকারী প্রচেষ্টা সরকারী সাহায্যপুষ্ঠ না হইলে প্রবল বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কখনই সফলকাম হইতে পারে না। আমাদের দেশে এই প্রতিযোগিতা অতি ভীষণ। আমরা পরাধীন জাতি! রাষ্ট্রশক্তির স্বতন্ত্র স্বার্থ, ঐ শক্তির মিত্রশক্তি-সংঘের স্বার্থ এবং অজ্ঞাত পরদেশী শক্তির প্রবল প্রচেষ্টা—এই ত্রিশক্তির চাপে আমরা চিরখিন্ন। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয় সম্বলনই আমাদের উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপতিগণ তাঁহাদের সম্প্রতি প্রকাশিত দ্বিতীয় বিবৃতিতে অল্পকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বে-সরকারী কার-কারবার বৈঠক অবশ্য নিরঙ্কুশ বে-সরকারী প্রচেষ্টার পক্ষপাতী।

“অহঙ্কারকে, ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবো তার
প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তার মানুষ হব
মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অস্ত
স্বভাবে হৃদয়।”—রবীন্দ্রনাথ

চতুর্থ অধ্যায়

বিকলে চা খাচ্ছি। প্রার চারটে হবে।

এমন সময় এক জন বেদীরা একটা চিঠি নিয়ে এল। তার মোহনচাঁদ অগ্রদূত লিখেছেন। "অবিলম্বে আসন, বিশেষ প্রয়োজন।" রামাহুজের দিকে চাইলুম। রামাহুজ বললে— "বাড়ী উচিত। কি থেকে কি হয় বলা যায় না। তবে সেখানে, বাবার আগে পুলিশে একটা খবর দিতে হবে।"



[চাক্ষুর্য উপজাতি]

ঐকান্তি রায়

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে দিল্লীর পুলিশ কমিশনারের কাছে গেলুম। তাঁর সঙ্গে রামাহুজের অল্প-বিস্তার পরিচয় ছিল। অভ্যর্থনা করে বসিয়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাস্য করলেন। রামাহুজ উত্তর বিজয় গুপ্তের উদ্ধারের কাহিনী সবিশেষ বর্ণনা করে বললে— "এখন আমরা শ্রম মোহনচাঁদের বাড়ী যাচ্ছি। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। হয়ত সেখানে কোন দুর্ঘটনা হবার চান্স রয়েছে। আপনি কয়েক জন পুলিশ-কর্মচারীদের ছদ্মবেশে বাড়ীর চারিদিকে মোতায়েন করে দেবেন।"

কমিশনার সাহেব বললেন— "বেশ, তাই হবে।"

আমরা শ্রম মোহনচাঁদের বাড়ী গেলুম। তিনি ভেতরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বললেন। দু'একটা অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদসূচক কথার পরই তিনি বললেন— "মিষ্টার বন্স, কাল আপনারা উত্তর গুপ্তর বিষয়ে অনুসন্ধান করতে আমার কাছে এসেছিলেন। সুনলুম, অল্পকণ পরেই দ্বিতীয় বার এসে আমার টাইপিষ্ট স্মিত্রো দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চান। তার পর সে আপনারা সঙ্গে চলে যায়। এখন পর্য্যন্ত কিরে আসেনি। তার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"

রামাহুজ গম্ভীর ভাবে বললে— "জানি অনেক কিছু, কিন্তু সব কথা আপনাকে বলে কোন লাভ হবে না। কেবল এইটুকু জানলেই বুঝতে পারবেন, সে কেন ফিরে আসেনি। তার আসল নাম র্যাচেল ফেরিস। জাতে ইহুদী। ক'লকাতায় এক গুরুতর অপর্যায়ের জন্ত পুলিশ তাকে সন্দেহ করে। কিন্তু প্রমাণ অভাবে বেঁচে যায়। এখন সে নাম ভাড়িয়ে আপনার কাছে চাকরী করছে।"

সবিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে শ্রম মোহনচাঁদ বললেন— "তাই না কি! কি ভয়ানক কথা! গেছে ভালই হয়েছে।"

"আপনি কি কেবল এই জন্তই ডেকেছিলেন?" রামাহুজ প্রশ্ন করলে।

শ্রম মোহনচাঁদ নিয় স্বরে বললেন— "না। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর এবং গোপনীয়। কাল রাত্রে আমার ল্যাবরেটরীতে চোর ঢুকছিল। কয়েকটি অতি দরকারী কাগজপত্র চুরি হয়েছে। এক জন সাধারণ চোর সেই কাগজপত্র নিয়ে কি করবে? কোন অর্থই বুঝতে পারবে না।"

"হয়ত যে বুঝতে পারে এমন লোকের কাছে বিক্রী করবে।"

"না, মিষ্টার বন্স, তাও সম্ভবপর নয়। সবই সত্যিকার নোট। কিছুই পুরোপুরি লোকা ছিল না। আমি ছাড়া অন্য কেউ তার অর্থ বুঝতে পারবে না। তবে একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে। সেকের মধ্যে অতি মূল্যবান সামগ্রী আছে। বোধ হয় সেইটাই চুরি করতে এসেছিল। কিন্তু তারা সেক খুঁজতে পারেনি। তাই বোধ হয় আমার কতিপয়ত করবার উদ্দেশ্যে বা সামনে পেরেছে তাই নিয়ে চলে গেছে।"

"হতে পারে। তবে একটা চিন্তা করবার বিষয় রয়েছে। কাল থেকে মিস কোরিস ফেরার। কালই আপনার ল্যাবরেটরীতে চুরি হয়েছে। হয়ত এর মধ্যে আপনার লেডি টাইপিষ্টের কোন হাত আছে। উত্তর গুপ্তর অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে তার বিলম্ব হাত ছিল। আচ্ছা, আপনার এখানে সে কত দিন কাজ করছে?"

"তা প্রায় মাস দু'য়েক হবে। মেম্বের-ব্যবহারে আমি কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাইনি।"

"তা না পেতে পারেন, কিন্তু আমি যা বলছি সবই সত্য। বাহিরের চোর আপনার সেক কি আছে জানবে কি করে? ল্যাবরেটরীতে সাধারণতঃ লোক চুরি করতে আসে না। আপনার সেক কি আছে? টাকা কড়ি?" গহনা?"

বুহ হাত সহকারে শ্রম মোহনচাঁদ বললেন— "তার চেয়ে অনেক দামী জিনিষ। রেডিয়াম আর ইরিডিয়াম। জগতে অতি দুর্লভ। আমার নয়। গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এক্সপেরিমেন্টের জন্ত দান করে এনেছি। আমার কাছে যা আছে অত্যন্ত অল্প, কিন্তু তার দাম এক কোটি টাকারও অধিক। সুতরাং আমার দায়িত্ব বুঝতে পারছেন।"

"আর কত দিন এই রেডিয়াম আপনার কাছে থাকবে?"

"মাত্র দু'দিন। আমার এক্সপেরিমেন্ট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

রামাহুজ গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে— "সাক্ষীও নিশ্চয়ই এ কথা জানত। তাই সে কালই চুরি করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কাল পারেনি। সুতরাং আবার এ চেষ্টা হবে। হয়ত আজকেই। আপনি আমার সম্বন্ধে কোন কথা ঘৃণাস্বরেও কাউকে বলবেন না। কিছু ভাববেন না। আমি কথা দিচ্ছি, রেডিয়াম চুরি যাবে না। আপনার বাড়ীতে চোকবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।"

শ্রম মোহনচাঁদ একটু বিমিত হয়ে বললেন— "তা আছে। কিন্তু কেন?"

"কারণ, তাদের লোক নিশ্চয়ই আপনার বাড়ীর ওপর নজর রেখেছে। আমাদের তারা বেরিয়ে যেতে দেখবে। আবার রাত্রে বন্ধন কিরব তখনও দেখতে পাবে। আমি তাদের অলক্ষ্যে আপনার বাড়ীতে ঢুকতে চাই। নইলে সব প্রাণ কীসে যাবে।"

শ্রম মোহনচাঁদ বললেন— "ঠিক বলেছেন, এটা আমার মাথাধ এতক্ষণ আসেনি। আমার বাড়ীর পিছনের রাস্তার নাম ম্যাগগট্রা রোড। সেই রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই একটা গলি পাবেন। সে গলিটা বাড়ীর পিছনের বাগান পর্য্যন্ত এসেছে। এই নিন চাবী খিড়কী দরজার তালা লাগান আছে। এই চাবী দিয়ে খুলে বাড়ীর ভেতর ঢুকবেন।"

রামাহুজ নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। বললে— "ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি বন্ধন কাজের ভার নিয়েছি চেষ্টার ক্রটি করব না। তবে কাউকে বেন কিছু বলবেন না।"

শ্রম মোহনচাঁদ বললেন— "না, না, তাকি কখনও বলি।"

আমরা বেরিয়ে ট্যান্সীতে উঠে বসলুম। রামাহুজ দেখলুম খুবই খুশী। পথে তাকে জিজ্ঞাস্য করলুম— "এখন কি করবে?"

রামাহুজ উত্তর দিলে— "হোটেল থেকে জিনিষপত্র নিয়ে ক্রেপে গিয়ে ক'লকাতাসমীপে ক্রেপে বসব।"

“ক’লকাতা কিরে যাবে। আর স্ত্র মৌহনটাদের রেডিয়াম?”

হো তো করে হেসে রামাহুজ বললে—“ক’লকাতাগামী ট্রেনে চেষ্টা সব বলেছি, ক’লকাতায় কিরে যাব তো বলিনি। একটু ভেবে দেখে নিন। এটা নিশ্চিত যে, শত্রুপক্ষ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তাদের বিশ্বাস করাতে হবে যে আমরা দিল্লী ত্যাগ করছি। ক’রে তা সম্ভব? যদি আমরা ক’লকাতাগামী ট্রেনে উঠি এবং দিল্লী ত্যাগ করি তবেই।”

“তার মানেই তো দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।”

“তা যাচ্ছি বটে, কিন্তু বেশী দূর নয়, শাহাদরা পর্যন্ত। সত্য করে দিল্লী ত্যাগ করছি নিজের চোখে না দেখলে তারা বিশ্বাস করবে কেন?”

“কিন্তু শাহাদরায় তো ট্রেন থামবে না?” আপত্তি করলুম।

“পরমা দিলে সবই হয়।” রামাহুজ উত্তর দিলে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—“ডাইভারকে অথবা গার্ডকে ঘুষ দিলে মেল যেখানে ইচ্ছা দাঁড় করানো যায় এই প্রথম শুনলুম। আগে জানতুম না।”

আমার বিরক্তি লক্ষ্য করে রামাহুজ হেসে বললে—“বন্ধু, ট্রেনের প্রত্যেক কম্পার্টমেন্টে একটা করে শেকল থাকে বোধ হয় লক্ষ্য করেছে। শেকলটি টানলেই ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়।”

“অথবা শেকল টানলে পঞ্চাশ টাকা ফাইন দিতে হয়।

“তা দেওয়া যাবে।”

“তুমি শেকল টানবে?”

“না। কোন কম্পার্টমেন্টে শেকল টানা হয়েছে জানা বিশেষ শাস্ত্র নয়। অল্প এক জন লোক অল্প এক কম্পার্টমেন্ট থেকে শেকল টানবে। গোলমাল হবে। ট্রেন দাঁড়াবে। সব লোক-জন ছুটে আসবে। সেই কীকে তুমি আর আমি সরে পড়ব।”

“মাল-পত্তর?”

“সোজা ক’লকাতা চলে যাবে। সেই লোকের সঙ্গে।”

“লোকটি কে?”

“দিল্লী পুলিশের এক জন কর্মচারী। সে বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। সাধারণ বেশে যাবে, যাবার জন্ত তাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দেব।”

অতঃপর আমার প্রান মত সকল কার্যই করলুম। শাহাদরার কাছে ট্রেন দাঁড়াল। গুণ্ডাগোল হল। আমরাও সরে পড়লুম। রামাহুজের হাতে একটি মাত্র ছোট স্ট্রিকেশন। টলা করে দিল্লীতে কিরে এলুম। একটা ছোট ধর্মশালায় উঠলুম। আশ ঘণ্টাটাক পরে ধর্মশালা থেকে বার হ’ল হু’জন গুণ্ডা। বলা বাহুল্য যে, স্ট্রিকেশনে ছন্নবেশের সরঞ্জাম ছিল এবং গুণ্ডা হু’জন আর কেউ নয়—আমি আর রামাহুজ।

রাত্রি বায়োটো নাগাদ আমরা স্ত্র মৌহনটাদের বাড়ীর কাছে উপস্থিত হলুম। চারি দিক নিস্তব্ধ। চাপা-হরে রামাহুজ বললে—“এখনও তারা আসেনি দেখছি। আজ রাতে নাও আসতে পারে। হয়ত কাল রাতে হানা দেবে। বাই হোক, ভেতরে যাওয়া যাক।”

অতি সন্তর্পণে বাগানের দরজা খুলে আমরা বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম। এক পা এক পা করে নিঃশব্দে অগ্রসর হচ্ছি হঠাৎ দশ-বারো জন লোক আমাদের আক্রমণ করলে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্ত আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। দেখতে দেখতে আমাদের মুখ-হাত-পা

সব বেধে ফেললে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাড়ীর বাইরে না দিয়ে গিয়ে ভেতরে নিয়ে চলল। তার পর এক জন লোক একটা দরজা খুললে। আমাদের একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। সেই ঘরটি স্ত্র মৌহনটাদের ল্যাবরেটরী। আলোয় দেখলুম, প্রত্যেকের মুখ মুখোমুখি আবৃত। ঘরের এক প্রান্তে বিরাট সেক। যে সেক স্ত্র মৌহনটাদের রেডিয়াম ছিল বলেছিলেন। এক জন চাবী দিয়ে সেকের দরজা খুললে। আমার অন্তরাচ্ছা শুকিয়ে গেল। এরা কি আমাদের সেকের মধ্যে বন্ধ করে দম আটকে মেরে ফেলবে। কি ভীষণ মৃত্যু! ভয়ে আমার কপালে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু না। সেকের এক প্রান্তে চাপ দিতেই দেয়াল ঘরে গিয়ে সিঁড়ি দেখা দিল। আমরা সেই সিঁড়ি দিয়ে মাটার নীচের এক কুঠরীতে নীত হলাম। ঘরে উজ্জ্বল আলোক, সেই আলোকে দেখলুম, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক মহাশয় মূর্তি। কালো আলখাল্লায় দেহ আবৃত, কালো মুখোমুখি মুখ আচ্ছাদিত, এমন কি হাত পর্যন্ত কালো দস্তানায় ঢাকা। কেবল মুখোমুখির দু’টি ছিন্ন থেকে ছ’টো চোখ জ্বল-জ্বল করছে। সে কি ভীষণ চাউনি, বাঘের চেয়েও হিংস্র। আর তার চেয়ে ভয়ঙ্কর সেই ব্যক্তির হাতের কালো পিস্তল।

ইঙ্গিত করা মাইই আমাদের সেইখানে নামিয়ে রেখে অপর সকলে প্রস্থান করল। আমরা একলা রইলুম সেই ভীষণদর্শন রহস্যময় কৃষ্ণ-বেশধারীর সামনে। আশ্চর্যে বুকলুম, ইনিই হলেন ত্রিমূর্তির ব্রহ্মা—বীর বুদ্ধিতে যজ্ঞস্বাকারীর পরিচালিত হচ্ছে। লোকটা খুঁকে পড়ে আমাদের মুখের বাঁধন খুলে দিলে। হাত-পা অবশ্য বাঁধাই রইল। শ্লেষ কণ্ঠে বললে—“রামাহুজ বাবু বে। কি সৌভাগ্য বে বিখ্যাত সখের ডিটেকটিভ রামাহুজ বাবু আজ আমার অতিথি। আপনার সাহস ও বুদ্ধির আমি তারিক করি, কিন্তু হঠকারিতা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। জানেন সেকগীয়ার বলেছেন—‘ডিসক্রীশন ইজ দি বটোর পার্ট অব ভালর।’ আমি আপনাকে সাবধান করে পাঠিয়েছিলাম আপনি তা উপেক্ষা করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে আপনার বুদ্ধিশক্তির পরীক্ষ করতে চেয়েছিলেন—তার এই পরিণাম।”

রামাহুজ কোন উত্তর দিলে না। একদৃষ্টে মুখোমুখি ব্যক্তির দিকে চেয়ে রইল। কি যেন সন্ধান করছে।

লোকটা বলে চলল—“আমাদের কার্যে কেউ বাধা দেয় তা আমরা পছন্দ করি না। সরিয়ে ফেলি। তার প্রমাণও কিছু কিছু আপনারা পেয়েছেন। মৃত্যু আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে তো প্রকাশ করে ফেলুন।”

ভয়ে আমার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গিছিল। গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। রামাহুজের কিন্তু মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না—ছিল কেবল একটা কৌতূহল। একদৃষ্টে লোকটার দিকে চেয়ে রামাহুজ বললে—“আপনাকে বেশ লাগছে। কথাবার্তার প্রশাণীও বড় যনোবুদ্ধকর। বড়ই হুর্ভাগ্য যে আমাদের পরিচয় এইখানেই শেষ হয়ে যাবে। তবে আমার একটা ইচ্ছা আছে। খুবী আসামীরও কাসীকাটে খোলাবার পূর্বে শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। আমার পকেটে সিগারেট কেস আছে। মরবার পূর্বে শেষ বায়ের মত ধূমপান করে নিতে চাই।”

লোকটা অষ্টহাস্য সহ বললে—“আপনিই কেবল বুদ্ধিমান, কেননা? হাতের বাঁধন খুলে দিতে হবে; কারণ, আপনি ধূমপান করবেন আমি নিকোবাই রামাহুজ বাবু। তবে সিগারেট দিচ্ছি।”

এই বলে রামানুজের পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করে একটা সিগারেট রামানুজের মুখে গুজে দিলে। তার পর নিজের পকেট থেকে সিগারেট-লাইটার বার করে জ্বলে রামানুজের সিগারেটের সামনে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে কি যে হয়ে গেল বুঝতে পারলুম না। লোকটা “ওরে বাপ রে” বলে চার পা পেছিয়ে গিয়ে চোখ বগড়াতে লাগল। হাত থেকে পিষ্টল ও লাইটার পড়ে গেল। রামানুজ হেসে বললে—“বটী-খানেক এখন চোখে কোন কাজ করতে পারবেন না। সিগারেটের মধ্যে এক বকম তীব্র বিষ মেশানো আছে। অবশ্য অল্প হয়ে বাবার ভয় নেই।”

লোকটা রামানুজের কথা শুনে কোন উত্তর না দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দরজা আঁধার করলে। তার পর কোথায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ দিকে রামানুজ দেখি ধীরে ধীরে নাগপাশের মত বাঁধন থেকে মুক্ত হচ্ছে। আমাকে বিফারিত লোচনে চেয়ে থাকতে দেখে বললে—“এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এক দড়ি দিয়ে পিচমোড়া করে বাঁধছে দেখে আমি বুকের ছাতি ও দেহের সমস্ত পেশীগুলো ফুলিয়েছিলুম। এখন কামাচ্ছি। তাই বাঁধন আপনা হতেই চিলে হয়ে খসে পড়ছে।”

সিগারেট-লাইটারটা তখনও জ্বলছিল। সেই শিখায় রামানুজ নিজের পায়ের বাঁধন পুড়িয়ে মুক্ত করলে। তার পর শরীরটাকে বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে হাত দুটাকে সামনে আনলে। অতঃপর পায়ের মত হাতের বাঁধনও অপসৃত হল। আমার বাঁধন খুলে রামানুজ বললে—“এইবার এ স্থান পরিত্যাগের চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঘরটা মাটার নীচে। নিশ্চয়ই এতে ঢোকবার এবং বেরোবার গুপ্ত রাস্তা আছে। খুঁজে বার করতে হবে। না পারলে জীবন্ত সমাধি।”

আমরা গুপ্ত পথ সন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাই না। লৌহময় কবর। কি ভীষণ অবস্থা। চারি দিকের লোহার দেয়ালে ঢোকা মেরে দেখতে লাগলুম, যদি কোথায় কাঁপা থাকে। হঠাৎ রামানুজ চেঁচিয়ে উঠল—“উঃ, কি পৈশাচিক বড়বস্ত্র!” জিজ্ঞাস্য নেড়ে তার দিকে চাইতেই ছাদের দিকে দেখালে। দেখলুম—দেখে গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। ভয়ে হাত-পা ঠক্ঠক করে কাঁপতে লাগল। ছাদ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে। একটু পরেই আমরা পিষে, চিপে,—উঃ কি ভয়ঙ্কর! এরা মানুষ না দানব। আমি সেইখানেই বসে পড়লুম। রামানুজের মুখে কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব। চোখ বন্ধ করে। একবার এদিক একবার ওদিক ছুটোছুটি করছে। দেয়ালে যা দিচ্ছে, হাত বুলাচ্ছে, থাকা মারছে। আমি প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে ইটনাম জপ করছি। ওদিকে স্নানিচিত্ত মৃত্যু নেমে আসছে—ধীরে ধীরে।

অকস্মাৎ রামানুজ বলে উঠল—“হয়ছে, ফাঙ্কনি হয়েছে।” তড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখি, একটা ছোট পেরেক ঘরে চানটানি করছে। একটা লোহার পাটাতন নামতে লাগল। দেয়াল যেন মুখ ব্যঙ্গ করলে। সামনেই সিঁড়ি। আমরা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। কাঁকটা আপনিই বোমালুম জোড়া লেগে গেল।

সিঁড়ি বেরে আমরা উঠলুম গিয়ে এক কোণের মধ্যে। সেখান

থেকে হাতড়ে হাতড়ে বাইরে এসে দেখলুম, এক নতুন জায়গায় গিয়ে পড়েছি। চারিধারে গাছপালা আর ষোপ। কোন ষোপ থেকে আমরা ঘর হয়েছিলুম বলা কঠিন। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বড় বাঁধার গিয়ে পড়লুম। তার পর খুঁজে খুঁজে শ্রম মোহন-চাঁদের বাড়ীর সামনে উপস্থিত হলাম। পুলিশের লোকেরা তখনও অপেক্ষা করছিল, আমাদের গুপ্তা মনে করে তখনই এসে ঘরে ফেরে। রামানুজ পরিচর দিতে তারা বিস্মিত হয়ে বললে—“আপনারা?” কণ্ঠে অবিশ্বাসের আভাষ। রামানুজ উত্তর দিল—হ্যাঁ, আমরা। এই দেখ তার প্রমাণ।” পুলিশ কমিশনারের প্রদত্ত সন্মুক্ত চিহ্ন দেখাতে তারা সেলাম করে বললে—“কই, কাউকে তো এখনও দেখলুম না।” রামানুজ বললে—“আজ রাতে হয়ত কেউ আসবে না। তবু তোমরা এইখানেই অপেক্ষা কর। আমি একবার শ্রম মোহন-চাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।”

আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা অবশ্য কাউকে বললুম না। শ্রম মোহনচাঁদের বাড়ী গিয়ে কলি: বেল টিপতে এক জন চাকর এসে দরজা খুলে দিলে। শ্রম মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে বললে—“কর্তার সঙ্গে তো এখন দেখা হতে পারে না। তিনি ঘুমচ্ছেন। সকালে আসবেন।”

রামানুজ বললে—“জরুরী কাজ। আমরা পুলিশের লোক। শ্রম মোহনচাঁদকে একবার খবর দাও।”

সে দৃঢ় কণ্ঠে বললে—“না, এখন হবে না।”

বুঝলুম, আমাদের গুপ্তা ভেবে আপত্তি করছে। রামানুজের মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম, সে যেন কি ভাবছে। তার পর বললে—“আচ্ছা, কাল সকালেই আসব।”

পুলিশদের নিয়ে আমরা থানায় গেলুম। ভোর হতেই পুলিশের এক জন উচ্চপদস্থ কণ্ঠচারীকে নিয়ে শ্রম মোহনচাঁদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। অবশ্য ছদ্মবেশ ত্যাগ করে। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলুম, শ্রম মোহনচাঁদ তখনও ঘুমচ্ছেন। পুলিশ কণ্ঠচারী বললেন—“এতক্ষণ ঘুমচ্ছেন কেন? আমাদের সঙ্গেই হচ্ছে, তাঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়নি তো? তোমার মনিবের শোবার ঘরে আমরা একবার যেতে চাই।”

চাকরের সঙ্গে শ্রম মোহনচাঁদের শয়নকক্ষে গেলুম। নাড়া দিতেও তাঁর ঘুম ভাঙল না। রামানুজ তাঁর চোখের পাতা টেনে দেখে বললে—“চোখটা যেন ভয়ানক লাল আর ফুলো দেখাচ্ছে।”

কণ্ঠচারীটি এদিক ওদিক ঘুরে একটি লিউমিনলের শিশি আঁধার করলেন। বললেন—“বোধ হয় ঘুমোবার ওষুধ খেয়েছেন, এখন কি করতে চান?”

রামানুজ বললে—“আর কিছুই করবার নেই।”

আমরা শ্রম মোহনচাঁদের গৃহ ত্যাগ করলুম। পুলিশের কণ্ঠচারী থানায় ফিরে গেলেন। আমরা ঘুরে বাড়ীর পিছন দিকের রাস্তায় গেলুম। যে দরজা দিয়ে হুকছিলুম সেটা ভালো বন্ধ। কিন্তু একটু দূরে অন্ধকূপ আর একটা দরজা, সেটিও ভালো বন্ধ। দুটো ভালোই এক।

রামানুজ বললে—“বোধ হয় আমরা ভুল বাড়ীতে হুকছিলুম।

সেই দিনই আমরা দিল্লী ত্যাগ করলুম। পথে রামানুজ জিজ্ঞাস্য করলে—“কিছু বুঝলে?”

উত্তর দিলুম—“তুমি বেঁচে গেছি।

রামাচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলল—“বাচার সঙ্গে সঙ্গে একটা খুব বড় রকম আবিষ্কারও করে ফেলছি। অবশ্য এমন প্রমাণ দিতে পারবো না যা পুলিশে চমকে দেবে। তবু যা কেনেছি তাতে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।”

বিমিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—“কি আবিষ্কার করলে?”

রামাচন্দ্র উত্তর দিল—“ক্রিমিটির মাথা—শ্রদ্ধা, বুদ্ধিবল।”

বুললুম, রাসের নিশ্চিত মুহুর ছাপ ওর মনের ওপর অতি গভীর ভাবে লাগ কেটেছে। হতভ ম'খার একটু ছিট হয়েছে। তাই হেসে বললুম—“ভালই তো!”

রামাচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলল—“কথাটা বিশ্বাস করতে পারছ না। যা বলব তা আরও অবিশ্বাস্য। হতভ তুমি আমার পায়ল মনে করবে। কিন্তু তুল আমার হয়নি। আমার একটা গর্গ ছিল। শত্রুর কীদ বৃত্ততে পারি—তাতে পা দিই না। কিন্তু কাল রাত্রে অকাতরে সেই কীদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম। অথচ কীদ নয়। ভুলিয়ে নিয়ে যাইনি। খেদ্দার সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন করেই গিচ্ছিলুম। তাদের এত দুষ্টি আমি ভাবতে পারিনি। আমি কে ভাবে কাজ করব সবই ছিল তাদের নথ্যপণ্ডে। ঐশ খামিয়ে ফিরে আসব এ শৃঙ্খল ত্যাগ জানত।” কোন পথে কখন থাকব জা জানত? বলই আমাকে ধরতে পেরেছিল এত সহজে এবং অভিজ্ঞে।”

তার কথাবার্তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কীদ হবে বললুম—“কি বলছ তুমি!”

রামাচন্দ্র উত্তর দিলে—“ঠিকই ক'ছি। কি করে জানতে পারল তুমিবে। কারণ, ক্রিমিটির ত্রুটি পশর কেউ নয়—হ্যাঁ, তুমি মোহনচাঁদ!”

আমি বিব্রত হয়ে বললুম—“রামাচন্দ্র, হয় তুমি কোপে গেলো না হয় ঠাট্টা করছ।”

রামাচন্দ্র বললে—“না বন্ধু, আমি ক্রোপিতনি অথবা ঠাট্টা করিনি। একটু চিন্তা করে দেখ। আমাদের গতিবিধি এক ক্রম মোহনচাঁদ ছাড়া অপর কেউ জানত না। কথার কথায় তত ব্যস্তক বলে ফেলবেন এমন ঝাঁচা লোক তিনি নন। বাগানের সবজির চাবী চাইতেই তিনি ব্যস্ত করে দিলেন। কোন ব্যক্তি বাগানের চাবী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। তিনি জানতেন, আমি চাবীটা চাইতে পারি তাই তৈরী হয়ে ছিলেন। তার পর কঠোর এবং তীব্র। মুখোদ পরেও তা আমার কাছ থেকে গোপন করতে পারেননি। শেষ তাঁর ঘুমোনে। ডোবের পাতা খসে দেখলুম, ডোব লাগ এবং ফুলে রয়েছে। রাসের ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া। অসহ্য যন্ত্রণার তল ঘুমোবার গুণ খেয়েছিলেন।”

অতিশয় বিমিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—“পুলিশে খবর দিচ্ছ না কেন?” গম্ভীর ভাবে রামাচন্দ্র উত্তর দিলে—“কারণ, এখনও সে সময় আসেনি। এখন থেকে পুলিশে খবর দিলে শত্রুরক সাহায্য করে শিলে আমার সমস্ত চেষ্টা পতঞ্জনে পরিণত হবে। আর প্রমাণ?”

আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না। চুপ করে বসে পু।

[ক্রমশঃ]

আলো ও ছায়া

ঐকিশোরী পাল

সন্ধ্যার পথের বেলা কেবল নাকো সীমাব উপায়া ;

অলিঙ্গিত জীবনের গৈরিক খাতোয়া

অতীতের বেলা ভোগলিনিকা, অল্যাময় বর্তমান

ভবিষ্যৎ নিশীথের দেয় না সম্মান,

নিশ্চলক চোখে শুধু পৃথিবীর বিস্তৃত ভবিষ্যৎ—

কল্পাসের অভিনব ভার্গব জয়ন্ত

সংগীতের সাথে তার নিয়ে আসে মৃত্যুর সপন ;

বৈশাখী হাওয়ায় যেন বেঁচে যায় অশোকের বন ।

সব কিছু ভুল মনে হয়,

কোন দিন কিছু স্বপ্ন ছিল মধুময়,

ভুলে যাই আজ তার সব পরিচয় ।

এই ত সে দিন ছিল শ্যামল প্রান্তর,

লগ্ন শুভ মেঘছায়া চির মনোহর ;

অশান্ত উজ্জল দিন ছায়া কেলেছিল জামি

অন্তরু তারার মাঝে, কামনার মাস্তানা-পাখানি

অকণ্ঠিত অলোছিল হলুদ দিখায়—

অতীতের বগালু হাওয়ায় ।

জীবনের প্রতি পলক করেছিল পান

সোমশাখের মত, আজিকার বর্তমান কুহেলিকাময়,

ভুলে গেছে অতীতের সব পরিচয় ।

তার পর কোন তমিষায়

নিশীথচাঁদীর লগ্নে শুধু নৃতন অধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসে, অভিলষিত দিনগুলি যেন

ছায়ারহীন পদক্ষেপে নৃতরঙ্গ জড়ি আঁঠি-বোলে,

আহত কামনা সব লাগ জাঁকু খুসর সন্ধ্যায়

যাত্রিক যাত্রা যেন কৃত্ত বুদ্ধসার

প্রলাপ কহিয়া সেল বক্তব্য প্রান্তরে

নিঃসহায় বর্তমান তিলে তিলে করে ।

কোন দিন তন্ত্রাচীর ধবস্তর লাগি

ছায়ানীল আকাশের আলো ছিল জাগি ;

জীবনের কিছু স্বপ্ন গড় হয়ে বসন্ত বাতাসে ;

তারকার সাথে ছিল বিধের আকাশে,

অতীতের সাথে সাথে বকুলের ফুল যদি হয় ;

জিমিত সূর্য্যেত আজ সব কিছু কুহেলিকাময়,

জাহি জাহি বহু ঘুরে লব নিকীসন

আজো বেলা দিবসগুলি উজ্জল বিহীন ;

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধার বিচার

মানুষ এবং জীব মাঝেই পোড়ার কোন অচিহ্ন অদৃশ্য, হৃদয়-
হৃদয় পদার্থ ছিল। তারই আপন স্বভাবে তার এই দেহ

ধারণ—অরূপ থেকে এই রূপায়ণ—কারণ থেকে ফল এবং ফল থেকে
ফলে তার এই আত্মপ্রকাশ। যেমন একটি ছোট সবিহার দানার
মত কট-বীজে সমস্ত বট গাছটির স্বভাব নিহিত আছে, যেমন একটি
আমের বা সেলের বীজে তাদের স্ব স্ব স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও আকৃতি লীন
আছে, বসেই সে বীজ থেকে গজানো গাছে তা' কালে প্রকাশ পায়,
প্রত্যেকটি জীবাত্ম, জ্ঞান ও শিল্পেতে তেমনি একটি বিশেষ পূর্ণতা
মাছুবের ভাল মন্দ ভগাণ্ড চরিত্র আকৃতি প্রকৃতি নিহিত আছে,
শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আধারে ক্রমশঃ সেই বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে।
একটি জ্ঞানের মাঝে হুমিয়ে আছে হিটলার, আর একটিতে আছে
ব্যানাসবের মত এক মহাকাব্যী পুরুষ; কোনটিতে আছে এক ধৃষ্ট
প্রতাবক এবং অন্য একটিতে আছে এক বন্ধ বাতুল। মানুষের
মাধার গঠনে, হাডের আকারে ও বেধার, তার চেতনার ধরণ ও ছন্দ,
তার জন্মের মুহূর্তের গ্রন্থ-সন্নিবেশে সর্বত্র আছে এই সব ভাবী
সম্ভাবনার চিহ্ন। শিশুর দেহটি হচ্ছে তার অন্তর্য্য চিমনির কৌটা;
তরল স্ফুটতিস্থল তবু বলে সে বহু পাত্রেও স্বভাব কতকটা
গ্রহণ করে; কারণ, তার অন্তরের প্রেরণা ও ভাবী প্রকাশের
ধারাতিক বাক্য করে রূপায়িত করবার অমূল্য কয়েই সে পড়েছে
এই তার পাত্র ও যন্ত্রক। সেহ হচ্ছে তাই জড় জগতে সেই
দেহীর প্রতীক, তার জীবন-মাত্রের বেতার যন্ত্র, তার প্রকাশ ধর্মের
রূপ-কোষ।

পৃথিবীতে কত রকম বিভিন্ন মানুষ আছে, তাদের রকমারি
আকৃতি প্রকৃতি স্বভাব ও গুণ অশক্যের না আছে হিসাব, না আছে
হিসাব। সে অনন্ত চেতনা ফুটেছে অনন্তমুখী হয়ে—বৈচিত্র্য ও তার
অনন্ত অসীমতার পরিচয় দিয়ে। মানুষের এই অসংখ্য অগণ্য
টাইপকে বুঝতে হলে তাদের একটা কাঙ্ক্ষারী শ্রেণী বিভাগ করে
নিতে হয়; তাদের গুণাঙ্গের তারতম্যের হিসাবে মানুষকে তাদের
পরিচুত কতকগুলি টাইপ বা জাতিতে ভাগ করে তবে তাদের প্রকৃতি
আমাদের মূল মনবুদ্ধির মানদণ্ডে কতকটা ধরা যায়। হিন্দু
শাস্ত্রকারদের মানুষ চেনবার ছিল সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি
ধারা। আধুনিকেরা হয়তো পুরাতন ঋষিদের এই ত্রিগুণকে একটা
কল্পিত ব্যাপার বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু সত্ত্ব রজ তম এই
ত্রিগুণের খেলা এক সেই অমুদ্রারী শ্রেণী বিভাগ শুধু মানুষেই নয়,
জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ সকল জীব ও পদার্থেই পাওয়া যায়। এই
তিনটি হচ্ছে মানুষের ও জীবমাত্রের সত্তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বা
গুণ। সত্ত্ব অর্থে জ্ঞান বা প্রকাশ গুণ—আলো; রজঃ অর্থে প্রচুর
প্রাণশক্তি, জাব বা গতিমহতা; তমঃ মানে সত্তার মুখ্য, জড়তা—
বা' থেকে আসে জড়তা, অজ্ঞান, অপ্রকাশ, মোহ। যার মাঝে
সম্বলণ বেশি সে স্বভাবতঃই হয় জানী, বুদ্ধিমান, বীর ও বিচারণালী;
রজঃপ্রধান মানুষ হয় জারুক, প্রেম-প্রাণ, কোবী, অপ্রাণকর্মী;
আর তমোভূমি মানুষের মানে জ্ঞানের দুখা বা কর্ত্ত ও ভক্তির

কোন বিশেষ তীব্র প্রেরণা ধুঁকে পাওয়া যায় না, সে স্বভাবতঃ হয়
মৃদু, মূলধনী, গতাহুগতিক—স্থিতিকামী।

শাস্ত্রের ভাষায় না বলে আরও কত ভাবে এই তিনটি টাইপ বা
শ্রেণীকে বোঝানো যায়; জানী, কর্মী ও মৃদু; মনোময়, প্রাণময় ও
স্থিতিময়; প্রকৃষ্ট, অর্ধকৃষ্ট ও অকৃষ্ট—এমনি কত ভাবে ও ভাষায়
এ একই সনাতন টাইপত্রয়কে বোঝানো যায়। যে কোনো টাইপ
বা জাতি তার স্পষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণ আছে সেই মানুষটির আকৃতি
প্রকৃতিতে—তার চোখ বলায় গতিবিধিতে, তার হাত-পায়ের গঠনে,
তার মুখাঙ্গুষ্ঠিতে—যথা চোখের, নাকের, কাণের, তরতর, মুখমণ্ডলের
গঠনে আকৃতিতে। সর্বা সর্বদাই সে মানুষটি তার অন্তর-পুরুষের
স্বভাব ও স্বরূপকে তার কাজে কক্ষে গতিবিধিতে চোখ বলায় প্রকাশ
করে ধরা দিয়ে দিয়ে চলেছে। যার গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে তিনিই তা'
স্পষ্ট দেখতে পান, এবং তা' দেখে মানুষ চিনে নেন।

এই সব মূল চিহ্ন এবং তার বহিঃপ্রকৃতির সুরসের লক্ষণগুলি
ছাড়াও যোগের হৃদয় দৃষ্টিতে—intuition-এর রূলে যোগীরা মানুষ
চেনেন। তাঁদের কাছে এমন কি তোমার কণ্ঠস্বরে, ব্যবস্থিত পাদুকার
ও বস্ত্রে, লেখাতে, পদকনিতে, গাঞ্জাকে, স্পর্শে আছে তোমার আমার
স্বভাবের পূর্ণ ও হৃদয় পরিচয়। অন্তর্দৃষ্টিতে চিনে মানুষকে তার আকৃতি
ও স্বভাবের অমূল্য চোখে পড়লেই সে মানুষ সার্থক হয়ে ফুটে ওঠে
ক্রমশঃ তার ঋণ মনুষ্য থেকে পূর্ণত্বের পথে অন্তর্নিহিত দেবদে।
শুধু যোগাভ্যাসের কেন, সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই খাটি শিক্ষক,
যে বোধে তার কোন্ ছাত্রটির কি প্রকৃতি, কোন্ দিকে কার স্বাভাবিক
প্রবণতা, তার চরিত্রের কোন্ দুর্বলতা কতটুকু প্রতিবন্ধক—শিক্ষাভ্য-
াসনের পথে—এক কথায় তার কোন্ শিক্ষার্থীকে কি মতিগতি
বা প্রেরণা দিয়ে প্রকৃতিবাহী জগতে পাঠিয়েছেন ঠিক কি হয়ে পড়ে
ওঠবার জন্ত—কবি হয়ে, না শিল্পী হয়ে, না বাস্তব ক্ষেত্রে কর্মী হয়ে।

মানুষের রয়েছে বাহিরের স্টুট সত্তা এবং রূপ ও তার অঙ্গুগ স্বরূপ,
তৎপরি মানুষের আছে গভীরের প্রকল্প সম্ভাবনা। এ গভীরের
সম্ভাবনা যোগদৃষ্টিতে দেখেই যোগীরা যোগার্থীর আধার নিরূপণ
করেন, সে কোন্ পথের অধিকারী বুঝে তাকে তদনুযায়ী পথ ধরিয়ে
দেন। যিনি ঋণ যোগী, যার এই অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি আরো নাই
অথচ শিখ্য করার দিকে ঝোঁক আছে, তিনি স্বভাবতঃই ভুল করে
বসেন—হয়তো ভুলকে চোখে জ্ঞানের পথে, যে আত্মবিচারের পথে
চলেতে তদনুযায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে জয়েছে তাকে হয়তো নেন হঠাৎসের
মূল প্রক্রিয়ার mechanical শিক্ষার ঠেলে, যে কোমল ভাবপ্রবণ
মানুষ এসেছে প্রেম-কল্পনা আদি হৃদয়বৃত্তি নিয়ে সেই ভূমিতে ফুটেছে,
অথবা বৈদ্যাত্তিক যোগী তাকে হয়তো টেনে নিয়ে চেনেন শুধু আত্মানন্দ
বিচারের দিকে—মানস অধঃগততার নীরস মরুদেশে। ফলে সেই সব
যোগার্থীর চাপা স্বরূপ সত্তার যোগ খোলে না, তার সহজ
পথটি বন্ধ হয়ে গিয়ে আসার নিষ্ফল তপস্যার দিন কেটে যায়।
যিনি যে পথের পথিক, যে সানারায় তাঁর আংশিক সফলতা এসেছে,
স্বভাবতঃই সেই পথের গুণের সেই যোগীর একটা মোহ ও
অনুরক্তি থাকেই। কাজেই আধার ও অধিকারী নির্দিষ্টতার তাঁর
ঝোঁক হয় প্রার্থী মাত্রকেই আপন অভ্রান্ত পথে টানবার। হুনিয়ায়
এই জ্ঞানবিলাসের গোলকধাড়া কত মানুষ যে এমনি ভাবে

পৃথক হইবে চলছে তার হিসাব নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভুল-ভ্রান্তিতে খুব বেশি আসে যায় না, কারণ, আসলে তো আমরা এই জগচ্চক্রেয় কর্তা নয়, আমাদের স্বপ্ন করে কাজ করছে পরম এক অজ্ঞাত স্বভাব; পরিণামে সে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি জটিল-বিচ্যুতিকও কাজে লাগিয়ে নেয়, অর্থাৎ খুব উঁচু পরমার্থ দৃষ্টি থেকে বলতে গেলে বলতে হয়—সেই করায় ভুল আবার সেই নেয় তা' শুধরে।

ভাল চক্ষুমান শিক্ষকের হাতে পড়লে যোগার্থীর সাধনা স্বতঃই অন্নায়াসে যায় খুলে, তার যোগ তাকে আপনি নেয় খুঁজে, আম গাছে আম ফলার মত সে উজ্জ্বল সমর্পিত আধারে আপনি যোগ ফলে—ক্রতপদক্ষেপে সে চলে অহুত্বিত থেকে নবতর অহুত্বিততে, নিতাই অনির্কচনীয় ও প্রত্যক্ষ বস্তু পেয়ে পেয়ে। ব্যবহারিক জীবনে মানস শিক্ষার যেমন ছাত্রের চাই উত্তম শিক্ষকের সাহায্য, যোগপথেও তেমনি অতি প্রয়োজনীয় হয়ে আসেন গুরু। যত দিন সাধক নিজের একটা ক্রব চন্দ্র ও গতি না পায়, একটা সম্বন্ধ-গঠিত অহুকুল ভিত্তির উপর সাধনাকে ঝোটারার কৌশল না আয়ত্ত করে, তত দিন তাকে চলতে হয় গুরুর নির্দেশে। এটিই সাধারণ নিয়ম, অসাধারণ আধারে এ নিয়মেয় ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব নয়।

প্রকৃত সাধক হচ্ছে সেই, যার আধারে—মনে প্রাণে ও দেহে আছে যোগের অহুকুল উপাদান ও প্রেরণা, বৈরাগ্য ও মুমুক্শু যার প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত, এইরূপ আধারেই সারবান করিত ভূমিতে বীজ পড়ার মত যোগ-বীজ পড়তে না পড়তে গজিয়ে ওঠে—সাধন খুলে যায়; ক্ষেত্রের স্বভাবজ উর্ধ্বরতা শক্তির তারতম্যের অহুসারে এই সাধন-খোলার হয় কালবিলম্ব। প্রকৃত গুরু হচ্ছেন সেই যোগী বা সাধক যার ঘটে আছে ষাট তপোবল ও যোগশক্তি এবং সাধনার্থীর আধারে তা' সঞ্চার করে দেবার সামর্থ্য (power of radiation)। সূসারে কিন্তু গুরুগিরির ব্যবসায়ই বেশি, সত্যকার শক্তিমান গুরু কম। স্থলে চাকরী দিয়ে বেত হাতে বসিয়ে দিলেই যেমন শিক্ষক হয় না—তার ঘটে চাই প্রকৃত বিজ্ঞা ও জ্ঞান এবং ছাত্রের মধ্যে তা' সঞ্চার করে দেবার কৌশল ও নিপুণতা, তেমনই উত্তম গুরু তিনিই যিনি যোগায়িত্তে দীপ্ত-আধার, ও যিনি যোগায়ি শিষ্যে সঞ্চারিত করবার শক্তি রাখেন, স্বভাবতঃই এক প্রকার যোগশক্তি বিকিরণ করবার সামর্থ্য সহজাত বৃত্তিকপে তাঁর আছে।

অনেক যোগী আছেন যারা স্বভাবতঃই আত্মকেন্দ্রী, জগতে তাঁরা প্রধানতঃ আপনি ফুটতেই এসেছেন, তাই তাঁরা নিজেই self-contained হয়ে সাধনা করেই চলেন; সে আধার থেকে যোগশক্তি আধারান্তরে সহজে চলে না, তার সত্যায় ও আধারে সে তপোবল হয়ে থাকে কূটস্থ (static) ও অন্তর্মুখী। কোন কোন সাধক কিন্তু গোড়া থেকে নিজের অপূর্ণ অবস্থায়ই গুরুর আসনে স্বতঃই উঠে বসে; সে জগ্নেছে শিক্ষক বা গুরু হয়ে, চালক বা নেতা হয়ে—ঠিক যেমনটি এই ব্যবহারিক কন্ধ্যবস্ত্র জগতেও ছোট-বড় নেতাদের মধ্যে দেখা যায়। অপূর্ণ অবস্থায় সে জন্ম-গুরু অপূর্ণকেই আংশিক সাধনা নিতে পারে, তারই অহুত্বিতগুলির কিছু কিছু প্রার্থীর মখে জগে ওঠে।

যোগপথে পরমার্থ ক্ষেত্রে সাধকদের লক্ষ্যও সকলের এক নয়; কাহারও লক্ষ্য নিজেরই উন্নতি ও মুক্তি, কাহারও লক্ষ্য বিশেষ কোন সিদ্ধি ও উচ্চ ভূমিলাভ, কাহারও লক্ষ্য ভগবদর্শন, আবার কাহারও

বা-লকা পরমার্থ পথে লোক-কল্যাণ—জগতের উন্নতি ও রূপান্তর। যারা নিজের উৎকর্ষ ও মোক্ষ নিয়েই যোগরত, তাঁদের আত্মকেন্দ্রী ও অন্তর্মুখী আধারের যোগশক্তি স্বভাবতঃই নিজের মন প্রাণের ও স্বকীয় গূঢ় স্বভাবের পরিধির মাঝেই আবদ্ধ। বিভিন্ন যোগী বা সাধকদের মুক্তির বা সিদ্ধির রূপও সকলের এক নয়; কেউ বা পরা শক্তির মাঝে নিমগ্ন থাকতে ভালবাসেন, কেউ বা প্রেমানন্দে বিভোর, কেউ বা দ্বন্দ্বময় সৃষ্টিকে এড়িয়ে নেতি নেতির পথে অব্যক্ত বা তুরীয়ে আত্মলোপ সাধনকেই পরম পুরুষার্থ ভাবেন এবং তাই লাভ করেন। এই প্রকার রুচি ও প্রেরণার বিভিন্নতা তাঁদের সত্তার স্বার্থেই নিহিত আছে; খুব উচ্চ ভূমিতে উঠে ব্যাপক অর্থও দৃষ্টিতে সকল সিদ্ধির সামঞ্জস্য সকলে করে উঠতে পারেন না এবং পারলেও স্ব স্ব স্বভাবের চানে স্বার্থের পথেই চলে যান। মূল পরাশক্তির সঙ্গে যারা নিত্য-যোগে যুক্ত হয়ে সহজ স্থিতি লাভ করেছেন, তাঁরা এত সমদৃষ্টি যে কোন সঙ্গীর্ণ গণ্ডিতে বিচরণ করেন না। নির্বাককে চরম লক্ষ্য বলে যিনি সিদ্ধ হলেন, জগৎ-প্রপঞ্চকে যিনি অনিত্য দুঃখময় বলে স্থির করলেন, সেই মহাপ্রাণ ইহবিমুখ পরম বৈরাগী বৃন্দদেবও সিদ্ধিলাভের পর মৈত্রী করুণার বশে লোককল্যাণে রত হয়েছিলেন। ঐশ্বর্যবাদের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য্য মুক্তি বলে দুনিয়াকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েও সেই মায়ার মধ্যে সত্যার্থ স্থাপনের জন্তু প্রাণ প্রয়াস করেছিলেন। মায়ার পুতুলের পক্ষে মায়াকে বা জগচ্ছক্তিকে অতিক্রম করার চেষ্টা নিজের ছায়া ডিভানোর মত হাতকর ব্যাপার হয়ে পড়ায়। তবু মহাপ্রাণ মানুষ লোককল্যাণ না করে পারেন না, এ হচ্ছে তাঁদের স্বভাবার্থ।

হুঁ-চার জন দীপ্ত শক্তিশ্বর আধার ছাড়া সকল সাধকেরই পক্ষে গোড়ায় চালক দরকার হয়। যোগসাধনার পথ—স্থূল জগৎ থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে কারণের মাঝে চলার পথটি নিত্যন্ত নির্বিক্রম নয়, শাস্ত্রে বলছে—

“কুরন্ত ধারা নিশিতা দুরন্তয়া।

দুর্গম্পথস্তং কবয়া বদন্তি।”

তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের অগ্রভাগের উপর চলার মত দুর্গম এই পথ;—সে জ্যোতির পথে সূক্ষ্ম অতীজ্ঞান জ্ঞানের পথে, অথও তত্ত্বের ভূমিতে অজ্ঞান-অনভ্যন্ত পথিককে হাত ধরে চালাবার—হাত ধরে নিয়ে যাবার মানুষ চাই। সত্য অগ্নি, পরম তেজ, দুর্বার তার শক্তি, সে পরম বস্তু যেমন সারবান শুদ্ধ আধারকে দীপ্ত করে—জ্ঞান করে, তেমনি অসতর্ক অন্তর্দৃষ্টি চক্ষু আধারকে কিছু দ্বন্দ্ব করে, চূর্ণ করে দিতে পারে। অগভীর জলের মাছ গভীর জলে বাড়ে না, নীচের স্থূল বায়ু অধিবাসী উচ্চের সূক্ষ্ম বায়ুস্তরে ধাস নিতে পারে না; জলের সে গভীরতায় মহাপ্রান্তের সে তরল বায়ুও লে স্বচ্ছন্দে বাস করার অভ্যাস তাকে শর্নে: শর্নে: আয়ত্ত করতে হয়। এই জন্তু যোগ সাধনা করতে গিয়ে অনেকে পাগল হয়ে যায়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কেহ কেহ বা যোগশক্তির স্পর্শের প্রতিক্রিয়া-জনিত বর্জিত ভোগাশক্তির বশে উদ্বার্গগামী হয়ে যায়। মানব-প্রকৃতির আবরণ বধন খুলতে থাকে, উচ্চের উন্মুল ভূমি সব বধন উন্মুক্ত হতে থাকে, তখন তার সত্তা অনাবৃত হয়ে যায়—অধা-উচ্চ উভয় দিকে। যোগীকে নিভূতে যোগাসনে যে কাম-ক্লেষ-মোহ-বেগ ধারণ করতে হয় সাধারণ সংসারকে তাঁর শতাংশের একাংশও করতে হয় না। যোগপথের

অর্থাৎ কতকটা পরিমাণে বর্করতা এবং গ্রাম্যতা হস্তরসের সম্পূর্ণতা সাধনের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। প্রিতিলি সাহেবের এই অল্পমান অনেকাংশে সত্য। বাসরঘরে শ্রালিকার হস্তে কর্ণধরন, তদ্রাগত গুরু মহাশয়ের শিখা কর্তন, নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকায় নশ প্রদান, চেয়ারে বসিতে দিয়া উপবেশনকারীর অঙ্গান্তে চেয়ার অপসারণ প্রভৃতি সুপ্রচলিত কৌতুক প্রচেষ্টা শাস্ত্ররসাম্পন্ন বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। ইহাদের মধ্যে আঘাত আছে বলিয়াই কৌতুক।

কৌতুকহাস্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :
“কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজউদ্দৌলা দুই জনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নশ পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়—উভয়ে ঠাট্টিতে আরম্ভ করিত, তখন সিরাজউদ্দৌলা আমোদ অদ্ভুত করিতেন।” (২)

কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে, তাহা এক রকম বুঝা গেল। কিন্তু কৌতুকের সহিত যে অসংগতির অবিচ্ছেদ্য বোগ সে অসংগতি কোথায়? তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইতেছে।

“ইহার মধ্যে অসংগতি কোথায়? নাকে নশ দিলে তো ঠাট্টা আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্যের অসংগতি। বাহাদের নাকে নশ দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা ঠাট্টা, কারণ, ঠাট্টিলেই তাহাদের দাড়িতে অকমাং টান পড়িবে। কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে ঠাট্টিতেই হইতেছে।

“এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি, কথার সহিত কার্যের অসংগতি, এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে।” (৩)

কৌতুকের মধ্যে যে আঘাত আছে তাহার মূল কারণটাই হইল নিয়মভঙ্গ। “নিয়মভঙ্গ যে একটা পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিষটা নিত্য নৈমিত্তিক সহজ নিয়মসংগত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক দিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যিক। সেই পীড়ক এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।” (৪)

এই নিয়মভঙ্গ এবং তজ্জনিত পীড়া এবং তজ্জাত উত্তেজনা ইহাদিগকেও স্থূল সূক্ষ্ম, অমার্জিত, সুমার্জিত, ইত্যর, তর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীকেও নানা স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বৈরক্তিক পরিহাসই বিবর্তনবিধি অনুসরণ করিয়া সাহিত্যিক পরিহাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। আদিম মানবের সহিত আধুনিক মানবের যে পার্থক্য, আদিকালের রসিকতার সহিত আধুনিক যুগের রসিকতার সেইরূপ প্রভেদ। তবে অজ্ঞকালীন মানব-সমাজও যেমন আদিমকালীন মনোভাবের পরিচয় একেবারে হুল ভয়, হস্তরসেরও তেমনই।

নিয়মভঙ্গ বা অসংগতি কৌতুকের উপকরণ বটে, কিন্তু নিয়মভঙ্গ কি কি উপায়ে হয়? এ প্রশ্নের উত্তর যদি দিতেই হয় তো এক কথায় দেওয়াই ভাল, যেহেতু, অনেক কথায় তাহা দেওয়া অসম্ভব।

- (২) কৌতুকহাস্যের মাত্রা, পদ্ধতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৩)
(৪)

আর সে এক কথা এই যে, নিয়ম ভাঙ্গিলেই নিয়মভঙ্গ হয়। বস্তুতঃ, ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজনও নাই। আমোদের নৈনশিন জীবনে নিয়মভঙ্গের অভাব নাই। বর: নিয়মটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইয়া পড়ায়।

যাহার কণ্ঠে স্বর নাই, সে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, যে হৃদয় মিলাইতে অক্ষম, সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে নিজেকে বিকৃত-যন্ত্রিক, সে অজ্ঞকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতেছে, খোসামোদ-প্রিয় বলিয়া যে রামের নামে নিন্দা রটায়, সেই আবার রামের চিত্রকণ-কমলে পুষ্পক উৎসর্গ করিয়া ধস্ত হইতেছে। বাহা হওয়া উচিত তাহাই নিয়ম। কিন্তু যখন উচিতের স্থলে অসুচিততা ঘটিলে তখনই হয় নিয়মভঙ্গ। নিয়মভঙ্গের কি অভাব আছে?

রামপ্রসাদ গাহিলেন—

আর কাজ কি আমার কাশী।

ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।

ভক্ত সাধকের মুখে ভক্তির বাণী। শুনিয়া মন মুগ্ধ হয়। কথার মধ্যে কারাগরি নাই। অলঙ্কারের আড়ম্বর নাই। কিন্তু হৃদয়ের যে আবেগ—অস্তরের যে অকৃত্রিম উচ্ছাসটুকু বাহির হইয়া পড়িতেছে তাহা ভক্ত পাঠকের বা শ্রোতার অন্তঃকরণ স্পর্শ না করিয়া পারে না। কিন্তু এ সুরের অল্পকরণে আছু গোসাই যখন গান ধরিলেন,—
পোসাদে তোবে যেতেই হবে কাশী।

ওরে তথা গিয়ে দেখবি যে তোর মেসো আর মাসী।

অমনি আমাদের হস্ত সংবরণ করা হুঃসাধ্য হইল। একটা মহৎ ভাবের মাথায় যেন কোন দৃষ্ট ছেলে সশব্দে ভূঁইপটকা কাটাইয়া বসিল।

রামপ্রসাদ গাহিলেন :

এই সংসার ঘোঁকার টাটি।

ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটি।

আছু গোসাই উত্তর করিলেন :

এই সংসার রসের কুটি।

ওরে খাই দাই আর মজা লুটি।

যার যেমন মন, তার তেমন মন কর রে পরিপাটি।

ওহে সেন, অজ্ঞজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।

ওরে, শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্রামা মায়ের চরণ ছুটি।

ওরে, ভাই বন্ধু দারা স্ত্রুত শিড়ি পেতে দেখ দুধের বাটি।

জনক রাজা ঋষি ছিল কিছুতে ছিল না ক্রটি।

সে যে এদিক গুদিক দুদিক রেখে খেতে পেত দুধের বাটি।

মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ার বেড়ি কাটি।

তবে অভঙ্গ জেন শ্রামের পদ শ্রামা মায়ের চরণ ছুটি।

এই গানের মধ্যে অতিরিক্ত আর একটি চরণ কোথাও কোথাও পাওয়া যায় :

যদি ঘোঁকাই জান তবে কেন তিনবার কেঁচেছ হুঁটি।

পূজ না হওয়ায় রামপ্রসাদ না কি তিন বার বিবাহ করিয়া ছিলেন—তাই এই ব্যঙ্গোক্তি।

রামপ্রসাদ গাহিলেন :

মুক্ত কর, মা মায়াজালে।

অমনি আছু গোসাই ধরিলেন :

বন্ধ কর মা খাপলা জালে ।

যাতে চুনে পুঁটি এড়াবে না মজা মারব ঝোলে ঝোলে ।

ইউরোপীয় আনুষ্ঠানিকরণ হাশুরসের যে বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন, wit তাহার অন্ততম । Wit বড় বড় সহিতে পারে না । এক জন গুণী ব্যক্তি যদি খোঁড়াইয়া চলেন তো সে গুণটাকে নশ্রাৎ করিয়া দিয়া খজতা লইয়াই তাহাকে বিক্রয় করিবে । রাম-প্রসাদের গানে সংসারের অসারতা সম্পর্কীয় যে মহত্ত্বের অভিব্যক্তি আছে, তাহাই ঐ কথা কয়টিকে মনোজ্ঞতা দিয়াছে । সেই জ্ঞানই প্রসাদী গান শুনিয়া আমাদের অন্তর তৃপ্ত হয় । আজু গোসাঁই রামপ্রসাদী গানের মর্মতা বৃদ্ধিগ্রাও বৃদ্ধিলেন না । অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়কে নিতান্ত হালকা হাসির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ।

কিন্তু আজু গোসাঁই হাশুরস পরিবেশন করিতে গিয়াও মাঝে মাঝে বিপদে পড়িয়াছেন । ভাবুক তত্ত্বজ্ঞানী লোকের পক্ষে হাশুরসিকতা তেমন জন্মে না । গোসাঁইজীর রসিকতা ও তত্ত্বকথার সমিশ্রণে দানা বাধিয়া উঠিতে পার্য নাই ।

“শিবের ভাবে ভাব না কেন শ্যামা মায়ের চরণ ছুটি ।”

“মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভারত মায়ার বেড়ি কাটি ।”

“অভেন জেন শ্যামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ ছুটি ।”

প্রকৃতি পংক্তি হাশুরস ব্যাহত করিয়াছে । কারণ, হাশুরসে যে কৌতুক—যে অসংগতি থাকা আবশ্যক, এখানে তাহার কিছুই নাই । এখানে যেন সমস্ত হাশুর-পরিভাসের সমাপ্তি ঘটয়া গিয়াছে । উল্লিখিত চতুস্তম্ভ বাদ দিলে আজু গোসাঁইয়ের গানকে প্যারিডি আখ্যা দেওয়া বাইত । কারণ, প্যারিডি শুধু যে কবিতা বা গানের অমুকরণ মাত্র তাহা নয়, উহা হাশুরগাম্বন্ধক ও হওয়া চাই ।

আমরা আজু গোসাঁইয়ের গান হইতে দেখিলাম যে, অমুকরণ মাত্রই হাশুরস নাই । অমুকৃত্য এবং অমুকৃতির মধ্যে আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্যটা যদি নিতান্ত প্রকট হয় তবেই তাহা কৌতুকবাহ হইয়া উঠে ।

রবীন্দ্রনাথ ব্রজবলা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব পদাবলীর অমুকরণে ডায়সিহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাকে কেহ হাশুরসের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিবে না । কারণ, উভয় রচনায় ভাবের কিছু সাদা আছে । অন্ততঃ এতটা অসাদ্য নাই—যাহা সহজে ধরা যায় ।

অমুকরণ হাশুরস সৃষ্টির অন্ততম উপায় । বঙ্গসাহিত্যে সেই উপায়টির বিরূপ প্রয়োগ হইয়াছে তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য । অমুকরণের দ্বারা অসংগতি প্রদর্শনের সুবিধা আছে বলিয়াই হাশুরসের ক্ষেত্রে অমুকরণের বাহুল্য দেখা যায় । সে অমুকরণ নানাবিধ ।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস নূতন নয় ।

ভারতচন্দ্রের ভূজঙ্গ প্রয়াসে কহে ভারতী হে ।

সত্য দে সত্য দে সত্য দে সত্য দে ।

অথবা

বিজ্ঞ ভারত তোটক ছন্দ ভণে ।

স্মরণ করুন । ইহাতে বাংলার উচ্চারণ রীতি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া বিচিত্র বোধ হয় বটে, কিন্তু তবু ইহার হাশোদ্ভাবক করে না ।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পিজল বিহেল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উন্নয় হও ।

সন্ধ্যার তন্ত্রায় মুখতি ধরি আজ মন্ত্র মন্ত্র বচন রও ।

‘বন্ধের নিবেদন’ হইতে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলি পড়ুন । মন্দাকিনী ছন্দ বাংলা ভাষার পথে ক্রমশঃ দীর্ঘের বাহন পাইয়া দিয়া সহজ গতিতে চলিয়াছে । কৌতুকের কোন অবসর নাই । কিন্তু যদি কোন ছান্দসিক পণ্ডিত বাঙ্গালী ছাত্রকে সংস্কৃত ছন্দ শিখাইবার জন্য রচনা করেন :

ঢাকা কুমিল্লা বরিশালবাসী

লঙ্কামরীচেন্দ্র সপালিবাণী ।

জেলে গিয়া কষ্ট করে কয়েদী

গঙ্গাভীরে বাস করে তপস্বী ।

তাহা হইলে না হাসিবার উপায় নাই । সংস্কৃত কবিতায় যখন গুরুগম্ভীর কোনো একটা কিছু শুনিবার জন্য প্রত্যাশা করিতেছি, তখন অকস্মাৎ একটা একান্ত তুচ্ছ—একান্ত অসম্ভব কথা আনিয়া ফেলা হইল । শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ছন্দ রক্ষা করিতে গিয়া সংস্কৃত এবং বাংলা উভয় ভাষাই উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইল ।

সংস্কৃতে পঞ্চকল্পা স্তোত্র আছে :

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা ।

পঞ্চকল্পাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ।

অমুকরণ করা হইল :

হেয়ার কবিন পামরশচ কেরি মার্শমেনস্তথা ।

পঞ্চগোবাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ।

বিষয়-বস্তু হাশুরক না হইলেও ভঙ্গীতা হাশুরক ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বচিত সংস্কৃত ছন্দে কয়েকটি স্রমধূর হাশুরসাম্বন্ধ কবিতা আছে ।

মন্দাকিনী ছন্দে রচিত টঙ্কাদেবী-মাহাত্ম্য :

ইচ্ছা সমাক জগদরশনে কিন্তু পাথের নাস্তি ।

পায়ে শিল্পী মন উড়ু উড়ু কি দৈবের শাস্তি ।

টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে টাংখ-জ্বালা ।

বিজ্ঞাবুদ্ধি কিছুই কিছু না, খালি ভ্রমে ঘি ঢালা ।

শিখরিণী ছন্দে রচিত ইন্দ্র-বঙ্গের বিলাত-যাত্রায় কৌতুকটা একটু প্রবল :

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে ।

অরণ্যে যে জন্তু গৃহগ বিহগ-প্রাণ দৌড়ে ।

স্বদেশে কীদে সে গুরুজনবশে বিজ্ঞু হয় না ।

বিনা ছাট্টাটা কোঁটা ধুতি পিহরনে মান যায় না ।

পিতা-মাতা-ভ্রাতা নবশিশু অনাথা ছট করি' ।

বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কুত' বুট পরি' ।

সিগারে উদ্গারে মুহুরমুহু ধূম-লহরী ।

স্বপ্নস্থলে আপনে মলুকপতি মানে হরি হরি ।

বিহারে নীহারে বিবিজন সনে ছোটক করি ।

বিবাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি ।

ফিমসে ফী মেলে অন্নমন করে বাড়ি ফিরিতে ।

কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে ।

ফিরে এসে দেশে গলকলরবেশে হটহটে ।

গৃহে ঢোকে রোখে উলগ তম্ব দেখে বড় চটে ।

মহা আড়ী শাড়ী নিরখি চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে ।

ছটা লাখে ভাজে ছরকট করে আসন পিঁড়ে ।

ইংরেজী সাহিত্যে প্যারডি অসংখ্য এবং অনেক প্যারডি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যেও প্যারডি রচনার চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চদরের প্যারডি অধিক নাই, এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে।

সুপ্রচলিত ও সুবিখ্যাত কবিতারই প্যারডি হইয়া থাকে। প্যারডিতে সাধারণতঃ কবিতার উচ্চ কল্পনা থাকে না, থাকে wit-এর অল্পমধুর উত্তেজনা। মূল কবিতাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া তাহার উদ্ভূত বাহ্যিককে ধূলিশায়ী করাই প্যারডির ধর্ম। সেই জন্যই উহা হস্তরসের কারণ।

হস্তরস সাহিত্যের অঙ্গ নয়, উহা সাহিত্যের ব্যঙ্গন। কিন্তু ব্যঙ্গনটাই যখন ভোজনপাত্রের একমাত্র আধেয় হয়, তখন ভোজনপর্কটা ভোক্তার সম্পূর্ণ তৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। তবে এমন ঔদরিকও আছে, যে এক কলসী নলেন গুড় পাইলে পূর্বম তৃপ্তিভাবে তাহাই গলাধঃকরণ করে। সাহিত্য সমাজে এইরূপ ঔদরিকের দৃষ্টান্ত বিরল নয় বলিয়া ভাঁড়ের ভাঁড়ামিও রসিকতা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 'ডি প্রোকুস' নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন :

"ইংলণ্ডের হস্তরসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র 'পাক' এই কবিতাটিকে বঙ্গপ করিয়া 'De-Rotundis' নামক একটি পত্র প্রকাশিত হয়। মূলটিকে কবিতা এবং অনুকৃতিকে পত্র বলা হইয়াছে।) আমরা এক্ষণে বঙ্গপ কোনো মতেই অনুমোদন করি না। একপ ভাব প্রবন্ধের ভাব। কোন একটি বিখ্যাত মহান্ ভাবে কবিতাকে বঙ্গপ করা তাহার আমোদের মনে করেন। তাহার কেহ কেহ লেন যে, কোনো কবির সম্ভ্রান্ত পূজনীয় কবিতাকে অঙ্গহীন করিয়া ৭ চঃ মাথাইয়া ভাঁড় সাজাইয়া, রাস্তার দাঁড় করাইয়া দশ জন লস লঘুহৃদয় পথিকের ভূই পাটি দাঁত বাহির করাইলে সে কবির ক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

আমাদের জাতীয় ভাব একপ নহে। যদি এক জন বুদ্ধ পূজনীয় ক্রিকে অপদস্থ করিবার জন্য সভামধ্যে কেহ তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত খাণ্ডিল বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া মুখভঙ্গী করিতে থাকে তবে তাহা দেখিয়া রসিক পুরুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে, তাহাদের বাণী-নাশিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।"

হস্তরসের উপাদান মাত্রই দুঃখমূলক। তাহাতে অনেক সময়ই ঠাট্টা দেখা যায়। কবি নিজেই তাহা দেখাইয়াছেন।

যদি কেহ কোন মান্য ব্যক্তির অনুকরণে বিকৃত মুখভঙ্গী করে, তাহা হইলেও কৌতুকের কারণ ঘটে। যে নিষ্ঠুরতা এবং অসংগতি গীতুকের অপরিসীম অঙ্গ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়া-ন, সেই কৌতুক রসই যদি হস্তরসের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার বাণী-নাশিত বন্ধ করিবেন কেন?

পঞ্চভূতে কবি নিজেই হস্তরসের যে উদাহরণটি দিয়া কৌতুকের প্রতি বিচার করিয়াছেন, সেটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

"একটা গানে গুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিভ্রাজ্ঞে প্রাতঃকালে হঁকা ৪ রাধিকার কুটারে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়া-লন গুনিয়া শ্রোতামাত্রের হস্তের উল্লেখ করিয়াছিল।"

হঁকা হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা নৃশ্বরও নয় এবং আনন্দজনকও ; তবু তাহা আমাদের হাসি উল্লেখ করে। কেন করে, সে

আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু উল্লেখ যে করে তাহা তো অবশ্যই স্বীকার্য।

এই প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন :

"কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রই ছেলামি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।...এইরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে।"

মাধুর্যের স্বভাব জিনিষটা এমনই ঐশ্বর্যচাষী যে, সে বিজ্ঞের নিষেধ, প্রবীণের নির্দেশ, শাস্ত্রের অনুশাসন এ সব সকল সময় মানিয়া চলে না। এমন কি, বিধির বিধানকেই মধ্যে মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া বসে। কৌতুকে হাসিয়া উঠা মাধুর্যের স্বভাব, এবং কৌতুক করাও মাধুর্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ক্ষেত্রবিশেষে কৌতুক-প্রচেষ্টা এক তাহা দেখিয়া হাস্য করা স্বরচিতসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

বস্তুতঃ একই আঘাত কাহারও পক্ষে অঙ্গ, আবার কাহারও পক্ষে অধিক পীড়াদায়ক। তাই একই ব্যাপার এক জনের কাছে ক্রৌড়া হইলেও অপরের কাছে দুঃখের কারণ। কৌতুক বহুটা কতক পরিমাণে আপেক্ষিক। যে উত্তেজনা কৌতুকের ক্ষয়দাতা, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা নির্দিষ্ট আছে।

"এই সীমা ঈশ্বং অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কাঁছনের মাঝখানে কোনো রসিকতা-বায়ুগ্রস্ত ছোকরা ঠাণ্ডা শ্রীকৃষ্ণের ঐ ত্র্যম্বক-ধূম-পিপাস্ততার গান বাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না। কারণ, আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে, তৎক্ষণাৎ তাহা উজ্জতমুষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিঃখে প্রবল প্রতিঘাতস্বরূপে ধাবিত হইত।"(৫)

ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যে সভায় এক জন বুদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তির হৃদয়ানঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিলে সকল সভাসদই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবেন, এমন সভায় কোনো রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা মুগ্ধভঙ্গী করিতে সাহস পাইবে না। পাইলেও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

প্যারডি জিনিষটাও একটা সুমার্জিতকৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র সাহিত্যিক-মণ্ডলীর জন্ম রচিত হয় না। তাহা সর্বসাধারণের পড়ে সর্বসাধারণের জন্ম তাহা রচিত হয়। অমার্জিত এবং অনতিমার্জিত কৃষ্টি খোরাক জোগাইয়া তাহা অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। মূল কবিতার যদি সত্যই কিছু বিশেষ্য থাকে তাহা হইলে তাহা নিজগুণেই ব্যঙ্গ-বঙ্গপ উপেক্ষা করিয়া অপ্রতিহত থাকিবে।

ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, প্যারডি মাত্রই বিজ্ঞপাত্মক নহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতেছি। এটি একটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার প্যারডি। মূল ছড়াটি হইল :

"জাহ, এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ, এ তো বড়ো রঙ্গ।

চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গে।

কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।

তাহার অধিক কালো কল্লো তোমার মাথার বেশ।

(৫) পঞ্চভূতে-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস ।
 তাহার অধিক ধলো কল্পে, তোমার হাতের শঙ্খ ।
 জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 জবা রাঙা করবী রাঙা রাঙা কুহুম ফুল ।
 তাহার অধিক রাঙা কল্পে, তোমার মাথার সিঁদুর ।
 জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 নিম তিতো, নিম্বুলে তিতো, তিতো মাকাল ফল ।
 তাহার অধিক তিতো কল্পে, বোন সতিনের ঘর ।
 জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি ।
 তাহার অধিক হিম কল্পে, তোমার বুকের ছাতি ।”

রবীন্দ্রনাথের প্যারিডি এইরূপ :

“এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 বরকি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি ।
 তাহার অধিক মিঠে কল্পে, তোমার হাতের চাপড়ি ।
 এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এতো বড়ো রঙ্গ ।
 চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 কীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি ।
 তাহার অধিক সাদা তোমার পট ভাষার দাবড়ি ।
 এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 উচ্ছ তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুত্ত ।
 তাহার অধিক তিতো হাহা বিনি ভাষায় উক্ত ।
 এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা ভূতের তলা ।
 তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা ।
 এ তো বড়ো রঙ্গ জাহ্ন, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
 চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।
 মিথ্যে ডেলকি, ভূতের ঝাঁচি, মিথ্যে কাচের পান্না ।
 তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি স্নেহের কান্না ।” (৬)

যাহা নিজেই হান্তকর তাহার অমুকরণের দ্বারা হাসির উল্লেখ হয় না । অন্ততঃ হান্তরসের পক্ষে তাহা অমুকরণীয় নহে । প্যারিডির ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায় । যে সকল রচনা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করে, প্যারিডি রচনায় পক্ষে তাহাদেরই উপযোগিতা বেশী । কিন্তু হালকা জিনিষও যে প্যারিডি উল্লেখ করিতে পারে, উল্লিখিত কবিতাটি তাহার একটি সুন্দর নিদর্শন ।

তবে ব্যঙ্গ-বিক্রপটাই সাধারণতঃ প্যারিডির উপজীব্য । রবীন্দ্রনাথের ‘ছই পাখি’ কবিতাটি মনে করুন :

বাঁচার পাখি ছিল সোনার বাঁচাটিতে
 বনের পাখি ছিল বনে ।
 একদা কি করিয়া মিলন হল দৌড়ে
 কী ছিল বিধাতার মনে । ইত্যাদি
 বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের প্যারিডি :
 পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই
 পথে যে ভগ্নানক কাদা ;
 বাড়ির লোক বলে ঘরেতে বসে থাকা
 কেমন আরামটি দাদা ।
 পথের লোক বলে উজ্জ্বল মরি মরি
 গরমে গেল প্রাণ ;
 বাড়ির লোক বলে আঁহা হা কি আরাম
 টান বে টানাপাখা টান ।
 পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই,
 পথ যে ফুরায় না হরি ;
 বাড়ির লোক বলে ঘুম তো ভেঙে গেল
 দিন যে যায় না কি করি ।

অথবা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান—“কেন যামিনী না বেতে জাগালে না নাথ”—এর বিজ্ঞেন্দ্রলালকৃত প্যারিডি :

কেন যামিনী না বেতে জাগালে না,
 বেলা হল মরি লাজে—
 আলু-খালু এই কবরী আবার এই আলু-খালু সাজে ।
 জেগেছে সবাই মোকানী পসারী,
 রাস্তায় লোক, আমি ফুলনারী,
 এখন কেমনে হাটখোলা দিয়ে চলিব পথের মাঝে ।

রবীন্দ্রনাথের “আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি”—গানের অমুকরণে বিজ্ঞেন্দ্রলাল লিখিলেন :

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
 তুমি liesue মাসিক বাসিও ।
 আমি নিশিদিন রেঁখে বসিয়ে আছি
 তুমি যখন হয় খেতে আসিও ।
 আমি সারা নিশি তব লাগিয়া
 রব চাটয়া মটর রাগিয়া,
 তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে
 গাঁত বের করে হাসিও ।

ব্রাহ্ম-সঙ্গীতও বিজ্ঞেন্দ্রলালের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই :

মনে কর শেষের সে দিন ডরংকর হাঁদ ।
 তুমি যৈবে চুপটি করে আর অস্তে করবে সিংহনাদ ।
 অস্তে মিঠাই মণ্ডা খাবে তুমি খেতে নাহি পাবে ;
 শমন এসে বলবে হেসে এখন কোথায় খাবে চাঁদ ।
 হুঁ দেবেই কোঁ ও এখন ভবে

ভূপতি চৌধুরী বি-এস-সি। নর্থ সাবার্বান স্কুলে অঙ্কর টাচার। বয়স ত্রিশ পার হয় নাই; এখনি মাথার সামনের সিকে টাক পড়িতেছে, গৌফগুলা কাঁপিয়া উঠিয়াছে, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি...রবিবার ছাড়া কামানোর ফুরশৎ মেলে না! বেশ-ভূষা নাই। চেহারা স্ত্রী হইলেও ওঁদান্তে-অবহেলার যেন কেমন এক-রকম!

বিবাহ হয় নাই। বিবাহের অবকাশ কোথায়? পাড়াগাঁয়ে বাস করিত; বাড়ীতে বিধবা মা আর বিধবা বোন। ম্যাট্রিকে ফলারশিপ পাইয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছিল...তার পর দু'-তিন পাশ করিয়াছে। পাশ করিয়া নর্থ সাবার্বানে মাষ্টারী করিতে চুকিয়াছে। মাহিনা বাট টাকা; তার উপর একটা টুইশনি আছে শ্যামপুকুরে রামময় বাবুর বাড়ী। সেখানে পায় ত্রিশ টাকা। এই নবকি টাকার উপর নির্ভর। চেষ্টা করিলে হয়তো আরো দু'-চারিটা টুইশনি মেলে...কেনী মাহিনার ব্যবস্থাও হয়তো হয় অল্প স্কুলে গেলে—কিন্তু সে-চেষ্টা করিবে, সময় কৈ? থাকে কল্প-লিয়াটোলার গলিতে রায়-মশায়ের মেশে। এ মেশের সঙ্গে পরিচয় সেই কলেজে পড়ার সময় হইতে!

সেদিন সোমবার। দোপার পাট খুলিয়া কাচা কোট-ধুতি বাহির করিয়া পরিতে গিয়া দেখে, কাপড়ের মাঝখানটা খোঁচায় কঁাদানো—কোটের ডান হাতের নীচের দিকটা মসী-খরা ছোপ! বিরক্ত হইল। কোট আর ধুতি হাতে রায়-মশায়ের কাছে আসিয়া হাজির হইল। রায় মশায় তখন চাকরের সঙ্গে মাছের দর লইয়া রসাতল-কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে! মাছের জন্ত বরাদ্দ দেড়টি করিয়া টাকা। চাকর বিশ্বনাথ আজ মাছে সাত সিকা খরচ করিয়া আসিয়াছে। রায় মশায় বকিতেছে, এ ভাবে খরচ বাড়াইলে তাকে এখনকার পাততাড়ি গুটাইতে হইবে! বিশ্বনাথ বলিতেছে—মাছের দর কি রকম চড়া! এই যুদ্ধের বাজার! বাবু নিজে বাজারে গিয়া দখিয়া আস্তান না। তর্কের মুখে বিশ্বনাথ এমন কথাও বলিয়াছে, না পাষার, তাকে ছুটি দিলেই চুকিয়া যায়...মেশে সাত বাবুর খিঁমত গিয়া পায় দশটি করিয়া টাকা। কারখানায় গিয়া চুকিলে এখনি অস-কম ডেলি তিন টাকা মিলিবে...

কথা শুনিয়া রায় মশায় একেবারে থ! স্ত্রী-পুত্র গেলে ক্ষের বাজারে আবার স্ত্রী ও পুত্র মিলিবে, কিন্তু ভৃত্য গেলে পাগলের তো নৃত্য করিতে হইবে...মাথা খুঁড়িয়া রক্ত-গঙ্গা হইলেও ভৃত্য লিবে না!

বিবাহ বিরক্ত মন...তার উপর ভূপতি আসিয়া নালিশ নাইল—এ রকম করলে তো আর পারা যায় না। আপনি পাকে জরিমানা করুন...খুঁতখানা খোঁচা লাগিয়ে কঁাসিয়ে এনেছে, খেছেন? বলিয়া ভাঁজ খুলিয়া রায় মশায়ের সামনে মেলিয়া দিল...তার পর রোষে ক্ষোভে অভিমানে বিজড়িত কণ্ঠে বলিল—খানা ধুতির এখন কি দাম, জানেন তো! আর-বারেও একটা টর হাতা কঁাসিয়ে এনেছিল...

রায় মশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না। সে বলিল—পুরোনো হ।

ভূপতি বলিল—পুরোনো হলেও আস্ত ছিল তো! তার পর, এই টের হাতা দেখেছেন? বলিয়া হাতের মকেখরা দাগ দেখাইল।

রায় মশায় বলিল—বদলে আপনি রাগ করবেন, কিন্তু মাষ্টার

মশাই, বোর্ডের খড়ির অঙ্ক আপনি ব্যাগে না মুছে যদি জামার হাতা দিয়ে মোছেন, তাহলে লোহাতেও ছাতা ধরে মশাই, এ তো স্থতির কোট!

কথাটা সত্য! কোটের হাতায় বোর্ড মোছা জার কেমন মজাগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে!

কথা বলিয়া রায় মশায় কোলা চশমাখানাকে নাকের উপরে তুলিয়া হিসাবের খাতা খুলিল। নিকুপায় বুকিয়া ভূপতি বিদায় লইয়া আসিল।

- বাড়ী হইতে মা চিঠি লিখিয়াছেন, এই সংক্রান্তিতে তিনি আর দিমি...হুজনে বাইবেন প্রয়াগে তাঁর করিতে! স্ত্রিবিধা হইয়াছে গ্রামের চক্রবর্তীরা সপরিবারে প্রয়াগে চলিয়াছে, এমন ভালো সঙ্গী আর কখনো ভাগ্যে মিলিবে না...তাই ভূপতি যেন মনি-অর্ডার করিয়া অবিলম্বে তাঁরই ব্যয়-ভূষণের জন্ত মাকে পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইয়া দেয়। বিধবা মায়ের তাঁর-পুণ্যজন্মের দায় সন্তান হইয়া যদি গ্রহণ না করিল তো ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেভিস-ব্যাঙ্কের খাতা খুলিয়া ভূপতি দেখে, ব্যালাঙ্ক টু ক্রেডিট একশো বারোটি টাকা। তাহা হইতে পঞ্চাশ টাকা তাঁরই জন্ত তুলিয়া দিলে...

কিন্তু উপায় নাই! মা টাকা চাহিয়াছেন। স্কুলের পথে শ্যামবাজার পাষ্টে অফিস হইতে একখানা উইথ-ড্রয়াল ফর্ম লইয়া সেখানার কীক্ ভরাত করিয়া টাকা তুলিল।

ঘড়িতে বাজিল এগারোটা। সন্ধান! সাড়ে এগারোটার তার ক্লাশ নাই! মনি-অর্ডার করিতে গেলে এখন ঐ কিউয়ে লাইন করিয়া দাঁড়ানো...যার নাম, কাজ চুকিতে বেলা সেই দু'টা! ...মনি-অর্ডারের একখানা ফর্ম চাহিয়া লইয়া ভূপতি স্কুলে আসিল।

দেশবন্ধু পার্কের ও-পাশে স্কুল।...

ক্লাশ নাইনে এ-আওনারে আজ এ্যালজেক্স! ক্লাশে চুকিয়াই কণ্ঠে 'সাইলেন্স'-হাঁক! তার পর বোর্ডের সামনে গিয়া খড়ি হাতে অঙ্ক কঁাদা—ফ্যাক্টরাইজ...

পিছনে গানের কলি ভাসিয়া উঠিল, কেন রে তুই ফুটলি বনে

বিজ্ঞান বনে, ও বনের ফুল!

শ্রিং টিপিলে কলের পুতুল যেমন ঘাড় ফিরায়ে, তেমনি ক্ষিপ্ত বেগে ভূপতি ঘাড় ফিরাইল। ঘাড় ফিরিতেই চোখ পড়িল বেঞ্চ উপবিষ্ট শ্যামলের উপর। শ্যামল গান গাহিতেছে।

ভূপতি ডাকিল—শ্যামল...

বলিল,—শ্রার...

—ষ্টাণ্ড আপ...

শ্যামল দাঁড়াইল।

ভূপতি কহিল—ক্লাশে গান গাইছ।

—সঙ্গীত...বিজ্ঞা! সাধনা করছি, শ্রার। মিউজিক-কম্পিটিশ সাই

এবারে নাম দিচ্ছে।

—না! ক্লাশে বসে গান গাইবে না!...

শ্যামল বলিল—অঙ্ক আমার মাথায় আসে না!

জোর করে আপনি আমার মাথায় অঙ্ক বুঁজে দেবেন? ...প্রোমোশন।

মুখের উপর এমন করিয়া কথা কয় পিউপিল! ডিসিল্লিন থাকিবে কেন?

ভূপতি কহিল—আমি যেমন বুঝিয়ে দেবো, তোমাবো তেমনি বোঝাবার চেষ্টা করা চাই।

শ্যামল কহিল—জোর করে জ্ঞান হয় না, তার! কালেক সিনেমায় শুনে এলুম খুব খাটি কথা—হীরাইন চম্পা বলছিল—গান শেখা বেলো, প্রেম করা বেলো, জোর করে বা গাটা মেঝে ও হয় না, হাতে পারে না।

ক্লান্তকর ছেলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভূপতির মুখ-চোখ রাগে অপমানে কাঁড়িকাঁড় লাগিল। ভূপতি জোর গলায় বলিল—সাইলেন্স!

ছেলেবা চুপ। ভূপতি চাছিল শ্যামলের দিকে, বলিল—তোমার নামে আমি ছেডমাস্টার-মশাইকে বিপোর্ট করবো, ইউ আর ব্যাড... ভেরী ব্যাড!

—ককন বিপোর্ট। আমি এসাইন ছেড দেবো তার, মিউজিক ক্লাশে ঢুকবো। পাশ করে তো ভারী লাভ! আপনি যে এত মাই পেয়েছেন, স্কুল কটা-বাকাই বা পান! মিউজিক শিখে আমি সিনেমায় লাইনে যাবো। মিউজিকাল-ডাইরেক্টর হবো। জানেন না তো রাইটান বডাল, পঞ্চম মল্লিক...এবা কি জিউজ ট্যাক নাহিনা পায়!

ভূপতি রাগিয়া উঠিল—তুমি স্বরে ডাকিল—শ্যামল...

শাস্ত্র স্বরে শ্যামল বলিল—ক্লাশ খেতে যাব করে বেয়েন? ...তা কেন, আমি নিজে খেতেই যাচ্ছি।

এ কথা বলিয়া বেশ নিরীশ্বর ভাবেই বই-খাতা হাতে লইয়া ক্লাশ হইয়া সে বাড়ির হইয়া গেল। ঘাইবার সময় পারিল,—

তুই চাপা নোস, গোলপা নোস,

নোসু বে বকুল!

ভূপতির সর্বত্র কাঁপিতে লাগিল। হুই চোখের সামনে যেন আত্মনের গোলা ঘরিতেছে!

বেলা চারিটার স্থলেব দুটি। দুটির পর ভূপতির ডিউটি, সিনেব মাহিনা-কালেক্সনটুকু মিলাইয়া গথিয়া থলিতে ভরিয়া সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা। সে ব্যাপারে আশ ঘটী সময় লাগে। তার পর সাড়ে চারিটার স্থল বন্ধ করিয়া সে আসে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট চিত্রার সামনে একটা হোটেল। সেখানে বসিয়া এক পেয়াল চা, দুটা ডিমের ওমলেট, আর দু-পিসু টোট কটি খাইয়া দেহ-বন্ধার ব্যবস্থা করে; তার পর শ্যামলকুব স্ট্রীটের শামরয় বাবুর গৃহে টুইশনি সাঁপাটো হইতে মাতটা পছন্দ।

মৌলি আসিয়া হোটেল লেখে, ভীষণ ভিড়। কিশোর-লপ্সারী ভিড় একটু বেশী। সব কাঁটি অসনট পূর্ণ...কোণের দিকে কটা টেবিল শুধু খালি। ভূপতি গিয়া সেই টেবিলের সামনে বসিল। ৪ আসিয়া নিত্যাকার কটিন-মাকি আনিয়া দিল চায়েব পেয়াল, ১ পুটে আর টোট...

হুই ভূপতি পেয়াল মুখে দিল...ওসিককার এক বেঞ্চে কিশোর-কণ্ঠে কহিতেল—

। কেন বে তুই ফুটল বনে

ভূপতি চমকিয়া উঠিল। চোখ তুলিয়া গ্রাহকের পানে চাছিল। জানিয়াছিল, সেই শ্যামলই বুঝি...কিছু চাইয়া যেন, শ্যামল নয়। শ্যামলের ঘরে বসে অনেক বড়...নিশ্চয় কলেজে পড়ে।

ভূপতি চায়েব পেয়ালার মন পিল।

হুইং তার সামনে আসিয়া বসিল...ঐ টেবিলট এক সুরেকা কিশোরী। সঙ্গে সঙ্গে চায়েব আমনন। তরুণী বলিল—তা আর জানো কেবু থাকে যদি তো ও'খান থেকে।

ভূপতির মাথাব মধ্যে বস্তু হুইং করিয়া উঠিল...মেয়ে কাতকে সে অসম্ভব বকম লক্ষ্য করে...বিশেষ এই বয়সের মেয়েদের...ভূপতির মনে হয়, কঠিন বোমের ব্যাশিশের চেয়েও মারাত্মক। লক্ষ্যের ক কাঠ হইয়া বহিল। ওমলেট টোট...এব বুঝিয়া গেল। ওপাল কিছু কিছু খাম জমিবে লাগিল।

বহ চলিয়া গেল, কিশোরী বলিল। মুহূর্ত্তের পানে দাঁড়—

কেন বে তুই ফুটল বনে

নিজনে বনে বে, ও বনের ফুল।

ভূপতি অবাক! বেশদিকে হুইং এই এক-গান আর পলক বসিয়াছে কেন! ক্লাশে সেই ক্রমল...এখানে চুপিসময়ে ও গান...তার পর এই মেয়েটিও...

ভূপতির কি হইল, সে বলিতে পারিল না...উইয়া কানাইক বয়সে ডাকিয়া পছন্দ দিয়া চলিয়া ঘাইতেছিল, হুইং ও কিশোরী আসিয়া সামনে ঠাড়াইল। দুই হাসিয়া কহিল—আপনার ঘর...

ভূপতি ঠাড়াইল...যেন পুতুল। হুইংয়ের বিশেষতা টুই তরুণীর উপর নিবদ্ধ। ইলেক্ট্রিক তারে ভাসে যেনে শব্দ লগে, মাঝা মনে তেমনি শব্দ...চোখের পাতা কাঁপিতে কাঁপিতে টুই চোখের তারার উপরে পৃথক মতো আবরণ ঢানিয়া দিল। অর্থাৎ তার টুই স্কু দুহিত হইল।

হাসিয়া তরুণী বলিল—আপনার বই কেলে বাড়িয়েন... এলেক্সেদ্রা!...

বয়স নয়। ভূপতি চোখ মেলিয়া চাছিল...তার পর তরুণী হাত হটাইত বই লইয়া কোনো মতে ছিটকাইয়া সে বাড়ির হইয়া আসিল।

পরের দিন সকালে লাল জুতার খড়ি মাখাইতেছে, হুইং বে ডাকিল—জার...

চোখ তুলিয়া ভূপতি দেখে, ক্লান্ত মাইনের সেই ছাত্র শ্যামল। শ্যামলের সঙ্গে লোহার বনিয়ারী জোয়ার একটি ভজলেক। ভজলোকের বেশ মোটা গৌক...মুখে সিগার...পায়ে গরুর পাখারি। বাহ মশারের জীর্ণ-কেশে এ-ছাত্রা একবারে মানার না!

জুতা বাধিয়া ভূপতি উঠিয়া ঠাড়াইল।

মোটা-গৌক ভজলোককে দেখাইয়া শ্যামল বলিল—আমার মেসোমশাই।

মুখে শুক রান হাসি...ভূপতি মেসোমশাইকে বন্ধকার করিল। মেসোমশাই বলিলেন—নিজের ঘরেই আপনাকে থিবক করত এসেছি। অর্থাৎ আমার প্রাইভেট টিউটর হই...আমারমশাইকেই। আমি এখানে বসি হয়ে এসেছি...কেনে কখনো খাটাইক কেন...

কষ্ট দিচ্ছে... মাছার মনে করে হোক ছেলটাকে মাটি কের বেড়া বসিস্! উনি কে...ই...বুঝলেন?
গাঠান-মশাই, মা... চাকরি! নিশ্চয় তাহা হইলে ডেপুটি কিছা হইলে আসিচ্ছ মা... কোনো অসুবিধা হইবে না। মাহিনা হাববেন ওর জন্ত।

কথাটার শেষে মা...সাতটা মকড়মি খা-খা করিতেছিল, 'আজ! তার মনে... বহিল...আর সে নিকরের পাশে মাঠার।' তাহা হইলে...

...চলানো মতো ছাড়া... হ তবে?

বিশ্বাস, নীজা... মাছার... আপনাব সুবিধা...

ভূপতি...সন্ধ্যার সময় বামময় বাবুর বাড়িতে পড়াই...
সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থাকতে হয়।

মেশোমশাই বলিলেন—বেশ, সাতটার পর আমার গুণানে আসবেন।...আমি বাসা নিছি দেশবন্ধু পার্কের ঠিক পূর্ব-পায়ে। সাড়ে সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত আমার গুণানে যদি ব্যবস্থা করেন, অসুবিধা হবে?

নয় মুড় কঠে ভূপতি বলিল—আজ্ঞে, না।

—বেশ! তাহলে আজ থেকেই...আমি ত্রিশ টাকা দেবো। আর ঐ সঙ্গে যদি মানে, আমার মধ্যে আই-এস-সি পড়ছে...তাকেও মাথামেটিকুটী একটা দেখিতে-শুনিয়ে দিতে পারেন তো আরো পানরো...মেট পয়তাল্লিশ! কি বলেন?

বুকের মধ্যে ছন্দর-মুদ্রা ভীষণ বেগে ঢুলিয়া উঠিল। পয়তাল্লিশ! ও, এ যে কলনাতীত! কিন্তু মেয়ে! আই-এস-সি-পড়া মেয়ে! যার নাম...বুকের সোপান চকিতে হইল স্থির ভূত্বিত। মুখে কথা ঢুলিল না...জিভটাকে কে যেন কঠোরের হইতে কিছা টানিয়া ধরিল!

তাকে মৌন দেখিয়া মেশোমশাই থুশী হইলেন।...মৌন! সম্বন্ধ-লক্ষণ...এ-জ্ঞান তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার সম্পর্ক সূত্র।

—তাহলে বেশ, আজ থেকেই...সন্তত নীজ। সাড়ে সাতটার আপনি আসবেন। এই আমার নাম আর ঠিকানা...

মেশোমশাই পকেট হইতে একখানা কাড় বাতির করিয়া ভূপতির হাতে দিলেন। বলিলেন—আপনার টাইম ভালুয়েবল্! সে-টাইম আর নষ্ট করবো না। তাহলে আসি, নমস্কার!

মেশোমশাই চলিয়া গেলেন। ভূপতির ঢোকের সামনে ছেলে-বেলায় পড়া ইংলিশ হিষ্টারি একখানা পাতা ভাসিয়া উঠিল...যেন ছুলিয়াস সিঙ্কার আসিয়াছিলেন এবং গেলেন ঠিক তাঁর মতো...ভিনি ভিডি ভিসি!

মেশোমশাহের নাম গজপতি রায়। সিনিয়র বি-সি-এস...কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটে বসিল হইয়া আসিয়াছেন। চাকরি লইয়া ইন্সক মফস্বলে কাটািয়াছেন, তাই কলিকাতার হাকিমী-চাল এখনো মজাগত হয় নাই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খবরাখবর রাখেন এবং নিজের প্রোমোশনের চিন্তাকেই সর্ব্বমুখ জ্ঞান না করিয়া তাদের কথাও চিন্তা করেন।...

সাড়ে সাতটার ছাত্র-ছাত্রীক ভূপতির হাতে সমর্পণ করিলেন; বলিলেন—ওদের ইকুইটি আর অফ সারফেসের জন্ত ইউনিভার্সিটির পলেন মিথিরা একটা জালো স্যাক কেনেন। অন্ধর অন্ধ ছিল আবার

হুশিয়ারা...শ্যামল আপনাকে এনে দেছে। ওদের দায় আপনার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিত!...

ছাত্রটির নাম তুলাল। এত বড় হরন্ত অজ্ঞমনস্ক ছেলে ভূপতি জীবনে দেখে নাই।

ছাত্র আজ আসে নাই। সকাল হইতে তার টেনশিল আওরাইয়া আছে...জরের মতো...টিচার-সিনামন খাইতেছে। তার আজ ব্যবস্থা হইয়াছে, বিশ্রাম...গ্র্যাবলিউট-রেট!

খটাবানেক খবর-বিস্তি করিয়াও তুলালকে একটি অঙ্ক কবানো পেল না। পাতার পাতার অঙ্ক লিখিয়া ভূপতি বত বৃকইয়া দেখে, সে চাহিয়া থাকে উলস নয়নে অঙ্ক দিকে। ভূপতির সাধনায় সে শেষে বলিয়া ফেলিল—আমার এ ভালো লাগছে না। কলকাতাকে সকলে বলে প্যারাডাইসল, ছাই! যেন একটা থাঁচ! দিনাজপুরে কি আরামেই ছিলুম, তার!

দিনাজপুরের শ্রবণের জীবন-ধারার বর্ণনায় সে মশগুল হইয়া উঠিল। ভূপতি হিমসিম খাইয়া গেল। তুলাল দাফ বলিয়া দিল—তু-দশ দিন আমাকে সহিয়ে নিতে দিন তার এখনকার বাতাস! তার পর শচাভনা!

ভূপতি ভাবিল, এখনকার বাতাস ধ্যতে না সহিলে এ-ছেলে কিছু করিবে না! অথচ...

পয়তাল্লিশটি টাকা। ভাবিল, টাই-টাই-টাই এগেন।

পরের দিন ছাত্রী আসিল...নীরজা। তাকে দেখিয়া ভূপতি চমকিয়া উঠিল। এ-দুখ যেন ঢেনা!

ছাত্রী বলিল—আপনি তার!...পরন্ত দিন হোটেল এ্যালজেরা ফেল চলে যাছিলেন। চিত্রার সামনে হোটেল!

ঠিক! এই মেয়েই বটে। গান গাহিতেছিল। বনের ফুলের গান। গায়ে কাঁটা দিল। এত বড় মেয়ের সঙ্গে জীবনে কথা বলে নাই...আর এখানে এই ছাত্রীকে পড়াইতে হইবে!

ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিল। মুখের মধ্যে কথাগুলো যেন সব তালগোল পাকাইয়া গেল—সে-জোট থুলিয়া একটা কথাও নিঃসারিত করিবার জো নাই!...

নীরজা বলিল—শামু বলছিল, আপনার মতো অঙ্ক আর কেউ জানে না। বলে, আপনি ভারী কড়া টাচার! জিওমেট্রি মতোই কড়া। কথার জবাব দিবে কি, মাথা সে তুলিতে পারিল না। মাথা আরো কুঁকিয়া যেন মাটিতে ঠুকিয়া যাইবে!

তুলাল বলিল—আমার আজ অঙ্ক মন লাগছে না, তার। সিনেমায় গিয়েছিলুম। গ্র্যাণ্ড ছবি...আঃ! দেখে এসে অবধি মনে হচ্ছে, ওরাই সাধক জন্মেছে...বন-জঙ্গল...গ্র্যাডুয়েটার...কি গ্র্যাণ্ড! আর আমরা এখানে...জিওমেট্রি, এ্যালজেরা, নয়, ঐ পাথস্ অফ পিসের মধ্যে মুখ শুঁজে পড়ে আছি!

নীরজা বলিল—বাবা তুলালকে পাশ করাবেনই, বলেছেন। লাঠি কাইনালে ম্যাথমেটিক্‌স ও কত মার্ক পেরেছিল জানেন? কিকটান...আউট অফ হান্ড্রেড!

খিচাইয়া তুলাল বলিল—ড্যাড ইট...বিলে তো তবু প্রোমোশন।

নীরজা বলিল—শুধু বাবার খাতিরে। বাবা সেখানকার সিনিয়র ডেপুটি...তাই।

হুলাল বলিল—প্রোমোশন না দিলেও আমার ভারী বয়ে যেতো। ...কে চায় ম্যাটিক পাশ করতে! হুঁজার দশ হাজার ছেলে ফী বছর ম্যাটিক পাশ করছে...তাদের বাইরেই আমি থাকতে চাই। গোয়ালে চুকে আমি গোরু হতে চাই না, মশাই।

নীরজা বলিল—ও কি বলে, জানেন শ্রাব? বলে, বাইরে গিয়ে এমন কিছু করবে, বার জন্ত দেশ-বিদেশে ওর কীর্তি রটে যাবে।...মা হেসে বলেন, চুরি-ডাকাতি করবি...না হয় জাল-জালিয়াতী!

হুলাল বাগিয়া নীরজার চুলের খুঁটি ধরিয়া এমন জোরে টান দিল যে তার মুখখানা টেবিলে ঠুকিয়া গেল। রাগে অপমানে নীরজার মুখে যেন লাল পদ্ম ফুটিল! সে বলিল—আবার আমার গায়ে হাত! বাবাকে বলে আজ যদি তোমায় বাড়ী থেকে না তাড়াই তো আমার নাম নীরু নয়।

—যা...বা...বা...বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। ছেলেকে তাড়ানো অমনি মুখের কথা নয়।...

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নীরজা হুম-দাম করিয়া চলিয়া গেল। হুলাল একখানা বই খুলিয়া বসিল।

ভূপতি আড়ষ্ট যেন কাঠ। মনে হইল, ইহাকে বলে, হাই লাইফ! বাপ রে! বাহির হইতে এই লাইফের সম্বন্ধে মনে-মনে কি ছবিই না রচনা করে।...

বাহিরে অভিযোগ-ভরা কণ্ঠ। নীরজার স্বর। ভূপতির যেন চমক ভাঙ্গিল। সে ঘাড় তুলিয়া চাহিল। হুলাল বই বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইল...নিমেষের জন্ত! তার পর পাশে বাথ-রুমের মধ্যে গিয়া চুকিল...এদিকে গজপতি বায়ের প্রবেশ। পিছুনে নীরজা।

গজপতি ঠাঁকিলেন—হুলাল...

হুলালের ছায়াও ঘরে নাই! ভূপতির উপর গজপতির হুঁচোখের দৃষ্টি। ভূপতির মনে চাক্ষুষ। ভূপতি বলিল—বাঁধ-রুমে গেছে।

—হুঁ...গজপতি গিয়া বাথ-রুমের দ্বার ঠেলিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নাই! বাথ-রুমের ওদিকে ছোট একটা দরজা...খোলা। বুঝিলেন, ঐ খোলা দ্বার-পথে সে সরিয়া পড়িয়াছে।

গজপতি চাহিলেন ভূপতির দিকে; কহিলেন—কি রকম ছাত্র...পরিচয় পাচ্ছেন। ইউ শ্রুত বী ভেরী ভেরী দ্বিষ্ট। দরকার মনে করলে উত্তম-মধ্যম দাওয়াই দেবেন।...কপোতাল পানিশমেন্ট।...বুঝলেন?

ভূপতি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

দু'মাস পরের কথা। হুলালকে বশে আনিতে ভূপতিকে যে চিন্তা করিতে হইয়াছে, সে-চিন্তার অর্ধেক সে জীবনে করে নাই...বি-এস-সি এগজামিনের জন্ত নয়...সংসারের জন্তও নয়।...চিন্তার পাখারে তলাইয়াও তল মিলে নাই। শেষে নীরজা দিয়াছিল যদি এবং সেই বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া...

সাফাই দিয়া কোনো মতে চাকরি বজায় রাখায়কের পানে চাহিল। বিবেক ত্রিশূলের খোঁচা মারে! কিন্তু উপায় হয় দেখে, শ্যামল নয়।

যে সহজ সরল বুদ্ধি লইয়া এত দিন চলিছে পড়ে!

বার-বার বলিতেছিল, এ চাকরি পোষাইবে।

বাথকে যদি বা বশ করিতে পারো, ৫-এ টেবিলেই এক স্ত্রবেশা হুলালকে পারিবে না।...চাকরি ছাড়ার এক্ষণী বলিল—চা আর বেশনায় টনটন করিয়া ওঠে। মাস ৫

এ-চাকর্য মায়ের কতখানি স্ত্রবিধা হইয়া উঠিল।...মেয়ে-জাতকে ভূপতির এগজামিনের ফী দিতে এই বয়সের মেয়েদের...ভূপতির খালাশ করিবার আশাও ছিল না-এ একমুণ্ড মারাত্মক! লক্ষ্যে সে কাঁদ কাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। তার উপর ছাত্রী গাঙ্গল। কপালে বিন্দু পাওয়া যায় না! কি মেধা! শিখিবার জন্ত কি আগ্রহ! হুঁ-এ ছেলেগুলার যদি এ মেধার, এ আগ্রহের সিকি থাকিত, তাহা হইলে এই হাতে সে দু'-তিন জন শ্রাব আন্তোষ তৈয়ারী করিয়া দিত। নীরজাকে পড়াইয়া যে আনন্দ পায়...সে-আনন্দের বিনিময়ে হুলালের দৌরাত্ম্য, ছল, কৌশল...বিবেককে ধরিয়া এ-সব সহানো কিছুই নয়।

বিবেকের প্রবেচনায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটয়া গিয়াছে। জামা-কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার দিকে ভূপতির নজর পড়িয়াছে। বিশেষ নীরজা যেদিন বলিল—আপনার ধোপা বুনি কাপড় দিতে খুব দেবী করে মাষ্টার-মশাই? সে-প্রশ্নে প্রোত্ম হইতে মনকে উপড়াইয়া চোখে প্রশ্ন ভরিয়া ভূপতি নীরজার দিকে চাহিয়াছিল। সে-দৃষ্টির উত্তরে নীরজা বলিয়াছিলেন—এত মহলা জামা পরেন, তাই বলিছলুম!

সেদিন হইতে ধোপার উপর নির্ভর ছাড়িয়া ভূপতি সানুসাইজ ডায়ারীর আশ্রয় লইয়াছে।...সিনেমা দেখিতে গিয়া যখন দেখে, নায়িকা গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া পুষ্প-কুঞ্জের অন্তরালে লুকাইতেছে আর নায়ক গানের বলি গাহিয়া তার সন্মানে ছুটিয়াছে...তখন ফ্যান্টর-সিমুলিফিকেশনের বেড়া ভাঙ্গিয়া তার মনও যেন কোন অজানা কুঞ্জ-কাননের বেড়ার কঁক খুঁজিয়া ছুটিতে চায়।...স্বপ্নে কত দিন বোর্ডে জিওমেট্রির ফিগার আঁকিতে গিয়া সেই ফিগারের মধ্যে নীরজার মুখ ফুটিতে দেখিয়াছে! রম্যবাসের মধ্যেও নীরজার মুখ! সেদিন একটা পোকানো কাঁতের মাজন কিনিতে গিয়া রকমারি পাটার্ণের বেলোয়ারি চুড়ি দেখিয়া তার মন বলিল, ঐ রেশমী শ্রুতার মতো যে-চুড়ি...কিনিয়া নীরজাকে দিলে কেমন হয়? তার স্তম্ভের হাত হুঁটি চমৎকার মানায়।...কিন্তু সে মাষ্টার...গরীব মাষ্টার...পয়তাল্লিশ টাকার ভূতা...তার এ-সাথ হয়তো স্পন্দার সামিল মনে হইবে। মন বলে, ছাত্রী...ছোট ভাইবোনের সমান। কিন্তু মনকে কে যেন থাবড়া মারিয়া বলে, তাই যদি তো হুলালের জন্ত কিছু উপহার কিনিবার কথা ভাবো না কেন, বাপু?

হুলাল ধানিকটা বশ হইয়াছে...তবু যখন বাঁকিয়া বসে, কার সাধ্য সিধা করে!...

সেদিন তার গৌ ভরস্কর রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। হুলালের আড়ালে

কষ্ট দিচ্ছে...আমবে অন্ধ কবছে না। তাতে মা বলেছে, ঠ্যাঙাতে বলিস্! উনি তো বলে দেছেন কর্পোরাল পানিশমেন্ট!...সত্যি মাঠার-মশাই, মা বলছিল আপনি যদি গুকে না সামলাতে পাবেন, তাহলে আসছে মাস থেকে দেখে-শুনে খুব এক জন ঠ্যাঙাড়ে মাঠার রাখবেন ওর জন্ত!

কথাটার শেষ দিকে...ভূপতির মনে হইল, নীরজার কণ্ঠ যেন আর্দ্র! তার মনেও সে-আর্দ্রতার স্পর্শ লাগিল। জ্বরদন্ত ঠ্যাঙাড়ে মাঠার! তাহা হইলে এখানকার সঙ্গে ভূপতির সম্পর্ক চুকিয়া যাইবে!...হুলালের মতো ছাত্রের জন্ত চিন্তা নাই! কিন্তু নীরজা? ভূপতির বিশ্বাস, নীরজা বেরকম মেয়ে, সে ঠিক কমপীট করিবে!...

ভূপতি ভাবিল, ঠ্যাঙাইতে দেও কি জানে না? কি-ঠ্যাঙান দিয়া ছিল ক্রাশে সেদিন দিলীপকে...ক্রাশে বসিয়া নাকে নশ গুঁজিয়াছিল বলিয়া! হুঁ...!

আজ সে পণ করিয়াছে, হুলালকে আর এতটুকু প্রশ্রয় নয়! হুলাল বাদরামি করিলে আজ ভূপতি এমন মূর্তি ধরিবে...

হুলালকে বলিল—খাতা আনোনি যে?

হুলাল বলিল—ভালো লাগছে না।

—ভালো লাগাতে হবে, হুলাল। তোমার বাবার কাছে আমি কি জবাব দেবো বলতে পারো? মাস গেলো তিনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন! বিচিত্র ভাবদ্বন্দ্বি-সহকারে হুলাল চাহিল তার পানে! কহিল—তার জন্ত হাজরে দিচ্ছেন তো! বাস!

নীরজা বলিল—কি হচ্ছে ও, হুলাল? মাঠার মশাইয়ের কথা শুনছো না? শূঁর অপমান করছো?

হুলাল বলিল—তোমার এত গায়ে লাগছে কেন? আমার খুশী! অপমান! মাঠার মশাই তোমাকে পড়াতে গেলেই খুশী! উনি চান তোমাকে নিয়ে মত্ত থাকতে! আমি যেন কিছু বুঝি না, না?

কি-রকম বিজ্ঞী কথা! ছি! ভূপতির দুই কাণের উগায় কে যেন বিছুটি মারিল! নীরজা ভদ্রার তুলিল,—বাদর ছেলে...কার সঙ্গে কি কথা কও, জানো না! ছোটলোক ইতর অভদ্র...

হুলাল বলিল—ছোটলোক কি রকম! আমি ও-সব খুব জানি, বুঝি। জানি, মাঠার মশাই ইজ ইন ডিপ লাভ উইথ ইউ! সেই নশ্টিতা ফিল্মে যেমন...সেখানে প্রাইভেট টিউটর উমাচরণ...

—রাষ্ট্রের পাজী...হুম্ করিয়া নীরজা হুলালের পিঠে মারিল প্রচণ্ড কিল! হুলালও অমনি চোখ পাকাইয়া বাঘের মতো নীরজার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! ভূপতির চোখের সামনে যেন সমুদ্রের সেই অলকোয়ায়েট ছবির দৃশ্য জাগিয়া উঠিল...কৌজের বেয়েনেট চার্জ!

ভূপতি রাগে জ্বলিয়া উঠিল। টানিয়া হুলালকে ছাড়াইতে গেল। কর্পোরাল পানিশমেন্ট!

কিন্তু হুলালের আশ্চর্য্য কৌশলে ভূপতির শাসনোক্ত হাত হুলালের কাণ টপকাইয়া নীরজার কাণ ধরিয়া ফেলিল...এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের চড়ও পড়িল নীরজার গালে! চড়ের বেগে নীরজা ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল দোকান নীচে...চকিতে দুখ নীল...গাল

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো যেন গায়ে-গায়ে ঝুকিয়া সশব্দে চূর, হইয় পৃথিবীর বুকে করিয়া পড়িতেছে!...চাঁৎকার-বলরবে ঘরের পর্দা ঠেলিয়া মা আসিয়া ঝাঁড়াইলেন ঘরের মধ্যে...মাথায় কাপড় টানিয়া...বলিলেন—কি হচ্ছে সব?

জোর গলায় হুলাল দিল জবাব। বলিল—দিদি ভয়ঙ্কর জ্বালান্ত করছিল মাঠার মশাইকে...তাই মাঠার মশাই ওর কাণ ধরে গাড়ে চড় বসিয়ে দেছেন।

মায়ের দুই চোখ বিষম-বিভীকায় বিস্ফারিত! মা বলিলেন—সত্যি?

কথাটা বলিয়া মা আগাইয়া আসিলেন। নীরজার মাথা ঘুরিতে ছিল...মা তার হাত ধরিয়া তাকে তুলিলেন। মেয়ের মূর্তি য দেখিলেন—হুলালের বাক্যে অশ্রুতায়ের হেতু পাইলেন না। এত-বড় মেয়ের গালে চড় মারিয়াছে...তার কাণ মলিয়া দিয়াছে...মাঠার! এমন অভদ্র...এতখানি তার স্পর্ধা! মা চাহিলেন ভূপতি দিকে...দু'চোখে তাঁর আকাশের বিদ্যুৎ! মা বলিলেন—এখনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে...আর পড়াতে হবে না। এ মাসের পুরো মাহিনা উনি এলে পাঠিয়ে দেবো!

ভূপতির মনে হইতেছিল, ছেলেবেলায় পড়া বন্ধিম বাবুর ঘেঁষে চৌধুরাবীর সেই পরিচ্ছেদের কথা...সেবীর বজরায় সাহেবের গাড়ে ব্রজেশ্বরের চড়...সঙ্গে সঙ্গে বড় ওঠা এবং বজরার মধ্যে সেই হুলস্থূল ব্যাপার! হরবল্লভ যেমন ভাবিয়াছিল দেবতাকে ডাকিয়া ফল নাই, তার ভবলীলা শেষ হইয়াছে, ভূপতিরও ঠিক সেই দশা!...নিশ্চয়ই কি করিয়া সে বাহির হইয়া পথে আসিল...যেন স্বপ্ন!

পরের দিন...সকাল। ঘরের জানলা খোলা...তস্তাপোতে গুম্ হইয়া ভূপতি বসিয়া আছে।

মেশের ভৃত্য পাঁচু আসিয়া একখানা চিঠি দিল।...চিঠি খুলিয়া উদাস নয়নে ভূপতি পড়িল। গজপতি বাবুর চিঠি। লিখিয়াছেন—

ভূপতি বাবু, কাল বাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তার জন্ত অপরাধ লইবেন না। আমার দ্বী সেক্স অত্যন্ত লজ্জিত এবং অক্লান্ত। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, আজ যথাসময়ে এ বাড়ীতে আসিবেন। আজ রাত্রে এইখানেই আহািরাদির ব্যবস্থা। তার উপর ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে খুব জরুরি পরামর্শ আছে। ইতি

বিনীত

ঐগজপতি বায়

মনের উপরকার জমাট মেঘের ভার...চিঠিতে কি ব্যতীত বহিল, কাঁদিয়া সাফ হইয়া গেল। এবং...

সন্ধ্যার সময় দোস্তলায় গজপতি বাবুর বসিবার ঘর। সেই ঘরে আছেন গজপতি বাবু, গজপতি বাবুর গৃহিণী অর্থাৎ হুলালের মা এবং ভূপতি।

হুলালের মা বলিলেন—বাড়ীর ছেলের মতোই আমার সে কথা ভুলে বেয়ো বাবা। ভাবো, আমি যেন তোমার মা। মায়ে তো অনেক সময় ভুল করেও বকে, গাল দেয়। তেমনি মনে করো, বাবা।...নীকর কাছে সব শুনলুম। হুলালের কথায় বিশ্বাস করে' তোমাকে

না। অতএব রাজাকে প্রত্যেক ধর্মাদিকরণে এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইত। সেই প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ হইতেন এবং তিনি অষ্ট তিন জন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিচারকার্য সাধন করিতেন। যে সভায় উপযুক্ত বেদজ্ঞ তিন জন ব্রাহ্মণ ও রাজার ব্রাহ্মণ-প্রতিনিধি বিচারকার্য নির্বাহ করিতেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা বলা হইত (২)। বিচার বিভাগে ব্রাহ্মণ এবং শাসন বিভাগে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়ই নিযুক্ত হইত।

মহু বলিয়াছেন, যে আদালতে বিচারকগণের সম্মুখে অধর্ম কর্তৃক ধর্ম এবং মিথ্যা কর্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবধাৰ্ণ বা অজ্ঞায় বিচার ফলে যে পাপ হয় তাহার চারি ভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী পায়, আর এক ভাগ মিথ্যা সাক্ষী পায়, সমুদয় সত্যসৎ এক ভাগ এবং রাজা এক ভাগ পাইয়া থাকেন (৩)। অনেকে অহুমান করেন, তখনকার ব্রাহ্মণদিগের পাপের ভর অধিক ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিচারক-পদে প্রতিলিপিত করিবার কথা মহু বলিয়া গিয়াছেন। এ অহুমান সত্য হইতে পারে। ক্ষত্রিয়গণ স্বভাবতঃ ক্রোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মহু বিচারকার্যে নিয়োগ করিবার বিধান করেন নাই। এ কালে সুসভা জাতির শাসনাধীন দেশে যেরূপ শাসন বিভাগের রাজপুরুষেরা বিচার-কার্যের ভার পাইয়া সময় সময় বিচারকার্যে পক্ষপাত করেন অথবা আসামীদিগকে অথবা কঠোর দণ্ড দিয়া থাকেন, প্রাচীন হিন্দু-দিগের আমলে তাহা হইত না। শাসকের হস্তে কোনরূপ বিচার-ভার ছিল না। ইহা ভিন্ন বিচারকগণ যদি পক্ষপাতপূর্বক কোন মামলার পক্ষবিশেষের প্রতি অবিচার করিতেন, তাহা হইলে সেই মামলার জায়ন্তঃ যে পক্ষের পরাজয় হওয়া উচিত তাহার যে দণ্ড হইত, প্রত্যেক বিচারক তাহার দ্বিগুণ দণ্ড পাইতেন (৪)। বলিষ্ঠের মতে বিচারকের অবিচারজনিত পাপ রাজ্যতেই বর্ধিত (৫)। হিন্দুদিগের আমলে রাজনৈতিক প্রভুতি কারণে আসামীর উপর বিধেববশতঃ কঠোর দণ্ড দান নিষিদ্ধ ছিল (৬)। ইহা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে জায়বিচার করিবার জন্য কিরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইত।

এখন জিজ্ঞাস্য, পূর্বকালে এ কালের মত উকিল-মোক্তার দ্বারা পক্ষগণ বিচারকার্য চালাইতে পারিতেন কি না? সে কালে ব্যবহার-দর্শক বা ব্যবহারদর্শী ছিল। কিন্তু ইহার এখনকার ব্যবহার-জীবদিগের মত পক্ষগণ কর্তৃক পারিশ্রমিক লইয়া মোহনমা চালাইতেন কি না সন্দেহ। অনেকের মতে তাঁহারা জুরী ছিলেন। সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। ব্যবহারদর্শীরা পক্ষগণের নিকট হইতে পারিশ্রমিক লাইতেন না। তাঁহারা আদালতেরই লোক ছিলেন। পক্ষগণই নিজ নিজ কথা বিচারকদিগের সমক্ষে বলিতেন,—প্রতিনিধির দ্বারা বলিতেন না।

প্রাচীন কালেও এ দেশে আপীল আদালত ছিল। নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত পক্ষপাতপূর্ণ হইয়াছে মনে করিলে পক্ষগণ উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পারিতেন। মহু বলিয়াছেন যে, অজ্ঞায় ভাবে

পরাজিত পক্ষ উচ্চ বিচারালয়ে আপীল করিতে পারিবেন। অজ্ঞায় বিচার করিয়া পক্ষবিশেষকে পরাজিত করা হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে রাজা সেই বিচারকদিগকে সহস্র পণ দণ্ড করিবেন (৭)। উচ্চ আদালতেও রাজাই তিন জন ধর্মী ব্রাহ্মণ লইয়া আপীলের বিচার করিতেন। আপীল ক্ষমু করিলেই সে কালে এ কালের জায় মামলা গ্রহণ করা হইত না। আপীলের কারণ আছে বৃদ্ধিতে পারিলে তবে আপীল গ্রাহ্য হইত, অজ্ঞা নহে (৮)। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, প্রাচীন কালে আইনের ঘটনাটি লইয়া বিচার-পূর্বক আপীল গৃহীত হইত না। তখন আইন সর্বল ছিল। আইনের অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রায় উঠিত না। অপরাধ হিসাবে দণ্ড অধিক হইয়াছে দর্শাইতে পারিলে আপীল গ্রাহ্য করা হইত। কারণ, বিশিষ্টপুঙ্খকে বহু দূর দণ্ড দিবার বিধান থাকিত, বিচারকের পক্ষে আসামীকে বা দোষী পক্ষকে তত দূর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা ছিল না। রামায়ণেও বলা হইয়াছে যে, প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করা রাজার কর্তব্য নহে (৯)। উত্তরাধিকার বলা হইয়াছে যে, অপরাধ অনুসারে দণ্ডদান করিলে প্রজা সুরক্ষিত হয় (১০)। রাজা অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব, দেশ, কাল, বয়স, বৃত্তি, বয়স এবং ধনাদি বিবেচনা করিয়া দণ্ড দিতেন (১১)। লব্ধ দণ্ড যে দেওয়া হইত না তাহা নহে। অনেক সময় শিকার দণ্ড অথবা বাগ্মন্য দণ্ড মাত্র দিয়া দোষী ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত (১২)। এখন তাহা হয় না। যে মহু অনেক অপরাধে অজ্ঞানদিগকে কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন, একেবারে কঠোর দণ্ড দিও না, প্রথমে অল্প দণ্ড দিবে, পরে অপেক্ষাকৃত অধিক দণ্ড দিবে, কিন্তু কিছুতেই যদি কোন অপরাধী অপরাধ করিতে নিরন্তর না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবে (১৩)। আধুনিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে বলেন যে, মহু অত্যন্ত কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া ঘোর নৃশংসতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহু সাধারণ ভাবে অবস্থা বিবেচনায় ক্ষমা করিবার কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে রাজা আপনাব হিতকামী—তিনি অর্থ প্রত্যাখ্যাসিগের, বালকদিগের, পীড়িত এবং বৃদ্ধদিগের নিন্দা কটুক্তি প্রভৃতি ক্ষমা করিবেন (১৪)। এখন যেমন রাজকার্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে একটু পান হইতে চূপ থসিলে রাজপুরুষেরা ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর দণ্ড দিয়া থাকেন, পুরাকালে রাজারা তাহা কদাচ করিতেন না। শুক্রনীতিসারে এবং কামন্দকীয় নীতিসারে উদাত্ত স্বরূপেই ঘোষিত হইয়াছে, যেন দণ্ডের অপপ্রয়োগ না হয়। উভয় গ্রন্থই অভ্যন্তর প্রাচীন। কামন্দকীয় নীতিসারে স্পষ্টই বিবৃত হইয়াছে যে, হিন্দু আমলে প্রাণান্তিক দণ্ড প্রায় প্রদত্ত হইত না। কামন্দকীয় নীতিসারে আরও বলা হইয়াছে—অতিশয় অপরাধ করিলেও আসামীকে প্রাণান্তিক দণ্ড দিবে না (১৫)। অজ্ঞ বলা হইয়াছে, দণ্ডব্যসনে রাজ্য ক্ষয় পায়। কাম এক কোশজনিত দোষই ব্যসন। যেস ইর্ঘ্যা এবং নির্ভরতা দ্বারা প্রযুক্ত দণ্ডই দণ্ডব্যসন। শাস্ত্রে গুরুদণ্ডের বিধান থাকিলেও উহা বহু ভিন্ন

(৭) মহু—১২৩৪ (৮) মহু—১২৩৩ (৯) রামায়ণ

(২) মহু—৮১—১১। বিষ্ণু—৩৫০—৫১

প্রয়োগ করা নিষেধ। অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োগ করিতে হইবে। এখনও তাহা হয়। মহাভারতও বলিয়াছেন যে, পনের অপবাদ শুনিয়া লোককে দণ্ড দিতে নাই। শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া তবে বন্দন এবং মুক্ত করিবে (১৬)।

এ কালে বিচারকগণ যেমন বিশেষ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও ভারতে সেইরূপ করিবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই মনে হয়। তবে সে পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যায় না। মমু বলিয়াছেন—রাজা ও বিচারক সম্যক-রূপে আচ্ছাদিত-দেহ হইয়া ধর্মাসনে বসিবেন। তিনি বিচারালয়ে আসিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবেন। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনের ধর্ম—সকলকে অভয়দান। ইহাতে তিনি জায় অনুসারে বিচার করিবেন, নিরপরাধকে দণ্ড দিবেন না, এই প্রতিজ্ঞাই স্থচিত হয়। ফলে ধর্মশাস্ত্রে যে সকল অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বন্দনও দিবার ব্যবস্থা আছে, সেই সকল অপরাধে বিচারকবর্গ সেই চরম দণ্ড দিতেন না। যে মমু অঙ্গাদিচ্ছেদ পূর্বক কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনিও তারত্বের বলিয়া দিয়াছেন যে, আসামীর অপরাধ যদি প্রথম হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে সেই অপরাধ জ্ঞাত তিরস্কার মাত্র করিবে, দ্বিতীয় বার করিলে দ্বিগুণ প্রদান করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তথাপি যদি সেই আসামী আবার সেই অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বর্গদণ্ড অর্থাৎ জরিমানা করিবে; কিন্তু যদি কিছুতেই তাহার স্বভাবের শোধন না হয়, তাহা হইলে শেষকালে তাহার অঙ্গচ্ছেদাদি কারাদণ্ড দিবে; আর বন্দনও স্বর্গদণ্ড অঙ্গাদিচ্ছেদ দণ্ড দ্বারাও যদি কাহারও অপরাধ কল্পিব্যস্ত প্রবৃত্তির সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ সর্বপ্রকার দণ্ডই দিবে (১৭)। মমু ভারতের আদি দণ্ডনীতি-প্রণেতা একথা সত্য, কিন্তু তিনি এখেলের দণ্ডনীতি-প্রণেতা ডেকোর জায় অপরাধী মাত্রকেই প্রাণান্তিক দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি অনেক স্থলে প্রথম অপরাধকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বেরও বলা হইয়াছে যে, সকল মাছুষের প্রথম অপরাধ ক্ষমা করা কর্তব্য (১৮)। অধিকন্তু, মমু বন্দনও অর্থে প্রাপদও নহে,—ঐচ্ছিক দণ্ড। নতুবা তিনি এমন কথা বলিতেন না—বন্দনও ঘাঘার সংশোধন হয় না, তাহাকে সর্ববিধ দণ্ডই

প্রদান করিবে। যে সকল দুর্য্যাপী পণ্ডিত বলেন যে, ভারতের আদি দণ্ডনীতি-প্রণেতা মমু ডেকোর জায় অতি নিষ্ঠুর আইন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ঐরূপ ধারণা আছে বলিয়া আমি এই কথাটি বিস্তৃত ভাবে বলিলাম।

প্রাচীন কালে আদালত-গৃহ স্বতন্ত্র ছিল কি না সন্দেহ। রাজার সভাগৃহের এক অংশে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠেই আদালত বসিত। ছোট ছোট অপরাধীদের বিচার করিতেন গল্পী-পঞ্চায়তবর্গ। কঠোর বা দুর্দান্ত অপরাধীর বিচার হইত রাজকীয় আদালতে। সুতরাং রাজকীয় আদালতে মামলা কম হইত। তাহা হইলেও রাজধানী জিন্ন রাজ্যের অজ্ঞাত স্থানে সরকারী আদালত থাকিত। রাজার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্রাহ্মণরা ঐ সকল আদালতের বিচারকার্য চালাইতেন। ঐ সকল বিচারপতির বিচার-বিভাগট ঘটিলে রাজাকে সে জন্ত পাপভাগী হইতে হইত।

প্রাচীন কালেও কুলাচার, স্থানীয় রীতি, জ্ঞানপদ ধর্ম, গুরুপরম্পরা-গত ধর্ম প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচারপতিরা অপরাধের বিচার করিতেন। সম্প্রদায়-বিশেষের বিশেষ কুলাচার বা সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা তাঁহারা কোন মতেই উপেক্ষা করিতেন না (১৯)। বর্তমান কালে যেমন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্বতন্ত্র, পুরাকালে হিন্দু আমলে তাহা ছিল না। একই আদালতে সর্বপ্রকার মামলার বিচার করা হইত। বাদী এবং ফরিয়াদীকে অগ্রে কোর্ট-ফি দিয়া উকিলের মারফতে মামলা রুজু করিতে হইত না। কাজেই উৎপীড়িত ব্যক্তিদের পক্ষে রাজস্বারে অভিসাগ করা অনেক সহজ ছিল। সকলেই অবোধ মামলা করিতে পারিত। জানিয়া শুনিয়া যে মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিত, তাহাকে শাস্তিগ্রহণ করিতে হইত। কাজেই মিথ্যা মামলা প্রায় উপস্থিত করা হইত না। তবে শেষকালে আদালতের খরচা বাবদ কোর্ট-ফি ও জরিমানার টাকা পক্ষগণ দিতে সমর্থ, ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহাদিগকে ঐ টাকার জামিন দিতে হইত (২০)। দুই পক্ষের যে পক্ষ মামলায় পরাজিত হইত, তাহাকে অর্থদণ্ড করিয়া সেই টাকা আদায় করা হইত। ফলে বর্তমান কালের ব্যবহার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু আমলে গরিব প্রজারা উৎপীড়িত হইলে অতি অল্পব্যয়ে মামলা করিতে পারিত।

(১৬) মহাভারত, শাস্তি, ৮৫১২৫ (১৭) মমু—৮।১২১-৩০

(১৮) মহাভারত—২৮।২৯

(১৯) মমু—৮।৪১-৪২

(২০) যাজ্ঞ—২।১০

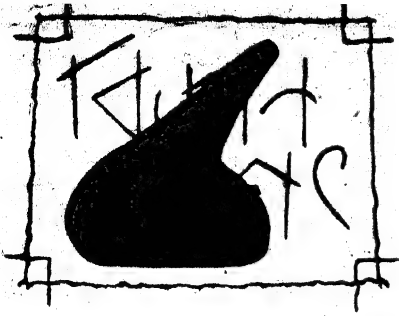
নতুন চোখ

শামসুদ্দীন

তোমরা মরিয়া গেছ ; প্রেত চলে শুধু
জীবন্ত কঙ্কাল সাথে ; তোমাদের গান
মুক আজি ; স্বর্ণ বজ মরুভূমি ধু ধু ;
শূণ্য বাঁধিছে বাসা—আখার আশান।

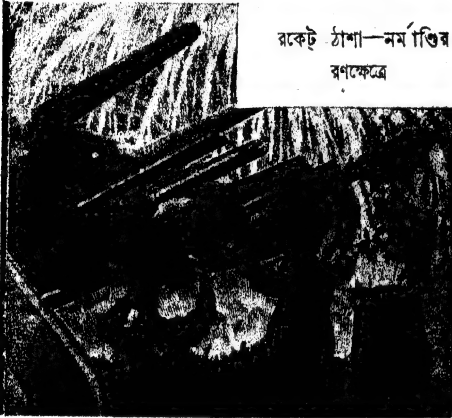
নদী সে ভুলিয়া গেছে সাগরের তান,
পাখীর কুজন নাই মাধবী-লতায়,
সকলের হাসি-অশ্রু—বত অভিমান

কুয়াশা বিদায় নেছে, মেঘ ভুলিয়াছে
বর্ষা-সুখের রাত, বোর অন্ধকার
তোমাদের পথ,—তবু সবে ছুটিয়াছে
আলোরোরে ধরি। হায়, দিন আগিবার—



রকেট-অঙ্গ

পাশ্চাত্য-আক্রমণে মিত্র-শক্তির রকেট একেবারে অসাধ্য সাধন করিয়াছে। নর্ম্যান্ডির উপকূলে রকেট-গ্লেন ঝাঁকে-ঝাঁকে গিয়া জাৰ্মানদের বেতার-বার্তার আন্তানাগুলি প্রথমে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়; তার ফলে জাৰ্মানগীর খবরাখবর রাখার সকল আশা



রকেট ঠাশা—নর্ম্যান্ডির
রণক্ষেত্রে

নিমূল হয়—তার পর তরক হয় রকেট-প্রোজেক্টরে মুহূর্তে গোলা-বর্ষণ। কাজই অতিক্রান্ত এ-আক্রমণে জাৰ্মানগীর পক্ষে পরাভব মানিয়া লওয়া



গ্যাপি-ক্রাক্টে রকেট ছোটে

হাড়া আর গতান্বয় ছিল না। প্রত্যেকখানি ব্রিটিশ ও মার্কিন লড়াই-গ্লেন পক্ষপটতলে চারখানি করিয়া রকেট লইয়া গিয়া জাৰ্মান-বাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই মিত্রশক্তির হাতে

ভাঙ্গলভাঙে কাটুশা-রকেটের সোশভে বাঁশরা আমাপাকে আর বসন্ত করিয়াছিল। প্রতি ক্ষেপে 'রকেটে' অসাধ্য গোলা বর্ষিত হয়—'তার'-'বাজি'তে যেমন অল্পস্র ফুল কাটে, তেমনি তাই এই এ-অল্পক্ষেপে অসাধ্য 'শেল' কাটে। রকেটের কামান হালকা অথচ ইহার শক্তি ১০৫ মিলি-মিটার শেলের তুল্য। লড়াই-গ্লেনের এক-একখানি পাখায় ছ'খানি করিয়া রকেট-নল আঁটিয়া অনাধাসে তাহা বহন করা এবং ছ'খানি পাখায়-আটা 'রকেট' একসঙ্গেই ছোড়া চলে। রকেটে শেল ছোটে প্রচণ্ড বেগে; ছুড়িবার সময় গ্লেনের গতিকে বৃদ্ধ বা মন্থন করিতে হয় না এবং তাহার লক্ষ্য হয় অব্যর্থ। গ্যাপি-এয়ার-ক্রাক্ট কামানেও রকেট আঁটিয়া বিপক্ষের বমার-বিশাশ-সাধনকার্য অনেকখানি সহজ ও সুনিশ্চিত হইয়াছে।

গাছের সেবা

লালনে বহু লইলে গোর যেমন পুষ্ট থাকিয়া বেশী দুধ দেয়, গাছকেও যদি তেমনি যত্ন করা হয় তো গাছ পুষ্ট দেখে অনেক-বেশী ফল-ফুল দেয়—এ সত্য সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। অন্তত দুর্বল মানুষকে সুস্থ ও বলশালী করিতে হইলে তার শরীরের কোথায় কি ক্রটি বুঝিয়া সে ক্রটি-মোচনের জন্য টনিকের ব্যবস্থা করিতে হয়; দুর্বল শীর্ষ গাছের দ্বাষ্টা বুঝিয়া



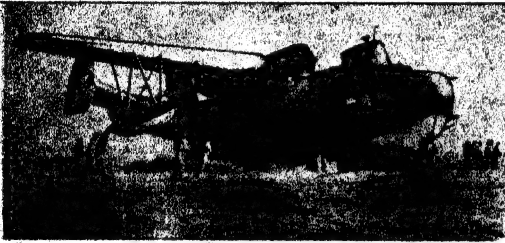
দ্বাষ্ট্যমুক্ত-ধারার গাছের আন

গাছকেও তেমনি টনিক দ্রাব্যকানি প্রয়োগ করিতে হয়। করিলে গাছ বাড়ে, গাছে ফল-ফুল হয় পর্যাপ্ত এবং সে ফল-ফুলের স্বাদ-গন্ধাদি হয় উৎকৃষ্ট। গাছের লালন-করে মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বহু রাসায়নিক চর্চ-দ্রাব্যকানি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সে সব দ্রাব্যকানি

চূর্ণ আসেট প্রভৃতি তাঁহাদের আবিষ্কারের ফল। চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয় গাছের গা কাটিয়া অথবা ইনজেকসন দিবার রীতিতে—দ্রাব্যাদি প্রয়োগ করিতে হয় স্প্রে-যোগে।

মকর-বিমান

পৌষ মাসে মকর-বাহন বাসের পরিচয় দিয়াছি; এবারে বলিতেছি মকর-বন্ধের বিমানের কথা। এ-যুদ্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কত অসম্ভবকেই না সম্ভব করিয়া তুলিলেন! এক-কালে মকর বালুকাবন্ধ হইতে বিমানের উড়িবার-নড়িবার সামর্থ্য ছিল না—সম্প্রতি ২৬ টন ওজনের একখানি লড়ায়ে প্লেন অচল হইয়া মকর বৃকে পড়িয়া গেলে বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে চালু করিবার জন্য অসাধারণ প্রয়াসে একাজে



মকর-বিমান

আশ্চর্যনিয়োগ করেন। তাঁদের সাধনা সফল হয়—বিমানের দু'পাশে ডবল-টায়ার চাকা সংযোজন। এই ডবল-টায়ার চাকার সৌলতে বিমানের পক্ষে বালুকাতে ওঠা-নামার আর একটুকু অগ্রবিধা ঘটিতেছে না!

বৈদ্যুতিক করাচ

বৃদ্ধের কাজে বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া তত্ত্বা সাহিব করিতে হয়। এ কাজ নিম্নেবে করা চাই একজনের জন্য তাই তৈয়ারী



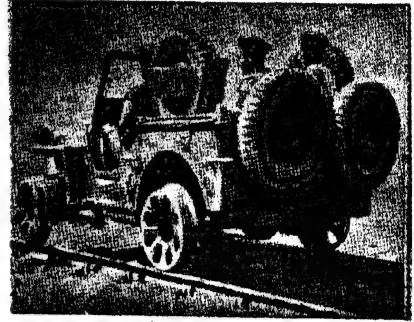
বৈদ্যুতিক করাচ

হইয়াছে বৈদ্যুতিক করাচ। ডেন-টাইপের করাতে দশ অশ্ব-শক্তি-বল্ক মোটর-এক্সিন সংলগ্ন করা হইয়াছে। গাছের গুঁড়ির উপর

গুঁড়িকে নিম্নেবে কাটিয়া দেয়। এক্সিন-সম্মত এ করাতেও ওজন এক মণ দশ দেয়। যোজের দলে এক-করাতেও রশদের সামিল হইয়াছে।

জীপের নব রূপ

'জীপ' আমাদের চোখে আজ আর নূতন নয়! কিন্তু এ জীপ আবার নূতন রূপে দেখা দিতেছে। জীপের 'বেশিকোপ্স'-মডেল তৈয়ারী হইয়াছে; তাহার সঙ্গে দু'শেট করিয়া অর্থাৎ প্রতি গাড়ীর জন্য আটখানি করিয়া চাকা। চারখানি চাকা মোটরের চাকার মত—



বেল-লাইনেও এ জীপ চলে

টায়ার-সম্বলিত; আর চারখানি চাকায় টায়ার নাই,—সেগুলি বেল-ওয়ে-ট্রেনের চাকার ছাঁদে বসিত। প্রয়োজন হইলে টায়ার-সম্বলিত চাকা খলিয়া গাড়ীর পিছনে ক্রাম্পে গুঁজিয়া দ্বিতীয় ছাঁদের চাকা আঁটিয়া জীপকে বেলোয়ে-লাইনের উপর দিয়া নির্বিবাদে চালানো যায়।

মাইন-চুর ট্যাঙ্ক

জাৰ্মান-মাইনকে সমুদ্রে চূর্ণ করিবার জন্য ব্রিটিশ সমর-বিভাগ 'ফ্রাইল-ট্যাঙ্ক' নামে এক জাতের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করিয়াছে। এ ট্যাঙ্কের



ট্যাঙ্কের আসল
রূপ

ফ্রাইল ট্যাঙ্ক
মাইন সন্ধান

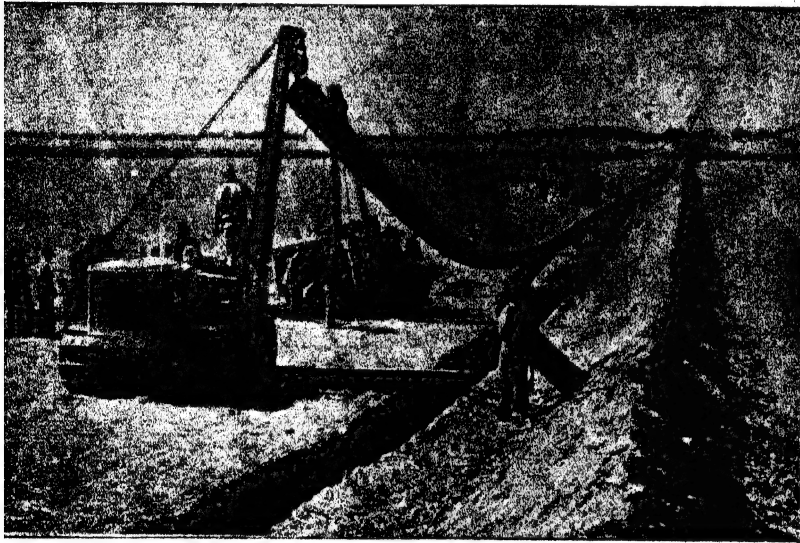


সামনের দিকে ইশ্পাতের একখানি চক্র সংলগ্ন আছে। সেই চক্রে কয়েক ফুট লম্বা একরাশ শিকল আঁটা। ট্যাঙ্ক চলিলে চক্রে-আঁটা ঐ শিকলগুলি বিবম বেগে ঘুরিতে থাকে; সে ঘোরায় মাটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলায় ধূণী রচিয়া তোলে। কাজেই পোতা মাইনের পক্ষে মাটার বৃকে আত্মসোপান করিয়া থাকা সম্ভব হয় না; শিকলের ধূণীবেগে 'মাইন' সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই ট্যাঙ্কের সাহায্যে উত্তর-আফ্রিকার পথে পোতা সমস্ত জাৰ্মান-মাইনের বিলাপ

পেট্রোলিয়াম

এই যে এত বড় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলিয়াছে, এ যুদ্ধে শক্তির উৎস কিন্তু তৈল—পেট্রোলিয়াম। আকাশে বিমান—তৈলের ডাব ঘটিলে ও-বিমানের পতন অনিবার্য। কৌজের সঙ্গে চলিয়াছে তাদে-কাতারে অত ট্যাক, ট্রাক,—ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র-ও-রসদবাহী রি—তৈলের অভাব ঘটিলে, ও-সব গাড়ী ছবির মত নিথর নিশ্পন্দ ক্রিয় ঝাঁড়াইয়া থাকিবে; তার উপর বেসামরিক নর-নারীর ন। পেট্রোলে টান পড়িলে তাঁদেরও দুর্গতির সীমা থাকিবে। ফ্যাক্টরি, মিলের কাজ হইবে বন্ধ; রেলপথে ট্রেন চলিবে না; লাসী ও কনীদের মোটরগাড়ী খেলনার মত পড়িয়া থাকিবে। জিকার এ যন্ত্রযুগে—যে-বস্ত্রে মানুষের প্রাণ, মানুষের শক্তি, সেই প্রাণ-শক্তি জোগাইতেছে তৈল, পেট্রোলিয়াম। সুতরাং পেট্রোলিয়াম-বিহনে চলমান বিশ্বজগৎ চকিতে স্তম্ভিত হইবে।

মানুষ এ তৈলের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছে ১৮৫১



পেট্রোলের পাইপ পাতা

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায়। তখন বাষ্পীয় এঞ্জিন, রীপার, লিফ্টের প্রভৃতির শৈশব। এঞ্জিনের চাকা চলিতে-চলিতে মিয়া বাইত ঘর্ষণবেগে; সে-চাকাকে মৃৎ মচল রাখিবার জন্ত লেপ-তৈলের (lubricating oil) সন্ধান মানুষ পায় নাই।

আজ পৃথিবী-ময় যে lubricating তৈলের ব্যবহার চলিয়াছে, র শতকরা ৫৭ ভাগ জোগাইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই তৈলের গবে জাখাগীর যুদ্ধ-যন্ত্রাদি বহু ক্ষেত্রে অকর্ষণ্য হইয়া জাখাগীকে হ্রীত করিতেছে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় তৈল-খনির সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ তর হাজার। এগুলি হইতে ১৩৫৪৪২৩০০০ পিপা-ভরতি crude oil মিলিয়াছিল। মার্কিনের বাহিরে রাশিয়া, ভেনেজুইলা, ইরান, ইরাক, কমানিয়া এবং মেক্সিকোতেও প্রচুর তৈল-খনি আছে। তবে

খরগীর গর্ভে এই যে তৈল—এ-তৈলের সন্ধান প্রাচীন যুগের মানুষও অল্পবল পাইয়াছিল। তখন যেটুকু তৈল মিলিত তৈল আলানি এবং ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত। জোরায়াদীর মন্দিরগুলিতে যে অনির্কাণ দীপ সেই কোন্ প্রাচীন কাল হইতে সমভাবে জলিয়া আসিতেছে, সে দীপ জ্বল সেখানকার বায়ুস্তরোৎপন্ন নৈসর্গিক বাষ্পের বলে। গলিত আসফাল্ট-ও-তৈলের মত জ্বলে। নেবুকাডনে-জারের যুগে বাবিলনের প্রাসাদ-নির্মাণে এই আসফাল্ট ব্যবহৃত হইয়াছিল পাথর ও বালি-চূণের সঙ্গে উপাদান-রূপে। যুক্তিকা-গর্ভ হইতে যে তৈল সহজে মিলিত, সে-তৈল প্রাচীন যুগে প্রলেপ-ঔষধাদি-রূপে ব্যবহৃত হইত, বলিয়াছি। আমেরিকায় সে-তৈলের নাম ছিল সেনেকা তৈল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ড্রেক সর্ব-প্রথম পেনসিলভানিয়ায় মাটা থুঁড়িয়া পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পান। তার পূর্বে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কেনুটাকি প্রদেশে এক ভ্রমলোক লবণ তৈয়ারী

করিবার উদ্দেশ্যে মাটা থুঁড়িতে গেলে তৈলাক্ত তরল পদার্থের স্রোত মাটা উপ-ছাইয়া চারি দিকে প্রবাহিত হয়; এবং কি করিয়া সে প্রবাহে অগ্নিশিখার স্পর্শ লাগে; লাগি বা মা ত্র দপ্প করিয়া প্রচণ্ড অগ্নি-ধারা চকিতে প্রসা-রিত প্রবাহে কাম্পা-লা নদী পর্যন্ত অগ্নি-ময় করিয়া তোলে।—সে আগুন বহু চেষ্টাও কেহ নিবাইতে পারে নাই। সে-আগুন দেখিয়া ভরে সকলে

অস্থির হইয়া বলিয়া ছিল, নরকের আগুন জ্বলাইয়াছে। সকলে ভগবানের কল্পনা প্রার্থনা করিতে ছাড়ে নাই।

ড্রেকের আবিষ্কারের পূর্বে কল্পনা হইতে কোন-কোন প্রদেশে তৈল নিষ্কাশন করা হইত। সে তৈলের দাম ছিল অত্যন্ত অধিক। তার পর পেট্রোলিয়ামের আবিষ্কার ঘটিলে তৈলের দাম শূন্য হয়। এত বেশী তৈল মিলিতে লাগিল যে ঔষধার্থে মানুষ কত ব্যবহার করিবে? তখন এ তৈল জ্বালানির কাজে লাগিত। ইক্সিরা ল্যাম্পে চালিয়া এ তৈল-বোগে সকলে আলো জ্বালিতে সুরু করিল। এমনি করিয়া পেট্রোলিয়ামের প্রসার বাড়িল।

এখন পেট্রোলিয়ামের কল্যাণে বাহুব নানা দিকে আরাম ও বিলাসিতা বাড়াইয়া জীবনকে কত দিক দিয়াই না পরের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

মিলিত, তাহা হইতে প্রথমে পাইতাম কেরোসিন তৈল; তার পর মিলিল গ্যাসোলিন বা পেট্রোল। প্রথম যুগে পেট্রোলে ছিল কবচ্য গুঁড়। সে গুঁড়কের ভক্ত মানুষ তাকে মাটা খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিতে পারিল। কিন্তু মোটর-এঞ্জিন সৃষ্টির সঙ্গে যখন গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল এবং গাড়ীর চাকার আঁটা হইল রবারের গায়ার, তখন মাটার বুক হইতে পেট্রোলিয়াম তুলিয়া সে পেট্রোল জরা হইল মোটর গাড়ীর এঞ্জিনে। পেট্রোলের জোরে এঞ্জিন সচল এবং পেট্রোলের জীবন ধন্য হইল। সেই সঙ্গে সার্থক হইল মানুষের মান-বাহনের উৎকর্ষ সাধনের সকল সাধনা।

কি করিয়া মাটার গর্ভ হইতে পেট্রোল নিষ্কাশিত হইল, সে কাহিনী বিশেষ উপভোগ্য।

পেট্রোলিয়াম লাভের জন্য মাটার বুক কুয়ার মত গভীর বন্ধ খুঁড়িতে হয়। কিন্তু মাটাতে যে বন্ধ রচনা করিবেন,—বুঝিবেন কি করিয়া যে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচে ঘোড়া-এ-রকে পেট্রোল মিলিবে কি না? তাহা ছাড়া কোন্‌খানটিতে বন্ধ রচিলেই বা পেট্রোল মিলিবে?

বিজ্ঞানের যুগে সর্বত্র আজ আর শিক খোঁচাইয়া তৈলের উৎস খুঁজিতে হয় না। এখন শিসমোগ্রাফ-যন্ত্র হইয়াছে। এ যন্ত্র সাহায্যে বন্ধ মধ্যে ডিনামাইট ফেলিয়া মাটা ফাটানো হয়। সঙ্গে থাকে রেডিয়ো-জেন। ডিনামাইটে বন্ধ বিবরের মাটা ফাটিলে তার কাঁপন রেকর্ড হয় ঐ যন্ত্রের-যন্ত্র। সেই রেকর্ড দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা নজর তৈয়ারী করেন—এবং নজর দেখা ধরিয়া নীচে যে পাথর বা লবণস্তূপ পাওয়া যায় সেইখানে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান অবশ্য ভাবে মিলিবে।

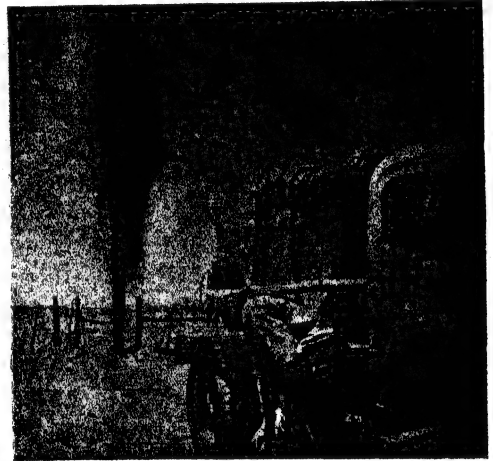
ধান্য পেট্রোল-নিষ্কাশন করেন, তাঁদের সঙ্গে থাকে ট্রাক, বোট এবং ‘পঙ্ক-বগি’। এই ‘পঙ্ক-বগি’ এক বিচিত্র বকমের গাড়ী। এ গাড়ী সাগর-জলে যেমন পাড়ি দিতে পারে, তেমনি আবার পঙ্ক-কর্ম কাটিয়াও পাড়ি দিতে সমর্থ। এ বগি-গাড়ীর চাকা দশ ফুট উঁচু—চাকায় খুব মোটা টায়ার। এ টায়ার প্রোপেলারের কাজ করে জলে এ গাড়ী সাঁতার কাটিয়া চলে। পেট্রোল-সন্ধানী আরো নানা জাতের যন্ত্র আছে—সেগুলির নাম টার্ণি ব্যালান্স, ম্যাগনিটোমিটার, গ্রাভিমিটার প্রভৃতি।

মাটার বুক কুয়ার বন্ধ রচিয়া নীচে হইতে পাথর-চূর্ণ তোলা হয়; সেই চূর্ণ পরীক্ষা করিয়া বুঝা যায়, মাটার নীচে পেট্রোলিয়াম-স্তর আছে কি না। বহু বিশেষজ্ঞের মত, ধর্মীয় নীচে বহু যুগ-সঞ্চিত গাছপালা এবং বিচিত্র প্রাণীর স্বেচ্ছা নাকি পেট্রোলিয়াম-স্তর হইয়া জমিয়া আছে—কাজেই ভূগর্ভস্থ মাটা বা পাথরের চূর্ণবিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাঁরা বলিয়া দিতে পারেন, কোথায় পেট্রোলিয়াম মিলিবে, কোথায় বা তাহা মিলিবে না।

এই সব বন্ধ বা কূপ হইতে পাম্প করিয়া পেট্রোল তোলা হয়। তুলিয়া টাকে ভরিয়া রাখিবার পালা। একমাত্র শেনশিলভানিয়ার কূপগুলি হইতে যে পরিমাণ পেট্রোল ওঠে, তাহা যদি এক বৎসর চালান না গিয়া সার-সার টাকে মজুত রাখা হয়, তাহা হইলে পেট্রোল-ভর্তি টাকগুলির জন্য ১৬০০০ মাইলব্যাপী জমির প্রয়োজন হইবে।

সাধারণতঃ পেট্রোল তোলা হয় ই-পাতের উঁচু ডেরিক-বন্ধ। এই ডেরিকেই বোটারি ড্রিল-যন্ত্র থাকে—যুঝিয়া যুঝিয়া মাটার বুক ভিত্তি বন্ধ রচনা করে। বন্ধ বহি খুব গভীর হয় তো ড্রিলের মাথার

পাইপের পর পাইপ আঁটা হইতে থাকে। অনেক সময় এ পাইপ হয় দৈর্ঘ্যে দু’মাইল। নীচে পেট্রোল মিলিবা মাত্র পাইপের মুখে তাহা উছলিয়া ওঠে। তখন পাম্প লাগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। মাটার নীচে পুঞ্জিত বাষ্পভারে গিয়া ডিলের আঘাত লাগিলে বিপদ ঘটে—সে আঘাতে মাটা সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়া যায়। এত জোরে ফাটে যে ড্রিল-ডেরিক সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার আশঙ্কা। এ জন্য ড্রিল-যন্ত্র নামাইবার সময় তার চাপের মাত্রা সবচেয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ১১০৮ ব্রট্টাকে মেক্সিকোয় এক খনির কাজে মাটা ফাটিয়া রীতিমত ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাষ্পোদ্গম হয় প্রচুর এবং কি করিয়া সে বাষ্পে আশ্রয় লাগে। তার ফলে ৫৮ দিন ধরিয়া দারুণ অগ্ন্যুৎপাতে আধ মাইল ব্যাপিয়া চারি দিক একেবারে ভয়ংকর হইয়া যায়। এ আশ্রয় এমন তীব্র তেজে জলিয়াছিল যে এগারো মাইল দূর হইতে তাহার লেলিহান শিখা দেখিয়া লোকজনের হৃৎকম্প ঘটয়াছিল। এ আশ্রয়



পেট্রোলের অবস্থান-পরীক্ষা

নিবানো হয় শ্রের সাহায্যে অজস্র বালুকাবর্ষণে। আশ্রয় নিবিলেও সে জায়গার এক মাইল খুঁড়িয়া crater-এর সৃষ্টি হইয়াছিল।

খনির সন্ধানে আশ্রয় ও ধূম বাতীত কর্মমোদগম লইয়াও মাঝে মাঝে বিভ্রাট ঘটে। কালিকোণিয়ায় একবার বিষম কর্ম-বিভ্রাট ঘটয়াছিল। সে সবচেয়ে বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুস্তাভ এগলাফ লিখিয়াছেন—

—এ খনি ড্রিল করিবার পূর্বে জানা গেল, খনির মধ্যে আছে ৬২০০০ পাউণ্ড ওজনের গ্লেন মাটা, ১১৬০০০ পাউণ্ড শুক মাটা, ৬৫০০ পাউণ্ড সিমেন্ট, ৬৩০০ পাউণ্ড অক্সিজেন-স্ট্রুপ, ১৮১ বস্তা কার্টের গুড়া, আর ২৩ গাঁট খড়। দশ দিনে ৩৬০০ ফুট খুঁড়িবার পর এই রিপোর্ট মেলে। তখন লক্ষ্য ভাবে কর্মমাদি সরাইয়া এ খনির তৈল উদ্ধার করিতে সময় লাগিয়াছিল প্রায় এক বৎসর।

এ পর্যন্ত বক্ত খনি খোঁড়া হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গভীর কালিকোণিয়ার ওয়ানকোর কনটিনেন্টাল কোম্পানির খনি।

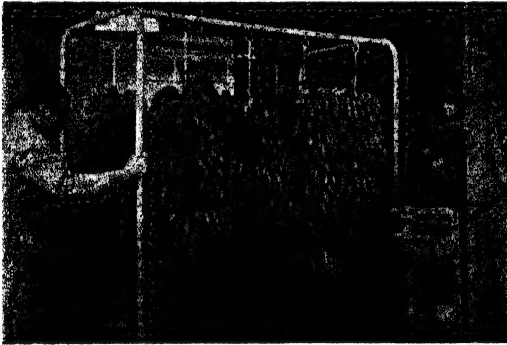
এটি ১৫০০৪ ফুট গভীর। সাধারণতঃ দেড় হাজার ফুট খুঁড়িলেই পেট্রোলিয়ামের সাক্ষ্য মেলে।

এক-একটি খনি খুঁড়িতে এখন ব্যয় হয় (আমেরিকার) বোল হাজার হইতে দুই লক্ষ ডলার। যাটা মাটির কীকে-কীকে এত রকমের নিরেট তরল পদার্থ ও বাষ্প ওঠে যে, তাদের নাম নির্ণয় করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও রীতিমত কঠিন। আসফাল্ট বালিয়া যে-বস্তুকে এত কাল ধাতু বালিয়া সকলের ধারণা ছিল, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, তাহা চূর্ণ এবং আলকাংরার (pitch) মিশ্র ভূপ। এই আসফাল্ট পাথর পেট্রোলের মতই দাঙ্। প্রাচীন বাইজান্টাইন যুগে গ্রীকজাতি জলন্ত আসফাল্টখণ্ডকে আয়েয়াস্ত্ররূপে নিক্ষেপ করিত। ওহিয়ো এবং ইণ্ডিয়ানা অঞ্চলে খনি-খনন-কালে ভূগর্ভ হইতে এক রকম বাষ্প নির্গত হইয়াছিল; সে বাষ্পের সংযোগে বালুকান্তর জমাট কাচে পরিণত হয়।

এখন যে 'শুক বরফ' (dry ice) পাইতেছি, এ'বরফের জন্ম ভূগর্ভত কঠিন ডায়ক্লাইড বাষ্পের কল্যাণে। শুক বরফ তৈয়ারী

যেমন খুব অল্প, তেমনি খাঁচ মেলে প্রচুর। এ বাষ্পকে তরল ট্যাঙ্কে পুঞ্জিত রাখা হয়। ট্যাঙ্কের মধ্যে তরল বাষ্প বরফের মত শীতল থাকে। পেট্রোল হইতে বুটেন এবং প্রোপিন নামে আরো দু'রকম বাষ্প উৎগত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যকের সহিত এ দুই বাষ্প মিশাইলে কলমেটিক, পেইন্ট, এ্যাটিক্লিজ দ্রাবক, রেজিন, নকল সিল্ক, কাপড় রঙাইবার রঙ, বিস্ফোরক এবং আরো কতো সামগ্রী তৈয়ারী হয়, তার সংখ্যা হয় না।

এক কথায় পেট্রোলিয়ামের খনি যেন মায়াবীর মায়া-ছদ্ম। বৈজ্ঞানিকের নিপুণ হাতে এ মায়া-ছদ্মের প্রভাবে ঋতু-পানীর বদল-কল্প হইতে অল্পশ্রদ্ধাশী পণ্ডিত পাওয়া বাইতেছে। এই যে এত রকমের বিলাস-প্রসাবনী, সুরভি-সার, তাস, রবার-টায়ার, মুখে মাখিবার ক্রীম, বর্ধাতি কোট, পর্দা, আসবাব, মাথ অঙ্গস্তের মুখের দৃষ্টপাতি—এ সব আজ এমন মজবুত, সুভল এবং সুন্দর হইয়া প্রচুর ভাবে বিরচিত হইতেছে, ইহা শুধু পেট্রোলিয়ামের প্রসাদে। গ্রিসারিখ তৈয়ারী হইতেছে পেট্রোলিয়াম হইতে। তার পর পেট্রোল হইতে

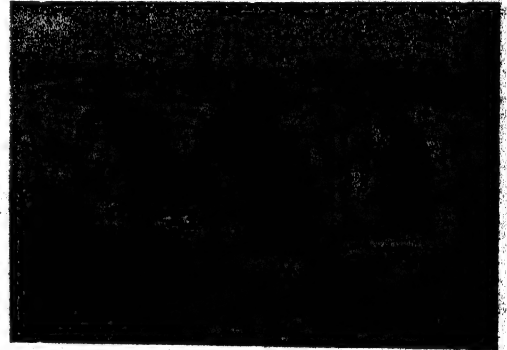


পেট্রোল-বাষ্পে কদলী পাকানো

করিতে বিশেষ যত্ন নিশ্চিত হইয়াছে। শুক বরফের জন্ম-কথা বৈচিত্র্যময়। ডক্টর গুস্তাভ এগলফ লিখিয়াছেন,—কলরাডো প্রদেশের ওয়ালডেনে মাটি ডিল করিবার সময় ভূগর্ভ হইতে পীতভ এক রকম জমাট পদার্থ সবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়—তাহা দেখিতে পীতভ বরফের মত। মাটি খুঁড়িবার পর ভূগর্ভে এমনি পীতভ পাথরে রচা গিরিশ্রেণী দেখা যায়। পরীক্ষায় দেখি, গিরি নয়, কঠিন ডায়ক্লাইড বাষ্প জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই বস্তুই শুক বরফ নামে পরিচিত। মেক্সিকো, নিউমেক্সিকো এবং উটার খনিতে প্রচুর শুক বরফ মিলিতেছে। এ বরফ এখন প্যাক করিয়া দেশ-বিদেশে চালান যায়।

লশ এঞ্জেলোশ এক তৈল-খনি খুঁড়িবার সময় ভূগর্ভ হইতে প্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড এবং অথচ একটি হস্তার কঙ্কাল সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। হস্তি-কঙ্কাল ছাড়া খনিগর্ভ হইতে অজ্ঞাত পত-কঙ্কালও উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

পেট্রোলের সঙ্গে অনেক সময় প্রচুর আর্দ্র-বাষ্প ওঠে। পূর্বে এ বাষ্প তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যক্ত হইত; এখন এ বাষ্পকে নানা কাজে লাগানো হইতেছে। কাচের ও ভামার বিবিধ কাঙ্কানাজলি এ বাষ্প আশানি-কণ ব্যবহার করে; ইহাও আশানি-কণ ব্যয় হয়।



পঙ্ক-বগি

তৈয়ারী গ্রিসারিখের সঙ্গে বাতাস-হইতে-পাওয়া নাইট্রেট মিশাইয়া দিন; নাইট্রো-গিসারিখ মিলিবে। তার উপর পেট্রোলিয়াম-বাষ্প হইতে যে কালো কার্বন (black carbon) পাওয়া বাইতেছে, তাহার কল্যাণে আমেরিকার মুদ্রাবন্ধের কাজে আশ্চর্য্য সুখ-সুবিধা ঘটিয়াছে। পেট্রোলিয়াম-বাষ্প ছালাইয়া উপরে ইম্পাতের স্ট্রেট রাখিলে সেই স্ট্রেটে যে বুল পড়ে, সেই বুলই কার্বন ব্ল্যাকরূপে নানা কাজে লাগিতেছে। ছাপিবার কালি এই কার্বন ব্ল্যাক হইতে তৈয়ারী। আধুনিক ভীষ-বেগসম্পন্ন মুদ্রাবন্ধে কার্বন ব্ল্যাকের তৈয়ারী কালি এমন অনায়াসে স্রোতে অক্ষর ও হাকটোন ব্লকগুলিকে সূত্রাত করিতেছে যে, কোনোখানে ছাপার হ্রস্ব বা ব্লকে কমবেশী কালি লাগার বাংলাই ঘটে না। দক্ষিণ-মেক্সিকো-অভিমান আডমিরাল বার্ড কার্বন ব্ল্যাক চূর্ণের বোমা লইয়া গিয়াছিলেন মেক্সিকোদেশের পরিমাণ-কাঙ্ক-সাধনে। মেক্সিকোদেশে নদী নাই, গাছপালা নাই, গ্রাম-নগর বা পথবাটের চিহ্নও নাই যে সেগুলির সাহায্যে নিদর্শন রাখা চলে—কাজেই এই কার্বন-বোমা বেশিরা তুঘারের গায়ে কালো দাগ রচিয়া সেই দাগ দেখিয়া বিমান হইতে তিনি মেক্সিকোদেশের বাস-ক্ষেত্রের কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। টায়ার নির্যাসে

জ্ঞা বা অসত্য বলিয়া বিবৃত হয়, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ সত্যাসত্য হইতে দূরতম বিলম্ব। দৃষ্টান্ত-রূপে দেখুন—নাট্যে প্রদর্শিত মৃত্যু—লোকে প্রসিদ্ধ মৃত্যু হইতে অত্যন্ত পৃথক। নাট্য জীবনের সজীব অঙ্কুরণ হইলেও—নাট্যের সবই কৃত্রিম। লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা ও নাট্যোক্ত ঘটনার ভেদ এইখানেই। এই যে—‘বে’—পদের তাৎপর্য যে বিষয়। এই বিষয়টি হইতেছে ‘স্বভাব’—‘এই যে স্বভাব’। ‘স্বভাব’ বলিলে কি বুঝায়? স্ব—স্বকীয়; ভাব—ভাব্যমান—চর্য্যমাণ বিষয়। ‘ভাব্য’শব্দটি তু-ধাতু হইতে নিম্পন্ন। ‘তু-ধাতুর অর্থ—সত্তা (ধাকা বা হওয়া), জন্ম, প্রকাশ। ভাব—ভাব্যমান বিষয়। ভাব্যমান—যাহা ভাবিত হইতেছে। অভিনবের মতে ভাব্যমান অর্থ চর্য্যমাণ। চর্য্যমাণ—আশ্বাস্তমান। যে বিষয়কে সকল লোক স্বকীয় বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে আশ্বাসন করে, তাহাই লোকের স্বভাব। যে বিষয় সর্বজন-সাধারণ, সে বিষয়কে সকল লোকই নিজ বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করে (কারণ উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নহে—সর্ব-সাধারণের)—তাই উহার নাম ‘স্বভাব’। সকল-লোক-সাধারণ বলিয়া যে বিষয় সকল-লোক-কর্তৃক স্বকীয় বিষয়-রূপে ভাবিত (অর্থাৎ আশ্বাসিত—প্রত্যক্ষ অনুভূত) হয়, তাহাই নাম ‘নাট্য’—‘বহুসত্তা’। লোকস্ব সর্বস্ত সাধারণতয়া স্বধেন ভাব্যমান-চর্য্য-মাণোহর্থা নাট্যম্ (অ: ভা:, পৃ: ৪০)।

নাট্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব নহে—নাট্যে বর্ণিত বিষয় সকল-লোক-সাধারণ। তাই নাট্য-বর্ণিত বিষয়কে সকল লোকই স্বকীয় বিষয় মনে করে। ইহা অবশ্যই সম্ভব যে, রামচন্দ্র বা চানক্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন। তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় তাঁহাদিগের অনুভূত সুখ-দুঃখ কেবল তাঁহাদিগেরই নিজস্ব ছিল। কিন্তু এই রাম-চন্দ্র যখন নাট্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকে তখন নাট্য-বর্ণিত রাম-চন্দ্রের সুখ-দুঃখ দর্শনকালে প্রত্যেক দর্শকই উহা নিজ নিজ সুখ-দুঃখ হইতে অভিন্ন ভাবে অনুভব করেন—ইহাই নাট্যের স্বরূপ ও ‘স্বভাব’ পদটির তাৎপর্য।

এই নাট্যরূপ বিষয়টি বিভিন্ন সুখ-দুঃখ-যুক্ত—কিন্তু সুখ-দুঃখের সহিত একাত্মক নহে। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনব গুপ্ত দেখাইয়াছেন—কিরাণে রতি-হাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবগুলি সুখ-দুঃখ-রূপ বা সুখ-দুঃখ-মিশ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে বিস্তৃত বিচার এ প্রসঙ্গে নিম্নায়াজন। নিম্নে কেবল দৃষ্টান্তরূপে একটু আর্থটু বিচারায় উদ্ভূত করা যাইতেছে।

হাস্য-ভাবগুলির মধ্যে রতি-হাস-বিষয়-উৎসাহ স্বভাবই সুখ-স্বভাব; কিন্তু তাহা বলিয়া উহাদিগের কোনটিই পূর্ণাঙ্গ সুখাত্মক নহে। রতি-ভাব সুখ-স্বভাব হইলেও উহার মধ্যে কখনও কখনও রতি-বিরোধী ভাবের উদ্ভবের আশঙ্কা মিশ্রিত থাকে—এ কারণে প্রথমমধ্যে দুঃখের ঈর্ষ্য সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। আবার ধন—উৎসাহ স্বামী ভাব। উহাতেও আত্মস্বরূপ দুঃখের মিশ্রণ আছে। তবে উহাতে বহুজননের জীবী ও চিরস্বামী উপকারের ইচ্ছা বর্তমান—ইহাতেই উহার সুখ-রূপতা। আবার দেখুন—শোক হাস্যভাব আশান্তদৃষ্টিতে মনে হয়—উহা সর্বদা দুঃখরূপ; কিন্তু উহাতেও প্রাক্তন সুখের স্মৃতি অল্পবিশিষ্ট হইয়া আছে—এ কারণে উহাতে দুঃখ-বাস্তবমধ্যেও সুখ-লেশ-মিশ্রিত। আবার ভয় হাস্যভাবেও দেখা যায় যে—উহাতে ভাবকালিক ক্ষয় থাকিলেও সেই দুঃখ দ্রবীকরণের আকাঙ্ক্ষা কিম্বদন্তি থাকে।

এই দুঃখাপগমের আকাঙ্ক্ষাতেই সুখের উৎশ্রেকা। অতএব ভয়ও সুখ-সম্মিশ্র দুঃখ-রূপ—নিম্নক দুঃখাত্মক নহে। এইরূপে অভিনব প্রত্যেকটি হাস্য-ভাবের স্বরূপ-বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই বিভিন্ন সুখের ও দুঃখের সম্মিশ্রণ বিস্তৃত। অবশ্য ইহা সত্য যে প্রত্যেক হাস্যভাবেই সুখ-দুঃখ সম-পরিমাণ বা একজাতীয় নহে—প্রত্যেক হাস্যভাবেই সুখের বা দুঃখের পরিমাণ ভিন্ন, সুখের স্বরূপ বিভিন্ন। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে—এমন কোন হাস্যভাবই নাই, যাহাতে কোন না কোন রূপে কিছু পরিমাণ সুখের বা দুঃখের সম্মিশ্রণ নাই। অভিনব আরও বলিয়াছেন—এই শিষ্টাঙ্গ ব্যক্তিরি-ভাব, বিভাব, অনুভাব, সাস্বিক-ভাব প্রভৃতির পক্ষেও প্রযোজ্য, অর্থাৎ ভাবমাত্রই সুখ-দুঃখ-সাম্যবিশিষ্ট—সুখ-দুঃখ-সাম্যগত।

সুখ-দুঃখ-সাম্যবিশিষ্ট—স্বভাব-পদের বিশ্লেষণ। সুখ-দুঃখাদি সন্নিবিষ্ট-স্বভাব—ইহাই অভিনবের মত; অর্থাৎ—সুখ-দুঃখ-প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিয়া জ্ঞান-রূপ (১)। কিন্তু মতান্তরে—সুখ-দুঃখ-দির বেদন বা অনুভবই এ প্রসঙ্গে অভিপ্রেত। মোটের উপর, উভয় মতের পার্থক্য এই যে—অভিনব-মতে—লোক-স্বভাব সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণ-বৃত্তি-যুক্ত, আর মতান্তরে উহা সাক্ষ্য সুখ-দুঃখ-সাম্যবিশিষ্ট নহে—কিন্তু সুখাদির অনুভব-বিশিষ্ট (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)।

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে—লৌকিক যে সকল ভাব—রতি-হাস-ভয়-লোকাদি—সেগুলি সকলই সুখ-দুঃখাত্মক। নাট্যরূপ বিষয় তৎসদৃশ ও তৎসম্ভারাহুবিদ্ধ, অর্থাৎ লৌকিক রত্যাঙ্গি ভাবের অনুসরণাত্মক নাট্য। এখন প্রশ্ন উঠিল—একবিধ নাট্য প্রতীতি-গোচর হয় কিরূপে? তাহার উত্তর-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অঙ্গাদি অভিনয়-যুক্ত হইলে লৌকিক ভাবগুলি নাট্যরূপে পর্যাবসিত হয়।

অঙ্গাভিনয়োপেতঃ (মূল)—অঙ্গাদি-বিষয়ক অভিনয়—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য, সাস্বিক—এই চতুর্বিধ অভিনয়। ইহাদিগকে ‘অভিনয়’ বলা হয় কেন?—ইহার উত্তর-দান-প্রসঙ্গে অভিনব বলিয়াছেন যে, ইহার রসের অভিমুখে নরন করে (অর্থাৎ লইয়া যায়), তাই ইহাদিগের নাম ‘অভিনয়’—‘আশ্বাসপর্ধ্যায়-প্রতীত্যুপযোগিনোহন্ত এবাভিমুখ্যনয়নহেতুহাঃ’ (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)। আঙ্গিকাদি অভিনয়-দ্বারা শূদ্রাদি রসের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকার হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকার বা অনুভূতিরই নামান্তর আশ্বাস বা চর্য্যণ। রত্যাঙ্গিভাবে এ চর্য্যণ থাকে না। এ কারণে রস ভাব হইতে বিলম্ব। আঙ্গিকাদি অভিনয় যেরূপ রসাদানের হেতু, সেইরূপ অঙ্গাদিও রসের অভিমুখে নরনের হেতু—‘রসভিমুখ্য-নয়নহেতবঃ’ (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)। অঙ্গাদি বলিতে বুঝায়—অঙ্গ-সমূহ (অর্থাৎ শাখা-মূল-গীত) আদি (প্রধান) বাহাদিগের—অর্থাৎ ব্যক্তিরি-ভাবসমূহ ও বিভাব-অনুভাব-সমূহের। কারণ বর্থাধ্যয়ে বলা হইবে—‘রত্যাঙ্গি হাস্যভাব-বিভাব-অনুভাব-ব্যক্তিরি-ভাব-সংযোগে

১। মূলে আছে—‘সন্নিবিষ্ট-স্বভাব: সুখাদয়:’ (অ: ভা:, পৃ: ৪৪)।

এখানে সন্নিবিষ্ট অর্থ—অন্তঃকরণের বৃত্তি-রূপ জ্ঞান—বিষয়-জ্ঞান বৃত্তিতে হইবে—knowledge of any object; বোদ্ধান্ত ‘সন্নিবিষ্ট’ শব্দের অর্থ—সিদ্ধাপ স্বরূপ-জ্ঞান—Consciousness; সে অর্থ এখানে গ্রাহ্য নহে। কারণ, সুখাদি অন্তঃকরণের বৃত্তি—অন্তেভন—বৃত্তিরূপ-মাত্র—চৈতন্য-স্বরূপ নহে।

মূল :—যেহেতু এই রঙ্গদৈবত-পূজন যজ্ঞের তুল্য, অতএব—
চ্যোতুগুণ-কর্তৃক সর্বপ্রথমে (ইহা) কর্তব্য। ১২৮।

সংক্ষেপ :—কর্তৃব্য ন্যাট্যোক্তভিঃ (বরোদা); কর্তৃব্য
পূজনম্ (কাশী)।

অপূজনে যদি প্রত্যাবার-মাত্র হয়, তাহা হইলে পূজা করিলে ত
চ্যাব্য-নিরুত্তি-মাত্র ফল? উহার উত্তর—না, রঙ্গপূজা যজ্ঞ-তুল্য;
এব যজ্ঞের দ্বারা ইহারও স্বতন্ত্র ফল আছে। সে ফল—১৩০
কে উক্ত হইবে।

মূল :—নর্তক অথবা অর্ধপতি—যে পূজা করিবে না, অথবা
জ্ঞানী করাইবে না, সে নিশ্চয় অপচয় প্রাপ্ত হইবে। ১২৯।

সংক্ষেপ :—নর্তক—নটাদি, রঙ্গাজিনেতা। অর্ধপতি—যিনি অর্ধ-
হায্য করিতেছেন, রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক (financier)। অথবা
অর্থের (রঙ্গবিষয়ের—রঙ্গাজিনের) অধিপতি—নাট্যাচার্য।
শচম—হানি, ক্ষতি, বিনাশ, প্রত্যাবার। কাশী-পাঠ—কারিয়্যভি
নৈব; বরোদা—ন কারিয়্যভ্যাজ্ঞেব।

মূল :—পক্ষান্তরে, যিনি ষথাবিধি যথাদৃষ্ট পূজা করিবেন, তিনি
৫ অর্ধ-সমূহ লাভ করিবেন ও স্বর্গলোকে গমন করিবেন। ১৩০।

সংক্ষেপ :—যদি কোন কর্মের অকরণে পাপ জন্মে, অথচ সেই
কর্মের করণে কোন পুণ্য উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই অকরণ-
নিত পাপকে বলা হয় 'প্রত্যাবার' (sin of omission)।
হা 'কৃত পাপ' (sin of commission) হইতে ভিন্ন। নিত্য
স্ব (দৈনন্দিন অবস্থা কর্তব্য—সন্ধ্যা-বন্দনাদি) না করিলে
প্রত্যাবার হয়—কিন্তু করিলে কোন পুণ্য হয় না—ইহা একশ্রেণীর
শ্রমিকের মত। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে—রঙ্গপূজা না করিলে ত
প্রত্যাবার হয়—ইহা ১২৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ১২৮ শ্লোকে
লা হইল—রঙ্গপূজা না করিলে যে কোন প্রত্যাবার হয়—এমন
হে অর্থাৎ রঙ্গপূজা করিলে যে কেবল প্রত্যাবারের নাশ হয়—অন্ত
কোন পুণ্য জন্মে না—এমন নহে; পক্ষান্তরে, রঙ্গপূজা বধন যজ্ঞ-তুল্য
যখন যজ্ঞের দ্বারা উহারও পৃথক পুণ্যফল বর্তমান। অতএব রঙ্গ-
জ্ঞা (নিত্যকর্মের দ্বারা) কেবল প্রত্যাবার-নাশক নহে—বরং উহার
দ্বারা (কাম্য কর্মের দ্বারা) স্বতন্ত্র ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সে ফল কিরূপ, তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। শুভ অর্থ (বিবর)
ও স্বর্গলাভ—এই স্বতন্ত্র ফল—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

ষথাবিধি—যে পদ্ধতি পিতামহ-কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে—বাহার
বিবরণ নাট্যশাস্ত্রের তৃতীয়াধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। দেবগণ-কর্তৃক বিহিত
রঙ্গপূজাই ষথাবিধি পূজা। যথাদৃষ্ট—এই বিধি শাস্ত্রে বেঙ্গদৃষ্ট
হয়। সেই শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিই যথাদৃষ্ট বিধি। শুভ অর্থসমূহ—
ঐহলৌকিক ধন-মান-প্রসিদ্ধি-লাভ ইত্যাদি।

মূল :—এই বলিয়া ভগবান্ ক্রহিণ—সকল দেবতা
সহ রঙ্গপূজা কর—এই প্রকারে আমাকে সম্যগুরূপে আদেশ
করিয়াছিলেন। ১৩১।

সংক্ষেপ :—“এবমুক্তা তু ভগবান্ ক্রহিণঃ সর্বদৈবতৈঃ” (বরোদা);
“এব ভবতি প্রাহ ক্রহিণঃ সহ দৈবতৈঃ” (কাশী)—ক্রহিণ
বলিয়াছিলেন—“এইরূপ হউক”; দেবগণ সহ (রঙ্গপূজা কর—এই
প্রকারে আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন)।

ক্রহিণ—ক্রমা। সমচোদয়—সম্যগুরূপে বিধিবাক্য-দ্বারা পূজা-
কর্মে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।

মর্ত্যগণের উদ্দেশ্যে রঙ্গপূজার অবশ্যকর্তব্যতা, অকরণে প্রত্যাবার
ও করণে শুভফলাদির নির্দেশপূর্বক পিতামহ কি করিয়াছিলেন,
সেই পুরাকল্পের অল্পসংগত্রে মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক
বলিতেছেন।

ইহা হইতে স্মৃতি হইতেছে যে—নাট্যাচার্যেরই দেবযজনে (রঙ্গ-
পূজায়) অধিকার আর তাঁহারই ষথানির্দিষ্ট ফললাভ। কবির
অধিকার প্রেক্ষায় অর্থাৎ নাট্য-রচনায়। আর প্রবর্তিতার
(Director) অধিকার—নাট্যের প্রযোজ (Production)।

রঙ্গ—বাহা-দ্বারা দর্শক-চিত্ত রঞ্জিত হয়—রঙ্গ্যভেদনেনোতি
বঙ্গো নাট্যম্ (অ: ভাঃ, পৃ: ৪৬)। রঙ্গ—নাট্য। নাট্যের আধার
বলিয়া গোঁণভাবে নাট্য-মণ্ডপের নামও 'রঙ্গ'। আর নাট্যমণ্ডপের
অধিষ্ঠাতারূপে দেবগণও অতি গোঁণভাবে রঙ্গ-পদবাচ্য। অতএব
—‘রঙ্গপূজা’ অর্থে—নাট্যমণ্ডপের অধিদেবতাদের পূজা। এই
শ্লোকে নাট্যমণ্ডপাধিদেবতার পূজার বিধি-প্রদান-পূর্বক দ্বিতীয়
মণ্ডপাধ্যায়ের উপোদ্যাত করা হইল—ইহা স্মৃতি হইতেছে।

ইতি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নাট্যোৎপত্তি নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

“ঈশ্বরকে ব্যাকুল হইয়া খুঁজিলে তাঁর দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা
হয়।...সত্য বলছি, দর্শন হয়।—এ কথা কারেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করে।”

“বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই।...ঈশ্বরে শরণাগত হও, সব পাবে।
তিনি সর্ববুদ্ধি দেবেন, তিনি সব জ্ঞান লবেন। যখন একবার ‘ইরি’ বা
একবার ‘রাম’ নাম উচ্চারণ করলে, রোমাঞ্চ হয়, অজ্ঞপাত হয়, তখন নিশ্চয়
জেনো যে সত্যাদি কর্ম আর করতে হয় না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার
হয়েছে—কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।”—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বহুমতীর প্রাণ-সর্ব্বক সত্যীশচন্দ্রের অন্তিম ইচ্ছা এবং নির্দেশ-কমুসারে তাঁহার প্রমোদ্য সহধর্ম্মিণী খড়দহের নিকট রহড়ায় অনাথ বালকগণের আশ্রয় ও লালনের জন্ত রামচন্দ্র-প্রীতি-মুখি ভবন নামে যে-আশ্রম এবং তাঁহার সজ্জিকল ইনস্টিটিউট হাসপাতালে টাইফয়েড রোগের প্রতিকারাবলি-কল্পে যে-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—গত ১১ই মার্চ



উপেন্দ্রনাথ

জনও হইয়াছিল। সভায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পৌরোহিত্য করেন এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সুধীর্বাগ্নি মূর্তি-ভবন ও আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং কল্পপদ্ধতি বিবৃত করেন; এবং উপেন্দ্রনাথ, সত্যীশ-চন্দ্র ও রামচন্দ্রের চরিত-চিত্র-কথার আলোচনা করেন। সন্ধ্যার সময় আশ্রমের অনাথ বালকগণ 'অভিমুখ্য বধ' অভিনয়ে সকলের চিত্ত-বিনোদন করিলে উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাঁহার উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতালের উৎসবানুষ্ঠানে স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসন সমলকৃত করিয়াছিলেন। সম্ভ্রুত উৎসব-প্রাক্ষেপে বহু জ্ঞানিগুণী-জনের সমাবেশ হইয়াছিল। হাসপাতালের চিকিৎসক-অধ্যক্ষবর্গ সমাদরে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া হাসপাতালের ধর-দ্বার ও কার্ধ্য-পদ্ধতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। হাসপাতালের কর্মসচিব-গণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভবভোব

দত্ত মহাশয় বিধানচন্দ্র এবং সমাগত ভ্রম্মজলীকে সাধব অভ্যর্থনায় সম্মানিত করিলে বিধানচন্দ্র—সত্যীশচন্দ্র ও রামচন্দ্রের চিত্র-বস্ত্রির আলোচনা-প্রসঙ্গে সত্যীশচন্দ্রের অমায়িকতা এবং বিনয়নন্দতার

স্মরণ

অকালে তাঁহাকে হারাইয়া শোকাক্ত পিতা-মাতা এ বিয়োগ-বেদনায় অপরের বিয়োগ বেদনা তাঁহা ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন



সত্যীশচন্দ্র

চালনার জন্ত আরো অনেক জমি চাই, টাকা চাই। এবং এ-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্ন্ত ও বৌগির দেবা-সাহায্য-কল্পে বহু দাতা যে মুক্তহস্তে অগ্রসর হইয়া আসিবেন, এ আশাও তিনি রাখেন। উপসংহারে বিধানচন্দ্র বলেন,—বাঁহারা আমাদের সহিত বিযুক্ত হইয়া পরলোক-গমন করেন এমনি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই তাঁহাদিগের সহিত সংযোগ এবং তাঁহাদিগকে মৃত্যুহীন করিয়া আমরা রাখিতে পারিব।

বিধানচন্দ্রের পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উপেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলেন—বহুমতী সাহিত্য-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন উপেন্দ্রনাথ; তার পর তাঁর অযোগ্য পুত্র সত্যীশচন্দ্র সেই ভিত্তির উপর বিরাট মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ দেশের কল্যাণে অর্থদান না করিলেও তাঁহার দান এই বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির তাঁহার কীর্তিকে অবিনশ্বর ও উজ্জল রাখিবে। সন্তানের জন্মতিথি দিনে রামচন্দ্রের মাতৃদেবী এক পুজকে হাগাইয়া বহু পুজের প্রাণরক্ষার যে-চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সামথ্যে দেশের বহু



রামচন্দ্র

কল্যাণ সাধিত হইবে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের পর শ্রীযুক্ত দৌরীন্দ্রমোহন ত্র্যোপাধ্যায় সত্যীশ-চন্দ্রের বহু গুণাবলীর কথা বলেন। সত্যীশচন্দ্রের অতুলনীয় কর্মসজ্জি

এবং সে-অনুভূতির তীক্ষ্ণতা বাহাতে আর কোনো পিতা-মাতাকে না কাতর করে,—একটি সন্তানের প্রাণও যদি স্তম্ভিকিংসার গুণে রক্ষা পায়, এই উদ্দেশ্যেই এতটা সপাতলটিকে সজীবনীশক্তি তে তাঁহার গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। বিধানচন্দ্র বলেন, হাসপাতালের সুপরি-

ধাবসায়, বন্ধু-বাংসল্য, অমায়িকতা ও সামাজিকতার উল্লেখ করিয়া বীরেন্দ্রমোহন বলেন—শাস্ত্র-পুরাণ গ্রন্থাদি এবং সংসাহিত্যে সুলভে বিজ্ঞানভিত্তিক করিয়া তোলা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এ ভাবে রক্ষণভা-মোচন এবং জনশিক্ষার কাজে তাঁহার সাহায্য বাড়লার ভিত্তিতে চিরস্মরণীয় থাকিবে। প্রথমে বিহুদী কল্যাণ, পরে একমাত্র তাঁ পুত্রের বিয়োগে তিনি ভাবিয়া ডিয়াছিলেন, তবু যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, সিনিক বহুমতীর সেবা নিমেষের জন্ত লেন নাই। এক দিকে অসাধারণ স্ববীর; অপর দিকে গভী, পুত্র, কল্যাণ বহুশ্রমিকের উপর আন্তরিক মেহ-মতার প্রাচুর্য—সতীশচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনন্তসাধারণ বলিয়াই তাঁহার ধ্বাস।

সৌরীন্দ্রমোহনের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য রামচন্দ্রের সম্বন্ধে লেন, রামচন্দ্রের মত প্রথার বুদ্ধিসঙ্গম গজ তিনি আর দেখেন নাই! ধনীর লাল হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাস হস্তটুকু ছিল না। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এবং কথাধূরাগ ছিল অসাধারণ। সদা-প্রসন্ন মুখ—সদা-চকল মন—কিশলয়ের

ত কোমল প্রাণ রামচন্দ্র অল্প বয়সেই বহু জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন; বজ্ঞান সাধনার জন্ত গৃহে সেবকটিকে গড়িয়াছিলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে চিরদিন বেদনার মধ্য দিয়াই বড় জিনিষ গড়িয়া ওঠে।

যে মধ্যান্তিক বেদনার মধ্য হইতে এই মহান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনি আশা করেন, তাহার দ্বারা দেশের বহু কল্যাণ সংসাবিত হইবে।

অন্তঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী বলেন, রামচন্দ্রের মনে অনেক আশা ছিল অভিসার ছিল। তিনি তাহা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। মরণের মধ্য দিয়াও তিনি মরণজয়ী হইয়া থাকিবেন।

প্রধান অতিথি এবং সভাপতিগণকে ধন্যবাদ-দানান্তে অস্থান শেষ হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে জাগে। মনে জাগে পুরাণের দ্বীপটি মূর্খের কথা। সে দিন এ-অস্থানে যোগ দিয়া বার বার এই কথাই মনে জাগিয়াছে যে দ্বীপটি মূর্খ। যেমন প্রাণ দিয়া—নিজের অস্থি-পঞ্জর দিয়া বজ্র রচনার সহায়তা করিয়াছিলেন—সেই বজ্রে হরষ হস্তে দৈত্য-কুল নিহত হইয়া শঙ্কর কল্পিত স্বর্গ আবার যেমন সুন্দর হস্তোচ্ছল স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি রামচন্দ্র-প্রীতির ও সতীশচন্দ্রের প্রাণশক্তি লইয়া আজ যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা—সে প্রতিষ্ঠানও শঙ্কর কল্পিত বজ্রের বাজলার

প্রীতি দেবী



ফাল্গুন-মধু

ত্রিশান্তি পাশ

ওগো, আজকের নব ফাল্গুনে, বৌদ দিয়ে বৌদ জাল বুন ;
ফুল ফলে কাঁচা রঙ, ধ'রে গেল, রূপো হ'ল সোনা কার গুণে !

জাহা, মিঠে হাওয়া বয় ফুরফুরি, অন্তরে কাটে স্তব্ধহুড়ি,
ছছ করে মন, কুছ কুছ ডাকে, কার লাগি করে খন-হুড়ি ?

হের, সজনের ফুলে ঝুপঝুপি, বোলতার বসে চুপচুপি ;
হিমে-ভেজা ঘাসে রস করে পড়ে, টুপ টুপ করে টুপটুপি ।

কত, মৌমাছি ক্ষেপে মৌ খুঁজে, চাক ছেড়ে দিয়ে ভাল বুঝে,
বৌও বৌও সুরে বন বন ঘুরে, জাম-ডালে বসে চোখ বুজে ।

চায়, প্রজাপতি খুঁদে তার পিছে, ফর ফর করে গায় মিছে ;
ভীমকল খেপা গৌং ঘেরে ফেলে, ঘুরপাক খেয়ে গায় নীচে ।

ওই, জাম-ডালে ঝিঙে ল্যাক্স নাড়ে বৌ-কথা-কও পাক মাঝে,
চোখ-গোল-পাখী চোখ গেল ব'লে, উড়ে গিয়ে বসে বাঁশ-বাঁড় ।

সেখা, বুলবুলি নাচে হুমহুমি পলাশের রঙে কুমকুমি ;
জল স'য়ে ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁঝ করে, বনে বনে বাজে ঝুমঝুমি ।

শোন, শিশু দিয়ে ডাকে কোন্ পাখী দেবদাস বনে গাও ঢাকি,
ভেল কুচকুচে কাঁচ-পোকা রঙ, টুকটুকু ছুটে লাল আঁখি ।

হোথা, গাঁওতালী মেয়ে যায় জলে লাল শাড়ি প'রে বলমলে,
ঘট কাঁখে ঘাটে ছল ছল করে, ভোর হ'য়ে ভাবে টলমলে ।

সে যে, বিড়-ফুল দিয়ে চুল বাঁধে কথা কেটে কথা বাঁধ মাঝে,
টং হ'য়ে কত ঢং করে চলে, খুঁট ধাসে পড়ে—পায় মাঝে ।

তার, হুই কানে ছল ছলছলি জৌলুস হ'ল চুল বুলি
মৌহনী ফুলে মধু মধু খোঁজে, জল ভেঙে জলে ঢেউ তুলি ।

আজ, কার কথা রটে বনে বনে চাষি দিকে চিটি-গুড়নে,
ফাল্গুন-মধু লুঠ হ'য়ে যায়, হরষ কার বোঝনে ।

ছোটদের আসর



একটি ছোট আরব্য উপন্যাস

গৌরীজগদীশ্বর বসু

বিজ্ঞানাগর মশায়ের লেখা আরব দেশের লোকের আতিথেয়তার গল্প নিশ্চয়ই তোমাদের পড়া আছে। বিজ্ঞানাগর মশায়ের চেয়ে আমিও বে কিছু কম বাই না—অর্থাৎ আরব্য আতিথেয়তার গল্প যে আমারও কিছু কম জানা নেই, সেটাই আজ তোমাদের কাছে প্রকাশ করব। বিজ্ঞানাগর মশায়ের গল্প ছিল শ্রেয় ফেলেকুলোনা গল্প। আর আমি তোমাদের বা কবর তা হচ্ছে আমার নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—একবারে নিজেরা সত্য।

আরব্য উপন্যাস পড়ার পর থেকে, সত্যি বলতে কি, আরব দেশটা আমার মন লাগত না। তার পর বিজ্ঞানাগর মশায়ের গল্প পড়ার পর থেকেই আরব দেশ সবচেয়ে আমি মাঝে মাঝেই কেমন একটা বিলম্বিত উৎসাহ বোধ করতাম। প্রায়ই ইচ্ছে হত, বাই নিজেই বাই। স্বচক্ষে গিয়ে অতিথিগিরায়ন মহান আরবদের দেখে আসি। কিন্তু সব সময়ে ত' আর সময় হয়ে ওঠে না।

সে বার কি একটা কার্বে—পড়াশোনা, না বেশভূষণ ঠিক মনে নেই—ঐ দিকেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিজ্ঞানাগর মশায়ের গল্প। আর যেই মনে পড়া—অমনি হাজির আরব দেশে। সেখানে বোঝ করতে লাগলাম বাড়ী বাড়ী। আতিথেয়তা ত' বুকের কথা—সেমানকার লোকতালি এমন অশিক্ষিত যে, বিজ্ঞানাগর মশায়ের নাম পর্যন্ত শোনেনি। যত দূর বুঝলাম, বর্ণপরিচয়ের খবর তারা রাখে না—লাম্বাক অক্ষর-পরিচয়ও তাদের হয়নি। অনেক বোজ-বাক্সের পর এক গাইডের কাছে কিছু খবর পাওয়া গেল। সে বলল যে সে যত দূর জানে, লোকালয়ে আরব দেশবাসীদের এ-হেন ভুলভাষের কথা তার জানা নেই। তবে মরুভূমিতে বেহুইনদের চোখে এসব প্রথা চলিত থাকলেও থাকতে পারে।

বিজ্ঞানাগর মশায়ের গল্পের একটি হেতুভেদে করবার জন্ত আমি

সমকথা বসে—এই স্টোটা কখন বাতাই কখন বিবেচনা করে গিয়ে নবাইকে আবার জামিয়ে দেওয়া করি। অনেক ঠিকানা দিয়ে—অনেক আশ্রয়ি কল কল করে ভেতরী বেহুইনদের গাইডে আমার সাথে মরুভূমিতে কেতে পাইডের হাতী করতলা গেল।

মরুভূমির মধ্যে লাম্বাক মিল করে প্রচুর খোঁজখনি করে, অনেক উটপাখী এবং হুইটিকি বর্ণনের পর লাম্বাকলা এক হুইটিকি দিয়ে আমার হাজির হল। মরুভূমিতে প্রচুর, একটি ছোট আরব পরিবার বেশ প্রতিভেত বসবাস করছে। তারা ঠিক বেহুইন কি না বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমাদের তারা খুব খারাপ-আপায়ন করলে। গিরাটি আমাদের নিজের হাতে খেঁচুর খাওয়ালে। বাবাটির ত সর্বদাই কেন্দ্র একটা তরু জাব। আর তাদের হুটি ছোট ছোট-মেয়েও আমাদেরই আল-পাল্প হয়ে কেঁদেতে লাগল।

হাজির কোলা দুয়োবার সময়ই লাম্বাক হুইটিকি। তাদের ঘরে দেখলাম, একটি বাক্স বিছানা—আর তাকে বাক্স হুটি লোক ততে পারে। মরুভূমি দিয়ে কোলা বেহন সব—আরব্য হাজির ঠিক তেমনি ঠাণ্ডা। বিছানার যে শেষ পর্যন্ত কে শোনে—ফেলেকুলোনা হুটি না আমরা হুইন, না কর্তা-গিরা—তাই নিয়ে আমি ভাবিত হ'য়ে পড়লাম। ফেলেকুলোনা হুটি তপন বহিও বাক্স হুইটিকি—তবুও সারা রাত বালির তপন কাটাবার কথা আমি জরুর পারহিলাম না। কর্তা-গিরা হুইটিকি তত্বতা করে নিজেরা বিছানার শেষে না—কিন্তু তা বলে যে ফেলেকুলোনা বেহন আমাদের বিছানার ততে কলবে—তা মনে হয় না। গাইডের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তার অবস্থাও সলীন। সেও এই কথাই জবাবে।

বা ভেবেছিলাম—একটু পরে তাই-ই হল। একটু রাত হতেই কিছু খেঁচুর খাইয়ে গিরাটি তার ফেলেকুলোনা হুটিকে বিছানার নিয়ে গুইয়ে দিলে। সেখানে দেখতে—কলপ নকশে এই বৃত্ত দেখতে দেখতে তারা ঘুমে একবারে অচেতন হয়ে পড়ল। বুঝলাম, আমাদের আর বিছানায় শোবার আশা নেই।

তার পর আমাদের খাবার তাক পড়ল। সারাটা রাত ভেগে কিংবা বালির তপন তপে কাটাতে হবে কেনে বাওবার আমার আর তখন উৎসাহ ছিল না। গাইডের অবস্থাও তবুই চ। বা তোক, সারা দিন ধরে হাটাধাটির পর 'বাংবা না' 'বাংবা না' বলেও বেশ কিছু খেয়ে ফেললাম। খেয়ে উঠে ভীষণ ঘুম পেতে লাগল। আমাদের ঘুম আসছে দেখে কর্তা-গিরা হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল এবং বিছানা থেকে তাদের ফেলেকুলোনা হুটিকে পালাকোলা করে ফুলে বালিতে গুইয়ে দিলে। আমি বৃহৎ আপত্তি জানালাম। কর্তা-গিরা হুইনই করতোজ জানালে, ঐটা না কি তাদের অভ্যেস আছে। আর আমরা বিছানায় না শোলে তাদের না কি পাশ হবে। আমরা অতিথি, অন্তঃর দেখতা।

চকুলান্না কাটিয়ে হুইন দিয়ে বিছানার শান্তি হল। বাবু, এক বিবরে নিশ্চিত হওয়া গেল। বিজ্ঞানাগর মশায় মিথ্যা গল্প লেখেননি। আরব দেশে তাহলে সত্যিই এ ধরনের আতিথেয়তার নেওয়া আছে। ঐ রকম বিধান লোককে সন্দেহ করা আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

অজ্ঞাত সন্দেহ এবং অজ্ঞাত জন্ত বিজ্ঞানাগর মশায়ের কাছে মাশ চাইতে চাইতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ছে—কিংবা ঘুমোতে ঘুমোতে কখন সে মাশ চেয়েই ঠিক করছে নেই। অনেককথা

মোবার পর তাঁর মনে হতে লাগল, আমি যেন উত্তর-সৈকতে বসবের মত ভবে আছি। মল্লখ্যির মধ্যে উত্তর-সৈকত নেহাৎ অলীক মনে। পর দেখছি যেসে আমি ব্যাপারটাকে বিশেষ আমল দিচ্ছি। না—যেমন হিলাস তেমনি ভবে হইলাম। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যে নেহাৎই বস নয়—এ কারণা বৃদ্ধ হতে লাগল। জাবলায়—যে মনে বস দেখতে দেখতেই জাবলায়—তা, বলা বার না। দাব্য উপভাসের মত 'ত'। হযত' কোন, তাঁকে মরুমান সমেত তিহাই উত্তর-সৈকতে এসে হাজির হয়েছি কোন দক্তি বা জিনের ধরাল-বুলাত। নাঃ, ব্যাপারটা কেবলে হয় চোখ-বুদে—ভাল নয়। তবে কি আরব দেশের আভিষেকের মত আরব্য উপভাসও দক্তি ঘটনা। চোখ মেলে আর দেখব হইল না। দেখলাম, পাণ্ডিত পোরানো ছেলে-মেয়ে হ'লি কখন এসে বিহানার হাজির করে।

উহা, তুল বললাম। আরবাই কখন এসে বলিতে ছেলে-মেয়ে হ'লি পাশে আশ্রয় নিবে।

আমি, বিহানা—সে ততক্ষণে হযত' কর্তী-গিরীকে আশ্রয় করেছে।

বিক্রান্ত

ঐরবিন্দন

১

জান হ'তে আড়াই হাজার বছরেরও আগের কথা। পুরাক নামে এক রাজা ছিলেন গিরিব্রহ্মপুরে। তাঁর ছেলে শিতনাগ বারাহনদীর রাজা হ'ন (১)। তাঁর ছেলে কাকবর্ষ। কাকবর্ষের ছেলে কেমধর্ষা (২)। কেমধর্ষার ছেলের নাম কত্রোজা (৩)। কত্রোজার ছেলের নাম প্রায় সকলেরই জানা—বিহিসার (৪)। বিহিসারের ছেলে অজাতশত্রু (৫)। অজাতশত্রুর ছেলে দর্ভক (৬)। দর্ভকের ছেলে

(১) বিক্রপুরণে ও ঐমভাগবতে এঁর নাম শিতনাগ; মন্ত-পুরাণে এঁর নাম শিতনাগ। (২) বিক্রপুরণে ও ঐমভাগবতে এঁর নাম কেমধর্ষা; মন্তপুরাণে এঁর নাম কেমধর্ষা। (৩) বিক্রপুরণে এঁর নাম কত্রোজা; ঐমভাগবতে কেমজ; আর মন্তপুরাণে এঁর নাম কেমজিং (মতান্তরে হেমজিং)। (৪) বিক্রপুরণে এঁর নাম বিহিসার; ঐমভাগবতে বিহিসার; এঁরই নামান্তর প্রৈণিক; মন্তপুরাণে নাম বিহ্যসেন। বিহিসারই প্রথম বারাহনদী ছেড়ে রাজপুত্রে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অরুণেশ্বর জয় করেছিলেন। ইনি মহাবীর ও বুদ্ধের সময়েই লোক। কেহ বলেন যে, ইনি বুদ্ধ-সেবের শুরু ছিলেন, আবার কেহ বা বলেন যে, জৈনধর্মের উপর এঁর খুব তক্তি ছিল। এঁর ছেলে অজাতশত্রু কিন্তু বৌদ্ধদের ভয়ানক শত্রু ছিলেন। রাজপুত্রে এখনকার রাজদীর—নালাদ্যর কাছে—বিহার-বজ্রাধিকার লাইট বেলে বেতে হয়। অরুণেশ্বর এখনকার কুলের জগদগুর ইত্যাদি জায়গা। রাজপুত্রে অসংখ্যই মধ্যে পড়ে। (৫) অজাতশত্রুর অন্য নাম কুনিক। ইনি মগধে গঙ্গার তীরে পাটলিপুত্র নামে একটি নগর স্থাপন করেছিলেন। পাটলিপুত্র গঙ্গা-শোণের সন্নিবেশে আছে। এখন এ নগর মাদীর নীচে বসে গেছে। এর ধানিকটর উপর এখনকার পাটনা-বীকীপুর পড়ে উঠেছে। মাটি খুঁড়ে-পুরানো নগরটি বার কয়বার চোঁটা এখন চলেছে। মন্তপুরাণে অজাতশত্রুর কুশিকিরের ছেলে বলা হয়েছে। বিহ্যসেনের ছেলে

উদার (৭)। উদারের ছেলে নন্দিবর্দন। তাঁর ছেলে মহানন্দী। বিক্রপুরণে বলা আছে যে, শিতনাগ-কলে এই দশ জন রাজা।

মহানন্দীই শিতনাগ-কলের শেষ রাজা। পুরাণভিত্তিক তাঁকেই বলির খেং-কত্রির রাজা বলা হয়েছে। বিক্রপুরণে, ঐমভাগবতে ও মন্তপুরাণে বলা হয়েছে যে, এই মহানন্দী এক পুরাক বিবাহ করেছিলেন। এই পুরাক গড়ে তাঁর এক কতি দুর্ভাগ্য হয়ে জন্মায়। এর নাম মহাপদ্ম। ঐমভাগবতে বলা হয়েছে—এঁর নাম নন্দ। তবে মহাপদ্ম সংখ্যক ধনের গতি ছিলেন বলে গোলক এঁকে ডাকত মহাপদ্মগতি নন্দ বলে। তাই থেকে সংক্ষেপে এঁর নাম হয়েছিল—মহাপদ্ম। মহাপদ্মের আর একটি নাম ছিল সর্বাধিসিদ্ধি। তবে তাঁর 'নন্দ' নামটিই খুব বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। সেই নামেই সকল গোলক তাঁকে ডাকত। এই নন্দবংশের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাস ধারা পড়েছেন—তাঁরা সকলেই জানেন।

মহাপদ্ম নন্দের রাজ্য ছিল বিশাল। তাই রাজকার্য্য ভাল ভাবে চালাবার জন্তে তাঁকে অনেক মন্ত্রী রাখতে হয়েছিল। এক মন্ত্রীর নাম ছিল বক্রনাস, আর এক জনের নাম ছিল রাক্ষস। রাক্ষসই ছিলেন নন্দের প্রধান মন্ত্রী—জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাক্ষসের স্বভাব ছিল যেমন কুক, বুদ্ধিও তেমনি 'তীক্ষ্ণ'। প্রত্যুত্তি, কুট-রাজনীতি আর জির এই তিন বিষয়ে তাঁর জোড়া তখনকার কুগো বুজ পাতলা যেত না। মহারাজ নন্দ ত রাজকার্য্য বড় একটা লেপতেনই না—সর্বাধাই তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে মতে থাকতেন। রাজকার্য্য বা কিছু চালাবার রাজার নামে রাক্ষসই চালাতেন।

মহারাজ নন্দ বিবাহ করেছিলেন দু'বার। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন এক কত্রির রাজার মেয়ে—নাম সুনন্দা। সুনন্দা কলে জন্মে অল্পময়। তবে নন্দ মহারাজ নিজের বস-স্বভাবের জন্তেই এমন ভাল রাণীকেও দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তাই কিছু দিন বাবে

কাথায়ন, তাঁর ছেলে ভূমিসিদ্ধ, তাঁর ছেলে অজাতশত্রু। অজাতশত্রু বৈশালী ও কোসলের রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই সময়ে বুদ্ধসেব ও মহাবীর নীকীপ লাভ করেন। (৬) বিক্রপুরণে ও ঐমভাগবতে নাম—দর্ভক; মন্তপুরাণে—বংশক; ভাসের 'বংশ-বাসবদন্ত' নাটকে এর নাম—দর্শক। মগধ—এখনকার বিহার। (৭) ঐমভাগবতে নাম—অজয়; মন্তপুরাণে—উদাসী। ইনিই পাটলিপুত্রের কাছে কুশমপুর নগর স্থাপন করেন। পাটলিপুত্র ছিল শোণ-নদের উপর; কুশমপুর—গঙ্গা-নদীর উপর।

বিক্রপুরণ মতে শিতনাগ-বংশে দশ রাজা—শিতনাগ, কাকবর্ষ, কেমধর্ষা, কত্রোজা, বিহিসার, অজাতশত্রু, দর্ভক, উদার, নন্দিবর্দন, মহানন্দী।

ঐমভাগবত মতে—শিতনাগ, কাকবর্ষ, কেমধর্ষা, কেমজ, বিহিসার, অজাতশত্রু, দর্ভক, অজয়, নন্দিবর্দন, মহানন্দী।

মন্তপুরাণ মতে বার জন রাজা—শিতনাগ, কাকবর্ষ, কেমধর্ষা, কেমজিং (হেমজিং), বিহ্যসেন, কাথায়ন, ভূমিসিদ্ধ, অজাতশত্রু, বংশক (বংশ), উদাসী, নন্দিবর্দন, মহানন্দী।

ভিনসেট স্মিথের প্রণত রাজবংশ—শিতনাগ (৬৪২ খৃঃ পূঃ), কাকবর্ষ, কেমধর্ষা, কেমজিং (কত্রোজা), বিহিসার (প্রৈণিক), অজাতশত্রু (কুনিক), দর্শক, উদাসী (উদার), নন্দিবর্দন, মহানন্দী (আশ্বক ৪১০ খৃঃপূঃ)।

তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন যুগা নামে এক শূদ্রের মেয়েকে। যুগাও দেখতে সুন্দরী ছিলেন আর রাজার মন ছাপিয়ে চলে গেলেন। তার ফলে কিছু দিন যেতে না যেতেই পাটনাগী মনশা হ'য়ে উঠলেন—টিক যেন রূপকথায় দুয়ো-বাণী। আর ক্রমে ক্রমে যুগা দুয়ো-বাণী হ'য়ে শেষে পাটনাগীর সিংহাসন পর্যন্ত দখল ক'রে বসলেন। [ক্রমশঃ]

ইতিহাস বারা তৈরী করে

ঐতিহাসিক বস্তু

নাট্য তার মত বড়, মনে রাখতে পারবে কি? ড্রাডিয়ার ইলিয়াদ আইজেনাভিড। বস্তুটা সত্যেই তাকুত ইলিট ব'লে।



সেনিন

সেই বোকা যুবকটি তার ছোট নোংরা ঘরে বাপি বাপি বই আর কাগজপত্রের মাঝখানে ব'সে ভাবছিল একটি মেয়ের কথা। তার নাম সেনা।

সেনাকে তার জারী ভালো লেগেছিল। বিয়েও করবে টিক ক'রেছিল।

কিন্তু হুড়িল কেবেছিল রাজনৈতিক মতামত নিয়ে। ইলিড ছিল কম্পেন্ডিয়াল মনের। সেনা ছিল মেন্সেভিক; যে ছ'টা মনে রাশিয়ার অনেক রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

সেনা বলেছে ইলিডকে তারের মলে চ'লে এসে বিয়ে করতে। কিন্তু ইলিড বল হাতের রাজী নয়।

আই ইলিড, ভাবছিল—কি করবে? বিয়ের জন্তে সে কি তার নিজস্ব হুঁস করবে?

কিন্তু ইলিড, কি হিব কয়ে, তার

মেন তার হুঁসের মিকে চেয়েছিলেন। হুঁস চেয়েছে একটা ঘুবি ঘেরে ইলিড কলসে—এ হ'তে পারে না। তার চেয়ে তার মেন বলছিল। নিজের মত ও বিবাস, মেন ও জাতির জন্তে সব কিছু ত্যাগ করা বাহ।

হাতের হুঁস ছিল সেনাকে কার্ল মার্কসের হুঁস, তার মিকে চেয়ে কলস কলসে নিয়ে ইলিড সেনাকে শিখলো—যে বড়, বিবাস।

বিবাস লিলে বটে, কিন্তু হুড়িলে জাপিয়ে বাসুবার জন্তে ইলিড, নাহ নিলে—সেনিন।

বিন বায়।

অখ্যাত যুবকের নাম মেনে মেনে বিখ্যাত হয়ে পড়লো। রাশিয়ার বিপ্লবের পুরোহিত সেনিন তার জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে লাগলেন—হুনিয়ার বাধা ও বিপাকতার নামে নিতীক জাবে ঠাড়িয়ে।

আজ তার নিবাস কেলবার সময় দেই। পড়ার ঘরে ব'লে কাজের সমুদ্রে তিনি ডুবে আছেন কাগজের পাহাড়ের মাঠে।

কে এক জন দেখা করতে এসেছে।

আসুতে বললেন।

এ কি। এ যে সেনা। বড় হ'য়েছে, কিসে হ'য়েছে, কিন্তু সেই সেনা, তেমনি রূপসী।

ভালো লাগলো অল্প বয়সের বাস্তবকে পেয়ে। অনেক কথা হ'ল অনেকক্ষণ ধ'রে। শেষটা বললেন—বদি কখনো প্রোডজন হয়, আমাকে স্বরণ কোর। সেনা, আমার সাহায্য চাইবামাত্রই তুমি পাবে।

কে জানত, এমন একটা দিন আসুবার দেয়ী ছিল না।

কিন্তু দিন বাসেই সেনিনের মলে সেনা বসে হ'ল মেন্সেভিক বলে।

বিচারে প্রমাণ হ'ল সে মেন্সেভাই, আর হুঁস হল ওলী ক'রে মারবার।

বিচার নয়, বিচারের প্রকৃতি কলা বাহ তাকে। তবে শান্তিটা নির্ধম এক অমোঘ।

এমন দিনে সেনার মত প'চল সেনিনকে,—এ মনের সেই সর্বময় কর্তার নামে একটা আবেদন-পত্র লিখে সে ব'লে গিলে বখাছানে বখাসত্তর শীত পাঠিয়ে দিতে।

হুক-হুক হুক ভরসা করছিল সাহায্য সে পাবে তার চরম দুঃসময়ে। বায় কথা এখানে 'শেক কল' তার কাছেই বহন সে সাহায্যের প্রতিক্রিয়া পেয়েছে এক দিন, তখন হুড়িল আসুতে বিলম্ব হবে না, এই সে ভেবেছিল।

কিন্তু তাকে মার্ত করিয়ে মার্তে মিলে কারার সময় পর্যন্ত কোনো জবাব এলো না।

কুয়াগার ঢাকা এমন একটা মহত্বজন প্রজাত পেটি ছিল, যে প্রজাতের কেউ কখনো মরতে চায় না।

কলিত কীণ করে সে এর কুললো—কতক সেনিনের কাছে আমার আবেদন পাঠান হুঁসে কি?

হুঁসে—কল কল সাক্ষিত উত্তর।

কতক বস্তুকলো তার মিলে চেয়ে মেন কলসে, হুঁসে নাও

পরে গাঙ্গুলি নিমন্ত্রণে আসিল না। তার একান্ত অনিচ্ছা তা নয়! জয়রাম রায়ের নিষ্ঠার তুলিয়া শিবকৃষ্ণ তাকে খানিকটা করিয়াছিল, তাই। পরেশ ল, বিবাহটা চুকিয়া যাক, তার গিয়া মাখন গাঙ্গুলিকে ধরিয়া ইয়া আসিবে। এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া প. পরেশের অন্তশোচনার সীমা কেবল না। জয়রামের বিষয়-সম্পত্তি



[উপভাস]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

র; আর এইটাই জয়রামের একমাত্র সম্ভান। নানা দিক দা পরেশ ঋণ-জালে জড়াইয়া আছে। তিন পুরুষ ধরিয়া এ। জমিয়া এমন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে যে, বাহির হইতে সাহায্য পাইলে সব যাইবে। কথাটা তেমন প্রচার হইবার পূর্বে

খিলের বিবাহ যদি সারিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে ঐ জয়রাম রায়ের সম্পত্তিকে অবলম্বন করিয়া আবার পাড়াইবার সামর্থ্য হইবে। জয়রাম রায়ের বয়স হইয়াছে। যদি...

পরে তাই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ঋণের বোঝার উপর দায়ো খানিকটা ঋণ চাপাইয়া চূড়ান্ত সমারোহ করিবে জমিদারী প্লাইয়া এটুকু বুঝিয়াছে, প্রাণ আর মান রাখিয়া কোনো মতে নৈজের জীবনটা কাটানো যাক; তার পর... যেমন ভাগ্য দিয়া আসিয়াছে।

বিবাহের দিন আকাশ কাঁশাইয়া বৃষ্টি নামিল। ঐরাবত যেন ওদিককার সজ্জিত সমস্ত জল ঢালিয়া পৃথিবীকে ডুবাইয়া দিবে। জাড়া-করা বজরা আসিয়াছে। কাল হইতে ঘাটে বাঁধ। বাজনার ব্যবস্থা হইয়াছে মাখন গাঙ্গুলিকে টেঙা দিয়া। তাছাড়া বড় একখানা নৌকা-বোঝাই শুধু এক-হাজার খাশগেলাস যাইবে সঙ্গে। বিলাস-পুরের ঘাটে নামিয়া সেই এক-হাজার খাশগেলাস জ্বালাইয়া দু'দল ব্যাণ্ড আর রঙনচৌকির বিরাট প্রোসেশন। কলিকাতা হইতে দু'জন ইছনী মেয়ে আন। হইয়াছে...তার চলিবে সে-প্রোসেশনের সঙ্গে দুতা-লীলায় তরঙ্গ তুলিয়া। ব্যাণ্ড খাশগেলাসের জাঁক-জমক অনেকে দেখাইয়াছে; কিন্তু ইছনী মেয়ের নাচে পরেশ গাঙ্গুলি সকলকে তাক লাগাইয়া দিবে।

বৃষ্টির খটা দেখিয়া পরেশ গাঙ্গুলি দমিয়া গেল। এ-বৃষ্টিতে বজরার এবং নৌকায় চাপাচুপি মিয়া কোনো মতে সকলকে লইয়া গেলো তার পর...বিলাসপুর। সেখানেও যদি আকাশের এমন খনখটা চলে।

শিবকৃষ্ণ বলিল—কুছ পরোয়া নেই। বাবার মাথার বেল-পাতা চাপাযো সেজবাবু, কেন ভাবছেন? বাবা আমার আন্ততোর।

বেলা দু'টায় বর বাহির হইবার কথা। বৃষ্টির বেগ সমানে চলিয়াছে। হু'শো লোক যাইবে কথা ছিল—বাজার সময় পঁচিশ জনের বেশী লোক পাওয়া গেল না। এ-জলে বরযাত্রী সাজিয়া যাওয়ার উপসাহ অনেকের নিবিয়া গেছে।

মাখন গাঙ্গুলির তরঙ্গ হইতে সুশীল আসিয়াছে। মাখন গাঙ্গুলি আসেন নাই; তার ছেলেরাও আসে নাই। সুশীল বলিল—ওদের

বেনির বিয়ের পরেই যাকে নিয়ে চলে যাবো ভেবেছিলুম। রয়ে গেলুম শুধু অখিলের বিয়ে দেখাবো বলে।

পালকী করিয়া বর ও বর-যাত্রীদের আনিয়া বজরায় ভোলায় ব্যবস্থা। সুশীল পালকীতে উঠিবে, হঠাৎ কালো আসিয়া হাজির। কক শুদ্ধ মৃতি...যেন কত কাল ভুগিয়াছে। মাথার চুল উজোখু... চোখ দু'টো জ্বাকুলের মতো লাল

টকটক করিতেছে।

দেখিবা মাত্র শিবকৃষ্ণ থিঁচাইয়া উঠিল,—যাটা মাতাল...কাজ কামাই করে আসেন করছিলেন। এখন এসেছেন নেমস্তন্ন গিয়ে পেটপুজোর মতলবে! সে-সাথে বালি। এখানেও আর কাজ করতে হবে না।

কালো কোনো জবাব দিল না। ছলছল নেত্রে কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল। সুশীলকে দেখিল। দেখিবা মাত্র তার পায়ের উপরে পড়িয়া একেবারে তার হুই পা চাপিয়া ধরিল। বলিল—আমাকে রক্ষা করুন দাদাবাবু।

সুশীল তার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল; বলিল—কি হয়েছে কালো?

কালো বলিল—আমার ভয়ঙ্কর বিপদ! কি যে করবো...হু'-চোখে আমি অন্ধকার দেখছি।

সুশীল বলিল—কারো অসুখ করেছে না কি?

কালো প্রায় কাদিয়া ফেলিল। বলিল—অসুখ হয়ে গুটিগুটি মরে গেলেও দুঃখ ছিল না দাদাবাবু। এ আমাকে...আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সুশীল বলিল—কাদিস নে কালো। আমাকে বল, কি বিপদ।

কালো বলিল—তাহলে আমার সঙ্গে একটু এ-দিকে তোমায় আসতে হবে দাদাবাবু। কিন্তু কি করেই বা আসবে! আমি কণ্ঠীবাবুর কাছে গিয়েছিলুম। আপনার নাম করে তিনি বললেন, তার কাছে যা। তাই আমি...কিন্তু...

সুশীল বলিল—তোর যদি উপকার হয় কালো, আমি নেমস্তন্ন যাবো না। সে চাইল পরেশ গাঙ্গুলির পানে; বলিল—আমাকে বাব দিন মামা! লোকটা কাঁছে। বলছে, বিপদ। নিশ্চয় গুস্তুর কিছু হয়েছে!...ওকে দেখা...কি বলেন?

একটা ছোট নিখাস ফেলিয়া পরেশ গাঙ্গুলি বলিল—বুঝি! তবে তুমি সঙ্গে গেলে আমার খুব আনন্দ হতো।

সুশীল বলিল—আমার আনন্দ আপনার আনন্দের চেয়ে অল্প হতো না মামাবাবু! কিন্তু আপনি তো দেখছেন...উপায় কি?

বর-পক্ষকে ছাড়িয়া সুশীল একান্তে সরিয়া আসিল। কালো সঙ্গে আসিল।

সুশীল বলিল—বল, কি হয়েছে?

কম্পিত আত্ম-কণ্ঠে কালো বলিল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু। মান-সম্মান সব গেল। লোকে তুলে আমার মুখে

সুশীল বলিল—বিশের কথা বলবি, না, এমনি আজ্ঞে-বাজে স্বাক্ষর পালা গাইবি ?

সুশীলের স্বর তীব্র... ভৎসনা-ভরা ।

ভৎসনা খাইয়া কালো ধামিয়া-ধামিয়া নিশাস লইয়া বে-কাঙ্ক্ষী বিবৃত করিল, তার মথ—কালোর বোন কালিন্দী এগারো বৎসর বয়সে বিধবা হয় । বিধবা হইয়া শতর-বাড়ীতেই বাস করিতেছিল । তাকে সব কাজ করিতে হইত । দান্নাবান্না, বাসন-মাজা, ঘাট হইতে জল বহিয়া আনা, খান-ভাঙ্গা, খান সিদ্ধ করা, গোন্ধ-বাছুরকে জাব দেওয়া...সব । শ্বশুরের ক্ষমতা আছে, কিন্তু হাড়-কুণা । বিধবা বৌকে দিয়া ধাক্কাড়ের কাজ পর্য্যন্ত করাইয়া লইত । বিনা-মাহিনার বাদী যেন । তাও কি পেট ভরিয়া খাইতে দিত । সকলের খাওয়ার শেষে যেমন ঘাহা পড়িয়া থাকিত, তাই...ইহার উপর শাস্ত্রীর গল্পনা গালি গ্রাহ্য ।... একবার শিষ্ট ছাঁকা দিয়া পথে বাহির করিয়া দিয়াছিল । শিষ্ট এত বড় ফোঁকা লইয়া তিন ক্রোশ মাঠ ভাঙ্গিয়া জলা ভাঙ্গিয়া কাদিয়া বেচারী ভাইয়ের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল ।...

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কালো খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল...নম ফুটাইয়া গিয়াছিল ।

সুশীল বলিল—সে কত দিনের কথা ?

কালো বলিল—গেলো চোত মাসে দাদাবাবু ।

সুশীল বলিল—তার পর সেই থেকে তোর কাছেই আছে ?

কালো বলিল—না । বোশেখ মাসে শ্বশুর এলো ।...কি আতিশো ! বললে, বোমা-বিহনে সংসার সেখানে অচল । আসলে এত খাটা খাটবে কে ? আমি মানা করলুম কালিকে...বললুম, বাসুনে কালি । আমার যদি দু'মুঠো জোটে, তোরও জুটবে । সেখানে কারো মুখে একটু মিষ্টি কথা নেই । ধরে-ধরে মারে, ছাঁকা দেয়...গেলো তুই মরে যাবি । তা শুনলো না । বললে, এক নন্দ ছিল...মরে গেছে । তার বাচ্ছ-ছেলেটা না কি ওকে না হলে থাকতে পারে না । তার হাড়ির হাল হচ্ছে, দাদা ।...গেল চলে হতভাগা শ্বশুরের সঙ্গে ।...তখন কি জানি, হতভাগীর পালক গজিয়েছে !

কথা শেষ করিয়া কালো একটা নিশাস ফেলিল ।

সুশীল বলিল—বল...

কালো সুশীলের পা জড়াইয়া বলিল—মুখ দিয়ে সে কথা বলতে আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দাদাবাবু । কালি পোড়ারমুখী এমন করে' সবাই মাথা খেলো শেষে ।...সে হাউ-হাউ করিয়া কাদিয়া উঠিল ।

সুশীল চাহিল চারি দিকে...বর বাহির হইতেছে...ওদিকে প্রচণ্ড হটগোল । রতনচৌকিওয়ালারা তার-স্বরে শানাইয়ে পৌঁ ধরিয়েছে...জ্ঞানরে শাখের রোল ।—এদিকে কাহায়ে লক্ষ্য নাই ।

সুশীল বলিল—বল...বা হয়েছে । কাদলে তো আর সে-সব 'না' হবে না ।

—তা হবে না দাদাবাবু । কিন্তু...

অজ্ঞর উচ্ছ্বাসে কথা রুদ্ধ হইল ।

সুশীল তার মাথায় হাত রাখিল । কণ্ঠে দ্রুত ভরিয়া ব্রহ্ম-বিগলিত স্বরে বলিল—বল কালো...বত বড় বিশদ হোক, যদি কোনো উপায় থাকে, আমি দেখবো ।

বিগলিত কণ্ঠে কালো বলিল—পরশ ওর শ্বশুর একখানা চিঠি পাঠিয়েছিল । লিখেছিল, ভরস্বর দরকার...আমি যেন চিঠি পেয়েই নিশ্চয়-নিশ্চয় সেখানে যাই । না গেলে জন্মের মতো আপশ্রুণ থাকবে ।...চিঠি পড়ে আমার ভয় হলো । মনে হলো, কালির নিশ্চয় খুব অস্থখ করেছে...হয়তো বাঁচবে না ।...কিন্তু এর চেয়ে তার কলেরা হলো না কেন দাদাবাবু ? কলেরা হয়ে কেন সে মরে গেল না ? তা হলে আমার আজ কোনো দুঃখ থাকতো না । চোখে এক কৌটা জলও ফেলতুম না ।

সুশীল ধমক দিল, বলিল—চলে যা, আমি তোর কথা শুনবো না, কিছু করবো না তোর জন্য ।

ধমক দিয়া কালোর বাহশাশ হইতে সে পা টানিয়া লইল ।

কালো আরো জোরে পা ছুটো জড়াইয়া ধরিল, বলিল—গেলুম চিঠি পেয়ে । ঘাবা মাত্র সকলে আমাকে মারতে উঠলো । কালিকে দেখি, উঠানের কোণে ছাগল রাখবার এতটুকু খোঁয়াড়, সেইখানে পড়ে আছে । আমাকে সকলে খিঁচিয়ে উঠে বললে, এ-পাপ এখনি আমরা বিদায় করবো...নিয়ে যাও এখান থেকে । নাহলে ওর চুলের ঝুঁটি ধরে ওকে পথে বার করে দেবো ।...কালির মৃতি দেখে আর ঐ ঠাণ্ডা তুনে আমি হকচকিয়ে গেলুম । কালি উঠে কেঁদে আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো । আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমাকে মেরে ফ্যালো দাদা...আমি আর এক-দণ্ড বাঁচতে চাইনে ।

ধামিয়া আবার নিশাস ফেলিয়া কালো বলিল—নিয়ে এলুম । কিন্তু নিয়ে এসে কি করবো দাদাবাবু, আমাকে বলে দাও ? সর্বনাশী কি করলে । লোকের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে ? আমি বসেছি, পুকুরে ডুবে তুই মর । আজ সে পুকুরে ডুবতে গিয়েছিল...ডুব দিয়েছিল । নন্দর মা দেখতে পেয়ে ধরে তুলে এনেছে । এ কি বিপদ বলা দিকিনি দাদাবাবু ! আমি বেচারী ছাপোষা মাছ । ওকে ঘরে ঠাই দিলে আমার জাত বাবে । অথচ মায়ের পেটের বোন...মেরে ফেলতেও হাত উঠেছে না ।

শুনিয়া সুশীল যেন কাঠ । নিমেষের জন্ম । তার পর হাত ধরিয়া কালোকে তুলিয়া সুশীল বলিল,—মারবি কি । চ, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি । এখনি ব্যবস্থা করছি ।...মামাবাবুকে সব বলেছি ?

—বলেছি । তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন ।

সুশীল বলিল—আর দেবী নয় । তাকে একলা রেখে আসিঙ্গনি তো ?

—না । নন্দর মা অ্যুগলে বসে আছে ।

—তোর বাড়ীতে আর কেউ নেই ?

—বুড়ো মা...কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে । কালিকে গাল দিচ্ছে, খিঁচুচ্ছে । কলছে, তুই মর ! এমন সর্বনাশীকেও পেটে ধরেছিলুম ।

—তোর বো ?

—সে তার বাপের বাড়ী গেছে । সেখানে আমার শ্বশুরের খুব ব্যাঘো ।

[কথন :

বঙ্গের
ঐনমিত্ত পাল
বিভিন্ন পত্রিকায় বহন
মেয়েদের বেচনগী বা

স্বাস্থ্য-মৌল্য

বাসে। খিলানার উপরে বহন
তখন ওঠাও ইচ্ছা করলই
সংসারের করা যায়।

তৃতীয়তঃ রাজ্যের কাজ—

আমাদের গৃহকর্মের প্রধান অঙ্গ।

গৃহকর্ম বিষয় আলোচিত হয়।

অন্য অধিকাংশ মহাবিশ্ব পরিবারের মেয়েরা ভাবেন যে, রূপ-
চর্চার নিষ্ফল উপকরণগুলি ব্যবহৃত না চলেও, বহু সময়-সাপেক্ষ।
মরণ এই পৃথিবীবাণী মতায়ুক্ত তথ্যগুলির কোন বিভিন্ন অংশে পরিব্যাপ্ত
হচ্ছে, তার ধারণা সহজ আমাদের খুব কমই আছে, কিন্তু এই
বৈষম্যপূর্ণ মতালম্বের চেষ্টা মহাবিশ্ব গৃহকর্ম পরিবারের গৃহীতলক্ষ্যেও
জার হোয়াচ লাগিয়ে তাকে সচেতন করেছে। ধোঁপা তার ২১০ টাকা
হারে কাপড় কাচা ছেড়ে ৭ টাকার গীড করিয়েছে, ক্রিচাকর নিত্যন্ত
কল্লোলকদের বাড়ী ছাড়া অল্প কোথাও পায়ের ধূলা দেওয়া সম্বন্ধে
অজান্তে চলেতেন। তাই ক্রিচাকর, ধোঁপা ও বাঁধনীর কাজ বহন
মাজীর মেয়েদের এক-ভাগে করতে হয়, তখন রূপচর্চার বিষয়ে
কোনই রকম আলোচনা কললে তাদের কল্পনাতন্ত্র ওক ওঠাথরে হাসির
বেধা বাধা মানে না।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনই হোক বা ভাগ্যবিধাতার পরীক্ষার
মির উপস্থিত হওয়ার কলই হোক, নানা রকম গৃহকর্মের ভার বহন
আমাদের উপরে এসে পড়েছে, তখন তাকে অস্বীকার করবার কোনও
উপায় নেই। কিন্তু মাহুদ সৈন্যশিন জীবনের ধরা-বীথার মাঝে
কিছুতেই জীবন কাটতে পারে না। যে অতি দ্রুত তার মনেও
সামান্য পরিবর্তনের সখ জাগে, আর সে এই সখের উপকরণ লত
অজাৰ সবেও না ছুগিয়ে পারে না।

অনেক সঙ্গারে দেখা যায় যে, তাঁরা শুধু কাজ নিয়ে থাকতেই
ভালোবাসেন, কিন্তু নিজের দৃষ্টিকে একটু সচেতন করলে এবং
সঙ্গারের বিপুল কথন্যায়কে লম্বা করবার ইচ্ছা থাকলে প্রতিদিনের
কাজের কীকটেও একটু সময় পাওয়া যায়। যে সময়টুকু
অল্প কোমলও করে না হোক নিজের মনের বিশ্রামের জন্যও
প্রয়োজন।

প্রত্যেকের সঙ্গারেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে। তাদের
মাকে অধিজ্ঞাত ভাবে ঘর-দোর পরিচার্যের কাজে লগে থাকতে হয়।
অনেকের ধারণা, ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলে বাড়ী-ঘর পরিচার্য থাকে
হস্তব। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। ছোট বেলা থেকে যদি তাদের
ঐশ্বর্য শিকা থাকে নিজের জিনিষপত্র বয়স অনুপাতে গুছিয়ে
রাখবার, তাহলে তাদের সে ভার চিরদিনই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ
হাসের যদি উপযুক্ত দৃষ্টি থাকে এবং তারা যদি জানে যে, কোনও
জিনিষ অপরিহার্য করলে তাদেরই আবার সেটা গুছিয়ে রাখতে হবে,
তাহলে তারা বাড়ী-ঘর নোংরা করতে ভয় পাবে। ছেলে-মেয়েদের
যদি পরিচার্য পরিচ্ছন্নতা শিকা দেওয়া যায়, তাহলে বাড়ীর স্বচ্ছ
কাজ কর্মে যার বলেই আমরা বিশ্বাস।

কাপড়-কাচা পরিচার্য রাখতেও বাড়ীর মেয়েদের প্রাধান্য পরিগ্রহ
হয়; কারণ, অধিকাংশ বাড়ীর ন-মশ বয়সের ছেলে-মেয়েরাও
নিষ্ফল জামা-কাপড় নোংরা করে, তার উপরে ধূলা পায় বিছানার
উঠে তামা ঘরের কাজ বাড়তে সাহায্য করে। দু-তিন বয়সের
বিশেষের কথা আলোচনা, কিন্তু তাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কাপড়-
কাচা নোংরা করলে তাদের দিগে যদি দু-এক দিন নিজের বয়স
সংগত বোঝানো যায় তাহলে নিজে থেকেই তাদের ও অজান্তে করে

সাধারণ বাড়ীতে সকালে উঠলে আঁচ পড়ে, ১১:১২টা পর্যন্ত
সকালের কাজ চলে, আবার ৩:৩০টার সময় বিকালের কাজ আরম্ভ
হয়। বারা এ কাজও সংক্ষেপ করতে চান, তাঁরা সকালে দুটো উঠলে
আঁচ দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারেন, তাহলে বেশী না হোক ১১টার
সময়ে যে কাজ শেষ হয় সেটা ১০টার মধ্যে শেষ হবে আশ্চর্য করা
যায়। সকালের কাজের শেষে বিকালের জলখাবারও সেই সঙ্গে করে
রাখা চলে, তাহলে ছেলে-মেয়েরা ভুল থেকে ফিরলে, তাদের খাবার
করে দেওয়ার তাড়া থাকে না। সন্ধ্যার সময়ে উঠলে আঁচ দিয়ে
বায়ের কাজ আরম্ভ করা যায়।

আমার ধারণা যে, সঙ্গারের কাজ সক্ষিপ্ত করবার ইচ্ছা থাকলে
নানা ভাবেই 'তা' করা যায়। প্রত্যেক সঙ্গারের কর্মধারা ও
প্রণালীর মধ্যে কিছু না কিছু তারতম্য থাকেই—নিজের বাড়ীর
সুবিধা-অসুবিধা বুঝে যদি কিছু ব্যবস্থাও করা যায়, তাতে অল্প
কোনও উপকার না হোক, নিজের শারীরিক বিশ্রামও তো হয়।

মাংস-পেশী

ত্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য

বর্তমান যুগের সভ্যতা অসংখ্য অনেক জিনিষের মত মাহুদকে
রূপচর্চার অনেক উপাদান ছুগিয়েছে। 'মাহুদ তাই আজ রক্ত,
পাউডার, ক্রিম আর লিপস্টিকের সাহায্য নিয়ে নিজের রূপ-বৃদ্ধির
জন্তে করে অস্বাভাবিক চেষ্টা। কিন্তু এ জাতীয় প্রচেষ্টাকে প্রকৃতির
বিরুদ্ধে বিরোধ বলে অভিহিত করা যেতে পারে, এবং এই বিরোধে
সঙ্গলকাম হস্তা হস্ত মাহুদের ভাগ্যে ঝুটবে না। মাহুদের রূপের
মূল উপাদানঃ রঃ নয়। স্বেচ্ছা আর পেশীর সৌন্দর্যই হচ্ছে প্রকৃত
সৌন্দর্য। প্রসাধনে সময় নষ্ট না করে সামান্য সময় ব্যয় করলেই
স্বেচ্ছার লাবণ্য আর সুগঠিত মাংসপেশীর সৌন্দর্য লাভ করা যায়।
আমাদের দেশে দেখা যায় যে, বয়স ত্রিশের ওপর না যেতেই যুগের
চামড়া যায় কুঁচকিয়ে, পিঠের হাড় যায় বেকে, মাথার চুল যায় উঠে,
কপালে ফুটে ওঠে রেখা আর মনে এসে যায় বার্দ্ধক্য। তখন
প্রাণপণ চেষ্টা চলে আগন্তব্য ভাঙ্গনকে রোধবার জন্তে। কিন্তু যদি
নিয়মিত ভাবে সামান্য চেষ্টাও করা যায় তাহলে হয়ত দীর্ঘদিন বার্দ্ধক্যের
সঙ্গে লড়াই করা যায়। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের অধিকারী হতে হলে,
সর্বপ্রথমে নজর দিতে হবে মাংসপেশীর দিকে। স্বাস্থ্যচর্চার আসে
পেশীর একটু পরিচয় জেনে রাখা দরকার।

প্রাণচেষ্টার সৌন্দর্য আর শক্তির আধার হচ্ছে মাংসপেশী।
অধিকাংশ মাংসপেশীই হাড়ের সঙ্গে সংলগ্ন। নরকল্লল থেকে বেধে
তার হাড়গুলোকে দিয়ে কাজ করানই হচ্ছে অধিকাংশ পেশীর ধর্ম।

মাংসপেশী দু'রকমের। কতকগুলোকে ইচ্ছামুখ্য পরিচালিত
করা যায়, আর বাকীগুলোকে তা করা যায় না। দেহের হাড়ের সঙ্গে
যে সমস্ত পেশী সংযুক্ত আছে তারা প্রথম জাতীয়। দ্বিতীয় রকমের পেশী
আছে পরিপাক-বস্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং এই জাতীয় অজান্তে কার্যকারী।

সে খাবার সময় ভেল বা চর্কির বাদ দিয়ে যেখানে আমরা নব। জরী যাড়ে বীরে বীরে। আর তাদের বাড়ার একটা সীমাও
নটাকেই পেশী বলে ধরা যেতে পারে। আসলে কিন্তু মাংস-পেশী
হয়। পেশী-তত্ত্বের সমষ্টি। সে সব তত্ত্ব দেখতে দ্বুতোর মত। ব্যায়াম করলে দেখে চর্কির জঃ না, সের-চর্কি কৃষ্ণিত হয় না—তুধু তাই

একটা তত্ত্ব হয়ত
ইফির পাঁচশো বা
ভাগের এক ভাগ
। তবে লম্বায় প্রায়
ইফির মত। এই
পেশীর কোনটার বা
রং, কোনটা বা
শে।

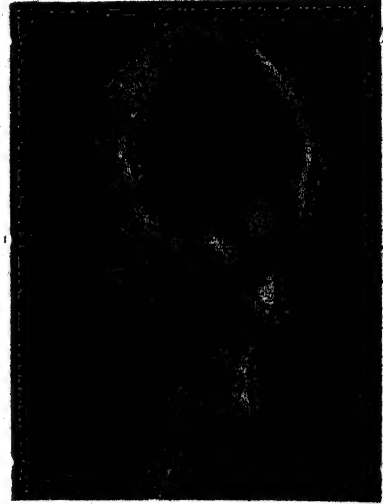
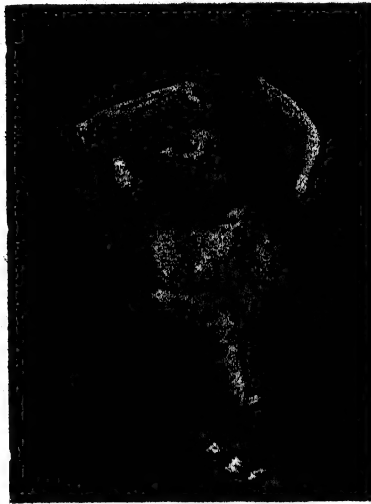
পেশী-তত্ত্ব হচ্ছে খুব
ছোট কোষ ছাড়া
কিছুই নয়। যে
ইচ্ছামত চালান
তার তত্ত্বতে থাকে
। আড়ি ডোরা। স্থৎ-
ধর তত্ত্বও এই জাতীয়
দিও তাদের খুশী-
পরিচালনা করা যায়

বাকী সমস্ত পেশীর তত্ত্বতে ডোরা কাটা থাকে না।

এই সব পেশীর কিন্তু নিজেদের কোন কাজ করবার ক্ষমতা
। পেশীদের চালনা করে স্নায়ু। আগুনের কাছে হাত রাখলে
৫ লাগবে-গরম। সেই গরম লাগার খবরটা একটি স্নায়ু পৌছে
। মস্তিষ্কে। তখন সেখান থেকে খবর পেয়ে আর একটি স্নায়ু

চিত্ত করবে হাতের
। ফলে আগুনের
। থেকে যাবে হাত-
। সরে। একটা ব্যাং
র সত্ত সত্ত তার পায়ের
। বা গুলিটিকে
শাদা করে কেটে নিলে
বিবয়ের পরীক্ষা করা
। অসুবীক্ষণ দিলে
লে পেশী আর তার
ব্রচালক স্নায়ুটিকে স্পষ্ট
ধা বাবে। জলে একটু
। দিলে সেই জলে ঐ
শী টিকে ভিজিয়ে
লে পেশীটি অনেকক্ষণ
। হাতে ধরে থাকবে, তখন
শীটতে খোঁচা দিলে

কটুও নড়বে না, কিন্তু স্নায়ুটিতে আঁত সামান্য আঘাত লাগলেও পেশীটি
হুচিৎ হয়ে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মাংসপেশীর পরিচালক হচ্ছে স্নায়ু।
পেশীকে স্পষ্ট, কর্কশ আর শক্তিশাল করে তুলতে হলে চাই
ময়িত ব্যায়াম। পেশীতত্ত্বের যে ইচ্ছে করলেই বাড়ান যায় তা



নয়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। ব্যায়ামের
সঙ্গে মালিশও পেশী স্নহ থাকে। আয়ত্তাধীন পেশীর সংখ্যা ২৪৫টি।
উপযুক্ত ব্যবহার না হলে তারা পঙ্ হয়ে যায়। এই সব পেশী
হাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয় দড়ির মত এক রকম জিনিষের সাহায্যে। সব
পেশীই এক রকম স্নহ আরবণী নিলে ঢাকা থাকে।



জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদ ত্রাগোর ছবি দেখা। পেল,
আয়ত্তাধীন মাংস-পেশীর সংস্থান দেখাবার জন্য।

স্বপ্নিওর মাংস-পেশীগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরা স্নহ
থেকে স্নহ পর্যন্ত অবিস্রাস্ত কাজ করে চলে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

মঙ্গলীয় ফাইনালের পরিসমাপ্তি

আন্তঃপ্রাদেশিক বর্গী ক্রিকেট

প্রতিযোগিতার চারি অঞ্চ-

লের শেষ খেলার নিষ্পত্তি হইয়া

গিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে

মাত্রাজ ও হোলকার দলের জয়লাভ

সকলেই আশা করিয়াছিল। বিশেষ

উল্লেখযোগ্য একমাত্র উত্তরাঞ্চল ব্যতীত প্রতি ক্ষেত্রেই বিজিত
কল 'ফলো-অনের' গ্লানি হইতে রক্ষা পায় নাই। পশ্চিমাঞ্চলে বরোদা
ইনিংস পরাজয়ের অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় চেষ্টা
করে ও শেষ পর্যন্ত সাত উইকেটে পরাজিত হয়।

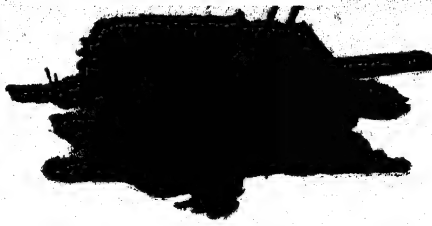
বাঙলা ও মহীশূর ইনিংসও বহু রাণে পরাজিত হইতে বাধ্য হয়।

পূর্বাঞ্চল—

ইন্দোরে যশোবন্ত ট্যাডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলার হোলকার বাঙলাকে
এক ইনিংস ও ২১৮ রাণে শোচনীয় ভাবে হারাইয়া দিয়াছে। লেঃ
কর্নেল সি, কে, নাইডুর দ্বারা অনন্তদাধারণ ক্রিকেট-প্রতিভার নেতৃত্বে
ও স্বল্পস্থানতানামা ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় গঠিত
হোলকার দলের শক্তিমত্তা সর্বক্ষেত্রেই কৌশলবোধে কোন অবকাশ ছিল
না। অপেক্ষাকৃত হীনবীৰ্য্য বাঙলা দলের ইহাদের বিরুদ্ধে পরাজয়
সকলেই প্রায় অবশুজ্ঞাবা বিলম্বই ধারণা করিলেও বাঙলার এই
শোচনীয় বিপর্যয় একেবারে আশাতীত ও মনোবিকৃত। এই প্রতি-
যোগিতার ফলাফল শুধু যে বাঙলার লজাটে পরাজয়ের কালিমা
আঁকিয়া দিয়াছে তাহা নহে, বাঙলা তথা বাঙালীর ক্রিকেট-জগতে
নিঃস্বস্তার পরিচয় প্রকট করিয়াছে।

বাঙলার এই চরম পরিশ্রুতির ফলে আলোচনা ও সমালোচনার
অন্ত নাই। তবে বাঙলা ক্রিকেটের অপোগতি সত্ত্বে সকল শ্রেণীর
সমর্থক একমত। জয়-পরাজয় খেলার অঙ্গ। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার
লীলাক্ষেত্র। আশাতীত বিপর্যয়ের ইতিহাস ক্রিকেট-জগতে বিরল
নহে। কিন্তু বাঙলার এই পরাজয় অত্যন্ত আশাবাদীর মনেও
কোন রেখাপাত করে না। সকল রকমে বাঙালীর ব্যর্থতা এই
খেলার সুপরিষ্কৃত হইয়া দেখা দিয়াছে। শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতা
ক্রিকেটের প্রধান অঙ্গলবন। এ বিষয়ে সি, কে, নাইডু সুবর্ণজয়ন্তী
উৎসবের পর কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে বাহা বলেন,
তাহা প্রশিধানযোগ্য। মাঠে শৃঙ্খলা রক্ষা ও একাগ্রতা প্রত্যেক
খেলোয়াড়ের ধর্ম। বোধ হয়, বাঙালী খেলোয়াড়ের খেলার মাঠে
অমনোযোগ তিনি লক্ষ্য করিয়াই এই কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।

বস্ত্ত: বাঙলার পরাজয়ের মূলে ছিল আমাদের খেলোয়াড়দের
কিঞ্জিএ অসংখ্য ত্রুটি। এই সমস্ত ত্রুটি অমনোযোগজনিত,
সংশেই নাই। কর্তব্য সত্ত্বে সজাগ খেলোয়াড় কখনও অল্পদ্রুপ ভাবে
ব্যর্থকাম হয় না। বাঙলার নৈরাশ্রজনক কিঞ্জিএ-এর সুযোগে
হোলকার ৫৩৮ রাণ করিতে সমর্থ হয়। সর্বাতে ১২৭ রাণের মধ্যে
একাধিক বার আউট হইবার সহজ সুযোগ বেন। গাইকোয়াড় ৭৩
রাণ করিতে নিভুল ভাবে ব্যাট চালনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের
জুসের মাতুল আদায় করার মত জীহ্বা দৃষ্টি বা ক্রিপ্ততা বাঙালী
খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যায় নাই। এই খেলার অব্যবহিত পূর্বে
অন্যত্রিটি বিশেষ খেলায় নামজাদা ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের



এম, ডি, ডি

সাহচর্য্য খেলিয়াও বাঙালী খেলোয়াড়-
গণ অল্পশীলন-প্রসূত কোনদ্রুপ
উন্নতির আভাস দিতে পারে নাই।
একই খেলার একাধিক খেলোয়াড়ের
রাণ আউট স্টরণ নেওয়ার ব্যাপারে
খেলোয়াড়দের মধ্যে অসহযোগ ও
বোকা পড়ার অভাব নির্দেশ করে।
অনেকে খেলোয়াড় নির্বাচনের
ত্রুটি দেখিয়াছেন। কেহ বা পরিচালক-

মণ্ডলীর মুগুপাত করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমাদের গোড়ায়
গলদ। গুণের মাত্র জলে শফরীর অবস্থা আমাদের খেলোয়াড়
সম্প্রদায়ের। সবজাত্তা না হইয়া বদি আমাদের তরুণ খেলোয়াড়েরা
শিক্ষা নেওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে আগ্রহাশিত হয়, তবে ভবিষ্যতে
আশার আলোর সন্ধান পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে স্থানীয়
ক্রিকেটের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদেরও অবহিত হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত
শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মামুখবস্ত্তিতার প্রচলন, অনুশীলনের অব্যব-
সুযোগ এবং সর্বোপরি যোগ্যতার সমাদর করিতে না পারিলে
বাঙলার মাথায় এই হ্রস্বনয়ন কলঙ্কের ডালি তুলিয়া দেওয়ার দুঃস্বপ্ন
হইতে তাঁহারাও নিভৃত্তি পাইবেন না।

হোলকার প্রথমে খেলিয়া সর্বাতে ৫৩৮ রাণ করে। তন্মধ্যে
সর্বাতে ১২৭, গাইকোয়াড়ের ৭৩, সি, এস, নাইডুর ৫০,
জে, এন, ভায়ার ৬১ রাণ উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ খেলোয়াড় সি, কে,
নাইডু নিজস্ব ১৪১ রাণ করিতে বিভিন্ন মারের কায়দা ও কৌশল
দেখান। বাঙলার নবাগত তরুণ বোলার পি, বি, দত্ত ৮৫ রাণ
দিয়া ৪টি ও এন, চৌধুরী ৮০ রাণ দিয়া ৩টি উইকেট পান।

প্রত্যুত্তরে বাঙলা প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬৪ রাণ করিতে সমর্থ
হয়। সি, এস, নাইডুর মারাত্মক বোলিং এই বিপর্যয়ের অবতারণা
করে। 'ফলো অন' করিয়া বাঙলা দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৬ রাণ করে।
ইহার মধ্যে পার্শ্বসারথির ৬০ ও ডোজিকারীর ৩৩ রাণ উল্লেখযোগ্য।
সর্বোপেক্ষা লজ্জার কথা, অবাঙালী এই দুই জনেই বাঙলার
মানরক্ষার জন্য কিছু প্রয়াস পান।

পার্শ্বসারথি উইকেট রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া
চার জনকে আউট করেন। এই খেলার সি, এস, নাইডু মোট
১টি ও সর্বাতে ৬টি উইকেট অধিকার করার স্পিন বলের বিরুদ্ধে
বাঙালী ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

হোলকার :—

লেঃ কঃ সি, কে, নাইডু (অধিনায়ক), মুস্তাক আলী, সি, এস,
নাইডু, কম্পটন, জগদেব, সর্বাতে, ভায়ার, ভাণ্ডারকর, নিম্বলকার,
গাইকোয়াড় ও বাওরালা।

বাঙলা :—

চৌধুরীর মহারাজা (অধিনায়ক), কে, ভট্টাচার্য্য, এন, চাট্টাঙ্গী,
জাজ, ডোজিকারী, এন, চৌধুরী, পি, সেন, এম, সেন, পার্শ্বসারথি,
এস, মিড ও পি, বি, দত্ত।

রাণ সংখ্যা :—

হোলকার—১ম ইনিংসে ৫৩৮ রাণ

বাঙলা—১ম ইনিংসে ৬৪ রাণ; ২য় ইনিংসে ১৭৬ রাণ

হোলকার এক ইনিংসে ও ২১৮ রাণে জয়ী হয়।

গাঙ্গল :—

এই অঞ্চলের ফাইনালে মাত্রাজ এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে বৃকে পরাজিত করে। প্রথমে খেলিয়া মাত্রাজ মোট ৩৬৩ করে। নবীন ও উদীয়মান খেলোয়াড় অনন্তনারায়ণ সখত ও ল ভাবে খেলিয়া ১২৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। য়ের দলপতি ও বহুদর্শী খেলোয়াড় পালিয়া ৭৩ রাণ দিয়া পাঁচটি কট পান।

ব্রহ্মচারী ও রামসিংএর কৃতিত্বপূর্ণ বোলিং মাত্র ৭৮ রাণে য়ের প্রথম ইনিংস শেষ করে। বধাক্রমে ৩৪ ও ৩৩ রাণের মধ্যে তাঁহারা সাতটি ও তিনটি করিয়া উইকেট লাভ করেন। ৭৭ অন' করিয়া মহীশূর দ্বিতীয় দফায় ১৫১ রাণ করিতে সমর্থ হয়। পতনের মুখে ঈড়াইয়াও পালিয়া ও ত্রামসুন্দরের দৃঢ়তা সকলের সো অজ্ঞান করে। তাঁহারা বধাক্রমে ৭৮ ও ৪৮ রাণ করেন। ১য় ইনিংসে মাত্রাজের অধিনায়ক গোপালমের বল বিশেষ ধাক্কী হয়।

মাত্রাজ :—গোপালম (অধিনায়ক), রামসিং, কিলিপস, রবিশ্বন, ার, রিচার্ডসন, ত্রিনিবাস, অনন্তনারায়ণ, পরাণকুসুম, ব্রহ্মচারী দালভ।

মহীশূর :—পালিয়া (অধিনায়ক), দারাসা, ইরাণী, ত্রামসুন্দর, পলসু, ব্রাহ্ম, আয়েল্লার, গরুড়চাঁর, রামারাও, বামদেব ও রামস্বামী।

২য় সংখ্যা :—

মাত্রাজ—১ম ইনিংস ৩৬৩ রাণ

মহীশূর—১ম ইনিংস ৭৮ রাণ

২য় ইনিংস ১৫১ রাণ

মহীশূর এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে পরাজিত হয়।

৩য় সংখ্যা :—

উত্তর-ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশন দক্ষিণ ভারতকে ৩৬২ ৭ পরাজিত করিয়া প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পর্য্যায়ে উন্নীত রাখে। টসে জয়লাভ করিয়া দক্ষিণ-পঞ্জাব দলের নির্বাচিত খিনায়ক অমরনাথ অজ্ঞাত কারণে ব্যাট করার সুযোগ অবহেলা দিয়া বিজয়ী উত্তর-ভারতকে প্রথমে খেলার সুযোগ দেন।

ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ ও পাতিয়ালায় মহারাজার অস্থগহস্থিত হুমদ সৈয়দ ও অমরনাথ বধাক্রমে দল পরিচালনা করেন। উভয় ক্ষে বহু তরুণ খেলোয়াড় যোগদান করিয়া লাক্ষ্যের পরিচয় দেন। হাদের খেলার উক্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের ধারা ও গতি তটা উন্নতিশীল তাহা বোঝা যায়। ইমতিয়াজ ও মকসুদের ত্রায় দীর্ঘমান খেলোয়াড়বৃন্দ বধাক্রমে আউট না ইইয়া ১০০ ও ১১৪ রাণ দায় সৌভাগ্য ও সুনাম অজ্ঞান করেন। চুবীলাসের চাতুর্ঘ্যপূর্ণ বোলিং দক্ষিণ-পঞ্জাবের পরাজয়ের কারণ হয়।

উত্তর-ভারত :—মহম্মদ সৈয়দ (অধিনায়ক), রামপ্রকাশ, াবদুল হাক্কিজ, নাজার মহম্মদ, মহম্মদ দাআলায়, ইব্রাহিম, চুবীলাল, জলা বায়ুদ, মুনীলাল, বদরুদ্দীন ও ইমতিয়াজ আমের।

দক্ষিণ-পঞ্জাব :—অমরনাথ (অধিনায়ক), রামসিং, ডালজিৎ, লস, হীরা, জমুতলাল, মকসুদ আমের, মহম্মদ ইকবাল, মুরাওরাও হোসেন, এই কাম, শিবজী ও সর্বার।

৩৪—১১

২য় সংখ্যা :—

উত্তর-ভারত—১ম ইনিংস—৪৪১ রাণ (আসালাম ১৭, রামপ্রকাশ ৭৭, মুনীলাল ৪১, সর্বার ১০৬ রাণে ৪টি উইকেট) ২য় ইনিংস—সাত উইকেটে ২১৮ রাণ (মুনীলাল ৮৫, ইমতিয়াজ নট আউট ১০০, সর্বার ৮৫ রাণে ২টি ও রামকিষণ ৪০ রাণে ২টি উইকেট)

দক্ষিণ-পঞ্জাব—১ম ইনিংস—২১৩ রাণ (মকসুদ ১১৪, মুরাওরাও ৭১, চুবীলাল ৬৬ রাণে ৩টি উইকেট)

২য় ইনিংস—১২ রাণ (চুবীলাল ২৫ রাণে ছয়টি ও বদরুদ্দীন ১১ রাণে দুইটি উইকেট)

উত্তর-ভারত ৩৬২ রাণে জয়লাভ করে।

পশ্চিমাঞ্চল :—

দুর্ভেদ খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা বোম্বাই বনাম বরোদা খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বোম্বাই পক্ষে প্রথম ইনিংসে ইব্রাহিম, মার্কেট ও আনোয়ার হোসেন বিশেষ কিছু করিতে না পারায় অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিস্থিতি হইতে বিশ্ববিজ্ঞানস্বের উদীয়মান পাশী খেলোয়াড় আর, এস, মুদী কুপারের সাহচর্যে নিজ দলকে রক্ষা করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যাটিং-প্রতিভা বোম্বাইএর বিজয়াজ্বিনের পাথেয় হয়। ২৪৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকিয়া তিনি আলোচ্য বৎসরে দুই বার দুই শতাধিক রাণ করার যোগ্যতা দেখান। বোম্বাই দলের ৪৬৮ রাণের প্রত্যুত্তরে বরোদার প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫১ রাণে শেষ হয়। বহুদর্শী ও শ্রীতনামা খেলোয়াড় বিজয় হাজারীর ব্যাটিং ব্যর্থতা সকলকে হতাশ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে গুল মহম্মদ দৃঢ়ভাবে খেলিয়া ৭১০ রাণ করেন। অধিনায়কোচিত চাতুর্ঘ্য দেখাইয়া নিখলকার মাত্র চার রাণের জন্ত শত রাণে বঞ্চিত হন।

বোলিংয়ে উভয় পক্ষে হাজারী, আমীর এলাহী, মন্ত্রী ফাড়কার ও তারাপোর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বোম্বাই—মার্কেট (অধিনায়ক), এম. কে, মন্ত্রী, আর, এস, মুদী, কে, সি, ইব্রাহিম, আক, এস, কুহার, ফাড়কার, তারাপোর, কোর, খোট, পালওয়াঙ্কার ও আনোয়ার হোসেন।

বরোদা—আর, বি, নিখলকার (অধিনায়ক), বিজয় হাজারী, অধিকারী, আমীর এলাহী, গুল মহম্মদ, সেখ, পাওয়ার, বিবেক হাজারী, মীরচন্দনী, ডি, এন, রায়জী ও এ, প্যাটেল।

৩য় সংখ্যা :

বোম্বাই—১ম ইনিংস—৪৬৮ রাণ (আর, এস, মুদী নট আউট ২৪৫, কুপার ৬২, পালওয়াঙ্কার ৭৮, গুল মহম্মদ ৮৫ রাণে ৩টি, হাজারী ১৪২ রাণে ৪টি ও আমীর এলাহী ১৪১ রাণে ৩টি উইকেট)

২য় ইনিংস—তিন উইকেটে ৭৪ রাণ

বরোদা—১ম ইনিংস—১৫১ রাণ

২য় ইনিংস—৩১ রাণ (গুল মহম্মদ ১০০, নিখলকার ১৬, ফাড়কার ৭৩ রাণে ২টি, তারাপোর ১০৮ রাণে ৪টি ও আনোয়ার হোসেন ৭৭ রাণে দুইটি উইকেট)

বরোদা সাত উইকেটে পরাজিত হয়।

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা

নিম্নলিখ ভারতীয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দলীয় অধ্যক্ষান সাড়হবে লাভোরে অধ্যুক্তিত হইয়া গিয়াছে।
ভারতের প্রতিযোগিতা বিভিন্ন প্রাদেশিক তরুণ খেলোয়াড়দের মিলনে মধ্যে মিলন ও অতীতকালের স্মরণ দেয়। খেলোয়াড়-
এ ব্যাপারে অতীতকাল প্রতিযোগিতার কার্যকারিতা অতুলনীয়।
অলিম্পিক অধ্যক্ষানে সাড়ে ৬৭ পয়েন্ট লাভ করিয়া পঞ্জাব
দ্বিতীয় অধিকার করে।

ক্রিকেট :—বোহিটন বারিয়া আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট
প্রতিযোগিতায় বোহিট চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করে। তরুণ পার্শ্ব
খেলোয়াড় আর, এস, মুদী ১১০ রান করিয়া নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের
দেয় পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। বিজিত পঞ্জাব পক্ষে ডালজিন্দার
৪৭ ব্যাক্রমে উভয় ইনিংসে ৪০ ও ৭২ রান করেন। ফাডকার

১০৬ রান দিয়া নয়টি ও পঞ্জাবের হাফিজ ৭৫ রানে পাঁচটি উইকেট
দখল করেন।

বোহিট—১ম ইনিংস—২৩৭ রান

২য় ইনিংস—২০০ রান

পঞ্জাব—১ম ইনিংস—১১৮ রান

২য় ইনিংস—১১৬ রান

বোহিট ৪৩ রানে জয়ী হয়।

টেনিস :—টেনিস খেলার মাত্রাজ ৩—২ ম্যাচে পঞ্জাবকে
পরাজিত করে। পঞ্জাবের কিশোর মাত্রাজের সম্পদকে ৬—৪ ও
৬—৩ এবং নারায়ণ রাও (মাত্রাজ) মাত্রাজ হাসানকে (পঞ্জাব)
৭—৫, ৬—৩ ও ৬—২ সেটে পরাজিত করেন।

ফুটবল :—ফুটবল খেলায় পঞ্জাব এই পরাজয়ের প্রতিশোধ দেয়
এক মাত্রাজকে ৪—০ গোলে বিপর্যস্ত করে।

বাসালাকে রক্ষার উপায়

ত্রিদিবের চট্টোপাধ্যায়

গত ২২শে পৌষ কলিকাতার মুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট কক্ষে
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বের এক সভায় বঙ্গদেশে ক্রম-
বর্ধমান পতিতাবৃত্তির বিষয় আলোচিত হয়। সমগ্র ভারত পদক্ষেপে
পরিচালনা করিয়াছেন, এমন অবাকালী সন্ন্যাসীদিগের মুখে পূর্বে
জনিয়াছি যে, ক্রিয়ার পতিতাবৃত্তির বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার
করিয়াছিল। আজ যদি অশ্বপতন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে গত
বৎসরের দুর্ভিক্ষ ও বর্জমানের অর্ধাহারই তাহার একমাত্র কারণ।
সাধারণ সময়ের সাড়ে তিন টাকা মণ চাউলই লোক পেট ভরিয়া
থাইতে পাইত না, এখন পনের বোল টাকার চাউল কত দিন কিনিতে
পারে? ২২শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত চাউলের
মূল্যবৃদ্ধি এইরূপ :—

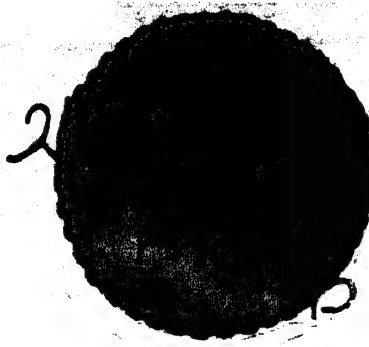
চালপুর ৮।১ টাকা হইতে ১২।০।১৩; পানবা ১২।০ হইতে
১৪।১৫; মৈমনসিং ১০ হইতে ১৪।০; সিরাজগঞ্জ ১২।১২।৫ হইতে
১৫ টাকা; ১১ই নভেম্বর প্রকাশিত নয়াদিল্লীর সংবাদে দেখা যায়,
সে সময়ে কুমিল্লার চাউলের দর ১৫ হইতে ৭ টাকা, ঢাকার ১৫ হইতে
১০ টাকা, বরিশালে ১৩ হইতে ১০।০ ও চট্টগ্রামে ১৫।২ হইতে
১০।১২ টাকার নামিয়াছিল।

দর নামিয়া আবার উঠিবার কারণ কি? দখল করিলে মনে
পড়িলে, গত বৎসর ঠিক এই সময়ে আমন ধান কাটিবার পূর্বে দাম
পড়িয়াছিল আবার উঠিয়া যায়। জিপুরা জিলার দুর্ভিক্ষের সময়ে
চাউলের দর ভয়ানক বাড়ি, আমন আমন কলসের ভরে সেখানেও
আশান্ত হইয়া হ্রাস হয়। দুর্ভিক্ষের পূর্বেই বৈশাখ মাসের প্রথমে

কলিকাতার চাউলের মণ ২২ টাকা হয়। সে সময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে
বার্ষিক ১৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ধান-
কাটার দুই মাসের মধ্যে এমন চাউলের অভাব হয় নাই যে, দর অত দূর
উঠিলে। এই সকল হইতে একটি কথা প্রমাণিত হইতেছে যে,
সঙ্কটকারীরা ধান চাউল ধরিয়া রাখিতেছেন ও এখনই ভয় পাইয়া
ছাড়িয়া দিতেছেন তখনই দর নামিয়া যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসরে
ধরিয়া রাখিয়াছিল ব্যবসায়ীরা ও গত বৎসর রাখিয়াছিল বড় বড়
চাষীরা। এই মজুতের কারসাজি না থাকিলে উপরি উপরি দুই
বৎসর আমন ধান কাটিবার পূর্বে দর পড়ে কেন?

দুর্ভিক্ষের সময়ে দুই মাস ধরিয়া বিহারের প্রথম রেল-ট্রেন
মিহিভামে ১৪ টাকার ও মাত্র ১৫ মাইল দূরে আসানসোলে ৪০
টাকার চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। বিহারের পুলিশ যদি বাঙ্গালার
মত কর্তব্যে অবহেলা করিত, তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না।
এই অবহেলা আজও চলিতেছে ও বত দিন যে কোন সচিবসম্মত
শিখণ্ডী খাড়া করা হইবে তত দিন চলিবে। স্থায়ী রাজকর্মচারীরা
মন দিয়া কাজ না করিলে কোন দেশেই শাসনকার্য যুদ্ধের সময়ে
ভালরূপ চলিতে পারে না। স্বতন্ত্র বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে হইলে
সচিবসম্মত ও বিরোধী দলের মধ্যে আপোষ করিয়া ৬৩ ধারার
প্রবর্তন করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বোয়েদাদ ও অত্যধিক
দুর্বোধ্য লেট-কটকিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বাঙ্গালার সমুদ্র
ক্ষতি করিয়াছে, এইবার তাহাকে বিদায় দিতে না পারিলে দেশে
ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িবে।

জাপানীরা ভাগ্য সঙ্কেতই না কি
গবেষণা ও পরামর্শ করিবার
ক্রিষ্টি—ফজলুট, চার্লিস ও টালিনের
ক বসিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে—
যে—জাপানী ও জাপানের বিনাসের্তে
দ্রুতমর্পণের আওরাজ্ঞ এবার একটু
করা হইবে। কেহ বলিতেছেন
ইরোপীয় রণাঙ্গনে অস্ত্র ও বসদাদি
ক প্রেরণ করিয়া প্রশান্ত মহা-
রায় অকালে সামরিক প্রচেষ্টা মন্দা
বার পরামর্শ করা হইবে। সেপ্টেম্বরে
১৪৪) ডায়াটন ওকসের গুপ্ত



শ্রীতারানাথ রায়

কের পর রুশিয়ার মতিগতি সঙ্কেত সকলেই যেন একটু উদ্বিগ্ন হন।
যা যেন এংলো-স্রাজ্ঞ মিত্রবন্ধকে তেমন প্রাণ থলিয়া বিশ্বাস করিতে
র নাই। প্রস্তাবিত যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা-রক্ষা-সম্বন্ধে রুশিয়া
থরে যে, চারিটি দেশের মধ্যে কোন দেশ কোন দেশকে আক্রমণ
লে তাহাকে শাস্যস্তা করিবার জন্ত সজ্জের সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার
কার চারি শক্তির যে কোন শক্তির থাকিবে—নাকচকারী শক্তি
আক্রমণকারী হইলেও। যথা, এষ্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া
ফাঙ্কন লাইনের পূর্বপার্শ্বস্থিত পোল্যান্ড যদি নিরাপত্তারাত্রিসজ্জের
ট রুশিয়াকে পররাষ্ট্র-গ্রাসকারী রাষ্ট্ররূপে অভিযুক্ত করে,
মরিকা ও বৃটনকে তাহা শুনিতেই হইবে। কিন্তু রুশিয়া
হা মানিবে না। রুশের বক্তব্য—পৃথিবীর নিরাপত্তা চাও,
পত্তি নাই। কিন্তু আপন জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত
গয়ার যে অধিকার আছে তাহা তোমাদের প্রথমে মানিয়া
তেই হইবে।

জাপানী সঙ্কেত সোভিয়েট মনোভাব—

১১৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর টালিন এক বক্তৃতায় বলেন—
জাপানীকে ধ্বংস করিবার নীতি আমরা অবলম্বন করিব না।
শরাকে ধ্বংস করা যেমন অসম্ভব, জাপানীকে ধ্বংস করাও তেমনই
সম্ভব। জাপানীর সমগ্র সুসংগঠিত সামরিক শক্তি আমরা
করিব না। যে একটু লেখাপড়া জানে সেও এ কথা বুঝে
জাপান সামরিক শক্তি ধ্বংস করা অসম্ভব। তবে আমরা
লালের সৈন্যদল ধ্বংস করিতে পারি এবং করিবও।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রুশিয়া বরাবর চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।
১১৪৩ খৃষ্টাব্দে মস্কোএ এক ফ্রি জাপান কমিটি গঠন করা হয়।
এর অল্প পরেই লিগ অব জাপান অফিসার গঠন করা হয়। মস্কোর
তিতুসে বসিয়া জাপান কমিউনিষ্ট ও বন্দী জাপান সামরিক নেতৃবৃন্দ
জাপানে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা গড়িতে থাকেন। নতুন
ল্যাণ্ডের দ্বারা রুশমিত্র নতুন জাপানী গড়িবার আয়োজন হইতে
কে। জাপান কমিউনিষ্ট এম্বকার ইরিচ উইনার্টের (ইনি জাপানী
তে রুশিয়ায় পলায়ন করেন) চেষ্টায় ও টালিনের সম্মুখে রুশ-
দ্বাশ মৈত্রীর পতন গড়িতে থাকে এবং বহু জাপান অভিজাত
দরিক নেতা ফ্রি জাপান কমিটিতে যোগদান করিতে থাকেন।
মানে এই কমিটির চেয়ারম্যান হইলেন ইরিচ উইনার্ট। অফিসার

লিগের চেয়ারম্যান হইলেন জেনারেল
ডায়ালবার কন সেইডলিগ। ১৭ জন
জাপান জেনারেল এ দলে যোগদান
করিয়াছেন।
যুদ্ধবিবর্তিত কথ—

৩রা ফেব্রুয়ারী কায়রো হইতে একটি
সংবাদ প্রচার করা হয় যে, জাপানীরা
মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধ-বিরতি সন্ধি
করিয়াছে। কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত
এই জনগণের সত্যতা সঙ্কেত কোন
আভাসই পাওয়া যায় না। তবে এ কথা
মনে হয় যে, এংলো-স্রাজ্ঞ জাতিসম্মত
অপেক্ষা সোভিয়েট রুশিয়া জাপানী সঙ্কেত
অধিক আগ্রহবান।

জাপান প্রতিরোধ—

একাধিকবার বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঠার উইনষ্টন চার্চিল
"কর্ণোরাগ হিটলারের" ব্যাঙ্গ জুতি করিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক
বক্তৃতাগুলিতে তিনি সেরূপ প্রয়োগ করেন নাই।
জাপানীতে হিটলারের প্রভাব স্তিমিত হইয়াছে এক্ষণ প্রচার ও
যোষণার মূলে সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু পশ্চিম রণক্ষেত্রে হিটলার
যে ভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন তাহাতে বিমিত হইতে হয়।
সমর সাংবাদিকদের অভিমত—"The use the Germans have
made of the past two months to recover, and
their remarkable resurgence of military power
show no amateur is now in charge but shrewd
professional soldiers"—জাপানীর এই পিতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধ
মার্কিন সামরিক কণ্ঠচারীর ভাষায়—"The hardest and most
costly fighting I have ever seen, worse than
anything in the last war." এ যুদ্ধে আক্রমণকারী ও
আক্রান্ত কাহাদের হতাহতের সংখ্যা অধিক হইয়াছে তাহা সামরিক
কারণে প্রকাশ নিবিষ্ট। যুদ্ধে সাধারণতঃ আক্রান্তগণ অপেক্ষা আক্রমণ-
কারীদের হতাহতের সংখ্যাই অধিক হয়, তবু এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষ
অপেক্ষা জাপানীদের হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা অধিক। অশেষ নিপুণ
হইলেও জাপানীদের জনস্বয়ও অশেষ হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম
রণক্ষেত্রে শেষানে শেষানে যে লড়াই চলিতেছে (বাহাকে সামরিক
ভাষায় "toe-to-toe slugging" বলা হয়) তাহা দেখিয়া মিঠার
চার্লিস তেমন উচ্ছ্বসিত ভাবে আশার কথা বলেন নাই। তাহার
ভাষায় মনে হয়, এদিকে যুদ্ধ কবে শেষ হইবে বলা কঠিন। পূর্বে
তিনি অজ্ঞান করিয়াছিলেন—"early summer" এ যুদ্ধ শেষ
হইবে, কিন্তু "early" কথাটি বাদ দিয়া এখন বলিয়াছেন—"I must
warn the House and this country against any in-
dulgence in feeling that the war will soon be
over."

জাপান আত্মরক্ষার আয়োজন—

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত জাপানীর আয়োজন দ্রুততর
ও ব্যাপকতর। সেনাপতি কিন্তু মার্শাল হেন্‌জ ওডেরিয়ানের
আয়োজনে ৮ হইতে ১৫ টন ওজননের চলমান ক্যান্টিক পূর্ণ পূর্ণ

মানুষের প্রদেশগুলি রক্ষা করিতেছে। এ সকল দূর্গের নাম 'শিরন' (বৃত্তিক)। 'শিরন'গুলির সম্মুখে ৬ হইতে ৮ সারি ইন প্রাকার। মাইনগুলির মধ্যে আছে ক্যানিস্ট্রিক স্পার্ক-বিফোরক ইন এবং বৈদ্যুতিক তার বা রেডিও প্রজ্জ্বলক ব্যবস্থামুক্ত কনক্রেট ইন। এই রক্ষা-বেটনের মধ্যে ট্যাঙ্ক-স্ট্রী রকেট ও কামান ইয়া জার্মান পলাতক সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছে।

পশ্চিম সীমান্তেও অল্পরূপে ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। 'মুগলির চতুর্দিকে বহু পরিখা খনন করা হইয়াছে। সাধারণ গুলির চারি দিকে ৫ ফুট কংক্রিট প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া গভীর ভূগর্ভ-প্রবেশ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক একটি গৃহ এক একটি ক্ষুদ্র দুর্গ।

বড় সহরের বড় বড় বাড়ীগুলির প্রতিটি কক্ষ তিমত লড়াই করিয়া মিত্রপক্ষদিগকে জয় রিতে হইতেছে।

হার কি মানুষ ?

জার্মানরা সকল বর্ণক্ষেত্রেই মাত্র মরিয়া হইয়া হু, হিংস্র স্বাধীন শেখ প্রতিরোধের জায় অসম হসিক ভাবে লড়িতেছে। বন্দী না হওয়া পর্যন্ত হারা মানবের জায় যুদ্ধ করে। শুনা যাইতেছে, 'শেখের পত্ন ও দুইরোগগ্রস্ত নরনারী যুদ্ধে আত্মবলি দিতেছে। ফল তেমন মন্দ।

কাষাতগ্রস্ত ৫০ বৎসরের এক জীলোক গুয়ানম্যান টর্পেডো এক ভন দ্যার চালিত টর্পেডো) লক্ষ্যস্থলে চালাইয়া লইয়া গিয়া আত্মত্যাগ করে। ১১ বৎসর বয়স্ক এক কিশোরের মেরুদণ্ডে টিবি হল। সে ডিনামাইট পূর্ণ গাড়ী লইয়া মিত্রপক্ষের যুদ্ধ ভেদ করিতে গেল। কিন্তু এত প্রতিরোধ ও এত আয়োজন সত্ত্বেও জার্মানরা হতাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। জার্মান সামরিক মুখপাত্র লে: কল: ডিটমার বলিয়াছেন—“দুই দিকে সঙ্কট ও সর্বনাশ, মধ্যে জীর্ণ রূপ, পদস্থলন হইলেই মৃত্যু। আজ জার্মান নরনারীর কর্তব্য—জীবন আত্মত্যাগ করা।” ৩০শে জানুয়ারী স্বয়ং ‘হিটলার’ (অনেকে ক্রোধ করিতেছেন হিটলার আর কথা বলেন না, আছেন কি না ক্রোধ।) এক বেতার বক্তৃতায় কৃষক, নাগরিক, সৈনিক—সকলকে হু ও প্রাণ বলি দিতে আহ্বান করেন। তবে তিনি ধনসাম্যবাদ-বিরোধী বুটেনকে স্বরণ করাইয়া দেন যে, বন্য বলশেভিককে সে পোষ মানাইতে পারিবে না, বরং নিজেই বন্ড হইয়া যাইবে। এ যেন ফকটটা হিটলারবাদের সহিত বুটেনের আপোষ করিবার আবেদন।

বার্লিনে রুশপতাকা উড়িবে—

বাস্তবিক সাগর হইতে কার্পেথিয়ান গিরিশ্রেণী পর্যন্ত রুশিয়া প্রায় ৩ শত ডিভিশন সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রায় ২ শত ডিভিশন সৈন্য আত্মরক্ষার যুদ্ধ করিতেছে।

জাহুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে রুশরা বার্লিন অভিযান আরম্ভ করে। এই ‘বলশেভিক স্বত্বাধীন’ গতিরোধ করিবার জন্ত জার্মানরা যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সাফল্য দেখা যাইতেছে না। বার্লিনের পূর্বদ্বারে রুশ বণ-নায়ক কোনিভ ও জুকোভের দুর্ধ্ব বাহিনী প্রবেশ ঘটনা ঘিয়াছে। ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সর্বান—রুশরা বার্লিনের প্রায় ৫০ মাইল পূর্বে গুডার নদী স্নাতকরূপে করিয়াছে। জার্মানরা জনক

তুচ্ছ কবিতা বাধা দিতেছে। কিন্তু রুশ পতাকা পড়ার জার্মানরা উদ্বেগিত হইয়াছে। কয়মাস বরফ পড়িবে, ‘লণ্ডন টাইমসের’ বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন—“If the thaw in Brandenburg continues, its effect on operations will be incalculable, greatly favouring the defenders and prolonging the battle now impending.—এই সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন যে, এমিকে রুশ আক্রমণ কতকটা শিথিল হইয়াছে, কারণ—(১) দূর হইতে রসদ সরবরাহের অসুবিধা, (২) প্রবলতর জার্মান প্রতিরোধ এবং (৩) বর্ণক্ষেত্রে দ্রুত ও প্রবলতর তুষার সমাচ্ছাদন।

ইটালীতে—

ইটালীতে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য—মাত্র কোন মতে নাৎসীদের উপর চাপ বজায় রাখা। কাজেই যুদ্ধ এখানে চিমে তালে চলিতেছে। কোন কোন স্থানে জার্মানরা আক্রমণ করিয়া মিত্রপক্ষের পক্ষম বাহিনীর কবল হইতে দুই-একটি পাহাড় কাড়িয়া লইতেছে, কোন কোন স্থানে মিত্রপক্ষের কয়েক শত গজ স্থান জয় করিতেছে। নিট



জাপান বনাম মিত্রপক্ষ—

জাপান ১৯৪৪ এপ্রিল হইতে এ পর্যন্ত চীনে যে অভিযান করিয়াছে, তাহাতে মাত্র চীন নহে আমেরিকা পর্যন্ত শক্তিত ও চিন্তিত হইয়াছে। হার্কো-ক্যান্টন রেলপথ দখল করিয়া তাহার দক্ষিণ চীনের সমুদ্রতট সুরক্ষিত যেমন করিয়াছে, তেমনই এক দিকে জাভা (এ স্থান হইতে রেলপথ ইন্দোচীনের হানই পর্যন্ত গিয়াছে) দখল করিয়াছে এবং অল্প দিকে কাঙইয়াং-এর (চীন-ব্রহ্ম পথ মিচিনা, কুনমিং ও কাঙইয়াং হইয়া উত্তরে চুংকিং পর্যন্ত গিয়াছে) দিকে ধাবিত হইতেছে। কাঙইয়াং-এর পতন হইলে জাপ সৈন্য চীনের রাজধানী চুংকিং-এর নিকটে আসিয়া পড়িবে। এই স্থানে আমেরিকার বিমান-বাঁটা আছে। ইতিমধ্যে চীনে ১টি মার্কিন বিমান-বাঁটা জাপ করায়ত্ত হইয়াছে। এই বাঁটাটিও তাহাদের কবলগত হইলে জাপান ব্রহ্মপথ ধরিয়া উত্তর পথে চুংকিং-এর দিকে অগ্রসর হইবে এবং কুনমিং ও শিচিয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চীনে মার্কিন রসদ সরবরাহের বিকল্প পথও রুদ্ধ করিবে।

চীনে এই দুর্বলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্ত মিত্রশক্তি ব্রহ্ম উপর প্রবল আক্রমণ করিতেছে। জাপান চীন লাইয়া ব্যস্ত, শুধিকে মিত্রপক্ষ ব্রহ্মদেশে আশামুদ্রপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। জাভা, ইন্দোচীনে পুরাতন চীন-ব্রহ্মপথের স্তম্ভ-স্থান লাশিও ও আরাবানে রীতিমত ভাবে তাহার প্রহার করিতেছে। দক্ষিণ স্তম্ভজায় জাপ পেট্রোল কারখানাগুলির উপর নৌ-বাহিনী হইতে আক্রমণ করা হইয়াছে। আমেরিকার ম্যানিলা জয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার নতুন ধনি—“চল টোকিও!”

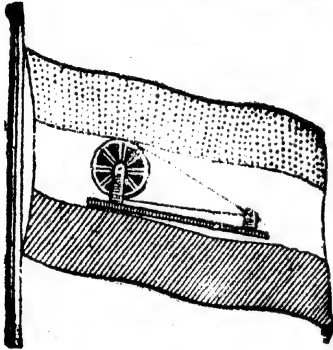
স্বাধীনতা দিবস

সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতির "স্বাধীনতা দিবস" উৎসব, আর ভারতের ছাত্র

হার ও অনাহারক্ষিত পরাধীন জাতির "স্বাধীনতা দিবস" অনাগত আশার মারক বস। এ দিন ব্যথিত জাতি আবার লয়ছে—চাই স্বাধীনতা; ডিকায় নহে—

নে নহে—অজ্ঞানে অধিকারে। শোণিত শোষিত—স্বল্প অপহৃত—নাহারে, রোগে শোকে সেহ নিজ্জীব। তবু চাই স্বাধীনতা—সম্পূর্ণ, অখণ্ড, পূর্ণ স্বাধীনতা। বাঁচিবার ও বাঁচিতে দিবার; গণের ও ভোগ করিতে দিবার, আহরণ ও অজ্ঞানের, রক্ষা ও প্রকম্পের, ক্রন্দনের ও আনন্দের—দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিচারণের ধীনতা।

পোঁপে দুই শত বৎসর পূর্বে জাতি দুঃসহ বেদনায় আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছে—এ মৃত্যু অসহ্য, আমার কি মুক্তি নাই—এ বন্ধনের কে শেষ নাই? পোঁপে দুই শত বৎসর পূর্বে এক মহত্ত্বের জাতি দলে দলে মরণ বরণ করিয়া ভবিষ্য জাতির মুক্তি কামনা করিয়া গিয়াছে। তাহার পর এক শত বৎসর গিয়াছে, বন্ধন শিথিল হয়



নাই, জাতির খনি বন্ধিমুক্ত আবার ডাকিয়াছেন—“আমার মনকামনা কি সিদ্ধ হইবে না?” কি জানি, বিধাতার কোন্ অভিশাপে জাতির মনকামনা সিদ্ধ হয় নাই। তবে যুব-ভারতের তত্ত্বা ভঙ্গ হইল। মাত্র প্রাণবলির স্বল্প নহে, একান্ত দেশপ্রাণে প্রবুদ্ধ হইয়া যুব-ভারত “আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরের” অত্যুগ্র সাধনায় ত্রুটি হইল। পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেল। জাতি আবার বন্ধন-বেদনায় আর্তনাদ করিল। ৫০ সালের মমন্তর আসিল। দলে দলে নব-নারী আবার কটপতঙ্গের মত মরিল। জননী চামুণ্ডা অনাহারে ক্ষুধ যুগ যুগ প্রহার-গীড়ন-বেদনাতুর সন্তানের কঙ্কাল-করেটি ভুজিত হইয়া ছড়ার করিলেন—ময় তুংখা হুঁ। দেশের দিকে দিকে শ্মশান-মশানের নিভৃত কন্মর বনানী হইতে সর্ব্বশ পণ করিয়া আবার নতুন জাতি “স্বাধীনতা দিবসে” মাতৃপূজার মন্ত্রোচ্চারণ করিল—বলে মাতরম্।

পরামর্শদান বৃথা

আড়াই বৎসর পূর্বে আমেরিকার উইলিয়মস্ কলেজের Woodrow Wilson Professor of Government লক্ষ্যপক



ক্রেডরিক, এল, প্রেরমান যুবু ভারতের বর্তমান অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে এমো-স্যান্ডন জাতিকে যে উপদেশ দিয়া পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন—Freedom and Democracyর আওতাধারদের আমরা আবার তাহা স্তনাইয়া দিতে চাই। অধ্যাপক প্রেরমান সিথিয়াছিলেন—“পশ্চবলে শাসিত ও বিপ্লব-বিগ্রোহে বিক্ষিপ্ত ভারত সর্বজন-শত্রুর প্রতিভৃষরপ। ইংরেজ মার্কিন সৈন্ত ভারতকে রক্ষা করিতে পারিবে না কখনও। আজ আমেরিকার উদাসিন্তে কাল যদি ভারত আমরা হারাই, তাহা হইলে চীনের পরাধীনতা অবশ্যজাবী; তাহা হইলে তাহাতে হইবে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্য এশিয়া শক্তি-বর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া, তাহা হইলে রুশসৈন্তকে বুঝালের পশ্চাতে সমিয়ার্থ হইতে বাধ্য হইতে হইবে। ইহার ফলে বুটনের অদৃষ্টে আছে—

শত্রুর অভিযান, আর আমেরিকার অদৃষ্টে—বিশ্ব যাহারা গ্রাস করিবে তাহাদের সহিত অবিরাম নিখিল যুদ্ধ। “বুটিশ-কারাকক্ষে একটি ভারতবাসীও যদি আবদ্ধ থাকে, একটি ভারতবাসীও যদি বুটিশ-বেত্রাঘাতে আর্তনাদ করে, একটি ভারতবাসীও যদি বুটিশ-বন্দকের গুলীতে মরে, তাহা হইলে বিশ্বের কোটি কোটি অশ্বৈত নব-নারীর নিকট সে হইবে দাক্ষ-নৈরাশ্রের প্রতীক। এই সব মুক অপেক্ষমাণ নবনারী শুধন বুঝিবে,—ভুল করিয়া হইলেও, এ সিদ্ধান্ত তাহারা করিয়া বসিবেই যে, পশ্চিমের সাধা লোকগুলি মুখে মিথ্যে, কাজে দুঃ। তাহারা বলিবে, প্রতিবন্দী গীড়ক জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে অশ্বৈত জাতির করণীয় কিছুই নাই। তাহারা বলিবে, ডিমোক্রাটিক ধার্মাবাজীর অপেক্ষা এশিয়া উদ্ধতা হয়ত তত অসহ্য নাও হইতে পারে।”

বুটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠী ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির সমপর্যায়ভুক্ত সমান অধিকার ও সম-স্বাধীনতা-সম্পন্ন মুক্ত ও স্বতন্ত্র ভারত যাহাতে বুটিশ রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত সমরে—শান্তিতে সংযুক্ত রহিতে পারে, তচ্ছত্র অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের প্রস্তাব করিয়া অধ্যাপক উপসংহারে বলিয়াছিলেন—“এ সুযোগ এড়াইলে পরাজয় বরণ করিতে হইবে। এ সুযোগ অবলম্বন করিলে বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হইবে। বিশ্বের নবনারী বুঝিবে, মিত্ররাষ্ট্রবর্গ স্বাধীনতা পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারে। আমরা যে বাঁচিয়া টিকিয়া থাকিবার উপযুক্ত, তাহার অগ্র-পরীক্ষা আজ ভারতবর্ষে। এখানে পরাজয় হইলে পরাজয় সর্বজন। মাত্র এখানে সাফল্য হইলেই মার্কিন রাষ্ট্রপতির এ বাণীর আশ্চর্যকতা প্রমাণিত হইবে—অন্তঃগর মাছুষের অধিকার সম্বন্ধে মাছুষকে নিশ্চিন্ত করিতে মিত্ররাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত আমাদের লোকবল বেধন আছে শক্তিও আছে তেমনি।”

সে সময় মার্কিন বিশিষ্ট সাংবাদিকরা বলেন, “মুক্তি-প্রিয় প্রত্যেক মার্কিনবাসী আশা করেন যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের এই গুরু সমস্তার কার্যকরী সমাধানে উপনীত হইবার জন্য মার্কিন সরকার সর্ববিধ চেষ্টা করিতেছেন।”

কিন্তু সে চেষ্টার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আটলান্টিক চার্টারের যুবুধ কাটিবার পর, প্যাসিফিক চার্টার দেখা গিয়াছে। পরাধীন ভারতের আশ্রয় ইং-মার্কিন ধনিক, বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী

কিন্তু সে চেষ্টার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আটলান্টিক চার্টারের যুবুধ কাটিবার পর, প্যাসিফিক চার্টার দেখা গিয়াছে। পরাধীন ভারতের আশ্রয় ইং-মার্কিন ধনিক, বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী

জাতি। ইহা দ্বারা ভারতকে মাত্র প্যাসিকাই করিয়া তাহারই সমস্ত
বিষয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িতে বলিতেছে।

সার্জেন্ট-পরিকল্পনা

লর্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারত
সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডাঃ জন সার্জেন্ট বলেন—
“কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে, আদর্শ
শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন তাহার লক্ষ্য নহে। ভারতবর্ষ বাহ্যতে
শিক্ষা বিষয়ে মোটামুটি অস্বস্তি দেশের সমান স্থানে উন্নীত হইতে
পারে, তৎক্ষণ্য নিরন্তর কার্য রচনাই এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য। বৃহৎ
মিটিয়া বাওড়ার পর শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা
করিবার সময় আসিয়াছে। সেই জন্য বৃহৎ চাপিতে থাকার সময়ই প্রস্তুত
হইতে হইবে বলিয়া বোর্ডের নিকট দাবী জানাইয়াছি। ভারতকে
শাস্ত্রাত্মকভাবে পরিচালনা করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নহে।—তাড়াতাড়ি
এক ব্যাপক ভাবে পরিকল্পনাই অমূল্যবান করা বাইবে না, এ দেশে
এইরূপ একটা নৈরাশ্রের ভাব দেখা যায়। অপর দেশে বাহ্য
সম্ভব, এ দেশে তাহা সম্ভব নহে, এই ধারণা জাবী উন্নতির পক্ষে
ক্ষতিকর। ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা পরিবর্তন আনয়ন করিতে
হইবে। শিক্ষা সকল শক্তি ও সকল কল্যাণের উৎস। কিন্তু ইহা
ব্যর্থ হইবে না হইলে অকল্যাণের কারণ হইতে পারে। প্রগতির
শক্তি সংগ্রহ হইলে চরম জয়ের পথে চলার সুযোগ পূর্ণাঙ্গের
বৈশিষ্ট্য আসিবে, আধুনিক আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে ইচ্ছায়
হউক, অনিচ্ছায় হউক, নিবিড় বান্ধনে বাঁধিতেছে। জাতীয় স্বাধীনতা
ভাল জিনিষ, কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্যৎ যদি নির্বীত হয়, তবে
জাতীয় স্বাধীনতাও আসিবে।

আমি রাজনীতিবিদ নহি। তবে মনে-প্রাণে আমলাতান্ত্রিক-
নীতিও সমর্থন করি না। শাসননীতি বেরুই হউক, উহা ভাল ভাবে
প্রযুক্ত হইলেই ভাল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন প্রতিযোগিতা
চলিতেছে, তখন শিক্ষার বিষয়ে এ দেশ অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে
পারে না।”

সার্জেন্ট পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের দু’একটি বক্তব্য আছে।
শিক্ষাপ্রণালী যদি দেশের আবহাওয়ার সহিত খাপ না খায়, তাহা
হইলে সে শিক্ষার দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। বৃটিশরা
ভারতের শিক্ষার জন্য কতটুকু করিয়াছে তাহা সুবিদিত। বিশেষ
গভর্নমেন্টের নিকট ইহার চেয়ে অধিক কিছু আশা করা যায় না।
ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ। ধরতের সিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রণালীর
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিলাতে যে ধরণে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়,
ভারতে তাহা মোটেই কার্যকরী হইতে পারে না। সে দেশে শিক্ষার
ব্যয় বহন করে সরকার, আর আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ব্যয়ভারই
হয়ন করিতে হয় দরিদ্র দেশবাসীদের। রাশিয়ারেও গণশিক্ষার
জরুর আমাদের দেশের মতই ছিল, কিন্তু তাহারা অতি শীঘ্রই তাহা
হ্রস্ব করিতে পারিল। কেন? কারণ তাহারা বাবীন জাতি। জাতীয়
গভর্নমেন্টের হাতে শিক্ষার ভার।

শিক্ষার, ব্যবসায়, বিজ্ঞানে, যে কোন পথে ভারতের প্রকৃত উন্নতি

প্রয়োজন। নতুন পরিকল্পনা কাগজেই রসোয়ত্বের হইল, কারে
তাহা হইতে কোন ফলই ফলিবে না।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসের মৃত্যু

উড়িষ্যার কুতূর্ণ প্রধান-পরিচ ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত বিশ্বনাথ
দাস ১৩ই জানুয়ারী সন্ধ্যার বহরমপুর (গঙ্গায়) জেল হইতে মৃত্যু
লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবাসীই আনন্দিত
সাধারণতঃ জেল হইতে মুক্তিলাভের পর এমন সব নিরাক-কাল্পনে
বাঁধাবাধি থাকে যে, মৃত্যুর মৃত্যু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক
ক্ষেত্রে জেলের দ্বারদেশেই নতুন পরোয়ানা দেখাইয়া আবার জেলে
ফিরাইয়া আনা হয়। আমাদের সৌভাগ্য যে, জেলের দ্বারে তাহায়ে
সেইরূপ কোন পরোয়ানা দেখান হয় নাই।

ভারতের বৈজ্ঞানিক উন্নতি

সমগ্র পৃথিবীবাসী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।
বস্তুতঃ, সময় থাকিতে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, যুদ্ধের পর
বেরুপ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গণ্ডগোল চলিবে তাহাতে পূর্ন
হইতে প্রস্তুত না হইলে সমুদ্র বিপদের সম্ভাবনা। ভারতের বর্তমান
দৈহ ও অনগ্রসরতা দূর করিতে হইলে সর্ব দিকে বিজ্ঞানের সাহায্য
লইয়া যুগোচিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক
অধ্যাপক হিলের ভারত-ভ্রমণ ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের বুটেন-সফর—
মনে হয় তাহারই পূর্বসূরী। হস্ত সময় লাগিবে, কিন্তু ভারতবাসীর
ধৈর্যের অভাব নাই। এত বড় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অল্প, বহু, ঔষধ-
পথ্যের অভাব সবই তো সহ্য করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতের
উন্নতি দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিবে।

হিল সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতিবিধান
প্রচেষ্টার সদর ষাটীকূপে বুটেনে একটি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক
সমিতি স্থাপন করিতে হইবে এবং এই সমিতিই ভারতবর্ষস্থিত
শাখা-সমিতিগুলিকে পরিচালিত করিবে। কৃষি, বাহ্য, যানবাহন
প্রভৃতির বিস্তার, উন্নতি, নব নব কলকারখানা স্থাপন, এক কথায়
বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সর্বাত্মক উৎকর্ষ বিধানই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য সাধু সম্ভব নাই, এবং ফলও যে ভাল হইবে তাহাও
স্বীকার করি, কিন্তু। এই কিন্তু লইয়াই গোলযোগ বাধিয়াছে।
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো না বদলাইলে এই
প্রচেষ্টা যে কত দূর কার্যকরী হইবে তাহা বলা শক্ত। ভারতে
প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই, কিন্তু সেই সম্পদ কাজে লাগাইবার
হুকুম নাই। প্রথমেই ভারতের এই আশেপাশ-নিবেশের শুল্ক দূর
করিতে হইবে। দ্বিতীয়, ভারতের মূলধনে এক সম্পূর্ণরূপে ভারত-
বাসীর দ্বারা ইহার পরিচালনা করিতে হইবে। তবেই লভ্যকার
উন্নতি ও কল্যাণের পথে ভারতের বাস্তব সার্থক হইবে, নতুন নহে।
বৈজ্ঞানিক হিল সেইরূপ কোন আভাস-ইঙ্গিত দেন নাই। অবশ্য
বেদনকারী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এরূপ আভাস দেওয়া সম্ভবও নয়।
বৃটিশ বড়কর্তাও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভীক।

ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহার কথা মনে পড়িয়া
গেল। বুটেন প্রবাসকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতের

ভারতবাসীর হাতে না আসিলে সত্যকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি কোন মতেই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক ভারতবাসীরই এই মত।

কিন্তু আমাদের মতে তো আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় না, হয় কৃষ্টি-কর্তাদের মর্জিতে।

দেশাই-লিয়াকৎ-ওয়ার্ডেল আলোচনা

সুখবর 'ওয়ার্ডেল' হইলেও সুখবোচক। ভারতবর্ষের অচল অবস্থার সমাধান হইবে। সত্য হউক, ভুল হউক, তবুও প্রাণে আশা, আনন্দ। বহু বার এইরূপ ধরন আমরা পাইয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, ঠিকিয়াছি, তবুও সমাধান আসিল শুনিতে আনন্দিত হই, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। সম্প্রতি পঞ্জাবের এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, শ্রীমত, বড় জোর এক সপ্তাহ অর্থাৎ নয় দিনের মধ্যে ওয়ার্ডেল-দেশাই মূল্যাক্তের ফলাফল জানিতে পারা যাইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীমত তুল্যভাই দেশাই ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খানের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট বৃথা-পড়া হইয়া গিয়াছে এবং বড়লাট উভয়ের সম্মত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা ও বিবেচনার ফলে না কি দেশে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুসুধ-প্রসারী ফল ফলিবে। কি ফলিবে জানি না, তবে অনেক দূর যে গড়াইবে সে কথা জানি।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুক্তি

একটি প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি দিয়াছেন। গত আট মাস যাবৎ তিনি পেটের পীড়ার ও অর্শ্বরোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বহু পূর্বেই ধারাপ হইয়াছিল। স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি আরও পূর্বে দিলেই মুক্তিবৃত্ত কাল হইত। এ যেন অনেকটা নিরুশাষ হইয়া আপন বিদায়ের মত মনে হইতেছে। একান্ত অন্তঃস্থ বলিয়াই বোধ হয় বিনা সন্দেহে মুক্তি!

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কার্যকর সমস্তদের মধ্যে এ যাবৎ শ্রীবৃত্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সৈয়দ মামুদ এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষই কেবল মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

বোম্বাই পরিকল্পনা

মহাযুদ্ধে বিশ্বস্ত ও সর্বোচ্চ দেশগুলির সমুখে বর্তমানে যে সমস্ত গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে তাহা—যুদ্ধ-পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সামাজিক পুনর্জীবনের সমস্যা। ভারতবর্ষের নিকট এই সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভবিষ্যতে ভারতের যে কোন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনার সহিত তাহার রাজনৈতিক দলতন্ত্র ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক দলতন্ত্রের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ আর্থিক পরিকল্পনাই পার্থক্য হইতে পারে না। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে হইলে আমাদের তাহার পূর্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা প্রয়োজন।

বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা এই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন কি না আমরা জানি না, তবে এ সম্বন্ধে

ব্যাপার 'বাবিন' একটি জাতীয় সরকারের দাবীতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা মনে করেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই যথেষ্ট হইবে, রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ কাম্য হইলেও তাহার আশ্রয় প্রয়োজনীয়তা তেমন নাই। আমাদের বিশ্বাস, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ কৃত্তি অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা করনাবিলাস মাত্র।

বোম্বাই পরিকল্পনাদ্বারা—১৫ বৎসরের মধ্যে জাতীয় উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার জন্য সর্বক্ষেত্রে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা মূলধন প্রযুক্ত করিতে হইবে। শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতুশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণগুলির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রয়োজন স্বীকার করা হইয়াছে। বনিয়াদী ও গুরু-শিল্পের প্রসার ব্যতীত জাতীয় শিল্পায়ন কখনই সম্ভব নহে। কৃষ্টি সাধারণ্যবাদ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই বনিয়াদী শিল্পের প্রতিষ্ঠার ও প্রসারে কোন প্রকার সহায়তা করেন নাই, পদে পদে আমাদের দেশীয় শিল্প-নায়কদের ব্যবসায় প্রচেষ্টার তাহার প্রচণ্ড বাধা দিয়াছেন। এমন কি এই যুদ্ধের মধ্যেও, যখন ভারতবর্ষের যুদ্ধের প্রয়োজনেই এই সকল গুরু-শিল্পের প্রসার একান্ত ভাবে প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তাঁহারা যুদ্ধপ্রচেষ্টা বাস্তব হইবার অঙ্গহাতে ভারতীয় শিল্পনেতাদের এই কার্যে বাধা দিয়াছেন। ওয়ার্ল্ডট্রাড হীরাটাদের 'অটোমোবাইল শিল্প' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার পরিণতি কি হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাদের বনিয়াদী শিল্প-প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে প্রশংসনীয় হইলেও রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ ব্যতীত তাঁহারা আসলো এই ইচ্ছা পূরণের পক্ষে অগ্রসর হইতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের যথেষ্ট সম্ভাব্য কারণ বহিয়াছে।

বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা গুরু-শিল্পের গুরু উপলব্ধি করিলেও এই সকল শিল্পের নিয়ন্ত্রণ-ভার ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হইবে কি না তাহা তাঁহারা এড়াইয়া গিয়াছেন। অথচ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার পরিকল্পনার কথা উঠিলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ দায়িত্বের কথা এড়াইয়া বাতুল্য অর্থহীন। অর্থনীতির যে কোন ছাত্রই জানেন, বনিয়াদী ও গুরু-শিল্প রাষ্ট্রীকরণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হইবে।

কংগ্রেসের 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' বাহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা তাহা নির্বিশেষে এড়াইয়া গিয়া স্ববুদ্ধির পরিচয় দেন নাই।

ইহা ব্যতীত বোম্বাই পরিকল্পনার প্রথম ভাগে বটন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নাই। সেই মারাত্মক ক্রান্তি সম্মুখিত প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগে খণ্ডন করা হইলেও বটন-ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা আসলো সম্ভাব্যজনক নহে। প্রত্যেকের জীবনব্যাপার একটি নিয়ন্ত্রণ জাল্য মান থাকিবে এ কথা বলা হইয়াছে, অথচ প্রত্যেক সুস্থ ও সবল ব্যক্তির কাল করিবার অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ জাল্য পারিক্রমিক ও বেতনের দাবী তাঁহারা কোথাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহাদের সহক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যে সময়ে প্রত্যেক সুস্থ, সবল ও যোগ্য ব্যক্তির কাল করিবার বা পাইবার কোন নিষেধাজ্ঞা নাই সে সময়ের কোন পরিকল্পনাকে প্রকৃতি অনুসরণীয় বলিয়া

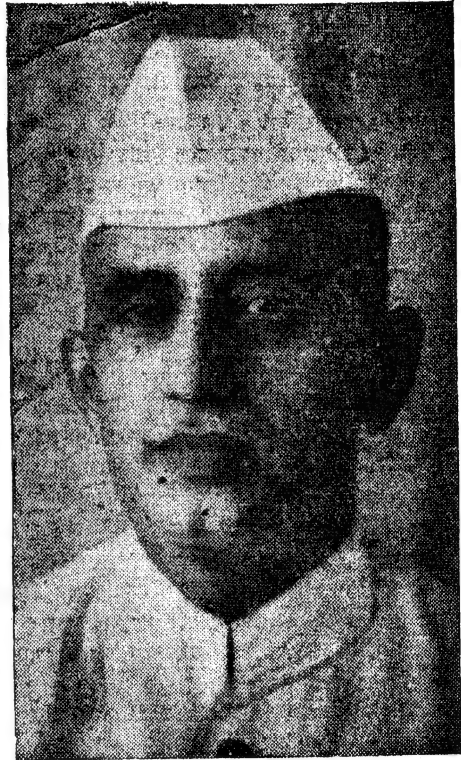
দ্রষ্টব্য থাকিতে পারে না। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা সর্বসাধারণের এই অধিকার ও নির্বিঘ্নতার দাবী পূরণ করা তাঁহাদের 'চমক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যে কোন অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা ইহাই প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। পশ্চিম নেহেরু পরিকল্পনা সমিতির নিকট এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেন : "No social or economic structure which does not provide work and security to the people can endure." (Red Book No. 4, National Planning Committee).

বোম্বাই পরিকল্পনার উপপাদন ও বর্জন-ব্যবহার এমন কয়েকটি রাষ্ট্রক ক্রটি রহিয়াছে যে, দেশের ও সমাজের সর্বাত্মক উন্নতিকল্পে তত কোন জাতীয় পরিকল্পনা তাহা থাকা উচিত নহে! ইহা তীত বিরাট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সমাজ রহিয়াছে। সেগুলির সমাধান ব্যতীত কোন জাতীয় পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে না। বোম্বাই পরিকল্পনায় অনেক জটিল সমস্যার বিস্তারিত গান আলোচনা করা হয় নাই। তাই মনে হয়, বোম্বাই পরিকল্পনা। ত শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্যের কসরতে পরিণত হইবে। মূলধনের মোটা মোটা অঙ্ক অবাস্তব গাণিতিক সংখ্যায় পর্যাবসিত হবে। কিন্তু দেশের চিত্তাশীল ব্যক্তিগণ ও শিল্প-নেত্রগণ এখন পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সে স্বপক্ষে চিত্তাশীল তখন এই পরিকল্পনার গঠনমূলক সমালোচনা করিয়া থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তাহাকে প্রচুরী করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য।

ভারতীয় সংবাদপত্র ও স্বাধীনতা

গত ২৭শে ও ২৮শে জাছুয়ারী 'বোম্বাই কনিকুল' পত্রিকার শাদক সৈয়দ আবদুল্লাহ ব্রেজভীর সভাপতিত্বে কলিকাতার নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত প্রায় ১২৫ জন প্রতিনিধি বোগদান করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদপত্রের স্বাধিকারিগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। দা অধিবেশনের সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহরণকারী যুদ্ধকালীন নানা প্রকার জরুরী প্রেস আইনের শি-নিষেধের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতীয় সংবাদপত্র-লিকে এই ভাবে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার দক্ষ ভারতীয় জনমত প্রকাশকদের স্বাভাবিক পক্ষে ন্যূনতম হইতেছে না এবং বৃটিশ সরকার ই সব আইন প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের বহু-বিজ্ঞাপিত গণতান্ত্রিক প্রতীতি আত্মগত্যা প্রশ্রয় করেন নাই। মহাযুদ্ধের সময় জরুরী প্রেস আইনের হস্ত ত কিছু আবশ্যকতা আছে, কিন্তু বৃটিশ সরকার যে ভাবে এই সব আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে ভাবে তাহা সাহে সেগুলির অপপ্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে যুদ্ধ পরিচালনার প্রদর্শনের প্রতি তাঁহাদের কোন নিষ্ঠারই পরিচর পাওয়া যায় না। লেও ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যুদ্ধের রাষ্ট্র, কিন্তু সেখানে ভারতীয় জরুরী প্রেস আইনের মত কোন আইন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জনমতের প্রকাশ করিবার জন্য রচিত হয় নাই। কারণ তাহারা স্বাধীন, মান বিদেশী শাসকশাসী প্রভৃৎ তাহাদের মানিয়া চলিতে হয় না।

তাই তাহারা স্বাধীন ভাবে নিজদের জীবনের ও জাতির নানাপ্রকার সমস্যার স্বাধীন আলোচনা করিতে পারে এবং শ্রু ও স্বাধীন জনমত এই সব দেশে গড়িয়া ও ওঠে। জাতির কল্যাণের জন্য সর্বাত্মক প্রয়োজন দ্বারা জাতির কর্তব্যের স্বরূপ, সেই রাষ্ট্রনেতা ও সমাজ-নেতাদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এই সতর্ক দৃষ্টি জনসাধারণেরই রাখা উচিত, কারণ জনসাধারণই জাতির সদাঙ্গপ্রত প্রেরী। এই জনসাধারণের মতামত প্রকাশের দায়িত্ব জাতীয় সংবাদ-পত্রের। এক দিকে সংবাদপত্র যেমন জনমতের বাহক, তেমনি আর



মিষ্টার এস এ ব্রেজভী (মূল সভাপতি)

এক দিকে জনমতের ব্যাণ্ণকামী অভিভাবকও বটে। কিন্তু যে দেশ পরাধীন, যে দেশে আজও বিদেশী বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে উত্তর রহিয়াছে, সে দেশে সংবাদপত্রে স্বাধীনতাই বা থাকিবে কি করিয়া এবং সবল ও স্বাধীন জনমতই বা কেমন করিয়া গঠিত হইবে? ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমস্যা তাই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এবং জাতীয় স্বাধীনতালাভ ভিন্ন ভারতের জাতীয় সংবাদপত্রের মুক্তিও সম্ভব নহে, প্রসারও সম্ভব নহে।

মহাকবি মিল্টন বলিয়াছিলেন, "Give me the liberty to know, to utter and to argue truly according to conscience, above all liberties." স্বাধীন দেশের মহাকবিকেই এখন এক দিন এই আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল, তখন

রাষ্ট্রীয় দেশের জনসাধারণের কোন বিষয় জানিবার, মতামত প্রকাশ করিবার অথবা নিজের বিবেকের আদেশ অনুযায়ী বিতর্ক বা দাওয়াবাদ করিবার স্বাধীনতা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে?

আজ তাই ভারতীয় সংবাদপত্রের সমুখে সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা হইতেছে। এই জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যা, কারণ জাতীয় স্বাধীনতা ভিন্ন বিদেশীয় রবারে জাতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্ত আবেদন করা বাতুলতা। ভারতের সাংবাদিকগণ যেন এই কঠিন সমস্যা ও দায়িত্বের



শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)।

খ। আজ ডুলিয়া না যান। ইতিহাসের এই অপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে ন পৃথিবীর জনসাধারণ তাহাদের স্বাধীনতা লাভের জন্ত স্থিরচিত্তে, যবক ভাবে, ভোলাভেদ ও বৈষম্য ডুলিয়া গিয়া সংগ্রাম করিতেছে, ন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কারাগারে বন্দী এবং রতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনীতিকগণ পারম্পরিক দলাদলি ও বৈষম্যের ইন্ধন যোগাইতেছেন। আজ যদি ভারতীয় সাংবাদিক-র কোন অবশ্য-পালনীয় একমাত্র কর্তব্য থাকে, সে কর্তব্য তেছে এই ভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, ভারতের জাতীয় গঠনের জন্ত জনসাধারণের নিকট আবেদন করা, জনসাধারণকে সম্বন্ধে সচেতন করা এবং জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্ত দৃঢ় গঠন করা। আমরা আশা করি, ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ এই কর্তব্য পালনে পক্ষাঘাত হইবেন না।

নিঃ ভাঃ সংঃ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(১) সম্মেলন দাবী করিতেছে যে, ভারতে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ করা হউক এবং এই উদ্দেশ্যে জরুরী প্রেস আইন ও রাজস্ববর্গের অধিকার রক্ষা আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন এই অনুযায়ী সংশোধন করা হউক।

মিঃ টি কে ঘোষ প্রস্তাব করেন এবং মিঃ জে. এন. সাহনী সমর্থন করেন।

(২) যুক্তশেষে যে সকল জাতি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবেন, তাহাদের দায়িত্বশীল সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে সমান ভাবে সংবাদ সরবরাহ করা হইবে, বিনা সেন্সারে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে দিতে হইবে, সংবাদপ্রাপ্তির ও সরবরাহের সমান সুযোগ থাকিবে এবং ইহার একই পরিমাণ অর্থ চাজ করা হইবে—যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশক-দিগের এই দাবী সম্মেলন সমর্থন করিতেছে।

মিঃ এ ডি মণি প্রস্তাব করেন ও মিঃ এ এস আয়েজার সমর্থন করেন।

(৩) কাগজ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্তর্বিধ প্রয়োজনে বিশেষ করিয়া যে সকল সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের মতামত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে, তাহাদের প্রচার রোধের জন্ত কাগজ নিয়ন্ত্রণ অর্জিট্যান্স যে ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে, সম্মেলন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে।

এই উদ্দেশ্যে এবং কাগজ সরবরাহের উন্নততর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সম্মেলন কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ শিথিল করিয়া চাহিয়া অনুযায়ী সরবরাহ করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছেন। যে সকল সাপ্তাহিক ও অর্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দৈনিক পত্রে পরিণত হইতে চায়, এই ভাবে তাহাদিগকে সুবিধা দিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

মিঃ এ এস আর চাবী প্রস্তাব করেন এবং মিঃ কে সত্যনারায়ণ সমর্থন করেন।

(৪) সাংবাদিক ডক্টর এ জি টেতুলকার তাঁহার মারাত্মক সাপ্তাহিক বেলগাঁওয়ের 'বার্ডা' পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্ত ১৯৪০ সালের ১১ই জুন হইতে বোম্বাই গবর্ণমেন্টের আদেশে বন্দী আছেন, তাঁহার প্রাণনা অনুযায়ী আইন আনুসারে বিচারের সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই, সম্মেলন হুঃখের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেছেন। বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে ইহা জানাইবার জন্ত সম্মেলন মিঃ এস এ ব্রেলভী, শ্রাব শ্রাবিস লো, মিঃ কে জীনিবাসন, মিঃ জে এস ক্যাণ্ডিকার এবং মিঃ এইচ আর মোহারীকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিতেছেন।

মিঃ এইচ আর মোহারী প্রস্তাব করেন এবং মিঃ জোয়াকিম আলভা এবং মিঃ এম বি সানো প্রস্তাব সমর্থন করেন।

(৫) এই সম্মেলন ১৯৪২ সাল হইতে লাহোর সেন্টাল জেলে আবদ্ধ দিল্লীর দৈনিক 'ভেজ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর মিঃ দেশবন্ধু গুপ্ত এবং এল এ, লাহোর 'প্রতাপ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর মিঃ বীরেন্দ্র, 'ভারত' পত্রিকার মাখনলাল সেন, 'হিন্দুস্তান ট্র্যাভার্স' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকার মনোহরন ও, মন্দির রায়, অধিনী গুপ্ত,

ফেস্বেল সেন এবং কেশব ঘোষ 'সংহতি' পত্রিকার সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, 'নিব-উড়িয়ার' মধুসূদন মহাপাত্র, বারাগদীর কমলাপাতি ত্রিপাঠী, 'অজু' পত্রিকার পণ্ডিত কালকূট শর্মা ও মিঃ জয়ন্ত-ইহাদের স্বাস্থ্যের ক্রম-অবনতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। জেলে তাঁহাদিগকে যে সকল ডাক্তারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা অবস্থার অবনতি নিবারণ হয় নাই, এই জন্ত সম্মেলন তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে গবর্ণমেন্টকে অতুরোধ করিতেছেন।

যে সকল সাংবাদিক বিনা বিচারে আবদ্ধ আছেন, সম্মেলন তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে তাঁহাদের স্বীয়-স্বীয় গবর্ণমেন্টের নিকট অতুরোধ জানাইতেছেন।

মিঃ দেবদাস গান্ধী প্রস্তাব করেন এবং এস এন ভাটনগর সমর্থন করেন।

(৬) মিঃ ডাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কতকগুলি সংবাদপত্র সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন আশংকা নাই। ঘটিলেও গবর্ণমেন্ট অনির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত উক্ত অর্থ জমা রাখিয়াছেন। নূতন যে সমস্ত সংবাদপত্রের নিকট হইতে জামানত তলব করা হয়, তৎসম্পর্কে আইনে এইরূপ বিধান আছে যে, যদি তিন মাসের মধ্যে উহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তাহা হইলে উহাদিগকে জামানতের টাকা প্রত্যর্পণ করা যায়। সম্মেলন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, পুরাতন সংবাদপত্র সম্পর্কেও জামানত সত্ত্বে অতুরোধ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হউক।

শ্রীযুত মিঃ আর শ্রীনিবাসন উক্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং তাঁর কালিঙ্গ লো উহা সমর্থন করেন।

(৭) 'জাশনাল হেরাল্ডের' পুনঃপ্রকাশের অস্বাভাবিক গবর্ণমেন্ট প্রত্যাখ্যান করার সম্মেলন গবর্ণমেন্টের উক্ত কার্যের নিন্দা করিতেছে এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে উক্ত পত্রের পুনঃপ্রকাশ বাহাতে সম্ভবপর হয় তাহা দ্রুত অবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিতেছে।

সংবাদপত্র ব্যক্তিগত বিবেচনাপ্রণোদিত বিষয়ের অবতারণার নিন্দা করিয়া অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবগুলিকে যদি কাৰ্য্যে পরিণত করা যায় তাহা হইলে দেশের ও সংবাদপত্রের যে অনেক উপকার হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাংবাদিকগণের বেতনের হার বৃদ্ধির জন্ত যে বাধ্যবদ্ধতা চলিতেছিল এবং প্রাদেশিক ভাষার সংবাদপত্রের সহিত ইংরেজী সংবাদপত্রের কমান্বয়ের বেতনের যে পার্থক্যের বিরুদ্ধে ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাহার কি মীমাংসা হইল আমরা জানিতে পারিলাম না। বাঁহারা জাতীয় সংবাদপত্রের কল্যাণ ও প্রসার কামনা করিয়া স্বদীর্ঘ বন্ধুতা দিলেন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত কি কারণে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষার প্রকাশিত সংবাদপত্রের সাংবাদিক কমান্বয়ের প্রতি উদাসীন হইলেন আমরা সামান্য বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রাজভাষার সংবাদপত্রের মধ্যমা কি বেশী? ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে কি ইংরেজী ভাষাই জনসাধারণ ও জাতীয় ভাষা হইবে, না হিন্দী, উর্দু, বাংলা, তামিল প্রভৃতি ভাষাই জনসাধারণের ভাষা ও জাতীয় ভাষা হইবে? যদি ইংরেজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা না হয়, তাহা

হইলে জাতীয় ভাষার প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্রের উন্নতির জন্ত বেশী সচেতন হওয়া উচিত নহে কি?

অধ্যাপিকার কৃতিত্ব

লেডী ড্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা অসীমা মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি, এস, সি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি, এস, সি। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুত জে, কে, দত্ত, মহাশয়ের কন্যা কুমারী গীতা দত্ত এ বৎসর ইন্টার-মিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় সংকুল বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে



প্রথম স্থান অধিকার করার মাসিক ১৫০ টাকা হিসাবে গবর্ণমেন্ট বৃত্তি পাইয়াছেন। আমরা এই কৃতী ছাত্রীর দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

শোক-সংবাদ

বিচিয়ার পরিচালক-সম্পাদক, প্রেসিডেন্সী ও রিপন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ সুরীলাজ মিত্র মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বরীন্দ্রনাথের সহিত যুরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা এক জন প্রতিভাশালী অধ্যাপক ও সাহিত্যিক হারাইলাম।

অপরিসীম শিত-সাহিত্যিক স্ববিনয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। কত গল্প, কত প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বালক-বালিকাদের একই সঙ্গে হাসি ও জ্ঞানের খোরাক জোগাইয়াছেন। বনামধ্যাত সত্বে রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞান, স্ববিনয় রায়চৌধুরী সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার পারিবারিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবাসিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৯৩০ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে 'বন্ধুত্ব' মাসিকের প্রকাশিত।

COOCH BEHAR



তারিখের যন্তোপাখ্যারের লোভে

১৩৫০

[শিল্পী—শ্রী দেবীপ্রসাদ সায়চৌধুরী]



আমার মত কতকটা তোমাদের বলতে চেষ্টা করব। এ কথা আমি স্বীকার করি যে, যুগে যুগে নতুন ক'রে ধর্মোদ্ভাসনা আসে। কিন্তু জগতে আজ তেমনি এক উদ্ভাসনা আছে। প্রত্যেক যুগেই ধর্মজাগরণে অসংখ্য দল জাগে। বুদ্ধবৃন্দগুলো দেখতে একই রকমের।

এর পেছনের আকাজকাও একই রকমের। এ যুগে যে ধর্মভাব লোকদের মধ্যে ক্রমে প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার বিশেষত্ব এই যে, স্পষ্ট চিন্তা-বর্ণির উদ্দেশ্য এক—ভগবদর্শন, তাঁকে দেখবার ব্যবহার আকাজকা। দেহগত, নীতিগত, ধর্মগত এবং সর্ববস্তুর ক'রে দেখে অথও সত্যকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার একটা বাসনা। সবাব মধ্যে জেগেছে। এ যুগের তাই সব আন্দোলন জ্ঞাত বা গীতসারে অর্ধেক বেদান্তের মহা দার্শনিক আদর্শের পথে চলেছে। সর্বদাই বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন চিন্তা-বুদ্ধির মধ্যে মিল-সংঘাতে জয়ী হয় মাত্র এক বুদ্ধি। অজ্ঞ সব বুদ্ধি জাগে মহাতরঙ্গের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিতে। এই তরঙ্গ প্রতিরোধ শক্তিতে সমাজে আসে প্রাণ।

যে সব দেশের কথা আমি জানি, ভারত, আমেরিকা বা ইংলণ্ড দেশেই দেখছি, শত শত ভাবুকের মনে বিপ্লব এসেছে। তে বৈতবাদের অবসান হ'তে চলেছে, মাত্র অর্ধেকবাদ এখানে ছ শক্তির প্রতিষ্ঠা। আমেরিকায় বহু আন্দোলন প্রবল হয়ে :। এর সবগুলোতেই কম বেশী অর্ধেক ভাব। আমি বেশ ত পেয়েছি, এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটিমাত্র অজ্ঞ সব-পক্ষে গ্রাস ক'রে আপন শক্তি প্রতিষ্ঠা করবে; কিন্তু এ কোন্ পালন ?

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, শক্তিমানই বেঁচে থাকে। এই র উপযুক্ততা চরিত্র-প্রতিষ্ঠা ছাড়া কি ক'রে হয় ? চিন্তাশীল হর ভাবী ধর্ম যে হবে অর্ধেক, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ন বার চরিত্রবলে শক্তিমান হবে তাদেরই হবে জয়। হয় ত হতে পারে, কিন্তু হবেই।

বাবার
স্বামী বিবেকানন্দ



আমার নিজের অভিজ্ঞতার এ কথা একটু বলি শোন। যখন ঠাকুর দেহ রাখলেন, তখন রইলাম কপর্দকহীন অজ্ঞাত আমরা জন বারো হুবক। আমাদের বিরুদ্ধে তখন শক্তিমান বড় বড় কত প্রতিষ্ঠান। ওরা আমাদের উদ্দেশ্যেই মেয়ে ফেলবার কত না চেষ্টা করেছে। কিন্তু

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের একটা মন্ত সম্পদ দিয়ে গেছেন—মাত্র কথা না ব'লে বাচার মতন ক'রে বাচার আকাজকীয় জীবন-মরণ সংগ্রাম করবার শক্তি। তাই আজ ভারত ঠাকুরকে চিনেছে, তাই ভারত আজ ঠাকুরকে ভক্তি করে। তাই আজ তাঁর শেখান সত্য দাবানলের মতন চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দশ বছর আগে তাঁর জন্মোৎসব করবার জ্ঞান আমি একশ' জনকেও জুড়িয়ে আনতে পারিনি। গত বছর ৫০ হাজার লোক এসে জমেছিল।

তোমার ঐ সংখ্যা, শক্তি, তোমার ঐ বিস্তৃত, বিস্তৃত, বস্তুতা কিছুই স্থায়ী হবে না, চাই পবিত্রতা, অমরত্বের আকাজকা, চাই অমৃত্যু। প্রত্যেক দেশে আপন-শৃঙ্খলমুক্ত সিংহের মতন কেশরী-চিত্র এমন মাত্র বারো জন ক'রে মাছুষ জাগুক; জাগুক তেমন বীর-যারা তাঁর স্বাদ পেয়েছে, জাগুক ঠটিকয়েক তেমন মাছুষ-বাদের সমস্ত চিত্র তাঁতে সমর্পিত হয়েছে; জাগুক তারা—যারা চায় না সম্পদ, চায় না শক্তি, চায় না ধন—দেখবে, এরাই বিশ্ব কম্পিত ক'রে তুলবে।

কৌশল ত' এই-ই। বোগদর্শনের শ্রী পতঞ্জলি বলেছেন—মাছুষ যখন অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তখনই তাতে হয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সে ভগবানের দর্শন পায়। সে স্বয়ং হয়ে যায় ভগবান। আর আপনি ভগবান হয়ে সে অজ্ঞকেও করতে চায় ভগবান। এই কথাই আমি প্রচার করতে চাই। মতবাদের ব্যাখ্যা চের চের হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকে পুঁথি লিখেছে, কিন্তু অজ্ঞান অন্ধশীলন একটু কি হবে না !

সমিতি-সংগঠন এ সব আপনি আসবে। যেখানে হিংসার কিছু নাই, সেখানে হিংসা জাগবে কি ক'রে ? অসংখ্য লোক আমাদের

কতি করতে চাইবে, কিন্তু ওতেই ত' প্রমাণ হবে যে, আমরা চলেছি সত্য পথে। লোকে বতই আমার বাধা দিয়েছে, ততই আমার শক্তি ব্যক্ত হয়েছে। আমার একমুঠো ধাবার সেরনি, খেদিয়ে দিয়েছে; কিন্তু তার পর দেখেছি, রাজা-রাজ্জারা আমাকে চরী-চুয়া খাইয়েছে, আমার পূজা করেছে। পুস্ত ও সাধারণ সমভাবে আমার তুচ্ছ করেছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ওদের সবারই ভাল হোক। ওরা আমারই আস্থা। ওরাই ত' আমার সাহায্য করেছে। ওদের থেকে বাধা না পেলে আমার শক্তি উঠু থেকে আরও উঁচুতে চড়তে পেরে না।

এক মহা রহস্ত আমি আবিষ্কার করেছি—ধর্ম নিয়ে বারা বঁকে মরে, তাদের শক্তি কবাব কিছু নেই। বারা সব বুকেছে, জন্মও কাল শূন্য নয়। বচনবাসী বঁকে মরুক। ওরা আর কি জানে। তারা নাম, বশ, কামিনী-কান্থন নিয়ে মত্ত থাকুক। আমাদের অমৃত্যু অর্জন করতে হবে, ব্রহ্ম পেতে হবে, ব্রহ্ম হ'তে হবে, উঠে পড়ে লাগ। বরণ কবুল, সত্য ছেড় না। জন্ম জন্ম সত্য ভাষার হয়ে উঠুক তোমাতে। অস্ত্রে কি বলে, তাতে মোটেই কান দিও না। তার পর জীবনভর চোঁয়ার একটিও—মাত্র একটিও বীর মসারের শেকল ভেঙ্গে মুক্ত হ'তে হবে, তবে আমাদের কর্তব্য শেষ—হরি ও!

আর এক কথা। কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ভারতকে আমি ভালবাসি। তবু প্রত্যহ আমার চোখ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আমাদের কাছে ভারত, ইংলণ্ড, আমেরিকায় ফারাক নাই। মুর্তা বাকে ভুল ক'রে বলে মাছুষ—সেই ভগবানের দাসাম্বাদাস, যে গোড়ায় জল ঢালে, সে কি আর গোটা গাছকেই জল দেয় না?

সামাজিক, রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলের মূলে ঐ এক কথা—আমি আর আমার ভাই এক, অভিন্ন নাই। এই কথা সর্ব দেশে সর্ব জাতির পক্ষে সত্য। প্রাচ্যবাসীর চেয়ে পাশ্চাত্যবাসী এ কথা শীঘ্রি বুঝবে। প্রাচ্য ভাবস্থর বচনা ক'রে আর গুটিকয়েক সিদ্ধ মহাপুরুষ জন্ম দিয়ে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

নাম, বশ চুলোর বাক, অপরের উপর প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা দূর হোক। কাষ ক'রে বাও। কাম-ক্রোধ-লোভের তিন বাঁধন থেকে মুক্ত হও, দেখবে সত্য তোমার নিত্য সঙ্গী। *

প্রত্যেক জাতিরই আছে বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষতি। কেহ রাজনীতি,

* জনৈক মার্কিন শিষ্যের নিকট লিখিত পত্র হইতে অনুলিখিত।

কেহ বা সমাজনীতি, কেহ বা অস্ত্র অস্ত্র পথে কাষ করে। আমাদের পথ ধর্ম—এই ধর্মপথে ভিন্ন আমরা অস্ত্র পথে চলাতে পারি না।... এই ধর্ম হয়ে পড়েছিল বিপন্ন। মনে হয়েছিল, আমরা যেন জাতীয় জীবন হতে এই ধর্ম ছেঁটে কেলেতে চাই, মনে হয়েছিল, আমাদের অস্ত্রের আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড ফেলে দিয়ে তার স্থলে রাজনৈতিক মেরুদণ্ড বসাতে চাই। এটা সফল হলে আমরা পৃথিবী হতে লোপ পেরে যেতুম। আমাদের ধ্বংস নেই। তাই ধর্ম হলেন স্বপ্রকাশ। এই মহাপুরুষকে কি চোখে তোমরা দেখবে না দেখবে, আমার তাতে কিছুই এসে যায় না, তাঁকে তোমরা কতটুকু প্রজ্ঞাভক্তি কর—তাতে কিছুই এসে যায় না, কিন্তু পরিষ্কার এই কথা তোমাদের মুখের ওপর বলে যাই, অস্ত্র শক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ—এমনটি ভারতে বহু শতাব্দী ধরে হয়নি। তোমাদের কর্তব্য, এই শক্তির পরিচয় লওয়া, তোমাদের কর্তব্য, খুঁজে দেখা ভারতের নব জাগরণ ও কল্যাণ এবং ভারতের যোগে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত তিনি কি করে গিয়েছেন।...

আমাদের শাস্ত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ হ'ল নিরাকার পুরুষ। ভগবানের রূপার এই আদর্শ অধিগত করার মত উচ্চ আমরা হতে পারলে কথাই ছিল না। কিন্তু এটা বখন সকলের পক্ষে সম্ভব-পূর্ণ নয়, তখন অগণিত নর-নারীর পক্ষে সাকার আদর্শই অপরিহার্য, জীবনের সাকার এইরূপ এক আদর্শের পতাকাভলে সাগ্রহে এসে যোগদান না করলে কোনও জাতি জাগতে পারে না, কোনও জাতি বড় হ'তে পারে না, কোনও জাতি বিদ্যুত্বে কাষ করতে পারে না। রাজনৈতিক আদর্শ এমন কি, সামাজিক বা বাণিজ্যিক আদর্শের কোনও ব্যক্তি ভারতে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমাদের সম্মুখে চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ, শক্তিমাত্র ধর্মগুরুদের ঘিরে আমরা পরম উৎসাহে সমবেত হতে চাই। আমাদের নেতাকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবকে সেই গুরুরূপে আমরা পেয়েছি। আমার কথা বিশ্বাস কর, এই জাতি যদি জাগতে চায়, তা হলে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে তাকে সাগ্রহে সমবেত হতে হবে...আর তিনি—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আমার জাতির কল্যাণের জন্ত, আমার দেশের কল্যাণের জন্ত, মনুষ্য-জাতির কল্যাণের জন্ত তোমাদের হৃদয়স্থায় উন্মুক্ত করে দিন। আমরা চেষ্টা করি চাই না করি, অভাবনীয় পরিবর্তন এ দেশে আসবেই আসবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মহা পরিবর্তনের জন্ত তোমাদের অটল শক্তি প্রদান করুন, তোমাদের সত্য-মণ্ডিত করে তুলুন।

“শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীতে যে একাগ্র ভগবৎ-প্রেম এবং ভগবানের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে এক হইয়া বাইবার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আর কোথাও এত দূর—এত সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি হইতে গাঁহার বিধান ও মতের পরম উচ্চাধার পরিষ্কৃত হইয়াছে। জ্ঞানের রহস্যলোকে তিনি কত গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, ভগবৎপ্রেমে কত গভীর ভাবে তিনি মগ্ন ছিলেন, তাহা গাঁহার উপদেশগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই।”

—ম্যাক্সমুলার



সংস্কৃত নাটকের মধ্যে রায়
রামানন্দ-কৃত জগন্নাথবল্লভ
নাটক সুপ্রচলিত। ঐতিহ্যবাহিনী
সকল গ্রন্থ আশ্রয়ন করিতেন, জগ-
ন্নাথ-বল্লভ তাহাদের অন্ততম—

জগন্নাথবল্লভ ও রায় রামানন্দ ঐতিহ্যবাহিনী



চণ্ডীদাস বিতাপতি রায়ের নাটকগীতি কণ্ঠায়িত শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাধাদিগে স্বরূপ রামানন্দ সনে গায় তনে পবন আনন্দ।
—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২য়

এই পাণ্ডিত্য দুইটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,
মহাপ্রভুর আশ্রয় কাব্য বা গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি সংস্কৃতে রচিত;
বিষমদল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠায়িত, জয়দেব গোষাধীর গীতগোবিন্দ
এবং রামানন্দ-প্রণীত জগন্নাথবল্লভ নাটক। সমস্তই কৃষ্ণলীলা-
বিষয়ক। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধ, সে জ্ঞাত
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোষাধী এই দুই কবির কোনও গ্রন্থের উল্লেখ
না করিয়া শুধু কবির নাম উল্লেখ করিলেন। রামানন্দের জগন্নাথ-
বল্লভ নাটকের নাম করা হয় নাই বটে; কিন্তু তাহার কারণ
এই যে, জগন্নাথ-বল্লভের আর একটি নাম রামানন্দ-সঙ্গীত নাটক।

শ্রীরামানন্দ রায়ের কবিতা তত্ত্বৎশলাবৃত্তঃ শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-
নাম গজপতি প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ঃ রামানন্দসঙ্গীতনাটকঃ নির্ময়ঃ...
—জগৎ-ব., ১ম অঙ্ক।

আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাঁহার নাটক,
তাহাকে লইয়াই মহাপ্রভু আশ্রয়ন করিতেন। এখানে ‘রামানন্দ’
বলিতে অবশ্য রায় রামানন্দকেই বুঝিতে হইবে। নীলাচল-লীলার
স্বরূপশাসনোপদেশের দ্বারা রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী ছিলেন।

এই নাটকখানি মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের সাক্ষাতের
পূর্বেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে নান্দী
বা মঙ্গলাচরণ নৃপুংসোভিত চরণ, নৃত্যপারায় শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি
আছে, ঐতিহ্যবাহিনী নাই। * গোপাবরীতে উভয়ের মিলনে
বে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, তাহাতে রামানন্দ গোপালময় হইয়া
গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ ঘটনার পর রামানন্দ রায়ের পক্ষে
শ্রীগোপালের বন্দনা না করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

রামানন্দ রায় ছিলেন, গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে এক জন
প্রধান রাজপুরুষ, তাঁহার রাজধানী ছিল বিজয়নগর—বর্তমান রাজ-
মহেন্দ্রী। ইহার পিতা ভবানন্দ রায় এক জন সম্মানিত ব্যক্তি
ছিলেন। তবে তিনি বিজয়নগরের অধীশ্বর ছিলেন কি না, তাহা বলা
যায় না। সতীশচন্দ্রে রায় লিখিয়াছেন যে, ভবানন্দ রায় বিজা-
নগরের অধীশ্বর ছিলেন। মৃণালকান্তি খোব্রা তাঁহার গৌরবপন্থরঙ্গিণীর
জীবিকায় এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, রায় ভবানন্দ যে
রাজা ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। মৃণাল বাবু সম্ভবতঃ জগন্নাথ-
বল্লভের ‘পৃথ্বীধরজ্ঞ শ্রীভবানন্দ রায়জ্ঞ’ লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু
ভবানন্দ যে বিজয়নগরের রাজা ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হয় না।

রামানন্দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের
যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, রায় রামানন্দের দ্বারা তিনিও

* বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত
মহাশয় মনে করেন যে, এ প্রাকের চৈতন্যপক্ষে ব্যাখ্যা করা হইতে
পারে। তিনি বলেন, মূবারি অর্থে স্বরূপ-গৌরস্বরূপ (মূরত্ব-সিত)
See East Bengal Times, 25/5/1936

নীলারসিক বিদগ্ধজন ছিলেন। কবি
তাহাকে “নিরুপম-কান্তি-লক্ষী-সুহ-
লক্ষীরমণাবলোচিত চিত্তহৃদ্যাকিনী
বিতাবাদি পরিণত রস-রসালমুহুর-
বদ্যাবাদ-কোবিল-পুংকোবিলেন শ্রীকৃষ্ণ-
হায় সহচরগুণ মুক্তা-কলমগুণিতস্বপ্নেন” বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ
(শ্রীরাধাকৃষ্ণহায়ের যিনি সহচর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুণরূপ
মুক্তাফলে ভূষিত হইয়াছে স্বপ্ন বাঁহার)।

তাহা হইলে পাঁড়ায় এই যে, ঐতিহ্যবাহিনী নীলাচলে গমন করিবার
পূর্বে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবধর্মের প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে
কারণে লক্ষ্মণসেনের রাজ-সভায় জয়দেব গীতগোবিন্দ গান করিয়া
তাঁহার আশ্রয়দাতার মনস্ত্রী সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, ঠিক সেই
কারণেই নীলাচলের বিখ্যাত রাধীন ভূপতি প্রতাপরুদ্রের রাজ-সভায়
রায় রামানন্দ জগন্নাথ-বল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকের
মতে গজপতি প্রতাপরুদ্র ঐতিহ্যবাহিনী প্রভাবে পণ্ডিত হইয়া রাজধর্ম-
পালনে উদাসীন হইয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবধর্মই তাঁহার পরাজয়ের
কারণ। কিন্তু রায় রামানন্দ তাঁহার আশ্রয়দাতা সযত্নে বাহা বলিতে-
ছেন, তাহা ঐ ধারণার অমূল্য নহে।

গজপতি প্রতাপরুদ্র মহারাজ পুরুষোত্তম দেবের পর ১৪৮১
খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব
করেন। রামানন্দ তাঁহার প্রশস্তি উল্লেখিত ভাষায় গ্রথিত করিয়াছেন।
যথা ‘প্রতাপরুদ্রের পরাক্রমে সেকন্দর (সেকন্দর গোদী ১৪৮১-১৫১৭)
ভীত হইয়া গিরিকন্দরে পলায়ন করিয়াছেন, কলবর্গ (গুলবর্গ) দেশের
ভূপতি তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষার জন্ত আশ্রয়িত হইয়াছেন, গুজরার
(গুজরাটের) রাজা তাঁহার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা
করিতেছেন এবং গোড়-ভূপতি বাত্যাভ্যুত অর্ণবপোতের আরোহীর
শ্রায় ব্যাকুল হইয়াছেন।’ এরূপ পরিচয় হইতে মনে হয় যে, তখনও
বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের হস্তে প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটে নাই।
কৃষ্ণদেব রায় শুধু যে উড়িষ্যাধিপকে পরাজিত করেন তাহা নহে,
বিজয়নগর ভূগর্ভস্থ করেন। মাদলাপাঞ্জী অনুসারে এই ঘটনা ১৫০৫
খৃষ্টাব্দে ঘটে। তাহা হইলে ইহার পূর্বেই জগন্নাথবল্লভের রচনা হইয়া-
ছিল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। রায় রামানন্দ নিজে এক জন
রাজা ছিলেন,—কেহ কেহ বলেন, কবর রাজা ছিলেন,—কাজেই তাঁহার
প্রশংসা গাত্যমুগতিক প্রশস্তি-পাঠের দ্বারা না হওয়াই স্বাভাবিক।

এই সময়ে বঙ্গ হোসেন শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৫১৪
খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্যার ইতিহাস
হইতে জানা যায় যে, তাঁহার কটক (প্রতাপরুদ্রের রাজধানী) পর্যন্ত
গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভয়ে জগন্নাথের
মূর্তি চটক পর্বতে লইয়া লুকানো হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপরুদ্র
সঙ্গে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে ঘরাবিত হইয়া ফিরিলেন এবং
মুসলমানগণকে গড় মান্দারণ পর্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। এই
ঘটনার পরে জগন্নাথবল্লভ রচিত হইলে নিশ্চয়ই সে কথা নাট্যকার
লিখিতে ভুলিতেন না। সেকন্দর গোদী এক জন দ্বায়পারায় স্থলতান
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিন্দুবিষয়ে যে জ্ঞান হিন্দু নরপতিগণ নিশ্চয়ই
তাঁহাকে ভাল চোখে দেখিতেন না। কাজেই তাঁহার উল্লেখ এই
প্রসঙ্গে হিন্দু লেখকের কলমে যোগাই হইয়াছে বলিতে হইবে।
গুলবর্গ বাহমণি রাজবংশের শেষ রাজা বিরাজ করিতেছিলেন।

স্বয়ংকার তিনি তৎপর ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। কারণ, কয়েক রায় মহাশয় এই রাজ্যকে পরাজিত করেন।

ঈশ্বরমহাপ্রভু যে এই জগন্নাথবল্লভ নাটক আশ্বাদন করিতেন, তাহা মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক গল্প সময়ে এই নাটকখানির বৃত্তান্ত তিনি অবগত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। নীলাচলে আসিবার দুই মাস পূর্বেই শোধ মাসে প্রভু স্বধন দক্ষিণ ভ্রমণে গমন করেন, তখন সার্কভৌম হাশর তাঁহাকে গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ রিতে অমুরোধ করিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বাহা বলিতেছেন, তাহা প্রাধিকানযোগ্য।

তোমার সঙ্গে বোণ্য তেঁহো একজন।

পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম।

পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তেঁহো সীমা।

সম্মুখিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা।

অলৌকিক বাক্য চোঁটা তাঁর না বুঝি।

পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া।

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৭ম

এত দিন তাঁহাকে বুঝি নাই, তিনি বৈষ্ণব, ভক্তিরসের অধিকারী, সিক; ইহা লইয়া তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে গম্যার প্রসঙ্গে বুঝিলাম যে, তিনি কত বড়। ইহা হইতে স্পষ্ট হা বার যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই রায় রামানন্দ বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতি হইয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে বা রূপ গোষামীর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী কালে বা সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিচার-সঙ্গে কোনওখানে জগন্নাথবল্লভের নাম কেহ করেন নাই। হার কারণ কি? রায় রামানন্দের পক্ষে ইহা বৈষ্ণবোচিত বিনয় হইতে পারে। কিন্তু রূপগোষামী বা মহাপ্রভু ও ত ইহার উল্লেখ রিতে পারিতেন। মহাপ্রভুর যে এই নাটক ভাল লাগিত সে মাণ ত আমরা পাইয়াছি। আরও প্রমাণ পাইতেছি যে, রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া আদর করিতেন:

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য

গোবিন্দাজের শুদ্ধ দাস্তরস।—ঐ, মধ্য, ২য় পরি

অর্থাৎ কবি, ভক্ত, রসিক ও দার্শনিক রামানন্দ তাঁহার রাজ্য-রত্ন পরিচয়্য করিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ কথিয়া তাহাকে সখে বন্দীভূত করিলেন। রায় রামানন্দের বৈরাগ্য হচ্ছে বলা হইয়াছে যে, সনাতনেরই দ্বার তাঁহার ত্যাগের মহিমা।

তোমার বৈষ্ণব বিশ্ব ত্যাগ তেঁহে তার রীতি।

দৈন্ত বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি।

—চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ১ম।

রূপগোষামীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠীর উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু এক নের আশ্বাধারণ কাব্যপ্রতিভা এবং অপদের অপূর্ণ বদান্ধভূতি প্রকাশ দিবার সুযোগ মিলেন। রস-প্রবীণ রামানন্দ প্রহ্ল-কর্তা, রূপ ভরদ্বাজ, মহাপ্রভু স্বয়ং বিচারক এবং অবৈত নিত্যানন্দ হরিদাস-রূপ গোষামী সার্কভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিত ও রসজ্ঞগণ দ্বারা। কৃষ্ণদাস করিদ্বাদ এই ইষ্টগোষ্ঠীর বর্ণনার বর্ণেই পাণ্ডিত্যের

পরিচয় দিয়াছেন। প্রহ্ল ও তাহার উত্তর উভয়েই সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য; উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টীকৃত না হইলে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল। এই ইষ্টগোষ্ঠীর বিবরণ কতটা প্রকৃত ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে কবিরাজ গোষামীর প্রামাণিকতা সন্দেহে সন্দেহের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তিনি প্রত্যক্ষকারী দ্বারা যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই এই ব্যাপারে আমাদের অবলম্বন বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। এই ইষ্ট-গোষ্ঠীতে, আমরা দুই জন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিকের যে পারস্পরিক সন্ধের পরিচয় পাইতেছি, তাহা সহজ সত্যের আভার উজ্জ্বল। স্বরূপ দামোদর সভাঙ্ক লোকের সমক্ষে রূপগোষামীর বিখ্যাত নাটকস্বর্য বিদগ্ধ-মাধব ও ললিত-মাধবের পঞ্চদশ দিতেছেন; তাহার পূর্বে এই নাটকস্বর্য অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয়। রাম রায় তাঁহাকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন আর রূপগোষামী সবিনয়ে তাহার উত্তর দিতেছেন। সেখানে স্বয়ং অবৈতাচার্য, সার্কভৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত, সেখানে রামানন্দ কেন প্রশ্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, ইহা প্রাধিকানযোগ্য। বস্তুতঃ, বসের বিচারে জগন্নাথবল্লভ নাটক-রচয়িতা রাম রায়ই যে সর্বাপেক্ষা বোণ্য ইহা মহাপ্রভু নিশ্চয়ই জানিতেন এবং সভাঙ্ক সকলেরও যে ইহা অনন্ত-মোদিত নহে, এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। রূপগোষামীর উক্তিতে এই সত্যটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে:

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।

দ্বিতীয় নাটকের কহ নানী ব্যবহার।

রূপ কহে কাঁহা তুমি সুর্য্যোপম ভাস।

মুখি কোন্ মুক্ত বেন খলোয়াত প্রকাশ।

—ঐ, অন্ত্য, ১ম

এই বিনয়-প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যে অত্যন্ত শোভন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ, জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের একমাত্র সমসাময়িক তুলনাত্মক বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব। শ্রীকৃষ্ণলীলা লইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা নাটক নহে, কাব্য। রূপগোষামীর নাটকস্বর্য শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার উল্লিখিত হইলেও ললিতমাধব সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। বিদগ্ধমাধব সম্পূর্ণ হয় ১৫৩২ এবং ললিতমাধব ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে। সুতরাং জগন্নাথবল্লভ নাটক যে তাহার বহু পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পূর্বেই যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বশ: পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইমাত্র অস্বাভাবিক বোধ হয়। জগন্নাথবল্লভে স্বত্বদার বলিতেছেন যে, তিনি এমন একটি প্রবন্ধ প্রণয়ন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন বাহা সম্পূর্ণ অভিনব অর্থাৎ বাহাতে অন্য কোনও পুরাতন প্রবন্ধের ছায়া না থাকে।

অভিনবকৃতিমন্তজ্জায়রা নো নিবন্ধ:...

ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রূপগোষামীর বিখ্যাত নাটকস্বর্যের পূর্বেই জগন্নাথ-বল্লভ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও রায় রামানন্দের কবিতার সমালোচনার স্থল ইহা নহে। তবে নানী শ্লোকে উভয়ে যে দৈন্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুল্য দেখিলে ইহাদের কবিতার ক্রম বুঝা যায়:

জগন্নাথ-বল্লভ :

ন ভবতু গুণগন্ধোইপ্যত্র নাম প্রবন্ধে

মধুরিপুপপদ্মোৎকর্ষনং নমস্তথাপি ।

সহস্রসহস্রাভ্যাসনসন্দোহহেতু-

নিয়ন্তমিমমতোহয়ঃ নিফলো ন প্রয়াসঃ ।

এই প্রবন্ধে গুণলেশও না থাকিতে পারে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সৰ্ব্বত্র আমাদের এই কীৰ্ত্তন সহস্রর ব্যক্তির প্রচুর সহস্রা-
নন্দের কারণ হইবে, অতএব এই প্রয়াস কখনও নিফল হইবে না ।

বিদগ্ধ-মাধবে বখা—

অভিব্যক্তা মন্তঃ প্রকৃতিস্বরূপাশি বখা

বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিতপময়ী বঃ কৃতিরিয়ঃ ।

পুলিন্দোনাপ্যয়িঃ কিমু সমিধমুগ্ধা জনিতো

হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নাস্তঃ কলুবতাম্ ।

হে পণ্ডিতগণ! আমি বল-বুদ্ধি হইলেও আমার কবিতা আপনাদের অভিলাব পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে; কেন না, অতি নিকট পুলিন বা শবর কর্তৃক কাষ্ঠবর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি কি কাঞ্চন-সমূহের অস্ত্রমালিত্ব বিনষ্ট করে না ?

কবিত্বের দিক্ দিয়া তুলনা করিলে শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামীকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয় । বস্তুতঃই রূপের তুলনা নাই । বৈষ্ণব-সাহিত্যে জগন্নাথ-বল্লভের কবি অপেক্ষা রূপগোষ্ঠামী যে বহু গুণ অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা কে না স্বীকার করিব? তবে রূপগোষ্ঠামীর উপর রায় রামানন্দের কাব্য কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই । জগন্নাথ-বল্লভে রাখা পরকীয়া নাহিক। * রূপগোষ্ঠামীর নাটকেও তাহাই । বিদগ্ধমাধবে মুখবা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, “চঞ্চল! অভিমন্তোঃ সহধর্মিণী পত্নী তব বন্দনীয়।” শ্রীরাধা অভিমন্ত্যুর পত্নী অতএব তোমার নমস্তা ।

এই পরকীয়াতত্ত্ব সঙ্ক্ষে উভয়ের ঐকমত্য কি আকস্মিক? অথবা রামানন্দের প্রভাবের ফল? জগন্নাথবল্লভে ললিতা বিশাখা নাই, রাখার সখীর নাম মদনিকা শশিমুখী । মদনিকা এবং পৌর্ণমাসী উভয়েই বয়োজ্যেষ্ঠা এবং লীলার প্রধান প্রযোজনকর্ত্রী । জগন্নাথ-বল্লভের বিদগ্ধক রতিকমল, রূপের নাটকে মধুমঙ্গলে পরিণত হইয়াছেন । কিন্তু গানের দিক্ দিয়া জগন্নাথবল্লভ যথেষ্ট জনপ্রিয়তার দাবী করিতে পারে । জগন্নাথবল্লভ পঞ্চাশ নাটক, বখা—পূর্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, ভাবপ্রকাশ, রাখাভাসার ও রাখাসঙ্গম । প্রথম অঙ্কে ৪টি করিয়া ১২টি, ৪র্থ অঙ্কে ৫টি এবং পঞ্চম অঙ্কে ৪টি গান আছে । ইহার মধ্যে অনেকগুলি গান পদকল্পতরুতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং কীৰ্ত্তনের আসরেও অজ্ঞাপি শুনিতে পাওয়া যায় । বখা—কেশিবিপিন প্রবিশতি রাখা রাখা মধুর বিহার্য্য; (অভিলাব) (অভিলাব); গোপকুমার সমাজমিমং সখি পুচ্ছ কদাচুগতোহহং (রূপানুরাগ) ইত্যাদি ।

* দয়িতো দয়িতত্ত্বা বালোরঃ কুলপালিকা ।

অকাতো কিমসৌ মুক্তে ধতামাচারবিপ্রবঃ ।

জঃ বঃ নাটক. ২য় অঙ্ক ।

এই গানের অনেকগুলিই জয়দেবের অনুকরণে রচিত । জয়দেবের প্রভাব কোনও বৈষ্ণব কবিই অতিক্রম করিতে পারেন নাই । জগন্নাথ-বল্লভের জায় কুয় নাটকখানিতে বিশেষাধিক গানের সমাবেশ দেখিলে জয়দেবের কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে । তবে জয়দেব যেমন শূঙ্গার রসের মধ্য দিয়াই কুললীলা আধাদন করিয়াছেন, রাখানন্দ সেরূপ করেন নাই । পঞ্চম অঙ্কে (রাখাসঙ্গম) মাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার মদনিকার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাও বেশ গাঢ়াভিযুগ্ম ।

পূর্বেই বলিয়াছি, রামানন্দের ভাবায় জয়দেবের শব্দালঙ্কারের প্রভাব স্পষ্ট । দৃষ্টান্তস্বরূপ

মধুতর শুভ্রললি কুলমতি ভাবণ ।

মন্দ মন্দস্বরূপ গন্ধ কৃত দ্ব্যংগ ।

অথবা, রাখিকে পরিহর মাধবে রাগময়ে । ইত্যাদি পদ লওয়া বাইতে পারে ।

চণ্ডীদাসের প্রভাব রাম রায়ের কাব্যে না থাকিবারই কথা । কারণ, চণ্ডীদাস বাঙালী কবি । তথাপি তাঁহার রাখাপ্রেমের আকৃতি দেখিলে চণ্ডীদাসের কথা মনে না হইয়া পারে না । বিশেষ যখন তিনি বলিতেছেন :

তদ্রূপে বিরহে নবৈব বিধুরা কান্তস্ত বোগে বখা ।

চণ্ডীদাসের অমর চিত্র ‘দুহু’ কোরে ‘দুহু’ কীদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’ অবজাই মনে পড়িবে । বিদ্যাপতির প্রভাবও রায় রামানন্দের উপর লক্ষ্য করা যায় । তাঁহার প্রেমবিলাসবিবর্তের পদটি

পহিলিহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল ।

নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত । রায় রামানন্দ গানে যে অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন, এ সঙ্কে সংশয় নাই । তাঁহার গানগুলির জনপ্রিয়তার ইহাও একটি হেতু । আর এক জন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি সেই ভক্তই তাঁহার সংকৃত গানগুলিকে বাংলা রূপ দিতে অনুপ্রেরিত হইয়াছিলেন ! জগন্নাথবল্লভের দ্রোক ও সঙ্গীত অবলম্বন করিয়া লোচনদাস ৪০টি পদ রচনা করিয়াছিলেন । পদগুলি অতি সুসংলগ্ন এবং স্থানে স্থানে কাব্যসৌন্দর্য্যে মূল কবিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে । লোচনদাসের পদেও ব্রজবুলি ভাষার যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয় । তাঁহার ৪০টি পদের মধ্যে ১৩টি ব্রজবুলি লক্ষণাক্রান্ত ।

রায় রামানন্দের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার সংলাপে, যেখানে তিনি মহাপ্রভুর প্রেমের উত্তরে সাধ্যের স্থাপন করিতেছেন । অজ্ঞাপি এই সাধ্যসাধনতত্ত্ব বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিধর্মের দৃঢ় ভিত্তি বলিয়া গণ্য হয় বস্তুতঃ এই প্রসিদ্ধ সাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিচারের জায় প্রেমধর্মব্যাখ্যা আর কোথায়ও দেখা যায় না । রায় রামানন্দ ছিলেন ‘রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-জ্ঞানের সীমা’ । কাজেই তাঁহার এই তত্ত্বব্যাখ্যা বৈষ্ণব ধর্মের নির্ধারিত বলিয়া আদৃত হইয়াছে ।

এই সুশ্রুতিচিহ্ন সাধ্য-বিচারের মধ্যে মাত্র দুইটি বিষয়ের প্রাপি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই । প্রথমতঃ, কাছা-ভাবের ভঙ্গ; এই প্রথম স্পষ্টভাবে অঙ্গীকৃত হইল । ভগবান যে প্রিয়তম এ কথা বৃহদারণ্যক এবং নারায়ণীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । ব্রজঃ গোপীয়া যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণকান্তরূপে ভজনা করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভক্তিধর্মের

বাখ্যা প্রচলিত ছিল তাহাতে মধুর বা উচ্চল রসের স্থান স্বীকৃত হয় নাই। সেই জন্যই ঐতিহ্যে যে ভক্তি সাধনা প্রবর্তিত করিলেন তাহাকে ‘অনর্শিতচর্য চিরাৎ’ বলা হইয়াছে। তিনি যে মধুর রস-সম্বন্ধিত ভক্তির প্রবর্তক ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে তাহার প্রেরণা এই দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে আসিয়াছিল ইহা না মানিয়া উপায় নাই।*

দ্বিতীয়তঃ এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ বরচিত একটি পদ গান করেন :

পহিলিহি রাগ নয়নভল ভেল।

অমুখিন বাঙ্গল অবধি না গেল।

না সো রমণ না হাম রমণী।

হুই মন মনোভব পেল জনি। ইত্যাদি

এই পদটির ব্যাখ্যায় অনেক কথক এবং জনৈক স্ত্রী সমালোচক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ‘না সো রমণ’ ইত্যাদির দ্বারা বিপরীত বিহারের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রায় রামানন্দ এখানে কান্তা-প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়া এমন এক অনির্বচনীয় অবস্থার আভাস দিতেছেন, যেখানে কান্ত ও কান্তা, নায়ক ও নায়িকা, ভক্ত ও ভগবান একান্ত হইয়া যান; কোনও রূপ ভেদ থাকে না, ইহাই কান্তা প্রেমের চরম পরিণতি।†

বৈষ্ণবদের এই প্রেমবিলাসবিবর্ত এক অপূর্ণ বস্তু! রায় রামানন্দ বৈষ্ণব ভয়ে ভয়ে ইহা ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, প্রেমের এই অভেলতত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ় এবং রহস্যমণ্ডিত বস্তু। কান্তা প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়া বস্তু মনে করিলেন যে, এ প্রসঙ্গের ইহাই চরম হইল। কিন্তু

* অধুনালুপ্ত ‘উদয়ন’ পত্রিকায় (কাস্তিক, ১৩৪১) বাংলার প্রেমধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম। রায় বাহাদুর রমাশ্রম চন্দ্র উদয়নে (পৌষ, ১৩৪১) তাহার প্রতিবাদ করেন; আমার প্রত্যুত্তি (বসুমতী বৈশাখ, ১৩৪২) দ্রষ্টব্য।

† প্রেমবিলাস-বিবর্তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে (আষাঢ় ১৩৪৪) আমি যে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্রফেয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ যে প্রত্যুত্তর (ভাদ্র, ১৩৪৪) দিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।

রায় কহে আর বৃদ্ধিগতি নাহিক আমার।

যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত এক হয়।

তাহা শুনি তোমার মুখ হয় কি না হয়।

সন্দেহে দোলায়িত রায় রামানন্দ ইহারই ব্যাখ্যাস্বরূপ নিজস্বত এক পদ গাহিলেন : ‘পহিলিহি রাগ নয়নভল ভেল।’ এই গান শুনিয়া মহাপ্রভুর প্রশ্ন নিরস্ত হইয়া গেল। তিনি উত্তত-কণা অঙ্গুরের দ্বারা হুলিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে—

প্রেমে প্রভু বহন্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।

‘প্রেমবিলাসবিবর্ত’ অর্থে এখানে এমন একটি অবস্থার ইঙ্গিত করা হইতেছে তত্ত্ব হিসাবে বাহার উপরে আর নাই। ‘বিবর্ত’ অর্থে ভ্রম, অর্থাৎ যেমন স্তব্ধিতে মূর্ত্যভ্রম, কল্পিতে সর্পভ্রম। প্রেমের জগতে ভ্রম ভ্রম, অজ্ঞেই সত্য। অর্থাৎ প্রেমবিলাসে যে ঐশ্বর্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাথমিক। প্রেমের পরাকাষ্ঠা হয় তখন, যখন প্রেমিক ও প্রেম্যাদেশের আর কোনও ভেদ থাকে না।

চণ্ডীদাসের কবিতায় ইহার আভাস আছে :

শিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া

পারেতে মিশিতে পারে।

পরকে আপন করিতে পারিলে

শিরীতি মিলয়ে তারে।

হুই হুচাইরা এক অঙ্গ হও

থাকিলে শিরীতি আশ।

শিরীতি সাধন বড়ই কঠিন

কহে ষিঞ্চ চণ্ডীদাস।

এই অভেলতত্ত্বই প্রকটিত হইয়াছে রসরাজ মহাভাবের একশ্রে। ‘রসরাজ মহাভাব হুই একরূপ।’ (চৈঃ চৈঃ) এই রসরাজ মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহ রায় রামানন্দের সমুখে বিরাজমান। অর্থাৎ রামানন্দ সর্বশেষে যখন রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে গৌরাস্তব্ধে আসিয়া পড়িলেন, তখন মহাপ্রভু বহন্তে প্রেমে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। এই ব্যতিকরণতয়া বানন্দবৈষ্ণবতো বা প্রভুরূপ করণদোষাত্মকতাপ্যবস্ত।

—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নটীকা, ৭ম অঙ্ক

কবিকর্ণপুর বিগ্রহের মুখ দিয়া এই সার্বভৌমের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলাইয়াছেন কিন্তু এই তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। এখানে কবিকর্ণপুর ইহাকে চাপা দিয়াছেন মাত্র। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারদের উত্তর পাইলাম না, কেবল এক সর্বপ্রাদিত্যভিষেক অনন্ত গন্ধন শুনিতে পাইলাম, অল্পালোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম :

‘বনের পদ্মশালা।

বিক্রয়—অনন্ত বন।

বিক্রোতা,—কাল।

মূল্য,—জীবন।

জীবন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।’—বঙ্কিমচন্দ্র

মায়া কাজল

আশাপূর্ণা দেবী



গাড়ীর ঝাঁকুনি খাওয়ার মধ্যে হাসির কি থাকিতে পারে, এ কথা অশোকের বুদ্ধির অগম্য। বারে বারে গাড়ীর ধাক্কায় সঙ্গে মণিকার উজ্জ্বলিত হাসির ধাক্কায় সহসা এক সময় বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠে—খুব আদায় হচ্ছে বুঝি? উঃ, আমার তো হাড়-মাস আলাদা হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত তোমার সাধুবাবার কাছে বোধ হয় দেহবৃত্ত আত্মটুকুই গিয়ে পৌঁছবে, বেছে বেছে আশ্রম কচ্ছেন ভালো জায়গায়।

মণিকা এলোমেলো অবস্থায় চুলকলা সামলাইয়া প্রায় হাঁকাইতে হাঁকাইতে বলে—কষ্ট না করলে কেউ পাওয়া যায়? গাড়ীর ঝাঁকুনি ভালো লাগে না তোমার? আমার কিন্তু খুঁট-ব ভালো লাগে, ক্ষোভ হয়ে পর্যন্ত নাগর-মোলায় চড়ে পাইনে তো

অশোক বাক্য কটাকে একটু স্বার্থবোধক হাসি হাসিয়া কহিল—পাও না বুঝি? বাক, খেটটা মিটিয়ে তাহলে? এই এই...ঈসু—আবার একটা প্রবল ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে মণিকা হাসিয়া একে বারে অশোকের কোলের উপর গড়াইয়া পড়িল।

—আঃ, কি হচ্ছে? মগনলালটা মনে করবে কি?

অশোক বিব্রত ভাবে পত্নীকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল।

স্বামীর বিরক্তি গারে না মাঝিয়া মণিকা আবদারে ধুকীর মত গা এলাইয়া দেয়।

—বাঃ, ও বুঝি দেখতে পাচ্ছে? মাথার শিচ্ছেন ঢোখ আছে না কি ওর?

—ঢোখ না থাক, অহুভূতি বলে একটা জিনিষ আছে তো?

—খোঁটার আবার অহুভূতি! আমার খুসি আমি হাসবো, যত ইচ্ছে হাসবো, কি করবে ওনি?

নিরুপায় ভাবে অশোকও হাসিয়া ফেলে। সত্যই মণিকাকে আঁটিয়া উঠা দায়, সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হইল ছেলেমানুষী ঘুচিল না। তবু ভালও লাগে বৈ কি, মণিকার হাসি গান দুই মী দুরন্তপনা মান অভিমানে দীর্ঘ দিন-রাত্রি ভরাট হইয়া আছে, নিঃসন্তান জীবনের নিঃসন্ততা অহুভব করিবার অবসর অল্পই ঘটে।

অশোকের বাউটা তো বন্ধুবান্ধব আত্মীয়বর্গের আড্ডা বসাইবার একটা কেন্দ্রবিশেষ। টেলিফোনের বেল বাজিয়াই আছে। গাড়ীখানা গৃহস্থর ভুলিয়া হামেসাই এ বাউী হইতে ও বাউী টানাপড়েন করিতে ব্যস্ত। অতিথি-সংকারের বিপুল আয়োজন সর্বদাই ঘরে মজুত, পৌষ পার্বণেই হোক বা পয়লা জাম্বুরারীতেই হোক, উৎসবের আগ্রহ মণিকার সমান।

এক কথায় অশোকের সংসারটা 'সংসার-চক্র' নয়, সংসার-ছন্দ, শুধীর হাতের মিঠা সুরে বাজিতে থাকে এবং অশোকের উপাখ্যানের প্রাচুর্য কখনো তালভঙ্গ হইতে দেয় না।

সাধুবাবাকে দেখিতে বাওবাও অবশ্য মণিকার দশটা খেয়ালের একটা খেয়াল মাত্র, তবে একলা মণিকাই নয়—সাধুবাবার আবির্ভাব এই ছোট সফরটিতে রীতিমত চাকচাক্যের স্রষ্টা করিয়াছে। সহরের জেলিয়া পড়িয়াছে জাঁজাব জাম্বুরা। সাধুবাবা-সাধুবাবা সর্বদাই



চাকরে হইতে শুরু করিয়া কেতাদুরস্ত আশা সাহেব-মেমরা পর্যন্ত 'সোহাতা' লোক দীক্ষা লইতে শুরু করিয়াছে।

অশোকরা অবশ্য এখানকার বাসিন্দা নয়, বেড়াইতে আসিয়াছে মাত্র। তবু দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিতে শেষ কি?...আশ্রমের কাছাকাছি আসিয়া পড়ায় অশোক তাড়া দিয়া বলিল—সুস্থির হয়ে বোসো এইবার, গাড়ের আঁচলটা ঠিক করে নাও, চলছে সাধুদর্শনে—কোথায় একটু গভীর হবে তা নয় খালি হাসি-ঠাট্টা। কোন কালে আর বেড়া হবে না তুমি।

—বেশ বেশ, খুব কমে গভীর হচ্ছে—বলিয়া গাভীর্ঘর অহুভবনে দুই গাল ফুলাইয়া ভারি কি ঢালে বসিয়া থাকে মণিকা।

—হোপ-লেস। এই মগনলাল, রোখো রোখো—

আশ্রমের সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের দুই ধারের বান-বাহনের সারি তাহার সাক্ষ্য। গোদান হইতে শুরু করিয়া রিকশা, সাইকেল, হাওদাগাড়ী কোনোটাই কম নয়।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে তিল ধরিবার ঠাই নাই। 'বাবা' একখানি 'ভক্ত-নন্দ' পুরু কার্পেটের উপর বসিয়া অভয় মুষ্টি ও শিতহাত দান করিতেছেন। ডান দিকে পুরুবাংসের ও বাঁ দিকে মেয়েদের স্থান।

সেই বিরাট নারীমণ্ডলীর ভিতর মণিকাকে ছাড়িয়া দিয়া অশোক গেটের বাহিরে পাড়াইয়া একটীর পর একটি সিগারেট ধরে করিতে থাকে। অবশ্য নিতান্ত নাস্তিক সে নয়, কিন্তু পরিচিত অপরিচিত এত লোকের মাঝখানে গরগল চিত্তে 'বাবা' বলিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িতে তাহার কঠিনে বাধে।

বাহিরে পাড়াইয়া আশ্রম হইয়া ভাবিতে থাকে, লোকে এত মুগ্ধ হয় কেমন করিয়া? ভক্তি কি সত্যই এত তাড়াতাড়ি গজায়?

অশিক্ষিত লোকের মৃত্যুর তবু মানে বোঝা যায়, কিন্তু শিক্ষিত সম্রদায়ের এই ইচ্ছাকৃত মৃত্যুর মানে বোঝা ভার। খোঁয়াড়ের গর-ভেড়ার মত দীকার শেষে শিষ্যের খাতায় নম্বর দিয়া বাহাদের নাম দাগিয়া রাখা হয় মাত্র, পারমার্থিক উন্নতি তাহাদের কতটুকু হয়? কতটুকু হওয়া সম্ভব? শুধর দায়িত্ব কি এতই লঘু?

সত্য কথা বলিতে কি, এই লোকারণ্য দেখিয়াই অশোকের অশ্রদ্ধা জন্ম।

অশোক ময়নারী আসিতেছে—চলিয়া বাইতেছে—ইহারই মাঝখানে হঠাৎ এক সময় মণিকার কানোশব্দে চকিতে ধীরে মন্থর পায়ের গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া অশোকের চমক ভালে, ব্যস্ত ভাবে নিজের উঠিয়া পড়িয়া বলে—কি ব্যাপার, এ হতভাগ্যকে কেনেই চলে বাচ্ছিলে না কি? আর মণ্ডার যবেই এত দূর তবুজান? 'কা' তব কৃষ্ণা কস্তে পূজা?'

মণিকা উত্তর দেয় না, থমথমে মুখে বাহিরের পানে চাহিয়া থাকে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে... অশোক মণিকার ভাবান্তর অতটা লক্ষ্য করে না, বেশ রসালো ভাবের আশ্রয়তত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে দীর-মুহুরে একটি সিগারেট ধরাইয়া বলে—তার পর কত দূর কি জ্ঞান লকার হ'ল? কথা নেই কেন? হ'ল কি তোমার? মুখখানা যে একেবারে আবার প্রথমদিবস করে তুলেছে? কেউ কিছু বলেছে না কি?

—ওখানে কেউ কিছু বলতে আসে না—মণিকা বাঁজিয়া উঠে—যাবাক একবার প্রণাম পর্যন্ত করতে যাওয়া হ'ল না কেন তখনতে পাইনে? মানের হানি হ'ত?

অশোক ঈর্ষ অপ্রস্তুত ভাবে বলে—কথাটা কি জান, অত লোকের মাঝখানে আমার কেমন কিছু আসে না।

—ও কথার কোন মানে হয় না। আসল কথা তোমার অহংকার।

অশোক বিম্মিত ভাবে বলে—তুমি কি আমাকে হঠাৎ নতুন দেখলে মণিকা?

মণিকা উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অশোক আবার কথা তুলিবার চেষ্টা করে—আচ্ছা তোমার তা'তে রাগ কেন? বেশ, না হয় আর এক দিন এসে সাঠাসে প্রণিপাত করে যাবো।

—থাক, অত দয়া না করলেও চলবে, তোমার প্রণাম না পেয়েও বাবার দিন আটকাবে না।

মণিকার মেজাজের গুজনটা ঠিক বুঝিয়া উঠা আপাততঃ সম্ভব নয় দেখিয়া অশোক চুপ করিয়া যায়।

উঁচু-নীচু পাখুরে রাজ্যয় থাক। বাইতে বাইতে গাড়ী আপন পথে চলে।

হুইট বাড়ী নীরবে হুই দিকে চাহিয়া থাকে।

রাতে শুইবার আগে মণিকা গম্ভীর ভাবে বলিল—আসছে পূর্ণিমায় আমি দীকা নেব।

—ভালো কথা—বলিয়া অশোক বালিশটা উন্টাইয়া পাশ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ওদের সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে বোধ করি এমন ঘটনা বিরল। ঘুমাইবার পূর্বে মণিকা ভাবিল—ভক্তকণে বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম, প্রথম দর্শনেই তাঁহার কৃপা লাভ করিলাম... অশোক ভাবিল... কৃষ্ণে আজ বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম, সাধ করিয়া শনিগ্রহ ছুটাইলাম।

রাত্রি কাটিয়া গিলের আলো ফুটিল নীরবে, মণিকা কলহান্তে অশোকের বেলায় ভটা সবচেয়ে বাছা বাছা মন্তব্য প্রয়োগ করিয়া ঘুম ডাঙাইতে আসিল না, বানের পর পাশের ঘরে ছুরার দিয়া দীর্ঘকাল গিয়া কি যে করিল সেই জানে।

অশোক উঠিয়া বসিয়া, মণিকার এই আকস্মিক খেলাটো দূর করিবার চিন্তা করিতে লাগিল।

পাশেই মণিকার বালিশটা পড়িয়া আছে... মৃগুধি কেনেইকনের মৃদু সৌরভ ভড়াইয়া আছে, হঠাৎ চোখে পড়িল সব একটু কালো স্থাপ... মণিকার চোখের কাজল। ঘুমের ঘোরে—অসামান্যে ব্যস্ততা লাগিয়া গিয়াছে। শুধু ঘুমের ঘোরে নয়, মণিকা আশ্রিত অসাবধানী, এই ভো—গত কালই বেশ-দুবা করিয়া বাহির হইবার সময় মণিকার ছেলেমাছুবী কাণ্ডে অশোক বিব্রত হইয়া বলিয়াছিল—হি: হি:, করলে কি? কস! পান্নাবীটার দিলে কাজল লাগিল? এখন উপায়?

—উপায়—নিরুপায়। কস! পান্নাবী পরে বড় বান্দা হইবে—

—না, সত্যি ভারী অভায়, তোমার ওসব কাজল-কাজল পরা ছাড়ো এবার।

—ইস—কেন তনি? মণিকা ভক্তকির সঙ্গে উত্তর করিয়াছিল, —নিজের বুড়ো হুচ্ছেন বলে আমাকেও বুড়ি বানাতে চান।

—কিন্তু মণিকা, কাজল তুমি কেনই বা পরো? এত চমৎকার টানা-টানা চোখ তোমার—

নিজের ধরণে দ্রীবা ছলাইয়া উত্তরটা দিয়াছিল মণিকা আরো চমৎকার... বলিয়াছিল—চোখ টানা দেখাবার ক্ষমতা নয় মশাই, ওটা তোমাদের মন টেনে রাখবার রাশ, কাজল নয়—মায়া-কাজল, পুরুষকে বশ করবার বাহুমন্ত্র।

হঠাৎ সে মন্ত্রের প্রয়োজন ফুরাইল না কি মণিকার?

চা আনিয়া দিল ভৃত্য, আহাদের সময় কেবল মাত্র বায়ু ঠাকুরের রূপ উপস্থিতি সজ্জ করিয়া নীরবে আহাৰ্য্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতে হইল, মণিকার পান্না নাই।

অইর্থে অশোক বায়ু ঠাকুরকেই প্রশ্ন করিয়া বলিল—তোমের মা'র যাওয়া হয়ে গেছে?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক নয়, মণিকা আগে ভাগে খাইয়া বসিয়া আছে এমন মনে করিবার হেতু নাই, কিন্তু বায়ু ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করিবার মত এর চাইতে ভালো কোন প্রসঙ্গ অশোকের মাথায় আসিল না।

কিন্তু ঠাকুরের উত্তরটা আশাতীত।

—মা তো আজ থাকেন না বাবু, 'সঙ্কল্প'র উপোস।

বাক্য মণিকার বাহরতের বালাই ছিল না বলিতেই চলে—তা ছাড়া সঙ্কল্পের উপবাসটা কি বস্তু অশোক ঠাহর করিতে পারে না—সবিস্ময় প্রশ্ন করে—কিসের উপোস?

—আজ্ঞে 'সঙ্কল্প'। সাধুবাবা বলেন—মন্ত্রের নেবার আগে এক দিন উপোস করে শরীর শুদ্ধ করতে হয়—এখনকার সকল লোকই ওই করছে দেখছি—বড় হুজুগে দেশ বাবু। আমাদের কলকাতার কোন বালাই নেই—শেষতঃ লোক এত নাচানাচি করতে জানে না।

বলা বাহুল্য, কথাটা অশোকের কাণে ঠিক মধুর্ষণ করিল না। শেষতঃ লোক নাচানাচি করুক কতি নাই, কিন্তু মণিকা হঠাৎ নাচিতে মুগ্ধ করিবে—এ কেমন কথা?

খেয়ালী মণিকার বোধ করি এ এক নতুন খেলা, কিন্তু অশোক একবার সভ্যতার নিবেশ করিলে নিব্রত হইবে না? প্রশ্নের সের

অশোক নিজের ইচ্ছায়—সোহাগ করিয়া। হঠাৎকি দিলে কোনো অভি-
বুদ্ধি নাই। শাসন করিলে—বারণ করিলে অশোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কোনো কিছু করিবার ক্ষমতা কি মণিকার সত্যই আছে?

কোন দ্বীপই কি থাকে?

অশোক হয়তো জানে না, কিন্তু থাকে।

দ্বীপা বধন স্বামীকে ডিঙাইয়া পরমার্থ লাভের ক্ষমতা স্বয়ং হয়,
তখন আপনাকে মন্ত বড় একটা কিছু ভাবিয়া ওজন হারাইয়া বসে।

এ জ্ঞান অশোকের ছিল না বলিয়াই মণিকার কাছে আসিয়া দৃঢ়
ভাবে কহিল—তোমার ওসব উপোস-মুপোস চলবে না—বাও, খেয়ে
নাও পে—হুজুমে পড়ে হঠাৎ একটা বাজে লোকের কাছে হীন্স
নেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি ওসব করতে সেব না তোমার—

মণিকার বাঁকা টোঁটের কোশে হুন্স একটা হাসির বেধা ফুটিয়া
ওঠে, অবজার এমন স্পষ্ট প্রকাশ আর কিসে হওয়া সম্ভব?

—আর কিছু বলবার আছে তোমার?

অবাক হইয়া বার অশোক—আরো কিছু বলবার দরকার আছে
না কি? সাদা কথা বলে দিচ্ছি, পাঁচ জনের দেখাদেখি চুপ শিখতে
হবে না।

—আচ্ছা। বলিয়া মণিকা স্বামীর উত্তপ্ত আবেগের উপর
ঈতল জল নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া যায়।

আশ্চর্য! মণিকাকে কেউ বাহু করিল না কি?

বিকাল বেলাটা ছই জনে বেড়াইতে বাওয়ার সময়, কিন্তু সু-
বাহা বস্ত্রের তার কাটায়া গিয়াছে, তাই অশোক একখানা ইজিচেয়ারে
পড়িয়া ধূলোকেব নৃত্য করিতে করিতে সজ্জ করিতেছিল, তাড়াতাড়ি
কলিকাতার কিরিয়া বাওরাই মজল। কে জানে, মণিকা একত্রেই
বসে সত্যই ‘কণ্ঠ-কণ্ঠ’ পড়িয়া একাকার করিয়া বসিবে কি না।
না, ও আর দেবী নয়.....দুঃখের শব্দ হইলেন।

...ভালো এক সাধুবাণা আসিয়া উল্লস হইলেন নির্বেশ আকাশে
ধূমকেতুর মত। চিন্তামূহু ছিঁড়িয়া মণিকার স্বর কাশে পৌছিল—
আমি এক বার আশ্রমে বাসি, আসতে বাত হ’লে খেয়ে নিও,
ঠাকুরকে বলে সেলাম।

সহসা অশোক স্বভাবের হৈগৈ হারাইয়া চাৎকার করিয়া ওঠে—
একলা আশ্রমে যাচ্ছো মানে?

—ভয় নেই হারিয়ে যাবো না, মগনলাল সঙ্গে থাকবে—বাঁকা
টোঁটে বিজয়িনীর হাসি হাসিয়া মণিকা কিরিয়া বাইতেছিল, অশোক
নিজেকে সংবরণ করিয়া দৃঢ় বসে কহিল—শোনো, তোমার বাওরা
হবে না—আমার নিবেশ।

—অজ্ঞায় নিবেশ আমি মানি না।

—তোমার সঙ্গে জ্ঞান-জ্ঞানের তর্ক তুলতে আমি চাইনে;
গাড়ীটা এখন পাবে না, আমি বেরব।

—আচ্ছা।

বলিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া বাগানের দরজা দিয়া বাহির
হইয়া গেল।

কিন্তু গাড়ীতে না কি মণিকা? সাধুবাণা কি মাছকে

অধির অশোকের কাশের কাছ মগনলাল আসিয়া বাহা বলিল
তাহার মর্ষা এই—অশোক কোথায় বাইতে চলে চলে, মণিকা
জানার বাবুর দ্বীপ সহিত জাহাজ বাবুর পাড়িতে বাহির হইয়া
গিয়াছেন।

‘চুয়া’ নামক সকল দুঃখ-নিবারক হানটার সম্মান টিক জানে
না থাকার এলোমেলো ভাবে বহুজন গুরিয়া আসিয়া অনেক
বারে বধন অশোক কিলি, মণিকা। তখন ভাঁড়াক-বরের ভিতর বাতি
ও হুণ জ্বলাইয়া পূজাবিনীর ভজিতে আশ্রম হইতে বিতরিত ‘মহাবার
ও আশ্রমজান’ নামক চটি বইখানি লইয়া নিময় হইয়া পড়িতেছে।

শরমকে আসিয়া দেখিল, পাটের উপর অশোকের একক শয্যা।
সেবের শুষ্ক একটি বালিশ ও কখন যেন অজ্ঞান বাড়াইয়া মণিকার
নূতন ব্যবহার নির্দেশ করিতেছে।

কাচের বাসনের ভিতরে ভিতরে চিড় খাওয়ার মত যে ঘর
বিদ্যারণ বেখাটা খচ, খচ, করিতেছিল, সহসা যেন কিসের আঘাতে ছই
খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল।

মণিকা আপন হাতে পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে?
যে মণিকা বাগের বাড়ী গিয়া এক বাড়ি কাটাতে পাবে না? যে
মণিকা একটুকু আশ্রমের কমতি হইলে—কিন্তু থাকে—কোন মজা
জোবে মণিকার নবলক মজার মোহ ঘুর করা যায়?

গভীর রাত্রি পঞ্চম আগিয়া কাটাইয়া কখন একটু ঘুম আসিয়া
ছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া অল্পভব হইল পাশের অশোকটা বড় বেশী কাঁকা
জানালা দিয়া এক টুকরা রান জোৎস্না তেরছা জোবে ঘরের মধ্যে
আসিয়া পড়িয়াছে...তাহারই স্বপ্নলোকে নজরে পড়িল—আপা
মন্তক কখন হুড়ি দিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে মণিকা।

হঠাৎ আগাগোড়া ব্যাপারটাই জারী হাতকর হেলেনাছবী না
হইল অশোকের। এ যেন অশোকের উপর বাগ করিয়া মণি
ঠাকুরাণী গোসা-বাগে গিয়াছেন।

খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া মণিকার মুখের ঢাকল গুলিয়া যি
বাত জোবে কহিল—এই এই মণিকা, আরশোলা, আরশোলা, তোম
বালিশে—

মণিকা হুড়কড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

আরশোলাকে ভয় করিবে না—সাধুবাণা পাছে এমন যে
নির্দেশ নাই, তাই পাণ্ডে মুখে বালিশ-চামর উঠাইতে হলি।

অশোকের হাসি আর ধামে না।

—হয়েছে—হয়েছে, বুঝে পাবে না। চল, জলকে করে পোবে
মাটিতে পড়ে ঠাণ্ডা লাগাতে হবে না।

কিন্তু উত্তরটা কি সত্যই মণিকা বিল? না মণিকার কাঁ
নকল করিয়া কোন অল্পত প্রেত?

—ববরদার, তুমি আমার কখন হুঁসো না, মানে কি!
তরসেব বলে যে সব লুকবই—

বিষয়টা যদি জোবে চাইতেও তীর না হইত অশোক কি
কল, কটন, কিন্তু কিছুই কলি না জু পাছা দিয়া হুঁসো

পর যখন অশোক নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া একটি বাত্র স্ট্রটকেশ লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল, সে দিন অনেক প্রশ্ন মনে উঠিলেও মণিকা একটি কথাও কহিতে পারিল না।

এখানেই বাড়ীর ভাড়াটা অবশ্য দুই মাসের আগাম দেওয়া আছে, কিন্তু সাধুবাবার অসম্মতি উপলক্ষে যে বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইবে, মণিকা যে তাহার অনেকটা ভাৱ লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিয়া আছে তাহার কি হইবে?

কিন্তু যে বামী রাস দেখাইতে কেবলমাত্র চাকর-বাকরের উপর ভরসা করিয়া তাহাকে বিশেষ একলা কেলিয়া বিনা স্থিতির চলিয়া বাইতে পারে, তাহার সঙ্গে মণিকার সম্বন্ধ কি?

কিছু না থাক আশ্রয় তো আছে, 'বাবা'র চরিত্রলসার পড়িয়া থাকিবে সে।

কুল-শীতে পরমাণের পথ অগ্রসর হইতে থাকে মণিকা, মাছ-মাংস ছাড়িল, সিক বেশম জরি জেক্রেট ছাড়িল, অন্নরাস তো দূরের কথা, মাখার তেলমাখা পূর্ণাঙ্গ ছাড়িয়া দিল।

পাঠ, কীর্তন, নাম, কপ এই লইয়াই আছে।

দীক্ষা অনেকই লইয়াছে—লইতেছে—কিন্তু মণিকার সঙ্গে ভাল রাখিতে কেহই পারে না। প্রশংসা-বিস্ত্রিত বিষয়, অথবা বিষয়-মিশ্রিত ঈর্ষা লইয়া তাহার কথা আলোচনা হয়।

পুরুষ-শূভ বাড়ী বলিয়া আজকাল মণিকার বাড়ীতেই মহিলাদের বিশ্রাহকি আড্ডাটা জমে জমো।

মণিকার চাইতে অল্পতঃ আঠারো বছরের বড় প্রোটা জন্ম-গৃহিণী গুরু-ভগিনীর সম্বন্ধ লইয়া মণিকাকে ইহানী "কিরি" বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছেন—সাধনা দেওয়ার হলে বলেন—বামীর রাসের জন্ম তুমি এক কোটা জন্ম খেয়ে না ফিদি, আর দু'দিন দেখ না মজাটা। তুমি এখন আপনার কাজ করে যাও, বাবার কৃপা পেয়েছ আর কি চাই? আত্মোত্তীর্ণি আমায়ের লক্ষ্য।—ঐহিকের লুপ্ত কো নরকের সমান—

চণ্ডা লাগলেই শাড়ীর মতন কোমল বস্তুরখাটি ছক চুলের উপর বেড় দিয়া ফিরিয়া একখানি ক্রেসে খাটা ছবির মত বসিয়া আছে মণিকা, যেন ভ্যাপা ও বৈরাগ্যের প্রতীক, মুখে তেমনি—উদাস রহস্যময় হাসি।

—এমনি অসার মুখে বসে বসেই তো একটা বহন কাটিয়ে এলাম ফিদি, আমি কে, আমার বসন্ত কি, কিছুই জানতে তো করিনি, সঙ্গারের খোলা জলকে অবৃত্ত ঘোমে পান করে এসেছি, শুভকণে বাবাকে দেখলাম—ভীর দুধামাখা বাণী তনুদার—চন্দক গোলাম। হঠাৎ যেন চৈতন্য হল, তাই তো, এক দিন কবেই কি? সঙ্গার বিশ্ব লাগলো—বামীকে শক্ত বন হল—

উকিল ফিদি গঙ্গার নাক নরুর কুসুমিয়া তরুন—আহা—তোমার তো হুমে লেগে ফিদি, আমায়ের যে মায়ায় বসন্ত হুতে চলে না—নরকের কীট হুয়েই ইলাল।

—ফিরির পথ কো আত্মী পবিত্রত্ব কবে কবেকাল জগতের, সম্ভানের মতন পাবেই কোঁচি আর সঙ্গার?

অজস্র মহিলাত্বের দলো দলো ফিদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ থাকে, যে যে ভাবে হুই, মণিকা, অজস্র সঙ্গার মণিকা-বাক্য

পাইলাম না বলিয়া যে খেদোক্তি কহা বহিতে থাকে, তাহার এক বিদ্রুপ বর্থাৎ আত্মবিক হইলে অথঃ ভগবান্ বোধ করি সঙ্গারের আসিয়া হাজির হইতেন।

মণিকা অবশ্য ইহাসের অনেক উল্টে, তাই একটি অলৌকিক বর্গীর হাসি মুখে আঁকিয়া নীরবে বসিয়া থাকে। কিন্তু উৎসব-ভিধি যে ক্রম আসিয়া বাইতেছে—মণিকার অলঙ্কারগুলো সব বেচিলেও কি ছয় হাজার টাকা হওয়া সম্ভব? কেবলমাত্র আটপোনে গহনাগুলিই যে সঙ্গে আনিয়াছিল।

তা ছাড়া গহনা বেচিয়া টাকা দেওয়া? মান-সঙ্গর থাকিল কোথায়?

কলিকাতার আসিয়া অশোক কয়েক দিন অস্থির ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি যে করিল সেই জানে, এতটা অকসেস চুচুচুটি দেখিয়া অনুমান করা যায়—বিবর সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ চলিতেছে। পৈত্রিক জমিদারী নিত্যন্ত সামান্য নয়, কলিকাতার চাহ-পাটখানা বাড়ীর মালিক সে, নিজেও বরাবর একটা প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তির কেশিয়ারি করিয়া আসিতেছে, কাজেই বিবর-সম্পত্তির তদারক্কে ব্যস্ত থাকি বিচিত্র নয়।

জনে বর্তমান মানসিক অবস্থা ইহার অনুকূল কি না? কিন্তু নিজেই ব্যাপ্ত রাখিতেই হয়তো—

যাক, সে দিন সব কাজ মিটাইয়া আসিয়া সম্ভার অধিকারে বিদ্যমান পড়িয়াছিল, নিজের কানকে অবিশ্বাস করিতে হয়—হঠাৎ নীচের তলার মণিকার কঠোর বাকিয়া উঠিল।

পুরানো কি বসন্তকে বাবুর উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে। স্থগিতটা একবার লাখাইয়া উঠিয়াই যেন ঠাঁতা হইয়া গেল—

মণিকা আসিয়াছে?

আপনার কুল ঘুরিয়া কমা চাহিতে আসিয়াছে।

কিন্তু নতুন কুল কি—অশোক নিজেই কহিয়া বসিল।

না, কুল কিসের? তাহা কার কি কোন্‌ শাসে?

হুইলে হুই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ এমন মণিকা উল্টাই বসিয়া উঠিল। হী, বলিয়া ওঠাই হুই কি, মণিকার এই নতুন রূপের পরিচয় অশোক হইয়া চাহিয়া থাকে অসম্ভব।

চণ্ডা লাগলোই কেন্দ্রী দেওয়া শাড়ী, কক কলসো মুলের জায়, ও 'কলী-ভিকর' এক অভিনব শ্রী ঘুরিয়াছে।

একটা প্রোব চাহিয়া বিদ্যমান কালে বেশির বসিয়া মণিকা অভিমান-ভরা কণ্ঠে কহিল—তুমি তো জাহান্না—মিলেই কোন্‌ বসতে কালে না—বেহাওয়ার বস ক'ও বসাব।

—কিন্তু আমি তো তেমনই ডাকিয়ে ফিদি মণিকা, যে জাহান্না এর ভাট।

—আজ্ঞা বেশ, আমার বাড়ীতে আমি বসে বসি আসিয়া আছে জাই কো? উল্টে হুইল মণিকা।

দীর্ঘার জাহান্না পূর্বের বসই বস।

এতের জাহান্না তেমনি শিলা?

অশোক কুল কহিয়া মণিকা বসে।

অশোক-টক হয়ে কহিল—কত টাকা এখন কোথায় পায়ে ?

—আহা, কতই বেন টাকা ? ইচ্ছে করলে বেন দিতে পারো না ?

—না তা' পারিলে, তা ছাড়া সে ইচ্ছে আমি করবো কেন ?

—বা রে, আমি লোকের কাছে অপদ্রব্য হই তাই তোলা ?

—তোলা হয়তো নয়, কিন্তু নিজের ওজন না বুঝে যা হয় কিছু করে বসলে অপদ্রব্য তো হতেই হবে মণিকা ?

—হাজার পাঁচ-ছয় টাকা দেবার কনডা আমার নেই—তা বুকেতে পারিনি—সস্তীর ভাবে উঠিয়া বঁড়ায় মণিকা—আমার জড়োয়া গহনা-জন্মে বেচলে এ টাকাটা উঠতে পারে বোধ হয় ?

—হয়তো পারে—বলতো ব্যাভ খেকে আনিবে দেব কাল ।

অশোকের মনতাহীন নিশ্চয় কর্তব্যের মণিকার অভিমান উৎফল হয় হই চোখে জল ভরিয়া আসে । গহনা বিক্রীর প্রস্তাবটাও এখন দ্বলীলাক্রমে স্বীকার করিয়া লইল অশোক ?

কত সামনে কত বাছাই করিয়া এক দিন নিজের হাতে বেগুনি কেনিয়া দিয়াছিল ?

হুগ একটু কাজলের রেখা খাঁকা টানা টানা কালো চোখের কাল বহিয়া বহরন করিয়া কয়েক কৌটা জল গড়াইয়া পড়িল ।

পেক্সা ও কাজল !

ভাবি হুগ একটু হাসির কোমল কুটিল গঠে অশোকের চোটে ।
প্রিয়মতের প্রয়োজন কবে আশ্রয় হুগার নাই মণিকার ?

—কাজল পরের না কি ?

হাসিবার ইচ্ছা সত্যি ছিল না, অশোকের ভাবে ব্যঙ্গিক হইয়া যায় কথটা ।

—পছন্দি, পছন্দিই তো, বেশ করেছি ।

—সে তোমার চুটি । কিন্তু হিসেবে একটু ভুল করে গেছে মণিকা । যারা কাজল তোমাদের পুরতে হয় না, পুরি আদর, তাই তোমরা দুন্দর, তোমরা দেবী, তাই আমাদের বাহুদ্বয়ের প্রয়োজন হয় না, হয়—পুলার যন্ত্রণ । কিন্তু ভুল এমনি করেই এক বিন বর পড়ে, প্রতিমার তেজর থেকে বড় উঁকি মাড়ে, জড় হয়ে যায় ভাবগান । কিন্তু ছি, কান্নাটা কমাও মণিকা, ওটা দেখা যায় না । সামান্য কটা টাকার জন্তে তোমাকে হুগে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু সত্যিই আশ্রয় দেবার কনডা নেই আমার । 'আমার' বলে যা কিছু জানতে, সবই এখন রাস্তার মিশনের ।

কালো ছলিয়া অকুট আর্দ্রনায়ে মণিকা বলিয়া ওঠে,—তার পর ?
তুমি ?

—তার পর ? তার পর আমি আছি আর মিশন আছে ।

প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া ওঠে অশোক ।

পিতৃযজ্ঞ

শ্রীকৃষ্ণদত্ত মল্লিক

কপের অম্লি মাতা-পিতাগণে প্রণতি জানাই পার ।

গলাগাগরে করি তপণ গৌমুখী ভেদি তা বার ।

পুণ্যপুণ্ড্র হে বর্ষাবাসী,

ভক্তি ও পূজা করি, ভালবাসি,

তোমাদের দীন সন্তান, কবি বন্দনা কবিতার ।

তোমাদের মেহ শুভ আকাজল কণ-লতিকা ধরি,
স্বরভির মত নামিয়া এসেছে যেক্ষেত্র এ বুক ভরি ।

তোমাদের দান করি আমি ভোগ,

পারিজাত সাখে এ ফুলের বেগ,

তোমাদিকে আমি পরশিতে গিয়া হরিষে পরল করি ।

হৃষ্ট হই আমি হতে এই সূর্য বর্তমান,
এলো তোমাদের অমৃতের ধারা পাই তার সন্ধান ।

সদেহু এখনি হুখ হুখ ব্যথা,

এই প্রতীকা এই ব্যাকুলতা,

কয়েক ধরার এই মধু-বিশ আমাদের মত পান ।

সাধু পবিত্র পুণ্য জীবন দেখার কাটাতে হয়,

নব নব অভিজাত্য দিয়েছ কণ-স্বর্গাধার ।

বহুনিষ্ঠ উন্নত ততি,

জানী, তেজস্বী, বিত্তত চুটি,

পেলে আনন্দ দেবের সেবার, জীবনের প্রেরণার ।

তোমাদের কাছে এক হয়ে গেছে নর আর নারায়ণ,
শ্রুতা এক হৃষ্ট হই দেখা করেছে সম্মিলন ।

শিত্তলোকের অমৃতের হ্রদে

গলা মিশেছে গিয়া হরিপদে,

আমি নব বটি—কিন্তু আমার দেবতারার পর নন ।

কত সভ্যতা, কত বিদ্রব, কতই হুগাভব

হেরেছ তোমরা সন্ম করেছ কত মনস্তব ।

বায়নি শুকায়ে তোমাদের ধারা,

কিপটহয়েতে হুগ নাই চাড়া ।

পদ্মাবতী ও উজ্জয়ের নিম্নভাগে শত বার ইহার। কুমির উপর
গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই বড় ইহাদের একটি নাম গু-
পাধ এবং পতিত ভাবে গমন করে বলিয়া আর একটি নাম পান্থ।
কুমির বন্ধুর হইলে ইহাদের গভারাতের ঘূষ প্রবিধি হয়। কুমির মৃত্যু
হইলে ইহার প্রবিধাযুক্ত চলাকের করিতে পায়ে না। কামের মত

৭ বছর উপর গমনাগমন ইহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তাদের মেরুণও মাত্র তেত্রিশখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। সর্পের মেরুণ প্রায় চারি শত অস্থি দেখা যায়। স্থলচর সর্পেরা জলে পড়িলে দুমাত্র বিকৃত হয় না। সমুদ্রগে জলাশয় প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া।। সামুদ্রিক সাপরা এ বিষয়ে অত্যন্ত অসহায়। ভরস্দের বেগে নক্রমে সমুদ্র-তটে আসিয়া পড়িলে সামুদ্রিক সর্পেরা অসহায় অবস্থায় বৎ পড়িয়া থাকে। কিছুমাত্র জলসর হইতে পারে না। পুরীর প্র-তটে বালীর উপর কতকগুলি সামুদ্রিক সর্পকে নিষ্কীর্ণ ভাবে ভুয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ইহাদিগকে পুনরায় দূর মধ্যে লইয়া বাইতে না পারিলে তটের উপরেই ইহাদের গুণ্টিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে সি-গাল নামক সামুদ্রিক পক্ষীর দিগিকে উল্লস্ক করিয়া ফেলে।

সর্পেরা প্রচুর পরিমাণে জলপান করে। জল না মিলে পালিত কৈ জীবিত রাখা হুঙ্কর। অধিক পরিমাণে জল পান করিলেও তাদের উপরে সূত্রকোষ (Bladder) নাই।

গু-সর্পের দুইটি জননেদ্রিয় থাকে। সর্পায় সহিত সঙ্গম কালে ই দুইটি জননেদ্রিয় নলাকারে সম্মিলিত হইয়া থাকে। ষ ষ পীর মধ্যেই সর্পদের সঙ্গম ঘটয়া থাকে। দুইটি ভিন্ন প্রেবী যেমন মন ও গোফুরে সম্মিলন হইতে দেখা যায় না। সঙ্গম কালে প ও সর্পকে বহুক্ষণ একত্র জড়িত থাকিতে দেখা যায়। সাধারণ ণ্ডা সর্পকে সন্ধ্যা হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই ভাবে অবস্থান দ্বিতে দেখা গিয়াছে। এ সময়ে ভয় পাইলে বা তড়িত হইলে পর্মিধুন বিজড়িত ভাবেই পলারনের চেষ্টা করে। টিকটিকিদেরও ইটি জননেদ্রিয় আছে। সঙ্গম কালে সম্মিলিত জ্যেষ্ঠীমখনকে হুঙ্কে বিযুক্ত করা যায় না, এরূপ প্রয়াসে উহাদের দেহই বয় বচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

মাছ ও অজ্ঞাত সরাহুপের মত সর্পের রক্তের তাপ অত্যন্ত কম। এই কারণে উহাদের দেহ সর্বদাই শীতল বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের রক্তের তাপ মাত্র ৮৮° (ফার্ন)। পাখীদের রক্তের তাপ সর্বাপেক্ষা অধিক—১৮°। সর্পেরা এক কালে ৪৮ হইতে এক শতটি পর্যন্ত অণু প্রসব করিয়া থাকে। অণু হইতে শাবক নিষ্কাশ হইতে গড়ে প্রায় ৩ মাস সময় অতিবাহিত হয়। গোফুরেরা এক কালে ১২ হইতে ২২টি পর্যন্ত অণু প্রসব করে। গোফুরের ভিন্ন হইতে শাবক বাহির হইতে প্রায় ২ মাস সময় অতিবাহিত হয়। কালাচ বা ক্রেটী জাতীয় সর্পেরা ৬টি হইতে ১০টি অণু প্রসব করে। চন্দ্রবোড়ার অণু প্রসব না করিয়া একবারেই শাবক প্রসব করিয়া থাকে। ইহারা এক কালে ৩০ হইতে ৪০টি শাবক প্রসব করে। অণু হইতে বাহির হইবার কালে শিশু-সর্প প্রায় ৮ হইতে ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। প্রথম বৎসরের মধ্যেই সর্প-শাবকের দেহের বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ বিশেষ ভাবে ঘটিতে দেখা যায়, এবং সাধারণতঃ চারি বৎসরের মধ্যেই ইহারা পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্পেরা সাধারণতঃ বিশ বৎসর জীবিত থাকে। -

অস্বাস্থ্যকর অবস্থান করেন, পৃথিবীতে প্রায় দুই হাজার বিভিন্ন প্রকারের সর্প আছে। ইহাদের মধ্যে বিবিধ সর্পের সংখ্যা অত্যন্ত

অল্প। এ দেশে গোফুর, চন্দ্রবোড়া ও কালাচ জাতীয় সর্পই শুধু বিবধর। শাবকের বিভাস-রীতি দেখিয়া সর্পতত্ত্ববিদেরা ইহাদের জাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন।

গোফুর প্রভৃতি বিবধর সর্পেরা প্রাকৃতিতেই ভেঁকাপি অবেশে বাহির হইয়া থাকে। চেমন প্রভৃতি নির্বিষ সর্পেরা সাধারণতঃ দিবাচর। গোফুর শাবকেরা কিন্তু দিবাভাগেও বাহির হয়। কালাচ সর্পের বিষ গোফুর বিবধর চেয়ে তিন গুণ তীব্র। বৃক্ষ ও পীড় বর্গে রক্ষিত শাখাদৃষ্টি সাপ অনেকেরই দেখিয়াছেন। ইহারা করাতি বা কালাচ সর্পজাতীয়। ইহাদের বিষ গোফুর বিষ অপেক্ষা ১৫ গুণ তীব্র। কালাচ সর্পের বিষ-বস্তুর আকার ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। চন্দ্র-বোড়ার মত বৃহৎ আকারের বিষ-বস্তু হইলে কালাচের বিবধর ক্রিয়া যে তিরুপ হইত তাহা ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। চন্দ্রবোড়ার এক-বারের দংশনে যে পরিমাণ বিষ উদ্গীর্ণ করে, তাহাতে দুইটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রাণনাশ ঘটিতে পারে। চন্দ্রবোড়া যে স্থানে দংশন করে উহা বিশেষ ভাবে ক্ষীত হইয়া উঠে। ৪৪ ব্যক্তি প্রাণে বাঁচিলেও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিত বেগ পাইতে হয়।

চন্দ্রবোড়া গভীর জঙ্গলে বাস না করিয়া বৌদ্বৃক্ষ উদ্ভুক্ত স্থানে অবস্থান করে। ভাঙ্গা ইটের পাঁজা, গোদ্বৃক্ষ মাঠে ইহারা পচন্দ করে। কেউটিয়া ভিজা সৈতসেতে জাহগায় থাকিতে ভালবাসে। শুকনা উঁচু স্থান গোফুররা পছন্দ করে। সর্পের মধ্যে চন্দ্রবোড়াই সর্বাপেক্ষা শাস্ত প্রকৃতি।

পৃথিবীর সকল স্থানে সর্প দেখা যায় না। উত্তর-মেরু প্রদেশে অ্যাজোর্স (Azores) দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ড দ্বীপে সর্প দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়ারল্যান্ড ও মাদাগাস্কার দ্বীপে বিবধর সর্পের বাস নাই। ইংলণ্ডে ক্ষুদ্র ভাইপার একমাত্র বিবধর। এই ভাইপারের বিবে মাল্লবের কোনও ক্ষতি হয় না; এমন কি, ক্ষুদ্র বালকেরও জীবননাশ ঘটিতে পারে না। শুধু বিভাল প্রকৃতি ক্ষুদ্র জীব-জন্তুই প্রাণান্ত ঘটিতে পারে।

সর্পের বিষ এত দিন মানবের প্রাণান্তকর বলিয়াই জানা ছিল। এক্ষণে উহা হইতে নানা কঠিন রোগের অমৃতোপম ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক বিদ্যুতিকা ও সাল্পিণাক জ্বরের নিদান কালে যে 'নুচিকাভরণ' প্রয়োগ করেন, তাহা কালসর্পের বিষ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি মতে গোফুর সর্পের বিষ হইতে স্থপিণ্ডের নানাবিধ কঠিন পীড়ার ও গুলাউয়ার শোষণস্থায় ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই ঔষধের নাম ক্যান্ডা বা কোত্রা। আমেরিকার এক জাতীয় ভয়ানক বিযুক্ত বোড়া সর্প (Lance headed viper) হইতে নানা প্রকার কাসি, তালুদুল-প্রদাহ, বিষক্রম, কৰ্কটরোগ (Cancer), বিসর্প (Erysipelas), প্রচণ্ড শিরঃপীড়া, জ্বংস প্রভৃতির উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই ঔষধের নাম ল্যাকেসিস। আমেরিকার ভয়ঙ্কর বিবধর শূন্বমি সর্পের (Rattle snake) বিষ হইতে গ্যাংগ্রেন, রক্তপ্রাব, বক্তের পীড়া, মারাত্মক জ্বাৰ, রক্তপ্রাবী বসন্ত প্রভৃতির অত্যন্তম ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শূন্বমির বৈজ্ঞানিক নামানুসারে ঔষধের নাম হইয়াছে ক্রোটেলাস হরিভাস।

কোনটা যে তাহার বড় আঘাত, সেইটা
বুঝিতেই ভূপেনের অনেককণ সময়

লাগিল। আর্থিক কঠিনতাও তাহার বর্তমান
অবস্থাতে অনেকখানি সম্বন্ধ নাই এবং হয়ত সে
জগৎ, তাহাণে এই অসময়েই, ভবিষ্যতের সমস্ত
স্বপ্ন রূঢ় ভাবে ভাঙ্গিয়া উন্নতির প্রথম অধ্যায়েই
পূর্ণজ্বেদ টাণিতে হইবে। কারণ, মোহিত বাবু যত
আত্মীয়তার দাবীই করুন, যেটা তিনি দিতে
চাহিতেছেন সেটা দয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে
দান কোন অবস্থাতে, কোন বিবেচনাতেই গ্রহণ

করা সম্ভব নয়—কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন সেই দুইহুঁটে
তাহার মনে হইতেছিল সন্ধ্যাকে হারানোটা। তাহার এই ছাত্রটি
কখন নিঃশব্দে ছাত্রীর পর হইতে বন্ধুর আসনে চলিয়া আসিয়াছিল
তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই, কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই যে
ভূপেন এত দিন নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছিল, এইবার সেটা
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল। মোহিত বাবু যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত
দিলেন, সেটা ভূপেনের কাছে অবিশ্বাস—স্বপ্নের কল্পনারও অতীত।
সন্ধ্যা বালিকা কি কিশোরী, সে কথা লইয়া মাথা ঘামানো দূরে থাক
—ভূপেন নিজের মনে বার বার শুধু এই কথাটাই অনুপস্থিত
মোহিত বাবুকে বুঝাইতে চাহিল—সে পুরুষ কি নারী এই তথ্যটাই
সে সম্পূর্ণ তুলিয়া গিয়াছিল। সব চেয়ে সে কেমন দেখিতে, ফর্সা
না কালো, সুন্দরী না কুৎসিত, এটাও সে কোন দিন ভাল করিয়া
চাহিয়া দেখে নাই। সন্ধ্যা শুধু সন্ধ্যাই—সে তাহার ছাত্রী। তাহার
কথা মনে হইলে শুধু তাহার সঙ্গ, একাগ্র চোখ দুটির কথা, শিক্ষা
সম্বন্ধে তাহার অসীম কৌতূহল ও একান্ত নিষ্ঠার কথাই মনে পড়ে।
সন্ধ্যা সেই ছাত্রী, বাহার প্রদ্বা হারাইবার ভয়ে নিজেকে অনেক যত্ন
প্রস্তুত করিতে হয়, রাত জাগিয়া মোটা মোটা বই পড়িতে হয়।
বাহার অন্তরের মাধুর্য ও তপস্যা পবিত্র দীপশিখার মত অলিয়া গুরুতর
অন্তরকে শুষ্ক দীপ্ত করিয়া তোলে।

কঠোর পরিমাণটা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেন মোহিত
বাবু সম্বন্ধে একটা প্রবল অভিমান এবং ক্ষোভ অনুভব করিতে
লাগিল। মোহিত বাবুকে সে প্রদ্বা ত করিতই, ভালও বাসিত।
সেই জঙ্কই অভিমানটা তাহার এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া,
মানুষের যখন স্বার্থে আঘাত লাগে তখন অপর দিকটা সে কিছুতেই
বিবেচনা করিতে পারে না। ভূপেনও, মোহিত বাবুর কথা মথ্যে
যত যুক্তি যত আন্তরিকতাই থাক, তিনি যে নিতান্ত অকারণে
তাহার প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিলেন, এ কথাটা না ভাবিয়া
পারিল না।

তবে একটা প্রতিজ্ঞা সে ইতিমধ্যেই মনে মনে করিয়া ফেলিয়াছিল,
তাহার বেদনাবোধের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত মোহিত বাবুকে সে কোন
উত্তর দিবে না। ১০০কিন্তু সেটা কমিতেও অনেকখানি সময় লাগিল।
সে-রাজ্যে ত সে ঘুমাইতে পারিলই না, পরের দিনও সমস্ত সকালটা
পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মনে মনে কেমন
একটা অপরিণীত শূন্যতা অনুভব করে সে—কি যেন তাহার হারাইয়া
গেছে, মূল্যবান কিছু, যা আর কোন দিন সে কিরিয়া পাইবে না।

একটা সন্ধ্যাটা পর্যন্ত এই ভাবে ঘুরিয়া আসিয়া অবশেষে



[উপস্থাপন]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

যখন জোর করিয়া সে জানাহার সারিরা পড়ার
টেবিলের কাছে বসিল তখন সে অনেকটা পাশ
হইয়া আসিয়াছে—বরং নিজের এই অপরিণীত
চিন্তা-ক্ষোভের জন্ত নিজের কাছেই যেন একটু
লজ্জিত।

মোহিত বাবু তাহাকে অবজ্ঞা একেবারে বাড়ী
বাইতে নিষেধ করেন নাই, আজ হইতেই যে
পড়ানো বন্ধ করিতে হইবে এমন কথাও বলেন
নাই, শুধু আর ও-বাড়ী বাওয়া যায় না। মোহিত
বাবুকে বাহা বলিবার চিঠি দিয়াই জানাইতে
হইবে। সন্ধ্যা হয়ত তাহাকে আশা করিবে,

কিন্তু আজ সেখানে গেলে তাহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইয়া
আসিতে হয়, অথচ কি-ই বা বলিবে তাহাকে। আর, মোহিত বাবু
যে আশঙ্কা করিতেছেন যদি আলোচনা-প্রসঙ্গে সে কথা আর ভাসমান
সন্ধ্যার কাছে প্রকাশ পায় ত লজ্জার সে মরিয়া যাইবে। তা ছাড়া,
কোনরূপ নাটকীয় বিদায় লইবার সম্পর্ক ত তাহাদের নয়—কোন
পক্ষেই কিছু বলিবার নাই। ক্ষতি যেটুকু সেটুকু একান্ত অন্তরের,
তাহা মনেই থাক।

সে প্যাড ও কলম লইয়া মোহিত বাবুকে চিঠি লিখিতে বসিল।
শ্রীচরণে পাঠ পর্যন্ত লিখিয়া অনেককণ শুষ্ক ভাবে বসিয়া রহিল।
চিঠিতে কোন দ্বন্দ্ব, কোন আবেগ না প্রকাশ পায়। অথচ যে ভাষা
প্রথমেই বাহির হইয়া আসিতে চায়, তাহা সবই অভিমানের। অতি
কঠোর, কঠোর শাসনে মনকে সংবৃত করিয়া সে লিখিল—

শ্রীচরণে—

বাড়ীতে আসিয়া আপনার কথাগুলি ভাল করিয়াই ভাবিয়া
দেখিলাম। আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে
আপনার আন্তরিক স্নেহ এবং মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।
কিন্তু স্নেহ মেহই—সেটা যখন আর্থিক মুদ্রা পবিত্র
হয় তখন সেটাকে আমরা দান বলিয়া মনে না
করিয়া পারি না এবং সে দান গ্রহণ করিলে আপনার
চোখে আমি খানিকটা ছোট হইয়া যাইবই—
অস্বস্ত: আমার তাই বিশ্বাস। সুতরাং আপনার স্নেহ যদি
আজ মাথা পাতিয়া না লইতে পারিত ত তাহাকে অকৃতজ্ঞতা
বা ল্পধা বলিয়া মনে করিবেন না। বরং আপনি আশীর্বাদ
করুন, আমি যেন সর্বতোভাবে আপনার স্নেহের উপযুক্ত
হইয়া উঠিতে পারি। আমার মনে হয়, আমি যদি নিজের
চেষ্টাতেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই
আপনার স্নেহ ও আশীর্বাদের মর্যাদা থাকিবে, আপনি
ক্ষুব্ধ হইবেন না—আপনার কাছে আমার প্রতিজ্ঞা রহিল—
যে এম-এ পাশ করা পর্যন্ত আপনি আমাকে আর্থিক সাহায্য
করিতে চাহিয়াছিলেন, সে এম-এ পরীক্ষা আমি দিবই।
তাহার জন্ত কঠোর কৃচ্ছ-সাধন যদি করিতে হয় তাহাও করিব।

কাল যে কথা-বার্তা হইয়াছে তাহার পর আর আপনার
বাড়ী বাওয়া বাহনীর কি না ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ডাকেই
চিঠি দিলাম। এই সঙ্গে সন্ধ্যাকে একখানি চিঠি দিলাম,
যদি বাধা না থাকে, তাহাকে দিবেন। প্রণাম লইলাম।

ইতি—

কি চিঠি লিখিল সে তিন ছত্র—

ল্যাথিয়ায়—

তোমাকে পড়াতে যাওয়া কোন কারণে আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কারণটা দাতার কাছ থেকেই শুনে। যেন ঘিরে পড়াশুনা ক'রে—আর কাকুর সাহায্য লাগবে। সে মনে হয় না। আমি বেখানেই থাকি, আমার দায়ীর্ঘ্য ও কল্যাণ-কামনা তোমাকে নিরন্তর ঘিরে থাকবে।

ইতি—মাতার মশাই।

চিঠিখানা খামে মুড়িবার আগে 'কারণটা দাতার কাছ থেকেই' লাইনটা কাটিয়া গিল। থাক—সন্ধ্যা যদি তাহাকে অকৃতজ্ঞ, মন ভাবে সে-ও ভাল, তবু কোন কদর্য সশব্দের কালি তাহাকে স্পর্শ না করে।

চিঠি সে নিজেই ডাকে দিয়া আসিল।

মুক্তি।

বত বেদনাচার্যকই হোক—মুক্তির একটা আনন্দ আছেই। চিঠি ক দিয়া কতকটা সেই আনন্দেই ভূপেন যেন নিজেকে অনেকখানি পূর্ণ বোধ করিল। সে উদ্বেগজনিত ভাবে কলিকাতার পথে ঘুরিতে তে নিজের মনকে প্রবেশ দিতে লাগিল, 'যাক—বাচিলাম! কাল তে যে অষ্ট্রীতিকর প্রসঙ্গ মনকে ভারি করিয়া রাখিয়াছিল তাহার চ ইহতে ত অন্ততঃ অব্যাহতি পাইলাম। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতা ও হ্রের সহিত কর্তব্য বিশিষ্ট ক্রমশঃই ওখানে একটা বন্ধন দূত ইহতে-ল, সেটার হাত ইহতেও অব্যাহতি পাইলাম। ঈশ্বর যা করেন লোকের জন্ত। এ এক বরম ভাগই হইল।'

কিন্তু খানিকটা ঘুরিবার পরই কেমন একটা অবসাদে পা-ট্টা ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু যে বাকী আরও অসম্ভব! কোথায় যেন কি একটা দুঃখিনী টিরাছে, কি যেন এক শোচনীয় হতভাগ্যের ইজিত চারি দিকের দাবহাওয়ার ১০০সে কতকটা নিজের উপর বিখন্ত হইয়াই বাড়ী ফিল।

বাড়ী চুকিতেই প্রথম দেখা হইল অবিনাশ বাবুর সঙ্গে। কানে একটা আধ-পোড়া বিড়ি এবং হাতে পানের বেটায়া চূপ—বাক্ত ভাবে কথার হাতেই ছিলেন, ভূপেনকে দেখিয়াই কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া কহিলেন, কি বাবাজী, এমন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরলে যে! তাহার সেই টুইন্তনী নেই? বড়লোকের মেয়ে, গেঁথেছ মন্দ নয়—এখন খেলিরে তুলতে পারলে হয়।

সন্ধ্যারপক্ষ: অবিনাশ বাবুর কথায় কান মিত না ভূপেন, লোকটির কথার ভিত্তিতে সর্বদা এমন একটা নোংরামীর ইজিত থাকে যে তাহাকে দেখিলেই তাহার গা বিন্-বিন্ করিত। কিন্তু সে যিনি পাশ কাটাইতে গিয়াও তাহার মনে পড়িয়া গেল যে এই লোকটির কণ্ঠে ছোট-বাট বিস্তর টুইন্তন থাকে—সে কোন মতে ঠোক গিলিয়া গিলিয়া ফেলিল, সে টুইন্তন ছেড়ে দিলেই—আমাকে আর একটা কথা দিতে পারেন?

অবিনাশ বাবুর পানে দী করিয়া তাকিয়া থাকিবার

আগেই আনন্দময় বাবাজী, বাবাজীরা ছেলে মেয়েছেলে মেয়েছেলে কি অমনি বাড়াবাড়ি শুরু করে দেখ.....থাক, দুঃখ কয়ে না, ও অমন হয়েই থাকে। মোক্ষ, এত দিন দায়ব করে এসে এখন কি আমাদের আটপন নিকার টুটপান করতে পারবে?

অবিনাশ বাবু হতটা বলিলেন তাহার চেয়ে ঢের বেশী কদর্যতা প্রকাশ পাইল তাহার মুখভঙ্গিতে। সে দিকে চাহিয়া যোগে ভূপেনের সর্বদেহ অলিয়া গেল, সে তাহার কথার উপর না দিয়াই উপরে উঠিতে শুরু করিল। কিন্তু অপর্যেব সৌজন্তের অভাবে উৎসাহ কমিবে অবিনাশ বাবু তেমন লোক নন—উপরে পৌঁছিয়াও ভূপেনের কানে গেল অবিনাশ বাবু বাবাজীরা ছেলের নৈতিক চরিত্রের উপর বক্তৃতা করিতেছেন।

কোঁকের মাথার কথাটা তাহাকে বলার জন্ত ভূপেনের অত-তাপের সীমা রহিল না। সবচেয়ে বেশী ভয় তাহার বাবাকে, অবিনাশ বাবু প্রথমেই তাহাকে সবদটা দিবেন এবং টীকা ভাষা সমেত দিবেন। অথচ আবার সেই অবিনাশ বাবুর আট টাকার টুইন্তন করা কি সম্ভব? ভূপেন আপন মনেই মাথা নাড়িয়া উঠিল, না, আর তা সম্ভব নয়।

সে যখন উপরে আসিল তখন মা রান্নাঘরে বিঘন ব্যস্ত; কেন সে আজ পড়াইতে গেল না, সে কৈফিয়ত চাহিবার সময় সেটা নয়। আপাততঃ জবাবদিহির হাত ইহতে দূকা পাইয়া সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানাতেই শুইয়া পড়িল। এটি তাহার নিজস্ব ঘর, মোহিত বাবুর কুপায় এত বড় বিলাসও তাহার সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু এখন কি আর রাখা সম্ভব হইবে!

একটু পরেই বাবা ফিরিলেন। অফিস হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহই বাবুর হইয়া আসেন—আজও সেই পুঁটলিটি হাতে ছিল কিন্তু আজ সোজা রান্নাঘরে না গিয়া তিনি পুঁটলি সমেত এ ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্ভির কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ যে, তোরা টিউশনটো না কি গেছে? অর্থাৎ অবিনাশ বাবু ইতি-মধ্যেই তাহার কাজ সারিয়াছেন। বাবার প্রশ্ন করিবার ধরণে ভূপেনের সর্বদা অলিয়া গেল, তবু কোন মতে আবদ্ধস্বপ্ন করিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ।

কণ্ঠে তাহার বিরক্তি আর চাপা রহিল না, আজকালকার বাবাজীরা এমন একটা টিউশনো পাওয়া কি সোজা কথা। এখন খরচ চলবে কিসে তনি?

এতক্ষণের সজিত সমস্ত কোভ এখন বাবার উপরই গিয়া পড়িল, সে তিক্ত কণ্ঠে কহিল, সে ভাবনায় আপনার ব্যবহার কি বাবা, এ টিউশনো কি আপনি জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন?

উত্তরটাতে দমিয়া গেলোও উপেন বাবু হাল ছাড়িলেন না, গলায় খর হতটা সম্ভব আহত শোনাইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, একসঙ্গে থাকতে গেলেই দু'টো-একটা কথা কইতে হয়, তা ছেলের মেজাজ দেখ না! তবু যদি চার চারের ভাব নিতে। সঙ্গের করতে হয় না বলেই জন্ত বেজায় রাখতে পেরেছ, সঙ্গেরের জর বাড়ি পড়লে বুকে ১০০০০ বেজায়ের জরই ত সব সেল—টিউশনোই হল চাক-ব-মনির সম্পর্ক, চাকরী দেখানে করতে হবে—সেখানে কি মনে-অভিমান

কুপেন বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া আবার জামাটা টানিয়া
 ইল। কুপেন বাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিয়, তিনি এখন সহজে
 মিনিবে ন। অথচ তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থার খেয়াল রাখাও
 ঠিন। সে জুতা পরিতেছে দেখিয়া উপেন বাবু রান্নাঘরের দিকে
 ১ বাড়াইলেন, কিন্তু বক্তৃতা তখনও তাঁহার খায়ে নাই, তিনি
 লিতে চলিতেই বাড়ীস্থ লোককে শুনাইয়া থলিতে লাগিলেন,
 ২ জত্নেই তখন বসেছিলুম যে, বি-এ পাশ করলি, এই বার চাকরীতে
 ৩ কে পড়। তখনও গম্বু সাহেব ছিল, অনায়াসে ঢোকা যেত—চাই
 ৪ কে এত মিনে এক বছর হয়ে গিয়ে একটা ইনক্রিমেন্ট পেতিসু। সেই
 ৫ গুরুই এখন করতে হবে, তখন মিচিমিচি এম-এ পাশ করে সময়
 ৬ নষ্ট করবার কি দরকার বুঝিনে—

তুপেন দ্রুতগতিতে সিঁড়ি ক'টা পার হইয়া বাজার পড়িয়া যেন
 ঠাক ছাড়িয়া ঝাঁচিল। কিন্তু বাবার শেষ কথাগুলো তখনও তাহার
 কানে বাজিতেছিল, তাহাদেরে খালা হইতে সে অত সহজে অব্যাহত
 পাইল না। 'চাকরীই বন্ধন করিতে হবে'—সত্যই ত, আর কি আশা
 তাহার আছে? এম-এ পাশ করিয়াই বা কি তাহার হাত-পা
 গুজাইবে, কোন্ পথ তাহার সামনে খোলা পাইবে সে। এত দিন
 বড়লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করার ফলেই এই অনিশ্চিষ্ট হইয়াছে
 তাহার, নিজের অবস্থার কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছে। কোথা দিয়া
 কি করিয়া যেন ইলানী? তাহার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে,
 এম-এ পাশ করিবার পরও শিক্ষার পথ তাহার কাছে বন্ধ হইয়া
 যাইবে না, সাধনা চলিবে অব্যাহত গতিতে। ...হায় রে !

ভূপেনের হাসি পাইল। কত আশা তাহার। ...গরীব হয়
 নিজের অবস্থার কথা ভুলিয়া যাওয়ার মত অপরাধ আর নাই। ...
 না, মোহ যখন তাহার চুটিয়াছেই তখন আর সুখ। আশার পিছনে
 সোড়িয়া সময় নষ্ট করবে না। ভূপেন যেন একবার নিজেকে একটু
 নাড়া দিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিল—এম-এ পড়া থাকে
 চাকরীর চেষ্টা দেখাই ভাল।

সে ঘুরিতে ঘুরিতে হেঁসোতে আসিয়া অবসর ভাবে একটা বেকিতে বসিয়া পড়িল। সে আজই মোহিত বাবুকে কথা সিয়াছে যে, সে এম-এ পাশ করিবেই। তাছাড়া সন্ধ্যা—সন্ধ্যা দুঃখ পাইবে। সে লেখাপড়া ছাড়িয়া সিয়াছে শুনিতে তাহার দুষ্কৃতিতে যে বেদনা ছুটিয়া উঠিবে কল্পনায় তাহার আভাস মাত্র পাইয়াই ভূপেন অস্থির হইয়া উঠিল। অথচ উপায়ই বা কি, বাবার বা জায় তাহাতে সন্ধ্যাই চলে না, পড়ার খরচ সেখান হইতে আশা করা বাহুল্য। টিউশনী করিবে? ইতিপূর্বেকার ছোট ছোট টিউশনীর যে তীব্র অভিজ্ঞতা ভূপেনের ছিল, চোখ বুজিয়া তাহার ছবিটা মনে করিবার চেষ্টা করিতে সে শিরহিয়া উঠিল। না, তখন যাহা সম্ভব ছিল এখন আর তাহা নাই। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক

সম্মুখে সমস্ত দুঃখ-ভয়ই তাহার কল্যাণের পিঠায়ে—সে অপমান, শিকার সে অমর্যাদা আর সহিবে না।

কিন্তু চাকরীই বা কোথায় ? কি কাজ পাইবে সে ? বাবার সেই সন্তানগণী অফিসে হুত একটা কেরানীসিরী এখনও মিলিতে পারে—হুত বাবা চৌ করিলে সেটা জোগাড় করা এমন কিছু কঠিন হইবে না । কিন্তু, এই জুই কি সে এত লেখাপড়া শিখিল ? বছরের পর বছর সেই একই রোতবে বলিয়া ঘাড় শুঁজিয়া কাজ করিয়া বাস্তব, এক-বয়স ও সম্পর্ক-নির্কশেবে অসীল রসিকতা করা ? পরতাপ্লিশ টাকা হইতে মুখ, হুতিবার বয়সে 'একশ' পনেরো টাকায় অব্যাহতি, সব ক্ষেত্রে তাও না । এই ত সে চাকরীর মূল্য !

দুপেন আর একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার চেয়ে আশঙ্কিত্য করা ভাল। যনে পড়িল সন্ধ্যার কথা, তাহার ইচ্ছা ছিল—দুপেন অধ্যাপকের কাজ করে। দার্জিলিং-এর সেই নিভৃত বেষ্টিতে বসিয়া বলা কথাগুলো যেন আজও কানে বাজিতেছিল, ‘আপনি আর কিছু করছেন, এ আমি ভাবিতে পারি না !’

হতাশা ও ক্ষোভে ভূপেনের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। অব্যাপকের পদ পাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তাহার কাছে হাশ্বকর। প্রথমতঃ এম-এ পাশ করার সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ শুধু এম-এ পাশ করিয়া প্রোফেসরী করিতে চুকিবার আগে অনেকগুলি মুকবি প্রয়োজন হয়। সে মুকবি তাহার নাই। না, ও-সব কথা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

ভূপেন জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। গরীব কেরাণীর ছেলে
 সে—স্বপ্ন দেখার সময় নাই।...কিন্তু সে যে আজই মোহিত ব্যসকে
 সমস্তে চিঠি দিয়াছে, তাহার সাহায্য ছাড়াও সে এম—এ পরীক্ষা দিবে,
 সে কি এতই ভুয়া, অন্তঃসারশূন্য।...একটা উপায় আছে প্রাইভেট
 সেওয়া—কিন্তু সৎসঙ্গারী অফিসের চাকরীর সহিত শিক্ষার সাধনা—
 এ কি সম্ভব।...তা ছাড়া, অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কিছু
 করিতেছে, এ কথা আজ যেন সে ভাবিতেই পারে না।...টিউটরী
 ছাড়া অন্য কোন বকমে শিক্ষায়ত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি থাকা যায় না ?

অকস্মৎ তাহার চোখ ছুটি জ্বলিয়া উঠিল। ঠিক ত—মাঠারী
ত সে করিতে পারে। তাহার অনাস—এর এটুকু মূল্যও কি মিলিবে
না? বাংলা দেশের ইকুল-মাঠারীর বেতন সামান্য—কিন্তু তাহাতে
তাহার নিজের স্বচা ত চলিবে। ...এম-এ পরীক্ষা দেওয়ারও সম্ভাবনা
থাকে, অবসর বেশী, পড়াশুনার সময় পাওয়া যায়। তাতেও যদি
সে নিজের উন্নতি করিতে না পারে ত সেটা তাহার নিজেরই
অকস্মতা।

সে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে মন স্থির করিয়া ফেলিল,—ইছুল-মাঠার ঘর চোঁই দেখিবে সে, 'তাই হোক সখ্যা—তোমার চোখে ছোট আমি কিছুতেই হবো না !'

[कर्मणः]

“আমরা অল্প মা মানি না—জননী জন্মভূমি বর্গাবধি গরীয়সী। আমরা বসি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—ভ্রাতৃ নাই, পুত্র নাই, বর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই মৃজলা, মৃকলা, মলয়বনমধ্যস্থতলা, শতভাষা,—বহিষ্যতজ্ঞ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই বিচিত্র সংসারে কত না বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আমরা দেখতে পাই। যোগীর শূন্য চুস্তির কথা বক্তব্য—যার হারা

মানুষের হুল বহিস্কারের অন্তরালে শুণ্ড গভীর সম্ভাবনাকুলি দেখা ও নির্ণয় করা যায়। তা ছাড়াও ব্যবহারিক জগতে সাদা চোখেই আমরা পাই কতই না বহু বিচিত্র মানুষের টাইপ। চতুর, বুধ, ক্রুর, সরল, বসিক, ভাবালু, শাস্ত্র, চক্কল, পাগলাটে, অহঙ্কারী, গভীর, বুদ্ধিমান এমনই কত-শত বিভিন্ন জীব অহরহঃ আমাদের চোখের উপর দিয়ে অবিরাম জীবনের শোভাযাত্রার চলেছে। শুধু এসেরই যদি একটা বিশেষ টাইপকে ধরা যায়, যেমন ধরুন বোকাটে ভোঁতা টাইপ; তার মধ্যে এমন বিশট বোকা মানুষকে একত্রে সাবিরক্ষী করে রাখা কবলে দেখা যাবে তারা বিশ জনে বিশ রকম, বিভিন্ন,—তারা বোকামীর তারতম্যে কেউই অল্প কাক মত নয়। তাদের কেউ অশান্ত বা বাতিকগ্রস্ত জীব, কেউ বা শুধু হুলবুদ্ধি বশতঃ নিরেট গাটে; কেউ বা অস্থিরমনা বলে স্থির হয়ে কিছু ধরতে পারে না, হঠাৎ আবেগে বশে ক্রমাগতঃ ভুল করে বসে, বুদ্ধির শাস্ত্র একাগ্র সূচ্যে নিয়োগ-ক্ষমতা সে আধায়ে গভীর। বানরের মত অস্থির প্রাণধর্মী মানুষও আছে, বানর যেমন কাজে অকাছে অনর্থক এ-ডাল ও-ডাল করে মরে, কিছুতেই অকাজ বা কু কাজ না করে পারে না, তেমনি অস্থিরগতি impulsive তরল মানুষও এ জগতে বিস্তার আছে। অলস ক্রিয়ধর্মী তমর অবতার মানুষের অপেক্ষা এরা সক্রিয় ও চক্কল বটে কিন্তু সমান বোকা। আরও বহু প্রকার নির্বুদ্ধি মানুষের প্রকার-ভেদ দেখান যায়, তাদের অগভীর বা অস্থির বুদ্ধির অন্তর্নিহিত কারণ বিভিন্ন হলেও তারা সবাই বোকা পর্যায়ের মানুষ।

এমনই চতুরেরও আছে বহু বিচিত্র রকমারি, বুদ্ধিমানেরও আছে নানা শ্রেণী, ভাবালুরও আছে বহু জাতি। স্নায়বিক, প্রাণবান ও ক্ষরবান এই তিন ধারার মানুষের মিল থাকলেও তারা পরস্পর থেকে বিভিন্ন; কারণ, তাদের জীবনের ভিত্তিই বিভিন্ন। কথটা একটু বিশদ করে বুঝিয়ে বলা যাক। যে দয়ালু আর যে তরুল্ল দ্রাব্য মানুষ, হৃৎকেন্দ্রই বস্ত্রপাত সঙ্ঘ করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে তারা কি এক? এক জন হচ্ছে নিউবিস্‌ম বোগে ক্ল এবং অপর জন কোয়ল স্কেল প্রকৃতির মানুষ। প্রেম-প্রবণেরও আছে বহু রকম; সংসারে অরীর প্রেমিকও আছে, শাস্ত্র প্রেমিকও আছে; প্রেমপ্রবণের মাঝে বার্ষণ্য, নিঃবারণ, ক্রুর, গোষ্ঠী, একনিষ্ঠ, বহুনিষ্ঠ কতই না শ্রেণী বা প্রকারভেদ দেখা যায়, সুতরাং শুধু emotional বা ভাবপ্রবণ বললেই তাদের সবকে কিছুই বলা হতো না। প্রেম সকলেরই অন্তরে অঙ্গ-বিস্তার আছে, কিন্তু দান্তিক আত্মকেত্রীর প্রেম ও বীর নিঃবারণ মহত্তর প্রেমের ধারা বা খেলা কখনই এক রকম হয় না।

মনোপ্রাধান বা mental মানুষ, প্রাণপ্রাধান বা vital মানুষ, জড়প্রাধান অর্থাৎ ক্রিয়ধর্মী বা physical মানুষ থাকলেও মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় তার সবগুলি বস্ত্রের বোগে অর্থাৎ মন প্রাণ

বা reason-এর প্রভাব বারো আনা এবং বার ওপর মাত্র চার আনা, তাদের হৃৎকেন্দ্রের মাঝে কতখানি পার্থক্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অবিকৃত, শুধু নিজের সদয় মন প্রাণ বেহু দিয়েই মানুষ চলে না, কারণ মানুষ পৃথক অঙ্গলয় একটা কিছু নয়, সে বিখচাচরের সঙ্গে যুক্ত, চারি দিকের মানুষ জীব তত্ত্ব বৃক লভা এমন কি লোক-লোকান্তরের সঙ্গেও তার চলছে অহরহঃ সেন সেন আদান-প্রদান মন-বিনিময়। কত সব কুক ও উজ্জল শক্তির প্রভাব নানা ছিন্ন স্নিহ তার ওপর এসে পড়ছে, কত জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কষ্ট ও ভাব-প্রবণতা তাকে দিতে চেষ্টা করছে গতি। একটি অসীম শক্তি-সমুদ্রে সে ভাসছে, তাইই বুকের দোলায়িত তরঙ্গ হয়ে, গোটা সমুদ্রটি এক তার কোটি কোটি ডেউ তাকে সর্করণ দিচ্ছে গতি ও দোলা—এই তো মানুষ?

এই সব বহু বিভিন্ন জাতির মানুষকে একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলেই বোকা যাবে যে, কত কঠিন এই আধার নির্মাচন; পিতৃ-ত্রাজ্ঞাও লোক-লোকান্তরে যার যোগদুষ্টি জাগ্রত, শিবের চোখে যে চোখ মিলিয়েছে, তাইই তারা এ নির্মাচন নির্মূল ভাবে হওয়া সম্ভব; তবু যে ধনুযোগীর ও অস্পৃগ ওজসের আংশিক দুষ্টিতে ও জ্ঞানে এ কাজ চলেছে, তার কারণ জীবনের নিদামক আমরা নই, আমরা স্বা, বস্ত্রের পিছনে আছে মহাশক্তির অজ্ঞাত প্রেরণ। সেই এক অভিন্ন মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ হচ্ছে প্রোবক, পুরুষকার, ওজ, পরিবেষ্টন, গ্রহ-সংযোগ, এমনই আরও কত কি। আমি যে তার মানুষের পিছনের সম্ভাবনাতুলিক বাখ্যা করলাম, সে ভাবে বুঝতে সহজেই অনুমান করা যায়, পরমার্থ-পথের পথিক সিদ্ধ ওজ দূরে থাক, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষক সস্ত্রাণ্যও কতখানি অজ্ঞ হয়ে বা-তা' করে ছেলে ঠিকিবে চাককে মানুষ হবার পথে চালনা করেন। কোন্ অপরিতপ্ত মানুষটিকে কি ভাবে ধরলে তার অন্তরঙ্গ মেধা-নাড়ী জাগবে, চরিত্রের বাঁকা দিক সোজা হবে, তা' কর্তৃক শিক্ষক কতটুকু বোঝেন এবং বুঝে সরলীর স্পর্শ নিয়ে তাকে মানুষ করেন? এ সব ক্ষেত্রে সত্য সত্যই "Ignorance is bliss"—অজ্ঞতাই এক প্রকার আশীর্বাদবরূপ। আমাদের এত অজ্ঞতা, এত তুল-জ্ঞানিতও যে মানুষের আমরা খুব বেশী কতি করতে পারি না, তার কারণ এই জগচ্চক্ চলছে তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত স্বভাবে (বস্ত্র), বস্ত্র:কুর্ভ গতিব হচ্ছে; সে গতি ও সে ধারা করে ফিরে সব ব্যর্থতা ও বিপত্তি কাটিয়ে পরিণামে নিজেই সফল করবেই।

Chiron জ্যোতিষবিজ্ঞার বা সামুদ্রিকের গ্রহে মানুষের নানান গঠনের আভুল, নাক, চোখ, ইত্যাদি আকৃতি নিয়ে চিত্র সাহায্যে চরিত্র-বিচার করার প্রণালী দেখা আছে। আবার Phrenology মানুষের মাথার বিভিন্ন গঠন থেকে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাবের বা প্রকৃতির স্বরূপ নির্ধারণ করতে শেখার। এ সবগুলিতেই আছে যানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য নির্ধারণ করার বিভিন্ন পথ। বাস্তবের এই হুল যানবাধার প্রতি আছে প্রতি অগ্নে রয়েছে সেই মানুষটির অন্তর্নিহিত স্বভাবের লক্ষণ ও পরিচয়। এই সব বহিস্কারণে দেখে এক প্রাধানতঃ স্পষ্ট জ্ঞান বা প্রজ্ঞার (intuition) সাহায্যে

এই স্বার্থ ও স্বভাব এমনই অমোঘ ও অবশ্যকারী যে, তার বিকাশ কেউ রোধ করতে পারে না। প্রতি মানবাবোধের এই অমোঘ স্বার্থকে লক্ষ্য করেই শাস্ত্রকার বলেছেন, “স্বার্থে নিবনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।” কর্ম্মকে গোড়ায় ধরে মধ্য কর্ম্মকিং পরিভূষিত ও ভোগের অবসর না দিয়ে তাকে প্রথমেই কর্ম্মবিরতি অভ্যাস করানোর মত বিড়ম্বনা আর নেই, তার ফলে সাধনাধীও গুরু ছুঁজনেই ক্রমাগত ব্যর্থতা অক্ষয়ন করে চলে। স্বভাব বাক্যে কল্পপথে অহরহঃ টানছে, তাকে কিন্তু গোড়ায় যদি প্রাণ ভরে কল্প করতে দেওয়া যায়, তা হলে ধর্মের প্রতি স্বভাবজ টানকে সে ভোগে তৃপ্ত করে কতকটা ক্ষীণ করে আনতে পারে, তখন তার অবসাদগ্রস্ত ভোগতৃপ্ত প্রশান্ত চিত্ত আশ্রয়িত কর্ম্মবিমুক্ত হয়। বৈবাগ্য তখন আপনি আসে এবং তাকে যোগমুখী করে; উপদেশ বা ক্রিয়া মন্ত্রসাধন-প্রচেষ্টা সকলই কর্ম্মিত উর্ধ্বের ভূমিতে পড়ে জীবন্ত সতেজ হয়ে গজিয়ে ওঠে। যেরূপরত্না অখচ সন্তানবক্তিতা নারী অসুতঃ পূর্বের সন্তানকে বা সম্বন্ধ-পালিত পশুপক্ষীকে বুকে ধরে সে সহজাত স্নেহের অধীর ক্রোধকে তৃপ্ত না করে পারে না। সাধনপথে তাকে নিতে হ’লে ভগবানকে গোপালরূপে তার ঈর্ষ করে দিতে হয়, গুরুকে বা কোন পূর্বের সন্তানকে বালগোপালরূপে ভালবাসে সে নারী সহজ ক্রমশঃ ভগবানে ডুগতে বা একাগ্র হতে পারে। তাকে বেশত্ব-গুরু এসে বৈরাগ্যের গুরু জ্ঞানাত্মক উপদেশ দিলে সে ভক্তিমতী প্রেমশ্রবণা নারীর কোমল চিত্ত শুকিয়ে কঠিন হয়ে যায়, সেই মক-প্রান্তরে দমকা বাসনার হাওয়া তাকে একাগ্র হতে দেয় না।

জ্ঞানী স্বভাব-পণ্ডিত আবার কল্প বা প্রেমের কোনটারই ধার ধারে না। বুদ্ধিজীবী বিচারশীল মানুষের কাছে প্রেম বা স্নেহ হস্তাকর দুর্বলতা-বিশেষ, তার চোখে কল্পপ্রবণতা চকল অগভীর সফীর পথ। সে কিছুতেই বুকে উঠতে পারে না যে, ঐ অধীর কর্ম্মী অমন করে কেন ব্যর্থ কল্পে ছুটে বেড়ায়, ঐ স্নেহ-ভক্ত বা কেন মাতাল অকৃতজ্ঞ অভ্যাচারী সন্তানের পিছনে এত লাঞ্ছনা ভোগ করেও তাকে ছাড়তে পারে না। কর্ম্মীর অজ্ঞান প্রাণশক্তি প্রেমিকের বুকের অঘাতিত প্রেরণা ও জ্ঞানীর ভাব্যব মেধা একই আধারে সমান প্রাবল্যে ক্রটি দেখা যায়—এমন মানুষ সত্য সত্যই দুর্ভাগ্য, যার তিনটি প্রধান চক্র (মন প্রাণ হৃদয়) বা জীবন-বেগ্নই সমান বিকশিত।

যে মহাশক্তি জীব-জগৎরূপে রূপায়িত পুষ্টিত হচ্ছে, সে এসেছে অগাধ্য আধারে অনন্তমুখী প্রেরণা নিয়ে রূপ গ্রহণ করতে, দলের পর দলটি মেলে বিকশিত হতে; তাতেই তার সার্থকতা ও আনন্দ। প্রত্যেক আধারস্থ চিন্তাক্রিকে তার স্বভাবের ধারায় ফুটতে দিতে হবে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তার মোড় কিরিয়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে তারই নিজস্ব পূর্ণাভিমানের পথে, তাতেই তার সত্যকার চরিতার্থতা ও কল্যাণ। একটা মূর্খের বৃহত্তর সম্ভাবনার লালসায় ব্যস্ত হয়ে অসময়ে অথবা তাকে তাড়না করে লাভ নেই; তার স্বভাবকে চেপে সে দিকের আভিলাষকে দমন করে, বোধ করে কোন প্রেরণই নেই, কারণ, আপাতদৃষ্টিতে বহু ব্যাকুল ও উদ্বারগামীই হোক তার স্বভাবই তার পক্ষে সহজ ও হৃদয় পথ—line of least resistance, কি ভোগ-পথে আর কি ভোগ-সাধন। এই তাইই নিজের স্বার্থ অহসরণ

—‘বোগঃ ভোগায়তে, ভোগঃ বোগায়তে’। জ্ঞানী যাবৎপ্রসাদ জ্ঞান-অজ্ঞানে আলোর-অন্ধকারে এই সমান সার্থক গতিকে লক্ষ্য করেই গিয়েছিলেন,—

“আমি উজিয়ে যাব উজান কালে
ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।”

আসলে জীবনের সমস্তটাই গতি, বিকাশ, পরিণতি ও উন্নতি, কিছুই এর ব্যর্থ নয়; কারণ, একই পরম সত্য আপন শক্তির আবেশে ফুটে চলেছে তার নিগূঢ় পরম ছন্দে; একটি সমগ্র হৃদয়ত পূর্ণ দৃষ্টি পেয়ে যে সৃষ্টি-রহস্যের এই মূল সত্য, এই গভীর রহস্য ও ইচ্ছিত যে বৃষ্টিতে না পেরেছে, তার পক্ষে মানুষকে গড়তে বা চালাতে বাওয়া বিড়ম্বনা। এই নিত্য গতিশীল স্বতঃপ্রসারিত শক্তিরই তুমি তরঙ্গ, তুমি গুরু ও তোমার শিষ্য, তোমরা উভয়েই এই জীবন্ত রূপাযুক্ত শক্তির দুই মুখ, দুই জন দুই জনকে না বুঝলে এবং তোমাদের অন্তরে অমুহ্যত সেই শক্তিসিদ্ধকে না চিনলে সেই মহামায়ার লীলার সাধী হ’তে পারবে না।

তুমি নিজেকে শুদ্ধ ভোগ-বিরক্ত সন্ন্যাসী হ’তে পার, কারণ, তোমার এসেছে বাসনা-রস শুকাবার সময়, ভোগ-বিরতির কাল, গুটিয়ে স্নেহত হবার অন্তিমুখী টান; তা বলে তোমার কাছে যে অকৃত্রিম কর্ম্মকল্প বা যেরূপ-ব্যাকুল চিত্রটি এসেছে পথ চলার স্বল সন্ধ্যের জন্ত, তাকে না বুঝে তোমার বিস্তৃত শুদ্ধতার মরুপথে তাকে টানতে বাওয়া তোমার পক্ষে বিড়ম্বনা, তার পক্ষেও দুর্ভাগ্য। “হবিষ্য কৃষ্ণবস্ত্রং বা পুন-বেবাভিবদ্ধতে”—হবির মুখে অগ্নির মত ভোগে ভোগ বেড়েই চলে এ কথা সত্য বটে, ভোগও যে মহাশক্তিরই খেলা, অনন্ত তার বুদ্ধির সামর্থ্য, সে বাড়বে না কেন? সে ইচ্ছনযোগে বাড়ি বলে সকল ক্ষেত্রেই ইচ্ছন সরিয়ে নেয় ত্যাগ-বাতুলে, তেমনি আবার সকল ক্ষেত্রে নিকিচারে ইচ্ছন যুগিয়ে দেয়ও বাসনা-পাগলে বা ভোগ-মুগ্ধে। আমরা ক্ষুদ্র ও আসক্ত জীব বলেই ভোগ বা ত্যাগের মোহে পড়ি, একটাকে স্বীকার করে অপরটাকে তিরস্কার করি। জগদ্ধক্তি কিন্তু পরম মুক্ত, তাই মহামায়া দশ হাতে পরম নিকিচারে ভোগ ও ত্যাগ, রূপ ও অরূপ, পাপ ও পুণ্য সমান আদরে গড়ে চলে। তাই মায়ের জাগা ছেলে—যে মায়ের খেলার সুচ্ছন্দ গতি ও ধারা বুকেছে তাঁর কোনই ব্যস্ততা নেই মানুষকে আলোর পথে জোর করে টানবার; স্ত্র ও কুব মোহ তার নেই; উৎকট কর্তব্য ও জ্ঞান বা অহংকারও তার নেই। মোহের অধীর কণ্ঠে কল্যাণ প্রসব করে না, কল্যাণ প্রসব করে মুক্ত মনের নিরুদ্ভাব কণ্ঠে যে কর্ম্ম জগদ্ধক্তির সঙ্গে সুর বাঁধা।

যোগপথে গুরুর অধীনে সাধনা করে সকল হবার জন্তে দু’টি জিনিষ চাই, গুরুর জ্ঞান ও অনন্তদৃষ্টি—শিষ্যের প্রকৃতি ও আধার বিচারের জন্ত ও তাকে তদ্ব্যবহারী তার পরম সার্থকতার পথে চালনা করার জন্ত; শিষ্যেরও চাই তার আধারে যোগ-সাধনার অনন্তকূল উপাদান ও শক্তি। জগতে মানুষ এসেছে বিভিন্ন রকম শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করতে; শুধু মানুষ কেন, জীব-জন্ত, পত-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-লাতা, মাটি-পাথর, ঘাছু সব কিছুই উৎপন্ন হয়েছে এক এক প্রকার উপাদানের সমবায়ে গঠিত হয়ে, এক একটি বিশেষ কাজে লাগবার জন্ত। জলের পরিবর্তে তৈল পান করে তৃষ্ণা দূর করা যায়

কবিকে দিয়ে লাঠিবাজী চলে না। এটা অতি সহজ বুদ্ধির কথা। উর্দ্ধের পবন লোকের আলোর দিকে একেবারে কড় বহু শুণী ও জ্ঞানী মানুষ সঙ্গারে এসেছেন, যোগ-সাধনার ভক্ত নয়, কিন্তু বিভিন্ন পথে লোক-কল্যাণের ভক্ত। প্রকৃতির নিগূঢ় ব্যবহার নেই যে, তাঁরা পরাজ্ঞান পেয়ে বৃহত্তর পথে মুক্ত হয়ে যাবেন। এটা তাঁদের ক্রটিও নয়, নিকটতার চিহ্নও নয়।

অজ্ঞাত বিদ্যাহীনতার পথের মত পরাবিশ্বার অমুখিলন-পথেও চাই কুশলী নির্দেশক বা গুরু এবং উজ্জ্বল উজ্জ্বলী আধার, তবেই এ সাধনা সফল হয়। প্রকৃতির কোল থেকে এ পথের ভক্তও এসেছেন চিহ্নিত মানুষ সব এই পথেরই অমুকুল উপাদান ও অল্পপ্রেরণা

নিরে। তাঁদেরই পক্ষে এ সাধনা সহজ; তাই আধার-বিচার একান্ত দরকার। লভের শিখোচাখী অবনীন্দ্রনাথের কাছে আমি অন্ধ-বিজ্ঞা শিখতে গিয়েছিলাম। তিনি আমার বলেছিলেন, 'চিত্রবিজ্ঞার ছ'টা অঙ্গ কেউ পেখে ৬ দিনে, কেউ পেখে ৬ হস্তায়, কেউ পেখে ৬ মাসে এক কেউ পেখে ৬ বছরে। ৬ বছরেও যে ছয়টি অঙ্গকে আয়ত্তে আনতে না পারে, সে এ পথের নয়।' প্রত্যেক সাধনার ও অমুখিলন-পথের আচার্য্য এই সহজ শ্রেণী-বিচারের বহুগুণি জ্ঞানেন। প্রকৃতির এই সহজজাত কৌশলের ও প্রতিভার ঘরে ডিমোক্রাসী বা সাম্যবাদের স্থান নাই; ওটা নিতান্তই মানুষের মন-গড়া খিওবী।

চৈত্র-মধু

ত্রিশাশি পাল

ফাগুন গেল,—চৈত্রী এস,
মাধবী কই? নয়ন মেল।
আজ কে না কি তোমার বিয়ে
গোধূলি পায়,—সত্যি কি এ?
মলয় এসে দখিন থেকে
ফুল-বোয়েরে কইছে ভেঁকে,—
বর এসেছে রাজার বাজা;
চুলি কোথায়?—বাজনা বাজা।
ছুঁই, চামেলি, রঙন, মতি,
কোথায় চাপা, পাঁচ এয়োতি?
বসন্ত যে বরের বেশে
দুরারে দেখে গাড়িয়ে যে সে।
ভোমরা সে তা' স্তনতে পেয়ে
সানাই-এ 'পৌ' ধরল ঘেয়ে,
মৌমাছিও ম্রা নিয়ে
বেরিয়ে প'ল গুন্ডুনিরে।
হলুদ গায়ে ছুঁইয়ে তারা
চুকল প্রজাপতির পাড়া,
আগ বাড়িয়ে পথকে যেতে
আমের বনে বসল মেতে।
পাকল দেখে আড় নরানে,
কুঁচকে ভুক খোমটা টানে;
ফুল-সোহাগী অমনি নেমে
হ'গাল চুমে পাপড়ি ভেঙে।
গোলাপ হেসে কইল তারে,
অভিধি, ছি ছি, গাড়িয়ে যাবে,
লজ্জা-সরম নেইক' ঘোটে,
অকালে ফুল সব কি কোটে?
রক্ত ছাড়, হেলছে বেলা
এখনো ঢ়? এ কি খেলা!
জল সইতে কখন বাবি
কখনই বা বোঁ নাওরাবি?

গ্রী-আচার ও কুশিকি
ক'রবি করে?—গ্রমরিকা।
কথার খোঁচা সইতে নেবে
পালিয়ে গেল কানন ছেড়ে,
ঝাঁকল্য বোঝে বাকিয়ে অঙ্গে
নামল গিরে দীপির জলে।
পদ্মবনে জাগল সাড়া
বিড়িয়ে দিল আসন তারা,
সাজিয়ে সভা মৃগাল মেয়ে
ছলছলিয়ে বইল চেয়ে।
বর বসলে কোথায় আগে
সেইনে' সব ভগড়া লাগে
নিরীষ বলে,—এইখানেতে,
লাও না হেথা আসন পেতে?
বকুল ব'সে একলা কীবে
পলাশ বলে,—আলপনা বে।
কেশব বেলা শুয়ে উঠে
ছড়িয়ে গেল পত্রপুটে।
তরুলতার কিন্তকেরে
লাঁথ হাতে বে' ফেললে কেবে,
মল্লিকা সে ঢালাক বড়
উলু বে' সব ক'রলে জড়।
অশোক বেঁবে তুণীর শিঠে
গোপনে শব মায়ল মিঠে,
কুন্দবালা উড়িয়ে ধজা
দূর থেকে সে দেখছে মজা।
উলল ভেঁকে মোয়েল ভায়া—
নামা হেথায় পাকী নামা
কোকিল গিরে ম্রা প'ড়ে
বরকে ধ'রে তুলল ঘরে।
মাধবী আজ কিয়ের ক'নে
সেই কথাটি বইল ঘনে,

কালীপূজার দিন। সকাল
আটটা। কান্তিক মাস

সবে পড়িয়াছে। শরৎ শেষ হইলেও
হেমন্তের পূর্ণাঙ্গি আবির্ভাব এখনও
হয় নাই, দিগন্তের কোলে কুহে-
লিকার কণি আভাস দেখা গিয়াছে
মাত্র। আকাশ পরিষ্কার নীল।
বাসের উপর প্রচুর শিশির-কণা

জমিয়া রহিয়াছে। শিউলি-গাছের তলায় এখনও বরা-ফুলের
ছড়াছড়ি। সূর্য্য চক্ৰবাল-রোখা ছাড়াইয়া কতকটা উপরে উঠিয়াছে।
মুখুজ্যেদের বড়কর্তা বিশ্বেশ্বর মুখুজ্যের বৈঠকখানার সামনের জমিটা
কাচা রোড়ে ভরিয়া গিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর তাঁহার চার বৎসর বয়সের পৌত্রকে কোলে লইয়া
রোঁজে ঠাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বয়স বাই পাঁচ হইয়া গিয়াছে।
লম্বা কাহিল গঠন, বঃ কসাঁ; মাথার চুল সব পাকিয়া শাদা
হইয়া গিয়াছে। শুক্ল-মুগ্ধহীন মুখ বাক্তিক-রোখাকীর্ণ। পরিধানে
পাড়হীন ধুতি, কোঁচাটি কোমরে গৌজা। গায়ে ফহুয়া ও শাদা
পুতি চাদর—চাদর দিয়া নিজের চেরে পৌত্রকেই ভাল করিয়া
ঢাকিয়াছেন।

সমুখেষ্ট মা কালীর মন্দির। অতি প্রাচীন মন্দির; এক কালে
যখন মুখুজ্যেরা গ্রামের জমিদার ছিল, তখনকার তৈয়ারী। বহু
টাকা খরচ করিয়া ভাল-ভাল মিত্রা দিয়া নির্মাণ করান হইয়াছিল।
কানিশের ধারে ধারে কত বকমের নকশা—খামের উপরে কত বকমের
কাগিগরি। সামনে প্রকাণ্ড আটচালা—এখানেও খুঁটিত ও চালের
কাঠামোতে নানা কারুকার্য। এখন মন্দিরের জীর্ণাবস্থা—দেওয়ালে
নোণা ধরিয়া চূণ-বালি ধসিয়া পড়িয়াছে—সমস্ত কানিশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতেছে—শেওলা ধরিয়া মন্দিরের শাদা বঃ কাল হইয়া উঠিয়াছে,
ছাদে ফাটল ধরিয়াছে, এখানে-সেখানে অথপের চাগা গজাইয়া
উঠিয়াছে। আটচালার চালের অবস্থাও অত্যন্ত জীর্ণ—কত দিন যে
নুতন করিয়া ছাওয়া হয় নাই কে জানে! কিন্তু মুখুজ্যেদের কাহারও
সে সিকে লক্ষ্য নাই। ভাগ্যে মা কালীর নিজস্ব কিছু জমি আছে,
প্রজার খাজনা আছে, তাই কোন মতে বৎসরে একবার পূজাটা
চলিয়া যায়—না হইলে পূজা কোন্ দিন বন্ধ হইয়া যাইত! মা
কালীর জমি বিশ্বেশ্বর নিজে চাষ করান, খাজনা নিজে আদায়
করেন। অস্তান্ত শরিকরা ইহাতে অসন্তুষ্ট। তাহাদের ইচ্ছা—সম্পত্তি
বিক্রয় করিয়া দিয়া মা কালীর পূজা তুলিয়া দেওয়া। বাহাদেব
নিজেদের অরসংস্থান নাই—তাহাদের দেবী-পূজা করার স্পষ্টা না
থাকাই ভাল। এ সব সাত্তে বড়লোকদের—অর্থাৎ গণপতি বাঁড়ুজ্যের
—বার বৎসরে লাখ টাকা আর।

গণপতি বাঁড়ুজ্য মুখুজ্যেদেরই পৌত্র। আগে অবস্থা ভাল
ছিল না। এক কনট্রাক্টারের অধীনে সরকারের কাজ করিত।
পরে কনট্রাক্টারের অধীনে ছোট-খাটো কনট্রাক্টারী স্কু করে—ক্রমে
ডিক্টেট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটার কনট্রাক্টার—তার পর মুন্সের
বাজারে মিলিটারী কনট্রাক্টার—এখন লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছে সে।
গ্রামে বিরাট বাড়ী করিয়াছে, গাড়ী করিয়াছে, দুর্ভিক্ষের বাজারে
সস্তা দামে এ তক্তাটের বিস্তার জমি কিনিয়া জমিদার বনিয়াছে।
গ্রামের ইজর-কর সকলে তাহার অন্নদাস। মুখুজ্যেদের কেহ

কালীপূজা

শ্রীঅমলা দেবী

কেহ বা নিছক মোসায়েব। বাহাদর
চাষী, তাহার ভাগে গণপতির
জমি চাষ করে, প্রাণা অংশ
গণপতিকৈ বিক্রয় করে, গণপতি তাহা
আবার উচ্চমূল্যে মিলিটারীকে সব-
বরাহ করিয়া প্রচুর লাভ করে।
বাউরী-হাড়িদের মেয়ে-পুরুষ গণ-
পতির কাছে কুলি-কামিনের কাজ

করে। মেয়েদের মধ্যে বাহারী যুবতী রূপসী—তাহারা গণপতিকৈ
সেহ বিক্রয় করে। কাহাকেও শ্রম্য মূল্য দিতে কার্পণ্য করে
না গণপতি। কাজেই শোভিত হইয়াও কেহ গণপতির
প্রতি ক্ষুব্ধ নয়—বরং কৃতজ্ঞতায় বিগলিত। গ্রামের মধ্যে শুধু
বিশ্বেশ্বর গণপতির কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। গণপতির
সঙ্গে হুর্ব্যবহার করেন নাই কখনও—পূজা-পার্বণে আশ্বিনের মত
আমন্ত্রণ করিয়াছেন, দেখা হইলে কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন—অনুশ্র-
বিশ্রমে খবরাখবর করিয়াছেন। গণপতিও ভিতরে ভিতরে তাঁহার
কৃতি করিবার হেঁচা করিলেও প্রকাশ্যে কখনও তাঁহার অসন্মান করে
নাই। বরং গত বৎসর দারুণ বিপদের দিনে পরম আশ্বিনের রোজও
সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র মহেশ্বর রোগশয্যায়;
সহরের ডাক্তাররা হাল ছাড়িয়া দিল; বেয়াই কলিকাতা হইতে
ডাক্তার আনিবার জন্ত পরামর্শ দিলেন; কিন্তু হাতে অর্থের
অবচ্ছলতা হেতু বিশ্বেশ্বর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। গণপতি
লোকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া নিজে আসিয়া বিনা খতে তাঁহাকে
তিন হাজার টাকা গণিয়া দিল, এবং নিজে ডাক্তার আনিবার ব্যবস্থা
করিল। মহেশ্বরের মৃত্যুর দিনেও গণপতি কম সাহায্য করে নাই।
বাড়ীতে তাঁহার পূর্ববধূ ঘন ঘন মূর্ছা বাইতেছিল—তিনি নিজে
পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন। আশ্বিন-বসন্তেরা—করুণাক্ষের
রোগী—বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্পর্শ করিবে না বলিয়া সরিয়া ঠাঁড়াইল।
সে দিন গণপতি ঠাঁড়াইয়া মহেশ্বরের শেষ-কৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর অবশ্য তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে সেরা সম্পত্তি—বায়ুন-
বেড়ার এক-চক পনেরো বিঘা জমি গণপতিকৈ দিয়া স্ত্রী-সন্তান
তাহার ঋণ শোধ করিয়াছেন—কিন্তু সে দিনের সেই উপকারের জন্ত
তিনি অন্তরের মধ্যে গণপতির কাছে ঋণি রহিয়া গিয়াছেন। এই
ঋণ থানিকটা শোধ করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। মা
কালীর জমি মুখুজ্যেদের জমিদারীর মধ্যে সেরা জমি। গণপতির
তাহার উপর অত্যন্ত লোভ। সে এই জমির পরিবর্তে কালী-
পূজার সমস্ত ভার বহন করিবার প্রস্তাব করিল। উপরন্তু
মা কালীর মন্দির ও আটচালা সস্তার করিবার প্রতিজ্ঞা
দিল। মুখুজ্যেদের সকলে সাগ্রহে সম্মতি দিল—শুধু
বিশ্বেশ্বর একা বাঁকিয়া ঠাঁড়াইলেন। মা কালীর পূজার গণপতি
যদি সাহায্য করিতে চায়—তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।
কিন্তু পূজার ভার হস্তান্তরিত করা চলিবে না। তাহাতে কণের
অকল্যাণ হইবে। অন্ততঃ তিনি বত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন—
তত দিন পূজা চালাইয়া যাইবেন। এই লইয়া মুখুজ্যেরা সকলে
তাঁহার বিরুদ্ধে ঠাঁড়াইয়াছে এবং এ সঙ্কে আদালতের সাহায্য
লওয়া বাইতে পারে কি না—উকিলদের সঙ্গে না কি পরামর্শ
করিতেছে। একমাত্র পৌত্রের মুখের পানে তাকাইয়া তিনি ক্ষু-
হইয়া আছেন। এ বৎসর এখনও পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরকে

কালী-মন্দিরের দিকে পা বাড়ায় নাই, বোধ হয় পূজার যোগ্যও
বে না। শুধিকে গণপতি বিরাট আড়ম্বরে কালীপূজার আয়োজন
কিচ্ছে। মুখুজ্যের সকলে এবং গ্রামের সকলে তাই লইয়া মত্ত
হয় গিয়াছে—তাহাদের মনিয়ে কেহ উঁকি পর্যন্ত মারে নাই।

গণপতির পূজামণ্ডপ হইতে নহবতের মিষ্ট সুর কানে
সিতে লাগিল। পূজার তিন দিন পূর্ণ হইতে নহবৎ বসাইয়াছে
পতি; এ তল্লাটের বত ঢাকী আছে—সকলকে বাঘনা করা
হাচ্ছে; তাছাড়া, ব্যাণ্ড-ব্যাগপাইপ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছে।
লিকাতা হইতে যাত্রার দল—রাগীগণ হইতে বাইনাচ আনা
হৈছে। বিবেশবের মনে পড়িল—তাহাদের কালীপূজার আগে
ত ধুমধাম হইত। সাত দিন ধরিয়া নহবৎ বসিত। কত বাঘনা-
দ্বি হইত—বাজি পুড়িত, আটচালার সামনে প্রকাণ্ড সামিয়ানার
চে মতিলাল রায়েব, নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের বাড়ী হইত—হাজার ড্রাক্সের
দবা হইত, সারা গ্রামের কাহারও বাড়ীতে ঠাঁড়ি ঢড়িত না দু'দিন—
। তল্লাটের বত কালী পিট ভরিয়া লুটি-মোটা খাইয়া মুখুজ্যের
দুগান করিতে কথিত ঘরে কথিত। শৈশবে এই সব নিজের
গাখে দেখিয়াছেন—কেন্দ্রের নিজের হাতে তার লইয়া অন্তর্ভুক্ত করিতে
পারেন নাই—তবু কিছু বজায় রাখিয়াছিলেন। আর এখন? একটা
খনিখাস পড়িল তাহার।

নহবতের সুর কখন থামিয়া গিয়াছে। তবু বাইতেছে, একটি
ময়েমাছুপের উরুকেটে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সুর। বাঁড়ুজো-
গাছার এক জন কোয়ার্ন হোকরা তিন দিনের জ্বরে মারা গিয়াছে সে
দিন—তাহারই মাঘের কাছ। গ্রামে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকাপ
হইয়াছে। ঘরে ঘরে বৌদি, দু'এক জন মারা বাইতে শুক করিয়াছে।

বিবেশব গায়েব চান্দরটা পৌত্রের গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া
ছিলেন। তার পর বাঁবে বাঁবে মন্দিরের দিকে চলিলেন।

থোকাকে মন্দিরের চাতালে নামাইয়া বিবেশব কহিলেন—গাছ,
নমো কর। থোকা দায়ব শিক্ষা-মত ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।
বিবেশবও উঠানে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন।

উঠিয়া ঠাঁড়াইতেই কে থামের আড়াল হইতে গুরুগম্ভীর স্বরে
প্রশ্ন করিল—মুখুজ্যে মশায়ের কুশল তো?

এ কণ্ঠস্বর বিবেশবের সুপরিচিত। যা কালীর প্রধান পূজারী বাঁলা
গোসাইয়ের। কয়েক পা আগাইয়া আসিতেই দেখিতে পাইলেন—বাঁলা
গোসাই বারান্দার এক পাশে আসন-পিড়ি হইয়া বসিয়া, পাতার
তৈয়ারী লুখা নলের উপর কলিয়া বসাইয়া তামাক খাইতেছেন।
বিবেশব প্রশ্ন করিলেন—কখন এসেন?

বাঁলা গোসাই জবাব দিলেন—এই কিছুকাল আগে। ভাল ত সব?
বিবেশব কহিলেন—ভাল। ঠী, ভালই আছে সব—বলিয়া
দাঁন হাসিলেন।

বাঁলা গোসাইয়ের লম্বা-চঙড়া সেহ, বিকৃত বুক, মেটে ক, লম্বা
হাঁড়ের মুখ, চাপ্টা নাক, টাকির মত গাঁক। এক কালে শক্তিশাল
ব্যক্তি ব্যক্তি ছিল তাহার। এখন বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে,
প্রাক্তন শিকিল, বাহার ফুল, ফুল ও গৌর পাঁকিয়া গেলের মত দাদা
বিশ্রামের মতো বেল সোজা হইয়া চলে, খাড়া হইয়া

বিবেশব থোকাকে ডাকিলেন—বাঁহ, এস। গোসাইয়ের বিশাল
চোখের দেখিয়া থোকা বোধ করি ভয় পাইয়াছিল। তবে তের পাশ
কাটিয়া আসিয়া দায়ব কোলে উঠিল। গোসাই কহিলেন—এইটিকে
যেবেই বুঝি মনো—

বিবেশব কহিলেন—হ্যাঁ। থোকাকে কহিলেন—দায়, গোসাই
মশায়কে নমো কর। থোকা দুই হাতে দায়ব গলা ভাল করিয়া
জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কঁখে মুখ লুকাইল। বিবেশব সনেহে পিটে
হাত বুলাইয়া কহিলেন—হিঃ দায়।

বাঁলা গোসাই হাসিয়া কহিলেন—আমার চোখের দেখে ভয়
পেয়েছে বোধ হয়। হ্যাঁ গো দায়। এস না, তবু কিসের? থোকা
তেননি মুখ তুলিয়া দিল।

মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপর নবনির্মিত দেবী-প্রতিমা। সেই
দিকে তাকাইয়া বাঁলা গোসাই কহিলেন—এবারের বৃষ্টি কিন্তু আগে
মত হয়নি, লম্বাভেতও ছোট, মুখের গড়নও অল্প বকর।

বিবেশব কহিলেন—আমাদের বাবা বরাবর গড়ে, তারা তো
আসেনি এ বছর, অল্প লোককে দিয়ে গড়াতে হয়েছে।

বাঁলা গোসাই কহিলেন—আসেনি কেন?

বিবেশব কহিলেন—আমাদের এখানে ওরা বরাবর যা পায় তাতে
ওদের পোষাচ্ছে না। কাজেই যেখানে বেশী পানীয় আশা আছে
সেখানেই গেছে। একটু চূপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—ওদের
সেবও দেওয়া যায় না। সব জিনিষের দাম চার-পাঁচ গুন বেড়ে
গেছে, কাজেই সবাই মজুরি বাড়তে চাচ্ছে। আমাদেরই না হয়
যেবার কমতা নাই। কিন্তু বুকের বাজারে ব্যাংক ছাতার মত
বিশ্বের হালি কড়লোক গজিয়ে উঠেছে, তারা যেমন দু'হাতে পরস
বোজগার করছে তেমনি খরচও করছে। এই দেখুন না, আমাদের
গায়েব গণপতি বাঁড়ুজো—

বাঁলা গোসাই একতরফ বাড় কাৎ করিয়া, চোখ বুজিয়া নির্লিপ্ত ভাবে
তামাক টানিতেছিলেন, গণপতির নাম তনিসম্বন্ধে চাচ্চা হইয়া বাড়
সোজা করিয়া দুই চোখ মেলিয়া কহিলেন—গণপতি বাঁড়ুজোয় ছেলে
তো? ও তো লাখপতি হয়েছে তুমি। তা কি হয়েছে গণপতির?

বিবেশব কহিলেন—কিছু হয়নি। কালীপূজা করছে এ বছর
বিশ্বব খরচ করে।

বাঁলা গোসাই দুই চোখ জড়াইয়া বিবেশবের স্বরে কহিলেন—তাই
না কি?

বিবেশব কহিলেন—আপনি শোনেননি।

বাঁলা গোসাই বাড় নাড়িয়া কহিলেন—না, আমি তো ঘরে
ছিলাম না, শিববাড়ী গিল্পার, কল পাড়া-দী, ডিট-চাপটি লিখলেও
পৌছুবার কথা নয়—বলিয়া চিহ্নিত হইয়া উঠিলেন।

বিবেশব হু হু হাসিয়া কহিলেন—আপনাকে দেখে আমি তাই
একটু আকর্ষ্য হয়েছিলাম। গণপতি আমাদের কাণিগ, নাপিত,
ঢাকী দায় আমার আত্মীয়ের পর্যন্ত হাত করেছে, তবু পুন্ডতি
বাব দিল কি করে।

বাঁলা গোসাই কোর করিয়া হাসিয়া কহিলেন—কি পাগল!
বাণ-চক্ৰবর্তী যে কাল করে সেয়েহ, সে কাল কি ছাড়তে পারি।

বিশেষর কহিলেন—আমাদের রামদাস আর তার ছেলে দু'দ্বিয়ার।

বাঁদা গোসাঁই বিশ্বম্ভর স্বরে কহিলেন—রামদাস ওখানে বসলে এখানে কি হবে? আমি তো একা সব পারব না।

বিশেষর কহিলেন—রামদাসের ভাইপো গৌর থাকবে এখানে।

বাঁদা গোসাঁই উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—সেটা তো বগুমার্ক! পূজা-পঞ্চতির জানে কি।

বিশেষর ওদারীজের সহিত কহিলেন—কি করব বলুন! ওকে নিয়েই এক রকম করে কাজ শেষ করতে হবে আপনাকে।

বিশেষরের বাড়ীর বি আসিয়া কহিল—খোকাকে বোদিনি একবার নিয়ে যেতে বললেন, দুধ খাওয়া হয়নি এখনও। খোকা এতকণ্ঠে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া, বাঁদা গোসাঁইএর দিকে মুখ কানাইয়া, বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল।

বিশেষর তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন—বাও, দাও।

খোকা এক হাতে বিশেষরের গলা জড়াইয়া খাড়া নাড়িল। বিশেষর জেঙ্কমোদীর স্বরে কহিলেন—বাও, দাও, বাও। আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে। সকাল থেকে এমনই ঠাঁড়িয়ে থাকলে কি চলে? বাও—চাক বাজলে আসবে আবার।

গোসাঁই বাঁজখাই স্বরে কহিলেন—না দায় তো আমার কাছেই সেন ওকে—রেখে দিই এই স্থলির ভেতরে।—পাশেই একটা খেবোর তৈয়ারী স্থলিতে গোসাঁইয়ের কাপড়, গামছা, পুথি এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ছিল। সেই স্থলিটা তুলিয়া লইয়া কহিলেন—নাতি-ঠাকুরদাদা ছ'জনকেই ধরবে বোধ হয়—বলিয়া গৌর চুমরাইয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বিশেষর খোকার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিলেন—তাই ভাল।

খোকা চকল হইয়া উঠিয়া বিএর দিকে বুকিয়া পড়িয়া কহিল—বাড়ী বাব।—বি তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

গোসাঁই কহিলেন—আটচালার চালটোর যে বড় দুষবছা দেখছি—ছাওয়ান উচিত ছিল এ বছর।

বিশেষর বারান্দার উঠিয়া আসিয়া গোসাঁইএর পাশে বসিয়া কহিলেন—খড় কোথায়?

গোসাঁই বিশ্বম্ভর স্বরে কহিলেন—আপনাদের এত বড় চাষ—খড়ের ভাণ্ডা?

বিশেষর দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন—চাব আর কারও বাড়ীতে নেই—জমি-বারগা বিক্রী করে দিয়ে নাগা সন্ন্যাসী সজে বসে আছে সব। আমার কিছু খড় হয়েছিল—তা' গাই-গন্ধর খাওয়া আছে—দর ছাওয়া আছে। আর একাই বা কত দেব বলুন! পরিকরা সব হাত বেড়ে দিয়েছে—মা কালীর সম্পত্তির আদে পূজোটুকু কোন মতে চলে, এ সব করতে কুলোর না।

গোসাঁই কহিলেন—জাগীদারদের কি হ'ল?

বিশেষর কহিলেন—গণপতি বাড়ুজ্যে বা কালীর জমিটা মেয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, আমি বাধা দিয়েছি। তাতেই বাবুরা সব রাগ করে গণপতির সঙ্গে জোট পাকাচ্ছেন। গণপতির চাকর তো সব। গণপতির কাছ থেকে পরসা না আনলে ঠাঁড়ি চড়ে না কারুই—বলিয়া তিস্ত হাসি হাসিলেন। কিছুকণ চূপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—গণপতি বাড়ুজ্যেকে তো মনে পড়ে আপনার—মুখুজ্যেদের বাড়ীতেই সারাদিন পড়ে থাকত, মুখুজ্যেদের বাড়ী থেকে চাল না নিয়ে গেলে ঠাঁড়ি চড়ত না তার। এখন মুখুজ্যেদের বাড়ীর ছেলেরা তার দরজার দিনরাত জ্বা দিয়ে পড়ে আছে, দিনরাত তার পা চাটছে, তার কাছ থেকে হাত পেতে পরসা নিয়ে এসে দ্রুপ-কস্তার মুখে আহার দিচ্ছে। কি বলবেন বলুন—বলিয়া দ্ব্যপার মুখ কুঞ্চিত করিলেন।

একটি বারো-তেরো বৎসরের মেয়ে আসিয়া মন্দিরের সামনে ঠাঁড়াইল। বিশেষর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ রে। তোর বাবা বরোছে বাড়ীতে?

মেয়েটি কহিল—ছিল তো, চা খেয়ে এখন কোথায় বেরিয়ে গেল।

গোসাঁইএর মুখের দিকে তাকাইয়া বিশেষর কহিলেন—শুনলেন! সব এক গোস্তর, কেউ এখানে পা দেবে না ঠিক করেছে। কি যে রাজা-উজীর করে দিচ্ছে গণপতি, তা' তো বুঝি না! এ দিকে পাঁচটা টাকা ধার চাইলে তো খত লিখিয়ে নেয়। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—সব বাবে গোসাঁই মশায়—এ বংশে শনির দৃষ্টি পড়েছে—

মেয়েটির দিকে তাকাইয়া কহিলেন—একটা কাজ করতে পারিস্ দিদি! তোর বাপ-মাকে বলিস না যেন—শুনলে গালাগালি করবে আমাকে।

মেয়েটি লজ্জিত মুখে কহিল—কি করতে হবে বলুন।

বিশেষর কহিলেন—বালিকে খবর লিগে বা—গোসাঁই মশায় এসেছেন, ঠর খাবার যেন ব্যবস্থা করে। বা-কিছু দরকার আমার বাড়ী থেকে যেন নিয়ে যায়।

বালি মুখুজ্যে-বংশেরই মেয়ে। বিববা, গ্রামেই বিবাহ হইয়া-ছিল। নাম বালিকাবালা। এখন অবশ্য বালিকা নয়, প্রৌঢ়া—বয়স চল্লিশ পার হইয়া অনেকটা আগাইয়া গেছে। গোসাঁই আসিলে বালির বাড়ীতেই তাঁহার আশ্রয় পড়ে। বালি নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করে।

গোসাঁই উঠিয়া ঠাঁড়াইয়া কহিলেন—থাক, আর খবর দিতে হবে না। ও তো আমার পরিচিত বাড়ী, আমি নিজেই বাছি—বলিয়া উঠিয়া ঠাঁড়াইয়া বুলিটা কাঁধে বুলাইয়া খড়ম পায়ে খট-খট করিতে বালির বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সোভিয়েট থিয়েটার

ঐশাখিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মস্কভিন সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ সন্ধান 'অর্ডার অফ লেনিন'এ সমানী ব্যক্তি, সোভিয়েটের সর্ব-বৃহৎ রাষ্ট্র পরিষদের সভা এবং জনগণের নটশিল্পী বলেই সোভিয়েটের কাছে স্বীকৃত। তিনি সোভিয়েট থিয়েটার সম্বন্ধে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বা লিখেছেন, তা আমাদের কাছে বিশেষ ভাবে প্রাধান্যবোধ্য। তিনি বলেছেন— "Soviet theatre is a theatre of the people. It serves the people and is inseparable from them." সোভিয়েট "people" অর্থাৎ "জনগণ" বলতে অনেকখানি বুঝায়—এবং কতখানি বুঝায় তা আমাদের দেশে বোধগম্য হওয়া কঠিন। তবুও আজকের দিনে দেশে আমাদের জনসাধারণের কথা আমাদের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে তুলেছে তাই—সোভিয়েট থিয়েটার সেখানকার জনগণের জন্ত যে কি পরিমাণ শিক্ষা ও মঙ্গলের এবং চিত্তবিনোদনের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, তাই বুঝাবার জঙ্কই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মস্কভিনের বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সোভিয়েটে আপাততঃ ৭১০টি থিয়েটার বা নাট্যশালা আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব-সীমান্ত রাডিভটকের নাট্যশালা থেকে বখন শ্রোতৃ-বৃন্দ অভিনয় দেখার পর বেরিয়ে আসছে, ঠিক তখনই ইউরালের সভারডলভস্ক সহরের নাট্যশালায় আসন গ্রহণের জন্ত প্রথম সাক্ষাতিক খণ্ডাধনি হচ্ছে। আবার ঠিক সেই সময়ে সোভিয়েটের পশ্চিম-সীমান্তে মিনস্ক সহরে বৈকালিক মহড়া সবমাত্র শেষ হয়েছে—মঞ্চসজ্জাকরেরা তখন দৃশ্যপট সাজিয়ে প্রথম অঙ্কের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে। আরও উপরে Arctic circle অথবা তারো পরে ইগারকার (Igarka) নাট্যশালা চোখে পড়বে। প্রচণ্ড শীতে সেখানে—শ্রোতৃবৃন্দ ভালুকের চামড়ায় সারা দেহ ঢেকে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে আসন গ্রহণ করছে—আবার দক্ষিণে সম্ভ্রান্তি স্থাপিত কুর্ড থিয়েটারে (Kurd theatre) গ্রীষ্মকালের উপশব্দী পাতলা পোষাক পরে জমায়েৎ হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শত সহস্র লক্ষ লক্ষ লোকে সোভিয়েটের নাট্যশালা পূর্ণ হয়ে যায়।—এটা অতিরঞ্জিত কথা নয়। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েটের থিয়েটার-গুলিতে ৬ লক্ষেরও বেশী লোকের সমাগম হয়েছিল এবং ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে এর চাইতেও অনেক বেশী লোকের ভিড় হয়েছিল এই সব বিজ্ঞিত থিয়েটারগুলিতে।

এখন একটা দিনের হিসাব নিতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে—হামলেট (Hamlet)এর দার্শনিক স্বগত উক্তি থেকে আরম্ভ করে কারমেনের (Carmen) উদ্দীপক সঙ্গীত অথবা অকেন-বাক্সের হাতমুখরিত অপেরা থেকে অষ্ট্রভস্কির (Ostrovsky) স্মরণ্যত ক্লাসিক নাট্য এবং আইভানভের (Ivanov) অগ্নিময়ী ভাষায় লিখিত নাটক—এ সব রকমের নাটকই একই সঙ্গে বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে।

এই সব নাটক শুধু যে রাষ্ট্রীয় ভাষায় অথবা এগারটি গণতন্ত্রী প্রদেশের ভাষায় লিখিত তাই নয়—সোভিয়েট রকমকম চল্লিশটি এমন কি তারও বেশী ভাষায় লিখিত নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে। বহু জাতির সমন্বয় হয়েছে সোভিয়েটে—তাই বহু ভাষার সাহায্য নিতে

সম্ভ্রান্তি গণতন্ত্রী আর্মেনিয়ায় ২৪টি থিয়েটার আছে, তাজিক (Tajik)এ আছে ২১টি, কিরগিজ (Kirghiz)এ আছে ১৫টি, তুর্কমেন (Turkmen) আছে ১টি। সোভিয়েটের নাট্যশিল্পের নাটকের রকমকমের যে কতখানি উন্নতি হয়েছে, সেটা বুঝতে হলে প্রতি বৎসর মস্কোতে যে জাতীয় শিল্পের উৎসব হয় সেটা দেখা দরকার। প্রতি বৎসর মস্কোতে নট-নটীরা আসেন, গায়ক-গায়িকারা আসেন, সঙ্গতকারীরা আসেন, আর আসেন নৃত্যশিল্পীরা। মস্কভিন বলেছেন যে—Those who attended these festivals came away with indelible impression of the wistful Ukrainian songs, the temperamental Georgian dancers, the amazing Azerbaijani melodies, the inimitable pageantry of the Uzbek theatre and the excellence of the Kazakh performances. সোভিয়েটের নাট্যশালা তার দূরতম পল্লীর অগণ্য জনগণের অভিনয় দেখার সুযোগ বিধান করে দিয়েছে। কোন দিন নাট্যশালা বা নাটক অভিনয়ের কোনো ধারণাই বাসের আগে ছিল না, আজ তারা নিয়মিত শ্রোতা হয়ে পড়েছে—সারা সোভিয়েটে বিস্তৃত বহু নাট্যশালা ও সখের রঙ্গালয়ের।

ছোট ছোট থিয়েটারে পল্লী অঞ্চলে অভিনয় করা যে সম্ভব হয়েছে—সেটা শুধু কৃষি ও কৃষি-ব্যবসায়ের সমন্বয়ে। সমষ্টিগত ভাবে প্রজা ও রাষ্ট্রের তরফ থেকে পল্লীগ্রামে যে সব কৃষি-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদেরি আশ্রুকূলে। প্রায় ৩০০ এই রকম জাম্যমান থিয়েটারে—১০ হাজারের বেশি অভিনেতার অভিনয় করছেন। শীত, গ্রীষ্ম, তুষার বা রৌদ্রকে তুলু জ্ঞান করে' বেলগাভীতে, ষ্টীমারে, অধারোহণে বা কুকুরদলের সাহায্যে তারা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়—এক কৃষি-প্রতিষ্ঠান থেকে আর এক কৃষি-প্রতিষ্ঠানে বাতায়াক করে। সেই সব কৃষক বা কৃষি-ব্যবসায়ীদের কাছে নটশিল্পীরা শিক্ষকের মত, ডাক্তারের মত অপরিহার্য বলে মনে হয়। তারা প্রাচীন এবং আধুনিক সব নাটকের অভিনয় করেন।

শিশুদের জঙ্কও পৃথক থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে সোভিয়েটে। ১১১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর শিশুদের জঙ্ক প্রথম থিয়েটার খোলা হয় মস্কোতে—ক্লশ-বিল্লবের সাপ্তাহসরিক উৎসবের দিনে। আজ সোভিয়েটে শিশুদের জঙ্ক থিয়েটার হয়েছে ১৩১টি—তার মধ্যে পুতুলনাচ হয় অষ্টক থিয়েটারে। উদায়মান জাতির দ্বারা অগ্র-দূত, সেই শিশুদের অনেকখানি শিক্ষার ভার নিয়েছে সোভিয়েটের এই থিয়েটারগুলি। সোভিয়েটের মধ্যে সহরে বা পল্লীগ্রামে এমন কোনো বাড়ী পাওয়া যাবে না, যেখানে একখানি না একখানি থিয়েটারের 'প্রোগ্রাম' রয়েছে। এমন কোন দূরতম পল্লী সোভিয়েটে যুক্তরাষ্ট্রে দেখতে পাওয়া যায় না, যেখানে এই প্রাদেশিক থিয়েটার তার অভিনয় দেখিয়ে আসেনি। ১১৩৬ খৃষ্টাব্দের তালিকায় দেখা যায় যে, এই সব প্রাদেশিক জাম্যমান থিয়েটারে—অষ্ট্রভস্কি (Ostrovsky)র ৭২ খানা, গোর্কির (Gorky) ৫০ খানা, সেক্সপিয়রের ৩৪ (শুধু 'ওথেলো'ই অভিনীত হয়েছে ১৩টি থিয়েটারে), লোপে ডে ভেগা (Lope-de-Vega)র ১৭ খানা, শিলার (Schiller)র ১৫ খানা নাটক অভিনীত হয়েছে।

বাক্য পাঠিয়ে দিলুম। আরও অনেক আবেদনকারী সেখানে কম্পিতদরে অপেক্ষা করছিলেন। আমারও বৃদ্ধা-দুঃস্থ দুঃস্থ করছিল, হস্ত অস্ত কারণে।

আধ ঘটিকা অপেক্ষা করবার পর এক জন ভৃত্য এসে খবর দিলে—“কর্তা প্রশান্তকুমার দাসকে বোলাচ্ছেন।” উঠে ভৃত্যকে সহসরণ করলুম।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘরে টেবিলের সামনে শ্যামলদাস বসে। তাঁর হাতে আমার আবেদন-পত্র। শ্যামলদাসকে এই প্রথম দেখলুম। এক জন বুদ্ধিমান এবং কর্ণঠ বক্তা বলে মনে হ'ল। প্রশান্ত দলটি, উজ্জল চোখ, বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের এই রকম চেহারা দেখব আশা করিনি। আমার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন—“বসুন।” সামনের খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

বসলুম।

আবেদন-পত্রটি টেবিলের ওপর রেখে বললেন—“মিষ্টার দাস, আপনার আবেদন-পত্র পাড়ে দেখলুম। আপনাকে উপযুক্ত লোক বলেই মনে হচ্ছে। চেহারাও আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। অল্প লোকের সঙ্গে আর দেখা করা প্রয়োজন মনে করছি না। আপনার তো কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ আছে?”

বিনীত ভাবে উত্তর দিলুম—“আজ্ঞে তা আছে।”

—“বেশ, বেশ। কাজ খুব বেশী নয়। আমার আরও দু'জন সেক্রেটারী আছে। কিন্তু তাঁরা এ দেশের লোক ন'ন। অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার কারবার করতে হবে। চা-পার্টি, ডিনার ইত্যাদিও দিতে হবে। আপনি আমার সেই সব ব্যাপারে সাহায্য করবেন। মোট কথা, এগানকার আদব-কায়দা তো আমার বিশেষ জানা নেই। আপনি একটু শিক্ষণীয় পড়িয়ে নবেন।”

উৎসাহের সঙ্গে বললুম—নিশ্চয়ই।”

সেই দিন থেকেই নতুন কাজে বহাল হয়ে গেলুম। কাজ বিশেষ কিছুই নয়। সব সময়ই প্রায় ছুটি। স্তরাস্তর চারিদিকে নজর রাখবার খুবই সুবিধা হ'ল। অল্প দু'জন সেক্রেটারী অতি নিরীহ। তাদের কাজও অনেক বেশী। ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র নিয়েই থাকে। আমার সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় হলেও ঘনিষ্ঠতা হ'ল না। বাড়ীর চাকরদের দ্বন্ধে সন্দেহজনক কিছুই পেলুম না। কয়েক জন শ্যামলদাসের সঙ্গেই এসেছিল। বাকী এগানকার লোক। স্বয়ং কর্তাকেও চোখেচোখে রাখলুম। কিন্তু সবই অনর্থক। ব্যবসা ছাড়া অল্প কোন সম্পর্কে কাজকে আসতে-যেতে দেখলুম না। আমার মনে ক্রমেই এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল যে, রামায়ণ ভুল করেছে। ত্রিযুগের সঙ্গে শ্যামলদাসের কোন সংস্রব থাকতে পারে না। প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। মেলামেশা করে বেশ একটা শ্রদ্ধা জন্মাল। লোকটি সত্যই চমৎকার। স্বল্পভাষী হলেও খুব ভদ্র।

এক জনকে খুব ভাল লাগল—তাঁর নাম জানকী বাই। মেয়েটি শ্যামলদাসের দূর-সম্পর্কে ভগিনী হন। দেখতে সুজ্ঞ, বয়স আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হবে। বেশ লেখা-পড়া জানেন। শ্যামলদাস স্বয়ং তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায়ই আমার কাছে সাহিত্য-চর্চা করতে আসেন। মধ্যে মধ্যে বিকেলে তাঁর সঙ্গে

ব্যাড-মিটনও খেলতে হয়। অলস একবেঁয়ে জীবনে জানকীর সাহচর্য খুবই ভাল লাগে।

এক দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বাগানে বেড়াছি। হাতে কোন কাজ নেই। শ্যামলদাস ব্যবসা-সংক্রান্তে আসানসোল গেছেন। এমন সময় জানকী বাই এসে হাজির। লক্ষ্য করলুম, তাঁর মুখটা খুব গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলুম—আজ বিকেলে তো হাঁওয়া ছিল না। ব্যাড-মিটন খেললেন না কেন?”

একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি উত্তর দিলেন—“মনটা ভাল ছিল না। চুপ করে শুয়ে ছিলাম।”

ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলুম—“শরীর ভাল তো?”

ঈষৎ হেসে তিনি বললেন—“শরীর ভালই।” তার পর আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে উলস ভাবে বললেন—“মিষ্টার দাস, আপনার তো অনেক বড়লোকদের সঙ্গে আলাপ রয়েছে। আমায় একটা চাকরী খুঁজে দিতে পারেন?”

বিস্মিত হয়ে বললুম—“আপনি! চাকরী করবেন! কি বলছেন।”

“হয়তো কিছুই এমন হয়নি, কিন্তু তবু আমার মনে বিলম্বণ আঘাত দিয়েছেন। কাল অনর্থক মামা এমন চোচামেচি আরম্ভ করলেন—” বলতে বলতে জানকী বাই-এর চোখে জল ভরে এল।

আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললুম—“ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। আপনার মামাকে যতটুকু চিনেছি, তাতে তিনি অনর্থক রাগারাগি করবার লোক বলে তো মনে হয় না। হয়তো কিছু বোঝবার ভুল হয়েছে।”

তিনি বললেন—“আপনি যে আমাকেই দোষী করবেন, তা আমি জানতুম। কিন্তু ব্যাপারটা শুনে তার পর বিচার করবেন। কাল ধোপা এসেছিল। মামার জামা-কাপড় আমিই গুছিয়ে নিই আর পাঠাই। একটা জামা ধোপাঘেঁ দিতে গিয়ে দেখলুম, পকেটে কি বেন রয়েছে। বার করে দেখি একটা চিঠি। খামের ওপর মামার নাম আর এক কোণে একটা সংখ্যা—“তিন” লেখা ছিল। কিছু বললেন কি?”

হয়তো আমার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে কোন কথা বার হয়ে গিছিল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম—“না, কিছু বলিনি তো। তার পর।”

—“তার পর কৌতূহল-বশত চিঠি বার করে পড়লুম। অবশ্য এটা আমার দোষ হয়েছে স্বীকার করি। পড়া শেষ হলে চিঠিটা আবার খামে পুরে মামাকে গিয়ে দিলুম। সে কি রাগ! আমাকে যেন মারতে আসেন আর কি।”

আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পিটছে। অতি কষ্টে ধীর কণ্ঠে বললুম—“হয়তো চিঠির মধ্যে গোপনীয় কিছু ছিল।”

—“না, না। সেই জেজ্জেই তো আশ্চর্য হয়ে গেছি। অতি সাধারণ ব্যবসাদারী চিঠি। কয়েক লাইন মাত্র। আমার কথাগুলো এখনও মনে আছে।”

ব্যাপারটা ঘনিষে আসছে। বললুম—“কথাগুলো একবার বলুন তো। লিখে দেখা যাক, রাগের কোন কারণ থাকতে পারে কি না।”

—“বেশ তো”—বলে জানকী বাই বলে গেলেন। আমি নোট-বুকের একটা পাতায় তাঁর কথাগুলো টুকে নিলুম।

“বহাশয়,—আপনার পত্র পাইলাম এবং পাঠ করিয়া জানিলাম, আমার সর্ভাকলী পাইয়াছেন। সঙ্গে ফরও ছিল। সাক্ষাৎ শীতই হইবে। প্রাথমিক বস্ত্রটি দিব। বালীগঞ্জ সাকুলার রোডে পার্ক বরাবর একটি দক্ষিণ-খোলা বাড়ী। কোশে বড় বাস্তা। সন্তেরো হাজার চায়। বারো বলেছি। কোনো সময় জানাব। বোধ হয় সন্ধ্যায় সুবিধা। বাড়ীর তিন দিক খোলা।

বিনীত

হীরালাল পোদ্দার।”

বললুম—“এর মধ্যে মারাত্মক কিছুই তো দেখছি না।”

হেসে জানকী বাই বললেন—“আমিও তো সেই কথাই বলছি।”

হু-চাটতে কথা বলে তাঁকে শান্ত করলুম। তিনি চলে যেতেই নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসলুম। সত্যি কথা বলতে কি, জানকী বাইএর কথায় অনেক রকম আশা মনে জেগেছিল। এইবার ঠিক সন্ধান পাব। কিন্তু চিঠি পড়ে নিরাশ হতে হল। অত্যন্ত মামুলী ব্যবসাদারী চিঠি। হীরালাল বোধ হয় বাড়ীর দালাল। কিন্তু খামের উপর তিন লেখা কেন? নিশ্চয়ই চিঠি পড়বার কোন গুপ্ত সঙ্কেত আছে। অনেক চেষ্টা করেও সে রাস্তে রহস্ত উদ্ঘাটন করতে পারলুম না।

পরদিন সকালে উঠেই আবার চিঠিটা নিয়ে বসলুম। বহুক্ষণ কেটে গেল। কিছুই সুবিধা হলো না। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। “তিন” সংখ্যাটিই তো রহস্তের চাবী। দুটো করে কথা ছেড়ে তৃতীয়টি নিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার রূপ প্রকট হরে উঠল চিঠির গুপ্ত বার্তা।—“পত্র পাঠ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রাথমিক। বালীগঞ্জ পার্ক, দক্ষিণ কোশে। সন্তেরো, বারো। সময় সন্ধ্যা। তিন।” সংখ্যাগুলির অর্থও সহজ। সন্তেরো তারিখ, ডিসেম্বর মাস। তিন বোধ হয় ত্রিমুখের চিহ্ন। শ্যামলদাসের বাড়ী বালীগঞ্জ সাকুলার রোডে। কাছেই পার্ক; সব মিলে যাচ্ছে। এত দিনে সন্ধান মিলেছে। রামাহুজ ঠিকই সন্দেহ করেছিল।

একবার ভাবলুম, নিজেই কাজটা হাসিল করি। রামাহুজকে খবর দিয়ে কাজ নেই। তার পর ভাবলুম, না, দরকার নেই। কাজটা ঝুঁকির। যদি ফাঁসে যায়! শেষ অবধি রামাহুজকে খবর দেওয়াই ঠিক করলুম। কাল ১৭ই ডিসেম্বর। অবিলম্বে রামাহুজকে সকল কথা বিশদ ভাবে জানিয়ে এবং অবশ্য আসতে অমুরোধ করে চিঠি লিখে খামে পুরে নিজে গিয়ে ডাক-বান্ধার ফেলে দিয়ে এলাম।

পর দিন শ্যামলদাস আসানসোল থেকে ফিরে এলেন। সমস্ত দিন ছটকট করে কেটে গেল। কোন কাজও ছিল না যে, অস্ত্রমনস্ব থাকি। শ্যামলদাসের সামান্য সন্দেহ এবং অসুখ! তিনি বাড়ী এসেই সোজা এসে বিছানা নিলেন।

ঠিক সন্ধ্যায় সময় চুপি-চুপি বালীগঞ্জ পার্কের দক্ষিণ কোশে গিয়ে উপস্থিত হলুম। শীত কাল। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। দেখি, পার্কের কোশে একটা কোশ। যেই গাছপালা একটু সরিয়ে যোপের ভিতর ঢুকছি, অমনি একটা গভীর কণ্ঠস্বর কানে এল—“মাখার ওপর হাত তোলা। তোমার জন্তই অপেক্ষা করছিলাম। নড়েছি কি গুলী করেছি। সাইলেন্সার লাগান আছে, একটুও আওয়াজ

চমকে উঠে দেখি, বুকের সামনে পিস্তল হাতে পাড়িয়ে স্বয়ং শ্যামলদাস। পিস্তল থেকে এক জন লোক এসে আমার মুখ ও হাত পা বেঁধে ফেললে। পিস্তল নামিয়ে শ্যামলদাস বললে—“আজ তোমাদের দু’জনকেই শেষ করব। বড় বাড়িরে তুলেছ। বন্ধুটি এখনও এসে পড়লেন না কেন?”

তাই তো! এতক্ষণ তুলে ছিলুম। রামাহুজ এখনই এসে কাদের মধ্যে পা দেবে। আমি তাকে ডেকে এনেছি, অথচ সাবধান করে দেবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই। ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যেন রামাহুজ না আসে। যেন কোন কাজে আটকে যায় অথবা একেবারে ভুলে যায়। তার জীবনের জন্ত আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

আমার আশা ভঙ্গ হ’ল। কাশে এল পদধ্বনি—নিকটে—আরও নিকটে। রামাহুজ পতঙ্গের মত ধীরে ধীরে মাকড়সার জালের দিকে এগিয়ে আসছে। মৃত্যুর উন্মুক্ত মুখবিবরে প্রবেশ করছে আমারই চোখের সামনে, অথচ তাকে সাবধান করে দেবার উপায় নেই। আমার হাত-পা-মুখ সব বাঁধ। নিজের অক্ষমতার ধানিতে যেন মরে যেতে লাগলুম।

একটু পরেই রামাহুজ অতি সন্তর্পণে যোপের মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলদাস তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে গভীর কণ্ঠে বললে—“মাখার উপর হাত তুলুন। নড়লেই গুলী করব।”

ওলিকে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নিঃশব্দে রামাহুজের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

রামাহুজ বিনা বাক্যব্যয়ে হাত উঁচু করে দাঁড়াল। বাস্তবের শ্যামলদাস বললে—“আপনার নাম শুনেছি, আজ চামুখ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটল। পূর্বেই স্বেচ্ছায় ঘটতে পারত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি বধে যাত্রা নাকচ করে আমাকে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। যাক, বোটার লেট জান নেভার, কি বলেন?”

রামাহুজ হেসে বললে—“নিশ্চয়ই!” নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে হাসি। আমি অবাক হয়ে গেলুম। রামাহুজ চারি ধারে দৃকপাত করে আমাকে দেখতে পেয়ে বললে—“আরে, ফান্সি যে। কিছু অবস্থা এমন বিপন্ন কেন?”

—“কারণ, আপনারা উভয়েই আমার ক্রীদে পা দিয়েছেন—ক্রিমস্তির ক্রীদে।” সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি।

—“ক্রীদ?” বিস্মিত হয়ে রামাহুজ প্রশ্ন করলে।

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বুঝতে পারছেন না? পিস্তল উঁচিয়ে অভিধি সংকার দেখেই তো বোঝা উচিত ছিল।”

রামাহুজ হেসে বললে—“ঠিক। বোঝা উচিত ছিল বই কি। কিন্তু ক্রীদ তো আমি শেতেছি। আপনার ক্রীদ বলছেন কেন? আপনারাই ক্রীদে পড়েছেন। আমরা কেন পড়তে বাব।”

—“জাঁ।” শ্যামলদাস বিস্মিত হয়ে বললে।

—“হ্যাঁ।” রামাহুজ উত্তর দিলে। “আমাকে অথবা ফান্সিনিকে যদি গুলী করেন কুড়িটা চোখ সাক্ষ্য দেবে যে আপনি হত্যা করেছেন। পালাবেন তার উপায় নেই। তাদেরও পিস্তল আছে। তার উপর সংখ্যায় আপনারা হ’জন, আর তারা দশ জন। স্ততরাং বুঝতে পারছেন—একেবারে মাং।”

রামাহুজ মুখ দিয়ে বিচিত্র রকমের শ্বাস দিলে; সঙ্গে সঙ্গে দশ জন

জলধারী লোক বোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে শ্যামলাদাস ও তার সঙ্গীরা
তথেকে পিস্তল কেড়ে নিলে, পালাবার পথ রইল না। তাদের
দু'বে সাক্ষেপ্ট এসেছিল, তাকে রামাহুজ চাপা স্বরে কয়েকটা কথা
লে। তার পর আমার বানন খুলে আমাকে নিয়ে বোপের বাইরে
। গাড়ী পার্কের ধারেই অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই
মরা বাড়ী পৌঁছলুম। পথে রামাহুজকে অনেক কথাই জিজ্ঞেস
রবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাকে চোখ বুজিয়ে বসে থাকতে দেখে
চাঁতুলস দমন করেছিলুম।

দ্বিতলে বসবার ঘরে পৌঁছতেই রামাহুজ একটা তুপির নিখাস
ফলে বললে—“ধাক্কা, তোমাকে যে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে আনতে
পারছি, এর জন্ত ভগবানকে ধন্যবাদ। তোমাকে পাঠাবার পর থেকে
কি হুশিয়ারি যে দিন কেটেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
প্রতি মুহূর্ত আমি নিজেকে দুঃখেছি।”

ভৃত্যকে দু'কাপ চা আনতে বলে রামাহুজ একটা চেয়ার টেনে
বসল। আমিও আসন গ্রহণ করে বললুম—“আমি তো জীবিত
স্বস্থায় ফিরে এসেছি। অবশ্য এর জন্ত সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ তোমারই
প্রাপ্য। কিন্তু তুমি তাদের মতলবটা বুঝলে কি করে?”

—“বুঝব আবার কি? আমি তো অপেক্ষা করছিলাম। তোমায়
পাঠালুম কেন? এই জন্তই তো। তোমার ছদ্মবেশ ও নকল নামে
যে তারা প্রভাবিত হবে, এ ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না।”

আমি চটে উঠলুম। বললুম—“কিন্তু আমাকে পাঠাবার সময়
তো এ কথা বলনি। অনর্থক আমাকে বেকুব বানাবার কি প্রয়োজন
ছিল?”

রামাহুজ হেসে বললে—“রাগ কোরো না বন্ধু। বেকুব বানাবার
জন্ত নয়, কিন্তু না বলবার সত্যই প্রয়োজন ছিল। তুমি অতি
সরল প্রকৃতির লোক। অভিনেতা নয়। মুখে আর মনে এক।
তোমাকে না ঠাকলে তুমি তাদের ঠাকবার চেষ্টা করতে পারতে
না। অবশ্য তোমার চেষ্টা, ছদ্মবেশ, নকল নামে তারা ভোলে।
প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল, তোমাকে আমিই পাঠিয়েছি। তখন
আমি যা ভেবেছিলাম, তারা ঠিক তাই করলে। মেয়েটি তোমার
সঙ্গে আলাপ করলে। নিজের দুঃখের কাহিনী তোমায় শোনালে
কেন? কারণ, তুমি কবি লোক। সুন্দরীর দুঃখে তোমার মন
কাঁদবে। মনস্তত্ত্ব—বুঝলে কি না? তার পর একটা চিঠি মুখস্থ
বললে। কেউ গুরুত্বম বাজে ব্যবসাদারী চিঠি মুখস্থ করে?
তাহলেই বুঝতে পাচ্ছ, মেয়েটিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। চিঠিটা একটু
যোয়ার, কিন্তু খুব জটিল নয়। পাছে বুঝতে না পার, তাই মেয়েটি
বলেই দিলে খামের ওপর তিন লেখা ছিল। তুমি মাথা ঘামিয়ে চেষ্টা
করে চিঠির অর্থ আবিষ্কার করলে। আমায় ডেকে পাঠালে, একসঙ্গে
দু'জনকে হাতে পাওয়া যাবে ভেবে তারা খুবই খুশা হ'ল। কিন্তু
রামাহুজ তো একেবারে নিরোধ নয়। ফলে যা হ'ল নিজের চোখেই
দেখতে পেলে। এবার ধড়চড়া ছেড়ে এস। চা এল বলে। প্রশান্ত-
কুমার দাস এইবার আমাদের পুরোনো বন্ধু ফাল্গুন রায়তে পরিণত
হোক। রাগটা ভুলে যাও, সব ভাল হার শেষ ভাল, জান তো?”

আমি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে
গেলুম। একটু পরেই মুখ-হাত মুখে বেশ-পরিবর্তন করে ফিরে এলুম।
ততক্ষণে চা, সন্দেশ এসে পড়েছে। চা ঝাঙ্কি, এমন সময় হুটনহুট হলে

ইলপেটের দীপঙ্কর সেন এসে হাজির হ'ল। ঘরে ঢুকে আমাদের
দেখেই বলতে আরম্ভ করলে—“আচ্ছা বেকুব বানালে যা হোক।”

আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেলুম। রামাহুজ বিস্মিত ভাবে
প্রশ্ন করলে—“মানে?”

—“মানে অতি সহজ। ঘরের ঘরে নিয়ে গেলুম, তারা বাড়ীর
দু'জন চাকর। শ্যামলাদাসও নয়, ত্রিমূর্তিও নয়।

—“চাকর!” অসুস্থ সুরে বললুম।

“হ্যাঁ।” দীপঙ্কর উত্তর দিলে। “তারা বললে, নতুন সেক্রেটারী
বাবুর সঙ্গে একটু রহস্য করছিলাম। অস্ত্র চাকরদের সঙ্গে বাজী রাখা
হয়েছিল, তোমাকে—বুঝলে ফাল্গুন—তোমাকে বেকুব বানাবে।”

—“কিন্তু এ যে অসম্ভব!”

“মোটাই অসম্ভব নয়। শ্যামলাদাসের বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম,
তিনি বিছানায় শুয়ে, অর হয়েছেন। পরীক্ষা করে দেখলুম, সত্যই
অর। চাকরদের প্রশ্ন করতে সকলেই বাজীর কথা বললে। তোমাকে
বেকুব বানাতে গিয়ে আমাদের শুদ্ধ বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলে।
আপিসে কাল থেকে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।”

—“কিন্তু পিস্তল?”

“রঙ খেলবার। ছিঃ ছিঃ।”

দীপঙ্কর চলে গেল। বসল না পর্যন্ত। লোকটা সত্যই ভয়ানক
রেগে গেছে। রাগাবার কথাই। আমি রেগে ছিলামই। দীপঙ্করে বর্ণনায়
রাগটা আরও বেড়ে গেল। শেষপর্যন্ত বলে—“শেষ পর্যন্ত
সকলকেই বেকুব বানিয়ে ছাড়লে। এর জন্ত তুমিই দায়ী। মিছিমিছি
শ্যামলাদাসকে সন্দেহ করলে—ত্রিমূর্তির মাথা। মুণ্ড!”

রামাহুজ গম্ভীর ভাবে বললে—“অস্বীকার করে লাভ নেই যে
আমরা বেকুব বনে গেছি। কিন্তু আমারও বোঝা উচিত ছিল, ওরা
নিরোধ নয়। মাথায় কিছু না থাকলে শ্যামলাদাস ত্রিমূর্তির মাথা
হতে পারত না। এতক্ষেণে সব বুঝতে পারছি। মেয়েটি মিস
র্যাচেল ফেরিস।”

—“তোমার উৎকট কল্পনা। আর চাকরটি?”

—“চাকরটি স্বয়ং মহেশ্বর—ত্রিমূর্তির তিন নম্বর। বেরোবার পথ
রেখে তবে তারা কাঁদ পেতেছিল। পিস্তল ঝুটো এ কথা ঠিক।
তাই তোমার হাত-পা বেঁধেছিল, গুলী করেন। আমাকেও বেঁধে
ফেলত। সত্যকারের এক নম্বর অর্থাৎ শ্যামলাদাস পার্কে এসে
মারামারি করবে, এ কথা ভাবাটাই আমার অন্তর্য হয়েছিল। শত্রুপক্ষ
বৃদ্ধিমান্ জানতুম,কিন্তু তাদের যে এত বৃদ্ধি তা আমি কল্পনাও করতে
পারিনি। কিন্তু তাদের ছেড়ে দিয়ে দীপঙ্কর ভয়ানক বেকুব করেছেন।
কোন মতে আটকে রেখে আমায় খবর দিলে মহেশ্বরকে চিনতে
পারতুম। যাক্, গতস্ত্র শোচনা নাশি।”

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তাহ খানেকের ওপর শ্যামলাদাসের বাড়ী থেকে এসেছি।
রামাহুজ বাড়ী থেকে প্রায় বার হয় না বললেই চলে। শ্রেষ্ঠ ঝায়,
পড়া-শোনা করে, আর ঘুমায়। মধ্যে মধ্যে বাঁশী বাজায়। ওর
বাঁশী শোনবার মত। চমৎকার বাজায়। এই সাত দিনের মধ্যে
তিনটে কেস ওর কাছে এসেছিল, এক জন বেশ মোটা বকমের কী

দিতেও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সে কোনটাই নেয়নি। আমি ওর এ রকম নিরুদ্ধ্য হয়ে বসে থাকায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলুম।

গতায় এসেছি অ্যাডভেঞ্চারের আশায়। শ্রেক খাওয়া আর এ তো পাটনায়ও হতে পারত। এখানে এসে লাভ কি? দিন অতিষ্ঠ হয়ে বলেও ফেললুম—“বলি রামাভুজ, ব্যাপার কি? কেস হাতে নিছক না কেন? এ ভাবে চুপ-চাপ বসে থাকার শাট কি?”

রামাভুজ একটু হাসল। ওর হাসি দেখলেই আমার পিত্ত জ্বলে। কথার উত্তরে লোকে কথা শুনতে চায়, হাসি দেখতে চায় রেগে বললুম—“হাসছ কেন? কথার উত্তর দাও। না, আর মত কোন উত্তর নেই?”

আবার সেই হাসি। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এবার হাসির রামাভুজের মুখ থেকে ভাষাও নির্গত হ'ল। বললে—“চুপ করে। নেই বন্ধু। দেখছি, লক্ষ্য করছি এবং বোঝবার চেষ্টা করছি। কেস হাতে নিলুম না, কারণ, অজ্ঞ কাজে ব্যপ্ত থাকলে বুদ্ধি ৫ সময় সেইখানেই আটকে পড়বে। আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় র রাখতে চাই ত্রিমুস্তির বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য।”

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললুম—“তার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি। হার, নিজা ও বংশীবাদন। আর একটু আটু পড়া-শোনা। ঠার ভাবিক করতে হয়। কি লক্ষ্য করছ শুনতে পারি?”

—“নিশ্চয়ই পার। জানলা দিয়ে একবার বাইরে রাস্তার দিকে জর কর। দেখবে, একটি নতুন পানের দোকান।”

—“ক'দিন থেকেই দেখছি। কিন্তু এতে লক্ষ্য করার মত কি যাচ্ছে?”

—“কিছু না। শ্রেক এইটুকু যে, দোকানের মালিকের দৃষ্টি সর্বদা আমাদের বাড়ীর দিকে নিবদ্ধ থাকে।”

—“কথাটা সত্য। একটা ছোঁড়া ও-দোকানে থাকে। আমি যখনই বার হই, দেখি, সে আমার কাছে এগিয়ে আসে এবং কিছু না বলে আবার সরে যায়।”

—“দেখছি। যাই হোক, এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তো। সেই জন্ত বাড়ী থেকে বার হচ্ছি না।”

—“দীপঙ্করকে একবার খবর দিলে হয় না?”

হেসে রামাভুজ উত্তর দিলে—“তাতে কোন লাভ হবে না। বাড়ীর সামনে পানের দোকান খোলায় অথবা কারো বাড়ীর দিকে দোকানে বসে চেয়ে থাকায় দোষের অথবা অপরাধের কিছু নেই।”

—“তবে আমাদের এখন কি করা দরকার?”

—“কিছু না। তুমি সকাল-বিকেল যেমন বেড়াতে বার হও বেরোবে এবং খুব বেশী করে বাজ্ঞ কাজে ঘুরে বেড়াবে। অমুসরণকারী যাতে বিরক্ত হয়ে পড়ে। আর আমি বাড়ীর মধ্যে শ্রেক চুপ করে বসে থাকব। ওরাও চুপ-চাপ বসে-বসে ক্লান্ত হয়ে শেষে হয় তো দোকান-পাট তুলে দিতে পারে।”

—“আমার অমুসরণ করে না কি?”

—“নিশ্চয়ই করে। ভাবে, আমি যখন বাড়ীর বার হই না, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়ে বাহিরের কাজগুলো করিয়ে নিই।”

আমি রেগে উঠলুম। এ কি অজ্ঞায় কথা। রাস্তার বার হব

রামাভুজ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—“না, না, ও কাজ কোরো না। এখন অনর্থক হাল্লামায় আটক পড়লে চলবে না। তার চেয়ে এক কাজ করলে সুবিধা হতে পারে।”

—“কি?”

“তুমি আজ একটা ছোট স্মটকেশ আর বেড়ি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে যাও। আমি শিবদাসকে দিয়ে সিটি বুকিং আপিস থেকে টিকিট আনিবে দিচ্ছি। তার পর পাটনাগামী ট্রেনে চেপে কলিকাতা ত্যাগ কর।”

বিম্বিত হয়ে চোখ কপালে তুলে বললুম—“তার মানে? তুমি আমার সরে পড়তে বলছ?”

—“ঠিক ধরছ। আমি তোমায় ক'লকাতা থেকে সরে পড়তে বলছি। কিন্তু বেশীকণের জন্ত নয়। পরের স্টেশনে নেমে আবার ফিরে আসবে। আমি ওদের বোঝাতে চাই যে, তুমি চলে যাচ্ছো। আমি একলা আছি।”

—“তা না হয় বোঝালে, কিন্তু উদ্দেশ্য?”

—“উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমি একা আছি জানলেই ওরা এক-বার আক্রমণের চেষ্টা করবে। তবে আমার বিশ্বাস, রাষ্ট্রের আগে কিছু করতে সাহস করবে না। তুমি বিকলের ট্রেনে বেরোলে রাত দশটা-নাগাদ ফিরে আসতে পারবে।”

রামাভুজের উপদেশ মত বিকলের ট্রেনেই কলিকাতা ত্যাগ করলুম। বন্ধুত্বমানে নেমে আবার কলিকাতাগামী ট্রেনে উঠে পড়লুম এবং সাড়ে নটা নাগাদ ট্যান্সি করে রামাভুজের বাড়ী ফিরে এলুম। গৃহ নিস্তরঙ্গ। সব-দরজা খোলা। ভাড়া চুকিয়ে স্মটকেশ ও বেড়ি সিঁড়ির নীচে রেখে উপরে উঠলুম। রামাভুজের বাঁশীর আওয়াজ কানে এল।

সবে মাত্র দোতালার পা দিয়েছি, এমন সময় কে যেন লাফিয়ে পড়ে আমার মুখ চেপে ধরলে। আর এক জন এসে আমার হাত দু'টো পিছন দিকে বেঁধে ফেললে। প্রথম ব্যক্তি মুখে ক্রমাল পুরে দিয়া করে বাঁধলে যাতে কথা না কইতে পারি। ব্যাপারটা অতর্কিতে এবং এমন তাড়াহুড়ি ঘটল যে, আমি বাধা পর্যন্ত দিতে পারলুম না। তারা আমাকে টেনে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে পা দু'টোও বেঁধে ফেললে। ঘরে আলো জ্বলছিল। দেখি, আততায়ী দু'জন মুখোশ-ধারী এবং দু'জনের হাতেই পিস্তল।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই দু'জন মুখোশধারী ব্যক্তি রামাভুজকে হত্যা করতে এসেছে। আমার বাড়ী ফেরার শব্দে তারা আমায় আক্রমণ করে বেঁধে ফেলেছে। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে বসে রামাভুজ মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাহিরে তার অলক্ষ্যে মৃত্যুপ্ত তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। যে মুহূর্তে সে বাঁশী বাজান শেষ করে ঘর থেকে বেরোবে, সেই মুহূর্তেই—ভারতে গা শিউরে ওঠে। অতর্কিতে তাকে তারা আক্রমণ করবার জন্ত দাঁড়িয়ে আর আমি সব জেনেও রামাভুজকে সতর্ক করে দিতে পাচ্ছি না। অথচ রামাভুজের প্রাণই ছিল আমি ফিরে এসে তাকে সাহায্য করব। নিজের অক্ষমতার জন্ত নিজেকে বার বার শিকার দিতে লাগলুম।

ঘরের ভেতর বাঁশী বাজছে। কি মধুর সেই সুরের খেলা। সমস্ত রামাভুজের এই শেষ বাঁশী বাজান। আগন্তুক দু'জন পিস্তল

ঠ শোবার ঘরের দরজার দু'পাশে ঝাঁড়িয়ে। নিশ্চলক চক্ষু সর দরজার দিকে নিবন্ধ। হঠাৎ কার গম্ভীর স্বর বলে উঠল—
ত থেকে পিস্তল ফেলে দাও। নড়েছ কি মরেছ। আমি দু'হাতে
তা পিস্তল নিয়ে তোমাদের লক্ষ্য করে আছি। মনে রেখ, আমার
দ্য অব্যর্থ এবং বখার নড়চড় হয় না। চমকে উঠে চেয়ে দেখি,
বার ঘরের দ্বারে ঝাঁড়িয়ে রামাছুর স্বয়ং। দুই হাতে দু'টো পিস্তল।
আবার ঘরে তখনও বাঁশী বাজছে।

ঘটনাস্রোত ঘুরে গেল। শত্রুপক্ষ এ রকম একটা ঘটবে আশা
 করেনি। তারা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঝাঁড়িয়ে রইল।
গমের অবশ্য হাত থেকে পিস্তল যেন আপনা হতেই থমে পড়ল।
রামাছুর সৈন্তাধ্যক্ষের মত হুকুম করলে—“এক জন ওর বাঁধন খুলে
দাও।” বিনা বাকাব্যয়ে আদেশ পালিত হ'ল। আমাকে রামাছুর
বললে—“ফাল্গুন, তুমি ওদের হাত পিছন দিকে বেঁধে দাও। বাখা
দেবার চেষ্টা করো না। তাহলেই আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয়
পাবে।”

আমি তখনই দু'জনের হাত পিছন দিকে বেঁধে ফেললুম।
রামাছুর এগিয়ে এসে তাদের পকেট হাতড়ে আরও একটা পিস্তল
ও একটা ছোরা পেল। সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে আমাকে
বললে—“ফাল্গুন, এইবার দীপঙ্করকে ফোন করে বল, এখনই আসতে।
বিশেষ দরকার। যেন দেবী না করে।” তখনও বাঁশী বাজছে।

রিসিভারটা তুলতে বাচ্ছি, এমন সময় সিঁড়িতে দীপঙ্করের গলা
শোনা গেল—“কি হে রামাছুর, খুব যে বাঁশী বাজছে?”—সঙ্গে সঙ্গে
সে স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকল। এ যেন জল নাটাইতেই মেঘ। দু'জন
অপরিস্রিত লোককে হাত-বাঁধা অবস্থার দেখে প্রশ্ন করল—
“এরা কারা?”

রামাছুর সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে। বিস্ফারিত
নোদ্রে দীপঙ্কর বললে—“তা তো বৃথলুম, কিন্তু বাঁশী বাজছে কে?”
রামাছুর হেসে বললে—“আততায়ীদের মতে আমি, কিন্তু আসলে
গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে।”

হঠাৎ বাঁশীধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। রামাছুর বললে—“অটোম্যাটিক
সিস্টেম। রেকর্ড শেষ হয়ে গেল। আজ বলতে গেলে ঐ রেকর্ডটাই
আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। বন্ধ করে রেখে দিতে হবে।”

দীপঙ্কর বললে—“বরাতে বেঁচে গেছ! তুমি যা অসাবধান!
যখন তোমার প্রাণ নিয়ে এমন টানাটানি চলছে, আমাকে একবার
জানালেই তো পারতে। পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করে রাখতুম।
ডয়ানক ডিসিগ্লিনের অভাব!”

রামাছুর হেসে বললে—“ভবিষ্যতে তোমার উপদেশ মেনে
চলব। এখন এই দুই ব্যক্তিকে সরাবার বন্দোবস্ত কর। অনাহুত
অতিথিদের আমার বাড়ীতে আর কতক্ষণ আশ্রয় দেব। সন্ধ্যার
অভিযালায় স্থানান্তরিত করে দাও।”

—“নিশ্চয়ই! এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।” এই বলে দীপঙ্কর
থানায় ফোন করে দিল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সার্জেণ্ট বিনোদ
পাল দু'জন কনষ্টেবল নিয়ে উপস্থিত হল। সার্জেণ্টের হাতে
লোক দু'টোকে সমর্পণ করে দীপঙ্কর উপদেশ দিলে—“খুব সাবধানে
নিয়ে যেও বিনোদ। যেন পালাতে না পাবে। লোক দু'টো ভীষণ
গুণ্ডা-প্রকৃতির। জবানবন্দী যদি কিছু পাওয়া যায় লিখে নিও।”

বাঁধন খুলে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাদের নিয়ে সার্জেণ্ট ও
কনষ্টেবলদ্বয় চলে গেল।

আমরা বসে চা খাচ্ছি আর গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ সিঁড়িতে
পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল পুলিশ সার্জেণ্ট বিনোদ পাল ও
দু'জন কনষ্টেবল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে দীপঙ্কর প্রশ্ন করলে—“কি
ব্যাপার বিনোদ! হঠাৎ ফিরে এলে যে? সেই লোকদুটো কোথায়?”

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দীপঙ্করের দিকে চেয়ে পুলিশ সার্জেণ্ট
বললে—“কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। ফিরে এলুম
মানে? আর লোক দু'টোই বা কে? আমি তো আপনার
টেলিফোন পেয়েই থানা থেকে সোজা আসছি।”

সকলেই স্তম্ভিত। কারো মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ
করলে রামাছুর। বললে—“দীপঙ্কর, আমরা প্রতারণিত হয়েছি।
শত্রুপক্ষের হাতে আমরাই তাদের অমুচর দু'টিকে সমর্পণ করেছি।
তাদের বুদ্ধির কাছে আমরা আজ পরাজিত হয়েছি।”

দীপঙ্কর ক্ষুব্ধ স্বরে বললে—“একেবারে বেত্ব বানিয়ে দিলে। ছিঃ
ছিঃ। আমি সন্দেহ পর্য্যন্ত করতে পারলুম না। ছবছ বিনোদের মত
দেখতে। উঃ ভারী ঠকিয়েছে। ব্যাটারদের একবার নাগালে পেলো—”

হেসে রামাছুর বললে—“এতক্ষণে তারা নাগালের বাইরে চলে
গেছে। চট করে যে তাদের আবার নাগালে পাওয়া যাবে তা জো
মনে হয় না।

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললে—“বিনোদ,
তোমরা তা হলে থানায় ফিরে যাও। একটু সতর্ক থেক।”

পুলিশ সার্জেণ্ট ও কনষ্টেবল দু'জন চলে গেল। দীপঙ্কর আমাদের
দিকে ফিরে বললে—“আমি ওদের ছাড়ব না। এর প্রতিশোধ নেবই।
ব্যাটারা শয়তান!”

আমি ক্ষণ কণ্ঠে উত্তর দিলুম—“শয়তান হতে পারে কিন্তু
ঠকিয়েছে বুদ্ধিবলে। স্তবরাং স্বীকার করতেই হবে, তারা আমাদের
চেয়ে বুদ্ধিমান।”

—“বুদ্ধিমান না ছাই। ব্যাটারা জোচ্ছোর। ঠকিয়েছে—”
দীপঙ্কর গজ্জ উঠল।

রামাছুর হেসে বললে—“যে ঠকে তার চেয়ে যে ঠকায় তাঁর বুদ্ধি
বেশী। আমরা ঠকেছি তারা ঠকিয়েছে। অতএব প্রমাণিত হচ্ছে,
তাঁদের বুদ্ধি আমাদের তুলনায় অধিক। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে
তর্ক করে কোন লাভ হবে না। তুমি আপাততঃ একটা সাহায্য
করতে পার?”

দীপঙ্কর প্রশ্ন করলে—“কি করতে হবে?”

রামাছুর উত্তর দিলে—“কলকাতায় সব থিয়েটারের পাশ
যোগাড় করে দিতে হবে। আর প্রত্যেক থিয়েটারের মালিকদের
সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। যাতে অবাধে টেকের ভেতর যেতে
আসতে পারি। কেউ কোন প্রশ্ন অথবা সন্দেহ না করে।”

দীপঙ্কর বিস্মিত হয়ে রামাছুরের মুখে দিকে চেয়ে বললে—“তা
পারি, কিন্তু কেন?”

রামাছুর হেসে বললে—“থিয়েটারে বই চালাব।”

আমি তার এই উত্তরে এত দূর অবাক হয়ে গেলুম যে, মুখ
দিয়ে একটি কথা পর্য্যন্ত বার হ'ল না।

আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলানিজের দিক থেকে শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। অন্তত ধারা আমার মত সাহিত্যিক অর্থাৎ ধারা উপজ্ঞাস গল্প নাটক লেখেন, তাঁদের পক্ষে। ধারা কাব্য রচনা করেন, কবি, তাঁরাও আমাদের দলের লোক। তবে আমি কবি নই, তাই তাঁদের কথা পৃথক ভাবে বলছি। এ বলার জন্ত একটি বিশিষ্ট অধিকারের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন সত্যই হয়। সে প্রয়োজনকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। সে অধিকার পাণ্ডিত্যের, বিশেষজ্ঞতার। বিশেষজ্ঞ পাণ্ডিত্যের যা মত সে বড় আশাজনক নয়।

সে দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আজ নেতিবাদই প্রবল। নেতিবাদেরও কিছু বেশী। কিছু বেশী এই কারণে বলছি যে নেতিবাদের অর্থ হল—‘কিছু হচ্ছে না।’ বাংলা সাহিত্যের ধনি শুধু ‘কিছু হচ্ছে না’ এইটুকুই নয়, যা হচ্ছে সে ধ্বংসাত্মক। শিবের অসাম্য ব্যাধি সৃষ্টি করছে বাংলা সাহিত্য। প্রমাণ-স্বরূপ তাঁরা আঙুল দেখিয়ে বলছেন—‘কল্পনা-শক্তি নাই—ভাববিলাস আছে, বিধাস নাই—সৌধীন মতবাদ আছে, সাহস নাই—শর্ততা আছে, প্রেম নাই—কলহ আছে, প্রতিভা নাই—অন্ধকরণপ্রিয়তা আছে।’ তার কারণ স্বরূপ বলেন—‘আজকাল সাহিত্যে spirit-এর উপর matter জরী হইয়াছে। আধুনিক লেখকেরা যে স্বাধীন ভাবকল্পনার দাবী করিয়া থাকেন, মূলে তাহা বাহিরের নিকট অন্তরের পরাজয়, বস্তুর নিকটে আত্মসমর্পণ, সমাজের যুগ-প্রয়োজনে স্বকীয় বঙ্গনার পক্ষচ্ছেদ। ইহার জড়জীব, চিৎশক্তিহীন, বর্তমানের আবির্ভাব ও বিক্ষুব্ধ জনস্রোতের ক্ষণবুদ্ধি—ইহাদের রচনা শতকরা পুরে যুগবিশেষের দাহিচ্ছিন্ন মসীরেখার মত মিলাইয়া যাইবে।’ শুকতর অভিব্যোগ। এ অভিব্যোগ সত্য হলে আধুনিক সাহিত্য বাঙালীর জীবনের অভিশাপ, বাঙালীর উন্নত আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এ কথা স্বীকার করতে হবে। এ অভিব্যোগ সত্য হলে বাঙালী সাহিত্যিককে তার শক্তিপ্রবাহের মোড় ফেরাতে হবে, না পারলে তাঁদের লেখনী পরিত্যাগ করাই উচিত।

তবে বিচার ক’রে দেখতে হবে—এ অভিব্যোগ কি সত্য? এ অভিব্যোগের বিচার করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে—আমরা কি হয়েছি। এ থেকে অবশ্যই বলতে হবে—আমরা যা ছিলাম তা নাই। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালীর এক বিশিষ্ট অংশ বা সম্প্রদায়ের যে নব জাগরণ শুরু হয়েছিল, যার প্রেরণায় আবেগে এই সম্প্রদায়ের জীবনে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার এ পরিণতি কেন? সে এমন শতভা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কেন? তাদের স্বাস্থ্য গেল কেন? তাদের সাহস গেল কেন? তারা এমন কলহপরায়ণ হয়ে উঠল কেন? তাদের প্রতিভার ক্ষুণ্ণের আভাস কৈ?

প্রথম প্রশ্ন স্বাস্থ্য। সে স্বাস্থ্য যদি একমাত্র বাঙালী সাহিত্যের দুর্নীতিপরায়ণতা মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলে নষ্ট করে থাকে তবে অবশ্যই সাহিত্য তার জন্ত দায়ী। কিন্তু যদি খাড়াভাবে বাঙালীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে থাকে, যদি অর্থনৈতিক গোপন যুদ্ধে বাঙালী—পোয়ালের গাই, ক্ষেতের ফসল নিজেকে বঞ্চিত ক’রে অপরের হাতে

তবে সে দাহিত্ব সাহিত্যের নয়। এই কারণে যদি বাঙালীর ঘর ভেঙে থাকে, গ্রাম ভেঙে থাকে, সমাজ ভেঙে থাকে, তবে সে দাহিত্ব সাহিত্যের নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই দেখি, তখন সত্তা সত্তা তাঁতীর তাঁত বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু তবু বাংলার গ্রামে তখন সম্পদ ছিল, খাত ছিল, কাজেই বাঙালীর স্বাস্থ্য ছিল, শক্তি ছিল, ছিল না কেবল সাংস্কৃতিক চৈতন্য। ইংরেজ-সংস্কৃতির সম্পর্কে এসে হিন্দু বাঙালীর নব জাগরণ হল। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার গ্রাণিও অম্লভব করলেন তাঁরা। আরও অম্লভব করলেন এই সম্পদ ক্ষয়ের সমস্তার আভাস। তাঁরা তখন সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রম করে তাই জাতীয়তার ভিত্তির উপর জীবন-সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত ক’রে স্বাধীনতা অর্জনের আবেগ সৃষ্টি করতে চাইলেন। বাঙালীর সাহিত্যেই সেই আবেগ প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সে আবেগ পরাধীনতার বাঁধকে ভাঙতে পারলে না, সম্পদ-শোষণের পথও রোধ করতে পারলে না। ক্রমে ক্রমে শোষণের পথে বাঙালীর সম্পদ গেল—খাত গেল। খাদ্যাভাবই গেল স্বাস্থ্য।

জাতির স্বাস্থ্য সাহিত্যের দুর্নীতি প্রচারের অভাবে মানুষের দুর্নীতিপরায়ণতার জন্ত ভাঙেনি। বাঙালীর সমাজ, বাঙালীর গ্রাম, বাঙালীর ঘর নিঃস্বতার দৈন্ত্যে ভেঙে পড়েছে। নিঃস্বত নিরুপায় অর্থনৈতিক দুর্ববস্থার জন্ত। যে কারণে টোলের পণ্ডিতের বংশধর ছুতার দোকান করে, বিশ্ববিদ্যালয় ফেরতা ছেলে আর্দ্রালীর কাজ করে, যার জন্ত কৃষক অর্থনৈতিক দুর্ববস্থার শেষ স্তরে এসে ভূমিশূন্য হয়ে মেয়ে-ছেলের হাত ধরে কলে গিয়ে মজুর হয়—সেই জন্ত। যার জন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়ে আপিসের চাকরীর জন্ত ছুটোছুটি করছে, তার মা-বাপ তার উপাঞ্জনের অর্থ হাতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে—সেই জন্ত।

কিন্তু আমাদের আবেগময় স্বাধীনতা আন্দোলন, নৈতিক তপস্বী, সমাজসেবা, ধর্মসংস্কারের প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও কেন আমরা শাসনের বন্ধনকে ছিঁড়তে পারলাম না, কেন শোষণের মুখকে রুদ্ধ করতে পারলাম না, কেন বিপুল জীবনাবেগ শাসনতন্ত্রের গোড়ায় মাথা ঠুক স্নান হয়ে পড়ল? তার ভিত্তি কিসে এত শক্ত হল? এর কারণ কি? যে কারণে তিনশ’ বৎসর পূর্বে গ্যালিলিওকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল, নিজের আবিষ্কৃত সত্যকে অস্বীকার করতে হয়েছিল, যে কারণে মানুষ আজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—সেই কারণে। গ্যালিলিও এবং বিচারক আজ যদি অলৌকিক কোন রহস্যবশে পৃথিবীতে এসে দাঁড়ান তা হ’লে যে কারণে আজ সেই বিচারককে দণ্ড ভোগ করতে হয়, সেই কারণে।

বিজ্ঞানবিদ্যার দুট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনী শক্তির ক্ষুধার দেশকে শোষণ করছিল বিজ্ঞানবাসে বীতশ্রদ্ধ শুধু আত্মিক শক্তির সাধনার দ্বারা সে শক্তির শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভবপর হ’ল না। এমন কি যদি কোনক্রমে পরাধীনতার উচ্ছেদও হ’ত তবুও সেদিন আমাদের সম্পদকে আমরা শোষণের মুখ থেকে রক্ষা করতে পারতাম না।

জিরের দ্বারের জিনিষ নিয়ে হীর নিয়ে গেলেও আমরা তা বোধ
স্ত পায়নাম না। এই কারণে স্বাধীন থেকেও চীন নিজেকে
বনের ক্ষয়বোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। আমরা
নে ধর্ম সমাজে সাহিত্যে শিল্প নব প্রেরণা এনেছিলাম, কিন্তু
যে সত্যকে অস্বীকার করেছিলাম। বিজ্ঞানকে আমরা তুচ্ছ
ছিলাম। তাকে আমরা অকিঞ্চিৎকর ভেবেছি। যাকে বিশ্বাস
তে চাই বলে আজও জড়জীবী, চিন্তাশক্তিহীন বলে আমরা ভাবিত
হ। Spirit-এর উপর matter জরী হয়েছে বলে আজও
জন্ত বিপুল আক্ষেপে আকাশ তরে রয়েছে।

বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনাবেগ পৃথিবীর ইতিহাসে
লনীর। সে আবেগময়ী শক্তি বাস্তববাদের শক্তির কাছে পরাভূত
হচ্ছে, স্তাই বাঙালীর জীবনশক্তির সঙ্গে তার সাহিত্যও আজ
ষমুখী—অনিবার্যরূপে বাস্তবষমুখী।

বিভিন্ন অভিযোগ সাহস নাই। এও কি সত্য?

বিগত ১১৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলার সম্রাসবাদীদের প্রয়াস ও
চেষ্টা উন্নত, কিন্তু অতি বড় দুঃসাহসের পরিচায়ক—এ ঐতিহাসিক
দ্র। ১১০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে দমননীতির
স্রোগ হয়েছে, বত অর্ডিনাল বাহাল হয়েছে সে আর ভারতের
ানু প্রদেশে হয়েছে? শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর ক'টা দেশেই বা
য়ছে? দমন করে কি? দুঃসাহসিক-দুর্দমনীয়তা অথবা ভীকতা?
সব সম্বন্ধে বাঙ্গালীর সাহস নাই এই অভিযোগ সত্য? এরাই তো
ই বাঙালী—বাদের মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু
নেন্দাঁস। এদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য, নীতিপরায়ণতা, সবই ছিল।
'রাই তো বহু চিন্তার পর পরবর্তী কালে নিজেকে মতবাদ পরিবর্তন
র নব মতবাদকে গ্রহণ ক'রেছেন।

এঁদের সাহস নাই, বিশ্বাস নাই, এঁরা শঠ—এ কথা কে
লবে? ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে হিন্দু রেনেন্দাঁসের মধ্যে এঁরাই তো
মন্ত বাঙালী জাতি। সেই জাগরণের সময়ে বলা অবশ্যই হয়েছে—
চি মেথর চণ্ডাল আমার ভাই। তাদের রোগে আমরা সেবাও
হয়েছি, দুর্ভিক্ষে সাহায্যও করেছি, জলপ্রাচয়ে উদ্ধারও করেছি।
কিন্তু এতেই কি তারা আমাদের ভাই হয়েছে? আমাদের সাহিত্য
গদের জন্ত নয়, শিল্প তাদের জন্ত নয়, গ্রামে তাদের স্বতন্ত্র পদ্ধতি,
দম্প্রশাতা নিবারণের সম্বন্ধ সমাজে তাদের পৃথক স্থান।
এ কথা অস্বীকারের উপায় আছে কি? এ ছাড়া বাঙলার আরও এক
হুঃ সম্প্রদায় আছে।

তাই অনিবার্যরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনাবেগ প্রচণ্ডতা
এবং মননীয়তা সম্বন্ধে প্রতিহত হয়েছে। স্তম্ভ হয়েছে। তাই
স প্রতিহতধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর উত্তরাধিকারী বিশ-
শতাব্দীর বাঙালীর মধ্যে নতুন আবেগ, নতুন মতবাদ সৃষ্টি করেছে।
স মোড় ফিরেছে। মহাদেবের জটার পাকে পাকে ঘুরে দেবাদি-
সবের শিরোবাহিনী হওয়ার গৌরবলাভ করেও সে শ্রোত কঠিন
মাটির বৃকে নামল। স্বর্গের জলধারা পঙ্কিল দেখাচ্ছে হয়তো,
হর্গের মল্যকিনী-ধারার শুভ্রবর্ণ হয়তো মাটির সম্পর্শে ঘোলা
হয়েছে, কিন্তু উর্ধ্বাশক্তি বৃদ্ধি পাবারই সম্ভাবনা আছে।

১১০৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই বাঙলার প্রাণশক্তি তার স্বাভাবিক পথের
পনান করেছে, সে সেই দিকেই মোড় ফিরতে চেষ্টা করেছে। বৃদ্ধি

আন্দোলনে বাঙলার বিলাতী কাপড় বিলাতী জিনিষ বজ্রনের
রব উঠেছে। ১১২১ খৃষ্টাব্দে এল চরকা। তার সঙ্গে এল গগনযাগ।
হরিজন আন্দোলন। বর্তমান জীবনবাদ—হাকে নিতান্তই খুলিমলিন
নথর বিদেশীয় বলে বজ্রনের রব আজ আকাশভেদী—তার ত্রিমিকা
তৈরী হয়েছে ওইখানে। সে আজ বাস্তব হয়েছে, বতটুকু গভীর
মধ্যে তাকে ধরে রাখার পরিকল্পনা ছিল, আদর্শবাদের প্রেরণায়,
জীবন-সংগ্রামের স্বাভাবিকতার তরঙ্গধারাতে সে তার স্বাভাবিক
প্রসার লাভ করবার ভ্রষ্টেই—পরিকল্পনার গভীরে অতিক্রম করে
প্রসারিত হয়েছে। দুঃসময় বজ্রিত হরিজন আন্দোলন, জাগ্রত গণ-
শক্তি আন্দোলনের কল্পনা আজ সাম্যবাদে পরিণত খৃষ্টতে চাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে যদি বলি সাম্যপ্রবণতা বাঙালীর আজ নতুন নয়,
সাম্যপ্রবণতা তার জীবনে আগেও আসবার চেষ্টা করেছিল তবে
মিথ্যা বলা হবে না। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে নবরীপকে কেন্দ্র
করে বাংলায় এক জীবনাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। সে দিন বাংলার
হিন্দু সমাজ রক্ষা পেয়েছিল, এই শক্তিতে, অথচ তারা ভীত
হয়েছিল, ত্রস্তও হয়েছিল এই শক্তির বিকাশে। চৈতন্যদেবের
বৈক্য ধর্মে সামাই বড়। তাই তাঁর পঞ্চায়ে বাংলা থেকে উড়িয়া
পর্যন্ত রাজপথে এক গণমিছিল যাত্রা করেছিল মানস-সদািবর
অভিমুখে হংস-বলাকার মত। সৃষ্টি করেছিল নতুন গান, নতুন
সাহিত্য, নতুন নাট্যকালিন্য—এক নতুন সংস্কৃতি। কীর্তন পাচালী
পদাবলী কৃষ্ণযাত্রা এই সংস্কৃতির দান। বাঙলার কৃষক-কবি,
নৌকার মাঝি-কবি, পাথের ভিহারী বাউল কবির গানে বাঙলার
সংস্কৃতি সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাঙলার পটুয়া-শিল্পীর পটে
ছবিতে শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাংলার নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে
সংস্কৃতির যে ক্ষীণ রেখা আজও জ্বলছে—সে সেই সাম্যের ভিত্তিতে
প্রতিষ্ঠিত বৈক্য আন্দোলনের ফল। কিন্তু সে টিকল না দুটি কারণে।
প্রথম, যে বিপ্লব চৈতন্যদেব এনেছিলেন—সে ভাববিপ্লব। রাষ্ট্র এবং
সমাজ তাতে বদলায়নি। বিষয়কে বিব বলে পরিচয় করেছিলেন
তিনি। তাই ভিক্ষার ভিত্তিতে ঈড়িয়ে এই সম্প্রদায় অর্ধশালীনের
চাপে ক্রমে ক্রমে হীন থেকে হীনতর স্তরে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে।
তাই আজ ইতিহাসের শিক্ষা খেবেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ভাব-বিপ্লবের
সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত
হয়েছে। তার প্রয়োগ-পদ্ধতি বৈদেশিক দৃষ্টান্ত মাত্র। তাকে এ
দেশের উপযোগী করেই গ্রহণ করতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে
জাতীয়তাবাদ বৈদেশিক হলেও আমরা গ্রহণ করেছিলাম এ দেশের
উপযোগী ক'রে। লোহার কারখানা, কাপড়ের কলের প্রায়ট বিদেশ
থেকে এনে আমরা বসিয়েছি, তাতে তার উৎপন্ন বস্ত্র বৈদেশিক হয়
নাই বা হয় না।

এ বাঙালীর চরিত্রবর্ধনতার ফল নয়, সাহসের অভাবের জন্তে নয়,
অন্ধকরণপ্রিয়তার জন্তে নয়। ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে এ পরিণতি
ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি।

এখন প্রশ্ন উঠবে—ঐতিহাসিক বিচারে এই পরিণতি হলেও এ
পরিণতি শ্রেয়: কি না? বলাবেন—spirit-এর উপর matter জরী
হলে মানুষ পতিত হবে, আমরা আমাদের চিরন্তন এতিহ্য থেকে
খলিত হব।

আরও প্রশ্ন উঠবে। ধর্ম নিছক সাহিত্যের পক্ষপাতী—কীরা

সমস্ত কিছুকে একটি কথার ফুৎকায়ে উড়িয়ে দেবার মত উড়িয়ে দিতে চাইবেন, বলবেন—‘এহ বাহু!’ সাহিত্যের সঙ্গে এই লৌকিক অবস্থান্তরের সম্বন্ধ কি? এ সমস্তই অনিত্য! সাহিত্য নিত্য শাশ্বত চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবর্তনশীল রাজনীতি, Matter বা বস্তুজগৎ লৌকিক বাহু। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান হারিয়ে মানুষের সঙ্গে সাহিত্য মাটির ধুলোয় মিশে যাবে।

তাদের বক্তব্য—পৃথিবীর এই কঠিন বস্তুর চিরদিনই আছে। জীবন Life তার সঙ্গে সংঘর্ষে, দ্বন্দ্ব, আত্মরক্ষার তাগিদে, জয়ের কামনায়, অন্তরের তপস্ব্যবলে রূপ হতে রূপান্তরে প্রকাশমান হয়ে মননশক্তিসম্পন্ন জীবদেহ এই মানব পরিণতি লাভ করেছে। মানুষও তার সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই বস্তুপ্রধান বহির্লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে দুঃখ পেয়েছে; সেই বেদনায় সে সৃষ্টি করেছে অন্তরলোকে কামনার কল্পলোক। সেখানে শোক-মিলনে, হৃৎ-স্বখে, আলোকে-অন্ধকারে একান্ত হয়ে গেছে। সেই লোকের পথ দিয়েই সে আবিষ্কার করেছে সৃষ্টিরহস্ত, রূপের বসতির মধ্যে অরূপ স্রষ্টাকে, এবং তারই সঙ্গে একান্ততার উপলব্ধির আনন্দে তার মনে যে রসসৃষ্টি হয়েছে—তাই অমৃত, তারই অভিব্যক্তিই চিরন্তন সাহিত্য। স্মৃতির মানব-জীবনে বস্তুই সর্বস্ব হলে মনোলোক খর্ব হবে, সে তার কল্পনার দূরপ্রসারী শক্তি ও সৃষ্টি হারাবে; বা নব্বয় নিত্যপরিবর্তনশীল, তাকে সর্বস্ব করে অমৃতময় চিরন্তনকে থেকে বঞ্চিত হবে। তাই বাহু রাজনীতিতে বাধা—তাই বস্তুবাদপ্রধান জীবনবাদে বাধা।

আশঙ্কার কথা সত্য। কিন্তু বহির্লোকের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ যে বেদনা পেয়ে স্বপ্নের কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে, সেই বহির্লোক জয়ের ফলে বতাই তার বেদনার পরিমাণ কমে আসবে—ততই তো তার কল্পনাশক্তি স্বপ্নের কল্পলোক থেকে সরে বহির্লোকমুখী হবেই। এই তো স্বভাব-নিয়ম। কিন্তু তার ফলে মানুষের মনের পুষ্প স্পন্দমানতা ক্ষীণ ও ত্রিযমাপ হবে এ আশঙ্কা কেন? বহির্লোক ও বেনুতন দুজিতে নব দর্শনের ফলে ক্রমশঃ স্পন্দমান হয়ে উঠেছে। ফল চিরদিন ফুটে আসছে। এক দিন ছিল—যে দিন ফুলের বর্ণ, ফুলের গন্ধ, তার সৃষ্টি—শুধু স্রষ্টার চরণে আত্মনিবেদনের জঙ্ক—এই বলেই সাহিত্য রচিত হয়ে এসেছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান আবিষ্কারের পরবর্তী কালে, তার বর্ণ, তার গন্ধের মধ্যে যে বাণীর সন্ধান পেলাম—সে বাণী বললে অন্ধ কথা। সে দিলে ভ্রমের ডাক। তার মধ্যে মানবজীবনের যৌবন-রহস্তের সঙ্গে অজুত সামঞ্জস্য লক্ষিত হ’ল। সৃষ্টি-রহস্তের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা বস্তুপ্রধান নিশ্চয়ই। সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তি তাতে খর্ব হয় নাই। ফুলের স্পন্দন তারও কল্পনার স্পন্দন তুলে তাকে কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়েছে। সে কাব্য মহৎ সাহিত্য হয়েছে, তাতে বাধা হয় নাই।

তা ছাড়া, সমগ্র বহির্লোকের মধ্যে মানুষ বহন জীবনস্পন্দন আবিষ্কার করতে পারবে, তখন বস্তুস্পন্দনের সঙ্গে নিজের জীবন-স্পন্দনের যে একাত্মতা সে করবে অজুত—সে অজুতের ফলেও আমরা চিরন্তন অমৃতরস অজুত করতে পারব। বরং মানুষের অজুতের শক্তি তাতে বৃদ্ধিই পাবে।

লোহা গলে। ঢালাই হয়। ফুটন্ত লোহার তারলের মধ্যে গুপ-পরমাণুর দ্রুত স্পন্দনশীলতা নব যুগের সাহিত্যিকের অন্তরে

হাতুড়ির বা মেরে তাকে ভেঁতা করে দেবার আশঙ্কার কথাটাই বড়। বিশেষ করে যখন তার শীতল কাঠিন্যের মধ্যেও প্রাণস্পন্দনের আভাস আমরা পাব। যেমন পাথর। সে যখন পড়ে থাকে মাটিতে তখন তাকে লোকে মাড়িয়ে যায়। সে যখন প্রাণময় দেবতা হয়ে সিংহাসনে বসে তখন তার সঙ্গে আমরা কথা কই।

এর পর সাময়িক সমাজ এবং রাষ্ট্রের কথা। রাজনীতি আর সমাজনীতির কথা।

এ প্রশ্ন উঠাই উচিত নয়। এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমি চিন্তা ক’রে দেখেছি। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে দু-দিক থেকেই বুঝবার ভুল আছে। আসল আপত্তি অর্থাৎ বাদ-প্রতিবাদের কোন অবকাশই নেই এখানে।

সাহিত্য অর্থে—কথাসাহিত্যে, গল্প-উপন্যাস-নাটকে জীবন-লীলাই প্রধান মুখ্যবস্তু। এ কথায় কোন পক্ষেরই আপত্তি নাই বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু জীবনের পশ্চাতে তো স্থান ও কাল আছে। রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে স্থান-কালের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সূর্য্য স্থির আছে, গতিশীল পৃথিবী বিবর্তিত হচ্ছে, চলছে; ফলে বর্ষে ও উত্তাপের বিভিন্নতার প্রভাভ ও সন্ধ্যার লীলা রূপান্তরিত হচ্ছে—কালো জলের বুক পদ্মের পাপড়ি তুলে বাওয়া এবং মুদিত হওয়ার মধ্যে। মানুষের জীবনলীলাও তো তেমনি ধার্য সাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে আপেক্ষিক। বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ যেমন বেদনা পেয়েছে, তেমনি বেদনা সে পেয়েছে রাজনীতি এবং সমাজনীতিনিয়ন্ত্রিত তার স্বজন, তার প্রতিবেশী, তার দেশবাসী এবং অন্ধ দেশবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে। বরং এ বেদনা আরও প্রগাঢ়, আরও গভীর। কারণ, মানুষের যে কল্পলোক তার সঙ্গে তার কালের ও দেশের সর্ববিধ নীতি বা বাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। একটা অপরটার প্রতিকলন। আত্মিক বহিঃপ্রকাশ। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই মানুষের বিকাশ ঘটেছে।

চণ্ডীলাস ভালবাসেন রামীকে।

সমাজনীতি-বিরোধী ভালবাসা। সমাজ তাতে বাধা দিল। সে বাধাকে অতিক্রম করতে গিয়ে তাঁকে নির্ধ্যাতন ভোগ করতে হ’ল। তার মধ্যেই তো হ’ল চণ্ডীলাসের জীবনের প্রকাশ। তার মধ্যেই তো তিনি উপলব্ধি করলেন জাতি ধর্ম সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে রক্তিনীর বরণীয়তা। তাই তো তার কাব্যে প্রকাশিত হ’ল—‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’

রাজনীতি সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। এর বহু দৃষ্টান্তই আছে। রামায়ণ, মহাভারত সমস্ত কিছুই সেকালের রাজনীতি এবং সমাজ-নীতির পটভূমিকায় রচিত। তবে জীবন পটভূমি অপেক্ষা অধবা পটভূমি জীবন অপেক্ষা বড় হবে সেই, প্রশ্ন। এ প্রশ্ন অবাস্তব। সমাজনীতির অজুতাসনের কাছে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বনবাস ভোগ করতে হয়েছে, আবার পরীক্ষাগুলো তিনি পরীক্ষা দিয়েই বিজয়িনীর রূপেই বহুব্রহ্মার গর্ভে অঙ্কুরিত হয়েছেন। জীবন জয়ী হয়েছে, বড় হয়েছে। এই জীবনের জয়েই সাহিত্যের সার্থকতা। সমাজ আঘাত পেয়েছে—তারও এসেছে নব চেতনা। সমাজের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে নবপ্রেরণা। রস তো শুধু আশ্রয়দানেই মগ্ন নয়, তার সঙ্গে তার সজীবনী শক্তির

মতবাদ বা একটা জীবনদর্শন প্রত্যেক অভিব্যক্তির মধ্যেই আছে। কারণ, দৃষ্টির ফলে ভাবের উদ্বেগ হয়। ভাবের প্রকাশের মধ্যে অবশ্যই দৃষ্টির দর্শনভঙ্গির পরিচয় থাকবে। সেই তো মতবাদ। তবে মতবাদ অত্যাগ্রহণ্য জীবনলীলা অপেক্ষা প্রকট হলেই সে হয় প্রচারধর্মী। সে বস্তু সাহিত্যই নয়। আবার যে জীবন দেশ ও কালের পটভূমির উপর স্থাপিত নয় সে জীবন ঋণ্ডিত অসম্পূর্ণ। তাই সে সুন্দর হলেও সম্পূর্ণ নয় অর্থাৎ সত্য নয়।

সমগ্র বাঙালী জাতি—বিশেষ করে মধ্যবিত্ত হিন্দুসম্প্রদায় গত পঞ্চাশ বৎসর যে পথে চলে এসেছে—সে পথ রাজনীতির পথ, সমাজ-নীতির পথ। বাঙালার আকাশে-বাতাসে দুঃখ-নারিষ্যের যে ধ্বনি উঠেছে তার মধ্যে রাজনীতির স্পর্শ রয়েছে। যেমন ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে বয়নশিল্পীদের কান্নার অন্তরালে। যাকে কোন মতে উপেক্ষা করা যায় না। বাঙালয় উল্লাসের ধ্বনি যদি কিছু উঠে থাকে সেখানেও আছে এই অস্বরূপ কারণ। রাজনীতি এবং সমাজ-নীতিকে বজ্ঞন করার অর্থ দেশ ও কালের পটভূমিকে বজ্ঞন করা, তাকে বজ্ঞন করে যে সাহিত্য সে good art হতে পারে, great art-এর পর্যায় সে উঠতে পারে না। সাম্রাজ্য গোজানো কন অসম্পূর্ণ নয়,—কিন্তু তার সে স্বভাবরূপ নয়।

ধারা আজ ঋণ্ডিত জীবন নিয়ে দেশ-কালের আংশিক পটভূমির উপর রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা সমগ্র দেশের এবং যুগকালের পটভূমির উপর জাতীয় জীবন নিয়েই বা বৃহত্তর সাহিত্য রচনা করতে অক্ষম হবে কেন? জাতীয় জীবনের মিছিল চলেছে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ত্যাগ, স্বার্থপরতা প্রভৃতির মধ্য দিয়েও সকল তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে জীবনের চিরন্তন প্রকাশ নূতন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে চাচ্ছে—সেই তো চির পুরাতন অথচ চির নূতন। রাজনীতি সামাজ্যনৈতিক ধারা বজ্ঞন করতে চান, তাঁরা জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গণ্ডিকে বৃহত্তরে প্রসারিত করতে জীত হচ্চেন—সেই তাঁদেরই মত ধারা নিজেরা এবং সম্ভাবন-সম্ভবিত্বের রাজপথের জয়যাত্রীর দল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখেন, আশঙ্কা করেন—ওখানে গেলে কুলধর্ম নষ্ট হবে। কিন্তু কুলধর্মের চেয়ে জাতিধর্ম বড়, এ কথা নূতন নয়, এ কথা চিরকালের কথা। এবং যেখানে জাতিধর্মের কথা সেখানে সবাই ভিড় ক'রে আসবে। ধনী আসবে, দরিদ্র আসবে, হিন্দু আসবে, মুসলমান আসবে, অশূদ্র আসবে, অস্পৃশ্য আসবে; রাজপথে চলমান মিছিলের মধ্যে পরস্পরের মধ্যেও বাস্তব-প্রতিঘাত লাগবে। চলার পথে সামনের পংক্তি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছলেই গোটা মিছিলের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনো স্বপ্ন হয় না, তখন সকলকে স্থান দিতে হবে সামনের পংক্তিতে অর্থাৎ এক পংক্তিতে। এবং এই সত্যকে অস্বীকার ধারা করতে চান তাঁরা সত্যের পূজা করছেন কি না এ কথা ভেবে দেখতে তাঁদেরই অমরোদ্ধার। ধাঁ—নব কল্পনার সব কিছুই এই দেশের মাটির এবং মানুষের উপযোগী, তার জন্ম ধারা চিন্তিত হয়ে পূর্বাহ্নে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানাই। তবে অতি সাবধানীর বজ্ঞন করার যুক্তিকে আমি অস্বীকার করি।

আর আছে ঐতিহ্যের কথা। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। ঐতিহ্য কি? ঐতিহ্য কি কতকগুলি নীতি? রীতিতে প্রকাশ হলেও তার মর্মগত অর্থ কি ভেবে দেখব না? মাটির প্রদীপে সন্ধ্যার প্রদীপ আলনাই ঐতিহ্য না অন্ধকারে আলোর ব্যবহার জানাটা ঐতিহ্য? যে পন্থায় জীবনের কল্যাণ আসে, জীবন মনোর ভাবে বিকশিত হতে পারে তার পন্থার গতি যেখানে থেমে গেছে, নূতন কল্যাণকে বরণ করার, গ্রহণ করার আগ্রহ সাহস যেখানে নাই, সেখানে ঐতিহ্যের অর্থ কি? আত্মকল্যাণের সঙ্গে সর্বজনীন কল্যাণ গ্রহণ করার উদারতা এবং শক্তির তো ঐতিহ্যের ধর্ম এবং মন্ত্রকথা।

আমার বিশ্বাস, মানুষ একটা যাত্রা করেছে অরণ্য গিরি-কন্দর থেকে, সে দিন হাতে ছিল তার পাখরের হাতিয়ার, তার পর সে গড়েছে গ্রাম, তার পর সে গড়েছে জনপদ। আজ সে গড়েছে সহর, পাখর থেকে সে আবিষ্কার করেছে লোহা! ক্রমে সে লোহার মধ্যে পাখরের মধ্যে প্রাণশক্তিসম্পন্ন পরমাণুর আবিষ্কার করেছে। এ যাত্রাপথে চিরন্তন দেহধর্ম সম্বন্ধে তার মনোধর্মের পরিবর্তন ঘটেছে মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে তার জীবনধারণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছে এবং করবে। আগে যা মেনেছে পরে তা ভেঙেছে, আবার তা ভেঙেছে। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সে নিজেকে প্রসারিত করেছে, নিজেকে সে ব্যাপ্ত করেছে, অপরকে স্বীকার করেছে, আপনায় মধ্য দিয়ে অস্ত্রকে সে উপলব্ধি করেছে। এই বাণী আজ বাংলা সাহিত্যেরও বাণী হয়ে উঠতে চাচ্ছে। তার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত আছে। সেই সম্ভাবনার পথেই মানুষের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চলতে চাচ্ছে। চলবে। চলার পথে ভ্রান্তি-বিভ্রম আসে চিরকাল। আগেও এসেছিল, এ যুগেও এসেছে, আবাবও হয়তো আসবে। নব সাহিত্যের ধারার মধ্যেও প্রথম যুগ এসেছিল। সে কথা ঐতিহাসিক সত্য। সে ভ্রান্তির কথা স্বীকার করি। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি সে যে ভ্রান্তির কুফল—আজ আবজ্ঞানায় পরিণত হয়েছে, মানুষ তা গ্রহণ করেনি। সে ভ্রান্তির সময় ধারা আশ্রয়বাক্য উচ্চারণ করেছেন তাঁরা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু তাই সব নয়। নূতন ভাব ও সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করার এইবার প্রয়োজন হয়েছে। নূতনকে গ্রহণের কাল এসেছে। নূতন উপলব্ধিতে এই নূতন কালে আমাদের যাত্রাপথ ক্রমশঃ প্রসারিত হোক, বাঙালীর জাতীয় জীবন বেগবান হোক।

সেই সঙ্গে নব যুগের বাঙালী সাহিত্যের ধারা যা আছে স্নান-সে হোক হুকুলপ্লাবিনী। বাঙালী সাহিত্য বাঙালার সকল মানুষের কল্যাণ-কামনায় তপস্বী পরিপূর্ণ হোক। সর্বজনীন সম-অধিকারের নব্য-জ্ঞানের সত্যকে প্রকাশ করে অমৃতত্বের অধিকার লাভ করুক। বাঙালার কৃষিক্ষেত্রের উর্বর ভূমির অভ্যন্তরের অনু-পরমাণুর স্পন্দনের মিলন ঘটুক; উর্ধ্বে জ্যোতির্লোকের প্রাণস্পন্দন বাহ্যিক হয়ে সাহিত্যিকের বিজ্ঞান সূক্ষ্ম স্নায়ুগুণে স্পন্দিত হোক। প্রাণি-জগৎ থেকে উদ্ভিদ-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ থেকে ধাতুতে প্রস্তুত বস্তুজগতের স্তরে স্তরে প্রাণময় নব রহস্যলোকের স্বনিকা উদ্ঘাটিত হোক তার দৃষ্টির সম্মুখে—সমৃদ্ধ হোক তার কল্পনা। কল্পনালোকের অঙ্গণ অপকল্প হয়ে প্রকাশমান হোক জীবন সাহিত্যে। বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা সত্য হোক, জীবন ধন্য হোক।

দৃষ্টি-প্রদীপ

“ভাস্কর”

১

বিধবার সংসার। ছোট একখানি দোতলা বাড়ীতে চার-পাঁচটি প্রাণী। অনন্থার স্বামী একখানি ছোট বাড়ী ও কয়েক ঝাঞ্জর টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যু বৃকে করিয়া দুই বছরের থাকাকে কোলে করিয়া অনন্থা যেন নতুন সংসার পাতিয়াছেন। ঝাঞ্জর দারুণ শোক পাইয়া পুত্রবধু ও পৌত্রকে যেন আরো বেশি দাঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। একটি পাচক ও একটি ভৃত্য সংসারের কাজ-কর্মের জন্ত রাখা হইয়াছে। মধ্যবিত্ত বাড়ালীর সংসার যেমন করিয়া চলে অনন্থার সংসারও তেমন করিয়াই চলিয়াছে। বিধবা হইয়াও ভাগ্যক্রমে একেবারে পরগলগ্রহ হইতে হয় নাই।

থোকা লইয়াই সারাদিন কাটে। তাহাকে খাওয়ানো, পরানো, দুধ খাওয়ানো, কাজল পরানো, ঘুম পাড়ানো—এ সব কি কম কাজ। তার পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক রাখা, বিছানা বাগিস মশারি ঠিক করা, তার খেলনার ব্যবস্থা করা, বৈকালে ঠেলাগাড়ীতে করিয়া বেড়াতে পাঠানো, আরো কত কাজ। থোকা লইয়া অনন্থার এক দণ্ড বিশ্রাম নাই।

একটু অসুস্থ করিলে, অমনি অনন্থা চঞ্চল হইয়া উঠেন। তখন চাকর বায় ডাক্তারের বাড়ীতে। ডাক্তার আসে, ঔষধ আসে, থোকা কাঁদে, কখনও ঔষধ খায়, কখনো খায় না। কখনো ঘুমায়, কখনো ঘুমায় না—অনন্থার সে কি উদ্বেগ। যে কয় দিন থোকা অসুস্থ থাকে, সে কয় দিন অনন্থাও যেন অসুস্থ হইয়া পড়েন। শান্ত-প্রাণী কত বাকেন, কত বলেন, কেন অত ভাব বউমা? একটু সর্পি লেগেছে, সেয়ে ধাবে। ছেলেরপিলের অমন কত হয়। অনন্থার মন বোঝে না।

থোকা যতক্ষণ চাকরের সঙ্গে বেড়াইতে যায়, বাড়ীটা খালি খালি লাগে। অনন্থা গৃহস্থালীর কাজকর্ম সারিয়াই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান, হয়তো পাশের বাড়ীর কারো সঙ্গে একটু কথা বলেন কিংবা বলেন না, কিন্তু তাঁর মন আর চোখ পড়িয়া থাকে যে পথে থোকা বেড়াইতে গিয়াছে, সেই পথে। একটু দেরী হইলে ভাবনার অন্ত থাকে না। পথে শহির হইলেই ভো কত রকমের বিপদ। বাড়ী ফিরিয়া থোকা যখন কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, অনন্থা তখন যেন স্বর্গ হাতে পান।

থোকা একটু একটু করিয়া বড় হয়। অনন্থা তারই মধ্যে দ্বারীর প্রতিচ্ছবি দেখেন। অনেক বই হইতে অনেক বাছিয়া, চেনা-সুনা আত্মীয় স্বজনের ছেলেরের নাম মনে করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল যে সব কাগজে বাহির হয়, সেগুলি পড়িয়া, বহু বার স্থির করিয়া বহু বার পরিবর্তন করিয়া অনন্থা থোকায় নাম রাখিলেন প্রদীপকুমার। নিজের চির-অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলো ওই থোকা। ওই থোকাই তাঁর গৃহের প্রদীপ।

থোকা আর একটু বড় হয়। লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে, তার পর যায় স্কুলে। অনন্থার দৃষ্টিভঙ্গা দশ গুন বাড়িল। সময়মত



ঠিক রাখা, দুপুরে জলখাবার পাঠানো, বৈকালে ফুল হইতে বাড়ী ফেরা—প্রত্যহ যেন এক মহাযজ্ঞ। বাড়ীর বাহির হইলেই পুনরায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত কত ভাবনা। ফুলে কি করে, পথে কি করে, কখন ক্ষিপে পায়, কখন অসুস্থ করে, এমনি কত ভাবনা সদা-সর্বদা অনন্থার মনে জাগিয়া থাকে।

থোকা পাশ করে, জলপানি পায়, অনন্থার মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। থোকা এখন আর থোকাটি নাই। এখন হইতে সে প্রদীপ। প্রদীপকুমার কলেজে ভর্তি হয়, মোটা মোটা বই পড়ে, হাফপাণ্ট পরিয়া খেলিতে যায়—দেখিয়া দেখিয়া অনন্থার মন শান্তিতে অভিযুক্ত হয়।

প্রদীপ এম্-এস্-সি পাশ করিল, পুরস্কার পাইল, মেডেল পাইল। একটি কঠিন পরীক্ষা দিয়া প্রদীপ সরকারী চাকুরীতে চুকিল। মায়ের অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা আজ সফলতার দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রদীপের দিকে চাহিয়া অনন্থা ভাবেন, আহা, যদি আজ তিনি থাকিতেন! ভাবিতে ভাবিতে মনের মাঝে একটা দীর্ঘশ্বাস জমিয়া উঠে, পুত্রের মুখ চাহিয়াই তাহা নীরবে সকলের অলঙ্কে মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখেন।

প্রদীপের বদলীর চাকরি। কিছু দিন অনন্থা কলিকাতার বাড়ী ছাড়িয়া থোকায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিলেন। একা যে তাহার কষ্ট হইবে। কে তাহার দেখাশুনা করিবে? প্রদীপের অল্প একটু আপত্তি সত্ত্বেও অনন্থা দেখিয়া শুনিয়া প্রদীপের বিবাহ স্থির করিলেন।

শুভলগ্নে থোকায় বিবাহ হইয়া গেল। কিছু দিন পর্যন্ত অনন্থা পুত্র ও পুত্রবধু সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরিলেন। প্রদীপ ও সন্ধ্যা তাঁহার জীবনে এক নতুন অধ্যায় আনিয়া দিয়াছে। সংসারের ভারকেন্দ্র ক্রমশঃ তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া বাইতেছে। প্রদীপের বদলিও বড় ঘন ঘন হইতে লাগিল। এদিকে কলিকাতার পরিত্যক্ত বাড়ীতেও নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত দেখিয়া ও সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া অনন্থা এত দিন পরে তাঁহার প্রদীপকে ছাড়িয়া কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

প্রদীপ ও সন্ধ্যা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসে। মায়ের কাছে দুই-এক দিন থাকে, আবার চলিয়া যায়। মা চিঠির জন্ত উদ্ভ্রম্য হইয়া থাকেন। প্রদীপ ও সন্ধ্যা দু'জনেই পত্র লেখে। কুশল-সংবাদ পাইলে তৃপ্তিলাভ করেন, অসুখ-বিস্রবের সংবাদ পাইলে ভাবিয়া আকুল হন। আরোগ্য-সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত এতটুকু শান্তি পান না। পুরানো কি যখন বলে, ওদের জন্ত কেন অত ভাব? ওরা বড় হয়েছে, বাহুব হয়েছে, ওদের জন্ত এত ভাবনা কেন তোমার?

অনুহা বলেন, ওরা যে আমার চোখের মণি। ওদের না দেখে আমি থাকতে পারি নে।

২

ত্রিশ বৎসর পরে। এই ত্রিশ বৎসরে অনুহা'র শরীরে ও মনে বহু পরিবর্তন হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যু ক্রীণ হইতে ক্রীণতর হইলেও এখনও তাহার মনোবাজ্যে অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই। বসন্তবাটীখানি ক্রমশঃ পুরাতন হইলেও তাহার প্রত্যেকখানি ঘর, প্রত্যেকখানি জানালা তাঁহাকে একান্ত আপন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। ক্রী-শুল্ক-কক্সা-সহ তাঁহার প্রদীপ বহু দিন বহু দূরে থাকিলেও তাঁহার মনের নিদ্রিত কক্ষের সর্বদা তাহাদের ছবিই ভাসিয়া উঠে।

নিজের বার্কক্যু ও বৈধব্যের ভার আর একা বহিতে পারেন না। একটি দূর-সম্পর্কীয় বিধবা ভাইবিকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। পুরাতন ঝি কয়েক বৎসর হইল, হাসপাতালে মারা গিয়াছে। একটি দূর-সম্পর্কীয় জ্যাতি আজ কয়েক বৎসর হইল এখানে আছেন—তিনিই সাংসারিক ব্যবস্থার ভার লইয়াছেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে জীবন যেমন করিয়া চলিত, এখনও তেমনি চলিতেছে। এই ত্রিশ বৎসরে কত নবীন জীবন অকুরিত হইয়াছে, কত জীবন-দীপ নিবিয়া গিয়াছে; মানুষের সমাজে কত নবীন চিন্তা-শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, বিজ্ঞান কত অভিনব তত্ত্ব ও অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে; কত প্রাণ, কত বজ্রা, কত মহামারী, কত অশান্তি বহিয়া গিয়াছে পৃথিবীর বুকে; কত প্রয়াস ও নিঃফল কামনা শু-পীকৃত হইয়াছে মানুষের জীবনে, সমাজে ও চেতনায়; কিন্তু মানুষের একান্ত আপন যে জীবন, যে মৈনন্দিন সুখ-দুঃখের তারে গাঁথা বৈচিত্র্যের মালা, কতটুকু পরিবর্তন তার হইয়াছে?

অনুহা আজ বুঝা। তাহার জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সবই আজ প্রায় নিশ্চল। তাঁহার বাড়ীখানি, তাঁহার সঙ্গী ও সঙ্গিনী কয়েকটি নরনারী, আর বিদেশবাদী তাহার প্রদীপের সংসার, ইহাই তাঁহার বর্তমান জগতের সবটুকু। এই ক্রীণ পরিমিত বাহিরে তাহার মন যায় না। তাঁহার চক্ষুর পরিধি আরও ক্রীণ। একটি চক্ষু একবারেই গিয়াছে। আর একটি চক্ষুতে খুব অল্প দেখিতে পান। ক্রমশঃ তাহাও যেন ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর পূর্বে যখন প্রদীপ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তখন অনুহা

তার, সন্ধ্যার এবং তাহাদের পুত্রকল্পদের প্রত্যেকের মুখখানি হাতে করিয়া চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া সম্মুখে চুপন করিয়াছিলেন। নাতি-নাতিনৌরা ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। ভাইবির সারদা বলিয়াছিল, পিসিমা, তুমি একেবারে পাগল। অনুহা উত্তর দিয়াছিলেন, ওরা যে আমার চোখের মণি।

প্রদীপ বদলি হইয়াছে পুণায়। সেই যে তিন বৎসর পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহার পরে আর এদিকে আসা হয় নাই। কবে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। অনুহা'র দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে ধীর মন্দর গতিতে। এ গতিতে কোন সুর নাই, কোন তাল নাই, কোন বিস্ময় নাই, কোন মাধুর্য নাই, কোন তিক্ততা নাই।

কয়েক দিন হইতে মনে হইতেছে, চোখের অবশিষ্ট জ্যোতিটুকুও যেন কমিয়া আসিতেছে। অনুহা মাঝে মাঝে সারদাকে কাছে ডাকিয়া তাহার মুখের উপর আলো ফেলিয়া দেখেন, চোখের দুটিটা আছে না একেবারেই গেছে। এক দিন তাঁহার মনে সত্যই সন্দেহ হইল, বোধ হয় আর বেশি দিন চোখের দীপ্তি থাকিবে না। চোখের কোণে জলের কঁোটা জমিয়া উঠিল। সারদাকে বলিলেন, শীগগির একখানা টেলিগ্রাম করে দিতে বল। এখনি যেন ওরা চলে আসে, নইলে এ জন্মে আর ওদের দেখতে পাব না।

টেলিগ্রাম গেল। এ বাড়ীর সকলেই পথ চাহিয়া আছেন। উহাদের থাকিবার স্থবিধার জন্য ঘরগুলি পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং যথাসম্ভব সাজানো-গুছানো হইয়াছে। প্রত্যহ দুই বেলা ট্রেনের সম্ভাবিত সময়ে পথের দিকে সকলে চাহিয়া থাকে। টেলিগ্রামের উত্তর না আসায় উহাদের আশিবার সম্ভাবনা আরও বেশি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সকলেই বলিতেছেন, না আসতে পারে টেলিগ্রামের উত্তর আসত।

সাত-আট দিন পরে উদ্বেগের প্রশান্তি হইল। টেলিগ্রাম নয় একখানা পত্র আসিল। ছোট চিঠি। মধুও ছোট। প্রদীপ ছেলে-মেয়েদের লইয়া কান্দীর বেড়াইতে যাইতেছে। এখন কলিকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়।

অতি ধীরে সন্তর্পণে সংবাদটি অনুহা'কে জানানো হইল। বুঝা বোধ হয় একটু কাঁপিয়া উঠিলেন। চোখটিও বোধ হয় একেবারেই নিশ্চল হইয়া গেল।

“মাসিক বহুসতী”—আপনি একা পড়বেন

না, যারা পড়তে পারে তাদেরও পড়াবেন। কারণ চাহিদামুযায়ী সকলকে পড়ানো কাগজের দুশ্রুপাতার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

“ছোটদের আসর”

ছোটদের হাতে তুলে দেবেন।

প্রেম শ্রীউমা দেবী

আজ ফিরে ফিরে শুধু তোমার কথাই
মনে পড়ে বাদলের ছপূর বেলায় ।
কেমন ঘিরেছে মেঘ । তুমি আর আমি
হু'জনে হু'ঠাই আছি । কেবল আকাশ
মেঘের সজল-ছায়া আঁচলের তলে
এইক্ষণে আমাদের এনেছে সংযোগ—
সংযোগ এনেছে আজ দেহের মনের—
বর্ষণ-শীকর-স্নিগ্ধ ছপূর বেলায় ।

আজ যেন মনে হয় যত দূর যাও
লক্ষ শত জন্ম ধরে পথচারী হয়ে
সমাপ্তি-বিহীন এই আকাশের তলে
বিচ্ছেদ কখনো তবু হবে না কোথাও ।
অনন্ত উলার কাল—অনন্ত আকাশ—
অনন্তের অধিকার রয়েছে আমার ।

ভুলপক্ষ রাত ছিল । ছাদের উপরে
শুধু তুমি আর আমি সেদিন ছিলাম ।
আকাশে অপূর্ব চাঁদ অঙ্কিত উজ্জ্বল
(ছ্যালোকে ভুলোকে যেন যত আলো ছিল
তিল তিল আহারণে হয়েছ নিঃশ্বাস)
উজ্জ্বল অঙ্কিত চাঁদ—লক্ষ যুগ পরে
সেদিনই পেয়েছিল তপূর্ব পূর্ণতা
আমি চেয়ে দেখিলাম সে চাঁদ তুমিই ।

আজো বসে আছি ছাদে । শুধু তুমি নাই,
আকাশে শুঁঠনি চাঁদ । অন্ধকার হতে
লক্ষ কোটি নক্ষত্রের জ্যোতির কণিকা
নিঃশেষে চেয়ে আছে আমার নয়নে ।
চূর্ণিত চাঁদের রেখা—আলোক কি ওরা ?
দেখিলাম তারাদলে রয়েছে আমিই ।

এসো আজ নদী-তীরে বসিব হু'জনে,
বিছানো—কামলতর বেলাবালুকার,
হু'জনে জাগিয়া আজ করিব বাপন
এ যামিনী প্রিয়তম নিবিড় মায়ায় ।
কেমন গহন আজি রাতের আঁধার,
ঝিমায় তারার দল সূদূর আকাশে,
বৃক্ষ নদীর মুহু মন্থর নিশ্বাস,
শয়ান শৈবাল দল গভীর আলসে ।

হোঁয়া লাগে কেশের না বাতাসের প্রিয় ।
নাসার কিসের জাগ ? ফুলের ? দেহের ?
জলের গুঞ্জন এ কি তোমার গুঞ্জন ?
অস্তরে রয়েছে তুমি অথবা বাহিরে ?
যে আলো নয়নে মোর কেলিছে আভাষ
তোমার নয়ন কি এ পূর্বের আকাশ ?

সে যে ঠিক কোন দিন পড়ে নাকো মনে
নোতলার ছোট ঘরে জানলার পাশে
গদি-আঁটা কেদারায় তুমি ছিলে বসে
আর তার হাতলেতে আমিই ছিলাম ।
আলো ও আঁধারে মেশা আবছায়া ঘর
জানলার লতাজালে সন্ধ্যার লালিমা
উন্মুক্ত কেশের ছায়ে আধো ঢাকা তুমি
মনে পড়ে দিয়েছিলে সরাগ চুসন ।

চাহিলাম নীলাকাশে বাতায়ন পথে
খণ্ডিত মেঘের দল সূর্য্য ডুবে যায়
বর্ণ-আলিঙ্গন মেঘে দ্রুততর বেগে
রক্ত হীন অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলায়—
আমি ভাবিলাম শুধু সূর্য্য ডুবে গেলে
রঙের ভঙ্গিমা কেন আকাশ হারায় !

দেখিতে কি পাও বন্ধু সন্ধ্যাকাশ তটে
ওই ঘোর হয়ে নামে নিশার কালিমা ?
ভয়ত্রস্ত বিহঙ্গের উন্মত্ত কুঞ্জে
শুনিছ কি দিবসের প্রলাপ-ক্রন্দনা ?
তৃষাতুর দিবসের ক্রন্দনা ও নহে
নহে জেনো ও কালিমা আসন্ন নিশার
যৌবন দেখিছে মুখ জরার দর্পণে
উৎসাহ আর্দ্রবরে ফেরে অনিবার ।

এ দুঃস্বপ্ন যায় যদি শুধু একবার—
যদি একবার চাও নয়নে আমার—
বেখানে আরক্তরাগে জেগেছে পিপাসা
সন্ধ্যাতটল শেষ আলোকের মত ।
নিশার শীতল ছায়া করিয়া হরণ
যদি বা নামে গো সেখা নয়নে নয়ন ।

সহসা চাহিয়া দেখি আমার আকাশে
প্লাবন আনিল কোন আশ্চর্য্য আলোক
চকিতে সহস্র ফুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে
হাসিল অসহ্য সুখে মেঘের স্তবক ।
চূর্ণিয়া চূর্ণিয়া করে আলোক-রেণুকা
অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণদীপ্তি করিয়া হরণ
ভাবিছ আশ্চর্য্য হয়ে কে ঐশ্বর্য্যবান
চিক্রিল বিচিত্র রূপে নভো অকারণ ?

নিমেষে হেরিগু ভূমে শান্ত তৃণদল
শ্রামল শীর্ষের সারি সংযত আবেগ
কে আহা গোপনচারী সঞ্চারিয়া দিল
নিঃশব্দে প্রাণের স্পর্শ পত্রের অন্তরে ?
এই প্রয়োজন আর অপূর্ব বিলাস
কে করিছে রূপায় ? শুনিলাম 'প্রেম' ।

বাঙ্গালী সাহিত্যে প্যারিডি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বিজ্ঞেন্দ্রলালের নামই বিশেষ করিয়া মনে জাগে। তিনি হাসিতে জানিতেন এবং হাসাইতেও জানিতেন। রসিকতা ছিল তাঁহার মজ্জাগত। বঙ্গসাহিত্যে তখন হাঙ্গরসের প্রাচুর্য ছিল না—এখনই যে আছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না—যাহা ছিল তাহাও আমিরসের আত্যাত্তিক সমিক্ষণে পঙ্কিল। হয়তো সেই কারণেই আমাদের দেশে হাঙ্গরস অপাংক্ত্যের ছিল; বিপুল সমাজে হাঙ্গরসের জন্ত কোনো স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট ছিল না।

বিজ্ঞেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের এই অভাব লক্ষ্য করিয়াই বিপুল হাঙ্গরস পরিবেশন করিতে মনোযোগী হন। তাঁহার ‘হাসির গান’ এবং বিবিধ প্রহসন হাঙ্গরসের অমৃত নিষ্কার। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট। কেবলমাত্র আনুকারিক হাঙ্গরসই ইহার আলোচনার বিষয়। তাই তাঁহার প্যারিডির গতি অতিক্রম করিতে পারিতেছি না। তিনি শুধু যে আশ্রয়ের রচিত গান বা কবিতার অনুকরণ করিয়াই নিশ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। অজ্ঞ নাটকের অনুকরণে একটি রজনীটাও রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম ‘আনন্দবিদায়’। অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত ‘নন্দবিদায়’ নাটকের অনুকরণে ইহা রচিত হয়।

হাঙ্গরসের সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঘনিষ্ঠ বোগ আছে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমাত্রই অল্প-বিস্তার শীড়াদায়ক। যে কৌতুকের আক্রমণের বিষয় বস্তু সংকীর্ণ, সে কৌতুক তত বেশী শীড়াদায়ক। হাঙ্গরসে যখন ব্যক্তিগত আক্রমণ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তখন তাহার নির্মলতা নষ্ট হয়।

বিজ্ঞেন্দ্রলালের ‘আনন্দবিদায়’ রচিত হয় ১৩১১ সালে এবং ঐ বৎসরই ঠাঁর থিয়েটারে অভিনীত হয়। কিন্তু প্রথম দিনের অভিনয়ের পরই রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ এই নাটক বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। দর্শকগণ মনে করেন, ইহাতে রবীন্দ্রনাথকে অশোভনরূপে আক্রমণ করা হইয়াছে।

উপরে বিজ্ঞেন্দ্রলালের রচিত যে অনুকার কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি আনন্দবিদায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্যারিডি হিসাবে এগুলি ভাল। স্বতন্ত্র ভাবে ধরিলে কবিতাগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দবিদায় নাটিকাখানি সমগ্র ভাবে বিচার করিলে সম্বন্ধের উদয় হইতেও পারে। নাটকের কোনো কোনো চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নামও আছে। কিন্তু সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলিয়া আর লাভ নাই! বাহিরের লোকের কথা কাণে না তুলিয়া গ্রন্থকারের কথার আস্থা স্থাপন করাই সঙ্গত বোধ করি। ভূমিকায় বিজ্ঞেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন:

“প্যারিডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে—রঙ্গ। তাহাতে কাহারও দুঃখ হইবার কথা নহে, বরং প্রীতি হইবারই কথা। কারণ বিখ্যাত রচনাই প্যারিডি লোকে করিয়া থাকে। মিটনের ‘প্যারিডাইজ লষ্ট’, মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ’, হেম বাবুর ‘হতাশের আক্ষেপ’, ঠাকুর দেবতা বিষয়ক বহু গানও নকলের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মজ্জিত কয়েকটি গানও এই সম্মানলাভ করিয়াছে।

“এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। ‘মি’র প্রতি আক্রমণ আছে। ঝাকামি, জ্যাঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অসুখ হয় তাহা তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে নরপণ ধরিয়াছি যাত্র। যদি ইহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হয়, তাহা হইলে

এ ব্যঙ্গ তাঁহাদের গায়ে লাগিবার কথা নহে। এক জন কবি অপর কোন কবির কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অজ্ঞায় বা অশোভন হয় আমি তাহা স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমূল্যকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য।...”

ইহা ছাড়া “সৌখীন সাহেবী কৃষ্ণভক্তিকে ব্যঙ্গ” কথাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রস্তাবনার্য তাঁহার বক্তব্যটি আরও সুস্পষ্ট।

প্যারিডিতে প্রহসনে শিখি,
গুলে নিরে অপোরাতে শিখি
কটু ও মিষ্ট
(পরে) বা থাকে অদৃষ্ট—
“(কাব্য) কুনীতির পৃষ্ঠে বাটিকা।

নাহি ধীর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি ধীর
লালসায় শুণু অম্বরক্তি—

এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট টাটিকা।

নাটকটি যে কেবলমাত্র রঙ্গ নহে, ইহাতে যথেষ্ট ব্যঙ্গও আছে এবং সে ব্যঙ্গকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে—এ আশঙ্কা লেখকের ছিল। কিন্তু সে আশঙ্কা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাই বেশ উদ্ধত ভাবেই বলিলেন:

কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিষেব নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—

বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা।

ব্যক্তিগত আক্রমণের মধ্যে যে হীনতা আছে, বিজ্ঞেন্দ্রলালের জ্ঞান তেজস্বী পৌরুষধর্মীর পক্ষে সেই হীনতার আশ্রয় লওয়া স্বাভাবিক নয়। তবে ‘মি’র প্রতি তাঁহার বিপরীত আক্রোশ ছিল, সেই ‘মি’কে ব্যঙ্গ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে তিনি সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটি তাৎকালিক সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

“বিজ্ঞেন্দ্রলালের রচনায়, চরিত্রে ও আচরণে সর্বত্রই পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েলি ধরণটা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। তাই তিনি লম্বা লম্বা কৌকড়ান চুল রাখা, নাকি-হুরে কথা কওয়া, মদ্যর পানক্ষেপে গমন, অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রভৃতির উপর ‘হাড়ে চটা’ ছিলেন। পুরুষ চোঁটা করিয়া ঝাঁলোকের মত হইবে, ইহা তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইত। তাঁহার ‘আনন্দবিদায়’ নামক অনুকৃতি-কৌতুকে তিনি যেন কতকটা আত্মবিশ্বস্ত হইয়া অশোভনরূপে ও অজ্ঞায় ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন।” (১)

এই নাটিকায় শুণু রবীন্দ্রনাথের নয় গিরিশচন্দ্র এবং সীতেশ্বর-প্রসাদের রচনারও প্যারিডি আছে। যে নন্দবিদায় নাটিকার অনুকরণে প্রহসনটি রচিত হয়, তাহারও অনেকগুলি গানের প্যারিডি ইহাতে আছে। দুই-এক জন পুরাতন কবির রচনাও অনুকৃত হইয়াছে।

গোবিন্দ অধিকারীর “তক শারীর দম্ব” এক দিন দেশে সুপ্রচলিত

ছিল। কিন্তু আত্মিকার পাঠকের কাছে হরতো তাহা অপরিচিত।
মূলটি জানা না থাকিলে পাঠকের রস উপভোগে বাধা হইবে। সেই
জন্য মূল কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের।

রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।

শুক বলে, আমার কুক মনমোহন।

শারী বলে, আমার রাধা বামে বতকণ—

নইলে শুধুই মন।

শুক বলে, আমার কুক গিরি ধরেছিল &

শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সকারিল—

নইলে পারবে কেন।

শুক বলে, আমার কুকের মাথার ময়ূরপাখা।

শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা—

ঐ যে বায় গো দেখা।

শুক বলে, আমার কুকের চূড়া বামে হেলে,

শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে—

চূড়া তাইতে হেলে।

শুক বলে, আমার কুক হৃদয়-জীবন।

শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন—

নইলে শূন্য জীবন।

শুক বলে, আমার কুক জগৎ চিন্তামণি।

শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী—

সে তোমার কুক জানে।

শুক বলে, আমার কুকের বাঁশী করে গান।

শারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম—

নইলে মিছে সে গান।

শুক বলে, আমার কুক জগতের কালো।

শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো

নইলে অঁধার কালো। ইত্যাদি

এবার কিঞ্জনেনাথের প্যারিড উল্লন :

কুক বলে, আমার রাধে বদন তুলে চাও।

রাধা বলে, কেন মিছে আমারে জালাও—

মরি নিজেই জালায়।

কুক বলে, রাধে দুটো প্রাণে কথ কই।

রাধা বলে, এখন তাতে মোটেই রাজী নই—

সব খোঁটার মরি।

কুক বলে, সবাই বলে আমার মোহন বেণু।

রাধা বলে, ওহো ওনে আমি মরে গেছ—

আমায় ধর ধর।

কুক বলে, পীতকড়া বলে মোরে সব।

রাধা বলে, বটে। হল মোকলাত তবে—

থাক্ আর খাওয়া দাওয়া।

কুক বলে, আমার রূপে জিতুবন আলো।

রাধা বলে, তবু যদি না হতে মিশ কালো—

রূপ তো ছাপিরে পড়ে।

কুক বলে, আমার গুণে বৃত্ত প্রজবাস।

রাধা বলে, বৃত্ত হচ্ছে না একটা জরী জাল—

তাতে আমারই কি &

কুক বলে, তনি যদি লোকে আমার কর।

রাধা বলে, লোকের কথা ক'রো না প্রভাত—

লোকে কি না বলে &

কুক বলে, রাধে তোমার কি কপেরই ভটা।

রাধা বলে, ধী ধী কুক ধী ধী তা ডা কটে,

সেটা সবাই বলে।

কুক বলে, রাধে তোমার কিবা ঢাক বেশ।

রাধা বলে, কুক তোমার পছন্দটা বেশ

সেটা বলতেই হবে।

কুক বলে, রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা।

রাধা বলে, কুক তোমার বাস যিষ্ট কথা—

যেন সুখ করে।

কুক বলে, এমন বর্ণ দেখিনি তো কতু।

রাধা বলে, ধী আচ্চ সাবান বাখিনি তো তবু

নইলে আরও সাধা।

কুক বলে, তোমার কাছে যদি কোথার লাগে।

রাধা বলে, এ সব কথা বললেই হত আগে—

গোল তো মিটেই যেত।

বাংলা সাহিত্যে ভাল হাসির কবিতা বেশী নাই। বাহা আছে
তাহার মধ্যে এই প্যারিডটি একটি উচ্চাঙ্গ লাগি করিতে পারে।

আত্মকারিক রচনার যে হাতেরসে উদ্ভব হয় তাবের বৈপরীত্যই
তাহার কারণ। রচনার বাস্তবিক আকারটাই অল্পকৃত হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত
ভাবটা নয়। মূল ও অল্পকৃতির মধ্যে তাবের অসঙ্গতি বড় বেশী চটবে
(অবশ্য তাহাও একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে), হাতের মাত্রাও ততই
বৃদ্ধি পাইবার কথা। আদ্যোক্ত অল্পকৃতির হাতেরসে যে একটু তীব্র,
বাহিরের সহিত ভিতরের আত্যন্তিক অঙ্গগতিই তাহার কারণ।

'শুক-শারীর বন্দ' কবিতাটির মধ্যেও বেশ একটি সুমধুর হাতেরস
আছে, কিন্তু ভক্তিরসের সন্নিবেশে তাহা কিছু গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অন্যকার কবিতায় সেই গভীরতা নাই, আছে চপলতার আতিশয়া।

কুকলক্ত শুক এবং রাধিকালক্ত শারী ব' ব' ভক্তির পাত্রকে বড়
কবিবার জন্য পদ্যশব্দের মধ্যে বগল্লা কবিরাছে। এখানে আধুনিক
ঐক্য রচনার বাস্তবিক কাহে আত্মরহিত্য কীর্তন করিতেছেন।
উক্তরে রাধা কিন্তু আপন রাধাস্ব্য প্রচার করেন নাই অথবা তিনি যে
কুকের অপেক্ষা অনেক উচ্চ এমন কথাও বলেন নাই। তবে তাহার
উক্তরে কুক-রাধাস্ব্য সঘর্ষে অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই
অসহিষ্ণুতার মধ্যে আপন প্রেমটি তনিবার জন্য যে ব্যাকুলতাই
প্রোচ্ছ ছিল, তাহা শেষের কয়েকটি অঙ্কুশে ব্যক্ত হইয়াছে।

রাধা অবশ্য বলিয়াছেন :

“এ সব কথা বললেই হত আগে—

গোল তো মিটেই যেত।”

কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু লেখক যে গোল মিটাইবার জন্য বলম
ধরেন নাই।

সন্ধ্যের কোলাহলময় পথের পাশে হোটেল। সন্ধ্যের এই প্রধান রাস্তার হোটেলের সংখ্যা কম নয়। হু'পালে দেশী-বিশেষী নানা জাতের। সকলেই নিজেকে জাঁকজমকে সাজিয়ে পথের জনপ্রস্রাভ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। সেখাে স্পষ্টই মনে হয়, একে অপসর্গকে ঐক্যবোধ সজ্ঞায়ে পেছনে কেসে সগর্বে ঝাঁড়তে চায়। নানা হোটেলগুলোর মাঝে জীব প্রতিযোগিতা; চাকচিক্যের চমক লাগিয়ে সকলেই পসার জমাতে চায়। কিন্তু এ সব সন্ধ্যেও, এই হোটেলটায় আকর্ষণ কিছুমান কম ছিল না—বিশেষ করে বাঙালীদের কাছে। বাঙালেশ হেডে এই সন্ধ্যের বিশেষে যে সব বাঙালীরা নিত্য নতুন আসতেন, তাঁরা তাঁদের স্বপ্নজীবী আত্মনা এই হোটেলেরই গাড়তেন। বাঙালীর হোটেল—ম্যানেজার বাঙালী। ধারা খেতে আসেন, গল্প-গুজব করেন বা ভাস-ধাবা পেড়ে বসেন তাঁরা সবই প্রায় বাঙালী। বোর্ডাররাও সব বাঙালী। তাই এখানে পুরোমস্তর বাঙালী হাওয়া বয়। ঘরের মতই এখানে নিবিড় আকর্ষণ জাগে। এ সব গৃহ-হায়া ছয়হাড়া প্রবাসী সম্ভানদের।

এই হোটেলের আমি প্রায় পাঁচ মাস আছি। এত দিনের ঘর-ছাড়া মনের বেদনা, এই হোটেলের আবহাওয়া আশ্রয়ী ভাবে ভুলিয়ে রেখেছে। এত দূরে এসেও সব সময় কাশে আসছে বাঙলা কথা, হাসি, বাঙালী-মনের সুখ-দুঃখ হাসি-কায়া।

আমার মত এত দিনের বন্ধু এ হোটেলের বেশী নেই। ধারা আসেন তাঁদের প্রায় সকলেই হয় কোনো ফার্মের প্রিন্সিপেট্টেট্‌উ, না হয় কোনো ব্যাঙ্ক বা ইনসিওরেন্সের এজেন্ট। থাকেন দু'-এক দিন বড় জোয়। তাই বেশীর ভাগ ঘরেই নিত্য-নতুন বাঙালীর মুখ দেখি।

আজ এই হোটেলের-দেখা এমনই এক নতুন মুখের কাহিনী শোনাব।

নীচে ম্যানেজারের টেবিলের পাশের চেয়ারে বসে, গল্প করছিলাম স্বয়ং ম্যানেজার নিতাই বাবুর সঙ্গে। বেশ অমারিক ভয়লোক। মাঝামাঝি-বয়স। মাথার কাঁচা চুলের মাঝে দু'-একটা পাকা চুল স্তম্ভপণে উঁকি মারে বৈ কি। ঘর ছেড়ে এই বিদেশে এসে দ্বিবি পসার জমিয়েছেন।

নিতাই বাবুর সঙ্গে নানা গল্প করছিলাম। এমন সময় গেটের কাছে কিছুটা থামল। নামলেন এক জন বাঙালী ভয়লোক। পাতলা চেহারা; মাথায় একটু খাটো, হাঁটু অবধি নেমে আসা ধুতি, পাশের 'চ'টার একেবারে ভগ্ন লম্বা উপস্থিত। জামার ওপরে মোটা কোট—দু'-এক জারগার ছিঁড়ে গেছে। আঁচড়ান নয়, ছোট ক'রে ছাঁটা চুল। গালের নীচে দাড়ি গজিয়েছে খুশীমত। এই অমাবজিত চেহারায় তাঁর আবির্ভাব।

তিনি এগিয়ে এলেন নিতাই বাবুর কাছে।
 "আপনিই কি এই হোটেলের ম্যানেজার?"
 জবাব দিলেন নিতাই বাবু—হ্যাঁ, কি দরকার আপনার বলুন।'
 নতুন কোন বাঙালী এলে দেখেছি নিতাই বাবু খুব বিনীত ভাবে কথা বলেন এবং তাঁর সুখ-সুবিধার জন্তে যত দূর সম্ভব সতর্কতা নেন।

'খাচা-খাওয়ার সুবিধে হয়ে এখানে?'

'চা' কি বকম?'

'মাছলি প্যরিশি টাকা।'

একটা সোম্ভান টিনের স্ট্রেকশ আয় ছোট্ট বেড়ি দরকার পাশে রেখে রিক্সা-চালক অনেকক্ষণ থেকে ঝাঁড়িয়েছিল। সে দিকে চোখ পড়তে ভয়লোক বললেন, 'একে দশ আনা দিয়ে বিন না। খুঁচরা নেই আমার কাছে।'

দশটা আনা দিলেন নিতাই বাবু। বিপদে সাহায্য তিনি প্রসন্ন মনেই করেন। রিক্সা-চালক সেলাম ক'রে বিদায় নিতে, নিতাই বাবু মোটা খাতা খুলে দোয়াতে কলম ডোবালেন।

'আপনার নাম?'

'সিগিথ দস্ত।'

বাঙালী বোর্ডারদের নাম ছাড়া আর কিছুই তিনি জিজ্ঞেস করেন না বা ঐ মোটা খাতায় টুকে রাখেন না। বাঙালীদের ওপর অগাধ বিশ্বাস নিতাই বাবুর।

'অ কেট, এই বাবুকে সাত নম্বরের ঘরটা দেখিয়ে দে, আর স্ট্রেকশ-বেড়ি ও ঘরে দিয়ে আয়।'

সাত নম্বরের ঘর মানে আমার পাশের ঘরটা। সিগিথ বাবু কেটের পেছু নিলেন।

নিতাই বাবুর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, 'বাক, আপনার এক জন বোর্ডার বাড়ল।'

'বাড়ল আর কৈ।' মোটা খাতাটা টেবিলের কোশে ঠেসে রেখে বললেন, 'ঘনজাম বাবু আজ রাতেই তো বললেন।'

'ও হ্যাঁ, তা বটে, তিনি আজ টু-রে বখে বাচ্ছেন বটে, মনে ছিল না। উঠে ঝাঁড়িয়ে আলস্ত ভাবলাম, 'বাই একবার, নতুন লোকটির সঙ্গে আলাপ করিগে।'

'তা করবেন বৈ কি, আপনার পাশের ঘরেই।'

'ও ঘরে যে কত লোকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল,' হেসে ম্যানেজার বাবুর কাছে বিদায় নিলাম।

ছুটির দিবা, সময়ের তাই কোন জরুরী নোটিশ নেই। সিগিথ বাবুর ঘরে বাবার জন্তে উঠে ঝাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখলাম তিনিই সশরীরে হাজির।

'এই যে, আপনি এখানে।' সিগিথ বাবু হাসলেন।

জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, এই ঘরটাই আমার।'

'বিবি সাজান ঘরটি তো।' তিনি চারি দিকে প্রশংসাময় ভুট্টি বোলালেন। 'এই যে দাড়ি কামাঘার সব সবজাম রয়েছে দেখছি, ঝাঁড়টা তবে কামিয়ে নিই, কি বলেন? বড় বেড়ে উঠেছে।' প্রশংসার উত্তরের জন্ত মোটেই অপেক্ষা করলেন না। আরসিটা টেনে নিয়ে দাড়ি কামাতে বসে গেলেন।

আমার চোখে এ জিনিষটা ভাল না ঠকলেও হেসে জানালাম, 'তা কামান না...তাতে আর কি।'

ভয়লোক তখন কামাতে ব্যস্ত, তাঁর দিক থেকে কোনো জবাব এল না। তখন সাবানের কোনায় ঝেড় চলেছে, বিছানায় বসে অঙ্গভা একটা সিগারেট ধরালাম।

কামান শেষ ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'কি সিগারেট ওটা মশাই?'

জবাব দিলাম, 'ডি লাক্স।'

নিলেন। পরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মস্তব্য করলেন, 'এখানেই সিগারেটগুলো সব ছাই।'।

প্রথম দিনেই তাঁর ব্যবহার আর যা কিছু হক, আনন্দদায়ক মোটেই নয়।

পরদিন অফিসের তাড়া। নেয়ে উঠে চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময়ে আরনায় ছায়া পড়ল গিরিশ বাবুর।

'আপনি কি তেল মাখেন মশাই? ... এই যে জ্বাকুসুম দেখছি। বাক, বাঁচা গেল।' শিশি থেকে খানিকটা হাতে ঢাললেন, 'আমার টা শেষ হয়ে গেছে একেবারে।'।

চুল আঁচড়ান শেষ করে কোট গায়ে গলালাম নিঃশব্দে। তেল মাখতে মাখতে গিরিশ বাবু প্রশ্ন করলেন 'অফিসে চললেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে জানালাম, 'হ্যাঁ।'।

এর পর আমার ঘরে আসতেন তিনি যখন-তখন। আমার ঘরই শুধু নয়, ঘরের সব কিছুই নির্বিকার মনে ব্যবহার করতেন। মুখে কিছু না বললেও, তার এই আচরণে মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠতাম। তার এই নির্বিকার ভাব, নিলজ্জতার সামিল মনে হত। কিন্তু দোষ আমার স্বভাবেরই। কেন জানি না, সহজে কাউকে কটু কথা বলতে পারতাম না।

সে দিন গিরিশ বাবু বিকেলে অনেকক্ষণ আমার ঘরে কাটালেন। এক সময় বললেন, 'ললিত বাবু আপনার এই পাঞ্জাবিটা আজকের জন্মে নিয়ে চললাম। তাড়াহুড়োর পাঞ্জাবিগুলো সব বাড়ীতে কেলে এসেছি। অথচ এই বিশেষ-বিশেষে ভাল জায়গায় যেতে-টেতে হ'লে কি মুন্সিল বলুন তো—'

এ চাওয়ার সরল আবেদন নেই। গিরিশ বাবুর ওপর মন বিরক্ত হয়েই ছিল। তবু দিলাম পাঞ্জাবি। নেই বলতে পারলাম না—আছে যে তিনি দেখেছেন। 'দোব না' বলতেও মুখে কেমন যেন বাধল। আর এক দিন চাইলেন দশটা টাকা। বললেন, 'বড় মুন্সিলে পড়েছি; হাতে কিছু নেই। ব্যাঙ্ক এখন বন্ধ নইলে চেক ভাসিয়ে—'

দিলাম টাকা। টাকা নিয়ে বললেন তিনি, 'চেকটা ভাসিয়ে টাকা কালই শোধ দিয়ে দোব।'।

বলা বাহুল্য, সে টাকা ফেরৎ পাইনি। তিনি ইচ্ছে করেই যেননি, না দিতে ভুলে গেছেন, তা জানি না। জানতে চেষ্টাও করিনি। থাক, ভরি তো কটা টাকা।

এ ভাবে দু'টা মাস এগোলো। জ্বাকুসুমের শিশি সপ্তাহেই শেষ হয়েছিল, সিগারেটের প্যাকেট হাওয়ার মত উড়ে যাচ্ছে। তবু দু'মাস কাটল। এই দু'মাসেই গিরিশ বাবুর আসল পরিচয় বা পেয়েছি, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণাই শুধু জন্মেছে। এমন নির্বিকার নিলজ্জা খুব কম দেখেছি। মাঝে মাঝে তার আচরণ সত্বের সীমা ছাড়ালে, রক্ত হয়ে আঘাত দিতে বাধ্য হয়েছি। দেখেছি, তিনি হান মুখে ঘর ছেড়েছেন। কিন্তু পরের দিন থেকে আবার সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হত তিনি চাকরি-বাকরি করেন কি না। কিন্তু চাকরদের কাছে জেনেছি, হুপুরে গিরিশ বাবু বাইরে যান। তাহলে চাকরি করেন। কিন্তু মাইনে বা পান, দিন চলে না তাতে নিশ্চয়ই, তা না হলে এমন স্বভাব হবে কেন? সব সময় হাত পাটবার এঁট জালা প্রবলি কেন?

সে দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সাত গরম পেয়ালার চুমুক দিয়েছি, এমন সময় কাশ লাগল নিতাই বাবুর উত্তেজিত কণ্ঠ। 'ও-মাসে বললেন এ-মাসে দোব, এখন আবার বলছেন আর মাসে। আমি ছা-পোবা মাছুর, অত দয়া দেখাতে গেলে মারা পড়ব।' কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হচ্ছে বুঝতে দেয়ী হল না। কেন না, পরক্ষণেই গিরিশ বাবুর গলা শুনলাম, 'আর মাসে ঠিক দিয়ে দোব।'।

'এ কথা তো গেল মাসেও বলেছিলেন; এ মাসেও বলছেন দেখছি। ও-সব ধাপ্পায় ভোলাবেন কত দিন শুনি? প্রথম মাসে দিলেন না যখন, কিছুই বলিনি। ভাবলাম, বিশেষে এসেছেন যখন, খরচপত্রের টানটানি প্রথম মাসে একটু বেশী হবেই। আপনি দেখছি তুখড় লোক মশাই।'।

কাছে থাকলে গিরিশ বাবুর মুখের ভাব লক্ষ্য করতাম। নীচে নামবার কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না। ওপরের ঘরে পীড়িয়েই ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

'বেশ, দু'মাসের পাওনা আজ বিকেলেই চেক দিয়ে মিটিয়ে দোব।' গিরিশ বাবু বলে উঠলেন।

'থাক, আর চেকের দরকার নেই। ব্যাঙ্ক-ব্যাঙ্কে যে কত, তা আমার বেশ জানা আছে। চাকরি-বাকরিও যে কিছু করেন না সে খবরও পেয়েছি। মিথ্যে কথার জোরে ও ধাপ্পা দিয়ে এত দিন আপনার জীবন কেটেছে। জারিজুরি সব ধরা পড়ে গেছে—এখানে আর সুবিধে হবে না। এখন মানে-মানে বিদেয় নিন। নেহাৎ বাড়ালী বিদেশে এসেছেন, তাই বিশেষ কিছু করলাম না। অন্য কেউ হ'লে এ জোচ্ছুরি আর ধাপ্পাবাজির ফল দেখাতাম।'।

নিতাই বাবুকে কোন দিন এমন কঠোর হতে দেখিনি। এ ভাবে তিনি যে কাউকে কড়া কথা বলতে পারেন, আগে ভাবতে পারিনি।

গিরিশ বাবুর অপরাধ গুরুতর। চাকরি করেন না; গরীব তো বটেই, তার ওপর এত দিন জোচ্ছুরি আর মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে এসেছেন, দস্ত মশায়ের ওপর আমার আক্রোশও কম নয়। তবু কেন জানি না, আজকে তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে দয়া হল। এই প্রথম দয়া হল তাঁর ওপর। নিতাই বাবু ব্যবসায়ের লোক। তাঁর এই কঠিন ব্যবহার হয়তো অজ্ঞান নয়। এত দিন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে তিনি যা কিছু বলেছেন, ক্ষতির তুলনায় কিছুই নয়। তবু এ ভাবে প্রকাশ্য অপমানের ওপর তাঁর অবস্থা অসহ্যমান করে মনের কোণে কেন যে ব্যথা জমল বুঝতে পারলাম না। এ অপমান যদিও গিরিশ বাবুর নায্য পাওনা।

সিঁড়িতে পদশব্দ। কার, চিনতে দেয়ী হ'ল না। গিরিশ বাবু আমার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে চলে গেলেন, দেখলাম। নিজের ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখেছেন অবশ্যই। কিন্তু লজ্জার আমার ঘরে আসতে পারলেন না। কেন না, আজ অবধি কখনই তিনি ঘরে ঢোকবার আগে আমার ঘরটাতে একবার না বসে যাননি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আগে আমার ঘর। ওঠবার আর নামবার সময় আমার এখানে খানিকক্ষণের জন্মে বসে তাঁর অভ্যেসের মত পীড়িয়ে গিয়েছিল। রোজকার এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে বুঝলাম, গিরিশ বাবুর মনের অবস্থা আজ সত্যিই ধারাপ।

এই লজ্জা বড়ই ব্যথা দিল

আমায়! দেখি, খোলা জানলার কাছে তিনি নিশাঙ্কে পাড়িয়ে।
শব্দ পেয়ে মুখ ফেরালেন।

‘ম্যানেজার তো, ম্যানেজার বাবু আমায় কি অপমানটা করলেন? অত কেউ হলে...’ কথাটা শেষ না করেই গিরিশ বাবু চুপ হলেন। পরে শুরু করলেন, ‘আপনার কাছে সস্তরটা টাকা হবে লগিত বাবু? সেন্ তো। নিতাই বাবুর পাওনাটা চুকিয়ে দিই।’

জবাব দিলাম, ‘অত টাকা কোথায় পাব।’

‘ও।’ তিনি চুপ করলেন। দেখলাম, তাঁর মুখে কেমন এক নিঃশব্দ অসহায় হীনতার ছায়া।

প্রশ্ন করলাম, ‘এ ভাবে এত দিন ধান্না দিয়েছেন কেন?’

জবাব দিলেন না। নতমুখে হাতের নখ খুঁটতে লাগলেন।

তাঁর এমন কল্প রূপ দেখিনি কখনও।

প্রশ্ন করলাম, ‘সত্যিই কি চাকরি-বাকরি করেন না?’

‘করতাম।’

‘ছাড়লেন কেন?’

‘ছাড়িয়ে দিল।’

‘কেন?’

কেন? জবাব এল না। বললাম, কারণটা প্রকাশ করবার যোগ্য নয়। তাই বলতে লজ্জা পাচ্ছেন।

প্রশ্ন করলাম, ‘দেশে কে আছেন?’

‘মা-বাবা আছেন।’

‘বিয়ে করেছেন?’

‘হ্যাঁ।’ বিয়ের কথায় তাঁর মাঝে দেখলাম উল্লাসের ভাব।

‘দেখবেন আমার বৌয়ের ছবি? খুব সুন্দর দেখতে। ফটোতে কিন্তু ভাল ওঠেনি।’ স্টুকেশ খুলে মহা উৎসাহে বৌ-এর ফটো বার করে তিনি আমায় দেখালেন। ‘কেমন, সুন্দর না? ওর নাম হচ্ছে বীথিকা। আমি কিন্তু বীথি বলি না, আমি ডাকি রাণী বলে।’

হ্যাঁ, বৌ তাঁর সুন্দরী বটে। এ সৌন্দর্যের চেয়ে আমাকে বেশী মুগ্ধ করল গিরিশ বাবুর কথাগুলো। এ কথাগুলোর মাঝে তাঁর প্রেমিক প্রাণের অনাবিল রূপ আজ হঠাৎ ধরা পড়ল।

‘রাণী আমার খুব ভাল চিঠি লেখে। এই দেখুন না কত লিখেছে। ও জানে না, আমি ওর সব চিঠি সত্ব করে রেখে দিই।’ স্টুকেশ থেকে একতড়া চিঠি এনে ধরলেন আমার সামনে।

একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, ‘ধাক ধাক, ও আর কি দেখব।’

‘দেখুন না পড়ে, কি সুন্দর লেখে। মা বলতেন, বৌমার আমার মুক্তার মত হাতের লেখা।’

চিঠিগুলোতে চোখ না বুলিয়ে মুক্তি পেলাম না। মুক্তার মত না হক, সুন্দর অবশ্যই।

‘সে দিন আপনার কাছে যে দশটা টাকা নিয়েছিলাম, সে তো রাণীকেই পাঠালাম। দেখুন না, টাকা পাঠাতে পারি না বলে কত দুঃখ করে চিঠি লিখেছে। কি করে যে ওদের দিন চলেছে ভগবানই জানেন। গিরিশ বাবুর মুখে ফুটল মলিন হাসি, ‘চাকরিটা তো ওরই জন্তে গেল। বলেছিলাম রাণীকে, ভাল শাড়ী কিনে দোব, অফিস থেকে ফুড়িটা টাকা চুরি করলাম। ভাল শাড়ী কি ফুড়ি টাকার করে হয়।’ থামলেন তিনি। নিঃশাঙ্কে এই ব্যথাতুর কাহিনী শুনি। আমি অজিহুত।

খানিক খেমে আবার গিরিশ বাবু বললেন, ‘রাণীকে আমি খুব ভালবাসি লগিত বাবু।’ কথার সঙ্গে সরমের আঁখি তাঁর মুখ লাল ক’রে দিল, স্পষ্ট দেখলাম।

বিকলে অফিস ফেরতা নিতাই বাবুর সঙ্গে দেখা হ’ল। হেসে বললেন, ‘তিনি পাগিয়েছেন।’

‘কে, গিরিশ বাবু?’

‘তা ছাড়া আর কে।’ দুপুরের দিকে কখন চুপিচুপি প্যাটার নিয়ে সটকেছে। বুকেছে গতিক ভাল নয়।

গিরিশ বাবুর এই চোরের মত পলায়ন। নিতাই বাবুর কাছে এটা আনন্দেরই খবর বটে। এ ঘটনা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা তিনি অবশ্যই করতে পারেন। আমি কিন্তু এই উল্লাসে যোগ দিতে পারলাম না। গিরিশ বাবুর এই পালানোর ব্যথা বুকে কাঁটার মত বিঁধল।

সন্ধ্যার দিকে কথায় কথায় নিতাই বাবু বললেন, ‘কি ঠড়িঝাজ লোক মশাই বলুন তো। শ্রেক মুখেই জ্বোরে যে বেঁচে রয়েছেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।’

সায় দিলাম, ‘তা আর বলতে।’

‘আপনাকেও অনেক ভুগিয়েছে বোধ হয়? পাশের ঘরেই থাকতো যখন। জিনিষ-পত্রের ভাল করে দেখে এসেছেন তো? খোয়া যায়নি ত কিছু?’

গিরিশ বাবুর আচরণ মাঝে মাঝে সম্ভের সীমা ছাড়ালেও, কোন দিন নিতাই বাবুর কাছে অভিযোগ করিনি। আমার ঘরে ঢুকে সব জিনিষপত্রের নিকরকার ভাবে ব্যবহার করতেন। এ সব্বন্ধেও কিছু তাঁকে জানাইনি। স্তরমায় পলাতক গিরিশ বাবু আর আমার মধ্যে যা ঘটেছে, সে সব ম্যানেজারের অজ্ঞাত ছিল।

আমার জবাবে নিতাই বাবু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, ‘যাক। বেঁচেছেন খুব।’

এক সময় দত্ত মশায়ের সঙ্গে আমার আজকের কথাবার্তার প্রসঙ্গ তুললাম। সব শুনে নিতাই বাবু হাসলেন।

‘আপনিও যেমন। ও-সব বিশ্বাস করেন না কি! বৌ আছে না ঘোড়ার ডিম। আপনার মন ভেজাবার জন্তে মিথ্যে ধান্না দিল।’ বললাম, ‘কিন্তু ফটো দেখাল যে। হাতের লেখাও দেখাল।’

‘ওর মত মানুষের পক্ষে এ তো অসম্ভব নয়।’ ম্যানেজার জ্বোরে ঘাড় নাড়লেন।

তাঁর মত আমি কিন্তু গিরিশ বাবুর আজকের কথাগুলো শুধু ধান্না বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

তার পর ক’টা দিন চলে গেছে। হোটেলের জীবন বোজকার বাঁধা-ধরা পথে এগোচ্ছে। গিরিশ বাবু সব্বন্ধে নানা বৈচিত্র্যময় আলোচনা হতো হোটেলের অধিবাসীদের মধ্যে। তাঁর ভুত-ভবিষ্যৎ আর বর্তমান নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা গড়ে উঠত। এ-সবও একটু যেন মিলিয়ে এসেছে অবশেষে।

সন্ধ্যার দিকে বেড়াছিলাম। মিউনিসিপাল পার্কের কাছাকাছি পিচের রাজ্যের এসেছি, হঠাৎ কাশে এল পরিচিত ডাক। ক্রিমে দেখি গিরিশ বাবু। শরীর এক দিনে শীর্ণ রক্তভার নেমেছে। গাল ভ’রে একরাশ দাড়ি। চোখ হাটুতে ম্লান জ্যোতি।

‘এই যে গিরিশ বাবু’, হেসে বললাম, ‘আছেন কেমন? এখন উঠেছেন কোথায়?’

‘একটা মায়াই হোটেল’ গিরিশ বাবু লড়ি চুলকোসেন।
 ‘আপনি এমই মধ্যে বেশ রোগী হয়ে গেছেন।’
 ‘তা হয়েছি।’ রান হাসলেন তিনি। পরে বললেন, ‘কিছু
 ঝগড়াবেন লজিত বাবু? বড্ড স্নিগ্ধ পেয়েছে।’
 তাঁর এই করুণ অমুরোধ বড় আঘাত দিল। আজ এ চাওন্সাতে
 নেই নিলজ্জতা। সেখানে নিষ্ঠুর পরাজয়ের যেননা।
 বললাম, ‘বেশ ভো, কাছাকাছি কোন হোটেল চলুন।’
 হোটেল বসে তিনি যে ভাবে গোদ্রাসে থাবার গিলতে লাগলেন,
 বুঝলাম দীর্ঘ দিনের অভুক্ত। খাওয়া শেষ করে বললেন, ‘অন্ততঃ
 কুড়িটা টাকা যদি নেন লজিত বাবু...’
 ‘কেন, কি করবেন?’
 ‘রাণীর আমার খুব অসুস্থ। চিঠি পেয়েছি কাল। যেতে
 পারতাম কালই—বিনা টিকিটে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু সেখানে
 গিয়ে কি করব? হাতে আমার কিছু নেই। কুড়ি না হক,
 পনেরটা টাকা আপনি আমায় দিন। আমার রাণী বাঁচবে না
 লজিত বাবু, আর বৃষ্টি বাঁচবে না।’
 দু’হাতে মুখ ঢাকলেন। জোড়ের ধান্নাবাজ মানুষটার আজ
 এ কি করুণ আবেগন। বেদনার গভীরতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এর
 পরও কি নিতাই বাবু এই কথাগুলোকে এক জোড়োরের মধ্যে ধান্না
 ল উড়িয়ে দিতে পারবেন?
 মণিবাগে ঠিক কত ছিল জানি না। তবে গোটা পঁচিশ টাকা
 বে নিশ্চয়ই। নিঃশেষে সব উজাড় করে দিলাম।
 গিরিশ বাবুর সঙ্গে আজকের এই সাক্ষাতের কথাটা বললাম না

নিতাই বাবুকে। ইচ্ছেও হ’ল না। জানি, তিনি শুনে হাসবেন।
 আমার এই নিবৃত্তিতার জন্তে আক্ষেপ করবেন। সারা হোটেল
 তার পর স্তব্ধ হবে আমাকে নিয়েই আলোচনা।

দু’সপ্তাহ বাদে, এক দিন শরীর ভাল ছিল না বলে আফিসে যেতে
 পারিনি। হোটেলের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ
 যেন দরজার কার ছায়া পড়ল। বই থেকে মুখ তুলে চমকে উঠলাম,
 —গিরিশ বাবু। শরীরের সব কিছু নিঃশেষে নিশ্চেষ্ট করে কে
 যেন শুধু বেদনাময় রিক্ততা ভরে দিয়েছে।

‘আপনি এখানে।’ বিশ্বয়ের কণ্ঠে বললাম।

‘হ্যা, দেশ থেকে আজই এসেছি। এই নিন আপনার টাকা।
 খরচ হয়নি মোটেই। মাত্র দু’চার টাকা হবে।’ নোট চারখানা,
 আমার হাতে তিনি এগিয়ে দিলেন।

‘রাণী ভাল আছে তো?’

‘পৌছলাম যে দিন, সে দিনই রাতে মারা গেল।’

খবর শুনে আমি স্তব্ধ। তিনি কিন্তু নির্বিকার। তাঁর মধ্যে
 কোন ভাবান্তর নেই।

‘কি অসুখ হয়েছিল?’

‘টাইফয়েড।’ বলার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ তিনি শিশুর মত হাউ
 হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ‘এ কি করুণ অসহায় কান্না।’

সারা জীবন ধরে গিরিশ বাবু বত মিথ্যা কথাই বলে থাকুন,
 একটা সত্যি কথা বলেছিলেন। সেখানে খুশা নেননি। রাণীকে
 সত্যিই তিনি ভালবাসতেন। নইলে সাহায্য জীবন যার ধান্না আর
 জোড়ুরি করেই কেটেছে, সে কেন টাকাগুলো ফেরত দিতে এল?

কবিতা-রান্না

শিবরাম চক্রবর্তী

বাক্সিশেষের পাণ্ডুর চাঁদ দেখেচ কখনো তুমি?
 রাত্রি বখন আস্তে আস্তে যায়?
 দেখেচ কি তুমি থেকে কত বুনে সরকারী বাংলায়
 পূর্বতমূলে অরণ্যকূলে কোনো?
 শুনেচ কি ঘনো ঘনো
 আকাশের চাঁদ তাকারে হঠাৎ হায়নার হায় হায়?
 দেখেচ কি তুমি? আমি তো দেখিনি উক্ত চন্দ্রটিকে।
 দেখব কি করে? তখন আমি কোথায়?
 নিজ শয্যায় হরত তখন নিদ্রায় অচেতন।
 স্বপ্নেও দেখা দেখনি সে চাঁদ (মেমরি আমার কিকে)
 যদি দেখে থাকি দেখেচি কল্পনায়।
 হায়না সে চাঁদ দেখিরাছে কি না জানে শুধু হায়নাই—
 এবং ভাঙ্কাড়া চাঁদের প্রতি যে ভালোবাসা তার কেমন
 সেই জানে; কতু তুলেও সে কথা আমারে জানায় নাই।

আর হায়নার কথা বলা যদি ভাই, কেমন হায়না ডাকে
 শুনিনি কখনো সত্যি বলতে গেলে।
 দূর অব্যয় দূরে থাক—কতু পা দেব যে তার দিকে
 অতীত স্বপ্নপরাহত মোর; বলতে লজ্জা পাই,
 —এই কথাটাই না দেখা লাগায় আমাকে।

তবে কি না, যদি কবিতা লিখতে হয় কোনো কবিকেই,
 আমাকে কিবা তোমাকে—কবিতা এসে—
 মানবে এ কথা, (ইতিমধ্যেই না ফেলে থাকলে লিখেই),
 হায়নার সাথে হায় হায় বেশ মেলে?
 কবিতার সাথে কোনোই তফাত নেই ভালো রান্নার—
 তরিতরকারি-মশলা-আনায়ে বাঁধনি যে রাঁধুনির—
 বাবুচি—বাহাছরি

‘নোলা-সকলকর।’

শব্দে গন্ধে মিলায়ে মিশিয়ে বিস্তার ভূর,ভূরি—
 মকা সে রসনার
 রন্ধন স্তব্ধবির।

মশলা আনায়ে, হুন্ কালু আর ফোড়ন সঘরায়
 কিছু কমবেশি হবার যো নেই,
 হলে পরে কান্নার,
 সে কবিতা লঙ্ঘর।

তবে কি না কথা এই,
 ডাক রোস্টে খেয়ে মনে লাগে যদি মানসের সর্বোবর
 হিম-অরণ্যপার :
 সগোত্র তাহা লৌকিক, সনেট আর মহাকাব্য—
 সে রান্না কবিতার।

মূল :—দ্বিবাগণের গৃহসমূহ ও উপবনসমূহে মানসী সৃষ্টি। সকল (মাছুষ ভাব যথাযোগ্য ভাবাচ্ছাসারে নির্কর্ষিত)। নরগণের প্রথমবশতঃ কর্তব্য লক্ষণাভিহিত ক্রিয়াসমূহ—(প্রবণ করণ)। ৫॥

সংক্ষেপ :—অভিনবগুণ্ড বলিয়াছেন—পূর্বস্মোক হইতে ‘প্রবণতা’ (আপনারা শুভুন) পদটির অম্বুভূতি এই শ্লোকে করিতে হইবে। কিন্তু নিতে হইবে?—নরগণের কর্তব্য ক্রিয়ার বিষয় প্রবণ করণ। শ্লোকমধ্যস্থ ‘চ’ (ও) পদটি হইতে বুঝিতে হইবে যে, এক্ষণে অম্বুক্ত লক্ষণ ও পূজনের বিষয়ও বুঝিতে হইবে। এই ক্রিয়া—কেবল নরগণেরই কর্তব্য—ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কেবল নরগণের ক্রিয়া কেন? ইহার উত্তর—কেবল নরগণের পক্ষেই ইতিকর্তব্যতার (ক্রিয়ার) বিষয় বিহিত হইয়াছে, যেহেতু, দেবগণের ত কোনরূপ ইতিকর্তব্যতা নাই। দেবগণ অম্ব কোনরূপ বাহ্য-সাধন-ব্যতিরেকে কেবল মনঃসঙ্কল্প-দ্বারাই মানসী সৃষ্টি করিতে পারেন।

এরূপ ক্ষেত্রে ইতিকর্তব্যতার স্থান থাকিতেই পারে না। ঐ স্থানে নানা সাধন-উপাদানাদির সাহায্যে একটা বিশিষ্ট পদ্ধতির ক্রম অবলম্বনে কোন বস্তু উপাদান করা যায়, সেই স্থলেই ইতিকর্তব্যতার অপেক্ষা থাকে। দেবগণের মানসী সৃষ্টি—এই সকল মানস-সৃষ্ট বস্তুগুলি সৃষ্টি-ক্রিয়ার কর্তৃক হইলেও বস্তুতঃ ঘটপটাদির দ্বারা বিবরণরূপে গণ্য হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে স্বপ্ন-সৃষ্টির উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বপ্নে যে হস্তী, অশ্ব, গৃহ, বৃক্ষ, মনুষ্য প্রভৃতি পদার্থ দেখা যায়, সেগুলি ব্যক্তিগত ভাবে স্বপ্নস্রষ্টারই মানসী সৃষ্টি—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তথাপি সেই সকল স্বপ্নের মানস পদার্থ জাগ্রদ্রাজ্যের হস্তি-গৃহ-বৃক্ষাদির দ্বারা বাস্তব বিষয় নহে। ঐ গুলি নিশ্চিতই মানসী সৃষ্টি-ক্রিয়ার কর্তৃক—তথাপি উচ্চাঙ্গিকাকে বিষয় বলা চলে না। এই কারণে স্বপ্নের জ্ঞান নির্বিষয় জ্ঞান। স্বাপ্ন সৃষ্টিতে সাধনাদির ক্রম প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতার জ্ঞানও থাকে না। ব্যাবহারিক জগতে যেমন গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইষ্টকের উপর ইষ্টক সাজান প্রভৃতি নানাপ্রকার ইতিকর্তব্যতা-জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন আছে, মানসী স্বাপ্নসৃষ্টিতে সেরূপ জ্ঞানের কোনই প্রয়োজন নাই। বিনা ইষ্টকাদি উপাদানে—বিনা গাঁথিবার ক্রমে—কোনরূপ ইতিকর্তব্যতা বিনা—স্বপ্নের বাড়ীখানি ক্ষণিকের মধ্যে গড়িয়া উঠে। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, মানসী সৃষ্টিতে ইতিকর্তব্যতার প্রয়োজন নাই। সেবালোকে যে, উপবন—তাহাও মানস-সৃষ্টি। সাধারণতঃ, নরলোকে উত্তান সৃষ্টি করিতে হইলে কত-দূর ইতিকর্তব্যতা-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা সকলেই জানেন।

প্রথমে উত্তানের মাটি তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহার পর তাহাতে গাছের বীজ-বপন, অথবা চারা, অথবা ডাল প্রভৃতি রোপণ করিতে হইবে। যে বৃক্ষ-গুপ্ত-লতা জন্মাবে, তাহাদেরও বীজ-অঙ্কুরোদগম—বৃদ্ধি—ফল—ফল—এইরূপ নিয়ত-ক্রমাচ্ছাসারে পরিপূর্ণতা আসিবে। উত্তানস্থ চক-লতা—ফুলভাগ—সরোবর—ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি বহু বিচিত্র অংশ-গুলিও এক দিনে গড়িয়া উঠে না—নিয়ত-ক্রমাচ্ছাসারে তাহাদিগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গৃহাদির কথা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু গাণ এ স্থলে ক্রমের অপেক্ষা রাখেন না। ক্ষণমধ্যেই তাহার ন-কল-শোভিত, বহু-বিচিত্র-তরুলতা-গুপ্ত-সরোবর-ক্রীড়াক্ষেত্রসম্বিত নের সৃষ্টি তাহার করিতে সমর্থ—বাহা নরগণের পক্ষে দীর্ঘ-সময়-পক্ষ ও নিয়ত-ক্রম-সাধ্য বলিয়া মনে হয়। গৃহের ত কথাই নাই।

মহর্ষি এই কথাই অতি অস্বাভাবিক বলিয়াছেন—গৃহ বা উপবন—সবই দেবগণের মানসী সৃষ্টি—সাধন-ক্রম-সময়-নিরপেক্ষ; উচ্চাঙ্গে ইতিকর্তব্যতা-জ্ঞানেরও প্রয়োজন নাই।

ইহার পরবর্তী অংশ—বাহা মূল ত্র্যাক্ট-মধ্যে মুদ্রাণিত হইয়াছে ও বাহার একটা অম্বুভাবের আভাসমাত্র আমরাও ত্র্যাক্ট-মধ্যে দিয়াছি—দুর্যোধ্য; অন্ততঃ বরোদা-সংস্করণের মূলে যেদ্রুপ পাঠ ছাপা হইয়াছে—তাহা হইতে কোনরূপ অর্থগ্রহ হয় না। পাঠটি এইরূপ—“যথা ভাবাভিনির্কর্তব্য সর্বে ভাবান্ত মাছুষাঃ।” আমরা যে অম্বুভাব উপরে দিয়াছি, উহা মূলের আক্ষরিক অম্বুভাব মাত্র—অন্ত-এব উহা হইতেও কোনরূপ স্পষ্ট অর্থবোধ না হইয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে এ স্থলে সম্ভবতঃ কিরূপ পাঠ হইলে অর্থ প্রকরণ-সঙ্গত ও বোধগম্য হয়, তাহার একটা আলোচনা আবশ্যক।

‘ভাব’—শব্দের অর্থ—(১) হৃদয়গত ভাবনা—মনের ভাব; (২) ভাবপদার্থ—অভাবের বিপরীত—বাহার বস্তু-সত্তা আছে।

সর্বে ভাবান্ত মাছুষাঃ—মাছুষ সকল ভাব অর্থাৎ মনুষ্যলোকে ব্যবহার্য সকল ভাব-পদার্থ Positive entity উক্ত পদার্থগুলি কিরূপ? তাহার উত্তর—

যথা ভাবাভিনির্কর্তব্যঃ—যথাযোগ্য ভাবাচ্ছাসারে নির্কর্ষিত (অর্থাৎ নিস্পাদিত)। যেদ্রুপ মনোভাব তদম্বুভাবে সৃষ্ট।

মোট অর্থ পাড়াইল—মাছুষলোকের পদার্থগুলি মনোভাবাচ্ছাসারে সৃষ্ট। অর্থাৎ মাছুষ যেদ্রুপ ভাবনা করে, তাহার ব্যবহার্য পদার্থগুলি তদম্বুভাবে সৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু দেবসৃষ্টির সহিত মাছুষসৃষ্টির পার্থক্য কোথায়—ইহা তলাইয়া বুঝিতে হইলে আর পূর্বোক্ত অর্থের সঙ্গতি থাকে না। মূলে আছে—“সর্বে ভাবান্ত মাছুষাঃ।” ‘তু’ পদটির অর্থ—পক্ষান্তরে; অর্থাৎ পূর্বে দেবগণের মানসী সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। সেই সৃষ্টির সহিত মাছুষ-সৃষ্টির পার্থক্য কোথায়—তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে পরে বলা হইতেছে যে—পক্ষান্তরে মাছুষ-ব্যবহার্য পদার্থগুলি অন্তরূপ (দেবগণের দ্বারা মানসী সৃষ্টি নহে)। কিন্তু—যথাভাবাভিনির্কর্তব্যঃ এই পাঠ ধরিলে অর্থ হয়—ভাবাচ্ছাসারে। পক্ষান্তরে, মাছুষসৃষ্টিও মনোভাবাচ্ছাসারী—এ অর্থ করিলে ত আর দেবগণকৃত সৃষ্টির সহিত মাছুষ-কৃত সৃষ্টির কোন ভেদই রহিল না। কারণ, দেবসৃষ্টি মানসী; আবার মাছুষসৃষ্টিও বলা হইল ভাবাচ্ছাসারী—অর্থাৎ এক কথাই উহাও মানসীই। তবে আর প্রভেদ রহিল কোথায়?

এই কারণে আমাদের মনে হয়—উক্ত পাঠ অসঙ্গত। কাসী-সংস্করণে ঐ অংশটিই দৃষ্ট হয় না। বরোদা-সংস্করণে একটি পাঠান্তর পাঠ্যকায় দৃষ্ট হয়—“ব্রত ভাবা বিনিশ্চয়াঃ সর্বে ভাবান্ত মাছুষাঃ।” ‘বিনিশ্চয়’ শব্দটিকে একটু বিশেষিত করিলে—একটা চেনসই অর্থ পাড়াইতে পারে। বিনিশ্চয়—বিশেষ ভাবে বিনিশ্চয়—অর্থাৎ মানসী সৃষ্টি মাত্র নহে—কিন্তু বিশিষ্টরূপে বিব্রাকারে সৃষ্ট। এরূপ অর্থ করিলে ভেদটি পরিষ্কৃত হয়—দেবসৃষ্টি মানসী—নির্বিষয়া, পক্ষান্তরে মাছুষসৃষ্টি সবিষয়া। স্বপ্নসৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টিতে যতটা ভেদ, দেবসৃষ্টি ও মানবসৃষ্টিতেও ঠিক ততটাই ভেদ পাওয়া গেল।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভাল পাঠ পাওয়া যায়—বিতীয়ারায়েরই ২৭ শ্লোকে—“দেবানাং মানসী সৃষ্টিগৃহে’পবনেষু চ। বহুভাবা-বিনিশ্চয়াঃ সর্বে ভাবা হি মাছুষাঃ।” (২২৭)—পাঠান্তর—বহু

ভাবাভিনিশ্চয়া—এ পাঠের অর্থসঙ্গতি হয় না। কিন্তু “সর্বের ভাবান্ত্র মাছুয়াঃ”—এ স্থলে ‘হি’ পাঠের পরিবর্তে ‘তু’ পাঠটি অধিকতর সঙ্গত ; যেহেতু ‘তু’-শব্দের অর্থ—পক্ষান্তর। দেবসৃষ্টি ও মনুষ্যসৃষ্টির পার্থক্য দেখাইতে হইলে ‘তু’-শব্দের ব্যবহারই সঙ্গত। কাশী-সংস্করণেও “বহুভাবাভিনিশ্চয়াঃ সর্বের ভাবান্ত্র মাছুয়াঃ”—এই পাঠ ২২ শ্লোকে পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকটি বর্তমান শ্লোকেই পুনরুক্তি কি না, সে বিচার অভিনব করিয়াছেন,—জামরাও যথাস্থানে উহা করিব। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য এই যে—“বহুভাবাভিনিশ্চয়াঃ সর্বের ভাবান্ত্র মাছুয়াঃ”—এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থসঙ্গতি অতি সন্দেহ হয়।

বহুভাবাভিনিশ্চয়াঃ—বহু-সহকারে নিশ্চিত।

সর্বের ভাবান্ত্র মাছুয়াঃ—মাছুয়ালোকের সকল পদার্থ।

মাছুয়ালোকের সকল পদার্থ প্রযুক্ত-সাধ্য—মানসী সৃষ্টি নহে ; কারণ, মানসী সৃষ্টিতে কোন প্রযুক্তের অপেক্ষা নাই। প্রযুক্ত বা যন্ত্র—পারীক্ষিক ব্যাপার—দেহ-চেষ্টা।

তাহা হইলে মোট পার্থক্য কাঁড়াইল এই যে—দেবগণের মানসী সৃষ্টি নির্বিঘ্ন, অপ্রযুক্তসাধ্য ; পক্ষান্তরে, মাছুয়গণের সৃষ্টি সবিসয়া—মতএব প্রযুক্ত-সাধ্য।

নরাণাং যত্নতঃ কার্য্যা লক্ষণাভিত্তিঃ—ক্রিয়াঃ—লক্ষণোক্ত ক্রিয়া—মহ নরগণের পক্ষে যত্নানুসারে কর্তব্য। এখানে ‘ক্রিয়া’-পদের অর্থ—ইতিকর্তব্যতা ; আর লক্ষণ—সন্নিবেশ-পরিমাণাদি—ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। যদি এটি অংশটুকু মূলে থাকে, তাহা হইলে আর পূর্বোক্ত অংশের (বহুভাবাভিনিশ্চয়ঃ সর্বের ভাবান্ত্র মাছুয়াঃ) কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না ; কারণ, উভয় অংশেরই তাৎপর্য একরূপ। এই কারণেই সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত অংশ ত্র্যাকটমধ্যে ছাপা হইয়াছে—অন্তর্থাৎ পুনরুক্তি অবশ্যসম্ভাবী।

মূল :—সেই হেতু শ্রবণ করুন—যে প্রকারে, যে দেশে ও যে কালে নাট্যমণ্ডপ কর্তব্য ; আর তাহার বাস্তব ও পূজা যে প্রকারে প্রযত্নানুসারে প্রযোজ্য। ৬।

সঙ্কেত :—সেই হেতু—যেহেতু নরগণের পক্ষে প্রযত্ন-সহকারে ক্রিয়া কর্তব্য। মূলে আছে ‘যত্র’—যে দেশে ও যে কালে। বাস্তব—গৃহ ও ভূমির পরিমাণ এ ক্ষেত্রে ‘বাস্ত’-পদের অর্থ (অঃ ভাঃ পৃঃ ৫০)।

মূল :—এই (নাট্যমণ্ডপে) প্রেক্ষাগৃহ দর্শন করিয়া ধীমান্ বিশ্বকর্ম-কর্তৃক ত্রিবিধ সন্নিবেশ শাস্ত্রানুসারে পরিকল্পিত হইয়াছিল। ৭।

সঙ্কেত :—ইহ প্রেক্ষাগৃহঃ দৃষ্ট। (বরোদা) ; ইহ প্রেক্ষাগৃহাংগা তু (কাশী)—এই পাঠটিতে অর্থসঙ্গতি স্পষ্ট—এই নাট্যমণ্ডপে ধীমান্ বিশ্বকর্ম-কর্তৃক প্রেক্ষাগৃহ সমূহের ত্রিবিধ সন্নিবেশ শাস্ত্রানুসারে পরিকল্পিত হইয়াছিল।

ইহ—নাট্যমণ্ডপ ; বিষয়াধিকরণে সপ্তমী—নাট্যমণ্ডপ-সংক্রান্ত বিষয়ে। সন্নিবেশ—আকার, form ; পদের শ্লোকে ত্রিবিধ সন্নিবেশের নাম বলা হইবে—(১) বিকৃষ্ট, (২) চতুরশ্র ও (৩) ত্র্যশ্র। সন্নিবেশশব্দ—এই ‘চ’-কার-দ্বারা প্রমাণ ও (পরিমাণ—মাণ) পাওয়া যাইতেছে ; উহাও পদের শ্লোকে বলা হইবে—(১) জ্যেষ্ঠ (২) মধ্যম ও (৩) অবর।

সিদ্ধান্ত—সিদ্ধ প্রকারে নাট্যমণ্ডপের সন্নিবেশ ও তিন প্রকার

প্রমাণ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা কি স্ববুদ্ধি-প্রসূত ? না, শাস্ত্রতঃ—শাস্ত্রানুসারে প্রেক্ষাগৃহ-সম্বন্ধে বিচারপূর্বক উহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। বিশ্বকর্মা যে শাস্ত্রবিচারে পটু ছিলেন—তাহা তাঁহার একটি বিশেষণ হইতেই বুঝা যায়—ধীমান্।

শাস্ত্রতঃ—শাস্ত্রানুসারে, অর্থাৎ বিশ্বকর্মা যখন শাস্ত্রার্থ-বিচার-পূর্বক সন্নিবেশাদির বিধান করিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে যে—উক্ত শাস্ত্র ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রেরও মূলভূত। সে শাস্ত্রও আবার ছিল অপর শাস্ত্রমূলক। অতএব, নাট্যশাস্ত্র প্রবাহরূপে অনাগি (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫০)।

মূল :—বিকৃষ্ট ও চতুরশ্র ও ত্র্যশ্র—(এই তিন প্রকারই) মণ্ডপ। তাহারিগের তিনটি প্রমাণ—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম আর কনিষ্ঠ। ৮।

সঙ্কেত :—সন্নিবেশ ত্রিবিধ—সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে। ত্রিবিধ কি কি—তাগ এই শ্লোকে বলা হইতেছে। বিকৃষ্ট—বিভাগানুসারে কৃষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ—চারিদিক সমান নহে (“বিভাগেন কৃষ্টো দীর্ঘো ন তু চতুর্ভু দিকু সাম্যেন”—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫০)। বিকৃষ্টের দৈর্ঘ্য বিস্তার অপেক্ষা অধিক—ইহাকে rectangular বলা চলে, square নহে। চতুরশ্র (কাশী—চতুরশ্র)—সমচতুরাঙ্ক ও সমচতুরাঙ্ক—square. ত্র্যশ্র (ত্র্যশ্র—কাশী)—তিনটি অঙ্গী যাহার, ‘তাহা ত্র্যঙ্গী ; ত্র্যঙ্গী ইহাতে আছে এই অর্থে ত্র্যঙ্গী—অন্তর্গত’ অচ্।

অভিনব বলিয়াছেন—কাহারও কাহারও মতে—এই বিকৃষ্ট, চতুরশ্র ও ত্র্যশ্রই যথাক্রমে—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ? মতান্তরে—বিকৃষ্ট-চতুরশ্র-ত্র্যশ্রের প্রত্যেকটির ত্রিবিধ পরিমাণ জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠ ; তাহা হইলে মোট নয় প্রকার ভেদ কাঁড়াইল। অভিনবের মতে ইহাই যুক্তিযুক্ত। প্রমাণ বা পরিমাণ ত্রিবিধ-সন্নিবেশাশ্রিত নহে—পরন্তু হস্ত-দণ্ডাশ্রিত ও জ্যেষ্ঠাদিভেদে ত্রিবিধ—ইহাই অভিনবের মত। তাহা হইলে নববিধ প্রেক্ষাগৃহের ভেদ নিম্নোক্তরূপে করা যাইতে পারে—

- (১) বিকৃষ্ট — জ্যেষ্ঠ
- (২) বিকৃষ্ট — মধ্যম
- (৩) বিকৃষ্ট — অবর
- (৪) চতুরশ্র — জ্যেষ্ঠ
- (৫) চতুরশ্র — মধ্যম
- (৬) চতুরশ্র — অবর
- (৭) ত্র্যশ্র — জ্যেষ্ঠ
- (৮) ত্র্যশ্র — মধ্যম
- (৯) ত্র্যশ্র — অবর

এই নয় প্রকার প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি আবার হস্ত-দণ্ড-গত পরিমাণভেদে ত্রিবিধ—অতএব মোট ভেদ অষ্টাদশ প্রকার—ইহা নবম শ্লোকে বলা যাইতেছে।

মূলে—ইহাদিগের হস্ত-দণ্ড-সমাপ্তিত প্রমাণ নির্দিষ্ট আছে—এক শত আট, চতুঃষষ্টি হস্ত অথবা বক্রিশ্র। ৯।

সঙ্কেত :—“শতং চার্ষ্টো চতুঃষষ্টিং হস্তা দ্বাত্রিংশদেব বা” (বরোদা)। অভিনব বলিয়াছেন—“শতং চার্ষ্টো চতুঃষষ্টিং ত্রিংশদেব নিশ্চয়াৎ”—এইরূপ পাঠও পাওয়া যায় ; কাশী-সংস্করণের পাঠ—নিশ্চিতম্ ; নিশ্চয়ঃ—এইরূপ পাঠও আছে। যাহা হউক, মোটামুটি অর্থ এই যে—উক্ত নয় প্রকার প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটির পরিমাণ—

হস্ত-পরিমাণ—১০৮ হস্ত অথবা ১০৮ দণ্ড ;
মধ্যম-পরিমাণ—৬৪ হস্ত অথবা ৬৪ দণ্ড ; অবর-পরিমাণ—
০২ হস্ত অথবা ৩২ দণ্ড ।

অভিনব বলিয়াছেন—এই সকল ভেদের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই
শাস্ত্র-বাক্যের পুনরুক্তি তিনি করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল ভেদের
প্রত্যেকটিই প্রতিক্রমে উপযোগী নহে । শাস্ত্রে অবশ্য উক্ত অষ্টাংশ-
প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে—তাহাদের সব কয়টি যদিও সর্বত্র
অনুপযোগী, তথাপি সম্ভাব্যের অবিচ্ছেদ্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে—

কোন কালে বা কোন স্থলে হয় ত কোনটির উপযোগ হইতে পারে—
এইরূপ সম্ভাবনার (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫১-৫২) ।

মূলঃ—অষ্টাংশিক শত জ্যেষ্ঠ, চতুঃষষ্টি মধ্যম, আর পঞ্চাশ্বে
কনিষ্ঠ গ্রহ স্বাভিংশং হস্ত বলিয়া অভিযুক্ত । ১০ ।

সংক্ষেপঃ—জ্যেষ্ঠ প্রমাণের মাপ—১০৮ হাত ।—মধ্যম প্রমাণ—
৬৪ হাত । কনিষ্ঠ (অবর) প্রমাণ—৩২ হাত । চতুঃষষ্টি বা
ত্রাশ্রে—চারদিক্ ও তিন দিক্ই সমান । বিকুণ্ঠে ইহাই দৈর্ঘ্যের মাপ
—বিস্তার দৈর্ঘ্যের অর্ধ—ইহা পরে পাওয়া যাইবে ।

(ক্রমশঃ ।

বোম্বাই পরিকল্পনার পরিবর্তিত দ্বিতীয় বিবৃতি

শ্রীযতীশ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়

এক বৎসর পূর্বে যে বোম্বাই পরিকল্পনা ভারতের এক প্রান্ত
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুদয়
সম্পর্কে গভীর অর্থনৈতিক আলোচনা ও আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল,
তাহাতে প্রতিজ্ঞিত দ্বিতীয় বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ।
সংক্ষিপ্ত পূর্বোক্ত-স্বরূপ প্রথম-প্রকাশিত বিবৃতির পরিণত
পরিবর্তনরূপে এই বিবৃতি অতি মূল্যবান অর্থনৈতিক আলোচনা ।
এই পরিকল্পনার অষ্ট শিল্পপতি-রচয়িতাদের অভিমত এই যে,
সমগ্র ভারতের অর্থনীতিকে একটি সুসঙ্গত পরিকল্পনা-মুখ্যায়ী
পরিচালনা করিবার, জন-সাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত
করিবার, সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত আয়ের বিবম বৈষম্য
নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ধনতাত্ত্বিকতা ও সমাজতাত্ত্বিকতা এই
উভয়ের পার্থক্যকে সাধারণতঃ অত্যধিক অতিরঞ্জিত করা হয় ।

বোম্বাই পরিকল্পনার প্রথম বিবৃতি যখন প্রকাশিত হয়, তখন
অনেকেই ইহাকে ধনতাত্ত্বিক নীতিমূলক মনে করিয়াছিলেন ।
রচয়িতাগণ সকলেই বিশিষ্ট ধনী শিল্পপতি । এই নিমিত্ত বহু
লোকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ধনীকে অধিকতর ধনী এবং
দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র করিবার যে চিরন্তন ধনতাত্ত্বিক নীতি,
ইহাতে তাহাই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কৃষি
অপেক্ষা শিল্পের প্রসার ও উন্নতিকল্পে অধিকতর মনোযোগ প্রদান
করা হইয়াছে । এ ধারণা অজান্ত নহে । শিল্পপতিগণ তাহাদের
প্রথম বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি-
কল্পে একটি পরিকল্পনাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়া সর্বসাধারণের
আলোচনার বিষয়ীভূত করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ।
তাহাদের প্রচেষ্টার পূর্বে যুদ্ধোত্তর সংগঠন-সমুদয় পরিকল্পনার
প্রচুর জ্ঞানা-কল্পনা চলিতেছিল, কিন্তু কেহই সাহস পূর্বক একটি
সুচিন্তিত ও সুসঙ্গত পরিকল্পনা রচনা করিয়া তাহাকে বাস্তব
করিয়া তুলিতে পারেন নাই । সুতরাং শিল্পপতিদের এই প্রথম
রচনা তাহাদের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক । স্বভাবতঃই ঐ
পরিকল্পনায় তাহারা ইহাকে কার্যকরী করিবার নিমিত্ত কণ্ঠপ্রাণী
এবং বিধি-বিধানের নির্দেশ দিতে পারেন নাই । জনসাধারণের
জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে অর্থ-
সম্পদের যথাযোগ্য বণ্টন বিভাগ দ্বারা ব্যক্তিগত আয়ের সমতা
অথবা উন্নতি সাধন, কিংবা ব্যক্তি অথবা সমগ্রগত অর্থনৈতিক

প্রচেষ্টার সহিত রাষ্ট্রের কিরূপ সম্প্রসঙ্গ সম্পন্ন সমীচীন, সে সম্বন্ধে
তাহারা কোন নিয়ম-নীতির ইঙ্গিত করিতে বিরত ছিলেন ।
তাহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এ সকল বিষয়ে তাহাদের
সুচিন্তিত নির্দেশ তাহারা যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাদের দ্বিতীয় বিবৃতিতে
লিপিবদ্ধ করিবেন । এই বিবৃতিতে তাহারা ধনসম্পদের বিধি-
সঙ্গত বণ্টন-বিভাগ এবং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার রাষ্ট্রের শাসন
সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে গঠন করিতে
হইবে এবং তাহার বিশিষ্ট নিয়ম-নীতি কিরূপ, সে সম্বন্ধে কোন
আলোচনা করেন নাই । এই স্কেটে তাহাদের প্রথম বিবৃতি
সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনার ফল কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া
বলা যায় না । প্রথম বিবৃতির জায় দ্বিতীয় বিবৃতিতে তাহারা
আর কোন ভবিষ্যৎ আলোচনার ইঙ্গিত করেন নাই । সুতরাং
তাহারা তাহাদের কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন মনে করিতে হইবে ।

শিল্পপতিদের এই দ্বিতীয় বিবৃতি যে গত এক বৎসর তাহাদের
প্রথম বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত আলোচনা ও প্রতিকূল সমালোচনা পর্যা-
লোচনার ফল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । যতই প্রভাব ও প্রতিপত্তি-
শালী হউন না কেন, কয়েক জন বেসরকারী শিল্পপতি ব্যক্তির পক্ষে
ভারতের যুদ্ধোত্তর ও ভবিষ্যৎ সংগঠন-সমুদয় সম্পর্কে যে পরিমাণ
ইঙ্গিত ও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব, রচয়িতাগণ সসঙ্কোচে তাহাতে
কুপণতা করেন নাই । তাহাদের পদবী অমুসরণ করিয়া তাহাদের
পশ্চাতে বহু গণ্যমান্ত ও নগণ্য ব্যক্তিও পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন ;
কিন্তু এই বোম্বাই পরিকল্পনা—সর্বপ্রথম নহে, সর্বশ্রেষ্ঠও বটে !
এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও নীতির সহিত সরকারের মতবৈধ
নাই । এই নিমিত্ত সরকার এই রচয়িতাদের অঙ্গতম স্তর
আর্দ্রশির দালালকে মন্ত্রী পরিষদে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর
সংগঠন-সমুদয় বিভাগের ভার অর্পণ করিয়াছেন । স্তার আর্দ্রশির
অত্যন্ত আগ্রহ এবং ঐকান্তিকতার সহিত তাহার কর্তব্য কণ্ঠে
নিযুক্ত হইয়াছেন । সরকারও ইতিমধ্যে তাহাদের পরিকল্পনা-
প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন । সরকারের পক্ষ
হইতে এখনও কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিবর্তিত হয় নাই
ভারতের জায় বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষিশিল্প সমুদয় ও সম্প্রদায়
পরিকল্পনা সহজসাধ্য নহে । বিভিন্ন প্রদেশে কৃষিশিল্পের অবস্থা-ব্যবস্থা
বিভিন্ন এবং বৃটিশ-শাসনাধীন ও ভারতীয় নৃপতিবর্গের আয়তনীয়

অঙ্গুলের মধ্যে প্রভেদ-পার্থক্য প্রচুর। সুতরাং ধীরে ধীরে অগ্রসর না হইলে বিভিন্ন অবস্থা-ব্যবস্থা ও স্বার্থের সমন্বয়ের পরিবর্তে সংঘর্ষের উৎপত্তি অনিবার্য। একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টার প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশ-গুলি—একটি জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতির সৃষ্টি করিয়া। দেশনায়ক জওহরলাল নেহেরু ছিলেন এই সমিতির সভাপতি এবং ভারতের কয়েক জন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত অর্থ-নীতিবিদ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কংগ্রেস শাসনের অবসানের সহিত এই সমিতির প্রচেষ্টা ক্রমশঃ হইয়া যায়। বোম্বাই-এর শিল্পপতিগণ তাহার পর যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে একটি বিশিষ্ট রূপ প্রদান করেন। তাঁহাদের সংসাহস সর্বথা প্রশংসনীয়।

সরকারী কক্ষে ত্রুটি হইয়া শ্রার আদেশের বোম্বাই পরিকল্পনার দ্বিতীয় বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। প্রথম বিবৃতিতে তাঁহার সভোগ ও স্বাক্ষর ছিল। শ্রার আদেশের স্মৃতি একটি বোম্বাই বক্তৃতায় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, ধনীকে অধিকতর ধনী এবং দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র করিবার কূট উদ্দেশ্যে বোম্বাই পরিকল্পনা রচিত হয় নাই। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—১৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের জাতীয় আয়কে তিন গুণ বৃদ্ধি করিয়া, সাধারণের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি পূর্বক দেশের নিম্নরূপ দারিদ্র্য বিদূরণ। এই শুভ সঙ্কল্প সাধনের নিমিত্ত ইহা সর্বসাধারণের জন্য উপযুক্ত অল্প, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি এবং শীতের চিকিৎসা ও ঔষধ-পাথ্যের যোগ্য ব্যবস্থার বিধান দিয়াছে। এই পরিকল্পনার অমূল্য একুন ব্যয়-সমষ্টি দশ কোটি টাকার শতকরা চল্লিশ অংশ ব্যবহৃত হইবে, এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত। আমাদের দেশের কৃষিকে শতকরা ১৩০ অংশ উন্নত এবং শিল্পকে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। কারণ, বর্তমানে আমাদের কৃষিক উৎপাদনের তুলনায় শিল্পের উৎপাদন অতি কম। ইহাতে আমাদের ভবন-পোষণের নিমিত্ত কৃষির উপর চাপ যেমন গুরু, শিল্পের উপর চাপ তেমন লঘু। এই অসমীচীন পার্থক্যই আমাদের দেশের অসমগ্রস্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আদিম কারণ। শিল্পের উন্নতি ব্যতীত কোন দেশই সমৃদ্ধ ও সম্মান লাভ করিতে পারে না। কৃষিতে অর্থাগম হয় অতি সামান্য, পরন্তু শিল্পে অর্থাগম হয় প্রচুর; অর্থাগম ব্যতীত স্তম্ভ ভাবে পারিবারিক জীবন-যাত্রা নির্বাহ এবং সামাজিক সুখ-শাচ্ছন্দ্য অসম্ভব। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে আমরা নুতিয়াছিলাম এবং বর্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ সেই অভিজ্ঞতা দৃঢ়তর হইয়াছে যে, শিল্প-অনুন্নত দেশের কোন রাষ্ট্রনৈতিক ভবিষ্যৎ নাই। শিল্প-অনুন্নত দেশের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব; কোন সুযোগে স্বাধীনতা অর্জন করিলেও তাহা রক্ষা করা দুঃসাধ্য। বহুদুখী শক্তিশালী শিল্প-প্রচেষ্টাকে অনতিবিলম্বে শত্রুদমনে নিযুক্ত করিতে না পারিলে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। অধুনা যে দেশ শাস্তিকালীন সর্বতোমুখী শিল্প-প্রচেষ্টাকে যত শীঘ্র যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পরিণত করিতে পারে, যুদ্ধে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে তত অধিক। আধুনিক যুদ্ধের ইহাই প্রকৃষ্ট রীতি। যত দিন ভাৰত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ও গুরু-লঘু সর্ববিধ শিল্পে সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে না পারিবে, তত দিন তাহার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হইবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ব্যতীত সর্বতোমুখী শিল্প সম্বরণ ও সম্প্রসারণ অসম্ভব। এই নিমিত্ত বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাগণ

তাঁহাদের পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য প্রয়োজন মধ্যে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কারণ, যখন তাঁহাদের পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইবে, তখন আমলানী-রপ্তানী, মূলধন-সংগ্রহ, কলকারখানা স্থাপনের স্থান-নির্ধারণ, বিভিন্ন ব্যাপারে মূলধন-বিনিয়োগ, কারকারবারে বিষয়-মূলক বাজার-সুস্ফূর্ত, লভ্যাংশ বিতরণের মাত্রা-নির্ধারণ, বিভিন্ন শ্রম উৎপাদনের পর্যায়ক্রম, জমির বোত-নিরূপণ প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্র-শাসন প্রয়োজন হইবে। শুধু ইহাই নহে, সময় সময় আহার্য-ব্যবহারের ব্যয়ের মাত্রা নির্ধারণ পূর্বক কঠোর বস্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে হইবে; এমন কি, অনেক সময় জনসাধারণের অভ্যন্তর আচার-ব্যবহারেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহযোগ ও সমর্থনের অধিকারী জাতীয় শাসন-তন্ত্র ব্যতীত অল্প কোন প্রকার রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ শাসন-সংযম প্রবর্তন করা সম্ভবপর নহে। কারণ, জনসাধারণ এইরূপ শাসন-সংযম তখনই মানিয়া লইবে, যখন তাহারা বুঝিবে যে, তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদেরই প্রদত্ত ক্ষমতা-প্রাপ্ত শাসনতন্ত্র এবং বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা যাইতেছে। বিধি-বস্ত্র মনে কিংবা কখনও আমাদের দেশে স্বায়ত্ত-শাসনশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে কি না—তাহা একমাত্র বিশ্ববিশ্বাসী জানান। সুতরাং সেই অনিশ্চিত অনাগত সুদিনের প্রতীক্ষায় কাল-হরণ করিলে জাতীয় স্বার্থের সর্বনাশ সাধন করা হইবে। অতএব বর্তমান পরিস্থিতির অভ্যন্তরে এখন ইহাতেই আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব জাতীয় সুস্থান-প্রচেষ্টার প্রযুক্তিশীল হইতে হইবে।

এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রাখিয়া বোম্বাই-এর অষ্ট শিল্পরথী তাঁহাদের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের প্রথম প্রকাশিত কাঠামোকে কার্যকরী করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন। নিখিল ভারতকে তাঁহারা এক অখণ্ড অর্থনৈতিক একক নির্ধারণ করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে অসমীচীন নহে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে ধনতান্ত্রিকতা পরিবর্তনীয় নহে; পরন্তু, ধনতান্ত্রিকতার আবেষ্টনে ব্যক্তিগত উত্তম ও অহুতানের অকুণ্ঠিত অবকাশ আছে, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সমাজের প্রদত্ত কল্যাণ সাধন করে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, ব্যক্তিগত উত্তম অহুতানকে কোন প্রকারে থরক করা কর্ব্য নহে। তবে ব্যক্তিগত প্রয়াস-প্রচেষ্টা বাহাতে জাতীয় স্বার্থের কোন প্রকার হানি না ঘটায়, তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং দেশের ও জাতির অর্থনৈতিক সম্পদের বৃদ্ধি ও সম্ভাবনার সম্পাদন নিমিত্ত রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট কর্তব্য আছে। জাতীয় আয় বাহাতে বিধি-সম্মত ভাবে ধনিক-শ্রমিক নির্বিশেষে সর্বপ্রকার বাহাতে বিধি-সম্মত ভাবে বিতরিত হয় এবং বহুকে বঞ্চিত করিয়া প্রচেষ্টাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিবন্ধ না থাকে, তাহাই তাঁহাদের উদ্দিষ্ট। তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তাহার পরিণতি সম্পূর্ণ স্বাধীন, যদি তাহার ফলে দেশের ও দেশবাসীর দারিদ্র্য বিদূর্ত হইয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত ও স্বাভাবিক না করে। এই নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাদের পরিকল্পনার পরিশিষ্টে জনসাধারণের মধ্যে আয়ের অসঙ্গত বৈষম্য বিদূরণ পূর্বক বাহাতে একটি দুঃস্বত

চ সর্বনিম্ন জীবনযাত্রার ধারা প্রবর্তিত হয়, তাহার বিধি-ব্যবস্থা র্ণক করিয়াছেন। সর্বসাধারণের মধ্যে আয়ের নীতিসঙ্গত ব্যাপকতম প্রণয়ের নিমিত্ত ধন-সম্পত্তি উপভোগের বিধম বৈধম্য তিরোহিত হয়। ইতর-সাধারণের অধিকারের মাত্রা প্রশস্ততর করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ দুইটি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম, সুভূতকর অর্থাৎ ধন-সম্পত্তির অধিকারীর গ্য হইলে উত্তরাধিকারকে তাহার প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী ভূতাপ্তারে কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে ধনীর সঞ্চিত ধর্ম কিয়দংশ জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়া ধন-বৈষম্য ধিকিৎ প্রশমিত করিবে। দ্বিতীয়, জমি-ভূমিই স্বত্বের (Land nure) পরিবর্তন। শিল্পরখিগণ মনে করেন যে, কৃষির ধ্বংস রতি তাঁহাদের অভীপ্সিত, জমিদারী প্রথায়া তাহা হওয়া সম্ভবপর হ। কৃষক যে জমি চাষ করে, তাহার স্বত্ব কৃষকের নিজেই না হলে জমিতে তাহার মমত্ব-বোধ থাকে না, সুতরাং জমির উন্নতির তি তাহার কোন আকর্ষণ জন্মে না। কৃষির উন্নতির নিমিত্ত ঠেটের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশেষ প্রয়োজন। তাহার ারও বলেন যে, চাষী কৃষকের জমি যাত্রা চাষ করে না, এমন ান ব্যক্তির হস্তে না যায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমি- াজ্বের হারও যথাসম্ভব কম-ইয়া বিভিন্ন স্থানে সমপর্যায় আনিতে াবে। বর্তমানে সহরঞ্চলেই বহু শিল্পের একত্র সমাবেশ ঘটিতেছে। াহাতে শিল্পের বিস্তার ও উন্নত যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে না; এবং তাহার ালে বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে তাহার সর্বপ্রকার াপকার ভোগ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত যৌথ কারবারের াংশ বহু স্থানের বহু জনের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে, কৃটীর ও ক্ষুদ্র ািল্পের যথেষ্ট বিস্তার সাধন করিতে হইবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ািল্পের বিস্তার বিকাশ করিতে হইবে এবং সমবায়-প্রচেষ্টার প্রসার ও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন শিল্প যত বিস্তার লাভ করিবে, ততই অধিক হইতে াধিকতর লোক তাহার সুযোগ ও সুফল লাভ করিবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধন-বৈষম্য বিদূরিত করিবার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য াই নহে যে, সকলের আয়ের সমতা সম্পাদন করিবে। এই বৈচিত্র্যময় ঙগতে তাহা সম্ভবপর নহে। নিজের নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন ারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ফল লাভ করিবে; তবে তাহার তীত্র ভীক্সতা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। তাহারও দুইটি উপায়। াপ্রত্যেক শ্রেণী সর্বল ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার নিমিত্ত তাহার ভরণ- াপাণের উপযোগী আয়সম্পন্ন কর্ণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জীবন- াত্রা নির্বাহের ব্যয় যথাসম্ভব কমাউতে হইবে, অর্থাৎ ভ্রব্যমূল্যের াতিবিক্রম বৃদ্ধি হ্রাস করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রব্যমূল্য বাহাতে াবধা হ্রাস না পায়, তৎপ্রতিও তীক্স দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাথমিক, িশেষতঃ কৃষিজ উৎপাদনের মূল্য হ্রাসসঙ্গত না হইলেই অর্থনৈতিক িপর্দায় ঘটবে। সুতরাং কৃষিজ পণ্যের মূল্য সর্বসা ও সর্বত্র ায়সঙ্গত পর্যায়ে রাখিতে হইবে। পরন্তু, সহরে ও মধ্যস্থলে উত্তরতর ামিকের মজুরী তাহাদের ভরণ-পোষণের উপযোগী করিতে হইবে; াবং জনসাধারণের বহুবিধ প্রয়োজন সাধনার্থ বহু শ্রেণীর সমবায় ামিতির স্রষ্টা বিস্তার-সাধন করিতে হইবে।

প্রত্যেক কর নির্ধারণ দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ব্যক্তির

মধ্যে নিম্নাংশ ধনবৈষম্য কমকিৎ নিবারণ করা যায় বটে, কিন্তু াপ্রত্যেক শ্রেণী সর্বল ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে উপযুক্ত কর্ণে িযুক্ত করিয়া তাহার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, িশেষতঃ দারিদ্র্য নিরাকৃত করিয়া সকলের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার াব্যবস্থা কখনই সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত কৃষির উন্নতির-সহিত সর্বপ্রকার উত্তম ও উন্নত শিল্পের সম্প্রসারণ-সমুদয়ন প্রয়োজন। ামাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ তাহাদের ক্ষেত্রে একটির অধিক ফসল উৎপাদন করে না, সুতরাং প্রায়ই তাহারা বারো মাস কর্ণ করে না। একই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করিয়া এবং কৃষিকর্ষের অবসর কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অখচ অতি প্রয়োজনীয় এবং আন্ত লাভজনক কৃটীরশিল্পে তাহাদিগকে বারো মাস িযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি ও শিল্পে পারিশ্রমিকের ার্থক্য যথাসম্ভব সর্বত্র সর্বত্র নিরাকৃত করিয়া উভয়ের বিধিসঙ্গত সমতা ও সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও ািল্পের বিস্তার ও উন্নতি এবং শ্রমিকদিগের কর্ম-কৌশল ও কর্ম- তৎপরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে, তাহাদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের াতিও তীক্স মনোযোগ প্রদান প্রয়োজন। এই নিমিত্ত পরিকল্পনা- রচয়িতাগণ যথাসম্ভব বিনামূল্যে তাহাদিগের সর্ববিধ শিক্ষা ও াড়িতাবস্থায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থার নিদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ াধুনিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতাব্যয় যাত্রাকে সামাজিক বীমা ও ব্যারাম িমা বলে, তাহার বিধান দিয়াছেন এবং অবস্থাবিশেষে পূর্বা বেতনে ছুটিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে আয়ের বিধম িষম্য দূর এবং দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ির্বাহ করিবার উপযোগী অন্ত-বস্ত্র-শিক্ষা ও রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থা- সমন্বিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে রাষ্ট্রের অকপট সহায়তা ও ান্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। যে কোন দেশে বৃহদাকারে ব্যাপক ভাবে দেশের ও দেশবাসীর উন্নতি সাধনার্থ অর্থনৈতিক ারিকল্পনায় রাষ্ট্রের কর্তব্য দ্বিবিধ—নিবেদনাত্মক ও প্রবর্তনাত্মক। তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে যে সমষ্টি ভাবে সর্বনিয়ন্ত্রণাত্মক হইতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণ কৃত- কার্যতার সহিত তাহার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য এবং ধন-সম্পদকে যু- কার্ণে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহা হইলে শাস্তিকালে দেশের ও দেশবাসীর সুখ-সম্পদ-সমৃদ্ধি সহজে দারিদ্র্য, রোগ এবং াজ্ঞতার বিরুদ্ধেও তাহারা সংগ্রাম করিয়া সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্ণে পরিণত করিতে হইলে যে সকল িধি-নিবেদন ও শাসন-সংঘম প্রয়োজন, দেশবাসী যদি তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে পরিকল্পনাকে ান্তি সহজেই এবং স্রষ্টা ভাবে কার্ণে পরিণত করা যায়। এই নিমিত্ত ািল্পপতিগণের অভিমত এই যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত উত্তোগ, উত্তম ও প্রচেষ্টার প্রচুর অবকাশ থাকিবে, অখচ এক্স প্রয়াস-প্রচেষ্টা কোন প্রকারে জাতি অথবা সম্প্রদায়গত ার্ষের ারিপন্ন হইবে না। পক্ষান্তরে, দেশের অর্থনৈতিক সম্পদকে সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস-প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের যে বিশিষ্ট কর্তব্য, তাহাও রাষ্ট্র যথার্থ ভাবে সম্পাদন করিবে। এই উদ্দেশ্যে স্বত্ব-স্বামিত্ব, শাসন এবং কর্ম- পণ্ডিচালন সম্পর্কে রাষ্ট্রের অধিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃততর হইবে। রাষ্ট্রের এইরূপ অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার সমাজের

কল্যাণজনক হইবে। এই বিষয়ে শিল্পপতিদের দৃঢ় মত এই যে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধিকার কিংবা প্রত্যেক কার্য-পরিচালন অপেক্ষ রাষ্ট্র-শাসনই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যে সকল প্রচেষ্টা সরকারী যত্নে পরিচালিত হইবে এবং বাহ্যসের পরিচালনা জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত, অথচ সরকারী স্বাধিকার ব্যতীত বাহ্যসের দ্রষ্টা শাসন সম্ভবপর নহে, সেগুলিতে অবশ্য সরকারের স্বাধিকার থাকিবে। পক্ষান্তরে, যে-সকল প্রচেষ্টা আর্থিক অথবা সম্পূর্ণরূপে সরকারের স্বাধিকারে এবং জনসাধারণের হিতকর অঙ্কন, বৈশিষ্ট্য শিল্প ও একচেটিয়া ব্যবসায় এবং যে-সকল শিল্প হস্তশ্রম বাজারিক সম্পদ ব্যবহার কিংবা উৎপাদন করে এবং তন্নিমিত্ত সরকারী সাহায্য লাভ করে, মাত্র সেগুলি সরকারের শাসনাধীন হইবে। পরিকল্পনা-রচনাপ্রণয় সরকারী স্বাধিকার অপেক্ষা সরকারী শাসনেরই অধিকতর পক্ষপাতী এবং সে শাসন নিয়ন্ত্রিত হইবে ত্র্য-মূল্য-নির্ধারণে, লভ্যাংশের সীমা নির্দেশে, শ্রমিকগণের কার্যকাল এবং মজুরী নির্ধারণে, সরকারী পরিচালক (Directors) মনোনয়নে, এবং হিসাব পরীক্ষার সুবন্দোবস্তে। সরকারের স্বত্ব-সম্মিলিত যে সকল অঙ্কন, তাহাদের পরিচালনায় সরকারের অধিকার বাজারিক; কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সরকারী অঙ্কন-প্রতিষ্ঠানকেও যে-সরকারী ব্যক্তিগত কিংবা আইন অনুসারে গঠিত সার্বসৌন্দর্য সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করা সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ, সরকারী পরিচালনা অপেক্ষা যে-সরকারী প্রচেষ্টারই তাহারা অধিকতর পক্ষপাতী। উদাহরণ-তাত্ত্বিকতার পরিবেশে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যজনক ধন-সম্পদ বিতরণই তাহাদের উদ্দিষ্ট। ইহা অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়া, জার্মানী কিংবা জাপানের দ্বারা সমাজতাত্ত্বিক বিধিব্যবস্থা সম্ভবপর নহে এবং সম্ভবও নহে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই উভয়ের সমঞ্জস সমন্বয়-সম্পন্ন উন্নতিশীল মধ্যপন্থাই আমাদের অবলম্বনীয়।

যুদ্ধবাসনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। স্মৃত্যুঃ এখন হইতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার প্রচেষ্টাই আমাদের শ্রুত করিতে হইবে। সরকার এই নিমিত্ত কতকগুলি প্রাথমিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কয়েকটি যুদ্ধান্তর সংগঠন-সমুদয় সমিতি বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা রচনা করিতে আছেন। তদ্ব্যতীত যুদ্ধান্তর কৃষি-শিল্প প্রভৃতির নিমিত্ত সর্বপ্রকার কর্তৃত্বশাসন, শিল্পী, মিস্ত্রী ও কারিকর শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও বিভিন্ন শিল্পবৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার বিস্তার ব্যবস্থা চলিতেছে। আমাদের বহু শিক্ষা-সম্পদ এবং তড়িৎশক্তি সরবরাহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং সর্বপ্রকার উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিবার নিমিত্ত একটি

পরিচালনা কমিটি করিয়াছেন। ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,০০,০০০ হাইড্রোইলেকট্রিক কবিরার একটি পরিকল্পনা হইয়াছে। ৩৫, ৫০০ শ্রমিক এবং দেশোক্তান্তরে গ্রাম্য জনসাধারণের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য একটি স্টেড ও কলপ-বন্দী-স্বাধিকার হইতেছে। দেশপুত্র ও মোটর বাহা বিস্তারের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকার টেনেসি জালা কর্তৃক অর্থ আদর্শে দুই-তিনটি প্রতিক্রিয়া-প্রদেয় মিলিয়া অথবা বস্ত্র ভাবে জিন্ন জিন্ন প্রদেয়ে সেচের সুবিধা সংকুল সলিলশক্তি পরিচালিত তড়িৎ সরবরাহ প্রতিক্রিয়া স্বাধিকার প্রচেষ্টা চলিতেছে। সর্বত্র অধিকতর পরিমাণে তড়িৎশক্তি সরবরাহের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি কেন্দ্রীয় শিল্পশক্তি পরিচালকবন্দী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অ-সামরিক বিমান-পরিচালনা বৃদ্ধির ব্যবস্থাও পরিকল্পিত হইয়াছে। কৃষি-গবেষণার কেন্দ্রীয় পরিষদের একটি শাখা সমিতি কৃষির উন্নতি দ্বারা কৃষিক উৎপাদন লব্ধ বৎসরে সের্গ ওল এবং পুনর বৎসরে বিভণ করিবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে; এই কার্যে স্বয়ং হইবে হাজার কোটি টাকা। বস্ত্র এবং মন্ত্র-সম্পদ বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হইতেছে। সোহ ও ইম্পাত, স্বপ্নপাতি, কলকাজ, বিলাতী মাটি, চিনি, মস্তুর সার (Alcohol) খাটকেন (Food yeast) তরু ও লঘু রাসায়নিক ত্র্যয়াদি, এবং ইলেকট্রো কেমিক্যাল প্রভৃতি শিল্পে শতকরা ৮-১০ অংশ বৃদ্ধি সাধন হেতু উন্নতিশীল কৃষি উপ-মণ্ডলী (Panels) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এ সকলই উদ্যোগপূর্বক ব্যাপার। এই সকল কর্ম-কল্পনাকে বাস্তব পরিকল্পনায় পরিণত করিতে এখনও অনেক বিলম্ব। এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অর্থ আসিবে প্রধানতঃ বেসরকারী শিল্পব্রতী ব্যক্তিবর্গের সংস্থান হইতে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক উপ-মণ্ডলীতে বেসরকারী সদস্য দুই-এক জন থাকিবে। প্রত্যেক উপ-মণ্ডলীকে সরকার সর্বপ্রকার তথ্য ও উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং উপ-মণ্ডলীগুলিও প্রত্যেকের নির্দিষ্ট শিল্প প্রবর্তন ও প্রবর্তন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহাদের স্থির সিদ্ধান্ত সরকারকে জানাইবেন। এই উদ্দেশ্যে ত্র্যয় আর্দর্শের দালাল সর্বসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহারা এ প্রার্থনা অবশ্য নিম্নলিখিত হইবে না। কিন্তু এই উন্নতিশীল বিভিন্ন শিল্পসংক্রান্ত উপ-মণ্ডলী নিয়োগ যুদ্ধান্তর প্রথম পাঁচ বৎসরের শিল্প-সমুদয় ও সম্প্রদায় পরিকল্পনার প্রথম অঙ্কন। যুদ্ধের পাঁচ বৎসরের অন্তে অঙ্কনটির মাত্র হস্তপাত। ইহার পরিণতি কত দিনে, কিরূপে ঘটিবে, তাহা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ভবিতব্যতার কবলে নিহিত। নিরবস্ত্র দেশ-হিত-ব্রতে আমলাতান্ত্রিক সরকারের শঙ্কুগতি চিরপ্রসিদ্ধ। বাহা এই সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহাদের স্বার্থ ও ভারতের জাতীয় স্বার্থ অভিন্ন নহে,—বিশেষ বিজ্ঞ। জাতীয় শাসনতন্ত্র ব্যতীত, জাতীয় স্বার্থের অঙ্কন পরিকল্পনা-প্রচেষ্টা বহু বাধা-বিঘ্ন ও বিলম্ব-সঙ্কুল।

“আমাদের হিন্দুস্তানের মূলে সমাজ, সুযোগ্য সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্বও মাহুৎ মহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্বও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, সুযোগ্য হাঁচ দেশ গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মাহুৎয়ের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝি।”

ছোটদের আসর



বরাতে না থাকলে

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

না'মটা ছিল তার সুবোধ, কিন্তু অমন চুই ছেলে গুদের পাড়াতেই নয় শুধু, মাঝা বাংলাদেশ চুইও পাওয়া যায় কি না সম্ভব। তার মাথার অঙ্ক কোন দিন চুকতো না, কিন্তু চুইবুজি চুকতো একবারে সফলবলে ভিড় করে।

অঙ্কের পরীক্ষার সে পেতো একশোর মধ্যে আট কি নয়; কিন্তু চুই মির যদি কোন পরীক্ষা থাকতো, তাহলে সে পেতো সত্ত জন ৭—একশোর মধ্যে একশো—আট কি নয়।

এ-হেন সুবোধচন্দ্র আজ মহা ব্যস্ত। রবিবার;—ইন্সুলে যাবার ছাফা নেই। তার ওপর পাড়ার পার্কটাতে আজ মহা ধুম। বেলা এগারটা থেকে তাদের জিমের সঙ্গে ও-পাড়ার জিপ-সি-ক্লাবের ক্রিকেট-ম্যাচ চলছে। পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মালীদের যে ঘরটা আছে, সেইটে হয়েছে তাদের টেক।

সুবোধ তাদের দলের এক জন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। তাদের দল ব্যাট করতে শুরু করেছে। হু'টো উইকেট গেছে পড়ে। তৃতীয় আর চতুর্থ ব্যক্তি ব্যাট করছে। এদের এক জন আউট হলেই সুবোধ ব্যাট করতে নাশবে। কাজেই সে প্যাড পরে তৈরী হয়ে বসে আছে। এমন সময় একটি আধাবয়সী দর্শক সুবোধের কাছে এসে পাঁড়ালো। ঠিক সেই সময় তৃতীয় ব্যক্তি আউট হয়ে গেল।

সুবোধ খুব কারলা করে ব্যাটটাকে হাওয়ার দোলাতে দোলাতে খেলতে বাচ্ছিল। লোকটি কাছে গিয়ে চুপি চুপি বন্ধ—দেখে-শুনলে মেরো ভাই, বলটাতে ব্রেক আছে। গোয়ারতুমি করতে বেও না ধরবার।

কাফর মুফকিরানা! সুবোধ কোন দিনই বরলাজ করতে পারতো না, আজও পারলে না,—এগুতে এগুতে বলে গেল—ব্রেক আছে না ছাই আছে! ও-সব বল মেরে ছাড়ু করে দেবো।

কিন্তু বল আর ছাড়ু হোলো না, ছাড়ু হোলো সুবোধের

উইকেটটাই। প্রথম বসেই বেচারার ডেকারট একবারে বেশে ভিড়ল-দুয়ারি হয়ে গেল।

ব্যাটটি বগলে করে বেচারী পত্রপাঠি করে এলো টেক। লোকটা তখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠায় পাড়িয়ে রয়েছে। অপরাহ্ন অনামুখে লোকটা! সুবোধের মনে হতে লাগলো—লোকটার মুহুরী যদি বল হোলো, তাহলে একটা ওভার বাউন্সারির মার ধাক্কা হাতের সুখ করে নিতো।

ভ্রলোক একটা মুফকিরানার হাসি হেসে বললে—বললুম দেখে-শুনলে মেরো, কথা শুনলে না। তার পরেই হঠাৎ নিজের হাত-বড়িটার দিকে চেয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বিড় বিড় করে আপন মনেই বকতে লাগলো—নাঃ, আর দেবী করলে চলবে না, চারটে অনেককণ বেজে গেছে, এইবার উঠতে হোলো।

কথাটা শেষ করেই সুবোধের দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা, নবীন মিত্তিরের লেনটা ঠিক কানুখানটার হয়ে বকতে পারো?

সুবোধ একবারে লাকিয়ে উঠলো। বাক লোকটাকে জব্ব করবার একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেছে।

নবীন মিত্তিরের লেনেই সুবোধের বাড়ী। গলিটা পার্কের একবারে গায়ে বজ্জই চলে। সুবোধ কিন্তু মুখের জব্বটা এমন করলে, যেন লোকটা ভুল করে একবারে উল্টো পথে এসে পড়ছে।—বললে—নবীন মিত্তিরের লেন এখানে কোথায় মশাই? পার্কের উত্তর দিকে ঐ যে গলিটা দেখাচ্ছেন, ঐ যে বার মোড়ে বাঁড়টা পাড়িয়ে রয়েছে, ঐ গলিটা ধরে বরাবর সিধে চলে গেলে ট্রাম-রাস্তা পাবেন। সেটা ক্রস করে ঐ গলিরই ঠিক সামনা-সামনি যে সড় গলিটা পাবেন, সেই গলি ধরে বরাবর উত্তর দিকে চলে গেলে এই বকম একটা পার্ক পাবেন। সেই পার্কের কাছে গিয়ে থাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই আপনাকে নবীন মিত্তিরের লেন দেখিয়ে দেবে।

লোকটা চলে গেলে পর সুবোধ মনে মনে ভারি খুসি হয়ে উঠলো। বাক, লোকটা তাকে যেমন অপদস্ত করেছে, সেও তেমনি তার শোধ তুলে ছেড়েছে।

এই ঘটনার কিছু দিন পর সুবোধের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার নগেন মামার কথা। নগেন মামা তার ঠিক আপন মামা নন। তার মার পিসতুতো না মাসতুতো ভাই। কিছু দিন হোলো, ভ্রলোক 'চিহ্ন-স্রগং' নাম দিয়ে একটা সচিহ্ন সাপ্তাহিক বার করেছেন। কাজেই বারকোপের পাসু তিনি অনারাসেই সংগ্রহ করে নিতে পারেন। লোকটা কিন্তু কেমন যেন গোমড়া মুখে। পাসের কথা তুললেই বলেন—এ বয়েসে এত বারকোপ দেখার সখ তো ভাল নয়, এখন মন দিয়ে লেখাপড়া... ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য বার বার তাগাদার কলে মামাকে অবশেষে বাজি হতে হয়েছে। কিছু দিন পূর্বে ভ্রলোক কথা দিয়ে কেলোছেন শীগিরই একটা পাস বোগাড় করে দেবেন। সেও আজ প্রায় মাসখানেক হতে চক্কো।

নগেন মামার কি কথার ঠিক।—সুবোধ আজ ঠিক করেছে নগেন মামার বাড়ী চড়াও হয়ে বেশ দু'-চার কথা শুনিবে আসবে।

বিবেল ছ'টা নাগাধ নগেন মামাদের বাড়ীতে গিয়ে সুবোধ হাজির হোলো। সদর-দরজা পার হয়েই একতলার বাইরের ঘর। উঁকি মেয়ে দেখে, নগেন মামার মেয়ে কেটা মাঠার মশাইয়ের কাছে পড়ছে। সুবোধ ঘরে ঢুকতে বাচ্ছিল, হঠাৎ মাঠার মশাইটির

দিকে চেয়েই লাফিয়ে উঠলো।—কি আশ্চর্য্য! এ যে সেদিনকার সেই আপনা লোকটা, যার মুখ দেখে ব্যাট করতে নেমে তার তেঁকাটি ভেঁ। হয়ে গেছলো!

লোকটা ঘাড় গুঁজে আপন মনে বেগুকে অঙ্ক না কি দেখাচ্ছিল। স্রবোধকে দেখতে পারনি ভাগ্যিস!

এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্রবোধ যেন ঠাঁক ছেড়ে বাঁচলো। তার পর একটু দূর নিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে স্টান্ উঠে গেল দোতলার। দোতলার হল-ঘরটার বসে নগেন মামা একরাশ কাগজপত্র নিয়ে মাথা-বুটু কি সব করছিলেন। বপ করে কবাসের উপর বসে পড়েই স্রবোধ বললে, খুব তো পাসু মিলেন নগেন মামা!

কাগজগুলোর ওপর থেকে চোখ না তুলেই নগেন মামা বললেন—পাসু তো জোগাড় করেছিলুম, কিন্তু তোর কপালে নেই, তা কি করব বল? এক-আধ জনের পাসু নয় যে, একেবারে পোটা একটা বল্লের পাসু!

স্রবোধ বললে—সে পাসু কি হল তা হলে?

নগেন মামা এইবার নখিপত্তর ছেড়ে সিঁধে হয়ে বসলেন। বললেন—আর বলিস কেন। কত করে তো পাসু জোগাড় করলুম। তোর মাষ্টার মশাইকে পাঠালুম তোর বাড়িতে পাসুটা পৌঁছে দিচ্ছি। গত ববিবারের কথা বলছি আমি। সেই দিনেই পাসু—সন্ধ্যা হুঁটার শো। বলে দিলুম, চারটের মধ্যেই যেন পাসু বখাওয়ান পৌঁছয়। আমি নিশ্চিত হয়ে বসে আছি—হঠাৎ রাত আটটার সময় সাত-বুহুক ঘরে এসে মাষ্টার মশাই পাসুখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার নবীন মিস্ত্রির লেন তো খুঁজে পেলুম না মশাই।

বললুম—সে কি! আমি যে আপনাকে পড়াপাখার মত করে বুঝিয়ে দিলুম! সুতরাংই অত বড় পার্ক; ও তো তুল হবার হো নেই। মাষ্টার মশাই বললেন—পার্ক তো খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু সে পার্কের কাছে নবীন মিস্ত্রির লেন বলে তো কোন গলি নেই।

বললুম—পার্কটা কি রকম বলুন তো?

মাষ্টার মশাই পার্কের যা বর্ণনা দিলেন, তা থেকে বুঝলুম, ভক্তালাক বখাওয়ান গিয়েই পৌঁছেছিলেন। বললুম—ওখানে নবীন মিস্ত্রির লেন বলে কোন গলি নেই, এ কথা কে আপনাকে বললে?

মাষ্টার মশাই বললেন—একটি ছোকরা।

নগেন মামা আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাগা দিয়ে স্রবোধ বলে উঠলো—বুঝতে পারছি, ভক্তালাক তুল করে ঘুরে মরেছেন।

নগেন মামাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে স্রবোধের ডাক ছেড়ে কাঁধে ইচ্ছে করল।

বিষ্ণুগুপ্ত

ঐরবি-নর্তুক

(২)

এই ভাবেই দিন কাটতে লাগল। কিন্তু রাজা মহাপদ্ম নন্দের সঙ্গে এক বিবাহ সংঘ—তার দুই রাণী সুনন্দা বা মুরা কান্নারই ফলে হয়নি। রাজা অনেক চেষ্টা করলেন—বাগ-বন্ধ-ঠাকুর-দেবতার কবচ-মাদুলী—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—রাণীদের হেলে হবার বয়স আর পেরিয়ে যায় যায়। এমন সময় এক দিন হঠাৎ এক জন মত্ত বড়

মহারাজের জয় হোক! আপনার কাছে আজ আমি অতিথি। অনেক দিন তপস্বী করেছি—কিছুই খাওয়া-পাওয়া ছিল না এত দিন। আজ আপনার অন্তঃপুরে আমার মনের মত খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

রাজা ত এতেন ভবিক অতিথি পেরে নিজের বড়-ভাগ্য মনে করলেন। ভবি ত নয়—কেন জলন্ত আগুন! তপস্বী করে তার শরীরে এত তেজ জমেছে যে, ভবির দিকে ভাল করে চাওয়া যায় না—চোখ কলসে যায়! তাই রাজা ভক্তিতে পঙ্গব চ'রে সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। ভবির চরণ মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁকে সঙ্গমে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে। এমন কি, পা খোঁষাবার জল পর্যন্ত নিজের হাতে ব'য়ে এনে খুব মত করে নিজেই ভবির পা হ'খানি বুইয়ে দিলেন। তার পর ঠিক ওকর মত পংম সমানরে ভবিরবের উক্তব রাজভোগ দেবার ব্যবস্থা করতে হুকুম দিলেন রাজবাড়ীর বাঁহুনীদের।

ভবির পা বুয়ে পাশোয়কটুই তিনি একটা পায়ে সাবধানে বেধে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় বন্দন এসে ভবিক প্রণাম করলেন, তখন সেই পাশোয়ক একটুখানি নিয়ে তিনি হুটে রাষ্ট্রীয় মাথাতেই ছিটিক দিলেন। বড় রাষ্ট্র সুনন্দার মাথার পড়ল পাশোয়কের নটি কৌটা, আর ছোট রাষ্ট্র মুরার মাথার এসে পড়ল একটা কৌটা মাত্র। কিছ ছোট রাষ্ট্র এই একটি মাত্র কৌটা পেয়েই কৃতার্থ হ'য়ে গিয়েছিলেন! তার মনের সেই আনন্দের জাব তিনি বুঝে প্রকাশ করতে লাগলেন—‘আমার কি সৌভাগ্য! আপনার মত ভবির পাশোয়ক আমার মাথার প'ড়ে আমার সকল পাপ দূর ক'রে গিয়েছে। প্রভু! আমার আশীর্বাদ করুন—যেন আমার নারীকে পৌঁছই এনে দেয় মাতৃবের সৌভাগ্য!’

ভবিও তার এই ভক্তিকার মেখে বুঝই সন্তুষ্ট হলেন, আর আশীর্বাদ করলেন যে, খুব শীঘ্রসিই ছোট রাষ্ট্রীয় একটি মনের মত ভাল ছেলে হবে।

বড় রাষ্ট্র সুনন্দাও তবে-ভক্তিতে জগ-মত্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বড় অভিমাত্রী—কাজই ছিল তার গভীর—তাই তিনি খুব কুটে কোন কথা বলেননি। ভবি তাঁরও মনের জাব বুঝে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁরও মনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে দেবী হবে না।

এর কিছু দিন পরেই ভবির কপাল সুনন্দা ও মুরা দুই রাষ্ট্র এক সঙ্গে গর্তবন্তী হলেন। ঠিক সময়ে মুরার মজা সত্যই একটি ফলে জমাল। যা মুরার নামের সঙ্গে মিল ক'রে হেলোটির নাম রাখা হ'ল—মৌখা।

এ দিকে বড় রাষ্ট্রীয় দুঃখের বরাত কি না—কোন কাজই তার ভাল ভাবে হ'ত না। তাই তার পোঁ থেকে বেরল—হেসে নর মেয়ে নয়—একটা প্রকাণ্ড মাসের জেল। মহারাজ কখন তাই দেখে চ'টে আগুন। তিনি তখনই বড় রাষ্ট্রীয় মাথা কেটে সুনন্দার হুকুম দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এখান রাষ্ট্রীয় কান্নার অনেক ক'রে বুঝিয়ে তাঁকে একটু শান্ত করলেন। তখন তিনি আদেশ দিলেন—‘মাসের পিঠিটা নলীয় জলে ফেলে লাগ।’ কিন্তু রাজার ভাতের বাগা দিয়ে বললেন—‘মহারাজ! আমার আর একটা বিজ্ঞান জ্ঞানত কাজা হয়! যে ভবির বয় বড় রাষ্ট্রীয় এই মাসের জেল এক

হাতে প্রত্যাক কল আপনি নিজেও শেরেছেন এই ক'দিন আগে। কত শত চেষ্টাতেও ত একটি ছেলের মুখ দেখতে পাননি এত দিন। আজ ঋষির পাদোষক মাথায় দিবেই যে ছোট রাণীমার সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে—এত আশা অধীকার করবার উপায় নেই। কাজেই এ মাংসপিণ্ডী কেমনে না। এতে হয়ত ঋষিবরেরই অসুখান করা হবে। দিবা-দুষ্টিতে তিনি তা জানতে পারবেনই। তখন তাঁর কোপে হয়ত আপনার নতুন বংশধরটিরও অনিষ্ট হবে—এমন কি, আপনি সকলে নির্দোষ হ'তেও পারেন। তাই আমি বলছি কি—আমাকে একবার দেখতে দিন এ মাসের ডেলাটা। আমি যদি বৃষ্টি গুটা কোন কাজে লাগবে না, তখন কেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে'!

প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস ছিলেন খুব বেশী ঢালাক। তিনি মনে মনে বেশ বুঝছিলেন যে, ঋষির বর কখনও ব্যর্থ হবে না—তবে হয়ত একটা অঘটনের মধ্যে দিয়ে ছেলে জন্মাবে। মহাভারতের কথা তাঁর মনে পড়ল। গান্ধারীরও ত এমনই একটা মাংসপিণ্ড পেট থেকে বেরিয়েছিল। তা থেকেই একশ' ছেলে জন্মায়। এ-ও সেই যক্ষ হয়ত হ'তে পারে। রাক্ষসের এই আশঙ্ক্য মোটেই মিথ্যা হয়নি। মাংসপিণ্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখে তাঁর মনে হ'ল যেন কতকগুলো ছোট-ছোট ছেলে ময়লার পেট-মাথার মত এক সঙ্গে মাথা হ'য়ে রয়েছে। তাদের হাত-পা-মুখ-পেট খুব অস্পষ্ট—তবু সে সব ছাপ যে ভেতরে রয়েছে তা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোকা যায়। তাই তিনি কাউকে কিছু না ব'লে মাংসপিণ্ডটা নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন।

বাড়ীতে এসে একটা প্রকাণ্ড গাম্ভীর্য মত পায়ে পরিষ্কার সর্বের তেল ভর্তি ক'রে তাইতে ঐ মাসের তালটা ডুবিয়ে রেখে দিলেন। যাক যাক নিজের হাতে তিনি পায়ে তেল ব্দলে দিতেন—মাংসপিণ্ডটাকে নয় বন্ধুতার পুঁজে রাখতেন। ক'দিন যেতে না যেতেই ঘরে ঘরে ফুলের পাশুড়ি খোলার মত ঐ মাসের তালটা থেকে ছোট ছোট শিশুদের সেই আলাপ হ'তে লাগল। আস্তে আস্তে মাংসপিণ্ডটার জোড়গুলো সব গুলে গিয়ে ন'টি শিশুর জন্ম হ'ল। তখন রাক্ষস ছেলেগুলিকে আলাদা ক'রে ন'টি পায়ে দুখে ডুবিয়ে রেখে দিলেন দিন দুই। তখন দেখা গেল—বান্ধার হয়ত পা' নাড়তে আরম্ভ করছে। শেষে যখন ছেলেগুলো কেঁদে উঠল—তখন রাক্ষস তাদের ভাল ক'রে তুলে নিয়ে পুঁছিরে নয়ম তুলোর বিছানায় শুইয়ে ছুটে গেলেন রাক্ষসভার। মাঝে ক'দিন তিনি অসুখের জপ ক'রে রাক্ষসভাতেই বাননি। দিন-রাত আহা-নিজা ছেড়ে মাংসপিণ্ডটার ভারকে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে হস্ত-বন্ধভাবে ছুটে আসতে দেখে মহাপ্রভু নন্দ মহারাজ চমকে উঠলেন। সজার সকলের বুকেই এক প্রশ্ন—'কি মন্ত্রিবার? ব্যাপার কি?' ঠাকাত্তে ঠাকাত্তে রাক্ষস উত্তর দিলেন—'মহারাজ! বড় রাণীমাকে সঙ্গে ক'রে শিশুটির চান্দন আবার বাড়ী। সেই মাসের ডেলাটা থেকে ন'টি ছেলে জন্মেছে। এখন তাদের মুখে মা'য়ের মাই-দুধ দিতে হবে—এইলা বিচার ব্যবস্থা'।

সত্যতঃ সত্যতঃ ক'রাক্ষস! মহারাজ, মন্ত্রিবার, রাক্ষসভার সবাইই ছুটে গেলেন রাক্ষসের বাড়ীর দিকে। 'হাসি দিকে রাক্ষসের লজ্জা হুঁসি'—মহারাজের 'কি ক'র' বন্দী হ'ল।

গ্যারিবন্ডির বন্দী

শ্রী প্রভাতকিরণ বহু

মিলাজোর যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল। দুর্গের যে ঘরটা থেকে ভূমধ্য-সাগরের নীল ডেউগুলি দেখা যায়, সেই ঘরে ব'সে গ্যারিবন্ডি তাঁর অমুচরদের নিয়ে। বহু দিন শূন্য প'ড়ে ছিল এখানকার ঘরগুলি, খুঁসা আর মাকড়সার জালের মধ্যে সৈন্তরা লগ্না হ'য়ে শুয়ে। বগল্লাস্ত্র সৈনিক সব। বিজ্ঞানের ভয়ানক প্রয়োজন।

বেগা-তটে। গ্যারিবন্ডির ঘরের তিনটি জানালা সমুদ্রের দিকে। দেখা যাচ্ছে ইটালীর ধূসর রঙের বাড়ীগুলি এবং ছোট শহর। বাংলাগুলি লাল টালি দিয়ে ছাওয়া এবং বাগানগুলি ফুলে ভরা—যার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ কখনো কোনো মেয়ের ভদ্র আর কৌতূহল মেলাতো। মুখ ফুটে উঠেছে। দুর্গপ্রাসাদের দেয়াল এক দিন সম্ভ্রান্ত ছিল, আজ হু' উঠে গেছে, কিন্তু তবু যে সব ভূতপূর্ব গভর্নরদের লগ্না ন্যাক আর সব মুখের ছবি টাঙানো রয়েছে, তাদের চোখগুলো যেন জ্বলছে বিদ্রোহী গ্যারিবন্ডির দিকে চেয়ে।

গ্যারিবন্ডি তাঁর সেনাপতিকে তাঁর কাছ বেসে বসুতে বললেন। সাবধান ক'রে দিলেন, দেখা, চোরাগাটা যেন ভেঙে না পড়ে।

—আমরাও ত' আমাদের বিজয়ী নেতাকে ভালো আসন দিতে পারিনি, বলল সেনাপতি।

জীর্ণ কার্ভের কেদারায় হাত বুলিয়ে গ্যারিবন্ডি বললেন—আমার যোগ্য আসনই পেয়েছি! গোলাপ ফুলের শয্যা আমার জন্তে নয়।

সেনাপতি অভিযান জানালো। প্যালেসে জয় হয়েছে, অনেক সৈন্য ক'রে। মিলাজোতে আরো বেশী। তবু গ্যারিবন্ডি, বিনি তাঁর তরবারি নিয়ে সারাদিন ঘূর করেছেন, একটুও স্ত্রান্ত হননি। আরো দুর্গ যদি জয় করবার প্রয়োজন হত, এগিয়ে যেতেন, বিজ্ঞানের জন্তে এখানে বসুতেন না।

ইটালীর জননেতা গ্যারিবন্ডি তরুণ বয়সেই স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন রাজশক্তির বিরুদ্ধতা করার দরুণ। দক্ষিণ-আমেরিকায় আশ্রয় নিয়ে তাদের যুদ্ধ-জয় তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে। রোমান বিপ্লবলীক প্রতীকিত হবার সময়ে আবার তিনি দেশে এসেছেন। আবার যে তাঁকে বিদায় নিতে হবে তা কি তিনি জেনেছিলেন?

কাউন্ট রমোলি তাঁর পরাজিত বন্দী। তবু তিনি যুদ্ধ নেত্রে গ্যারিবন্ডির দিকে দেখছিলেন পাঁড়িয়ে পাঁড়িয়ে। তিনি শুনেছিলেন, সিসিলির সমস্ত অধিবাসীরা এই বিদ্রোহী বীরকে নতজান্ন হ'য়ে 'মুক্তিদাতা' ব'লে অভিনন্দিত ক'রে নিয়েছে। মেয়েরা ভগবানের কাছে এ'র মঙ্গল প্রার্থনা করেছে আর মায়েরা তাদের ছেলেদের এগিয়ে দিয়েছে এ'র হাতের পবিত্র স্পর্শ নেবার জন্তে। ত্রিজিলের অরণ্য ও নদীতীরে এ'র কত না বীরদের কাহিনী, সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি আর জলমন্ডনের সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প মুখে মুখে প্রচারিত হ'য়ে গ্যারিবন্ডির নামকে তাঁর জন্মভূমিতে বিখ্যাত আর রহস্যময় ক'রে তুলেছে—কাউন্টের মনে পড়লো। যন্ত্রণার মতন তিনি পাঁড়িয়ে রইলেন।

গ্যারিবন্ডির কথাই তাঁর চমক ভাঙলো—আপনি আমার বন্দী। কিন্তু নেপলস থেকে হুকুম না আসা পর্যন্ত আপনি আমার অতিথি।

কাউন্টের সাধা যুব লক্ষ্যের রাজ্য হ'য়ে গেল। সত্যিই ত বিজয়ী কাউন্ট আজ বিদ্রোহী গ্যারিবন্ডির বন্দী, যা

—ধনুবাধ জেনারেল, বললেন তিনি ক্লক ঘরে। আপনি যদি আমাকে অমৃত্যু দেন, এক বার আমি আমার সৈন্তদের দেখে আসি।

—সৈন্তদের দেখে আসবেন? গ্যারিবন্দির মুখ গভীর হ'য়ে গেল। তার পরেই ফুটে উঠলো উজ্জ্বল হাসি। তিনি উঠে কাউন্টের হাত ধরে বললেন—মনে করেছিলাম, শান্তির মধ্য দিয়েই আমি অভীষ্ট লাভ করব বিনা রক্তপাতের। তা হয়নি, অনেক রক্তক্ষয় হ'য়ে গেল। দোষ আমারও নও, আপনারও নয়, যুদ্ধ বাধিয়ে যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় দোষ সেই সব শত্রুতানদের। যান আপনার বেখানে থুসি। আসবেন আপনি যখন থুসি। কিন্তু ভুলবেন না, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা খেতে বসব—কুটি আর মদ আর খানিকটা ঝোল। সামান্যই উপকরণ, তবে আমার মতন দুর্দান্ত ক্ষিদে যদি আপনার হয়, ভালো লাগতেও পারে।

কাউন্টের কথা জড়িয়ে এলো, তাঁর চোঁট কাঁপতে লাগলো, খাপ থেকে তরোয়াল খুলে টেবিলের ওপর রেখে তিনি বললেন—আমার হাতিয়ার জামিন রেখে গেলাম, লুণ্ঠ ক'রে বলছি আমি পালাব না, সৈন্তদের সঙ্গে দেখা করেই কিরে আসব।

গ্যারিবন্দি লাক্ষ্যের উঠে এগিয়ে গেলেন।

তরোয়ালটি তুলে নিয়ে কাউন্টের কোমরবন্ধের খাপে সম্বন্ধে পুরে দিলেন।

—আমরা দু'জনেই ভ্রমলোক এবং পরস্পরের বন্ধু। দূরত্বের সঙ্গে বললেন গ্যারিবন্দি—এখানে জামিনের কোনো প্রকল্পই ওঠে না।

পাথর-খুঁজে বার করা অসমতল সোপানশ্রেণী ঘরে টলতে টলতে কাউন্ট নেমে গেলেন, চোখে তাঁর জল টলটল করছিল—বিস্ত্রোহী গ্যারিবন্দি তাঁকে আশ্চর্য ক'রে দিয়েছেন। দেশের রণক্ষেত্রে তাঁরা দু'জনেই শত্রু দু'জনের, কিন্তু অন্তরের শান্তি-রাজ্যে অন্তরতম বন্ধু চিরদিনের।

জননেতা গ্যারিবন্দির পূজা কেন ইটালীর ঘরে ঘরে, আজ তিনি বুঝতে পারলেন।

গৃহ-শিল্পী

ঘাসের বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলো-পাখা আছে, তারা জানে, সে আলো-পাখার তার ফিউজ হইলে কি অন্তরবিধায় পড়িতে হয়। তখনই ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ডাকা চাই; নহিলে পাখা চলিবে না, আলো জ্বলিবে না।, অথচ ফিউজ-তার ঠিক করিয়া লওয়া শক্ত নয়। এ কাজটুকু বাড়ীর ছেলেমেয়েদের শিখিয়া রাখা উচিত। শেখা থাকিলে এই সামান্য বিপত্তিতে পরের উপর নির্ভর রাখিতে হয় না। ইলেকট্রিক তারের সম্বন্ধে একজ্ঞান থাকা এখুণে যেমন আবশ্যক, তেমনি ছোট-খাট আরো যে নানা ব্যাপার সংসারে ঘটে, সে সবের সম্বন্ধে ছোট বরস হইতেই শিক্ষার প্রয়োজন। এমনি কয়েকটি বিপত্তির কথা বলিতেছি।

কালির দোয়াত উলটাইয়া গেলে জামা-কাপড়, টেবিল-ক্লথ, বিন্দার চাঙ্গর নোংরা হয়। কাচিতে দিলেও খোপা অনেক সময় জামা-কাপড়ের সোনাগ তুলিয়া সিতে পারে না; তার ফলে জামা-কাপড় প্রভৃতির এমন চোঁহা হয় যে গায়ে দিয়া উজ-সমাজে বাহির হওয়া দায়। অথচ এই কালির দাগ অভিসহজে মুছিয়া বিলুপ্ত করা চলে। বাজারে ব্রীচি পাউডার পাওয়া যায়। এক-পেয়লা জলে

খানিকটা ব্রীচি পাউডার মিশাও; সঙ্গে সঙ্গে আধ-এক পেয়লা জলে সাধারণ সোডার গুঁড়া (সুয়াশি সোডা) ঢালিয়া গোলো। তার পর দুই পেয়লার জল তৃতীয় পেয়লার ঢালিয়া মিশাও। মিশাইয়া দশ-পনেরো মিনিট পরে এই মিক্চারটুকু পরিষ্কার ব্রীচি-কাগজে বা পাংলা ঝাকড়ায় ছাঁকিয়া লও। এই ছাঁকা জলে কালির দাগ-লাগা অংশটুকু ঘষিয়া মুইয়া লইলে কালির রেখা নিশ্চিহ্ন হইবে। আর একটি সহজ উপায় আছে,—তুল্যাংশে নাইটিক এসিড ও পোটাসিয়াম-বাইটারট্রেট (ক্রীম অফ টার্টার) মিশাইয়া লও। মিশাইলে এ-জিনিব হইবে খড়ির গুঁড়ার মত। তার পর একটি এনামেলের বা এলুমিনিয়ামে গ্রেট তাতাইয়া কাপড়ের যে-অংশে কালি লাগিয়াছে, সেই অংশটুকু জলে ভিজাইয়া তাতানো প্লেটের উপরে রাখো; রাখিয়া কালির দাগে ঐ গুঁড়া ঘষো, তাহা হইলে কালির দাগ সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে। কালির দাগ উঠিয়া গেলে ভালো জলে কাপড় বা জামা কাচিয়া লইয়ো। ব্রীচি পাউডারের মিক্চারে শুধু কালির দাগ নয়, জামা-কাপড়ে যদি ফলের দাগ, লোহার কষানি বা খয়েরের দাগ লাগে তো সে সব দাগও মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে।

জামা-কাপড়ে পোড়া-দাগ ধরিলে সামান্য একটু পোটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেটের সঙ্গে হাইড্রোজেন-পেরক্সাইড মিশাইয়া সেই মিক্চারে ঝাকড়া ভিজাইয়া তাহা দিয়া ঘষিলে দাগ মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে।

চীনা-মাটির ডিশ পেয়লা প্রায় ভাঙে। ভাঙ্গিলেই তাহা ফেলিয়া দিয়ো না—ভাঙ্গা ডিশ-পেয়লা বেমানুম জোড়া চলে। ছুড়িবার জন্ত খানিকটা সাদা-খড়ির গুঁড়া লও। তার সঙ্গে খানিকটা সোডিয়াম-সিগনেট-সলিউশন মিশাইয়া ঘুঁটিয়া লইলে ঘন কাইয়ের মত হইবে। ডিশ বা ভাঙ্গা পেয়লার গায়ে এই কাইয়ের প্রলেপ লাগাইয়া লাইনে-লাইনে চাপিয়া ধরো—কাইয়ের আঠায় সম্পূর্ণ আঁটিয়া ছুড়িয়া যাইবে। ডিশ-পেয়লার গায়ে যদি আঠা লাগে তো ভিজা ঝাকড়া ব্লাইলে সেটুকু মুছিয়া যাইবে। তার পর এই জোড়া পেয়লা-ডিশ দু'দিন রাখিয়া দিয়ো—ব্যবহার বা ঘাঁটাঘাটি করিবে না। দু'দিন পরে আন্ত অটুট ডিশ-পেয়লার মতই এ ডিশ-পেয়লা ব্যবহার করিতে পারিবে।

জামা-কাপড়ে আয়োড়িনের দাগ লাগিলে একটি টিউবে কিছা গ্রাসে হাইপো-মিশ্রিত জল ভরিয়া আয়োড়িনের দাগের উপর ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিয়ো—হাইপো-জল লাগিবামাত্র আয়োড়িনের দাগ বেমানুম মুছিয়া যাইবে।

লেবল, ধাম প্রভৃতির জন্ত ময়দার কাইয়ের আঠা আমরা ব্যবহার করি। সে-আঠার কাজ হয় একটু জ্যাঝড়া। ভালো আঠার জন্ত একটু গাম-আরবেক (gum arabic) বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া জলে গোলো। জলে বেশ গুলিয়া গেলে সেই জলে মিশাও এক-ছটা ষ্টাচ'চুর্ণ করিয়া এবং সেই সঙ্গে ছোট চামচের এক-চামচ চিনি। এক-সঙ্গে গুলিয়া মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লও। সিদ্ধ করিলে ষ্টাচ'গুলিয়া জলে মিশিয়া যাইবে। এই মিক্চারে সরকারী খামের আঠা তৈয়ারী হয়! এ আঠা যেমন কার্যে, তেমনি সৌখীন।

যে-সব রাসায়নিক দ্রব্যক বা চুর্ণের কথা লেখা হইল, এগুলি খুব দামী নয় এবং বাজারে পাওয়া যায়। এ কাজে শুধু যে সংসারের উপকার হইবে তা নয়, এ কাজ করিতে খুব আনন্দ পাইবে।

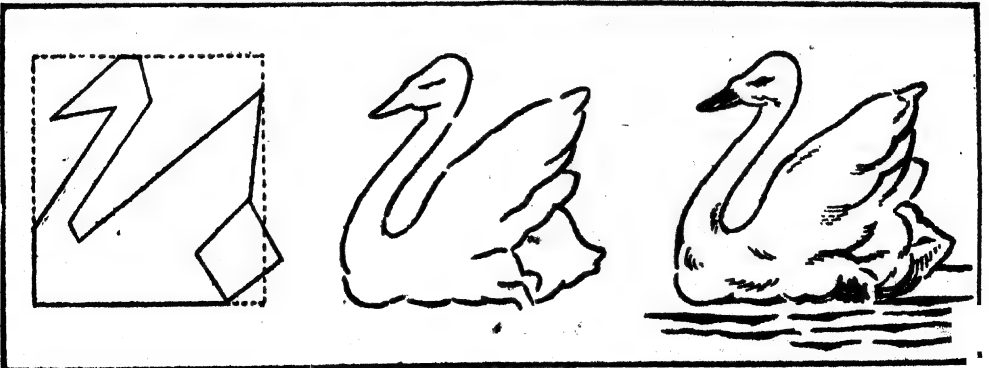
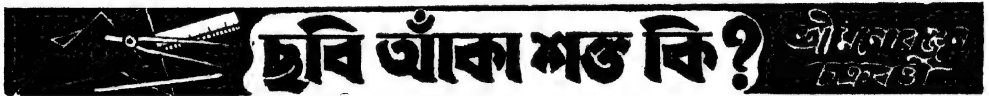


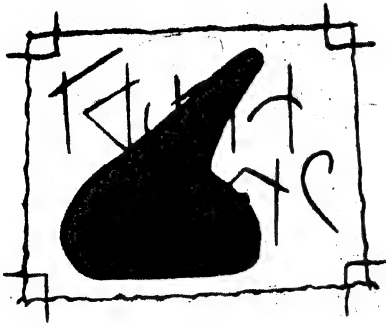
খ্যাস্ খ্যাস্ কাগজেতে টানলে কি ছবি হয় ?
 দেখে থাক বেরসিক ছবি আঁকা কারে কয় ।
 কালি আর রং তুলি ধরা বেশ শক্ত,
 কালি মেখে ভূত সাজে যারা ছবি ভক্ত ।

ভক্তেরা হরদম যাবে কেন রবারে
 পটুয়ার কাজ কি এ ? বোঝাবো তা সবাবো ।
 দিন-রাত কসরৎ দিন-রাত ভাবনা
 হয়বাণ হয়ে ভাবি খাবো কি না খাবো না ।
 সাধনায় সিদ্ধি বলে শুধু বোকারা
 সিদ্ধির সরবৎ খায় বুড়ো খোকারা ।
 ছপরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে খাবি খায় শকুনি
 ছাতে বসে ছবি আঁকি, খাই খাব বকুনি ।
 বিদুষ্টে বাতাসের ছম্‌ছম্‌ আওয়াজে
 ঝাঁ ঝাঁ করে মাঠখানা মেতে যাই বেওয়াজে ।
 খ্যাস্ করে টেনে যাই মশগুল আবেশে
 বহুত চরে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশে ।

এঁকে ফেলি বহুত লিঙ্কলিকে চেহারা ।
 পাঁকাটির খাঁচা নিয়ে ওড়ে যেন বেহারা ।
 তার পর অন্ধুতে এঁকে ফেলি পৌচড়ে
 অন্ধুত ভূত নয়, মুড়ি খায় কৌচড়ে ।
 কিছুত হেসে ফেলে তবু চোখে জল তার
 বিচ্ছিন্নি মুখখানা তৈতো খেয়ে পলতার ।
 লোকুত লোমে ভরা কাঁদ কাঁদ চাহনি
 এঁকেছি তা হুবহু, দেখেছ কি দ্যাখনি ?
 মোকুত মোলায়েম পিছলেই সরে সে
 ব্যাড়াটির ভক্ত লাজ দিয়ে ধরে সে ।
 বোকুত বোম্‌ বলে বোমা বেন কাটায়ে
 হেঁচে হেঁচে নাজেহাল, বুসী হয় কাটায়ে ।

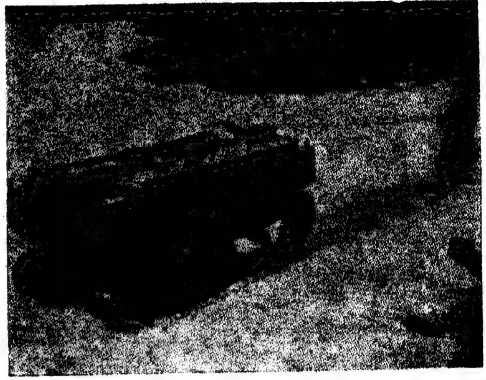
আরও কত ভুতদের ছবি আঁকি কাগজে
 কিনবে কি ঝান হই ? চুকবে কি মগজে ?



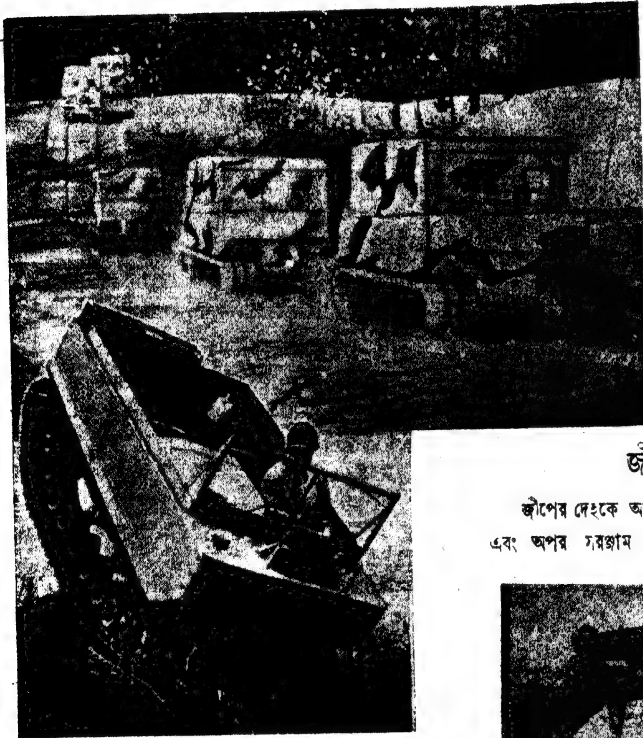


শিবাঃ পছানঃ

এবারকার এ মহাযুদ্ধ পৃথিবীর সকল দিক, সকল প্রান্তকে
প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে! ইহার বহিঃস্থলিঙ্গ ও বহিঃ



রশি ধরিয়া গাড়ী চান।



চলে। এ গাড়ীর বড় বড় মোটা চাকা
রবার প্যাডে মণ্ডিত; ওজন লঘু। পথ
চলিতে সাধারণ গাড়ীর যে চাপ পথের
বুকে পড়ে, এ গাড়ীর চাপ তার সিকি
ভাগ। তাছাড়া পঙ্ক-কর্দমে চাকা পুঁতিয়া
গাড়ী অচল হইলে ড্রাইভার অনায়াসে
নামিয়া 'রশি' টানিয়া গাড়ীকে সচল
করিতে পারে। তুবার-স্তূপে গাড়ী চাপা
পড়িলে ড্রাইভারের কোন আশঙ্কা নাই।
গাড়ীর মাথার ক্যাবিশের আবরণ আছে।
ছয়-সিলিণ্ডার ইন্ডিবেকার-এঞ্জিনে এ
গাড়ীর প্রাণ-শক্তি।

জীপের ক্রমোন্নতি

জীপের দেখে আকারে বাড়িয়া সে-দেহে আরো দু'খান চাকা
এবং অপর দরজাম আঁটিয়া নব-রূপে তাহাকে অগ্নি-নির্ভাণের



অগ্নি-বারণ-রূপী জীপ

বরফ ভাঙ্গিয়া চলা; খাড়াই-পথে নামা

জালা হইতে কোনো দেশ, কোনো মহাদেশের মুক্তি নাই। অভিযান
চলিয়াছে গিরি-পর্বত বহিয়া, জলা-জঙ্গল হুঁড়িয়া, কর্দম-তুবারের
ভূপ ভাঙ্গিয়া—সে-অভিযানকে অবাধ-অব্যাহত এবং অমোঘ রূপিবাব
জন্ত মামুদের সাধনারও সীমা নাই। এই সাধনার সাক্ষ্য-স্বরূপ নির্মিত
হইয়াছে "এম-২১" মডেলের নূতন বিদ্যুৎ-বাহন। তার নাম উইল
গাড়ী। স্কোর্পন এবং রশ্মিপত্র বহিবাব জন্ত এ-গাড়ীর সৃষ্টি। এ গাড়ী
পঙ্ক-কর্দম, গিরি-পর্বত, তুবার-স্তূপের বাধা মানে না। সে-সব বাধা

কাজে আজ অব্যর্থ সহায় করিয়া তোলা হইয়াছে। বর্ধিত অংশে

সঙ্কতিত ভাবে স্থলীকৃত হই; এবং বায়ু গ্যাস-মুখোশ, বৈদ্যুতিক আসবেষ্টনের তৈয়ারী অঙ্গাবরণাদি সংরক্ষিত থাকে। অল্প-সং-র সঙ্কতে পাইবামাত্র একীপ চকিতে গিয়া সে-আন্তন হইতে পারে।

সংহার ও স্থিতি

এত কাল হেলিকোপ্টারের কাজ ছিল শুধু সংহার-লীলা-সাধন। ত 'এক আর ৫' মডেলের যে নূতন হেলিকোপ্টারের সৃষ্টি হইয়াছে, চুই রূপ ধারণ করিতে পারে। প্রথম রূপে সংহার-সাধন—



হেলিকোপ্টারের নব পর্যায়

স্টায় রূপে আহতদের গা-পরিচর্যা। ন ব-স্মিত হেলিকোপ্টারের ক্ত-সামর্থ্য ও গতিবেগ উন্নীত হইয়াছে। তবেগ এখন হইয়াছে গায় ১২০ মাইল।



হেলির বৃক্ক হাসপাতাল

শাশ ফুট খোলা জমি পাইলেই এ হেলিকোপ্টার অনায়াসে সেখানে মিয়া দেহকে অক্ষত রাখিতে পারে। বৃক্কের মধ্যে চার জন আহতের গায় শয্যা এবং পরিচর্যাগিরি রক্ষা-সংস্থান, অস্ত্রশস্ত্র, পাইলট প্রভৃতি ইয়া এ হেলিকোপ্টার প্রায় চৌদ্দ মণ ওজনের ভার বহিয়া গতিবেগ হ্রাস রাখিতে সমর্থ।

মশা-মাছি-নিপাত

বৈজ্ঞানিক-সাধনার মার্কিন আজ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুঃখ-প্রাধির বীজাণু-নিপাত-কল্পে ডিমখিল যথালোটে নামে বর্ণনীয় এক রাসায়নিক জাবক তৈয়ারী করিয়াছে। কাপড়-চোপড় ও বহানাগ্রে পিচকারী-ধারায় এ জাবক ছুঁ-তিন আউল জিটা হইয়া গিলে মশা-মাছি বা কোনো রোগের বীজাণু স সবের কাছে পাঁচ দিন ধৈর্যেতে পারিবে না; গারে এ জাবক মাখিলে ছয় ঘণ্টা কাল চুষ্ট কটপতল বা বীজাণুর আক্রমণ-ভয় থাকিবে না। এ জাবক সৃষ্টি করিয়াছে আমেরিকার কুপট

বিমান-নির্দেশ

বিপক্ষের বিমান আসিতেছে কি না, সে-সংবাদ পূর্বাঙ্কে জানিবার জন্য হিটলার এক অমোঘ অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে। এক অভিকার বস্ত্রে অপূর্ণ কৌশলে একটি ম্যাগনেটিক-ডিটেক্টর সংলগ্ন করা হইয়াছে। তাহা হইতে আকাশে অতি তীব্র আলোক-রশ্মি ফেলিয়া আসন্ন বিমানের অবস্থান জানা যায়। বিপক্ষ-বিমানের পক্ষ-চালনার ক্ষমি অতি ক্ষীণ ধারায় কাশে বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্ত্রে স্পন্দিত হইবার বহু পূর্বেই উক্ত আলোর ধারায় তাহার অবস্থান সঠিক নির্ধারণ করা

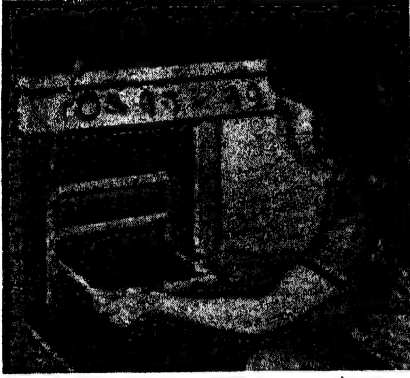


জাখানির বিমান-সন্ধান

সম্ভব হইয়াছে। এ যন্ত্রটি বিপক্ষ-গতি-প্রতিরোধে হিটলারের আজ প্রধান সহায়।

খাত-সার-রক্ষা

দীর্ঘকাল মজুত রাখা এবং বহু দূরদেশে পাঠানোর জন্য খাতাদি হইতে জলীয় ভাগ নিষ্কাশিত করিয়া সেগুলিকে ডী-হাইড্রেট করা হইতেছে। ডী-হাইড্রেট করার ফলে খাতের সারাংশ সম্পূর্ণ ভাবে যেমন রক্ষা পায়, তেমনি ছুঁ-চার বছর সে খাতকে তাজা রাখা চলে। এই রীতিতে কলম্বাস মাছ-মাংস প্রভৃতি সকল প্রকার খাতই কোঁজের জন্য বা ব্যবসায়ের জন্য যেমন সুর দেশে পাঠানো সম্ভব হইয়াছে, তেমনি খাতগুলোর এতটুকু অপচয় ঘটিতেছে না। এ রীতিতে খাতের ক্ষয় নাই, অপচয় নাই। গৃহ-যুদ্ধের বাহাতে এ রীতি অঙ্কুরিত হইয়া খাত-সার রক্ষা পায়, সে জন্য 'হার্ড-উড' জাতের কাঠ 'ডী-হাইড্রেট' করে তৈয়ারী হইয়াছে। গ্যাসের, তৈলের, কয়লার বা বৈদ্যুতিক চুইতে এই নূতন ডী-হাইড্রেট করে ব্যবহার করা চলে। তিনখানি ডী-হাই

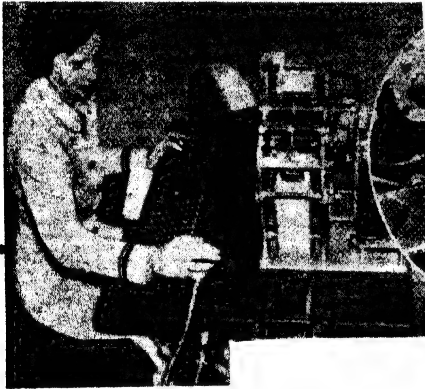


খাত্ত-সার-সঙ্কলনী যন্ত্র

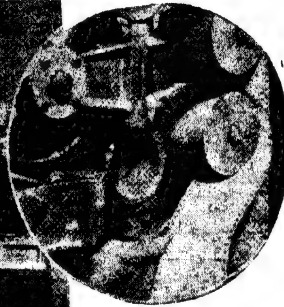
ঐ প্রকৌশলে আড়নের আঁচে বসাইতে হয়। কি ভাবে এ যন্ত্র ব্যবহার করিতে এবং খাত্তাদি তৈয়ারী ও সংরক্ষণাদি করা হয়, সে সব বিবরণ গুস্তিকাকারে যন্ত্রের সঙ্গে পাওয়া যায়।

গণিত-যন্ত্র

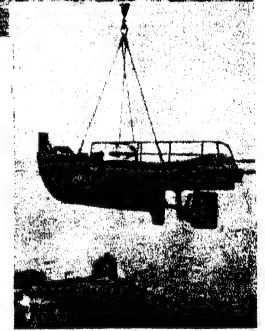
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আইকেন এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। যন্ত্রটি দেখিতে টাইপ-রাইটার যন্ত্রের মত—



অঙ্ক-কথা যন্ত্র



রক্ত রেখার অঙ্ক-লেখা



বাহন জীপ

লইয়া আসে। টাগখানি লম্বা ৪২, উচ্চতায় ১৫ ফুট; ২৫০ অশ্ব-শক্তিযুক্ত ক্রাইশলারমেরিন এঞ্জিন টাগখানিতে সংলগ্ন আছে; সেই

দৈর্ঘ্যে ৫১ ফুট, এবং উঁচুতে ৮ ফুট। যন্ত্রটিতে ৫০০ মাইল দীর্ঘ সর্ক তার সংলগ্ন আছে; তার উপর অঙ্ক যোগ করিবার ছোট ছোট ৭২টি মেশিন সংযুক্ত আছে। সংখ্যা-লেখা বোতাম টিপিলে প্রয়োজনীয়

এঞ্জিনের শক্তিতে টাগ চলে। এক জন মাত্র লোক এঞ্জিন চালাইয়া টাগে শ্রোণ-শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ। এমন শক্তিশালী ও সহজে চালু টাগ-বোট পৃথিবীতে আর নাই।

‘জাহাজ না বিড়ালছানা !

বার্থিংহাম ইসল্যু আয়রণ ওয়ার্কস কোম্পানি এক-জাহাজের ‘জল-জীপ’ তৈয়ারী করিয়াছে। এ জীপ ‘টাগ’-বোটের কাজ করিতেছে অর্থাৎ জখমী সাগর-প্লেন বা জাহাজ নিষ্ক্রিয় অচল হইলে সেগুলিকে বিড়াল যেমন টুঁটি কামড়াইয়া ঝুলাইয়া তার শাবককে বহন করে,— তেমনি ভাবে ঝুলাইয়া বহিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার করিয়া বন্দরে

“মামুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃ-স্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।”

টাকা ধার করেছেন তাঁদের

মুখেই শোনা টাকা করার
র বাধা শক্ত। 'লক্ষী চঞ্চা'
কথাতো তার প্রমাণ মেলে।

এ অপবাদটা লক্ষ্মীরই এক-
টয়া নয়। প্রেমের সেবাতো বড়

ম চঞ্চল নয়। বিবাহিত মাত্রেই আমার কথার হয়ত সার দেবেন
বং তা দেবেন ঠিক দ্বীপ অসাকাতোই। অভিজ্ঞ ধারা তাঁরা
শুধুই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, দৈবাৎ-পাওয়া প্রেম শুধু
ফন, কষ্টাঙ্কিত প্রেমও হারী হওয়ার পক্ষপাতী নয়—যেটুকু সময়
ন টিকে থাকে—তা যেন নেহাৎ অনিচ্ছায়—যুব নিয়ে বললেও ভুল
যে না। লজ্জা হাতে গুঁজে শিশুক আটকে রাখার মত।
লজ্জার ঠেকের দিকেই তার দৃষ্টি থাকে পড়ে, ওটি ফুরাবার সঙ্গেই
তার নোটিশ-না-দেওয়া অন্তর্ধান।

যার চলে যাওয়ার পথের দিকেই শুধু চোখ পড়ে থাকে, সে যখন
হঠাৎ এসে পড়ে চমকে দেওয়ার কায়দায় বাধাবন্ধীন দমকা
হাওয়ার মত, তখন কিন্তু একসঙ্গে কয়েক হাজার রজনীগন্ধা ফুটে
ওঠে—একসঙ্গে কয়েকটা কোকিল ডেকে ওঠে। ঘড়ির কাঁটাগুলো
সময়ের সব কাটা ঘরকেই অভিসার-মুহূর্ত বলে ঘোষণা করতে থাকে।
অ্যাপপয়েন্টমেন্ট, টেলিফোন, দর্শন শুভলয়ের অপেক্ষা করে মাত্র!
তরুণ-তরুণীর উচ্ছাস-উৎসাহ মানস লোকের কাহিনী সে—কাব্যের
উপাদান সে।

উচ্ছাসের মেঘ সরিয়ে আশ্রন উঁকি দিয়ে দেখা যাক লজ্জা-প্রিয়
শিশুটি কেমন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত মনে। আরও স্পষ্ট দেখুন



উপহারের উপসংহার

নায়ক কেমন শিকারী বলে নিজেকে ধরে নিয়েছে, সে নায়িকাকে
সেই যে সে দিন একপাল আশ্রয়ের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে
সিনেমার কোটরে ঢুকেছিল। একেই সে শিকারের স্তরে তুলে ধরতে
চায়।

আরও এক দিনের কথা, যে দিন সে নায়িকাকে অনেক খুঁজে বার
করে নম্বর হারানো বাড়ির টিকানা থেকে, তার পর তার মনোবাগ
টানবার অভিপ্রায়ে তাকে কত কি উপহার দিতেও সে ছাড়েনি।
সর্বদাই একটা হারাই হারাই ভাব তাকে নিশ্চিন্ত হতে দেখনি।

প্রেম যে চুপে চুপে

ক্রীশল চক্রবর্তী



রকম হলেও সব ক্ষেত্রে নয়।
মেয়েদের মনেও শিকারীর চোখ
আছে বা খুঁজে নেয় বেছে নেয়
—গড়ে নেয়—তার পর নিশ্চিন্ত
আরামে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে

পড়ে, গা ভাসিয়ে দেয়। মেয়েরা যে দড়ি দিয়ে টানে সেটা হৃদয়
ক'রে পাকানো, শক্ত, অখণ্ড দেখা যায় না; পুরুষের দড়ি কাছির মত
শক্ত ও স্থূল, টানতে হ'লে তার ভাবটাও বইতে হয়, চোখেও পড়ে
সহজে। মেয়েরা তাই হৃদয়তার আড়ালে স্ত্রীত্ব ধরে আছে কি না
বোঝা যায় না, অবজ্ঞা না ধরার
ভাবই তারা করে বেশী।

দাম্পত্য প্রেমে এমন দেখা
যায়, জ্বীই বাঁচিয়ে রাখে প্রেমকে
জমে হিম হয়ে যাওয়া থেকে।
এ ঐ হৃদয় হুতালি আকর্ষণেরই
গুণে। তার পক্ষে অভিনয় করা
সহজ, ছলা কলা তাকেই সাজে
তাই। স্বামীকে সে ধাক্কা দিয়ে
জাগিয়ে দিতে পারে আবার নাড়া
দিয়ে সচেতন করতেও পারে
সময় বুঝে আবার সরে গিয়ে
রহস্তের অবগুণ্ঠন টেনে নিতে
পারে। সত্যি কথা—তার এগিয়ে
আসা ও পেছিয়ে যাওয়া, তার
বাঁকানো তুলেই পদ। বদলান এক
অজুত ব্যাপার। তার এগিয়ে আসাকে সংবত করে তার পেছিয়ে
যাওয়া। তার দাক্ষিণ্যের হুতালিতেই কার্পণ্যের কষাকষি প্রেমকে
অটুট করে। ধরা দিতে এসে অধরা হয়ে পড়া শুধু অধর সম্পর্কেই নয়
অন্ত বিবয়েও রোমাঞ্চকর, সন্দেহ
নেই।

বলা বাহুল্য, নায়িকাজেদে
যে এ রীতির তারতম্য ঘটে তা
সহজেই ধরা যায়। অতি লক্ষ্যরী
মেয়ের কাহিনী সাধারণী বা
অরূপার থেকে স্বতন্ত্র। স্বন্দরীদের
মধ্যেও যে শ্রেণী-ভাগ বহু ভাবেই
করা হয় তাতেও বৈচিত্র্যের সন্ধান
পাওয়া যাবে। যে স্বন্দরী বহু
জনের দৃষ্টিপথে অনিবার্য ভাবে
ফুটে ওঠে তার কাছে অবাচিত
ভাবেই এসে পড়ে হাজার প্রাণ-
রীর বা প্রাণবানীর অজ্ঞান সম্ভাবন।

তাকে কেন্দ্র করে বহু দূর-দূরান্ত অবধি কলগঞ্জন চলে—না চাইতেই
তার জোটে সব—হাত না বাড়াতেই তার কনপুট পূর্ণ
হয়ে যায়। তাই সে ব্যর্থ করে বসে বেশী সার্থক করে তার
অনেক কম।



হুতালি টান



কার্পণ্যের কষাকষি

সাধারণী বা অরুণাদের বেলা কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে। তাদের প্রয়োজন হয়। নিজের সম্বন্ধে ছোট খাণ্ডা বেশ সজাগ। তত তাদের প্রয়োজন হয় অস্ত্রাস্ত্র গুণপনার চর্চা করতে। আরে দিকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হয় কিছু বেশী। এই জন্ত

হিতোপদেশ
অতি সুন্দরী
জী হিসাবে
নীয় নয়। এটা
রী দে র প্রতি
টার বা পক্ষ-
ত নয়, আঙ্ক-
দর্শ্যবোধ তা কে
ত সচেতন রাখে
। জন্তে তার পক্ষে
। হওয়া সম্ভব হয়
। অবশ্য এর
তিক্রম যে নেই
। নয়।



এপ্রিল হওয়ার নমুনা

সাধারণ ভাবে
দতে গেলে প্রেমের

পাপারে স্বকীয় পরকীর যাই হোক নারীর অতি খোলাখুলি হওয়া
লে না। তার রহস্য-লোকের সবটুকু পুরুষের কাছে উন্মুক্ত করা
কিন্তু সম্ভব নয়। নিজেকে পুরানো হ'তে দেওয়া আর নিজেকে
প্রম-সঙ্গ থেকে নির্বাসিত করা একই কথা। তার অন্তর্ভুক্ত গভীর
। ক্ষম ও সাধনা গোপনেই যেন থাকে যা থেকে মিতব্যয়ীর মত কিছু
কছু ভাবিয়ে সে খরচ করতে পারে।

মেলা-মেসার প্রথম পদক্ষেপেই পুরুষের উল্লস কামনা হয় নারীকে
চিনে নেবার। আদম থেকেই ঈভের উৎপত্তি হলেও আদমের
চিরন্তন প্রয়াস ঈভকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখে নিতে।
নারীকে চেনা জানার এই কৌতুহল প্রণয় ব্যাপারে একটি মূলধন।
তার দৃষ্টিকে সে বিশ্লেষণ করতে চায় তার হাসিটিকে সে কালো
পাখরে ঘবে পরখ করে। আবার এমন পুরুষ আছে নারীকে যে
তার সংসারে ডালা কুলোর মত একটি জীব বলে মনে করে।
এ রকম লোককে নিয়েই হয় মেয়েদের মুষ্টি-তাদের কাছে
মেয়েদের অস্ত্র পন্থার শরণ নিতে হবে, তার পর ধীরে তার গজজীবনে
ছন্দ সৃষ্টি করতে হবে। আনি জানি, বিবাহিত জীবনে এ দৃষ্টান্ত
বিরল নয়।

নরনারীর অন্তর্নিহিত এই রহস্যলোক নিয়েই প্রণয়ের আয়ু-
নির্দেশ। 'বিবাহ প্রেমের সমাপ্তি' কথাটি মিথ্যা নয় এই দিক দিয়েই।
একটি অপূর্ণ সুন্দরী তরুণীর কাহিনী জানি। প্রাক-বিবাহ প্রণয়ের
কথাই বলছি। ছেলেকে তার প্রিয়তমার চিত্ত জয় করেছিল ঠিকই;
কিন্তু তার অশান্ত উচ্ছ্বাস আর প্রগলভ প্রণয় নিবেদন মেয়েটিকে
বেশ উদ্ভ্রান্ত করে তুলতো। সে সময়ে অসময়ে জানিয়ে দিত কত
ভালবাসে ডাকে। সে বলে যায়...তোমায় আমি কত ভালবাসি
...তোমার জীবন তমি না

তোমার সঙ্গ চাই তোমায় চাই। তার পর আরও গাঢ় হয়ে বলে
'তোমায় আমি সত্যিই ভালবাসি'।

'আঃ, তোমার সেই একঘেয়ে কথা'। কত আর শুনবো? মেয়েটি বিরক্ত না হয়ে পারে না। শেষে এক দিন তার ঘনিষ্ঠা
এক সন্ধিকে সে সমস্তার কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করে বসলো।
বলতে পারিস ভাই, এত ভালবাসা থেকে ওকে কি ক'রে থামান যায়
—ক'দিন থরে আমি ত আর শুনতে পারি না?

'এ আর কি?' সখি গভীর ভাবে বলে, খুব সোজা কাজ এটা,
তুই ওকে বিষে ক'রে ফেল, আর কিছু করতে হবে না।

সখিটি বেশ অভিভূত এবং বিবাহিতা বলেই অবশ্য মনে হয়।
বিবাহের নামে এটি তুর্নাম হ'লেও—কথাটা অমূলক নয়।



সেক্সপিয়ার একটা শ্লোক বলেছেন,

Men are April when they woo
December when they wed.

বিবাহিত জীবনের পরিণতি ভেবে শিউরে ওঠার প্রয়োজন নেই।

কোনও কথাই নিছক সত্যি হ'তে পারে না। আমি এমন
লোক দেখিছি, চল্লিশোর্ধ্বেও যথেষ্ট সে নববধূর সম্ভাষণে সম্ভাবিত
করে, অথচ তা বেমানান নয়, আন্তরিকতার রসপ্রোতে সম্পূর্ণ
অভিযুক্ত।

আমাদের দেশের বিধানে তাই মাছুষকে ডিসেম্বর হতেও বলেনি
আর এপ্রিল হ'তেও বলেনি—সব সময়েই আগষ্ট থাকলেই বোধ হয়
ভাল হয় (?)। মেয়েদের দৃষ্টিতে অনেক সময় তাকে মনে হয়েছে
সে যেন বাড়ীর বাগান থেকে ডালা ভর্তি করে তুলে আনা সজ্জি
কিন্তু বেগুন পুরুষ প্রয়োজন হিসেবে মেয়েদের তুলে আনতে চায়
—তার মধ্যে বেছে নিতে চায়, দরকারের সীমা ছাড়িয়ে গেলে ফেল
দিতেও কুণ্ঠিত নয়। সৌভাগ্য বলতে হবে এরকম পুরুষের সংখ্যা
বেশী নয়। তবে অল্প দিকও আছে যে দিক দিয়ে তাকালে আর
একটা জিনিষ চোখে পড়ে।

কুল অনেক রকম আছে তার মধ্যে সজনে কুলও একটা। সজনে
ফুলের প্রয়োজন শুধু আমাদের পাক-ঘরে, কিন্তু বেল বা গোলাপের
প্রয়োজন অস্ত্র। তারা এসে হাজির হয় আমাদের পরিশ্রুটি করে
সাজানো ডুই-কসে। মাছুষের পাক-ঘর বা ডুই-কসে কোনটাকেই
বান দেওয়া সম্ভব নয়। পাক-ঘরে বেশী থাকা মানে অজীর্ণতার

গায়ে চাপানো। এ-হেন হুই আসন্ন বিপদের ধাক্কা বাঁচিয়েই তাকে চলেতে হয়—পড়ে বাঁধরা থেকে সামলে সঙ্গ একগাছি দড়ির ওপর দিয়ে সার্কাস-গার্ল-এর চলা-বিশেষ। পতনোন্মুখ হওয়ার মুখেই তার বা কিছু কসরৎ। নমুনাও হুঁত নয়—যথা, এক গোলাপজাতীয় নববধূ ডুইং-কমেই অধিষ্ঠিতা ছিল এক মিন। ফুলের vase-এ না হলেও শঙ্কসজ্জিতে ভাসমান অবস্থায়। সেতারধারিণী খিনিখিনি-নামিনী সে এক মোহিনী মূর্তি তার। সন্ধ্যার প্রায়াক্কার জমাট হয়ে রাত্রির অবগুষ্ঠনে পরিণত হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা তখনও ঠিক সাড়ে নটার ঘরে যায়নি। সারা দিনের কর্মস্বাস্থ দেহটি টেনে যান-বাহনের সহস্র ধাক্কা সামলে স্বামিদেবতা ততক্ষণে হাজির হয়েছে ঘরে। বনংকারিণী দ্বার দিকে চোখ মেলেই তার ভাল যে লাগল না তা নয়। কিন্তু তার পাকযন্ত্রের অসহ উত্তাপ অল্পভব করলো বেশী। তাই প্রশংসা দিয়ে পূর্ণচ্ছদ টানবার চেষ্টা সে করলো কিন্তু ফল হলো উল্টো। সারগামের সাধাসামি বন বন করে উঠলো তার কাণে।

কি স্বন্দর বাজাও যে তুমি বেলু!

শোন না, আরও আছে, নতুন আর একটা সারগাম...

—সারগাম বেশী ভালো কি? আলাপের পর ও আর জমে না।

—কে বলে? এই শোনো না...

সারগাম সুরর আগেই ঘড়ির বনংকার শোনা গেল! দশটা বাজলো। আরম্ভের আগে আরম্ভ আছে কিন্তু আরম্ভের শেষ আছে কি কে জানে? স্বামিপ্রবরের পাকহুলীর শেষ হয়ত আছে।

—কেমন লাগে?

—সুর আমার ভালই লাগে—মাত্র সাতটা পর্যায় এত সুর?

—নীতীশ বাবু বলেছেন, সুর পুরোপুরি জানলে সাতটাকে টেনে সাতশ' করা যায়।

—হ্যাঁ বল কি, অত টানটানি কি ভাল হবে? হাজার হোক কোমল জিনিষ ত।

—সেখ, বেরসিকের মত কথা বলছো। সুর টানলে কি ছিঁড়ে? মীড়ে মীড়ে রস...রসিক হ'লে বুঝতে সুরের কাছে কিছু লাগে না। সুরে ভর দিয়ে ভরপুর হয়ে ইচ্ছে হয় পাখা মেলে উড়ে যাই—গানের আকাশে পাড়ি দিই—

—কিন্তু, বেলু, আমার যে কিসে পেয়েছে, আমার খাবারটা দিয়ে যেও।

রবীন্দ্রনাথের এক নাট্যিকাকে ফুর্ক হ'তে দেখেছি—স্বামীর ঐচরণকমলের মাপ নিয়েই যেন বিধাতা তৈরী করেছেন তাঁদের—স্বামীর আবার কোথায় একটু জাঁট সহিতে পারেন না...। মেয়েরা তাই ত ফেলে বদলে অনেক কিছু নতুন মাছুরের সাহচর্য্য এসে। নতুন মাছুরের সঙ্গ পেয়ে নতুন করে ঢালাই করে নিতে হয় নিজেকে। অবশ্য ভান্সাগড়াটা যে ছ'পক্ষেরই তা আর বলতে হবে না।

তবে এমন মেয়ে দেখা যায়, যারা নিজস্বের ঢালাই করার থেকে অপর পক্ষকে গড়ে পিটে নিতেই ব্যস্ত। বাস্তবতা মন্দ নয়, কেন না, নিজেকে ঢেলে সাজার থেকে অন্তকে পেটাই করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেটোয়া করে নেওয়া সহজ কাজ বৈ কি!

মেয়েরা জানে এ রহস্ত বরা জানাও উচিত। পুরুষকে বশ না করলেও করে টানবার হাত তাদের হাত আছে। অনেক সময় স্বামন

তার নিজের শক্তি সবকে নিশ্চিত থাকে এবং অলঙ্কার যজ্ঞ বা যপি দিয়ে কবাকবি করে? সেটি যে সহজে ছিঁড়ে না এ রকম ধারণা থাকলে মেয়েদের হালচালই বদলে যায়। আত্মনির্ভরতা বেড়ে যায় অন্ততঃ আত্ম পারসেট। অর্থাৎ পাকা হাছ-শিকারীর মত দ্বিধা ধরে শিকারের দিকে অবিমিশ্র তাকিল্যে ভাব দেখাতে পারে।



গড়ে পিটে পেটোয়া

একটি পাকা পুঁচি সেয়ে কাতলাকে অবলীলাক্রমে খেলিয়ে তোলার কার্য্য ও কসরৎ দেখানো 'খুবই সহজ। সে যে শিকারকে ডাকার তুলতে ব্যস্ত এ রকম সন্দেহ যেন শিকারের মনে না জাগতে পারে সে দিকে শিকারীর সাবধান-দৃষ্টি যেন থাকে। এইখানেই মুন্সিল, মেয়েদের অর্ধেক মোহ আর আকর্ষণ ছিপের স্ততার সঙ্গেই ছিঁড়ে যাবে তাহলে।

কাতলা মাছের উল্লেখ করেছি এমনিই বলতে হবে। তবে এই প্রসঙ্গে ঘটাও বলে রাখছি যে রুই-জাতীয় দান্তিক মস্তকেও বঁড়শিবিদ্ধ হ'তে দেখা বিচিত্র নয়। রূপ বর্ণিত স্তম্ভ দেহ নিয়ে যারা ভুক তুলে চলে এ-হেন পুরুষ যারা পৌরুষের বৈজয়ন্তী উঁচিয়ে পা ফেলে, কৌলীন্তের মূলধন আভিজাত্যের মালমসলা বান্দের পকেটে পকেটে সে রকম রুই-শ্রেণীকেও দেখা গেছে অবিশ্রাম পুরুষের এক প্রান্ত থেকে অল্প প্রান্ত অধিক দৌড়ালোড়ি করতে। একে জলকলি



হুইল ও স্ততার খেলা

বলেই তারা ধরে নেয়—এক কি ভালই যে লাগে তাদের নিজেকে একটি বোকা বেচারী পুতপুতে মাছের মত কল্পনা করে নিতে। এতে তার হলনা লেশমাত্র নেই, মাছের আচার-ব্যবহার যে সজ্জিই ভাল নয়—এ স্ততোলি খেলাটিই লাগে সব চেয়ে ভাল। আর ভাল লাগে ত্রিপারাবিশেষ। কিন্তু আরও যে স্তত দেখা থাকে—তব

আর তুমিই তার হৃদয়ে পুড়তে হয় নিছক মন্ত্রভুক্ত প্রেরণা বশে... ছি, এ কল্পনা শুধু অবাস্তব নয় অজ্ঞাতও। হিশের হইলে যে শুটানো স্রুতোর প্রচুর ঠেক এবং সেই স্রুতো ছাড়া ও খোলা হুঁটাই সমান সহজ—খানিকটা খোলা স্রুতোর lease নিয়ে যখন মন্ত্রপ্রবর খেলতে

থাকে সে তখন ঐ সত্য বুঝবে কি করে? ডাকার তোলার প্রথম চোঁতোই তাই দেখা গেছে অকৃত্রিম প্রেম ব্যাপারেও ভাটা পড়তে। মাড়েরও চোখ খুঁসে গেছে এবং এ-হেন সঙ্গীন অবস্থাতেই স্রুতো হেঁড়ার বহু কাহিনীও মন্ত্রপূরণের পাতার পাতার ছাপা আছে।

হিন্দু কোডের প্রতিবাদ

লেডি ননীবালা ব্রহ্মচারী

বিষয়াধিকারে মেয়েদের লাভ কোথায়? পিতা কতটুকু বধাসাধা শিক্ষা দান করেন। সে শিক্ষা আজকাল ছেলোদের মত সর্বোচ্চ কালেক্সিক শিক্ষার পরিণত হইয়াছে, ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। হিন্দু সমাজ বলিতে যে বাপক বিশাল সমাজকে নির্দেশ করিয়া এই আইন করা হইতেছে, তাহার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত, ইংরেজী-ভাবাপন্ন এবং আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপেই বৈদেশিক সমাজের অমুরূপ চালচলনে চলিতে অভ্যস্ত ব্রাহ্মসমাজ আর্যসমাজ প্রভৃতির প্রভাব কাউন্সিল প্রভৃতিতে সমধিক হইলেও সংখ্যায় উহার অত্যন্ত। হিন্দু সমাজের পরিবারগত ব্যবস্থা বিষয়াধিকারের সঙ্গে কতখানি বিজড়িত, তাহা তাঁহার কল্পনা করিতেও সমর্থ নহেন। শ্রাদ্ধ, পিণ্ড, গৃহসেবতার নিত্যসেবা, দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি কুলাচারের প্রতিপালন তাঁহাদের গৃহে থাকে না; বার মাসের লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতির দায়ভার খরচপত্র অজ্ঞাত। মেয়ের বিয়ের খরচ তাঁদের ইচ্ছামত করিলেও মেয়েকে বস্ত্রালঙ্কার, জামাইকে যত্ন। কিছু ও পাট দিয়াই সারা চলে। বিবাহের বিপুল খরচ, ফুলশয্যার তত্ত্ব, নমস্কারীর অসংখ্য বস্ত্রাদি, ননদতোষণ, সম্বাভুট্টি এ সব জানেনও না। তাঁদের সম্পর্ক বর-কনের মধ্যেই। বার মাসের তের পার্করণের পার্কণী ভায়ে ভায়ে কখন কটুশবাড়ী পাঠাইতে হয় না; কস্তার সাথে সম্বানের জন্মে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে ব্যয় করিতে হয় না। কস্তার বিবাহ প্রকৃত হিন্দু সমাজে পিতার সর্বাপেক্ষা বড় দায়। বিষয়াধিকার মেয়েকে দিলেই যে বিবাহে ব্যয় আপনি উঠিয়া বাইবে তাহা মনে করা একান্ত বাতুলতা। কেন বাইবে? কোন্ বরের বাপ বা বর নিরলঙ্কারা কপর্দকশূন্য কস্তাকে বধু করিতে ছুটিয়া আসিবেন? "পণ" বলিতে যে নগদ টাকাটা দিতে হয়, যদি ধরা যায় বড়লোকের মেয়েদের জন্ম সেইটুকুই বাদ দিতে কোন কোন ব্যক্তি রাজী হইলেন, বাকিদের? বড়মামুর এ দেশে করটি? তাঁদের দিকেই আইনকর্তা ও গৃহীতার উদ্দেশ্যে চাহিয়া আছেন। এ দেশে মামুদের আয় গড়পড়তার দৈনিক ১/৩, সে কথা সম্পূর্ণই ভুলিয়াছেন। কিন্তু অসংখ্য দরিদ্র ও অর্ধ-দরিদ্রদের ঘরে কি বিপ্লব বাধিবে সে কথা কেন কেহ ভাবিয়া দেখেন না? শিক্ষার দ্বারা সমাজকে উত্তোলন এবং হিংসা-বিবেক বিবর্তিত না করিতে পারিলে শুধু একটা বিপ্লবী আইন করিলেই হয় না, মেয়েদের ইহাতে কোন দিক দিয়াই লাভ নাই। বাপের বিষয় পাইবে, স্বামী-শুভ্রের বিষয় ননদকে কাটিয়া দিতে হইবে, দুই স্বামীর টুকরা খুঁচরা হইয়া সংসার উৎখাত হইবে। জাইরে ভাইরে পৃথক হওয়া ও কটুশ আনিয়া ঘরে চুকান এমন কল্পনা অনভিজ্ঞতার একটি প্রধানতম দৃষ্টান্ত। বোধ পরিবার নাই ধারা বলেন, এই কলিকাতা সহরেই কয়েকটি মাত্র রাস্তায়

ব্রাহ্ম, বিলাতী-ভাবাপন্ন হিন্দু এঁদের মধ্যে বড়লোকদের ভিত্তর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দেখিয়াই তাহাকে নজীর করিবেন না, সে সংখ্যা অত্যন্ত। পরীগ্রামে বোধ পরিবারের অভাব আর্দ্র নাই। মেয়েকে বিষয়াংশ দেওয়ান জুলুম ত বটেই, মেয়ের উপরই সেই জুলুম বেশী করিয়া পড়িবে।

ভাই-বোনে পিতৃধনের মত মাতৃধনের বখরাও হইবে। মাতার যৌতুক ধন কেবল কুমারী কস্তা পাইত। এই প্রাচীন প্রথা বড় মন্দ ছিল? নূতনের পক্ষপাতীদের দ্রুদগতি কোথায়? নূতন হইলেই হইল? অর্থোতুক ধন কুমারী কস্তা ও ভাইদের মধ্যে সমান অংশে বিভাগ হইত। এখন বিধবা কুমারী, সম্বা কস্তার দৌহিত্রী, পৌত্রী দৌহিত্র, পৌত্র পাইবে। ছেলোও বোনের অর্ধেক পাইবে। কেন পাইবে? বিধবার বাপের কাছে বিবাহের ব্যয় মিলিয়াছে, তাহার অংশ জীবন আছে, স্বামীর সম্পত্তিও ছেলোদের সঙ্গে সমান অথবা নিঃসন্তান হইলে জীবনব্যয় সবই মিলিয়াছে, শুভ্র বা দাদা-শুভ্রের (যদি স্বামী পূর্বে মৃত হয়) স্বামীর প্রাপ্য সম্পত্তির যে সব আইন হইয়াছিল যদি পাইলেন, তবে মাতৃ বা পিতৃধনে ভাগ বসান কেন? অনাহারীকে গুরু আহার্য দেওয়ার জন্তই কি এ বিধান? পৌত্রীরূপে, দৌহিত্রীরূপে, ভাগিনেয়ীরূপে, কস্তারূপে পত্নীরূপে পুত্র-বধুরূপে সর্বত্র হইতে পাইয়া তাঁহারই কি সমাজের প্রথম শক্তি হইবেন? পুরুষরা তাঁহাদের প্রতিপাল্য রহিবেন?

বিষয়-সম্পত্তিও কি তাঁরা চালাইবেন? উইল করা প্রোবোটে নেওয়া, পাটিসন স্ট্রাট করা, কলহ এবং দাঙ্গা এ সকলের কথা কল্পনাকুশলীরা এক বার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সেরাজিনী নাইডু রাজনীতি বুঝেন, তাঁর হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিশেষ কোন পরিচয় নাই। তিনি "মেয়েরা নিজের ভাল নিজেরাই বাখে না" মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া তাহাই ধরিয়া লইতে হইবে? মেয়েদের পূর্ণ অমঙ্গলের ছবি আমরা ঐ আইনটির প্রতি জিনিবেই দেখিতে পাইতেছি। হিন্দু সমাজ একটুও অপরিবর্তিত অচল্যতন নয়, কোন দিন ছিলও না, প্রয়োজন মত কালই ধীরে ধীরে তাহা সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। সংস্কার দেশকালপাত্র হিসাবে আপনা হইতেই জন্মায়, আইনের বন্ধন বহু কোটিকে এক সঙ্গে বন্ধ করে। যুষ্টিমের ধনী ও কোটি কোটি দরিদ্রের বাড়ি এক দায় চাপান ইহা নৈসর্গিক বিধান নয়। ধনীপুশিতা কস্তাকে বখোঁ দিয়া বান। অনিচ্ছুক শিশু হঠাৎ হার্টফেল না করিলে উইল করিয়া বাহা ইচ্ছা তাহাই শুধু দিবেন। উইলের মত সম্পত্তি বাদের নাই, বিপার তারাই হইবে। সমাজনীতি, লোকাচার তাহাই বেশী মানে, অল্প কস্তা রাখিতে তাহাই ভর পার, তাহদেরই ঘটা বাটা ধালা লইয়া, জীর্ণ গৃহাংশ, কুটার লইয়া টানাটানি

ৱ ও কুমারীর প্রাণা আইনবধ নাকচ করিয়া বহু উত্তরাধিকার এই জটিল অধিকার দেওয়ার? দুই পুরুষ বাদে কেহই আইনের কবলে অবস্থাপন্ন থাকিবে না। হিন্দুর বৌধ পরিবার কারই ভাঙ্গিবে। উত্তরাধিকারী তো আর শুধু ভাই-বোনই প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সেনা-পাওনার আইনবদ্ধ সম্পর্ক ব, অথচ মায়ের অন্তর এত উদার নয়, নিজ জন্মাজ্জিত বা জিজ্জিত ধন-সম্পত্তি প্রত্যেক পরিজনের মধ্যে বিতরিত করা। আর গৃহশোভা-সৌকুমার্যের জন্ত মায়ের নানা দেশ হইতে সব্বদে ৫ কি আহার্য করে, পুত্র-পৌত্রাদি ভোগ করে এই ইচ্ছায়। লম্বান ওরাক্ষ আইনে বিষয় এক স্থানে আবদ্ধ করিতে পারে, ক্ষুর সে সুরোগ নাই, তাহাকে ঋণ-বিধগুরুপে দরিদ্রতার হইতেই হবে। বড়বরের প্রবীণা শিক্ষিতা মহিলারা এসব দিক না খিয়া শুধু “মেয়েরা পাইতেছে” এই আনন্দেই উন্নতি হন কেমন রিয়া?

জাপান জাতীয় উন্নতিকল্পে সমস্ত ধন রাজার হস্তে সমর্পণ দিয়াছিল, কমানিষ্ঠ রাশিয়া সমস্ত ধন-ভার বহুস্তে লইয়া ব্যবসায়-পরিজ্ঞা হইতে অর্থকরী ব্যাপার সমুদয় সম্পন্ন করিয়া জাতিকে কাষায় তুলিয়াছে। একত্রিত অর্থরাশিই না সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সহায়তা করিতে সমর্থ। এ দেশে নিজের ধন্য স্বজাতি রাজা নাই, ষ্টেট নাই, থাকিলে তার আশ্রয়ে সবই সমর্পণ করিবার সময় আসিয়াছে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া-যায় না, যতটা যায় তা ষ্টেট দিতে পারে। পৈতৃক বিষয় কাড়াকাড়ি করিয়া কোন অধিকারই মেলে না। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, অবৈতনিক বহু বিতালয়, আশ্রম, নারী-রক্ষা সমিতি প্রভৃতি বাহ্যতে গবর্নমেন্ট খুলিয়া দেন সে জ্ঞাত আরও চেষ্টা করা, এ সব কি বিষয়াদিকার আইনের চেয়ে ঢের আগেকার কাজ নয়? মেয়েরা আর অবলা বা অসহায় নাই, প্রত্যেক মেয়ে যদি শিক্ষালাভ করে, উপার্জন-শক্তি ধরে, শিল্পোন্নতি কার্যে যোগ দেয়, তবে তাদের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়। ধোপাজ্জিত ধনে সমান সহকারেই জীবন-যাপন সংসার-পালন করতে পারে। স্বামিরত দ্বীকে পালন করিবার কঠোর আইন আছে। তবে কেন ব্যতিক্রম ঘটে? আইনের অভাবেই যত কিছু মন্দ কাজ হয় না, ধর্মজ্ঞানের অভাবেই হয়। আইন গড়া সোজা, প্রয়োগ করানই শক্ত। এ আইন শুধু অশান্ত

সমাজকে অশান্ততর করবে, ভাল করতে পারবে না। রক্ষণশীলতা সকল সময়েই মন্দ নয়।

দ্বিতীয় কথা, একপত্নীত্ব ও ডাইভোর্স। এ যুগে বহুবিবাহ কেহই সমর্থন করে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তায় মায়ের এখন দায়ভার এড়াতেই চায়, জড়াতে ইচ্ছা করে না। এক বিবাহেই শিক্ষিত ছেলেরা ভাবগুরুপে নারাজ। যদি কোন কারণে কেউ তা' করেই বসে, তাহলে তার জন্তে পূর্ব-দ্বীকে ডাইভোর্স করে ভাসাতে হবে, এর জন্ত আইন করা অর্থকরী। হয়ত পূর্বার্থে প্রথম দ্বী নিজেই স্বামীর বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক নয়, হয়ত নিজে কল্যাণে বলে একপুত্র ব্যবস্থায় অমুমোদন করে। এই আইন প্রথমা পত্নীকে বক্ষ্যাত্তর জন্ত, দুরারোগ্য কারণের জন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদে ফেলে পথে বার করবার ব্যবস্থা করবে। এ পক্ষেও মেয়েদেরই সমূহ ক্ষতি। বিশেষ সমাজের বা বিশেষ প্রকৃতির রূপবতী ধনবতী তরুণীদের ডাইভোর্সের পর বর ছুটিতে পারে, কিন্তু ধারা তা নয়, তাদের? ডাইনের সঙ্গে মনোমালিঙ্গ করলে সেখানেও স্থান হবে না। হিন্দু সমাজ বাল-বিধবাদের বিয়ে দিতে পারেনি, পুরুষায়ুকমিক সঙ্কার সহজে যায় না। বলা হয়, ডাইভোর্স না থাকায় কেউ কেউ মুসলমান হয়ে অস্ত্র বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ক'জন কুঠগ্রস্ত স্বামীর দ্বী? ক'জন নিকৃষ্টের? ক'জন পুরুষবহীনের? যে প্রবৃত্তি বহুর দিকে আকর্ষণ করে, তার পথ মুক্ত করলে আমেরিকান বা রাশিয়ান ডাইভোর্স বিবিই নেওয়া উচিত। এ দেশে দ্বীরা সহজে আদালতে দাঁড়াতে না, দাঁড়ালে খোরপাষের জন্তই দাঁড়াতে। তারা স্পষ্টই বলেন, নালিশ করে আদায় করা কি সোজা? হ'মাস ছ'মাস পরে খোরাকী বন্ধ করে, কের হায়রাগী; তার চাইতে কিছু শিখে খেতে থাকো। কেউ বলেন, আইন আদালত তো অমনি হয় না, কে ও-সব করে দেবে? ডাইভোর্সের ব্যাপার ঢের বেশী কঠিন, বখাও দ্বঃস্থারা সে সব পারবেন? সুরোগ নেবে পুরুষেই। বিধবারা সে কালে বিবাহ করে নাই, তার পশ্চাতে ছিল পুরাতন কুঠি, ধর্ম, শিক্ষা। আজ তার কতটুকু বাকি আছে? যাও ছিল, ডাইভোর্স আইন তার প্রায় সবটাই নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মায়ের চেয়ে তার আদর্শই বড়। যে জাতি তার বহু সহস্র বর্ষের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি-মূল উৎখাত করিয়া বিসর্জন দিতে পারে, তার পতন অনিবার্য।

ভগ্ন-বীণা

শ্রীদেবপ্রসন্ন যুথোপাধ্যায়

ভেঙে গেছে বীণ
তবু এ বীণার

ছিঁড়ে গেছে তার,
ক্ষীণ স্বকার,

কেন তুলে হাহাকার?

কেন আঁখিকোণে
অজ্ঞ-বাদল

শুধু অকারণে
বিবহ-বেদনে

বরে বরে পড়ে যায়?

সুখের স্বপন,
গেছে যদি থাক

দোহাগ ভতন!
আঁখি-বিমোহন,

হাসি সাথে থাক মায়,

প্রেম যদি যায়
ছায়া-বিনিময়

কিবা রয়ে যায়।
তুলিবার নয়,

কায় বিনে মিছে ছায়া।

ফৌজ-পালন

কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের পক্ষে যে বিরাট অকৌহিলীর সমাবেশ হইয়াছিল, সে অকৌহিলীর খাত-বাবস্থার উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণকে তথাকথিত যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি কাব্য-কথা বলিয়া উড়াইয়া দেন, এবারকার এ যুদ্ধে এক-একটি প্রদেশে যে ফৌজ জড়ো হইতেছে, তাদের খাতের আয়োজন দেখিলে তাঁরা বুঝিতে পারিবেন, পুরাণের সে-বর্ণনা অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কারণ, যুদ্ধ জয় করিতে হইলে অস্ত্রশস্ত্রাদির যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সেই অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োগে স্ত্রনিপুণ অকৌহিলীকে স্ত্র সর্বল রাখিতে তাদের জন্ত স্বাভাবিক খাত-পানীয়েই ব্যবস্থা। গত বৎসর মাঘ-সংখ্যা মাসিক বস্ত্রমতীতে আমরা ফৌজ-ভাণ্ডারীর বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। ফৌজের খাত-পানীয়েই সর্বত্র মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র যে অমানুষিক আয়োজন করিয়াছে, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। ট্যাক কামান বমার বৌমার জোগানোর মতই খাত-পানীয় জোগানোর আয়োজনও বিরাট এবং বিপুল। এ খাত-পানীয় শুধু মার্কিং হইতে ভারতগত-মার্কিং-ফৌজের জন্তই জোগান যাইতেছে না—ইজারা-খণ রীতিতে মিত্রপক্ষীয় অকৌহিলীর জন্তও সর্বত্র পাঠানো হইতেছে। গত বৎসর সমগ্র ফৌজের জন্ত মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র শুধু আনু জোগাইয়াছিল ৩৭৬০০০০০ সঁইট্রিশ কোটি বাট লক্ষ মণ। অর্থাৎ এই আনু পাহাড় একত্র জড়ো করিলে সমগ্র জিত্রালটার বোপটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে! ১১৪২ খুঠাঙ্গে—যুদ্ধের তখন সব সূচনা বলিলে চলে—ডিম চালান গিয়াছিল পঞ্চাশ কোটি! তাছাড়া গম মাংস দুধ—এ সবের তো কথাই নাই।

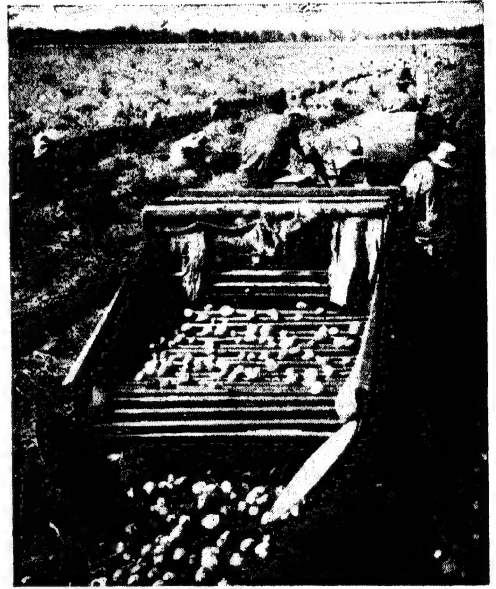
ব্রিটিশ ফুড মিশনের অধ্যক্ষ ব্রাণ্ড ওয়াশিংটনে আছেন। তিনি বলেন—১১৪২ খুঠাঙ্গে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র যে খাত জোগাইয়াছে, তার এক-চতুর্থাংশ মাত্র বুটেনে পাওয়া যায়! ডেনমার্ক হলান্ড বেলজিয়াম হইতে বুটেনে প্রচুর মাংস ডিম এবং জমাত দুগ্ধ চালান যাইত; এ সব প্রদেশ জাৰ্মানির করতলগত হওয়ার পর এচালান একেবারে বন্ধ হয়; কাজেই আমেরিকার সাহায্য না পাইলে সব অনাহারে মরিতে হইত।

যে-সব খাত পাঠাইতে জাহাজে অল্প জায়গা লাগে, এমন খাতই পাঠানো হয়—অর্থাৎ মাংস, ডিম, শুকনো বা জমাত দুধ, চাঁজ, চর্বি, শুক ফল ও শুক-মাংস প্রভৃতি।

সাধারণতঃ জাহাজে এখন চালান যাইতেছে ৬০০০ পিপা ডিম,— অর্থাৎ পরিমাণে ২২১১৩৭ মূগাঁর ডিম। ৬০০০ পিপা শুকীকৃত দুগ্ধ—২৭৮০ গাভীর এক বছরের দুধ। ২০০০০ বাজ চাঁজ—এক-বছরে ৩০০৭ গাভীর দুগ্ধে এ-পরিমাণ চাঁজ তৈয়ারী হয়। ৬০৬১ বস্তা গম অর্থাৎ ৮৩৮ একর পরিমিত জমিতে যে-গম জন্মায়, তাই। ১৬১১১ টিনে-ভরা তরী-তরকারী প্রভৃতি—অর্থাৎ টোমাটো, কলাই-গুটি এবং বীনের পাহাড়। ইহার উপর আরো কত কি আছে।

রাশিয়া, আফ্রিকা, ইতালী, ভারতবর্ষ—সর্বত্র এ সব জিনিষ চালান যাইতেছে। তাছাড়া জিত্রালটার, কলম্বো, ক্রী-টাউন, ডাকইন প্রভৃতি প্রদেশে যে সব ফৌজ গিয়াছে, তারাও এই মার্কিং খাত গ্রহণ করিতেছে। রাশিয়ায় মুরমানস্ক হইতে ককেশাস পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশের সেনারা আজ মার্কিং খাত খুঁইয়া যুদ্ধ করিতেছে। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বন্দরের সমস্ত মাল-গুদামেই এই সব

এত মাল জোগান দিলেও দেশের লোক না খাইয়া মরিতেছে, তা নয়! স্বাধীন দেশ—সামরিক এবং বেসামরিক—সকল অধিবাসীর প্রাণের দাম সেখানে সমান! সে জন্ত ফলস দুধ প্রভৃতির উৎপাদনে দেশের লোক যেন সহস্র-বাজ হইয়া কাজ করিতেছে; এবং চুরি বা ব্যবসাদারী না ঘটে, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি এতটুকু শিথিল নয়। বরফের ফ্যাক্টরি ভাসিয়া চুরিয়া বারুদখানা তৈয়ারী-করা কঠিন নয়, কিন্তু জলা বুজাইয়া জল উপড়াইয়া সেখানকার মাটিকে উর্ধ্ব করিয়া তথায় ফলস ফলানো সহজ ব্যাপার নয়। মার্কিং আজ সে কার্য সাধন করিয়াছে। ৩৫০০০ টন ওজনের একখানি যুদ্ধ-জাহাজ গড়িয়া তুলিতে ২৬১০০০ ঘণ্টা সময় লাগে। যে সব লোক এ জাহাজ গড়িয়া তুলিবে, তাদের সকলকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি দিতে হইলে ৪২০০০ একর



আলুর চাষ

পরিমিত ক্ষেত্রে একটি বছরের ফসলের আবশ্যক। একটি বমার তৈয়ারী করিতে বহু লোকের প্রয়োজন। তাদের খোরাক জোগাইতে চাই ১৫৫ একর পরিমিত ক্ষেতের ফসল। ট্যাকের কারিগরদের জন্ত চাই ৪৩ একর পরিমিত ক্ষেতের ফসল। ১৬ ইঞ্চি সাইজের একটি কামান একবার মাত্র ছুড়িবার জন্ত দুমহীন বারুদ চাই সাড়ে আট মণ। এই সাড়ে আট মণ বারুদ তৈয়ারী করিতে যে-পরিমাণ তুলা ও নুতি-কাপড় চাই,—তাঁহা পাওয়া যায় দেড় একর পরিমিত জমিতে ফলানো তুলা এবং এক-পঞ্চমাংশ একর পরিমিত জমির ইন্দুদও হইতে।

তার পর পশু। মার্কিং কৃষিজীবীদের ঘরে ঘরের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ কোটি বাইশ লক্ষ। তাদের লোমে যে পশম মিলিত, সে পশম বেসামরিক অধিবাসীদের পরিচ্ছদের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না;

খন আবার আছে ফোজ এবং জাহাজের নাবিক-সম্প্রদায়। মার্কিন লুকে বছরে সাধারণতঃ ষাট কোটি পাউণ্ড ওজনের পশম লাগে। ১৪২ খৃষ্টাব্দে শুধু ফোজদের জন্ত মার্কিনে পশম লাগিয়াছে একশ' কোটি পাউণ্ড। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিগুণ পশম লাগিয়াছে। তার পরণ বিমান-বাহিনীকে জ্যাকেট দিতে হইয়াছে এবং ফোজের জন্ত রম কোটি পাউণ্ড হেলমেট প্রভৃতি জোগাইতে হইয়াছে অজস্র পরিমাণে। চামড়ার ব্যাপারেও এমনি সমারোহ। কেল্লার চূপ-পাশ বাস করিবার সময় সেনাদের দেওয়া হয় বছরে দু'জোড়া কশা তিন জোড়া করিয়া ছুতা। কিন্তু আফ্রিকায় গিয়া ফোজের গারে দু'সপ্তাহের বেশী কোনো ছুতা টেকে নাই। তাহা হইলে

খান্ধে চৰ্কি খাটা চাই। আমাদের খাতে বছরে চৰ্কির প্রয়োজন সাধারণতঃ ২৬ সের করিয়া। যুদ্ধে দারুণ পরিশ্রম—এ জন্ত ফোজের খাতে বরাদ্দ-চৰ্কির পরিমাণ মাথা-পিছু বছরে এক মণ এগারো-বারো সের নির্দিষ্ট আছে। চৰ্কির জন্ত মাছ-মাংস জোগানো—তার উপর রাসায়নিক রীতিতে প্রস্তুত ভাইটামিন পাঠানো হইতেছে। চৰ্কি জোগানে অভাব না ঘটে, এ জন্ত মার্কিন গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়াছে, “দেশে শূকরের বংশ বাড়াত! সয়া-বীন এবং চীনা বাদামের চাষ করে প্রচুর পরিমাণে।” চীনা বাদাম ফোজের জন্ত দৈনিক বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১১৪১ খৃষ্টাব্দে মার্কিনে ১০৬৪০০০ একর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হইত। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে ছত্রিশ লক্ষ একর জমিতে চীনা



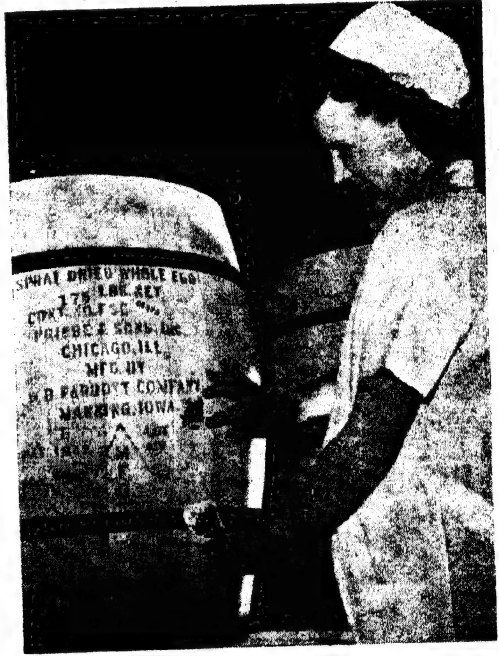
গাজর ডি-হাইড্রেট

ধরুন, দশ লক্ষ ফোজ ও নাবিক পাঠাইতে হইলে তাদের জন্ত কত ছুতা চাই!

এ জন্ত মার্কিনে শুধু যে খান্ধ-পানীয়েব উৎপাদনই শুধু প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো হইয়াছে, তা নয়! চামড়া, পশম অর্থাৎ সর্ববিধ দ্রব্য-উৎপাদনে সেখানে আজ রীতিমত সমারোহ বাধিয়া গিয়াছে।

তিসির তৈল চাই সাগর-পরিমাণ। এ জন্ত মিনেশোটা হইতে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে কৃষিজীবীরা পঞ্চাশ লক্ষ একর জমি লইয়া সেই জমিতে তিসি ফলাইতেছে—তিসির তৈল জোগাইতে।

দড়ি চাই দেড় লক্ষ টন! এই দড়ির প্রয়োজনে তিন লক্ষ একর জমিতে শুধু শশের চাষ হইতেছে।



পিপার মধ্যে 'ম' মণ আড়াই সের শুক ডিম ভরা আছে

বাদাম ফলানো হইয়াছিল; তার পর মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন সয়া-বীনের চাষ হইতেছে এক কোটি দশ লক্ষ একর জমি ছড়িয়া।

তাছাড়া, শ্রমিকদের কাজের জন্ত সে মাগুলি আট ঘণ্টার সময়-নির্দেশ-রীতি উদ্ভাওয়া গিয়াছে। মার্কিনে এখন শ্রমিকের আর ওভার-টাইম নাই। কাজ চাই ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মাংসের জন্ত গো-বংশ ধ্বংস করিবার চেষ্টা নাই। গাভীর দুধ পরম পুষ্টিকর। সে-দুধে মাখন হইতেছে—তাহা হইতে চীজ ও বিবিধ খাদ্য তৈয়ারী হইতেছে। শূকর-মাংসই মার্কিন ফোজের প্রিয় এবং শূকর-মাংসই অজস্র ভাবে জোগানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। শূকর-পালনে যে অধ্যবসায় চলিয়াছে, আমাদের জন্ত তার সিঁকি-ভাগ যদি কখনো করা হয়, তাহা হইলে আমাদের জী কিনিয়া যায়। পালন ও পরিচর্যায় শুণে মার্কিন গাভী

কামখেন্দ্র মতো অকুপণ ভাবে দুধ দিতেছে। এত দুধ হইতেছে যে, সে-দুধ এক-জায়গার ঢালিলে ৭৫ মাইল লম্বা দুধ-নদী তৈয়ারী হয়। এ দুধ বেসামরিক অধিবাসীদের পাত্র ও পেয়ালার কাপা জম্পূর্ণ রাখে না। বেসামরিক অধিবাসীদের প্রয়োজন-মত দুধ জোগাইয়া যে-দুধ বাঁচে, তাহা হইতে চাক তৈয়ারী হইতেছে। মাটা তুলিয়া দুধ পাক করা হইতেছে, মিষ্টার হইতেছে, মাখন হইতেছে; এবং আত্মতা বা জলীয় ভাগ নিষ্কাশিত করিয়া দুধের সারাংশটুকু শুক করা হইতেছে।

দুধকে শুকানো করা হয় স্ত্রী-রীতিতে। এই শুক দুধ জলে গুলিয়া পান করিলে দুধপানের ফল মেলে। এ রীতিতে এক মণ দশ সের দুধকে বিকৃত করিলে জমাট শুক দুধের ওজন ঠাঁড়ায় চার সের মাত্র। এই চার সের দুধ-সার জলে ফুটাইয়া তার পরিমাণ প্রয়োজন-মত দশ সের হইলে এক মণ পর্যন্ত করা চলে। সে দুধ 'জলো' হয় না; খাঁটি দুধের মতই তাহা পুষ্টিকর।

গমের চাষ মার্কিণে বাড়িয়া চতুর্গুণ হইয়াছে। তার পর ডিম। যুদ্ধের পূর্বে মার্কিণ হইতে আন্ত ডিম অল্পসংখ্যক হইয়া বুটেনে চালান হইত। তার মধ্যে অনেক ডিম নষ্ট হইত। এখন শুধু বুটেনে চালান নয়, এ ডিম চালান বাইতেছে আফ্রিকার, যুরোপে এবং ভারতে। ডিমগুলিকে গুঁড়াইয়া চূর্ণ করিয়া পাঠানো হইতেছে—পরিবার বা নষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই। তিন ডজন তাজা ডিম লইয়া তাহা হইতে যে ডিম-সার তৈরী হইতেছে, তার ওজন আধ সের মাত্র। ডিম ভাঙ্গিয়া বিশেষ যত্নে পাইপের মধ্যে তার পীত ও হরিতাংশ ঢালিয়া দেওয়া হয়—সেই গোলা ডিম পাইপের অপর প্রান্ত দিয়া পিচকারী-ধারায় বর্ষিত হইয়া তন্তু পাত্রে পড়ে, এবং পাত্রমধ্যে জমাট বাঁধিয়া চূর্ণ হইয়া ময়দার মত বয়িয়া মেঝের জড়ো হয়। দু'মণ ওজনের পিপায় এই ডিমচূর্ণ ভরা হয়। দু-মণী পিপার মধ্যে যে ডিমচূর্ণ ধরে, তার পরিমাণ আঠারো বাত্র ভর্তি তাজা ডিমের অনুরূপ। এই ডিমচূর্ণ চারের চামচের এক চামচ-পরিমাণ খান আর দু'টা তাজা ডিম গোচ করিয়া খান—সমান ফল পাইবেন। চালানি জাহাজে অল্প জায়গা লাগিবে বলিয়া মাংস পাঠানো হয় ডী-হাইড্রেট করিয়া। ছ'সাত মণ মাংসকে ডী-হাইড্রেট করিলে তার ওজন ঠাঁড়ায় ৩০ সের, বড় জোর এক মণ মাত্র। ডী-হাইড্রেট করিতে যেমন পরিশ্রম তেমনই ইহাতে ব্যয়ও পড়ে বেশী।

শুক্র বা মেঘ কাটিয়া প্রথমে তার ছাল ছাড়ানো হয়। তার পর সিঁক করিয়া লইয়া হাড়জলাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তার পর টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া একটি বর্গমান ডায়াল-বস্ত্রমধ্যে পুরিয়া দেওয়া হয়। ডায়ালে রাখার ফলে মাংস হইতে জলীয় ভাগ সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হয়। পিপার ভর্তি ফল-মূল আনাজ-তরকারী শাকসব্জীও এমনি ভাবে ডী-হাইড্রেট করিয়া তবে চালান দেওয়া হয়। ডী-হাইড্রেট করার ফলে জলীয় ভাগ নিষ্কাশিত হইলেও গন্ধ বা স্বাদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে লাল ফোঁজের জন্ত ডী-হাইড্রেট করা যে পরিমাণ টোমাটো, মটরশুটি, বীন প্রভৃতি চালান গিয়াছিল, তার ওজন এগারো কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে চালানির পরিমাণ হইয়াছে তার বিংশগুণ।

বা দুধ পাঠাইতে ১০৪৪ খানি জাহাজ লাগিত, সে-জাহাজ ১৭০ খানি জাহাজ লাগিতেছে। সাড়ে পাঁচ হাজার মণ ওজনের তাজা দুধকে শুক চূর্ণে পরিণত করিয়া তাহা একখানি ছোট গ্লেন মারক্স পাঠানো সম্ভব হইয়াছে। এই দুধচূর্ণ দশ হাজার মাইল দূর-পথেও নিখিল অনাবিল থাকে—টিকিয়া নষ্ট হয় না।

যুদ্ধের ফলে মার্কিণে ইকুর চাষ অসম্ভব বরফ বাড়িয়াছে। হনলুলুতে মার্কিণ যে চিনির কল বসাইয়াছে, সেখানকার সে চিনিতে এসিডাবাসী মার্কিণ ফোঁজের জন্ত সর্ববিধ মিষ্টার তৈয়ারী হইতেছে। কেক, চকোলেট, লজ্জেলস, গামড়প হইতে শুরু করিয়া পাই, আইসক্রীম, জ্যাম, চিডিয়িং গাম, চা, কফি—কোনো দিকে ফোঁজের এতটুকু অভাব বা অবাচ্ছন্দ্য নাই। এ-দিকে কিউবা এবং পোর্টোরিকোয় এত চিনি তৈয়ারী হইতেছে যে, সে-চিনি মজুত রাখিবার উপযোগী জায়গা মিলিতেছে না। চিনি শুধু ইক্ষু হইতেই নয়, বাট হইতেও তৈয়ারী হইতেছে। সয়া-বীনের-চাষ মার্কিণে শুরু হইয়াছে আজ ৩৫ বৎসর মাত্র। প্রথমে চীন হইতে সয়া-বীন আনা হয়। বৈজ্ঞানিক অধ্যবসারে এখন আমেরিকায় সয়া-বীন ফলানো হইতেছে প্রায় ২৫০০ জাতের। যুদ্ধের মত্মমে সয়া-বীনের চাষ



বোতলে যে জল, ও-জল এই মাংসখণ্ড হইতে নিষ্কাশিত

দশ গুণ বাড়িয়াছে। সয়া-বীন হইতে চার্ক, ত্যালাড-অয়েল তৈয়ারী হইতেছে। তাহাড়া ময়লা হইতেছে। মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আটা-ময়দার সয়া-বীন-চূর্ণ মিশাইয়া খাইলে আটা ময়দার পুষ্টি-কারিতা বহু গুণ বাড়ে। এ জন্ত রাশিয়ার এবং বুটেনে সয়া-বীনের আদর বাড়িয়াছে। বাটার্ণে ব্যবহার জিস সয়া-বীন হইতে রাসায়নিক রীতিতে সাবান, প্রাষ্টিক, পেইন্ট, বার্শিশ, গ্লিসারিন প্রভৃতিও তৈয়ারী হইতেছে।

মার্কিণ ফোঁজ আকারে বিপুল—এই ফোঁজ পরিপুষ্ট করিতেছে বরফ মার্কিণ পুরুষের দল। এত লোক যুদ্ধ করিতে গেল, ক্ষেত্রে-খামারে কাজ করিবে কে? বারো বৎসর বয়সের ছেলেরা ক্ষেতের কাজে নামিয়াছে। তাদের সঙ্গে নামিয়াছে মার্কিণ নারী-



ধটুভোর গম

করিয়া ক্ষেতে নামিয়া কাজ করিতে হয়। কালিকোণিয়া সহর হইতে
সপ্তাহে এক দিন করিয়া ৮০০ নর-নারী যায় শ্রাঙ্গা-ক্ষেতে কাজ

করিতে। নাগরিকদের কৃষি-পদ্ধতি শিক্ষানো হইতেছে। সার-
সংগ্রহেও অধ্যবসায় এবং সমারোহের অন্ত নাই। মেক্সিকো হইতে
কুলি-মজুর-শ্রমিক আনানো হইতেছে এবং বন্দী হইয়া যে সব জাপানী
আমেরিকায় আছে, তাদের দিয়াও ক্ষেত-খামারের কাজ করানো
হইতেছে। কেনটাকি, মিসৌরি, কনেকটিকাট এবং আরো
বহু প্রদেশের ভয় বে-সামরিক নর-নারী কৃষিকাজে রীতিমত
সহযোগিতা করিতেছে।

এ সহযোগিতায় বিজ্ঞানের সংযোগ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শ্রদ্ধা
শ্রদ্ধা করিয়া তুলিয়াছে। জমিতে জল দেওয়ার জন্ত নব নব
ব্যবস্থা—অম্লকর জমিকে উর্বর করিয়া তোলা—জমিতে সার দেওয়া
—গো-মেষের পালন-পরিচর্যায় উৎসাহে—অম্লরাগ—মার্কিন যুক্ত-
রাষ্ট্র এ দুর্দিনে যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে, তাহা সর্ব দেশের সকল
জাতির অনুকরণযোগ্য। এ সব দেখিয়া এক জন সুখী বলিয়াছেন—
মানুষ বত দিন ভূমিকে পরম সম্পদ বলিয়া তার পরিচর্যায় কাহ্ন-মন
উৎসর্গ করিয়াছিল, তত দিন অন্নবস্ত্রের অভাব কেহ অনুভব করে
নাই! এ দুর্দিনে ভূমি-লব্ধীর পরিচর্যা করিয়াই বিজয়-লব্ধীকে
পাইবার আশা! পেট ভরিয়া মানুষ যদি খাইতে পায়, তাহা হইলে
তাকে মারে কে?—এ কথা এ দুর্দিনে অপগত হইলেও বেন আমরা
না ভুলি!

শেষ হবে রাত্রি কবে

রাজা ত্রিপুরেন্দ্র গুহরায়

পৃথিবী আকাশ এলো বসন্ত আবার
বন্দী হ'লো বনানীর কারা-অস্তরালে;
আকাশ লোহিত নহে আজ দেখি আর
বরণ দিলো না পৃথ্বী কোন চন্দ্রতালে।

পৃথিবী মরিয়া গেছে নিঃশব্দ নভোছায়ে;
মানুষের অম্লকর মনের মাটিতে
শান্তির অঙ্কুর লুপে র'য়েছে ঘুমা'য়ে;
শতাব্দীর অবকাশ সে ঘুম ভাঙিতে।

নিরুদ্বেগ জীবনের কাল-শিরাতলে
কালো মৃত্যুর সে কালো রক্ত, তা'র স্থাপু
আয়ু-গুণ্টে পিশাচের পাণ্ডু হাসি কলে,
সঞ্চরে শরীর-মনে বিবাক্ত জীবাপু।

ভবিষ্যৎ কেঁদে ফেরে প্রান্তরের পারে,
সম্মুখে জন্মাট এক আঁধারের ভয়;
দাসত্ব পৌঁছেছে মাত্র দুপুরের দ্বারে,
দুন্দু-দেব-তাণ্ডবতা নয় শেষ নয়।

আকাশ হবে কি লাল কুহুম-জীবীরে?
পৃথিবী হবে না ফুল ফাগুনের ফাগে?
মনের আকাশ কবে লাল হবে বীরে
আঁধার আগল ভাঙি সোনালী পরাগে?

তদ্রাগত ল'য়ে শান্তি-প্রীতির মুছনা
ছিন্নমস্ত জীবনের মহোত্তর জয়ে,
শেষ কবে হবে রাত্রি বক্ষা অলক্ষণা
প্রাসন্ন সে প্রভাতের রক্ত সূর্য্যোদয়ে?

চর্ম

দেহের হাড়, মাংসপেশী,
হাড্ডি, শিরা এবং অঙ্গাঙ্গ

প্রয়োজনীয় জিনিসকে রক্ষা করার
জন্তে দেহ-চর্মের সৃষ্টি হয়েছে।
বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের
দেহের ভেতরকার যোগাযোগ বজায়
রাখবার ব্যবস্থা অবশ্য আছে। মুখ,
কাণ, নাক প্রভৃতি অঙ্গগুলো ঐ ব্যবস্থার সহায়ক।

দেহচর্মের মূল্য অনেক বলেই তার পরিচয়, আর কি করে তাকে
সুস্থ রাখা যায়, সেটা জানা প্রয়োজন।

চর্মের দু'টো ভাগ। বাইরের যে অংশটা আমাদের চোখে পড়ে,
সেটার নাম অধিবৃক বা এপিডার্মিস (epidermis); তার নীচে
থাকে অধস্থক বা ডার্মিস (dermis)।

অধিবৃকের আবার দু'টো স্তর আছে—তার মধ্যে ওপরেরটির
কোষগুলি প্রাণহীন। নীচেকার কোষগুলি জীবন্ত আর অনবরত
সংখ্যায় বাড়তে থাকে। তবে সেগুলি অমর নয়। নীচেকার নতুন
কোষের চাপে তাই ওপরের পুরানো কোষগুলি আলাদা হয় এবং
ফল তাদের আর প্রাণ থাকে না। সেগুলি তখন কঠিন অবস্থায়
দেহের ওপরে এসে জমা হয়। আমরা স্নান করে গা মুছলে এগুলি
উঠে যায়, আর তা না হলে এইগুলিতে ময়লা আটকায়। ফলে,
গায়ে খড়ি ওঠে। শুধু তাই নয়, দেহের ঘাম বেরোবার পথও ময়লার
যায় বন্ধ হয়ে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, স্নানের উপকারিতা যেন বোঝা গেল,
কিন্তু দেহের রং ফেরান যায় কি? না, দেহের রং বদলান যায় না।
তার কারণ, অধিবৃকের নীচেকার স্তরের কোষে থাকে রং। সেই
রংই কাউকে করে ফর্সা, কাউকে কালো। কিন্তু তাহলেও দেহচর্মের
লালিত্য বলে একটা জিনিষ আছে। সেটার অধিকারী কি করে
হওয়া যায় তা পরে বলা হচ্ছে।

চর্মের অধস্থকে আছে . রক্তশিরা, হাড়, লোমকূপ আর বেদ-গ্রন্থি।
তার নীচে থাকে চর্কি। এর ওপরে মাঝে মাঝে কতকগুলি শুল্কের
মত জিনিষ আছে। সেগুলির নাম প্যাপিলা (papilla)
তাদের মাথার থাকে অসংখ্য স্পর্শেন্দ্রিয়। তার কোনটি দিয়ে
আমরা উষ্ণতা অনুভব করি, কোনটি দিয়ে শীতলতা, কোনটি
দিয়ে বা ব্যথা—এই রকম সব অনুভূতিরই স্বতন্ত্র প্যাপিলা আছে।
প্যাপিলার সংখ্যা করতলে বেশী, তার মধ্যে তর্জনিতে সব থেকে
বেশী। সেই জন্তে তর্জনির অনুভব-শক্তিও সব অঙ্গ থেকে বেশী।

দেহ-চর্মের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এর মধ্যে কতকগুলি
হচ্ছে লোমকূপ—অর্থাৎ তাদের মধ্যে মানব-দেহের লোম প্রোথিত
থাকে। লোমকূপের চার পাশে খুব ছোট ছোট মাংসপেশী আছে।
শীত লাগার ফলে কিম্বা ভয়ে বা আনন্দে সেগুলি সঙ্কুচিত হয় বলেই
লোম দাঁড়িয়ে ওঠে এবং আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। লোমকূপে
এক জাতীয় গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ জমা হয় বলে দেহ-লোম সুস্ব
সময়েই চকচকে আর তেজা থাকে। অঙ্গাঙ্গ কানের সঙ্গে লোম
স্পর্শেন্দ্রিয়ার কাজও খানিকটা করে।

লোমকূপ ছাড়া অঙ্গ যে সমস্ত ছিদ্র চর্মের ওপরে আছে, তারা

স্বাস্থ্য-মৌল্য

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

ও

পঞ্চানন ভট্টাচার্য

হেঁকে নিয়ে ঐ সব ছিদ্র দিয়ে বাইরে
পাঠান। ঘাম আমাদের সমস্ত অঙ্গ
দিয়ে সব সময়ে বাইরে এলেও, হাব
আর পাই বেশী ঘামে। এর কারণ,
করতলে আর পদতলে লোমকূপের
সংখ্যা কম আর ঘর্ষ-ছিদ্রের সংখ্যা
বেশী। শরীরে যেখানে লোমকূপের
সংখ্যা বেশী, সেখানে আবার ঘর্ষ-
ছিদ্রের সংখ্যা কম।

ঘাম দেখা যায় আবহাওয়ার ফলে। শুকনো এবং গরম
আবহাওয়ার ঘাম সহজেই বাষ্প হয়ে যায় বলে দেখা যায় কম।
কিন্তু স্যাঁৎ-সেতে আবহাওয়ার ঘাম শুকায় না বলে দেখা যায় বেশী।
যাই হোক, মোটামুটি প্রায় এক সের পরিমাণ ঘাম রোজ আমাদের
ঘর্ষ-ছিদ্র দিয়ে দেহ-চর্মের বাইরে আসে।

ঘাম যে শুষ্ক ময়লা পরিষ্কার করে তা নয়, দেহের চর্ম এবং রক্তকে
ঠাণ্ডা রাখতেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

চর্ম দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও খানিকটা হয়, তবে খুবই
সামান্য। মানুষের দেহচর্ম পুরু বলে চর্ম দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালান
সম্ভব হয় না, কিন্তু ব্যার্জের ফুস্ফুস কেটে বাদ দিলেও তারা পাতলা
দেহ-চর্মের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

দেহ-চর্মের পরিচয় মোটামুটি দেওয়া হল। এখন কি করে সেই
চর্মে ঠিক মত বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে কথা আলোচনা করা যাক।

তেল বেশ ভাল ভাবে মালিশ করলে দেহ-চর্ম সুস্থ থাকে। তার
কারণ,—(১) দেহ-চর্ম কিছু তেল শুষে নেয়; (২) মালিশে রক্ত-
চলাচলের উন্নতি ঘটে; (৩) অধস্থকের নীচেকার চর্কি ক্রমশঃ সরে
যায়; (৪) লোমকূপ এবং ঘর্ষ-ছিদ্র সতেজ হয়। তবে মালিশ করার
পর ভাল করে তেল তুলে ফেলতে হবে। মালিশের পরে স্নান
করলে অধিবৃকের মুত কোষগুলি সহজেই উঠে যায়।

দেহ-চর্মের সৌন্দর্য হচ্ছে স্থায়ী সৌন্দর্য। মুখ এবং অঙ্গাঙ্গ
অঙ্গের চর্মকে সতেজ এবং টান রাখতে হলে নিয়মিত মালিশ করা
দরকার। অবশ্য এই মালিশ করতে খুব বেশী সময় ব্যয় করবার
দরকার করে না।

এ ছাড়া ব্যায়াম করলে চর্মের রক্তনালীগুলি স্ফীত হয় এবং
যথেষ্ট ঘাম হতে থাকে। তার ফলে শরীরের রক্ত দূর হয় আর
চর্ম মন্থণ ও সতেজ হয়।

পারিবারিক অশান্তি

বিবাহের সময় আমরা বেশ একাগ্র মনেই মন্ত্র পড়ে বলি, স্বামীর
হৃদয় পত্নীর হোক; পত্নীর হৃদয় হোক স্বামীর হৃদয়—দু'জনের হৃদয়
মিলে এক হোক, অভিন্ন হোক! কিন্তু বিবাহের পরে কোনো ক্ষেত্রে
দু'চার বছর, কোনো ক্ষেত্রে বা পাঁচ-সাত বছর স্বামি-স্ত্রীর মনে-
মনে পূর্ণ প্রশান্ত মিলন দেখা যায়; তার পর সংসারের নানা অবস্থার
নানা ঘটনার দাড-প্রতিদাডে দু'জনের সম্পর্ক প্রায়ই দাঁড়ায় বিরস
বৈচিত্র্যহীন। স্বামী দেখেন স্ত্রীর চলাফেরা-বলায় নানা ক্রটি, বেশে-ভূষায়
কতই খুঁৎ। স্বামী ভাবেন, স্ত্রী যেন ব্যক্তিগত হারিয়ে কি হয়ে
উঠেছেন। স্বামী তখন স্ত্রীর 'স্বপ্নে' খানিকটা উলাসীন হয়ে ওঠেন

— এই ছিদ্র দিয়ে বাইরে পাঠান।

আছেন। পাঁচটা আসবাবের সামিল হয়ে দ্বী তখন সংসারে বাস করেন। দ্বীসের মধ্যে অনেকে সংসার জ্বর ছেলেমেয়ের মধ্যে নিজেদের এমন ভাবে নিমজ্জিত রাখেন যে, স্বামী শুধু তাঁর কাছে সংসার-চক্র চালাবার এক্ষণিমাাত্র বলে অনুভূত হয়।

এমন ভাবে বহু সংসার শৃঙ্খলা-পারিপাট্যহীন হয়। হাসি-গান সৌন্দর্য্য-শান্তির লীলাভূমির বদলে সংসার হয় যেন অফিসের মত, কল-কারখানার মত। কর্তৃক্লান্ত স্বামী সংসারে ফিরে যেমন শান্তি পান না, দ্বীও তেমনি নিজীব মেশিনে পরিণত হন। দু'জনেরই মনের অপমৃত্যু ঘটে।

এমন ঘটার প্রধান কারণ—প্রথম মিলনের রহস্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না। হতে পারে না। রোমান্সের আমেজ কাটলে স্বামি-স্ত্রী মোহের আবরণ-মুক্ত এবং পরস্পরের কাছে নিজেদের নীনতা ও দোষগুণ-সমেত স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। দু'জনেই দেখেন, কাব্য-নাটক-উপক্ৰাস পড়ে কল্পনার রঙে মিলনের যে-ছবি দু'জনে মনের পটে আঁকতেন—আঁকা-ছবির সে আদর্শের ধারেও কেউ দাঁড়াতে পারেন না। তখন বাস্তব জীবনের দৃশ্য-বিরোধ স্বার্থ-খেয়ালের কথা ভুলে তাঁরা পরস্পরের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলোকেই শুধু বড় করে দেখেন। সে দোষ-সম্মিলাপাতে গুণাবলী কোথায় চাপা পড়ে যায়! কাজেই অশান্তির বোঝা মনের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে।

এ-অশান্তি-মোচনের উপায়—স্বামি-স্ত্রী পরস্পরকে যদি বাস্তব জগতের জীব বলে মনে করেন, এবং তা মনে করে পরস্পরের

ক্রটি-বিচ্যুতিকে ঘোরালো দৃক করে না দেখে সহজ ভাবে দেখেন, সহজ-সরল ভঙ্গিতে পরস্পরকে মানিয়ে বনিয়ো নিষ্কৃত পারেন। দু'জনে যদি বোঝেন, উপক্ৰাসের নায়ক-নারিকারা শুধু বাছা-বাছা কথা বলে, বাছা বাছা ঘটনা নিয়েই তাদের বাস; বাস্তব জীবনের নর-নারীর পক্ষে নায়ক-নারিকার লিখন-লিপি নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়—তা হলে মনের এ ব্যাধির উপশম ঘটতে পারে। তাছাড়া সংসারে সকলকে নিয়ে, সকলকে সয়ে, সকলকে মানিয়ে বনিয়ো বাস করতে হবে। সকলের সুখ-দুখে সাধ-আশা এমন ভাবে বিজড়িত যে, এক জনকে উপেক্ষা করলে সুখে-সুচ্ছন্দে থাকা যাবে না—এটুকু বুঝে চলা চাই। স্বামী যদি চান, দ্বী তাঁর ছায়া মাত্র হবে—এবং দ্বী যদি চান, স্বামী তাঁর ইঙ্গিতে নড়বেন কিরবেন, তাহলে তাঁদের মৃত্যুর সীমা থাকবে না। মানুষ রক্ত-মাংসের জীব,—কলের পুতুল নয়। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে ও ব্যক্তিকে প্রজ্ঞা-সন্ধান করে যদি প্রত্যেককে চলেন, তাহলে আপনা থেকেই বহু দোষ-ক্রটি দূর হয়ে যাবে। দু'জনে যে মন্ত্র পড়েছিলেন—‘দুইটি ছন্দ মিলে এক হোক’—সেই মন্ত্র মেনে মনের বাক ঘুরিয়ে সিধা সরল করুন, তবে তো মনে-মনে মিলবে। মনে-মনে মেলাবার চেষ্টা যিনি না করবেন, তাঁর তর্ভাগা বিধাতাও যুতোতে পারবেন না। স্বামী মানুষ—স্ত্রীকেও তেমনি মানুষ বলে জানা তাঁর চাই। সে-মানা মানতে পারলে বহু অসন্তোষের দায় কাটিয়ে শান্তি-সুখের সন্ধান মিলবে। স্বামি-স্ত্রী দু'জনের পক্ষেই এ একেবারে অবিসম্বাদি সত্য কথা।

সিগারেট নাই



খুকী, শাড়ী বে-সায়লে চল'!
(পুড়িবার ভয় নাই)



(ধূমপানের নূতন টেকনিক)
প্রাণেন—

মুশলির মুখে বৃত্তান্ত তুলিয়া

সরস্বতী আসিল কালোর বাড়ীতে। ঘরের কোণে দুখ গুঁজিয়া কালিন্দী পড়িয়া আছে। চোখের জলের কালিতে মুখের চেহারা বা হইয়াছে, দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়!

সরস্বতী আসিয়া সঙ্গেহে তাকে কাছে বসাইল, তার পর বলিল—এ কী চেহারা করেছিস বে, এ্যা! বা, মুখ-হাত ধুয়ে আয়!

কালি নড়ে না। নন্দর মাকে বিয়া জোর করিয়া হাত ধোয়ানো হইল। তার পর কালোর মাকে সরস্বতী বলিল—বাড়ীতে দুখ নেই এক-ছিটে?

কালোর মা বলিল—না মা, দুখ আর কার জন্ত থাকবে!

—কোনো খাবার?

—মুড়ি আছে, বাতাসা আছে!

—খেতে সিরেছিলে?

—না। কালোর মা বলিল—খেতে দেবো কি! শুনে ইস্তক মাথার কি ঠিক আছে পিসিমা! আখি থাকলে তাই দিতুম! কালামুখী কি করে বসলো বসো তো! কালোর মায়ের চোখে জলধারা বহিল।

সরস্বতী বলিল—এখন কৈদে ফল? আগে থাকতে মেয়েকে সাবধানে রাখতে পারিসনি? নে, মায়-কান্না রাখ। মুড়ি-বাতাসা নয়, আমাদের ওখানে যা তো তুই নন্দর মা, গিয়ে মতির মার কাছ থেকে আমার নাম করে এক-বাটি দুখ চেয়ে নিয়ে আয়! বলবি, পিসিমা চেয়েছে...পিসিমার দরকার। যদি জিজ্ঞাসা করে, কার জন্ত দরকার? তাহলে বলিস, পিসিমা বলতে পারে; তুই তার কিছু জানিস না—বুঝি! এখানকার কোনো কথা বলিস নে যেন! বিপদে মানুষ ভালো করতে না পাকক, মন্দ করতে ছাড়ে না!

সরস্বতীর কথায় নন্দর মা গাঙ্গুলি-বাড়ীতে গেল দুধের জন্ত।

তার পর মমতা-ভরে কালিন্দীকে সরস্বতী নানা প্রশ্ন করিল। লজ্জায় কালিন্দী যেন মরিয়া আছে! অথচ সরস্বতীর এমন স্নেহ...প্রাণ তার বিগলিত হইয়া গেল! কোনো মতে সব কথা সে খুলিয়া বলিল। নিজের দোষ কৌনখানে, তাহাও অবুঁঠ কণ্ঠে বলিল।

সরস্বতী বলিল—হঁ। তা একটা পাপ তুমি করেছো বলে আর একটা পাপ করতে যাচ্ছ! আশ্বাষাতী হবার মানে, আর-একটা প্রাণি-হত্যা! সে নিরীহ...কোনো অপরাধ করেনি, পাপও করেনি। কামিয়া কালিন্দী লুটাইয়া পড়িল, বলিল—আমার কি হবে? সরস্বতী বলিল—এ কথা আগে ভাবা উচিত ছিল, মা।

কালো বলিল—বোন...আমি ফেলতে পারি না পিসিমা। কিন্তু পাঁচ জনকে নিয়ে বাস করি। তাছাড়া আমার স্বত্ব-শাস্ত্রী...

সরস্বতী বলিল—স্বত্ব-শাস্ত্রী কি ধার তুই ধারিস? যে নিজের মায়ের পেটের বোনকে ঘরে ঠাই দিতে তাদের ভয় করবি!

সরস্বতীর মা বলিল—আমাকে তাহলে কান্দী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা

করুক কালো। আমি মস্তুর নিয়েছি...আমার দেবতা আছে, ধর্ম আছে।

ধমক দিয়া সরস্বতী বলিল—দেবতা আর ধর্ম তোকে দেখবে ভাবিস, কালোর মা, এত বড় বিপদে পেটের সন্তানকে ঠেলে বাড়ীর বার করে দিলে? আন্তনে হাত দিলে হাত পোড়ে—একথা ছেলে-মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে হয়। না বুকে না জেনে ছেলেমেয়ে আন্তনে

[উপস্থাপন]

ত্রিশোবীরমোহন মুখোপাধ্যায়

হাত দিয়ে হাত পোড়ালে তাকে দেখাবনি, বিদায় করে নিজের স্বার্থ-স্বখ খুঁজবি? এ তোর ভালো বিচার-বিবেচনা বটে!

এত কথা বলিয়া সরস্বতী আবার চাহিল কালিন্দীর পানে। সে একেবারে চোরের অশ্রম হইয়া মুইয়া ভাসিয়া আছে। সরস্বতীর মনে মমতা হইল। সরস্বতী বলিল—ওর তার কাকেও নিতে হবে না, আমি নেবো। এখন ওকে নিয়ে গিয়ে বৌঠাকরুণের কাছে রাখবো। তার জাত নেই, কালিরও জাত গেছে। সে জাত-হারার কাছে এ জাত-হারা আরামে থাকবে!...তার পর একটা নিখাস ফেলিয়া আবার বলিল—ভেবছিলুম, এদিককার সব চুকলে ফিরে যাবো! তা আর হবে না! এ এক নতুন গেরো পায়ের বাধলো। ভালোয়-ভালোয় দু'টো দু'টাই হোক, দেখি, তার পরে যাওয়া!

কালোর মা চমকিয়া উঠিল, বলিল—বলো কি গো পিসিমা! তুমি বামুনের ঘরের বিধবা...আচার-নিষ্ঠা মেনে চলো...তুমি এই অনাঙ্কিষ্ট ব্যাপারে...

কঠিন কণ্ঠে সরস্বতী বলিল—মানুষ যখন বিপদে পড়ে কালোর মা, তখন তাকে দেখাই হলো সবচেয়ে বড় ধর্ম, বুঝি!...নিখুঁৎ আমরা কেউ নই! কিন্তু যাক, বাঁচলুম তোর তত্ত্বকথার দায় থেকে! নন্দর মা আসছে।

নন্দর মা আসিল। তার হাতে বড় বাটি-ভরা এক-বাটি দুখ, আর কিছু মিষ্টান্ন।

সরস্বতী বলিল—আয় কালি, এইখানে এসে বোস, বসে মুখে কিছু দে দিকিনি।

নন্দর মার হাত হইতে মিষ্টান্ন এবং দুধের বাটি লইয়া সরস্বতী বলিল কালোকে—একখানা রেকাবি-টেকাবি আছে রে কালো?

—আছে পিসিমা।

—আমাকে এনে দে।

—দি।

কালো রেকাবি খুইয়া আনিল। সরস্বতী রেকাবিতে সাজাইল দু'টি সন্দেশ, দুখানি বাগুসাই-গজা এবং দু'টি রসগোল্লা। তার পর কালিকে বসাইয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

নন্দর মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল। কালিন্দীর খাওয়া চুকিলে সরস্বতীর পায়ের কাছে গলবস্ত্র হইয়া টিপ করিয়া প্রশ্নাম করিয়া বলিল—তুমি মানুষ নও...গো পিসিমা, দেবতা। দাও, একটু পায়ের ধুসো দাও...কৃতার্থ হই।

কালিন্দীকে আনিয়া বিদুমতীকে বলিয়া সরস্বতী তুলিল তাঁর ছ। কালিন্দীর চেহারা দেখিয়া কাঁটা হইয়া বিদুমতী বলিলেন,—
য় দাগড়া-দাগড়া এ সব কিসের দাগ রে কালি ?

কালিন্দী বলিল, এ দু'দিন শস্তর-বাড়ীর লোক-জন তাকে
-য়ার করিয়াছে! শ্যোল-কুকুর মারার মতো! বলিল, এখানে
সিয়াও সেই দূর-ছাই!

বিদুমতী বলিল—আহা! আমার কাছে তুই থাক কালি...
দিন আমি বেঁচে আছি, নিরাশ্রয় হবি নে। তার পর যাবার সময়
পর...আর এত দুর্গতির মধ্যে যেটা আসছে...তোদের দুজনেরই দুটি
স্নর আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা যেমন করে' হোক, আমি করে বাবো।

৩১

চার মাস পরের কথা।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। কেশব-ঠাকুরের গৃহে রান্নাঘরের
গোয়াল বসিয়া কদম একখানা বাঙলা বই পড়িতেছে; সঙ্গে সঙ্গে হৈসেল
ঠিকি দিতেছে। কেশব ঠাকুরের থাওয়া হয় নাই। বেলা দশটায়
ফরিবার কথা...এখনো দেখা নাই। কদম তার আগে খাইতে পারে
না। ভেলেরা খাইয়া যে যার ধান্দায় বাহির হইয়া গিয়াছে। হাতে
ফাজ নাই, তাই সময় কাটাইবার জন্ত কদম বই লইয়া বসিয়াছে।
বই তার প্রাণ। জীবনের চারি দিকে মস্ত প্রাটার তোলা...সে
প্রাটারে বাহিরে কি আছে, সে পরিচয় লইবে, তার স্বযোগ নাই!
নভেলের পাতাধ-পাতায়, কাব্য-নাটকের লাইনে-লাইনে তার মন যে
আরাম পায়, তার জোরেই সে বাঁচিয়া আছে।

কদম পড়িতেছিল রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্য। সুশীল তাকে
এ বই আনিয়া দিয়াছে। কদম বলিয়াছিল,—বই পড়তে গেলে আমার
আর কোনো দুঃখ থাকবে না। সকলের সব অত্যাচার আমি ভুলে
যাই তাতে। সুশীল বলিয়াছিল,—সুবিধা হলেই আমি তোমাকে
বই এনে দেবো, কদম। সে-কথা রক্ষা করিয়া সুশীল তাকে আনিয়া
দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের রাজা-রাণী, সোনার তরী আর মানসী; তাছাড়া
বঙ্কিমচন্দ্রের দু'-চারখানা উপন্যাস।

কদম পড়িতেছিল—

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে।

খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে।

হেথায় বুধা কীনা দেয়ালে পেয়ে বাধা

কীদন ফিরে আসে আপন কাছে।

পড়িতে পড়িতে বৃকের মাঝখানটা ফেঁসে হ-হ করিতেছিল।
মনে হইতেছিল, আশে-পাশে এত বাড়ী-ঘর এত লোক-জন...তার
কি দুঃখ, কেহ বোঝে না! সব যেন পর, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত...

এমন সময় কেশব-ঠাকুর আসিয়া দেখা দিল। ক্রম শব্দ মৃদু...
বলিল—এই যে, এখানে বসে!

কদমের মনের মধ্যকার মায়া-পুতী সে স্বরে কাঁশিয়া চূর্ণ হইয়া
গেল। কদম চাহিল কেশবের পানে। মুখের ভাব দেখিয়া কদমের
মুখে কথা ফুটিল না; সে চুপ করিয়া রহিল।

কেশব-ঠাকুর বলিল—বড় গিন্নীঠাকুরের ওখানে তোমার আর
বাওয়া হবে না...পাঁচ জনে আপত্তি করছে।

— নিশীথানন্দন যানে বিদুমতী।

কদম একথা শুনিল। শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল...কথার জবাব
দিল না।

গায়েয় উড়াখানান! দাওয়ায় ফেলিয়া কেশব-ঠাকুর বলিল সিঁড়ির
উপর। সিঁড়ির উপরে ছায়া। বসিয়া কেশব-ঠাকুর বলিল,—
কালোর বোনটা ওখানে রয়েছে...হাজার হোক নষ্ট-হুট্টু মেয়েমানুষ
তো...ওরা দয়া-শ্রম করে ওকে ঠাই দিলেও ও-সব মেয়েকে শাসিত
করা চাই, নাহলে বিপত্তি ঘটতে পারে।

কদম এবার কথা কহিল...বলিল,—কিন্তু তার হাতের রান্না
খেতে যাচ্ছি না। সে রান্না-বান্না করে না। বাড়ীতে দাসী-চাকর
রাখা হয়...কে কেমন মানুষ, তার কত খপরই বা কে রাখে! মানুষের
হাওয়ায় বিষ থাকে না।

কদমের মুখে একথা শুনিয়া কেশব-ঠাকুর চমকিয়া উঠিল।
বলিল,—হাওয়ায় বিষ আছে, কি না আছে, অত তত্ত্ব-কথায় তোমার
দরকার নেই। গায়ে দশ ঘর বজমান নিয়ে আমাকে চলতে হয়...
তরাই ভরসা। তারা যদি আপত্তি করে...কাজ কি তোমার
ও-বাড়ীতে যাওয়া-আসা করার!

কদম বলিল—জ্যাঠাইমা আমাকে ভালোবাসেন, আমি তাঁকে
ভক্তি-শ্রদ্ধা করি।

কেশব-ঠাকুর বলিল—আমিও ভক্তি-শ্রদ্ধা করি...তাছাড়া ছেলের
ব্যাপার নিয়ে যে যেটা হযেছিল, তা মিটে আসছিল...হয়তো মিটে
যেতো। কিন্তু এখন ঐ কালোর বোনটার জন্ত...

কদম বলিল—ওকে যদি উনি আশ্রয় না দিতেন, তাহলে মেয়েটার
কি গতি হতো বলতে পারো?

কাজিয়া কেশব-ঠাকুর বলিল—চুলোয় যাক ও সব মেয়ে। ওদের
গতির জন্ত মাথাব্যথা করা উচিত নয়।...

কদম ভ্রু কুঞ্চিত করিল। তার পর ধীর কণ্ঠে বলিল—কিন্তু
ওকেই শুধু তোমরা দোষী করছো কেন? যে ওর এ-সর্বনাশ
করেছে...

বাধা দিয়া কেশব-ঠাকুর বলিল—পুরুষ-মানুষের সঙ্গে মেয়েমানুষের
তুলনা হয় না! পুরুষ আর মেয়েমানুষ যদি সমান হতো তাহলে
মেয়েরা কাছাকাঁচা দিয়ে কাপড় পরতো।...বাঁকুগে অত কথা!
এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। এ ব্যাপার নিয়ে রীতিমত পোল
বেছেছে। অক্ষয় বাবুর বাড়ী আজ সন্ধ্যার সময় সতানরাণ পূজা
আছে...আমাকে ডেকে পাঁচ জনের সামনে সকলে মিলে বলছে,
তোমার পরিবার বড়গিন্নীর ওখানে যদি হামেশা যাওয়া-আসা করে
ডুটচাজ, তাহলে পূজা-পার্বণের কাজ করতে জন্ত পুরুষের ব্যবস্থা
করতে হবে। কাজেই বুঝছো, বজমান রাখতে হলে তাদের কথা
মানা ছাড়া আমার উপায় নেই।

কদম কোনো জবাব দিল না...বই হাতে দাওয়া হইতে
নামিল।

কেশব-ঠাকুর বলিল,—আমি গিয়ে বড়-কর্তাকে কথাটা বললুম।
তখন তিনি বললেন, যা উচিত মনে করবে, করো...এ সবকিছু আমার
কিছু বলবার নেই। কাজেই বুঝছো...অর্থাৎ বড়-কর্তা তো এক
বকম সংসার খেঁক সরে দাঁড়াছেন। ওরা হলেন বড় লোক...ওঁরা
বা করেন, সব মজিমাকি...আমাদের মতো ছোট-বাটো মানুষের
মজিম বলে কোনো-কিছু থাকতে পারে না তো।

কদম কাঁড়াইয়া এ কথা শুনিল...তার পর কি মনে হইল, বলিল,—এত দিন তো তুমি মানা করেনি।

—না। তার মানে, পাঁচ জনে এতে তখন আপত্তি করেনি...

কদম বলিল—আজ পাঁচ জনে আপত্তি করেছে বলেই তোমার আপত্তি।

কেশব বলিল—ও কথা ভাববার খেয়াল এত কাল আমার হয়নি। পাঁচ জনের কথায় ভেবে দেখছি, এ সব ঐশ্বর্য দেওয়া অজায়... খুবই অজায়!

—জাঠামশাইকে গিয়ে এ-কথা বলে! না কেন? তাঁদের পুত্রোহিত তো তুমি...তাঁর মঙ্গলামঙ্গল...

কথাটার রীতিমত স্নেহ! কেশব-ঠাকুর তাহা উপলব্ধি করিল; বিরক্ত হইল। কিন্তু সে বিরক্তি চাপিয়া বলিল—ওরা পরসাদলা মাগুয়...কারো মতামতের তোয়াক্কা রাখেন না। কেনই বা তাঁকে আমি এ কথা বলবো? বললেই বা তিনি শুনবেন কেন?...আমার আসল কথা, তুমি আমার জী...তুমি যদি ওখানে যাওয়া-আসা করো, তাহলে পাঁচ জনে আমার সংসব ত্যাগ করবে...বুঝলে?

কদম বলিল—বুঝছি।

এইটুকু মাত্র বলিয়া কদম গিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বথান্নানে বই রাখিয়া তখনই বাহির হইয়া আসিল; বলিল—জল-পায়ছা সব ঠিক করে রেখেছি...মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি তোমার ভাত বাড়ি। বেলা একটা বেজে গেছে।

কেশব-ঠাকুর বলিল—ভাত এ বেলায় খাবো না। অল্প বাবু ওখানে সত্যনারায়ণ পূজা করতে হবে। আমাকে হুঁখানো লুচি ভেজে দাও বর।

—দিচ্ছি।

বলিয়া কদম আবার গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। উছন নিবিয়া গিয়াছে। কোণ হইতে একগোছা শুকনো নারিকেল পাতা আনিয়া উছনে গুঁজিয়া দিল; তার পর...

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কেশব গিয়া বিছানায় দেহ-ভার এলাইয়া দিল; কদম নিজের জন্ত খালায় ভাত বাড়িল।

বাইতে বসিয়াছে, বড় ছেলে বিপিন আসিয়া হাজির। বলিল—বাবা বাড়ি আছে?

মাথা নাড়িয়া কদম জানাইল, আছে।

বিপিন বলিল—সুশীল বাবু এক কীর্তি করেছেন।

কদম শিহরিয়া উঠিল। সুশীল তবে কিরিয়াছে? আজ হুঁমান সুশীল এখানে নাই! বলিয়া গিয়াছিল, জরুরি কতকগুলো কাজের জন্ত বাহিরে চলিয়াছে!

কিন্তু কীর্তি! বিফারিত দৃষ্টিতে কদম চাহিয়া রহিল বিপিনের পানে। বাড়সাইটাকে টানিয়া নিঃশেষ করিয়া শোভা টুকরাটুকু উঠানে ফেলিয়া দিয়া বিপিন বলিল—কালির সেই জাগর...যানে যে... অর্থাৎ তাকে নিয়ে একটু আগে এখানে কিং এসেছেন। বলেন—কালিকে বিয়ে না করিয়ে তাকে ছাড়বেন না। জাগরটার বেশ ভয় চেহারা! গায়ে পাঞ্জাবি জামা, পায়ে পাম্বু... কদমের বিস্ময়ের সীমা নাই! কদম বলিল—তুমি দেখেছো

পুত্রের পাড় কিংই যে উনি কিংলেন। বললুম—এ কে? তাতেই এ-কথা বললেন।

কদম বলিল—লোকটা ভালো মানুষের মতো ঠর সঙ্গে এলো?

—ভাব-গতিক ভালো মানুষের মতোই দেখলুম। কি জানি, তাকে ভয় দেখিয়েছেন, না, লোভ দেখিয়েছেন।...এই পর্যন্ত বলিয়া মহা উৎসাহে ডাকিল,—বাবা,—বাবা...যুমোলে না কি?

ঘরের ভিতর হইতে কেশব-ঠাকুর সাড়া দিল,—হতভাগা ছেলে! খেয়ে-সেয়ে একটু বিশ্রাম করবো, তার জো নেই।

—আর বিশ্রাম! নাও, এ-বিষয়ে দিতে পারো তো কিছু কাঁও মেরে দেবে...হ্যাঁ হ্যাঁ...

—কাঁও। ঘর হইতে কেশব-ঠাকুর বলিল। ঘর এবার শান্ত...

কেশব-ঠাকুর বলিল,—কার বিয়ে? কিসের বিয়ে?

বিপিন বলিল—তোমাদের ঐ কালোর বোন কালিশৌর গো।

—কালিশৌর বিয়ে!

কেশব-ঠাকুর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিল না...ব্যহিরে আসিল।

বিপিন বলিল, যে কথা শুনিয়া আসিয়াছে।

কেশব-ঠাকুর বলিল—ও মেয়ের আবার বিয়ে হয় না কি? হুঁ! কে বিয়ে দেয় দিক দেখি! আমাকে লক্ষ টাকা দিলেও আমি ও-কাজে নেই।

বিপিন বলিল—দিলে বহুং টাকা মেরে দিতে পারো...

কেশব-ঠাকুর বলিল—টাকার লোভে জাত-জন্ম বিসর্জন দিতে হবে? সে-লোভ যদি আমার থাকতো বাপু...

বাপের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিপিন বলিল—জাত-জন্ম নিয়ে ধুরে খেলে দুঃখ ঘুচবে না। কে কত মানছে, দেখছি তো! যার বথানে বাধ। তোমার পয়সা নেই, তাই তোমাকে কেউ মানে না। যার পয়সার জোর আছে, সে সব-কিছু করে তবে থাকে।

কেশব-ঠাকুর বলিল—ও কথা বলিস নে, পাপ হবে। আমাদের বড়-কর্তা...পয়সার জোর এ গ্রামে কার আর অত আছে? তবু তো তিনি অমন ছেলেকে, তার পর তাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন।

বিপিন বলিল—তুমি ঘাই বোলো, ও-কথা আমি মানি না! আমি বুঝি, মনি মনি মনি...ব্রাইটার জানু সান-শাইন, সুইটার জানু হনি।...হুঁপয়সা যেখানে থেকে আসে। পয়সার মান আমি সবার আগে রাখবো।...এ বিয়ে দিতে কেউ না রাজী হয়, আমি রাজী।

কেশব-ঠাকুরের গুখ গভীর হইল। কেশব বলিল—তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

বুক ফুসাইয়া লম্বুভরে বিপিন বলিল—তাতে আমাকে রাজ্য কি রাজ-সিংহাসন খোঁষাতে হবে না।

কেশব-ঠাকুর চটিল; বলিল—এই কথা বলতে এসেছিস। তোর যা ধুশী কর; গিয়ে, আমার কিছু বলবার নেই।...বড় হয়েছো ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছো।

বিপিন বলিল—শিখেছিই তো! এত কাল এত যত্নমান নিয়ে বাস করলে, নিজের অবস্থাটা কিংবদন্তি পেরেছো। পয়সা না থাকলে...এ পেরে না মান কথা আমি বুঝেছি। পয়সা যদি করতে পাবি

ধমক দিয়া কেশব-ঠাকুর বিপিনকে নিবৃত্ত করিল।
বিপিন বলিল—খবরটুকু শুধু দিতে এসেছিলুম—।
বিপিন চলিয়া গেল। কেশব-ঠাকুর গুম্ব হইয়া পাড়াইয়া
ন।

কদম কথাগুলো শুনিয়াছিল। খাওয়া চুকিলে মুখ-হাত ধুইয়া
স্নান কেশবের পানে চাহিয়া বলিল—কি ভাবছো?

কেশব-ঠাকুর বলিল—বিপিনের কথা শুনেছো?

—শুনেছি।

—বামুন-পুরুষের ঘরে জন্মে হতভাগার এমন মতিগতি।

কদম বলিল—পয়সার লোভে ষা-স্ত্র করা উচিত, এ কথা বলছি
তবে কালির এ বিষয়ে বাধা দিলে অর্থ হবে।

—অর্থ! কেশব-ঠাকুরের দু'চোখে আগুন জ্বলিল।

কদম বলিল—আমি পণ্ডিত নই, শাস্ত্রও পড়িনি। তবে এটুকু
ধ, মেয়েটার ইহজন্ম ঐ বিয়ে ছাড়া রক্ষা পাবে না।

—অমন মেয়ের ইহজন্ম রক্ষা না পাওয়াই উচিত। এ বিষয়ে
৪ দিলে অন্যটার প্রায় পাবে। এ স্রোতে লোকে গা ভাসিয়ে
বে। তখন?

কদম বলিল—অন্ত-শত বুঝি না, তবে শুল্লী বাবু বলছিলেন...
কথা শেষ হইল না। কেশব-ঠাকুরের চোখের আগুন আরো
তেজ! কেশব-ঠাকুর বলিল—শুল্লী বাবু তোমার ইষ্টদেবতা
হতে পারেন, কিন্তু আমার নন যে তাঁর কথা শিরোধার্য
করতে হবে।

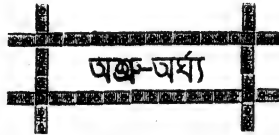
এ শ্বেষ কদমের মধ্যে বিঁধিল। কদম বলিল—তোমাদের
ইষ্টদেবতা নেমে এসে যদি দেখা দিতেন, তা হলে শাস্ত্র-পুরাণের নাম
নিম্নে তোমরা মাছুষের উপর এতখানি অবিচার করতে পারতেন না।

—অবিচার!

কদম ভাবিল, কাহার সঙ্গে বাস্তববাদ করিতেছে? ফল? তাই
চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শাস্ত্র ঘরে বলিল—আমি মুখ্য
মেয়েমানুষ... শাস্ত্র পড়িনি... আমাকে তুমি যেমন হঠাৎ বোঝাতে
পারবে না, আমিও তেমনি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

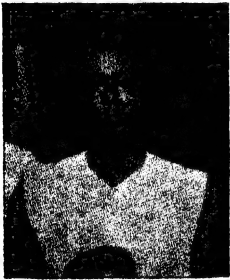
কথাটা বলিয়া কদম সেখান হইতে চলিয়া গেল। কেশব-ঠাকুর
বিস্ময়ের মতো পাড়াইয়া রহিল। মাথার উপর একটা চিল
ডাকিয়া উঠিল, কোথায় বুঝি, লোকনীয় কিছু দেখিয়াছে।

(ক্রমশঃ)



কিরণচন্দ্র ঘোষ

বহুবাজারের প্রেসিড জুরেলার কে, সি, ঘোষ এণ্ড সন্সের
স্বত্বাধিকারী কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১২ই জানুয়ারী রাত্রি
১০-৩০ মিনিটে বৈকুণ্ঠধামে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে



কিরণচন্দ্র ঘোষ

তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়া-
ছিল। তিনি স্প্রেন্সিড জুরে-
লার বি, সরকার মহাশয়ের
কনিষ্ঠ জামাতা ছিলেন।
তিনি ধর্মভীরু, অজাতশত্রু
ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার
২ পুত্র, ২ কন্যা, বিধবা ও
নাতি-নাতনীরা বর্তমান।

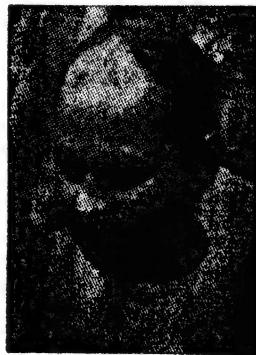
বিধনাথ ভাট্টা

বঙ্গালার সুপরিচিত
অভিনেতা বিধনাথ ভাট্টা

২৮শে মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স
৪৮ বৎসর হইয়াছিল। কিছু দিন যাবৎ তিনি রক্তের চাপ-
বৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের ও
চিত্রের বিশেষ ক্ষতি হইল।

বলাইচন্দ্র সেন

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলাইচন্দ্র
সেন মহাশয় ১১ই ফাল্গুন পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার



বলাইচন্দ্র সেন

বয়স ৪৮ বৎসর হইয়া-
ছিল। তাঁহারই আশ্রাণ
পরিশ্রমে ও রিয়েন্টাল
মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ এবং
পিওর ড্রাগস্ কার্পোরেশন-
ক্যাল গুয়ার্ডসের প্রতিষ্ঠা
হয়। তিনি একাধারে
ব্যবসায়ী এবং শিল্পী
ছিলেন। আয়ুর্কোদে
তাঁহার প্রচুর দান ছিল।
তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে
সকলেই মুগ্ধ হইত।
তাঁহার দানে কালনার
মিউনিসিপ্যাল হাস-
পাতাল, অম্বিকা হাইস্কুল ও কালনা কলেজ পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার
অকাল বিয়োগে বঙ্গালা দেশের প্রভুত ক্ষতি হইল।

বিভূতিভূষণ সরকার

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমানের উত্তর "গিনি হাউস" এর প্রেসিডেন্ট জুয়েলাব বি. সরকার এর সপ্ন সিমিটীতেব সিনিয়র জিরেটীর পরামর্শকণার বি. সরকার মহাশয়ের মহান পুত্র বিভূতিভূষণ সরকার মহাশয় তাঁর কল্যাণের জিহা এক তরুণের রূপে দুহাদুশে পণ্ডিত হইয়াছেন। দুহাদুশে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি হইতে তিনি যেকোন রূপেবৃত্তে ভূগিতেছিলেন। তাঁহার বিবাহ, পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী ও বহু আত্মীয়-বন্ধন বর্তমান। বংশোদ্ভ



বিভূতিভূষণ সরকার



অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

জিলার বাতাপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যুগ্মমেব কথা কোন দিন বিবৃত হন নাই। অর্থ ও সামর্থ্য বিহা গ্রামের উচ্চতম তাঁহাকে বরাবরই সচেষ্ট রাখা যাইত। তিনি সত্যাসীল, মিষ্টভাষী ও লালনীয় ছিলেন। গত তরুণিক তিনি দুস্তরহস্তে রাজার ওজার লোককে অর্থ ও বস্ত্র লান করেন। "গিনি হাউস"এব বিখ্যাত পুনামের মূলে তাঁহার অধ্যবসায় ও সাধুতা বিস্তারিত ছিল। আমরা তাঁহার শোকসম্পন্ন পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এইচ, ডি, বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তনরা ব্যারিষ্টার এইচ, ডি, বসু ২০শে ফাল্গুন অপরাহ্ন প্রায় ৪ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত ফেলক্স লাল, এস, জাহ, লাল, এবং লাল বিনোদ সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। আইনের পক্ষে জ্ঞানের সহিত স্বাধীন মনোবৃত্তি, চারিত্রিক শুচিতা ও মাধুর্য কতিপয় সন্ধ্যাপে তাঁহার ব্যবসা ও ব্যক্তিগত উই-ই প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করে। একাধিকবার তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি নিজ স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহার বৃত্তান্তে কলিকাতা হাইকোর্ট এক জন বিচক্ষণ আইন-ব্যবসায়ী, অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং অস্বাধিক বন্ধু রাখাইল।

কে, এস, গুপ্ত

কেন্দ্রীয় পরিষদের কমপ্লেক্স দলের বিশিষ্ট সভ্য কে, এস, গুপ্ত

ব্যাংকট দ্বন্দ্বিত বন্ধুতা করিবার সময় তিনি একমাত্র অগ্রহণীয় সাজাহীন হইয়া পড়েন। পরিষদের অধিবেশনে কিছু সময় পরে গণ হয় এক ডাঃ দেশবর্ষ ও অজ্ঞাতেরা তাঁহার চেহারা কিংবাটা অস্বাভাবিক বখাসাখা চোঁকা করেন। কিন্তু সমস্ত চোঁকা খুঁজিয়া

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা। পারলিসিটি সার্ভিসের প্রধানকারী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪শে ফাল্গুন পরলোক গমন করিয়াছেন।

কিন্তু তাল দ্বারা চূড়ান্তে বৃত্তিগত। বৃত্তাকারে তাঁহার বয়স ৬০ বছর হইয়াছিল। তিনি সচিব-কোরে এক জন অল্প প্রবয় এক তাঁহার সচিবীয় পদেব বহুসংখ্যক পুরাতন।

খোলাদ্বারের তাঁহার জন্ম ১৮৭৮, কলিকাতার প্রথম কোম্পানীর মাসিটি অন্তর্ভুক্ত। তিনি অল্প দুঃসময়, কতিপয় পুরাতন এবং লম্বা জীবন। এক কতিপয় এক পরিবার তাঁহার জিহা ওজার তিনি সত্যায় পাঠিত।

আমরা তাঁহার শোকসম্পন্ন পরিবারের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

কলকাতা কটন মিলের সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ১৫ ফাল্গুন পরলোক গমন করেন। বৃত্তাকারে তাঁহার বয়স ৬০ বছর হইয়াছিল।

ব্যবসায়ের সাক্ষ্য একা বৃত্তাকারে বাকালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা নেব গ ঠান-কর্তা হিসাবে তাঁহার নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত।

এইস পরীক্ষা পাশ করিয়া শিক্ষা-নবীশকর্মে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দিন পরে নিজে একটি ইন্ডিয়ানাই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন—ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য কোম্পানী। অতি

অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী পুনায় অধীন করে। ভট্টাচার্য-কোম্পানী অন্যান্য অন্যান্য কোম্পানী একজন প্রকৃত ব্যবসায়ী



সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

আন্তঃপ্রাদেশিক হাক প্রতিযোগিতা

গোয়াপুরের এ বৎসর নিখিল

ভারতীয় আন্তঃপ্রাদে-

শিক হাক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
হইয়া গিয়াছে। ভূপাল দল শেষ
খেলায় মাত্র এক গোলে যুক্ত-
প্রদেশকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী
সম্মান লাভ করিয়াছে।

হায়দ্রাবাদকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া যুক্তপ্রদেশ প্রতি-
যোগিতার উদ্বোধন করে। যুক্তপ্রদেশের দৃষ্টান্তের খেলা বিশেষ
ক্রেমসনীয় হয়। মধ্যপ্রদেশ মধ্য-ভারতের নিকট ৭ গোলে শোচনীয়
ভাবে বিশ্রাস্ত হয়। টিকমগড়ের প্রাক্তন খেলোয়াড় জাহীর মধ্য-
ভারতের শক্তি বৃদ্ধি করেন। মাদ্রাস একাকী পাঁচটি গোলে করেন ও
অব্যবহৃত প্রয়াসে কুশলতার পরিচয় দেন। গোলরক্ষক সাকী অপূর্ণ
বৃত্ততার সহিত গোলরক্ষা করিয়াও বরোদাকে ভূপালের বিরুদ্ধে ৬-০
গোলে পরাজয়ের ধানি হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরবর্তী
বাউ ও যুক্তপ্রদেশ পরস্পরকে কোনক্রমে এক গোলে পরাজিত করে।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রথম দিন অমীমাংসার পরে বোম্বাই
প্রাদেশিক দলকে অল্পকণ্ঠে তাইই পরাজিত করে। কোয়াটার
ফাইনালে মধ্য-ভারতকে এক গোলে পরাজিত করিয়া
বাঙলা গত বৎসরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ
করে।

ক্রীড়ামুরগী বাঙালীদের মনে বিপুল উৎসাহের
সঞ্চার হয়। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের নিকট সেমিকাইজালে
মাত্র এক গোলে পরাজয় বরণে বাঙলার ললাটে
আর এক দফা কলঙ্কের ছাপ পড়ে। আশ্রণ চেরা
করিয়াও বাঙলার খেলোয়াড়গণ গোলে পরিশোধ করিতে
পারে নাই। যুক্তপ্রদেশ না কি খেলায় অবৈধ ভাবে
শক্তিমত্তার আভ্রয় নেয় ও বাঙলাকে প্রতিহত করে।
ইহা হৃদয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনের হল মাত্র। আমাদের
খেলার আমূল ক্ষতের প্রয়োজন। অধিকার-সর্বস্ব ও
ক্ষমতা-প্রিয় পরিচালকগণের অবহিত হওয়ার সময়
আসিয়াছে। দলাদলি ও চক্রান্তবাদের অবগান করিয়া
প্রকৃতপক্ষে বাঙলার খেলোয়াড়গণকে প্রবৃত্ত করার
যত শক্তিশালী স্ফূর্তক ও শিক্ষকের প্রয়োজন।
খেলোয়াড়দের মধ্যেও নিয়মামুখবর্তিতা, ভীষ আদর্শ ও বাঙলার লুপ্ত
গৌরব পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে আর কোন আশা নাই।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পরাজিত করিয়া ভূপাল ফাইনালে
যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।

বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণ—ডেভিড; লাইম ও মীড়; এল
মুখার্জী, জলুখ ও কে প্যালিবার্ড; এ মিত্র, চব্বীং বার, কার
(অধিনায়ক), জ্যাঙ্গেন ও রোড।

বোম্বায়ে নাইটু-জয়ন্তী উৎসব

মোহনবাগান দ্রাবের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয়
ক্রিকেট দল বোম্বায়ে ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়া উদ্যোগে লে-



এম, ডি, ডি

এতদপক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রদর্শনী
ক্রিকেট খেলায় ক্রিকেট-জগতের বহু
খ্যাতনামা নবীন ও প্রবীণ খেলোয়াড়
যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের সৌভাব্য
বৃদ্ধি করেন। অধ্যাপক দেওবরের
নেতৃত্বে ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়া
নাইটু দলকে এক ইনিংস ও ১৩
রাশে পরাজিত করে। বিজয়ী দলকে
মানকড়, বিজয় মার্কেট, হাজারী ও

কুপার আউট না হইয়া শতাধিক রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।
সর্বসম্মত ৬৫৪ রাণের প্রত্যুত্তরে নাইটু দল প্রথম ইনিংসে ৩১৭
ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪১ রাণ করিয়া দ্বিতীয় দফার খেলায় ২৪১ রাণ করিতে
সমর্থ হয়। উভয় ইনিংসে যথাক্রমে গুলমহম্মদ ১১৫ ও বিলাতী
খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন ১০০ রাণ করেন। হাজারী, আমীর
এলাহী ও ক্রিয়েগান প্রত্যেক ইনিংসে তিনটি করিয়া উইকেট
দখল করেন।

শেষ দিন উদীয়মান বোলার হাফিজ প্রতি ওভারে একটি করিয়া
উইকেট দখল করিয়া পাঁচ জনকে আউট করেন।

পি, ডি, এম, জিমখানার উদ্যোগে ভারতীয় ক্রিকেট কনফেডারেশন
বোর্ডের সভাপতি ডাঃ মুকারায়ণের নেতৃত্বে লেঃ কর্ণেল নাইটুকে



সি, কে, নাইটু



মার্কেট

বিশেষ সর্বজনীন আশ্রয়িত করা হয়। নাইটু দল বিভিন্ন গুণাবলীর
বর্ণনা-প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, নাইটু এক সময়ে নিখিল বিশ্বের
শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের
উন্নয়নকল্পে তাঁহার অবদান অসামান্য। তিনি কেবল এক জন
হৃদয় খেলোয়াড় ও নিপুণ শিল্পী নহেন, তিনি ক্রিকেট-জগতের
অন্ততম আচার্য। বহু শিল্পজ্ঞী তাঁহার অনুপ্রেরণায় আজ ভারতীয়
ক্রিকেট-গণের উজ্জল তারকা। তবু হোমী বোম্বীর নেতৃত্বে
ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়া তাঁবুতে জাহুত সভায় নাইটুকে প্রদর্শনী
খেলার সংগৃহীত ১৮ হাজার টাকা মুদ্রার জোড়া উপহার দেওয়া
হইয়াছে। বোসের সমাদর করিয়া বোম্বাই আপনাকে সন্মানিত
করিয়াছে।

বিভূতিভূষণ সরকার

২৫শে ফাল্গুন বহুবাজার স্ট্রিটের "গিনি হাউস"এর সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার বি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেডের সিনিয়র ডিরেক্টর পরলোকগত বি. সরকার মহাশয়ের মধ্যম পুত্র বিভূতিভূষণ সরকার মহাশয় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিছু দিন হইতে তিনি রক্তের চাপ-বৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বিধবা, পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন বর্তমান। যশোহর



বিভূতিভূষণ সরকার



অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

জিলার বাত্রাপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বগ্রামের কথা কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। অৰ্ধ ও সামর্থ্য দিয়া গ্রামের উন্নতিতে তাঁহাকে বরাবরই সচেষ্ট দেখা যাইত। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাবী ও দানশীল ছিলেন। গত দুর্ভিক্ষে তিনি মুক্তহস্তে হাজার হাজার লোককে অন্ন ও বস্ত্র দান করেন। "গিনি হাউস"এর বিশ্ববিশ্রুত সুনামের মূলে তাঁহার অধ্যবসায় ও সাধুতা বিজ্ঞান ছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এইচ, ডি, বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এইচ, ডি, বসু ২০শে ফাল্গুন অপরাহ্ন প্রায় ৪ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ, এস, আর, দাশ, এবং সার বিনোদ মিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। আইনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের সহিত স্বাধীন মনোবৃত্তি, চারিত্রিক শুচিতা ও মাঝিত রুচির সংযোগে তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তি, চারিত্রিক শুচিতা ও মাঝিত রুচির সংযোগে তাঁহার ব্যবসা ও ব্যক্তিগত হই-ই প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করে। একাধিকবার তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি নিজ স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতা হাইকোর্ট এক জন বিচক্ষণ আইন-ব্যবসায়ী, অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং অমায়িক বন্ধু হারাইল।

কে, এস, গুপ্ত

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কে, এস, গুপ্ত

বাজেট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। পরিষদের অধিবেশন কিছু ক্ষণ বন্ধ রাখা হয় এবং ডাঃ দেশমুখ ও অক্সফোর্ড তাঁহার চেষ্টনা করিয়াই আনিবার জ্ঞাত বধ্যসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা পাবলিসিটি সার্ভিসের স্বাধিকারী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪শে ফাল্গুন পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছু কাল যাবৎ হৃদ্রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রচার-ক্ষেত্রে এক জন অগ্রণী প্রবর্তক এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠান ভারতে সর্বাপেক্ষা পুরাতন।

খেলাধুলায়ও তাঁহার বিশেষ সখ ছিল, কলিকাতায় প্রথম রেফারিগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি অত্যন্ত সদালাপী, অতিথি-পরায়ণ এবং দয়ালু ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্র এবং পরিবার তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইত।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

বঙ্গলক্ষী কটন মিলের সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ৮ই ফাল্গুন পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। ব্যবসায় সাফল্য এবং বৃহত্তম বাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন-কর্তা হিসাবে তাঁহার নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত।

এটাস পরীক্ষা পাশ করিয়া শিক্ষানবীশরূপে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে নিজে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন—ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী। অতি

অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী সুনাম অর্জন করে।

তাঁহার-অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ এক জন প্রকৃত ব্যবসায়ী



সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

আন্তঃপ্রাদেশিক হাক প্রতিযোগিতা

গোয়াক্ষুণের এ বৎসর নিখিল

ভারতীয় আন্তঃপ্রাদে-

শক হাক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
হইয়া গিয়াছে। ভূপাল দল শেষ
খেলায় মাত্র এক গোলে যুক্ত-
প্রদেশকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী
সম্মান লাভ করিয়াছে।

হাঙ্গরাবাদকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া যুক্তপ্রদেশ প্রতি-
যোগিতার উদ্বোধন করে। যুক্তপ্রদেশের মস্তকের খেলা বিশেষ
প্রশংসনীয় হয়। মধ্যপ্রদেশ মধ্য-ভারতের নিকট ৭ গোলে শোচনীয়
ভাবে বিপর্যস্ত হয়। টিকমগড়ের প্রাক্তন খেলোয়াড় জাহীর মধ্য-
ভারতের শক্তি বৃদ্ধি করেন। মাণ্ড একাকী পাঁচটি গোল করেন ও
অবরোধ প্রয়াসে কুশলতার পরিচয় দেন। গোলরক্ষক সাকী অপূর্ণ
দৃঢ়তার সহিত গোলরক্ষা করিয়াও বরোদাকে ভূপালের বিরুদ্ধে ৬-০
রাজিও যুক্তপ্রদেশ পঞ্জাবকে কোনক্রমে এক গোলে পরাজিত করে।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রথম দিন অমীমাংসার পরে বোম্বাই
প্রাদেশিক দলকে অল্পরূপে ভাবেই পরাজিত করে। কোয়ার্টার
ফাইনালে মধ্য-ভারতকে এক গোলে পরাজিত করিয়া
বাঙলা গত বৎসরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ
করে।

ক্রীড়ামুরাঙ্গী বাঙালীদের মনে বিপুল উৎসাহের
সঞ্চার হয়। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের নিকট সেমিফাইনালে
মাত্র এক গোলে পরাজয় বরণে বাঙলার ললাটে
আর এক দশা কলঙ্কের ছাপ পড়ে। আগ্রাণ চেষ্টা
করিয়াও বাঙলার খেলোয়াড়গণ গোল পরিশোধ করিতে
পারে নাই। যুক্তপ্রদেশ না কি খেলায় অর্থাৎ ভাবে
শক্তিমত্তার আশ্রয় নেয় ও বাঙলাকে প্রতিহত করে।
ইহা হর্বলের আত্মপক্ষ সমর্থনের ছল মাত্র। আমাদের
খেলার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। অধিকার-সর্ব্বণ ও
ক্ষমতা-প্রিয় পরিচালকগণের অবহিত হওয়ার সময়
আসিয়াছে। দলাদলি ও চক্রান্তবাদের অবসান করিয়া
প্রকৃতপক্ষে বাঙলার খেলোয়াড়গণকে প্রবুদ্ধ করার
মত শক্তিমূল্য সংস্কারক ও শিক্ষকের প্রয়োজন।

খেলোয়াড়দের মধ্যেও নিয়মামুখবর্তীতা, তীব্র আগ্রহ ও বাঙলার লুপ্ত
গৌরব পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে আর কোন আশা নাই।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পরাজিত করিয়া ভূপাল ফাইনালে
যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।

বাঙলা পক্ষের খেলোয়াড়গণ—ডেভিড; লাইম ও মৌড়; এস
মুখার্জী, ডালুজ ও জে গ্যালিবার্ড; এ মিত্র, চরভাং রায়, কার
(অধিনায়ক), জ্যাকেন ও রোড।

বোম্বায়ে নাইটু-জয়ন্তী উৎসব

মোহনবাগান ক্লাবের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয়
বোম্বায়ে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ান উজ্জাগে লে:



এম, ডি, ডি

এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রদর্শনী
ক্রিকেট খেলায় ক্রিকেট-জগতের বহু
খ্যাতনামা নবীন ও প্রবীণ খেলোয়াড়
যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব
বৃদ্ধি করেন। অধ্যাপক দেওবরের
নেতৃত্বে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া
নাইটু দলকে এক ইনিংস ও ১৬
রাণে পরাজিত করে। বিজয়ী পক্ষে
মানকড়, বিজয় মার্চেন্ট, হাজারী ও
কুপার আউট না হইয়া শতাধিক রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।
সর্বসমেত ৬৫৪ রাণের প্রত্যুত্তরে নাইটু দল প্রথম ইনিংসে ৩১৭
ও ফলা অন করিয়া দ্বিতীয় দফার খেলায় ২৪১ রাণ করিতে
সমর্থ হয়। উভয় ইনিংসে যথাক্রমে গুলমহম্মদ ১১৫ ও বিলাতী
খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন ১০০ রাণ করেন। হাজারী, আমীর
এলাহী ও কিশোরচাঁদ প্রত্যেক ইনিংসে তিনটি করিয়া উইকেট
দখল করেন।

শেষ দিন উদীয়মান বোলার হাফিজ প্রতি ওভারে একটি করিয়া
উইকেট দখল করিয়া পাঁচ জনকে আউট করেন।

পি, ডি, এম, জিমখানার উজ্জাগে ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল
বোর্ডের সভাপতি ডা: মুন্সাবায়ণের নেতৃত্বে লে: কর্ণেল নাইটুকে



সি, কে, নাইটু



মার্চেন্ট

বিশেষ সর্ধনায় আপ্যায়িত করা হয়। নাইটু বিভিন্ন গুণাবলীর
বর্ণনা-প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, নাইটু এক সময়ে নিখিল বিশ্বের
শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন খেলোয়াড়ের অন্যতম ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের
উন্নয়নকল্পে তাঁহার অবদান অসামান্য। তিনি কেবল এক জন
দুর্দর্শ খেলোয়াড় ও নিপুণ শিল্পী নহেন, তিনি ক্রিকেট-জগতের
অন্যতম আচার্য্য। বহু শিল্পরতী তাঁহার অনুপ্রেরণায় আজ ভারতীয়
ক্রিকেট-গগনের উজ্জল তারকা। শ্রব হোমী মোদীর নেতৃত্বে
ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ান তাঁবুতে জাহাজ সভায় নাইটুকে প্রদর্শনী
খেলায় সংগৃহীত ১৮ হাজার টাকা মূল্যের ভোড়া উপহার দেওয়া
হইয়াছে। যোগ্যের সমাদর করিয়া বোম্বাই আপনাকে সম্মানিত

রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠতম প্রতিযোগিতা রঞ্জী ট্রফীর অবসান হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই দল হোলকারকে ৩৭৪ রাণে পরাজিত করিয়া আসোটা বঙ্গের বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছে।

প্রথম সেমিফাইনাল

প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় বোম্বাই উত্তর ভারতকে ৮৭ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে।

উত্তর-ভারত : মহম্মদ সৈয়দ (অধিনায়ক), নাজার মহম্মদ, এ হাফিজ, মুনীলাল, রামপ্রকাশ, এম ভাইডী, এম আসলাম, ইমতিয়াজ আমেন, ফজল মামুন, বদরুদ্দীন ও মুনোয়ার খাঁ।

বোম্বাই : বিজয় মার্কেট (অধিনায়ক), এম বারজী, কোব, ইব্রাহিম, পালোয়াকার, আর এস মুলী, আর এস কুপার, ফাডকার, এম কে মল্লী, উট্ট এন মার্কেট ও তাবাপোর।

রাণ-সংখ্যা

উত্তর-ভারত : ১ম ইনিংস—৩৬০ রাণ (হাফিজ ১৪৪, রামপ্রকাশ ৪৮, ইমতিয়াজ ৫৫, ফাডকার ৬১ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—৩১২ রাণ (নাজার মহম্মদ ৮৬, মুনীলাল ৫৫)।

বোম্বাই : ১ম ইনিংস—৬২০ রাণ (ইব্রাহিম ৬৭, কুপার ৪৮, আর এস মুলী ১১০, উল্ল মার্কেট ১৮০, তাবাপোর ৪১, হাফিজ ১০৮ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ৫১ রাণ।

বোম্বাই ৮৭ উইকেটে জয়ী।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

হোলকারের নিকট মাত্রাঙ্গ ৮৭ উইকেটে পরাজিত হয়।

মাত্রাঙ্গ : সি পি জনটন (অধিনায়ক), বকিলান, রিচার্ডসন, নেলাব, গোপালম, রামসিং, অনন্তনারায়ণ, জিনিবাস, পরাগকুশুম, রত্নাচারী, আলভা।

হোলকার : সি কে নাইডু (অধিনায়ক), সি এস নাইডু, মুস্তাক আলী, সর্কাতে, জগদেল, ভায়া, ভাগীরথক, কম্পটন, গাইকোয়াড, বাওরাল, প্রতাপসিং।

রাণ-সংখ্যা

মাত্রাঙ্গ : ১ম ইনিংস—২৫৪ রাণ (জনটন ৬৭, আলভা ৪০, সর্কাতে ১০ রাণে ৬টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—১৫৮ রাণ (রিচার্ডসন ৪৪, সর্কাতে ৬০ রাণে ৭টি উইকেট)।

হোলকার : ১ম ইনিংস—৪০০ রাণ (সর্কাতে ৭৪, কম্পটন ৮১, সি কে নাইডু ৫২, সি এস নাইডু ৪৪, ভায়া ৩৬, প্রতাপসিং ৪০, রত্নাচারী ১১০ রাণে ৭টি ও রামসিং ১৪১ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ১১ রাণ।

সর্কাতেপক্ষ উল্লেখযোগ্য, উত্তর বেলাতেই বিজিত দল বাক্সে যাত্রা ৫০ ও ১১০ রাণের ব্যবধানে ইনিংস পরাজয়ের গ্রানি হইতে অক্ষাহিত পায়।

জন্ম শত রাণে বঞ্চিত হন। উত্তর ইনিংসের খেলায় মোট ৮০০ সেঞ্চুরী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫১ রাণ করিয়া রঞ্জী ট্রফি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। এ বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তি খেলার তিনি শতাধিক রাণ করার জন্য অজ্ঞান করেন। উপরন্তু মোট ১০৮ রাণ সংগ্রহ করিয়া মহাবীর সোহনী কর্ক ১১৭১ গুণে সর্বাধিক উচ্চতম রাণ-সংখ্যা রাণের রেকর্ড অতিক্রম করেন। মুস্তাক আলী যথাক্রমে ১০০, ১০১ রাণ করিয়া উত্তর ইনিংসে শত রাণ সম্পাদনের নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিজয়ী অধিনায়ক মার্কেট নির্ভর করে পেলিয়া। ভারতের প্রথম বোলারগণের বিক্ষেপে ২৭৮ রাণ সম্পাদন করিয়া নিজের বিরুদ্ধে আর এক লক্ষ পরিচয় দেন।

বিখ্যাত বিলাতী টেষ্ট খেলোয়াড় জেনিস কম্পটনের কল্যাণে অনবদ্য ব্যক্তিগত পুণ্যের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ১ম ইনিংসে ও ২য় ইনিংসে খেলার মাঠের দখল খেলার মোটেই হারিয়ে থাকে না। কিন্তু এইরূপ বিশ্রীত অবস্থার মধ্যেও আউট না হইয়া ২৪১ রাণ করিয়া তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে এক অভিন্ন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮৭ম উইকেটে বাওরালের সহযোগিতায় ১০০ রাণ এই প্রতিযোগিতায় নূতন রেকর্ড।

বোম্বাই : বিজয় মার্কেট (অধিনায়ক), ইব্রাহিম, মল্লী, কুপার, উল্ল মার্কেট, কোট, তাবাপোর, ফাডকার, পালোয়াকার, বারজী।

হোলকার : সি কে নাইডু (অধিনায়ক), সি এস নাইডু, মুস্তাক আলী, নিখলকর, সর্কাতে, জগদেল, ভাগীরথক, কম্পটন, গাইকোয়াড, ভায়া ও বাওরাল।

আম্পায়াবন্দ্য : লোরে ও রামচন্দ্র।

রাণ-সংখ্যা

বোম্বাই : ১ম ইনিংস—৪৬২ রাণ (মুলী ১৮, উল্ল মার্কেট ১০, পালোয়াকার ৭৫, কুপার ৫২, ইব্রাহিম ৪৪, নিখলকর ৬৮ রাণে ৩টি ও সি এস নাইডু ১৫০ রাণে ৬টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—৭৬৪ রাণ (মুলী ১৫১, বিজয় মার্কেট ১০০, কুপার ১০৪, উল্ল মার্কেট ৭০, মল্লী ৬০, সি এস নাইডু ২২৫ রাণে ৫টি উইকেট)।

হোলকার : ১ম ইনিংস—৫৬০ রাণ (সর্কাতে ৬৭, মুস্তাক আলী ১০১, সি এস নাইডু ৫৫, জগদেল ৪০, ফাডকার ৭৫ রাণে ৫টি ও তাবাপোর ৬৪ রাণে ৩টি উইকেট)।

২য় ইনিংস—৪১২ রাণ (মুস্তাক আলী ১০০, কম্পটন ৮১, আউট ২৪১, নিখলকর ৪০, কোট ১৪ রাণে ২টি, তাবাপোর ১০০ রাণে ২টি ও বারজী ১০০ রাণে ৩টি উইকেট)।

বোম্বাই ৬৭৪ রাণে জয়ী।

পূর্ণ-বঙ্গের বিজয়

১১০৪—৩৫	বোম্বাই	১১০১—৪০	মহাবীর
৩৫—৩৬	বোম্বাই	৪০—৪১	

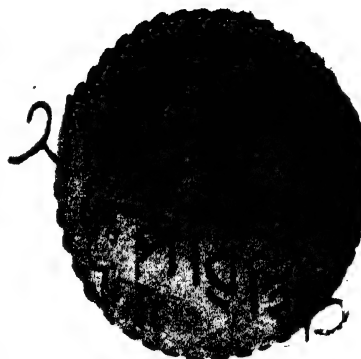
যুদ্ধ অকস্মাৎ শেষ হইবে ?—

জাতিগণের প্রচার-সচিব ডাঃ

গোয়েবলস অকস্মাৎ আশা
করিয়াছেন যে, যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইবে।
কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঠার ম্যাকেন্সী
কিংও আশা করিয়াছেন যে, আগামী
জুনের মধ্যেই যুরোপীয় যুদ্ধের অবসান
হইবে। তাঁহার এই আশা করিবার
"strong reason"ও না কি আছে।
এই "হঠাৎ" অবসানের চেত্ন কি, এক
"strong reason" কি ও আন্ত-
জাতিক পরিস্থিতিতে আকস্মিক কি
অভিনব পরিবর্তন আসন্ন, তাহার কোন
কথা জানা যায় নাই।

ক্রিস্টি-বৈঠক—

আগামী ২০শে এপ্রিল বার্নেইমসিয়ার বৈঠক বসিতেছে অর্থাৎ
ইং-মার্কিন-চীনা সোলিয়েট শক্তিসমূহ আমন্ত্রণ করিতেছেন। এ যুদ্ধে
নিমন্ত্রিত হয় নাই পোলাণ্ড। যদি নিমন্ত্রিত হইয়াও যোগদান



শ্রীতরানীথ রায়



যুরোপের পশ্চিম-বর্গক্ষেত্রে কানাডিয়ান সাজোয়াবাহিনী সীড নদীর বেলী সেতু
অতিক্রম করিতেছে

করিতে অস্বীকার করিয়াছে। যুদ্ধান্তে আপন আপন সুবিধা সংগ্রহের
জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের ও অন্যান্য জাতিগণ-কলম্বুক রাষ্ট্রগুলি জাতিগণের বিস্তারে

সাংবাদিক মতলে বাক্যের ঝড় বহিয়াছে। কিন্তু সকল বাক্যকে
চাপা দিয়া এক দিকে মি: রুডলফট অন্ত দিকে মি: চার্লিস ও মি:
এটর্নী ইডেন বলিয়াছেন, সব ঠিক ছাড়া। ঠালিন কথা বলেন না—
সুতরাং কথা বলেনও নাই। তবে 'রিভিউ অব ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস'

পত্র এই বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা-প্রদত্তে
মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানকে ঘায়েল
করিতে রুশ-সাহায্য ক্রম করিবার জন্য
পোলাও সম্বন্ধে রুশিয়াকে তাহার কাম্য
সকল সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। কথাটা
এই—"Signs are that Stalin is
for intervention against
Japan—because if successful,
Russia would thus eliminate
the only remaining world
power outside the Anglo-
Saxon group. She would
dominate Asia. Her influence
over India alone would be
enormous. If the present
Russian offensive in Europe
fully succeeds then Stalin
may have enough influence
at home to permit him to
enter the Pacific war."

কিন্তু এক জাতিগণের সহিত রুশিয়ার
যুদ্ধের অবসান প্রয়োজন। কারণ, এ দিকে
"The strain on Russia is so
great that any serious pro-
longation of struggle with

Germany would greatly reduce and might
eventually eliminate for a considerable time her
capacity to make war elsewhere."

জাৰ্জাণ পৰৱৰ্ত্তি-সচিব ৱিবেনটপ পৰ্য্যন্ত একশ ইঞ্জিত দিয়া বলিয়াছেন যে, জাৰ্জাণী কশিয়ার সহিত আপোৰ কৰিবে সেও ভাল, তবু এ্যাসো-ভান্নন শক্তি-সম্বন্ধে নিকট আত্মসমৰ্পণ কৰিবে না। যদি অ-হিটলাৰ-পন্থী জাৰ্জাণী কশিয়ার সহিত বন্ধ কৰে, তাহা হইলে আন্তৰ্জাতিক পৰিস্থিতিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিবৰ্ত্তন হইয়া যায়। জাপানেৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিবার লোভ দেখাইয়া কশিয়াকেও জাপানেৰ সহিত তাহাৰ অনাক্রমণ চুক্তিৰ খেলাপও কৰিতে হয় না।

জাপানেৰ বিৰুদ্ধে হিটলাৰেৰ অভিযোগ—

জাপানেৰ বিৰুদ্ধে হিটলাৰ না কি অভিযোগ কৰিয়াছেন যে, জাপান প্ৰতিশ্ৰুত হইয়াছিল, জাৰ্জাণী যখন কশিয়াকে আক্রমণ কৰিবে তখন জাপানও কশিয়াকে আক্রমণ কৰিবে। কিন্তু জাপান বিৰাসম্মতকতা কৰিয়াছে বলিয়াই জাৰ্জাণীৰ পৰাজয় হইতেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে কশিয়া জাৰ্জাণীকে যে ভাবে আক্রমণ কৰিতেছে, তাহাতে হিটলাৰ পৰ্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। রুশ-জাৰ্জাণী বণক্ষেত্রে রুশ সৈন্য বাণ্টিক উপসাগরে উপনীত হইয়াছে। সেনাপতি মাৰ্শাল য়োকেনাভি ও মাৰ্শাল থুকোভেৰ বাহিনী মিলিত হইতে চেষ্টা কৰিতেছে, জাৰ্জাণীও কটোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিয়া তাহাঙ্গিকে বাধা দিতেছে। কিন্তু এমন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইউক্ৰেণেৰ বণাঙ্গনে জাৰ্জাণীৰ অভ্যন্তরে রুশ গেরিলা সৈন্যগণ জাৰ্জাণীকে বিশেষ বিপন্ন কৰিতেছে।

পশ্চিম বণক্ষেত্রেৰ অবস্থা।

পশ্চিম বণাঙ্গনে জাৰ্জাণ প্ৰবল প্ৰতিৰোধ সত্ত্বেও ৱাইন নদীৰ পশ্চিম তটেৰ প্ৰায় ১১ মাইল মিত্ৰপক্ষৰ কবলগত হইয়াছে ও তাহাঙ্গের প্ৰভাব প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিগফ্ৰিড লাইন বলিয়া বৰ্ত্তমানে আৰ কিছু নাই। ৱাইনল্যাণ্ড বিখণ্ডিত হইয়াছে। সেনাপতি কনষ্টাটের নেত্বে জাৰ্জাণ সৈন্যরা প্ৰবল বাধা দিতেছে। তথা বাইতেছে, হিটলাৰ কনষ্টাটকে নতুন মান-পদক প্ৰদান কৰিয়াছেন। ইহা তাহাৰ সাক্ষ্যেৰ জ্ঞত কি অস্ত কাকণ, তাহা জানা যায় নাই।

‘নিউজ ক্ৰণিকলের’ মন্তব্য-স্থিতি সংবাদসভা মি: পল উইনটনটন জানাইয়াছেন—“In the East as in the West advance has been no picnic.”

জাৰ্জাণীৰ মরণ কামড়

আমেৰিকাৰ ইউনাইটেড প্ৰেস ইককলম হইতে সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিয়াছিলেন যে, জাৰ্জাণ নায়কগণ বলিতেছেন, তাঁহারা অৱগত হইয়াছেন, মিত্ৰপক্ষ এমন বিৰবাণ প্ৰয়োগ কৰিবে বাহা কেবল জমিৰ উপৰ ছড়াইয়া পড়িবে না, এই গ্যাস গাছে গাছে, আটকাইয়া থাকিবা কিছু দিন উপৰ হইতে কৌটা কৌটা মাটিতে পড়িতে থাকিবে। হিটলাৰও না কি বিস-গ্যাস ব্যবহার কৰিবেন কলিয়া স্থিৰ কৰিয়াছেন।

জাৰ্জাণ বেতারমুখৰ ডা: গোয়েবেলস (২৮শে ফেব্ৰুৱাৰী) তাই ভয়

পৰাই মাৰ্ক বাস পড়িতেই ইংলেণ্ড উপৰ জাৰ্জাণীৰ বিমান আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। উত্তৰ ও দক্ষিণ ইংলেণ্ড উত্তৰ দিকেই আক্রমণ হয়। দীৰ্ঘকাল দীৰ্ঘ থাকিয়া জাৰ্জাণীৰ উড়ন্ত বোমা আবার ইংলেণ্ড উপৰ আসিয়া পড়ে। অনেক মনে কৰিতেছেন যে, জাৰ্জাণীৰ পশ্চিম বণাঙ্গনেৰ বহু শতাব্দ হইতে এই “বাক বোমা”গুলি প্ৰেৰিত হইতেছে। ডি-১ বোমা অপেক্ষা এই বোমাগুলি বড় ও ক্ৰতগামী, ইহাঙ্গের পাঠাও খুব দূৰ।

প্ৰাচ্যেৰ বণাঙ্গন

চীনেৰ উপকূল সৈন্য নামাইবার জন্ত প্ৰকাণ্ড জোড়জোড় চলিতেছে উত্তৰ পক্ষে। মিত্ৰপক্ষ কোথায় সৈন্য নামাইবে তাহাৰ স্থান নির্ণয় পৰ্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। বলা হইতেছে যে, সাংহাই হইতে কনসী ইম্বেচীনেৰ সীমান্তেৰ মধ্যবৰ্ত্তী কোন স্থানে চীনকে জাপ কৰিবার জন্ত এ্যাসো-ভান্ননসেৰ সৈন্য নামিবে। এই উপকূল বন্ধা কৰিবার জন্ত জাপান বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ কৰিয়াছে বলিয়া শুনা বাইতেছে।

মিত্ৰসৈন্যগণ ইয়াবতীৰ পূৰ্ব্বতট হইতে ৮৫ মাইল স্থান ইতিমধ্যে দখল কৰিয়াছে। জাপানীয়া মাৰ্শালসেৰ চাৰি দিকে ৮টি বিমানক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰে। মিত্ৰপক্ষের বিমানবাহী সৈনিক দল মিটকিন দখল কৰিয়া মাৰ্শালস বন্দরেৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিয়াছে।

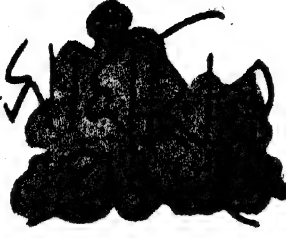
মিত্ৰপক্ষ আশা কৰিতেছে যে, উত্তৰ-ব্ৰহ্ম বিপন্ন হইয়া জাপান বেজায় মালয় ত্যাগ কৰিয়া বাইবে। কিন্তু অনেক আবার উল্টা আশঙ্কাও কৰিতেছে যে, নিউগিনি, নিউইউনে প্ৰভৃতি স্থানে জাপান যক্ষ্মসৈন্যেৰা যে ভাবে দীৰ্ঘকাল বাধা দিয়া বাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, মালয় ও দক্ষিণ-ব্ৰহ্ম বন্ধাৰ চেষ্টাই জাপানেৰ শেষ আশা। মিলিশাইন বীপপুত্ৰেৰ মাৰ্কিন অভিযান এক বৃষ্টি ১৪তম বাৰ্হিনীৰ মাৰ্শালস অভিযান এক বিৰাট সাঁড়াষ্টী অভিযান বলিয়াই অনেক অনুমান কৰিতেছেন; ইহাৰ সহিত অবিকৃত চীনেৰ উপকূল ও জাপ বীপপুত্ৰে মিত্ৰসেনা অবতৰণ কৰিয়া সাহায্য কৰিলেই অভিযান সম্পূৰ্ণ হইবে। ইতিমধ্যেই মিত্ৰপক্ষের বিমান-বাহিনীকে বঙ্গোপসাগরে জাপ মালবাহী জাহাজ ও মোটর লঞ্চ আক্রমণ কৰিতে দেখিয়া মনে হয়, জাপানকে চাৰি দিক হইতে আক্রমণ কৰিবার আয়োজন হইয়াছে।

জাপানেৰ প্ৰধান বন্দী আশঙ্কা কৰিয়াছেন যে, মিত্ৰপক্ষ যদি জাপান আক্রমণ কৰিয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰীৰ যুদ্ধ সহজ ও দক্ষিণ কৰিবার বতলন কৰিয়াছে। বঙ্গুৎ জাপানীদিগকে বিপন্ন কৰিবার দল তাহারা আইওজিমা ও সংলগ্ন বীপগুলিতে সৈন্য নামাইতে আৰম্ভ কৰিয়াছে। মিত্ৰপক্ষ অনুমান কৰিয়াছিল, অবশ্যে কাৰ্য্যোদ্ধাৰ হইবে। কিন্তু ২৫শে ফাৰ্ভন মাৰ্কিন নৌসেনাপতি এডমিৰাল নিমিচ সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন, আইওজিমাৰ যুদ্ধ যে প্ৰচণ্ডতম হইবে তাহা পূৰ্বে জ্ঞাত যায় নাই। তিনি আশঙ্কিত বলিয়াছেন যে, জাপ-সাত্ৰাজ্যকে আক্রমণ বহু স্থানে কৰিতে হইবে। বাস জাপ বীপপুত্ৰেও সৈন্য নামাইতে চেষ্টা কৰিলে জাপানেৰ বেঙ্গামবিক আশঙ্কা হইবে।

ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি

ভারতীয় বিজ্ঞান মিশনের সদস্য-
গণ সম্প্রতি বুটেন ও মার্কিন

জুগরাষ্ট্র সফর করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া-
ছেন। সদস্যগণের মধ্যে ডাঃ মেঘনাদ সাহা,
জ্যেষ্ঠ শাস্ত্রবিদগণ ডাউনগর, ডাঃ এস. কে.
মিত্র, অধ্যাপক জে. এন. বুথার্ড, জে. সি.
ঘোষপ্রমুখ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-
যোগ্য। ইহার বুটেনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, নানা বস্তু যন্ত্রা-
ল ও অন্যান্য শিল্প-জুগায়াদির কল-কারখানা পরিদর্শন করিয়া, সেখান-
কার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সহিত আলোচনা-আলোচনা করিয়া মার্কিন



যুজরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। মার্কিন যুজরাষ্ট্রের বিমরকর বৈজ্ঞানিক
উন্নতির বাস্তবায়ন নির্দেশ এবং বিশ্ববিখ্যাত 'টেনেসী ভ্যালি কর্পোরেশন'
পরিকল্পনার ফলাফল স্বরূপে দেখিয়া, ভারতে কি ভাবে উক্ত পৰি-
কল্পনা প্রয়োগ করিয়া কার্যকরী করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে
মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা
ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েক স্থানে বস্তু-প্রদর্শন
তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়া-
ছেন যে, বিজ্ঞানবিমুখতাই ভারতের সামাজিক ও আর্থিক
অবনতির কারণ। ডাঃ সাহা বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবি-
মুখ ও টেকনিসিয়ানগণই একযোগে কাজ করিয়া ইলেক্ট্রিক এই যন্ত্রে
বন্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি বড় একটা শিল্প-প্রধান
দেশে পরিণত করিতে হয়, আর এই দেশের দারিদ্র্য, অশুষ্টি ও
আর্থব্যয়িত্ব শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়, তবে ভারতে
বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। টেনেসী
ভ্যালি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা পরিদর্শন করিয়া ডাঃ সাহা বলিয়াছেন
যে, ভারতেও অল্পকাল পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে।
আমাদের দেশে নদীর অভাব নাই, শক্তি, বাত বা কোন প্রাকৃতিক
সম্পদ অপ্রচুর নহে, কিন্তু আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই অমূল্য
প্রাকৃতিক শক্তিকে কি ভাবে কাজে লাগাইতে হয়, তাহা
জানি না, তাই আজ আমাদের এই দুঃখ। পৃথিবীর মধ্যে
প্রাকৃতিক সম্পদে 'সকল দেশের সেবা' হইয়াও আমরা দরিদ্র ও
পশু হইয়া রহিয়াছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক
পরিকল্পনা, শিক্ষা ও মনোভাব লইয়া আজ যদি আমরা সামাজিক
উন্নতির পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে মাত্র কয়েক বৎসরের
মধ্যেই আমরা পৃথিবীর অল্পতম শিল্পপ্রধান দেশগুলির সমস্তের
পৌছাইতে পারি। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তি ও
শিল্পজাতদের দুরলস পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অমুদায়ী
সদবন্দ্য ভাবে কাজ। দুঃখের বিষয়, ভারত আজ পরাধীন,
তাহার নিজের জাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার তাহার নাই।
সুতরাং কে তাহার সর্বোচ্চ সামাজিক উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানের
বিচার ও প্রণালী কামনা করিবে?

জেনারাল ষ্টুয়ার্ট কলিকাতার সামরিক
কর্তৃপক্ষ নগরীতে মোটর-দুর্ঘটনার সংখ্যা
বৃদ্ধিকল্পে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া-
ছেন, তাহা বিবৃত করেন। প্রাদেশিক
সরকার এবং কলিকাতায় যুক্তরাষ্ট্রীয়
সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণও বৈদ্যে
উপস্থিত ছিলেন।

মেজর জেনারাল ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, প্রতিকার-ব্যবস্থা হিসাবে
বিগত মে মাস হইতে কলিকাতার রাজপথ সমূহে পাহারা দিবার
জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ও বৃটিশ সামরিক পুলিশের একটি সম্মিলিত টহলদার
বাহিনী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা সামরিক গাড়ীর চালকেরা
নিয়ন্ত্রণ করে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন
হইলে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

সামরিক মোটর গাড়ীর গাড়ার হতাহত অসামরিক ব্যক্তিগণের
জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়া জেনারাল ষ্টুয়ার্ট
বলেন যে, ইহা দুঃখের বিষয় যে, অতীতে কলিকাতায় হতাহতের
জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী সঙ্গে সঙ্গে মিটান হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে
নিখিল ভারত ফ্রেমস কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে
এইরূপ বিলম্ব ঘটবে না।

তিনি আরও বলেন যে, আমেরিকান ও বৃটিশ ট্রান্সিক পুলিশের
বিশেষজ্ঞগণ এই অভিন্নত ব্যস্ত করেন যে, পথচারীর বেপারের
ক্রমের জন্য শতকরা ৭০টি দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিশেষে জেনারাল ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির
জন্য তিনি অসামরিক ব্যক্তিগণের সহযোগিতা আশা করেন:—
(১) পথচারীর বাহাতে ফুটপাথ ও পথপার্শ্বস্থিত পথে চলার পথ
ব্যবহার করেন, তজ্জন্য সম্ভব প্রচেষ্টা; (২) অসামরিক ব্যক্তিগণের
মোটর গাড়ীর ব্রেক পরীক্ষার জন্য অধিকতর সূক্ষ্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা;
(৩) রাস্তা পারাপারের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যাপকতর ব্যবস্থা
এবং পথচারীর বাহাতে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাস্তা
পারাপার হন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ; (৪) যানবাহনের
গতায়ত সম্বন্ধে জনসাধারণ বাহাতে সমাপ্তরূপে অবহিত হইতে
পারেন, তদ্বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রচার।

অনেক মোড়েই 'এম, পি' ঠাঁড়াইয়া থাকে; কিন্তু সবই
প্রায় ফিরিঙ্গীপাড়ায়। সেখানে ও লরীর সঙ্গে বিজ্ঞাপন পোতা
পাইতেছে—'দেখে শুনে, পথ চলুন।' পথচারীদের সাবধান করিয়া
দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু লরী-চালকদেরও 'দেখে শুনে চালান' নামক
একটি সাবধান বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত। পথে পথচারীর মরিয়া
জন্য বার হন না। শুনিয়াছি, ভাল মোটর চালাইতে হইলে প্রত্যেক
মোটরচালককে ডাবিতে হয়, যত পথচারী সকলেই তাঁর গাড়ীর নীচে
পড়িয়া মরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই কথা 'বিশেষ লরীর
চালকদেরও ডাবিতে অমুরোপ করিলে বন্ধ হয় না।

রেলপথে বাজেট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের যানবাহন ও রেলপথ-
সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেল কেমরীর ব্যবস্থা পরিদর্শন ১৯৪৪-৪৫ সালের
সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেল কেমরীর ব্যবস্থা পরিদর্শন ১৯৪৪-৪৫ সালের
প্রাথমিক বাজেট উপস্থিত

দেখে শুনে, পথ চলুন

আরও বার যথাক্রমে ২১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ১৪৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে উক্ত আরও বারের পরিমাণ অনুমিত হইয়াছে যথাক্রমে ২২০ কোটি টাকা ও ১৫১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য দুই সপ্তাহে সর্বমুখ্য খরচ মিটাইয়া এবং মূলধন সংক্রান্ত শ্রম বাধা যথাক্রমে ৪২ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও ৩৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা উৎসৃত হইবে বলিয়া রেলওয়ে-সচিব অনুমান করিয়াছেন। সার এডওয়ার্ড বেল প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই উৎসৃতির মধ্যে ৩২ কোটি টাকা হিসাবে দুই বৎসরে মোট ৬৪ কোটি টাকা ভারত সরকারের সাধারণ ব্যয়কাষে জমা দেওয়া হইবে এবং বাকী ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা যথাক্রমে ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাবে মজুত-তহবিলে জম্ম করা হইবে। যুদ্ধের সময় রেলওয়ে সংক্রান্ত পণ্যাদি অধিক মূল্যে ক্রিনিতে হইতেছে বলিয়া এবং যুদ্ধের কাজের চাপে রেলপথ-সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া রেলওয়ে-সচিব বর্তমান বৎসর ও আগামী বৎসরের বাজেট বিশেষ মূল্যাপক বাধা যথাক্রমে ২৪ কোটি ও ৩০ কোটি টাকা সরাইয়া রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পরিষদের সমস্তগণের অবগতির জন্ত সার এডওয়ার্ড জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত মোট ১৩৭টি ব্রডগেজ এঞ্জিন, ৪১৫টি মিটারগেজ এঞ্জিন, ২৮,৮০০টি ব্রডগেজ মালগাড়ী ১১,৮২০টি মিটারগেজ মালগাড়ী বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। রেল-পরিচালনার ভারতীয়দের কর্তৃত্ব প্রসার প্রসঙ্গে রেলওয়ে-সচিব বলেন যে, বর্তমানে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের বিভিন্ন কাষে নিযুক্ত লোকসংখ্যা শতকরা পোনে ১ শত ভাগ ভারতীয় এবং মাত্র দিকি ভাগ বিদেশী। পরিশেষে বর্তমান বৎসরে খাজ, বস্ত্র প্রভৃতি বেসামরিক ভোগ্য পণ্য-বহনের ব্যাপারে রেল বিভাগের সামর্থ্য সংস্থার প্রকাশ করিয়া সার এডওয়ার্ড তাহার এবারের বাজেট-বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের রেলওয়ে-সচিব বাজেট-বক্তৃতায় তাঁহার বাজেট দুইটিকে নিম্নলিখিত বা unorthodox প্রমাণ করিতে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই ভারতবাসীর স্বার্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মূল্যাপক বাধা ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সালে ৫৪ কোটি টাকা সরাইয়া রাখিবার জন্ত অনেকে অস্বস্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এই ৫৪ কোটি টাকা ভারতের স্বল্প চাপাইয়া সার এডওয়ার্ড ভারতবাসীর প্রতি স্তুতির করেন নাই। সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রয়োজ্য সাহায্যের জন্ত ভারতীয় রেলপথগুলিতে সাজ-সরঞ্জামের অভাব ঘটিয়াছে, এ অবস্থায় ভারতকে রেলওয়ে সংক্রান্ত পণ্যাদি বিক্রয়ে বুটেন, ক্যানাডা, বা যুক্তরাষ্ট্র অধিক মূল্য দাবী করে কোন যুক্তিতে? তাছাড়া, যুদ্ধের কাজের চাপেই এ দেশের রেলপথ, এঞ্জিন প্রভৃতি অস্বাভাবিক ভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, মিস্ত্রীশ্রমী শ্রমিকদের কি উচিত নয়, এই বিরাট ক্ষতিপূরণ ভারতবর্ষের সহিত আর্থিক সহযোগিতা করা? মূল্যাপক বাধা টাকার অভাব হ্রাস করিবার সময় এই সকল কথা কি সার এডওয়ার্ডের মনে একবারও উদিত হয় নাই?

হইয়া থাকে। সাধারণ সময়ে অর্থাভাবের অনুভূত ভারত সরকার এই নিয়ন্ত্রণের বৈশাখ্যবীর অনুভবী দৃষ্টিকরণে অগ্রসর হইতে পারেন না। বর্তমানের ভার অস্বাভাবিক আয়ের আমলেও কি ইহাদের ভর কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সার এডওয়ার্ডের পক্ষে সম্ভব ছিল? আলোচ্য দুই বৎসরের ৭৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা উৎসৃতির মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা মজুত-তহবিলে না রাখিয়া আরও কিছু বেশী টাকা কি রেলওয়ে-সচিব এই বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে পারিতেন না? যুদ্ধের পরে রেল বিভাগের আয় কমান্বায় হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সময় পরিচালনার আর্থিক শাস্ত্রি গ্রহণ করিয়া খুব বেশী মজুত-তহবিল না থাকিলে কি রেল বিভাগ এ ধরনের ব্যবস্থার কাষে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবেন? ভারতের রেল-এঞ্জিন নিৰ্মাণের কারখানা স্থাপনের কথা বহু দিন ধরিয়া ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন, এ বারের বাজেট বক্তৃতায় এডওয়ার্ডের এই কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা সার এডওয়ার্ড বেল উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এ সময় ভবিষ্যতে আমদানীর আশায় যে ভাবে এঞ্জিনাদি অর্ডার বিশেষ প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের সত্যকার মনোভাব আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রেল বিভাগের ভারতীয়করণ সম্বন্ধে সার এডওয়ার্ডের যুক্তিও আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধোপ হইতে যোগ্য লোক আমদানী করা কঠিন বলিয়া হজরত হু'-এক জন ভারতবাসীকে রেল বিভাগের মধ্যমাধ্যম উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হইতেছে, কিন্তু এখনও প্রায় সমস্ত শাস্ত্রিকপূর্ণ পরে যেতাম কলকাতার বিরাজমান এক সংখ্যার ইহারা শতকরা দিকি ভাগ হইলেও বহাদুর বা বেতনের দিক হইতে শতকরা পোনে ১ শত ভাগ ভারতীয় কলকাতার কি তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন নহেন? বর্তমান বৎসরের রেলপথগুলির বেসামরিক পণ্যবহনের ব্যাপারে সার এডওয়ার্ডের সৌরভ অনুভব করিবার কি আছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই। রেল বিভাগের অব্যবস্থা ও মালগাড়ী টানটানির জন্মই কলকার অভাবে জনসাধারণ এক কলকারখানা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; খাজদায়ী এক প্রদেশে অশাখ্য থাকিলেও অন্য প্রদেশে সরবরাহের অভাবে অধিশূন্য এক অপ্রাপ্য পথ্যের আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ অবস্থায় রেল বিভাগের সাফল্যের জন্ত সার এডওয়ার্ড সন্তোষ প্রকাশ না করিলেই আমরা আনন্দিত হইতাম। মোটের উপর আমরা অসন্তোষে বলিতে পারি যে, রেলওয়ে-সচিব বা তাঁহার বক্তৃতার নিকট রেল বিভাগের বাজেট বর্তী নিরুপেক্ষ মনে হইক, সাধারণ ভারতবাসীর প্রশংসা বা স্বার্থের কথা ইহাতে আশাশ্রুত বিবেচিত হয় নাই বলিয়া এ বাজেট জনসাধারণের কাছে সম্মত হইবে না।

বাকালার বাজেট

বাকালার সরকারের অর্থসচিব জীবন্ত কুলসীজ গোখরাী তাঁহার বাজেট-বক্তৃতায় দেশবাসীকে দৈবাভাজনক কথা বলিছেন না কি করিয়াও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়া দেখিয়াছেন যে, বাকালার গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা আসন্ন সম্ভাব্যজনক নহে। ১৯৪৫ হইতাবের ৩১শে মার্চ বাকালার গভর্ণমেণ্টের কণের পরিমাণ ঠাঁইয়ে

এখন মাস্ট্রেট উদ্বেগের কারণ। কিন্তু যদি ঋণ করিয়া তাহা সাক্ষাৎকর কাগজে নিয়োজিত করা হয়, তবে ঋণ শোধ করিয়াও মুনাফা থাকে। সে ক্ষেত্রে উদ্বেগ নাই, বরং আশাই থাকে। কিন্তু বাস্তবায়ন সরকারের ঋণ—এই বা তবু! প্রশ্ননতঃ, বাস্তবায়ন সরকার এই ঋণ দ্বারা শাসনকার্য্য চালান, যাহা হইতে মুনাফা উপার্জিত হইতে পারে না। অতএব এই ঋণ শোধ হইবার নয়।

আর বাড়িটায় যে ঋণ শোধ করিবেন, সে পথটী বা কোথায়? ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প কোন উন্নতিই তো বাস্তবায়ন দেশে হইবার উপায় নাই। সব দিক্ দিয়া সরকার আট-বাট বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। উপায় আছে একটি মাত্র—ট্যাক্স বৃদ্ধি। এ পথেও সরকার প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দক্ষায় দক্ষায় ট্যাক্স বাড়িয়াছে। বিক্রয়-কারের পরিমাণ বিস্তৃত হইয়াছে। কৃষিজাত আদায়-করের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেক্সিকেশন ফি ও প্রসেস ফি গণ্যে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এখন তাহারা কোন উপায়ে নতুন ট্যাক্স চাপাইবেন, সেই চিন্তায় মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিতেছেন। তিন বৎসরের মধ্যে বাস্তবায়ন ট্যাক্স বাড়িয়াছে সাড়ে সাত কোটি টাকা। কিন্তু কেবল ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াই কি এই বিপুল ঋণভার শোধ করা সম্ভব?

আগামী বৎসরে বাস্তবায়ন সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় এক বৎসরের আর্থনিক আয়ের সমান পাড়াইবে। ঋণ শোধ করিতে হইলে বহু আর তত্ত্ব ব্যবহার করিতে হয়। সংসার চলে কি করিয়া? অর্থসচিব এবং স্বয়ং গভর্নর মিলিত হইয়া কেন্দ্রীয় অর্থসচিবের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এখন অবধি মন স্থির করিতে পারেন নাই। কলিকাতা আকুল নয়নে চাহিয়া আছে দিল্লীর পানে। কবে আসিবে, কতটা আসিবে?

কিশোর লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাজেটে কেবল ঋণ শোধের পক্ষা অর্থাৎ ট্যাক্সের কথাই আছে। গঠন-বুলক কোন পরিকল্পনাই নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের চুক্তিকে এক ভাষায় পরবর্তী মহামারীতে বাস্তবায়ন অবস্থা আঁক শোচনীয়, কিন্তু উপশমের জন্য কোন চিন্তাই সচিবমণ্ডলী প্রয়োজন মনে করেন নাই। সেটা পাকিস্তানী না অক্ষমতা? উভয়ই অত্যন্ত গঠিত।

বাজেটের আর্থ-ব্যয়ের ও অপচয়ের বহুর দৈর্ঘ্য বাস্তবায়ন দেশকে দরিদ্র বসিয়া মনে হয় না। দরিদ্র দেশে এক অপচয়, এক ঋণ, কি করিয়া সম্ভব?

আগামী বৎসর বাস্তবায়ন আর হইবে ২১ কোটি টাকা, আর ব্যয় হইবে ৩৭ কোটি টাকার অধিক। সরকার অ-সাময়িক সরবরাহ বিভাগের মাধ্যমে ব্যবসা চালাইয়া তিন বৎসরে লোকসানের বোকা পাড় করাটাইছেন সাড়ে ২২ কোটি টাকা। কি করিয়া এই লোকসান হইল, কেন হইল, কে বুকাইবে?

তদা গিরাহিল, পজার হইতে জ্বলন্ত মূল্যে খাজনা কব করিয়া সরকার চড়া মূল্যে বাস্তবায়ন তাহা বিক্রয় করেন। তাহাতে দিয়া দু'পয়সা মুনাফা হইয়াছিল। তবে লোকসান হইল কেন? বহু খাজনায় পজার, বহুদলের আহারের অবশ্যা করিয়া দই করা হইয়াছে। ক্ষতির ক্ষেত্রে ইহারও নিষ্ফল কিছু অংশ আছে। যে সচিবমণ্ডলী

ক্ষতিপূরণের খুঁটী রাখা, তাহাদের কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। যুরোপীয় সমস্ত মিঃ খ্রিস্থস পৃথাক্ত বাজেটের ভীত নিন্দা করিয়া একথা না বলিয়া পারেন নাই যে, সরকারী ব্যবসায় পরিচালনার খাতে সাড়ে ২২ কোটি টাকা লোকসান একটা কলঙ্কজনক ব্যাপার। ইহার জন্য গভর্নমেন্টের অবসর গ্রহণ করা উচিত।

মহাস্বাক্ষরীর বিরতি

বহু দিন পরে সরকারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মহাস্বাক্ষরী গান্ধী একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিরতি দিয়াছেন। ইহাতে তিনি দিল্লী ও লণ্ডনের উদ্ভূতন কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে ভাবে কংগ্রেস-নেতাদের ধড়পাকড় চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ইহা ভ্রান্তি নচে, ইহার মূলে সর্বভারতীয় সরকারী নীতিই ক্রিয়া করিতেছে। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ এবং সিন্ধু এই চারিটি প্রদেশে প্রায় একই সময়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতাদের প্রতি গভর্নমেন্টের একই প্রকারের আচরণ—তাহার সন্দেহ সমর্থনই করে।

কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যক্রমের উদ্বেগ বর্ণনা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “এই চেষ্টার মধ্যেও আপত্তির কিছু আছে কি?” তিনি মনে করেন, “ভারতবর্ষে যদি সর্বজনীন ভাবে এই কণ্ঠস্বী গৃহীত হয়, তবে অহিংস আইন অমান্ত আন্দোলন না চালাইয়া অথবা আইন সভা দখল না করিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে। সেইরূপ করিলে এ দু'টির কোনটারই প্রয়োজন হইবে না। ইংরেজ তখন ভারতে থাকিয়া ভারত শাসন নিরর্থক মনে করিবে। নেহাও যদি সে থাকে, তবে সে নাগরিক হিসাবেই থাকিবে। ১৯৪২-এর ভাষায় বলিতে হয়, শাসক হিসাবে তাহাদের ভারত ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না, তাহাদের সৈন্ত হইবে বেকার আর শিল্প হইয়া পড়িবে নিরর্থক।”

এই সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন, “রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যে ইহার লক্ষ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একটা বিরাট জাতির দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই কার্য্যক্রম একটা নৈতিক নিরুপদ্রব বিপ্লব আনয়ন করিবে। এই বিপ্লবের পরিণতিতে জাতিভেদ, সম্পৃথ্যতা ও অজ্ঞাত কুসংস্কার নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ অভ্যন্তরীণ কাহিনীতে পরিণত হইবে। ইংরেজ অথবা যুরোপীয়দের প্রতি বৈরিত্যের বিদ্ভূতির গর্ভে বিলীন হইবে। রাজতন্ত্র ও পুঁজিপতিরা দেশের ধনসম্পদের প্রকৃত ও আইনসম্মত অধিকার জনগণের বহুর মত ব্যবাস করিবেন।”

বৃটিশ-কর্তৃপক্ষের সর্বত্র বহু পক্ষ ব্যক্তি এইরূপ আশঙ্কা চাহিয়াছেন কিন্তু সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে অচল অবস্থার সমাধান তাহাদের অভিজ্ঞত মত, এই ব্যপারই মনে বহুদল হয়। বিদ্রোহ হইয়া মহাস্বাক্ষরী এর কহিয়াছেন, “আমার পক্ষে এরূপের অবশ্যা সম্ভাবনীয় ব্যতীত বহি কর্তৃপক্ষ আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যক্রম সহ করিতে যাত্রী না হন, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাহাদের আসল মতলবটা কি? তাহারা কি অভ্যন্তরীণ

কি স্বপরিজ্ঞাত ও অন্ধ-পরিজ্ঞাত সমগ্র ভারতবাসীকেই কারাক্ষম রাখিতে চাঠেন ? কংগ্রেসকর্মীরা দেশের সর্বত্র স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিবে এবং তাহার ফলে অস্থির আলোচনায় পুনরুজ্জীবিত হইবে, এই আশঙ্কায় গভর্নমেন্ট বিচলিত হইয়াছেন কি ?

মহাত্মা গান্ধী ভারতের ও বুটেনের উল্লেখই কল্যাণকামী। একান্ত মনোহত হইয়াই আজ তিনি এই সকল প্রেরণ করিয়াছেন। দিল্লী এবং লণ্ডনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি নিশ্চয়ই কোন উত্তর আশা করেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইবেন কি ?

শীতলবাদের অভিভাষণ

নয়াশ্লীষিতে ভারতীয় বণিক-সমিতি-সম্বন্ধে বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ জে. সি. শীতলবাসী তাঁহার অভিভাষণে ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রাধান্যবোধগ্য।

প্রাথমেই তিনি বলিয়াছেন—“আমরা যে ভারতীয় গভর্নমেন্ট দাবী করিতেছি এবং বর্তমান অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য বুটেন গভর্নমেন্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছি, তাহার কারণ শুধু এই নয় যে, উভয় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। আমরা এই কারণেও অচল অবস্থার অবসান কামনা করিতেছি যে, ইহা বাটীত যুদ্ধান্তর কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় স্তব্ধরূপে কাহা পথিগত হইতে পারে না; এমন কি, সময়কালীন অবস্থা হইতে সাধারণ অবস্থার কিরিয়া বাণিজ্য ও সহস্রাধা হইবে না।”

তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য হইলেও নূতন নহে। পণ্ডিত জহরলাল (জাতীয় পরিকল্পনা) হইতে আরম্ভ করিয়া সার বাকেলির দালাল (বোম্বাই পরিকল্পনা) সবচেয়ে একবারো ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এমন ভাবে মিশিয়া বসিয়াছে যে, একটিকে ছাড়িলে অপরাধের কোন অভিভূত থাকিতে পারে না।

ভারতের পাণ্ডা টার্সি-সম্পদ সম্পর্কে মিঃ শীতলবাসী বলেন যে, এই সমস্যার সমাধানের উপর যুদ্ধান্তর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বুটেন কি ভাবে এই ঋণ শোধ করিবে সে সম্বন্ধে অবিলম্বে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ব্রেটন উডস বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে এই সমস্যা-সম্পর্কিত আলোচনার দাবী ভারতীয় প্রতিনিধিরা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কারণ, ক্ষমতা বাজারের হাতে, তাহার ভারতের কথা ভাবিতে নারাজ। অদূর ভবিষ্যতে যে এই সমস্যার সমাধান হইবে, এরূপ আশা করাও দুরাশা মাত্র। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে যে যুদ্ধাশ্রীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, চোরা-বাজার প্রভৃতি দেখা গিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—“যুদ্ধাশ্রীতির প্রতিকারকল্পে গভর্নমেন্ট কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে হুল-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সফল পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আত্মপরিচয় যে-আইনী মজুতদারী ও চোরা-বাজারের কারবার বন্ধ হইয়াছে, এরূপ কথা কোন ক্রমেই বলা যায় না।” মিঃ শীতলবাসী এই ব্যাপারের জন্য সরকারী কথোপকথনকেই দায়ী করিয়াছেন। তাঁহাদের

থাকিতে পারে না। অনেক ব্যবসায়ীও চোরা-বাজার চালাইয়াছেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন এবং স্থান-কাল-পাত্র বুটেনা পণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহারাও আংশিক ভাবে দেশের এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। ব্যবসায়িগণ যদি সম্ভবতঃ ইহা এই কাল-জুয়াচুরির বিরুদ্ধে যত্নবান, তবেই দেশের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত হইতে পারে। এবং বহু ভাবে শীতিল জনগণের হৃদয়ে কিছু লাঘব হইতে পারে।

আমাদের হৃদয়ে আমাদেরই দৃষ্টি করিতে হইবে। পূর্বপ্রয়োজ্য হইয়া থাকিলে চিরাগতই এই হৃদয়-হৃদয় ভোগ করিতে হইবে।

বন্ধু-চুক্তি

মহা-জীবনের চুক্তিটি প্রধান প্রয়োজন—অর্থ এবং শক্তি। সময়কাল-কেন্দ্রবাসীর অশেষ চিন্তাগা যে, এই চুক্তিটি হইতেই বহুতর হইতে বসিয়াছে। অস্ত্রের অভাব যে কি উৎপন্ন আকার ধারণ করিতে পারে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, এবং সেই ক্ষেত্রে এখনও নিম্নলিখিত। এইবার বন্ধুর অভাবের কল্পভোগ আরম্ভ হইয়াছে। এই নিম্নলিখিত অভাব সত্তর ও মঙ্গল সর্বত্রই সমান। বহু বান হইতে সমস্ত আশিষ্টেছে, বন্ধুর অভাবে কুলনাশিগণ গৃহের বাহিরে হইতে পারিতেছেন না।

এই অভাব দূর করিবার জন্য নানাবিধ বিধি, নিষেধ, অধিনিয়ম, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু কিছুদূরই যত্ন করিতেছে না। অতিশয়, চোরাবাজার, সরকারী অবস্থার, ব্যবসায়ীদের কারসাজী, অনেক কথায় তখন দায়, তন্মিমে পাইতে কেবল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার কথা। অদূর অতীতের পরিচয় যে হইলে রাজ্যলীল তদন্ত বন্ধা দূর থাক, লক্ষ্য বন্ধা পথের দূর হইবে না।

বাজারের মাথা-শিল্পী বন্ধু বন্ধ হইয়াছে, অস্ত্রের দল এবং অস্ত্র প্রভৃতির তুলনায় অনেক কম। কারণ, বাজারের দল দোকান আকারে ওজনে অস্ত্র প্রদেশবাসীর তুলনায় বেশী। তাহারা চুক্তি, বাতা বন্ধ হইয়াছে, তাহাও তো বাজারের আশ্রিতই না। শীতল-শিল্প যে এই সমস্তের কিঞ্চিৎ লাঘব করিবে সে ই-শিল্পের দূরতার শীতল-শিল্পকে চালু রাখিবার কোন ব্যবস্থাই বানায় নাই। বন্ধু সরকার করিবার জন্য তাঁহাদের, কিন্তু যে পরিমাণ বন্ধু তাঁহারা নিরাতেন, তাহাতে বাজারের অভাব পূরণ হয় না। বন্ধু হানে তাঁত হুতার অভাবে অচল।

যুদ্ধের লক্ষণ, একা যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিষ্টকে যুদ্ধের কলম মানিয়া লইতেছি। কিন্তু বেটুকু বন্ধু বন্ধ হইয়াছে তাহাও পাইতে বাটতেছে না কেন? এবং বেটুকু বন্ধু আশিষ্টেছে তাহাও কি তাহা ভাবে বন্ধ হইতেছে না কেন? বন্ধী অধিক মূল্যে বস্ত্র টান্ডা দর ক্রম করিতেছে, আর লক্ষ্যের সেই পরিমাণ বন্ধুর অভাব পতিতেছে।

অবিলম্বে বন্ধুর একটা কেন্দ্র বন্ধ করা প্রয়োজন। খাত যে নিয়মে নিরস্ত্রিত করা যায়, বন্ধুর সম্বন্ধে সে নিয়ম পাঠে না। জন-শিল্পী বাজারের একটা দান করা চলে। কিন্তু বন্ধু ব্যবসায় নির্ভর করে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার উপর। একজন পক্ষেই কেন্দ্র বন্ধী হইতে দরকার।

শে মন্ডেলের পণ্ডিত পাঁচ মাসে বাঙ্গালার অসামরিক জনসাধারণকে শিক্ষিত করা পক্ষে অপেক্ষা ৪ গজ মিলের কাপড় বেশী লাগবে। তবে বাঙ্গালার বস্ত্রের এই অবস্থা হটল কি করিয়া?

বিভিন্ন স্থানে বহু প্রাপ্তি স্থানীয় বটন ব্যবহার উপর নির্ভর করে। সম্প্রতি টেক্সটাইল কন্ট্রোলার মহেশ্বরে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ঢোকা বাজার প্রবেশ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইহুই ব্যবস্থা প্রচলন করা হইবে।

৩ বিঘা বিবাহী শ্রমের নেতা মিঃ এ. কে. ফজলুল হক ২৮শে মার্চ সোমবারে স্বামী পরিবারের সমস্তদের নিকট এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, “যে সচিবমণ্ডলীকে আমরা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই সচিবমণ্ডলীকে আপনাবা বহু দিন অল্প ভাবে সহ্য করিবেন?”

বহু-বটন সমন্বয় সচিবমণ্ডলী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিয়া মিঃ হক বলিয়াছেন,—সমন্বয় সমাধান খুব সহজ। সকল সচিবকে পদত্যাগ করিতে বলা হউক এবং তাঁহারা গভর্ণরকে পদত্যাগপত্র দাখিল করুন। এখনই পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করিলেও চলিবে, আমরা নিশ্চিতে বাজেট গৃহীত হইতে দিই, তাহার পর গভর্ণর ইচ্ছা করিলে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া একটি জার্নালিষ্ট সচিবমণ্ডলী গঠন করিতে পারিবেন। গভর্ণর ঐতাকে পছন্দ করেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে এবং ঐতাকে তিনি পছন্দ করেন না, তাঁহাকে বর্জন করিতে পারিবেন।

সবট বুকিলাম। সবট ফিউচার টেম’। কিন্তু বর্তমানে যে লক্ষ্য-নির্ধারণ দায়। তাহা কি হইবে?

আদর্শ প্রচার-কার্য

প্রচার এবং অপপ্রচারের মধ্যে পার্থক্য কি? সত্য কথা এবং অসত্য কথা, সত্যবাদন নাম প্রচার এবং মিথ্যা কথা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের নাম অপপ্রচার। ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহিমাকীর্তনের জন্য আমেরিকার কি-জায়ে প্রচারকার্য চালাইতেছেন, তাহাও নানা সূত্রে প্রকাশ পায়। যে দিন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত গভর্ণমেন্ট হইতে আমেরিকায় এই বরণের প্রচার ও অপপ্রচার-কার্য চালাইতে হয় তাই না, এই বিষয়ে একটি প্রোগ্রামের উদ্ভাবন সরকারের পক্ষ হইতে সার মধ্যম ওসমান বলেন,—“ঐচ্ছিক বিক্ষয়শক্তি পণ্ডিতের লায় ব্যক্তিরা আমেরিকায় গিয়া এই ধরণের প্রচার-কার্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম-সম্প্রদায়-গত কোন বিরোধ নাই এবং বৃটিশ ভারতবাসীদের মধ্যে ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা উদ্ভাবনের দায়ে লড়াই করে। এমন অবস্থায় ভারতের সম্বন্ধে মার্কিনবাসীলগকে খাতি খবর জানাইবার যে প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করা চলে কি?” অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিলেন যে, অপপ্রচার চলিতেছে।

ভারত সরকারের পন্থাটি বিভাগের সেক্রেটারী স্বীকার করিয়াছেন —

প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং সেই প্রচারকার্যের ভিত্তি কতটা সত্যের উপর স্থাপিত তাহা সকলেই জানেন।

‘চিন্তাশ্রম টাইমস’ পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রচারকার্যের স্বরূপের একটি নমুনা দিয়াছেন। “আমি ভারত গভর্ণমেন্টের আমেরিকায় এক্সট্র-জেনারেল সার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার মত এক জন শিক্ষিত এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি কি ভাবে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বিবৃতিপূর্ণ পুস্তক ও ইস্তাহার সমূহ প্রকাশ করিতে সম্মত হন?” তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন,—“আমি কোন পুস্তকই পড়িয়া দেখি নাই অথবা প্রচারমূলক কোন পুস্তক-পুস্তিকার তথ্য বিচার করি নাই। আমি শুধু বিলে সতি দিয়াছি মাত্র। তাঁহাকে কি শুধু সহি দিবার জন্য বেতন দেওয়া হয়? তিনি চোখ বুজিয়া এমন ভাবে সহি করেন কেন? বাজপেয়ী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার পৃষ্ঠাপূর্ণ কাগজপত্র ভারতীয় করদাতাদের পরসায় বিলি করা হইতেছে।”

বাঙ্গালী দেশের সম্বন্ধে আমেরিকায় কিরূপ প্রচারকার্য চালাইতেছে, সে বিষয়ে সংবাদদাতা বলেন—“বাজপেয়ীর আমলে সব চেয়ে বড় কাজ হইল তাঁহার কানাডা পরিদর্শন। সেখানে গিয়া তিনি কানাডার প্রধান মন্ত্রীর নিকট বলেন যে, ভারতে প্রকৃতপক্ষে স্বাধাভাব ঘটে নাই এবং ভারতের মজুতদারেরাই সেখানকার চুক্তির জ্ঞা দায়ী, নতুবা সেখানে যথেষ্ট খাঙ্কই ছিল। কানাডার গভর্ণমেন্ট ভারতের জন্য খাঙ্ক সাহায্য পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। এই ভাবে প্রচারকার্যের দ্বারা বুঝাইয়া শুঝাইয়া তাঁহাদের নিবৃত্ত করা হয়। কালিফোর্নিয়ার পঞ্জাবী কৃষকদের এক সভায় বাজপেয়ী মহাশয় বলেন, “বাঙ্গালীর চিবকালই চুক্তির মরে; বাঙ্গালীর চুক্তির একটা অসাধারণ কিছুই নয়। তিন শিকড় হইয়াছিলেন; বাধা হইয়া তাঁহাকে সভা হইতে পলায়ন করিতে হয়। ভারতের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর মূল্যবান প্রচারকার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে সার গিরিজাশঙ্করকে কংগ্রেস প্রেসে ৩৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এই তাঁহার জন্য তাঁহাকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না। ওয়াশিংটনের মহাসভায় কৃষক প্রতিনিধিগণ এই শিকড় তিনি বাস করেন, এবং এই বাড়িতে বৃটিশ সরকারের সমর্থকদের খানা দিবার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়।”

শুধু ভারতের বাহিরে নয়, ভারতের মধ্যেও এই শ্রেণীর প্রচার-কার্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। ‘আশানাশিল্ট’র মিলার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—“বিশ্ব সূত্রে জানা গিয়াছে যে, মিঃ এ. এন. রায়ের আয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বড় গাটের চেয়েও বেশী। বাজপেয়ীর বরাদ্দ অনুসারে বড়লাট বার্ষিক ২,৫০,০০ টাকা বেতন পান; পঞ্চাঙ্গরে, মিঃ রায়ের আয় বার্ষিক ২,৭৫,০০০ টাকা বলিয়া মনে হয়। মিঃ রায়ের আয় সম্বন্ধে নিয়মিত হিংসা পাওয়া গিয়াছে,—ভারত সরকার হইতে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য মাসিক ১৩,০০০ টাকা, মুক্ত-প্রাদেশিক সরকার হইতে মাসিক ৭,০০০ টাকা এবং অজানা সূত্রে হইতে মাসিক ২,৫০০ টাকা।”

বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতার সাধনায় ভারত সরকারের এ-ধনে তৎপরতা দেখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহিমায় অপ্রস্তুত হইবে না, এমন যুগ ইহ জগতে নাই।

নিখিল-বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ

গত ৬ই ফ্রেব্রুয়ারী হইতে লণ্ডনে নিখিল-বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পাঁচ কোটি শ্রমিকের প্রতিনিধিরূপে ৪০টি দেশ হইতে ২৪০ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। এক দিকে ত্রিনেভু সম্মিলন হইয়াছে, আর এক দিকে বিশ্বের শ্রমিকসমাজের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্য ঘটনা-সংযোগ হয় নাই। নিখিল-বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল :—

(১) ফ্যাব্রিয়ারের চূড়ান্ত প্রত্যক্ষকল্পে বৃদ্ধি ও অস্তিত্ব সমরোপকরণের উপাদান-বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের শ্রমিকদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার সম্বন্ধ গ্রহণ করা; (২) একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করা। এই সঙ্ঘের মধ্যে শক্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকগণ শান্তি ও শিখ-নিরাপত্তা রক্ষার আদর্শে অগ্রপ্রাণিত হইয়া ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং ভবিষ্যতে মানব জাতি ও মানব-সভ্যতাকে মহাযুদ্ধের ক্রুর গ্রাসে হইতে বচা করিবার জন্য সজাগ ও সতর্ক হইবে; (৩) ভবিষ্যতের শান্তি ও পারস্পরিক মৈত্রীর ভিত্তি গঠন করা এবং ফ্যাব্রিয়ার বাস্তবতার ভবিষ্যৎ শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা বচনা করা; (৪) বিশ্বের শ্রমিকদের দ্বারা দাবী ও স্বাধিকার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে ট্রেড যুনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী করা।

বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাসের দ্বারা বীহারা স্পষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, যুরোপে প্রথমে ও ইটালীতে এবং পরে জার্মানিতে যে ফ্যাব্রিয়ার ন্যায়বাদের আভ্যাস সত্ত্ব হইয়াছিল, তাহার প্রপাণ কারণ—এই সব দেশে ট্রেড যুনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠন দুর্বল ছিল এবং শ্রমিকনেতাদের পরস্পরের মধ্যে মহানীড়ার ও বিরোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। ইটালীর সোশ্যালিস্ট ও জার্মান সোশ্যাল ডিমক্র্যাটরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে যে ভাবে বিপথগালিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন, ফ্যাব্রিয়ার তাহারই অযোগ্য লইয়া দেশে দেশে বিপ্লব দমন করিতে এবং শ্রমিক আন্দোলনের মেরু-দণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফ্রান্সেও বিভিন্ন শ্রমিকসমাজের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ এবং ক্যাসী সোশ্যালিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট ভাঙ্গিয়া যায় এবং লাসালিয়ে-বনে-গোটির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটেনের শ্রমিক-দলের নেতারাও এই বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ করিতে বিপ-বোধ করেন নাই। বিগত বিশ বৎসরের এই শোচনীয় ইতিহাস নিখিল বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ তুলিয়া বান নাই এবং ভবিষ্যতে যাচাতে এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

পৃথিবী হইতে ফ্যাব্রিয়ার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবার এবং বিশ্ব-শান্তির ভিত্তি গড়িতে তাহে গঠন-করিবার সিদ্ধান্ত ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে। শুধু বর্তমান যুদ্ধের অবসানেই বিশ্বের শ্রমিকগণ

সম্মত হইবে না বা শান্তি পাইবে না। যে সমাল-ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার ফলে ফ্যাব্রিয়ারের জন্ম হয় এবং বৃদ্ধিবিগ্রহ ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হয়, তাহাকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে শ্রমিকশ্রেণীর শান্তি নাই। যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্ভূত হইয়া এই যুদ্ধে 'মহাযুদ্ধ' অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদর্শ শুধু ক্ষেত্রবিশেষে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োগ করিলে চলিবে না। পরবর্তীতে বাস্তব ও উপনিবেশভিত্তিক আন্তঃনির্য্যাসের অধিকার বান করিতে হইবে এবং এই পর্যায়ে দেশগুলির মধ্যে অস্তিত্ব হইল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করিয়া নিখিল-বিশ্ব ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব বিশ্বের শ্রমিক প্রতিনিধিগণ, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট যুনিয়নের শ্রমিক প্রতিনিধিগণ সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করিয়াছেন। বন্ধনহীন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দণ্ড আর কত দিন বিশ্বের জনমত উপেক্ষা করিয়া, বিশ্বের শ্রমিকদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ভারতবর্ষে স্বাধীনতার কর্তৃত্ব কায়েম করিবে, তাহা অবশ্য ভবিষ্যতেই বুঝা যাইবে।

রাজ-বন্দিনী

রাজ্যের দেশের ভাগে আটক কপিদের অসীম দান আর গণিত না। পুলিশ ও সরকার বীর ক্ষমতার দ্বীপে হইয়া দিন দিনের অধিক নীতির মধ্যে এমন একটা আন্দোলন যত পাইয়াছেন যে, মানবতা, কল্যাণ, জাতিবদ্ধ সবই তাহার নিকটে কেবল বৃদ্ধি বজায় রাখা পরিহাস জীবিত নিখিলনাথ কুণ্ড এক প্রান্তরে সরকার পক্ষ হইতে রাজবন্দিনীদের যে কলিকাতা পেশ করা হইয়াছে, তাহারই দেখা যায় যে, ১১টি বন্দিনীর মধ্যে ১৪ জনই নানা জটিল রোগে আক্রান্ত।

শ্রীমতী প্রভা মজুমদার দ্বারা যোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, শ্রীমতী কমলা দশগুপ্তা মেলগুণে কল্যাণে ভুগিতেছেন, শ্রীমতী বনলা সেন হাবুযোগে ও কলকাতা প্রান্তে ভুগিতেছেন, শ্রীমতী হোসেনা দত্ত, শৈলবালা সেন, আশালতা দাস, সুরাসিনী গাঙ্গুলী, লাবণ্যপ্রভা দশগুপ্তা এবং শ্রীমতী লীলা দাস প্রভৃতি মোট ১৪ জন মহিলা কলিকাতা প্রান্তের অন্তর্গত যোগ-কল্যাণের কাল অতিবাহিত করিতেছেন। বিচারও নাই, মুক্তিও নাই। জীবিত নিখিলনাথ কুণ্ড জানিতে চাতিয়াছিলেন যে, বীহারা দীর্ঘকাল ব্যর্থ অস্ত্রের ভুগিতেছেন, স্বাভাবিক দৃষ্টি দেওয়া গভর্ণমেন্ট বুদ্ধিবুদ্ধ হলে করেন কি না? উত্তরে বান ব্যক্তের যত্নসহ আলী জানান যে, নিরাপত্তার দিক হইতে কাজকেও আটক রাখা অত্যাবশ্যক হইলে না করিলে গভর্ণমেন্ট আটক রাখিবেন না। চমৎকার উত্তর। নিরাপত্তার অজুহাতে আটক রাখিবার কোন তাগিদ নাই। কিন্তু এই যোগ-কল্যাণে মহিলাদের নিরাপত্তার লোহাই দিয়া আটক করিয়া রাখা কেবল হাতবন্দ নহে, নিতান্ত নিলক্ষ্যতা ও যত্নহীনতার পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের কিছুই করিবার নাই। আমরা পরবর্তী জাতি। কিন্তু যিনি সকল বন্ধনের উচ্ছেদ, তিনি কি মানবতার এই অবমাননা নীকে সব করিবেন?



বুঝিবারের সন্ধ্যাবেলায় আমা-
দের নববন্ধু-সভা বেশ জমকে
উঠেছে। চিড়ে-ভাজা, পেরাজের কুলুবি,
বাটি বাটি চা—কিছুই অভাব নেই।
সভাপতি গোপালদাস'র মনও বেশ
শ্রুত। ঋপরের কাগজখানি নামিয়ে
বেশে তিনি বললেন, “বাকু, বাঁচা গেল।”

বন্ধু-পরিহিত রাইচরণ ভিড়ান্ন নেমে গোপালদাস'র দিকে
চাইল।

গোপাল দাস' হেসে বললেন—“আরে দেখছ না, ঠালিন আমার
গদা হিটলার বেটার নাকের উপর পড়ে পড়ে হয়েছে। আর মাস-
খানেকের মধ্যেই কেঁদা ক্ষত। তার পর বাকি বইল ঐ বেটে
বল্লে জাপান। তাদের থালা নাক তুবড়ে দিতে ভীমসেন ব্রজভট্টের
আর ক'দিন লাগবে? বাপ! সিঁচাপুর যখন গেল, তখন কি
ভরাটাই না হয়েছিল! বোলা কি হে! ত্রিশ বছর সরকারী চাকরী
করে তিরানকই টাকা দশ আনা পেঙ্গন পাই, সেটুকু চলে গেলে এই
বুড়ো বয়সে যে গিল্লীর হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে ঠাড়াতে হতো। জয়
মা কালী! কি বাচনটাই না বাঁচিয়ে দিয়েছে মা! এই দুঃস্বপ্ন শেষ
হবে বাক মা, তোমার একটি আসল মুক্তা দিয়ে নং গড়িয়ে দেবো।”

রাইচরণ ঋপরের কাগজখানি হুড়িয়ে নিয়ে বল্লে—“তা তো
হ'লো। মা কালী না হয় মুক্তার নতুন লোডে শুভ-নিশ্চয় বধের
পালা শেষ করলেন। কিন্তু সেই থানেই যে দানববধের পালা শেষ
হবে, তাই বা কে বল্লে? আরও দু'-চারটা দাঁড়ানো তত দিনে
হবত আবার গড়িয়ে উঠবে; আর আপনি যেমন মাকে মুক্তার
নতুন লোড দেখিয়ে পেন্সনটা বজায় করে নিচ্ছেন, অপরে হয় ত
হীরের বাগার লোড দেখিয়ে আবার কি একটা কাণ্ড ঘটাবে।”

গোপাল দাস' হেসে বললেন—“আরে না, না, সে জব্ব আর নেই।
এবার যে দৈত্যকুল নির্মূল হয়ে বাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই
দৈত্যকুল জ্বলার পরেই যে সভ্যকুলের আরম্ভ, তা বিতর্কসিদ্ধ।”

দেবদানবের যুদ্ধ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়ে এখনও ন'শো একটিশ কংসর তাঁর তিরানকই টাকা দশ আনা
পেঙ্গন ভোগ করতে পারবেন। আর আমাদের চা, চিড়েভাজা ও
পেরাজের ফুলুরি অঙ্গর হয়ে রইল।”

আমাদের উদ্যোক্তা কবি লতিকাকান্ত এতক্ষণ চুলুচুলু নেমে
গোলাপি চায়ের পেয়ালা নিশেষ করছিল। এইবার সে মিহিকটে
বলে উঠল—“বীরে, রক্তনী বীরে! জন্ত তাড়াতাড়ি দৈত্যবধের
পালাটা শেষ করবেন না। শুভ-নিশ্চয়ের বংশে বাতি দিতে
কেউ যে আর বাকী থাকবে না, তা ত দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু ধীরা
তাঁদের বধ করবেন, তাঁরা কি সবাই দেবালয়সম্মত? সববে-পড়া
দিয়ে ত ভূত ছাড়াছো, কিন্তু সেই সবের ভিতরই যে দু'-দশটা ভূত
লুকিয়ে নেই, তা বেশ পরখ ক'রে দেখেছ ত?”

গোপাল দাস' তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে হু'-একবার
উঁকি-বঁকি মেরে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। রাস্তার
পাশেই ঘর। কে আবার কোন্ কথা শুনতে পেয়ে কখন কি বিপদ
ঘটায় তা ত বলা যায় না। তার পর ধীরে ধীরে বসে একটু ভাবির
কটে বললেন—“আরে ছি ছি! অবিশ্বাসী অন্তর, সঙ্কটিত নিরন্তর।
এই দৈত্যবধ-যজ্ঞের ধারা হোতা, তাঁরা তিন জনে যে একেবারে ব্রহ্ম,
বিষ্ণু, মহেশ্বরের অবতার, তা দেখেও বেঁচে না?”

ভক্তি জিনিষটা সত্যাক! গোপাল দাস'র গদগদ কণ্ঠের ধ্বনি
শুনে আমার গুণ প্রাণ গুলকের শিহরণ দেখা দিল। আমি বলে
উঠলুম—“আর কেউ দেখতে না পাক, গোপাল দাস', আমার জানচুকু
তোমার কথার একেবারে খটস করে খুলে গেছে। আমি বেশ স্পষ্ট
দেখতে পাচ্ছি, এই দানববধ কল শেষ করে মহেশ্বর ঠালিন অভ্যাস্তিক

মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত তাঁর ব্যাপ্তিমান বিস্তার করে ধানস্রূ হয়ে পড়বেন। এ যুগের ব্রহ্মা চারচিল, মহেশ্বরকে আর না খাটিয়ে সারা আফ্রিকার আর আরব, পারস্য, ভারত, ব্রহ্ম, জায়েদে নতুন নৃষ্টির পবিত্রজনা করবেন। বড়-বড়শালী মহাত্মজা বিকৃতরূপে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র আর বাহিনী বিস্তার করে জগৎ প্রতিপালনের ভার নেবেন। আটলান্টিক চাঁটায়ের মুষ্টিযোগ দিয়ে তিনি বে জগৎ থেকে বেগ-শোক, ক্লেশ-ক্লেশ, দারিদ্র্য, লজ্জা, মান, ভয় সবই দূর করে দেবেন, এ কথা ত হাপার অকরে খপরের কাগজে অনেক দিন আগেই যেরিখে গেছে। তবুও যারা বিশ্বাস করত চার না বে, এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-প্রবর্তিত নবযুগ জগতে বর্ষাবাজা প্রতিষ্ঠা করবে, আমি প্রত্যাখ্য করি যে, তাদের কঠী ছিঁড়ে দেওয়া চোক অথবা Defence of India Rule কেলে তাদের দৈবশক্তির প্রভাব অস্তিত্ব কহিয়ে দেওয়া চোক।

বক্তৃতা শেষ করে আমি আর এক চোক না খেয়ে নিলুম। আশা করেছিলাম, আমার গুজবিনী ভাবার গুণ্ডোয় লতিকাকান্ত লভিয়ে পড়বে। কিন্তু সে বকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

সে তুড়ি মেরে গান ধরে গিলে—

“হাঙ্ক তুমি হেসে হেসে
কামতে হবে অরশোয়ে
কলসী তোমার বাবে হেসে
লেগে প্রেমের ঢেউ

দেখ, গোপাল দা’। ইউরোপ আর এশিয়ার লতি-লানবুদেব শেষ করে তোমার ব্রহ্মা-বিষ্ণু বধন আমায়ের উপর প্রেমের বজা বজিয়ে দেবেন, তখন কাঁধের কলসী কেন, ভাঙেব গিড়ি-কুড়ি মুক্ত হেসে না যার।”

প্রেমাতুর ক’দিন থেকে বাড়িকাল ডিম্বাক্রান্তিক দলে বাতায়ানত করছিল। সে বাধা দিয়ে বললে—“না, লতিকাকান্ত, সে ভয় আর নেই। এবার ব্রহ্মার মন্দির হবে। দেনার জালায় তাঁর মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হবে। ব্রহ্মার বতগুলি মাসনপুর আফ্রিকার, চীনে, ভারতবর্ষ, পারস্যে লোলজিব্বা বিস্তার করে বজ্রভঙ্গ সঙ্গত করে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের বসন্তাশুর ভুজিয়ে বাবে। বসন্তের অজাবে তাঁদের দেউলিয়া হতে হবে। তা ছাড়া, দেখছ না, ব্রহ্মলোকেই এক আখটা বিপ্লবের স্কুলিক দেখা দিতে।”

রাইচরণ বলল—“ঈ, ব্রহ্মার মন্দির হবে ঐ আশাতেই থাকো। আমি ত দেখতে পাচ্ছি যে, যোগের পূর আবার ভরসাব্যাপ্ত পুনরুদার করবার জন্তে তিনি দিকে দিকে হাঙরা খেতে বেরিয়ে পড়বেন। তাঁর হাঁড়ে কোথায় কড়কুড় ভেল লুটান আছে, সে বশর তিনি কোন খেতাই সঙ্গত করবেন। তাঁর পর বৃষ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লক্ষ্যকার বৃক্কের উপর পা দাড়িয়ে গিয়ে বহুধর করবেন—কাও হাঙ্ক, পা হুঁটায় একটু ভেল বাসিস করে। তোমাদের বজা করবার হাঙ্ক বুটোয়টি করাই আমার পক্ষে বাধা ধরে গেছে। এখন তোমরা জল বাসিস করবে না ত করবে কে।”

প্রেমাতুর পরম বিজ্ঞান জার লতিকাকান্তেরা বিস্তার করে বললে—“কোন বশরই বাধা না দেখছি। এই পত লেখি, একবার আমায়ের

Army will vote for not holding India, Simple because they do not want to go back to that country...The views of the British Army in India would count a great deal in England after the war and in India the war has been a terrible thing.”

রাইচরণ লাকিয়ে উঠে কলসে—“বলো কি হে! জলে শিলা ভেসে যায়, বানরে সন্নীত গায়, এ কথা শুনেছে কে বা কবে? সে কালে নবীন সেন বে লিখেছিলেন—

মাটি কাটি লতি কোড়িধর
কেলিয়া সে বর হার কে করে কিরিয়া হার
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ?

সে কথা ত দেখছি ভুল হয়ে গেল। পাছে এ দেশ হাত-ছাড়ি হয়ে যায়, সেই ভয়ে ইংরেজ নানা দেশ থেকে সাশ, কাশা, ফলসে, পাটকিলে নানা বকম সৈন্য একত্র করলে; চারচিল সাহেব আমার মাড়ী থেকে টাকা ধার করে মূর মিতে মিতে সেউলে হবার জোগাড় হলো; আর তার পর বক্তারক্তি বধন শেষ হয়ে বাবে তখন ইংরেজ সৈন্য ‘বুটোর’ বলে এ দেশ ছেড়ে চলে বাবে। কলো কি হে! কোন দেশের খবরের কাগজ এ বশর ছাপলে? সেখানে গাঁজার দর কত? আমার ত মনে হয়, এর মধ্যে আরও কিছু আছে।”

লতিকাকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার সে মূর খুললো,—“তাই তো গোপাল দা’, ব্রহ্মার এই সব মন্দিরির লক্ষণ ত ভাল নয়। কলিকাতায় জয় করবার পর না কি মহারাজ অশোকের মনে বৈরাগ্যের সঙ্গার হয়েছিল, আর তার কলে চণ্ডাশোক বর্ষালোকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মকল চারচিলের মন মহারাজ অশোকের মতো ত অত নরম হাটিতে গড়া নয়; ব্যাপারটা কি বৃত্তে পারছিনে ত।”

আমি বললাম—“দেখ, বেবতাসের লীলা নরলোকের পক্ষে বুঝা কঠিন। বেবতারা ত তুমি দৈত্যানব বধ করেই কাঙ্ক্ষ হন না। বজ্রভঙ্গ নিয়ে তাঁদের নিজস্বের মধ্যেও যে হাঙ্ক হাঙ্ক মন-কবাবি, এমন কি লাঠালাঠি পর্যন্ত হয়, তার ত বহু প্রকাশ পুরায়েই রয়েছে। এই দেশ না কেন, ধীর কলসী বেবতা জীয়া সহজে শিকতে বজ্রভঙ্গ মিতে চাননি। অনেক বক্ষক পণ্ড করে তবে শিঠীচুককে জাতে উঠতে হয়েছে। এবারও বেবতারা শেষ পর্যন্ত যে কি লীলা দেখাবেন, তা ত কলো হার না। কে কোন্ জীকক ভরাবায় জয় দেখেন তা নিয়ে বতজেন হাঙরা খিচি নয়। আর তাই বলি হে, ত প্রেমের বজা আবার বসন্তাশুর পরিণত হতে কতক্ষণ।”

রাইচরণ ধামিকলপ বাধা দেতে বলল—“আমাদের মহামন্ত্রীও যেন ঐ বকম কথা বলছেন। এই শুধন না, তিনি কলহেন—
Victory won at the expense of India will mean that out of the ashes of Fascism-Marxism and Japanese militarism will have risen a new monster that will seek to eat all it sees and in

। ধ্বংস হবে বটে, কিন্তু যজ্ঞকুণ্ড থেকে এমন এক অতিকার আবির্ভাব হবে যে, সকলকে গিলে ফেলবার' চেষ্টা করবে এবং নৈজেও ধ্বংস হবে। কি যে বাকি থাকবে তা ভগবানই ।"

। সব নূতন ধরনের অতিকার দানব-টানবের কথা শুনে । দা'র মুখ শুকিয়ে আসছিল। তিনি চো চো করে আর এক গা খেয়ে নিয়ে বললেন—"নাঃ, তোমরা আর আমার নিশ্চিত পুনর্সনট্টা ভোগ করতে দেবে না দেখছি। অদৃষ্টে বা আছে, হবে, কিন্তু মহাস্বাক্ষীর ঐ কথাটা ত ভাল বুঝলুম না। দেব সঙ্গে একটা নূতন দানবের যদি যুদ্ধ হয়, ত এ ওকে খেয়ে, আর ও একে খেয়ে ফেলবে, আর বাকি যা থাকবে, তা জীও জানেন না—এ আবার কি রকম কথা হলো? দেবতাই, আর দানবই হোক, কেউ একটা বাকি থাকবে ত?"

আমি বললুম,—"না, গোপাল দা', মহাস্বাক্ষী ঠিকই বলেছেন। বাকি থাকবে না। জেলস্বাক্ষী একবার আমি একটা গোখরো'র সঙ্গে একটা কেউটে সাপের লড়াই দেখেছিলুম। ছ'বার

কৌস কৌস করে কেউটে সাপটা গোখরো সাপের ল্যাঙ্গটা কামড়ে ধরলে। গোখরো সাপও ছাড়বার শক্তি নয়। সেও কেউটে সাপের ল্যাঙ্গে মারলে কামড়। তার পর ল্যাঙ্গ থেকে আরম্ভ করে এ ওটাকে গিলতে লাগলো, আর ও এটাকে গিলতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে—আচ্ছা গোপাল দা', কি হোলো বল দেখি।"

গোপাল দা' বললেন—"কি আর হবে, দু'টোই মরে গোল হয়ে রাস্তায় পড়ে রইল।"

আমি বললুম—"ঐ ত গোপাল দা', সাপের খেলাই বুঝতে পার না, আর দেবদানবের খেলা বুঝবে কোথা থেকে? কি হলো, জান? বললে বিশ্বাস করবে না, কেউটেটা গোখরাটাকে বেমানুম গিলে ফেললে, আর গোখরোর মুখে পড়ে কেউটেটারও ঠিক ঐ দশা হোলো। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি—রাস্তা একেবারে সাক। সাপের নাম-গন্ধ নেই। মহাস্বাক্ষীর কল্পিত দেব-দানবের যুদ্ধও ঠিক ভাই হবে আর কি।"

গোপাল দা' মুহু হাসি হেসে বললেন—"চলোয় যাক দেবতা-দানব, আমার পেলনটা বজায় থাকলেই হোলো।"

—বিচ্ছেদ—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আশী বছরের বৃদ্ধের সাথে
বাঁধন কাটিল সম্ভার
যাট বসন্তের পরে ;—

বাঙা মাড়ী সিন্দুর আলতায়
চৌশলে পেল সম্ভার, এক।
অশীতি রহিল ঘরে।

সহসা বৃদ্ধ মোর মুখে চেয়ে
নিস্ত্যক্ত আঁধি অশ্রুতে ছেয়ে
ভক্ত-কণ্ঠে শুধল আমার—
'কি করি এখন ক'ন ত'?

শিশিরকোঁর্ষ স্বচ্ছ প্রভাত,
শেফালি-সুরভি বহে নীত বাত,
অকুণ্ঠ নীল অশ্রু আকাশ
উড়ে চলে নীলকণ্ঠ ;

চাহিয়া উড়ে করমোড়ে নমি'
কহিলাম আমি জাকি,—
'উজ্জ্বল দাও, নীল গগনের
হে নীলকণ্ঠ পাখি'!



দৈর্ঘ্য ছয় ফুট, গৌরবর্ণ দেহ, তপ্ত কাকনের আভা। বয়সের ছাপ গোটা করেক রেখার আছে, কিন্তু পল্লবপাশের মত চোখ দু'টি এখনও স্নিগ্ধতা বিকিরণ করে।

প্রতিমা প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে। সারা শরীর তখনো থর থর করে কাঁপছে। দিবোন্দু অবশ্য পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ এই শালগ্রামে মহাত্মক মহাপুরুষের সম্মুখে দিবোন্দুকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হতে লাগল প্রতিমার, তুলনায় অতুলনীয় অকিঞ্চিৎকর।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতখানা তখনো প্রতিমার মাথার ওপরই রয়েছে। প্রতিমা আনত মুখে দাঁড়িয়ে।

স্নিগ্ধ একটু হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

ভয় কি মা, এত বড় একটা দুঃসাহসের কাজ করেছে,—সমাজের মতো একটা দশমুণ্ড বিশহস্ত রাক্ষসের জুইটিকে উপেক্ষা করে এসে শেষ পর্যন্ত এই নিরামিষভোজী নিরীহ ব্রাহ্মণকে ভয়? কি রে দিবোন্দু, কথা বলছিস না যে? সব বীরত্ব, বড়ো বড়ো কথা কুহিয়ে গেল?

দিবোন্দু বলতে চেষ্টা করল,—আপনি আশীর্বাদ করুন। তার জন্মটুকু কথাটা শোনা গেল না, কিন্তু বোকা গেল।

আশীর্বাদ? আশীর্বাদ জ্ঞানেন্দ্র কবেই করেছেন, যে দিন দিবোন্দু এসে তাঁর কাছে সব কথা বলে বলেছে, সে দিনই।

মাথার ওপরের হাতখানা এতক্ষণে প্রতিমার ডান হাতখানা সন্মুখে টেনে নিয়েছে। জ্ঞানেন্দ্র বললেন,—চলো মা, ঘরে চলো। চা খেতে খেতে সব কথা শোনা বাবে। এসো দিবোন্দু।

চা খেতে খেতে কতো কাহিনী শোনা গেল। জ্ঞানেন্দ্রের বয়বনের। বোবনে ঝরাও বিদ্রোহী ছিলেন। প্রচলিত সব চিন্তাধারার বিক্ষেপে সেখানে একাকী দাঁড়িয়ে কতো সঙ্কল্প করেছেন, সে কথা সবিস্তারে বললেন।

পরিশেষে বললেন,—দুটি প্রাণের প্রেরণায় তোমরা দু'জনে

অবস্থাতেই এই অমুরাগ, পরম্পরের ওপর উজ্জল শ্রদ্ধা, ঐতিহ্য একে মলিন হতে দিয়ে না।

প্রতিমার হ' চোখ ছল-ছল করে উঠলো। জ্ঞানেন্দ্রের পায়ে হাত দিয়ে আবার নমস্কার করলে।

খুব ভোরে প্রতিমার ঘুম ভেঙে গেল। জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। আজ আকাশের রঙ এমন নতুন লাগছে। ভোর নয়,—সামান্য একটু চাঁদ ঝাউগাছের চূড়ায় লেগে রয়েছে। বাগানের দিকে তাকাতোই প্রতিমার চোখ ছুড়িয়ে গেল। এত ফুল আর এত রকমের। লাল, নীল, সাদা,—রঙে রঙে মেশামেশি; আর সবার মাঝখানে জ্ঞানেন্দ্র ধীরে ধীরে পায়েচাটী করছেন। আজ্ঞাহ-লম্বিত হাত দু'খানা বুকের ওপর রাখা। ধ্যান করছেন কি? বোকা গেল না। প্রতিমার ভারি লোভ হতে লাগল উঠে যায়। এই প্রাক্তসকালের হাওয়া, আখফোটা আলো, ভিজে ঘাস আর গন্ধনিবিড় মালক, এর কি যেন একটা তীব্র আকর্ষণ আছে। দিবোন্দু ঘুমুচ্ছে। প্রতিমা ওর গায়ে চামচটা ভাল করে ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো + যাওয়াটা ঠিক হবে কি? জ্ঞানেন্দ্রনাথ যদি অদৃষ্ট হন? হয়ত এই সময়টা উনি একলা থাকতেনই ভালবাসেন। কে জানে?

পায়ের শব্দেই জ্ঞানেন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। ফিরে তাকালেন,—এসো মা।

সেই আকর্ষণবিশ্বস্ত হাসি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুন্দর, প্রতিমা জানে,—কিন্তু সে রূপ যে কত, মহাসমুদ্রের মত দোলায়মান অথচ সহজ, পূর্ণতার মত উজ্জ্বল অথচ অল্পজ্বালিত, সে কথা আজ এই ব্রাহ্মদুর্ভেদে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সে উপলব্ধি করলে।

জ্ঞানেন্দ্র বললেন,—এসো মা। ঘুম ভেঙে গেল? দিবোন্দু ওঠেনি?

অকারণেই প্রতিমা একটু আতঙ্ক হয়ে উঠলো। বললে,—না।

—আর তুমি বুঝি ওকে না জানিয়েই উঠে এলে? আমায়ের



শিল্পী—সব্বসন আবেশিন

“সে অন্ন বর্জন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ভাক নিষ্ঠুর অভ্যাচারে,
নাহি জানে কার বারে পাড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।”—স্ববীজনাথ

—সকালবেলা উঠে একটু বেড়াতে ইচ্ছে হ'ল। আপনি বোধ
এত জোরে ওঠেন ?

এ কথার জবাব না দিয়ে একটু হাসলেন শুধু। আজ নয়, এ
অত্যাশ তাঁর বহু দিনের। সারা দিনের হটগোলে নিজেকে মানুষ
খুঁজে পায় না,—হারিয়ে যায়, নদীর প্রান্তে নৃশংসকণের মত অজ্ঞান
ধারায় ভেসে যায়। খালি এই সময়টুকু তাঁর নিজস্ব, নিঃসঙ্গ এই
প্রাকৃতিক ব্রাহ্মণ্যটুকু। এই সময় সমস্ত পৃথিবীতে একটা শিশিরবাত
আছে বেননা জড়ানো থাকে,—নিজেকে সমগ্র বিশ্ববস্তুর সহোদর
মনে হয়। চরাচরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করবার পক্ষে এমন
উপযুক্ত সময় আর পাবে না মা। এসে একটু ঘুরি।

সারা বাগান ঘুরে জানেন্স প্রতিমাকে গাছপালার সঙ্গে পরিচিত
করালেন। ফুলগুলোর নাম চিনিতে গেলেন, একে একে। কি
ভালের বৈশিষ্ট্য, কোন্টা কার প্রকৃতি,—সব।

প্রতিমা মুক্ত বিষয়ে স্তব্ধ। জানেন্স এত জানেন,—শুধু তাই
নয়, এমন উচ্চারণ-ভঙ্গি, এও প্রতিমার কানে নতুন। ধীরে ধীরে
প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছেন, এক কলি ফুলের যেন পাশটি খসে
যাচ্ছে। আর কত কথা। ফুলের ভেতর, ঘাসের ভেতর, লব
মিগন্ধের মৌন নিশাঙ্গ অরণ্যানীর ভেতর যে এত কথা ছিল, তা
প্রতিমা এত দিন কোথা থেকে জানেন ? বাগানের প্রতিটি ফুল
জানেন্সের চেনা। এসে প্রতিটির জন্মবৃত্তান্ত জানেন।

কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল। চাদের বিবিসি দিবোন্ধু এসে
হুম-জড়ানো চোখ মুছতে মুছতে। একটু নিবাসা পেয়েই প্রতিমাকে
জনাঙ্কিত করলে,—চুপি চুপি কখন উঠে এসেছে, আমাকে ডেকে
লাগনি যে ?

প্রতিমা সংক্ষেপে বললে,—বাগান ঘুরে তেরছিলুম।

ধীরে ধীরে জানেন্সের সব কাজের ভার এসে পড়ল প্রতিমার
ওপর। সকালে চা পানের পর খবরের কাগজ। বকরের কাগজের
পর ডাক খোলা। জানেন্সনাথের নামে এত চিঠিও আসে। শতকরা
পঁচিশখানা চিঠি আসে বিদেশের। দেশে-বিদেশে জানেন্সের অসংখ্য
জন্মভক্ত ভক্ত ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রীতির জ্বালা নিবেদিত হয়
প্রতিদিন নানা রঙের চিঠিতে।

সেক্রেটারীর কাজ করছে প্রতিমা। প্রতিদিন এষ্ট ক্রান্তিকর
ছুপ পড়ে উজ্জ্বলবাস্যগুলোর সন্ধিপুলার জানেন্সকে কানানো।
কতকগুলোর জবাব লিখে দেওয়া।

দিবোন্ধুর সঙ্গে কথা হয় বৈ কি। ওপূর্ব আড়াইটের পর দুই
বৈকুণ্ঠ মাঠের পায়ে-চোলা খুলো-গড়া পথে একটা বাইসকেল এসেছে।
খেকড়া শব্দ ভেঙে আসে। এই সময়টা জানেন্স নিজের লাইব্রেরী-
ঘরে নিরাপায় বসে পড়াশুনা করেন। প্রতিমার ছুটি। সেট
সাইকেলটা এসে ঢোকে জানেন্সের বাড়ীতেই। কটক পাব হয়ে
বাগান। বাগানের শেষে ছোট্ট সোতলা ঘর।

সাইকেল থেকে নামলো দিবোন্ধু। চৈত্র মাসে তিন ক্রোশ
সাইকেল ভেঙে এসেছে। সারা শরীর ঘাসে ঢেঁকা। ভামাটা গায়ে
রক্তের আভাস দিচ্ছে। আর মুখের রঙ ঠিক কপা দিবোন্ধুর
কবলোই ছিল না। এই ক'দিনে ঘুরে ঘুরে আরো বেন পড়ে

ঘরে ঢুকে দিবোন্ধু ভামাটা ঘুলে জাকেটে বুলিয়ে গিলে, তার পর
খালি শিঠি জিমে পাখাটা জড়িয়ে বললে,—সেক্রেটারীজী, কি খাবে।

প্রতিমা একটু হাসলো, জবাব দিলে না। বললে,—খাবার দিও।
সোত্রাসে খাবার একটা কথা আছে। পোকের গায়ে কেমন
প্রতিমার জানা নেই, কিন্তু সারা দিন ঘুরে ঘুরে হরষাণ হয়ে ফিরে
এসে দিবোন্ধুর মুখে ভাত ভোলবার জলী সবে প্রতিমার ওই কথাট
মনে হয়। মনে কতই হাসি পায়।

দিবোন্ধু বলে,—হাসছি ?

প্রতিমা বলে,—হাসছি ? কই না তো ? ডুমি খাও, আমি
চাওতা করছি।

দিবোন্ধুকে প্রতিমার মাথা চড়। সেই আগের দিবোন্ধু তার
নেই, কলেজের ডিক্টে আর কখনও ঘর যুক্তিতে প্রতিমা তার
মানার অবসর পেতো না। সেই দিবোন্ধু কই, তার উচ্চারণ
প্রতিমা এক দিন বিজ্ঞানের ডেকা অলসে দেখেছে, ঝাকানো টোটে
সেখোছে সত্যজ্ঞর কৃপাণ ?

দিবোন্ধু যেন নিয়ে গেছে। সব পৌঁছাব কি তার তে সময়
চাওয়ায় নিয়ে গেল,—সমাজের বিজ্ঞানে একটা মেথোকে তার করে
বিরে করতে গিয়েই ? প্রতিমার অবাক লাগে। এই লোকটির পূর্ণ-
পাশি অসমর্থ মনে আরো একটা ছবি ভেসে ওঠে। অতি নীচ
সৌম্যবর্ন প্রবীণ একটু বপ। যোমের মত গায়ে বসে। সারা
শরীর কলসায় বেন গলে গলে পড়ছে। ধীরে ধীরে জানেন্স তার-
সম্পর্ক ছাড়ে।

কিন্তু দিবোন্ধু ও তো মন নয়। ও যে তার নিশ্চয় আশ্রিত।
জানেন্সনাথ সত্যজ্ঞর, কিন্তু দিবোন্ধু প্রতিমার একাধ।

জানেন্সনাথের আদ্যে অনেক সন্ধ্যার সময় একটা হ'ল গাউ
সংগঠন। বাংলার সব গ্রাম নতুন করে গড়ছেন। জমি, জল,
কুমার, ছুতোয় সবাইকে নিয়ে একটা আদর্শ সমবার গঠন করেন।

আপাততঃ পাশের ধান জিনেব গ্রাম নিয়ে একটা পরীক্ষার
প্রকল্প রচা চলছে, আর সেই প্রকল্পে কণ্ঠকণ্ঠ দিবোন্ধু।

সারা দিন দিবোন্ধুর এতটুকু বিজ্ঞান নেই। কোন দিন এসে
ত'টো আড়াইটে নাপাক করে ছ'টো খেয়ে নেবার জের, কোন দিন
হরষ আর সময়মত কোই হয় না। বেলা পাঁচটা ছ'টার সময়
ফিরে সাইকেলটাকে টেলে সে একজিকে, শরীরটাকে চালান করে
বাখকয়ে। কিন্তু প্রতিমা কই। সারাদিনের আকাশ চাংখার পর
দিনান্তের নীচ কি এই,—যার জন্তে দিবোন্ধু সব কিছু ত্যাগ করে,
আত্মীয়-বন্ধনের সম্পর্ক ছুঁকিয়ে, প্রতিমাকে নিয়ে এই গ্রামে এসে
এসে ডেবা বেঁধেছে ?

চাকরের হাতে চিঠি দিয়ে প্রতিমাকে ডেকে পাঠালো। প্রতিমা
ততখুপি এসো না, এসো বকস ভকস করে ঘরে সন্ধ্যাপূর্ণি খাশ হয়ে
গেছে। অন্ধকার ঘরে আবার-আবার শরীর ঘুড়িয়ে দিবোন্ধু সার
দিনের অবলাস নিয়ে তরেকিল। প্রতিমার পায়ের শব্দ পেতেই
একটা আদর্শ ঘর বেরিয়ে এসে,—এত দেরী।

হাসিমুখে প্রতিমা বলে,—কাকাবাবুকে আর কই উই লেখা একা
নতুন গাম শোলালাস। নতুন ক্রিকেটের। আমি সোপানে বসিদি
—

দু'বললে,—না থাক। কসবে একটু ?

শুভ তা বসবার সময় নেই প্রতিমার। জানেন্স একটা লিখছেন,—হাতের কাছে নানারকম বই চাই। সব বই কে নিয়ে লিখতে বস। বড় অসুবিধার,—তাঁই প্রতিমাকে। হাতের কাছে চাই। ছোটখাটো ফরমাস খাটবে প্রতিমা, তবু তাঁর অসুস্থত্ব প্রসঙ্গের জবাব দেবে, কীকে কীকে চা করে এ ভারী মজার না ? ভাবতেও আমার গর্জ হয়। তাঁর এটি ভিত্তিবাণ,—সব কাগজে বা ছাপা হবে, সারাদেশ বার প্রকাশ্যে, তার শিষ্টনে আমারো একটা দান আছে, সাধমত আমিও সাহায্য করতে পারছি,—এটা গর্জের নয় ? তুমি এখন কী ?

শিখি ? দিব্যোদ্ধ বলা,—আমি একটু ঘুমোবো।

গাটো বসন্তকাল প্রতিমা জানেন্সনাথের সঙ্গে ভারতবর্ষ ঘুরে। এই সময়টা জানেন্সনাথ দু'টো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন। গিয়েছেন। তিনটে বঙ্গদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর যারোখাটন ছন। তাছাড়া সর্বত্র প্রভাত কতটা বকুতা ছড়াতে হয়েছে হিসাব নেই। এত কাল প্রতিমা জানেন্সকে দেখেছে তাঁর লোক ধ্যানাসনে,—জনারণ্যে এই প্রথম দেখল। দেখল অসংখ্য পুর ভীড়ও জানেন্সনাথ দ্যুতিমান, সকলের ওপর মাথা তুলে ছন। দেখল, তাঁর প্রতিষ্ঠা। যেখানেই গেছে, সেখানেই ভৈল্লন, মালা আর চন্দন ; প্রণাম আর করতালি। জানেন্সের টিভের দু'শাশে সারিবদ্ধ লোকের জয়ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে গর্জের ভিয়ারও বুক ভরে উঠেছে।

জানেন্স বলেন,—তুই আগের কসে আমার মেয়ে ছিলি। মেয়ে। হলে বাপের এমন বড় কষ্টই করে।

প্রতিমা কিছু বলে না বটে, কিন্তু বলে বলে জায়ে,—আমিমাঝে রে করতে পারাও বে সৌভাগ্যের কথা।

আর সেই দু'র প্রবাসে কতই কখনো দিব্যোদ্ধ চিঠি এসে পৌঁছয়। জানেন্সনাথকে আশ্রমের খবরাখবর দেওয়া শুকনো সাংসারিক চিঠি। প্রতিমার কাছেও কখনো যা হ'তর থাকে। বহুব্রহ্মান্তর থেকে কখন একটা সাদার মত। দিব্যোদ্ধ এখনো আছে। অনেক দূরে আছে।

মমতা প্রতিমার আসে বৈ কি ! আহা বেচারি ! দিব্যোদ্ধ একটা কটো তার হৃদয়ে ছিল। সেখানে গুলে বার করে। অত্যন্ত ভীক একটা চেহারা ! কর্কশ কৌকড়ানো চুল পিছনের দিকে ঝাঁচড়ানো। বুড়ির ছাপ সে মুখেও আছে বৈ কি। জানেন্স অপরূপ কিন্তু দিব্যোদ্ধ অন্তঃ।

ওরা যে দিন কিরে এলো দিব্যোদ্ধ সে দিন ঠেগনে ছিল। জানেন্সকে প্রণাম করে প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করল,—কেমন ছিলে ? উদ্ভূসিত হয়ে প্রতিমা সারা পথ-জমজমাতির বর্ণনা দিলে। দেশের

দৈনিক কাগজে সে সবার বিবরণী বোরয়োছল, ১৮৮৩

যেন দৈনিকের নীরস ফিরিঙ্গির চেয়েও ক্লান্তিকর। অনেক কথাই প্রতিমা বলে গেল, কিন্তু বহন জিজ্ঞাসা করল এই আড়াই মাস দিব্যোদ্ধ কেমন ছিল, দিব্যোদ্ধ তার জবাব দিলে না।

সামিগ্রীর সম্পর্ক ক্রমেই আরো সূক্ষ্ম, সামান্য হু'-একটা কথার আদান-প্রদান মাত্র ঠেকল।

খেতে বসে যদি বা কখনো প্রতিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথা বড় হয় না !

—তুমি আজ কাল বড় কম থাক।

আগে হলে দিব্যোদ্ধ ঠাট্টা করে বলতে পারতো,—তুমি সমুখে বসে রয়েছ তাতেই পেট ভরে গেছে। কিন্তু আজ চুপ করে রইল। জ্বীর সঙ্গে ঠাট্টা করার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

প্রতিমাও আজ কাল বই পড়তে শুরু করেছে। জানেন্সের লাইব্রেরীর বাছা বাছা বই। বলে,—কিছু জেনে শুনে রাখা ভাল বাপু। নইলে তাঁর সঙ্গে কথা কইতেও লজ্জা করে। এত জানেন,—নানা কথা বলেন, কিছু বুঝতে পারি না,—খালি চুপ করে থাকি। তুমিও তো হু'-একটা বই পড়তে পারো !

তার পর দিন কতক দিব্যোদ্ধকে আরো দেখা গেল না। প্রতিমার সময় অল্প। জানেন্সনাথের কবিতার বইয়ের প্রেক্ষ দেখা থেকে শুরু করে তাঁর আহ্বারের পরিচর্যাও তাকে করতে হয়, তবু এরই কীকে কীকে সে দিব্যোদ্ধের খোঁজ করতে গিয়ে শুনেছে, দিব্যোদ্ধ বাড়ী নেই। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছে, দিব্যোদ্ধ আলো জালিয়ে পাশের ঘরে শুয়েছে।

পা টিপে-টিপে প্রতিমা উঠে এলো। দিব্যোদ্ধের দরজা ঠুক খোলা। আলোর একটা তির্যাক তাঁর বারান্দার এসে পড়েছে। আন্তে আন্তে দরজা ঠেলে প্রতিমা ভেতরে এগিয়ে গেল। টেবিলের ওপর মাথা রেখে দিব্যোদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর একটা স্নো আর একটা পাউডার। আর খোলা খাতার পাতার ওপরে অল্পস্রু কাটাফুটি করা গোটা তিনেক কবিতার লাইন, তাও শেষ পর্যন্ত মেলেনি। প্রতিমার মনটা চমকে উঠলো। স্নো আর পাউডার মেখে দিব্যোদ্ধ জানেন্সের মত ফর্সা হতে চায় না কি আর হ'তর ছন্দ মেলাবার বর্ষান্ত্র চেষ্টা করে চার জানেন্সের মত কবি হতে। এত ছেনেমাছুষ দিব্যোদ্ধ ? কল্প কল্পে এত দিন তবে এই সর্বানেশে বশীকরণ-তপতায় সে মেতেছিল ?

নিজের অজান্তেই প্রতিমার বুকের নিহতলা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল দিব্যোদ্ধের খোলা খাতাটার দিকে। এর কী প্রয়োজন ছিল ? ওর দ্বিধাবিভক্ত নারীচিত্তে দিব্যোদ্ধ আর জানেন্সনাথের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আসন, সে দু'য়ে তো কোন বিরোধ নেই। তবু দিব্যোদ্ধ জানেন্স হতে চায় কেন ?

“মাদুরের সঙ্গে মাদুরের আত্মীয়-স্বজন-স্বাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।”—রবীন্দ্রনাথ

পূর্বের দিন সকালবেলাই সে পাড়ার
লাইব্রেরীতে থাকা ইংরেজী বাংলা
কলত্রগুলির কব্জিখান-পুঁজা খুলিয়া বসিল।
দ-মাষ্টারী খালি হওয়ার সময় সেটা নয়,
বাং বিজ্ঞাপন অর্থাৎ থাকে। তবু সব
টা কামত খুঁজিয়া বদ-বায়েটা বিজ্ঞাপন
হয় করিল। এবারি তাহে প্রত্যাহ বটা-হুই
জ্ঞাপন বাটরা তিন দিনে প্রায় পোটা
লিখেক দরবাণ্ড ছাড়িয়া সে কতকটা
হইল। কলা বাহুল্য, ইহার সব



[উপভাস]

শ্রীগজেন্দ্রকৃষ্ণার নিয়

টুটাই মকবলের ইচ্ছা। কলিকাতার কোন ইচ্ছার বিজ্ঞাপন
গাথে পড়িল না, পড়িলেও সে দরবাণ্ড করিত না—কারণ,
লিকাতা সে ছাড়িতেই চায়। ছিল হুই-একটা সহরতলীর ইচ্ছা,
কিন্তু সে-ও সেই এক কথা। সেখানে মাষ্টারী করিলে বাড়ী ছাড়ার
কান অজুহাত থাকিবে না, মিছামিছি ট্রান্স-মাসে কতকগুলি বাড়তি
পলস ও সময় নষ্ট হইবে।

না, কলিকাতার থাকা তাহার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। এখানে
সময় নষ্ট হইবার অল্পমাত্র কাঁচ পাড়া আছে চারি দিকে, চাকরী করিয়া
নিজের পড়াশুনা করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাহার উপর বাড়ীর আবহাওয়াও
তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থার অসঙ্গ। ইচ্ছাকলমে ছাড়া
পড়িবার কথা তাহার চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং এখন তাহার
পড়াশুনার সময় বেটুকু সমীর করে তখন সেটুকুও থাকিবে না।
তাহার উপর এই ইচ্ছা-মাষ্টারীতে যে তাহার বাবা যোগদত্ত
অংশিত করিবেন, বরং তাহার বিদ্যুদ্ভাষ্য শব্দ ছিল না—
প্রতিদিনই কানের কাছে শোনাইবেন যে, চাকরি যদি করিতেই হয়
তাহা হইবে চাকরীই করা উচিত। তাহার কথা অমাত্র করিয়া
সে যে বহুলোকের ভরসাও এম-এ পড়িতে গিয়াছিল সে অপরাধ তিনি
কোন দিনই ক্ষমা করেন নাই—সুযোগ পাইয়া নিষ্ঠুর বিদ্রোহ এই
কয় দিনেই তাহাকে জলজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তবু
অনেকটা সময় সে বাহিরে বাহিরে কাটাওয়া আসে কিন্তু বারো মাস
ত আর সেটা সম্ভব নয়, আর তাহা হইলে পড়াশুনাই বা সে করিবে
কখন? তার চেয়ে বরং পুরীগ্রামে চলিয়া যাইতে পারে ততই
ভাল। এখানকার এই সব স্তম্ভহীন বিরক্তিকর আক্রমণ সেখানে
পৌছিতে না—বড় জোর কয়েক দিন অন্তর দু-একটা চিঠি, সেটা
তত অসঙ্গ হইবে না।

দরবাণ্ড পাঠাইয়া সে যেন প্রতিটি মুহূর্ত গণিতে লাগিল। চাকরীর
দরবাস্তবের কি কল হয় তাহা সে অনেকের মুখেই শুনিয়াছে, তবে
এ ক্ষেত্রে ভরসা এই যে, মকবলের ইচ্ছা-মাষ্টারী নিত্যন্ত নিরুপায়
না হইলে কেহ করিতে চায় না। চলিখ বিলাশিষ্ঠা দরবাস্তবের মধ্যে
একটা অন্ততঃ কোথাও লাগিয়া যাইবে—এ ভরসা তাহার ছিল।
দিন যেন আর কাটে না। ইউনিভারসিটি বাঙলা সে ছাড়িয়া বিদ্রোহ;
এম-এ পড়া এখন কিছুতেই সম্ভব হইবে না তখন শুধু শুধু বায়া
বাড়াইয়া লাভ কি? কি-ই বা বলিবে সে সহপাঠীসব? তাহাদের
সেই নিশ্চিন্ত কল-কোলাহলের মধ্যে তাহার আশাতমের বেদনা
অধিকতর আঘাত পাইবে, এই মাত্র। ও সময়ে ভ্যাগ করাই ভাল।

পরিচিতি বা পরিচয় এইকি কেই বৈধ
বাস্তব জগতের না। তাই সে মনে মনে
প্রতিজ্ঞা করিল, আবার যদি কোন দিন
কখন যোগ্য হয়ে আসে তাঁকিতে পারি তবেই
সেবা দেব, হইলে নই। বড় জোর
জীবনে আদি কাল দেখি কিংবা হয়েই গেছি।

দীর্ঘ দিন এক দীর্ঘ রাত্রি। সকাল-
বেলাটা কাটে লাইব্রেরীতে, বায়া অফিসে
চলিয়া গেলে বাড়ী থেকে—তাহার পুর লখা
মিছামিছা বিদ্রোহ আবার সজ্জার পূর্বেই
বাহির হইয়া পড়ে, রাত্রি পড়ার হইবার

আসে আর বাড়ী আসে না। কিন্তু সে-ও বিশৃঙ্খল নয়, কলমে
খোদায়, ইচ্ছা মার্গেই প্রকৃতি পরিচিতি ও প্রিয় জগতগুলি তাহাকে
এড়াইয়া চলিতে হয়, পাছে কোন সেনা-লোক বা সহপাঠীর সঙ্গে দেখা
হয়। অপেক্ষাকৃত নির্জন এক ঘর কোন একটা পার্কে চূপ করিয়া
বসিয়াই বৈধ জাগ সময় কাটায় সে। এ নিষ্ক্রিয়তা তাহার অসঙ্গ
লাগে, অথচ কোন উপায়ও খুঁজিয়া পায় না।

সজ্জার কথা তাহার প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়ে। মনে হয় যে,
তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবার আসে যদি এমন কোন দুর্ভাগ্যের
মধ্যে পড়িত, তাহা হইলে যোগ হয় একটা দুঃখ জোগ করিতে হইত
না—তাহার কাছে সাধনা মিলিত অতি সহজে। তবু তাহার
সাহচর্যই ত একটা মস্ত সাধনা। এই মুহূর্তে সে যদি সজ্জার কাছে
বসিয়া আবার আপেকার বস্ত সাহিত্য বা অন্ত দেখা-পড়ার কথা
আলোচনা করিতে পাইত, তাহা হইলে এই সমস্ত বেদনা, সমস্ত
প্রাণের চিন্তাভাব থাকিত না তাহার মনে।

একটা কথা তাহার মনে হয় সব চেয়ে বেশী—একটা কোত্থল
আচ্ছা, সজ্জাও কি তাহার অভাব অনুভব করে? প্রায় জাগে বার
বার—বার বারই সে নিজের অন্তরের মধ্যে উত্তর খুঁজিয়া পায়
সজ্জার সেই সমস্ত জ্ঞানশিখার চোখ টুটি—দুপনের মধ্যে শুধু
উৎসর্গ এবং প্রীতি যেন সে গুটি চোখে ভরিয়া থাকিত। না, সে
এক সহজে দুপনকে তুলিয়া যাইবে না। সেই আশা-বাক্যটিই
তাহার এই অপরিমিত নৈরাশ্রের মধ্যে যেন তাহাকে বাঁচিবার
পাথের যোগাইত।

ছুতীর দিন ডাকে হুইখানি চিঠি আসিয়া পৌছিল। হুটি হুটি
করই তাহার পরিচিত। একটি সজ্জার, আর একটি মোহিত বাবুর।
প্রথমেই সে সজ্জার চিঠিটা খুলিল। সে লিখিয়াছে—

শ্রীচরণ—

আপনার চিঠি পেলাম দায়ব হাতে। কেন যে
আপনি সহসা আমাদের ভ্যাগ করলেন তা বুঝতে পারলুম
না। সে দিন দায়ব সঙ্গে কথা কইবার পর সেই যে আপনি
চলে গেলেন আর এলেন না, তাতে তবু এইটে অস্বাভাবিক
করতে পেরেছিলুম যে, সেই আলোচনার সঙ্গেই আপনার
এই অস্থায়িত্বের যোগাযোগ আছে। আজ লাহ
আপনার চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'সিঁরিভাই
যেহ আমায়—দুপনে খুব আঘাত পেয়েছে কিন্তু তুমি
বিধায় করো আমার অন্ত উপায় ছিল না।'—কি কারণ,

আমাকে পেরেন তা জানি না, জানবার

হুত আমার নেই! তবে যদি যে কখনও কারুর
ব্যবহার করবেন না, এটা আমি জানি। অথচ
জানি, আপনিক অক্ষরেন অভিন্ন করবেন
। সত্য আমার সত্যাতীত—তা নিয়ে যাবাও
।। কারন বাই হোক—আপনাকে হারতে হ'ল
আমার কাছে বড় কথা। আপনার সঙ্গে আমার
এর নিম্নই হুত বাবার নহ—বেটু আক জেনেছি
আপনারই কত, এটা আপনিও কোন দিন
প্রকটন না; আর সেই জন্মেই আমার ভরসা আছে
যে প্রতি আপনার স্নেহও কোন দিন যাবে না।
! খাদুস—আমি জানি আপনার স্নেহ ও আশীর্বাদ
পাশে। আপনি করন খুব বড় হবেন, খুব বড়—
কলে দেশবিন্দে আপনার খ্যাতি বখন হুতবে পড়ার
স আর সব কথা তুলে বান কতি নেই, শুধু এটি
প্রকটন যে সে দিন আর কেউই আমার চেয়ে বেশী
হবে না। আপনার স্নেহ আমার অনেক আশা মাঠার
। আমার সে আশা যে পূর্ণ হবে তাও আমি জানি।
আপনি দেখা আর না গিতে চান সেবেন না, কিন্তু
সেবেন ত ?

আমার লত কোটি প্রশ্নাম নেবেন। ইতি—
আপনার সন্ধ্যা!

ঐশানা পড়িতে পড়িতে ভূপেনের ঘুড়ি আপসা হইয়া আসিল।
এর মনকে বার বার এই বলিয়া সাধনা দিবার চেষ্টা করিল যে,
তাহার কোন হুশে নাই, অন্তর ভবিষ্য গিয়াছে, সন্ধ্যা এই
এই প্রীতিফুল্ল তাহার চক্ষুকে সজল করিয়া তুলিল।...
সন্ধ্যা চিঠি পড়া শেষ হইবার অনেকক্ষণ পূর্ব সে মোহিত বাবুর
ধানা খুলিল। চিঠির সঙ্গে বাহির হইল একখানা চেক, এ মাসের
বেতনটাই শুধু দিয়াছেন তিনি, বেশী কিছু দিবার চেষ্টা করেন
। মোহিত বাবু লিখিয়াছেন—
কল্যাণবন্ধু—

তোমার চিঠি পড়িয়া, তুমি যে আমাকে তুল বুঝিয়াছ
সে জন্ম বেমন হুশিত হইলাম, তেমন আমি যে তোমাকে
তুল বুঝি নাই এজন্য একটু গর্ক বোধ না করিয়াও পারিলাম
না। তুমি যে আত্মসন্ধান-বোধের পরিচয় দিয়াছ তাহা
তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে এবং এখন আর স্বীকার করিতে
যাযা নাই, আমি তাহা তোমার কাছে আশাই করিয়া-
ছিলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি জয় হও, বশী হও—
তোমার ভবিষ্য উজ্জ্বল হউক। তবে একটা অনুরোধ,
যদি কখনও খণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন অন্ততঃ যেন
এই বুকের কথা আগে মনে পড়ে। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও
অন্ত কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে, তখন আমাকে
ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিও, তখনও যদি অভিমান করিয়া দূরে
রাখা তাহা হইলে ক্ষম হইবে। মধ্যে মধ্যে পত্র দিও। ইতি—
আশীর্বাদক—তোমাদের দাদু।

চিঠিখানা বাক-হুই পড়িবার পূর্ব পূর্বকার সন্ধ্যা হুত...
ভূপেন ছির হইয়া বসিল। হুত সে তুলই বুঝিয়াছে মোহিত বাবুকে,
কিন্তু তাহার দান প্রত্যাখ্যান করিয়া তুল যে করে নাই, তাহাকেও
নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।...এই পরিবারটির প্রীতি, লক্ষ্য এক
যে স্নেহ স্নেহাংশদের স্নেহে অনেক আশা পোষণ করে, সেই সত্যকার
স্নেহের পরিচয় সে বার বার পাইয়াছে, আশাও আর একবার পাইল।
বোধ হয় এই-জন্মেই কতিবোধ ত হার এত প্রবল, এই জন্মেই তাহার
বেতনার পরিমাণ এত বেশী। তবু এইটাই তাহার ভবিষ্য জীবনের
পাথের হইয়া রহিল, জীবন-যুদ্ধের রহিল প্রধান অস্ত্র।

সন্ধ্যার খোলা চিঠিখানা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর
একবার সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, তাই হবে সন্ধ্যা, আমি তোমার
জন্মেই বড় হবো! নিশ্চয়ই বড় হবো, তুমি দেখে নিও।

দিন পাঁচ-ছয় প্রতীক্ষা করার পূর্ব বখন চিত্ত তাহার বৈশেষ্য শেষ
সীমায় পৌছিয়াছে, বখন হতাশ হইবার আর খুব বেশী দেরী নাই,
তখন হঠাৎ এক দিন সকালে খান-হুই চিঠি আসিয়া পৌছিল। একটি
আসিয়াছে এম-ই বা মধ্য-ইয়েরজী বিভাগর হইতে—ইহার বিজ্ঞাপনে
মহিনার কথা জানান নাই, এখন তাহাকে ঐ পদে বাহাল করিয়া
জানাইয়াছেন যে, আপাততঃ কুড়ি টাকার বেশী বেতন দিতে পারিবেন
না। আর একটি বীরভূম জেলার এক গ্রাম্য হাই-স্কুল হইতে
আসিয়াছে, তাহার নিয়োগপত্রে লেখা আছে মাসিক পঞ্চাশ টাকা
বেতনে তাহাকে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল; কিন্তু সেই
খামের মধ্যেই একখানা ব্যক্তিগত চিঠিতে হেডমাষ্টার মহাশয়
জানাইয়াছেন যে, খাতার-কলমে পঞ্চাশ টাকা থাকিলেও আসল মাহিনা
তাহার তেতাশি টাকা আট আনা, সে যেন কোনরূপ ভুল বুঝিয়া
না আসে। এখানে প্রাইভেট টিউশানীরও কোন সম্ভাবনা নাই—
অপেক্ষাকৃত বাহাদুর অবস্থা ভাল তাহাদের লইয়া একটা কোচিং
ক্লাস মত আছে, কিন্তু সে-সবই পুরাতন শিক্ষকরা লম্বল করিয়া
আছেন। সে যদি হোটেলেরি থাকিতে চায় তাহা হইলে মাসিক
চার টাকা খরচ পড়িবে থাকা এক খাওয়ার। ইত্যাদি—

মাষ্টারের মাহিনা খুবই কম—এ কথাটা আরও অনেকের মুখে
ভূপেন শুনিয়াছিল; সুতরাং তেতাশি টাকা আট আনাতে সে ভর
পাইল না। বরং সে হুত আরও কমই আশা করিয়াছিল। কিন্তু
হোটেল চাক্ত-এর পরিমাণ দেখিয়া সে বিস্মিত না হইয়া পাকিল না।
চার টাকার খণ্ডা ও থাকা? সে কেমন দেশ!

সেই দিনই সে সেক্রেটারীর নামে ইংরেজীতে একখানি এবং
হেডমাষ্টার মহাশয়ের নামে বাংলায় একখানা চিঠি লিখিয়া ছাড়িয়া
দিল। হু'জনকেই লিখিয়া দিল দিন-আটকের মধ্যে সে ওখানে
পৌছিবে।

বাড়ীতে এত দিন সে কিছুই জানায় নাই। কথাটা শুনিতেই
একটা চোচামেচি, এমন কি লালাকাটি পড়িয়া বাইবে। সব চেয়ে বিশদ
বাবাকে লইয়া, মুখে তিনি বাহাই বলুন, সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে স্নেহ
তিনি যে তাহাকেই করেন তা ভূপেন জানে। আশা-তরঙ্গ সবই
তাঁহার এই একমাত্র পুত্র-সন্তানটির উপর। এ ক্ষেত্রে কথাটা
কি করিয়া পাড়া বার সেইটাই হইল বড় সম্ভা। অনেকক্ষণ
ভাবিবার পর সে সর্বাপেক্ষা সঙ্গ উপায়টাই বাছিয়া লইল। সন্ধ্যার

পুকেই সংবাদটা মাকে জানাইয়া, তিনি শুদ্ধিত ভাব কাটাইয়া উঠিবার আগেই, সে বাহির হইয়া পড়িল এবং কিরিল রাত্রি এগারোটার পরে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়াই সে বুঝিল, বড় তখনও কাটে নাই। বাবা তখনও টাংকার করিতেছেন, নীচের তলার অবিনাশ বাবুয়া সকলে উপরে বসিয়া ভটলা করিতেছেন আর মায়ের অবস্থা বর্ণনা না করাই ভাল। তাহাকে দেখিয়া বাবা গলাটা আর এক পর্দা চড়াইয়া দিলেন। সেই সুদূর বীরভূম, ম্যালেরিয়া-জলকট-মহামারীর দেশ, সেইখানে সে সামান্য করটা টাংকার জন্ত ঘাইতেছে ইতুল-মাঠারী করিতে? কেন, তিনি কি মরিয়া গিয়াছেন? না হয় গঙ্গা সাহেব নাই, তাই বলিয়া তাঁহার এত দিনের সান্ত্বনের কি কোন মূল্য পাওয়া যাইবে না? তিনি যে এখনও মরা-হাতী লাখ টাকা। নিজের ছেলে বলিয়া গিয়া ঠাঁড়াইলে, বিশেষতঃ যে ছেলে গ্রাজুয়েট, এখনও তিনি পয়তাল্লিশ টাকায় চুকাইয়া দিতে পারেন যে কোন দিন। তার পর ইনক্রিমেন্ট? সে তো তাঁহাদেরই হাতে। তা-ছাড়া যদি দুইটা বৎসর তিনি বাঁচিয়া থাকেন, মাহিনা ঘাই বাড়ুক, বিল সেক্সানে তিনি যেমন করিয়াই হউক চুকাইয়া দিবেন তাহাকে—তার পর আর ভাবনা কি? হাজার টাকার বিলে দশটা টাকা করিয়া লইলেও মাস গেলে যেমন করিয়া হউক উপরি, দশটি টাকা পকেটে আসিবে। ঐ করিয়া পুলিশ দা' কলিকাতাতে দুইখানা বাড়ীই কিনিলেন, মাহিনা ত পান মাত্র ডেডশ টাকা! ইত্যাদি—

অনেকক্ষণ ধরিয়া এক নিশ্বাসে বকিয়া ঘাইবার পর, বোধ করি দম লইবার জন্তই উপেন বাবু চুপ করিলেন। বিরক্তিতে ভূপেনের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, একে সে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্ব স্তান্ত তাহার উপর বাবার অফিসের এই মহিমা সে বাল্যকাল হইতে ভনিয়া আসিতেছে। তবু সে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখিয়াই কহিল, —চাকরী আমার ভাল লাগে না বাবা, সে-ত আপনি জানেন।

উপেন বাবু একেবারে তেলে-বেগুন জলিয়া উঠিলেন,—তা ভাল লাগবে কেন? ইতুল-মাঠারীটা চাকরী নয়—না? ওরে এ হ'ল হাজার হোক—সাহেবের চাকরী, এর ঢের সুবিধে। আর সে দেখবি হাজারটা মনিব। এইত আমাদের অফিসের প্রাণকোট, এম-এ পাশ করে মাঠারী করতে চুকেছিল। বড় ইতুল, মাইনেও পাচ্ছিল ভাল—ছুটি বছর না যেতে যেতে পালিয়ে আসতে পথ পেলে না। পাঁচ টাকা কম মাইনেতেই আমাদের অফিস এসে চুকল। বলে দাদা, এ ঢের ভাল। সেখানে সেই সেক্রেটারী থেকে, ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর থেকে হেড মাঠারী এক্সকু পঞ্চাশটা মনিব—সে সছ হয় না। তা ছাড়া, যদি মাঠারীই করতে হয় ত এখানে চেষ্টা কর, সেই ধার ধাড়া-গোবিন্দপুর না গেলে হয় না!

অবিনাশ বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছিলেন, এইবার তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন,—ভাখো বাবাজী, একটা কথা শুনে রাখো, আমার বয়স ঢের হয়েছে, অনেক দেখলুম—বিলেতের খবর জানি না অবিশি, এখানে ইতুল-মাঠারীদের লোকে হামুদের মধ্যে গণ্যই করে না। মাঠারী শুনেই সবাই মুখ টিপে হাসে—ঠাট্টা করে। আমাদের দেশে বার্ট-ক্লাস লোক বারা তারা ব্যবসা করে কিংবা উকীল-ব্যারিটার হয়, সেকেন্ড-ক্লাস লোক হয় ডাক্তার

কিংবা ইঞ্জিনিয়ার, বার্ট-ক্লাস লোক চাকরী করে, কোর্থ-ক্লাস লোক প্রফেসর হয় আর বাসের কিছু হয় না তারাই যায় মাঠারী করতে। ...তুমি বাবাজী কোন দ্বন্দ্ব মাঠারী করতে বাবে? তুমি বিদ্বান-বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার উন্নতির কত পথ খোলা—

এবার আর ভূপেন বিরক্তি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই কহিল,—আমি ত আর চিরকালের জন্তে মাঠারী করতে বাচ্ছি না—আপনারা এতই বা উত্তলা হচ্ছেন কেন? চাকরীতে চুকলে আমার এম-এ পাশ করার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না, লেখাপড়ার আশা চিরকালের মতই জলাঞ্জলি দিতে হবে। মাঠারীতে অবসর বেশী, পড়ার সুবিধেও ঢের, সেই জন্তই মাঠারী করতে বাচ্ছি। আর সেই জন্তই কলকাতাতে থাকবার আমার ইচ্ছে নেই।

উপেন বাবু কহিলেন—কেন কলকাতাতে থাকলে তোমার কি অনুবিধা হবে শুনি? এখান থেকে কেউ পাশ করে না? বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা হচ্ছিল না এত দিন? তার পর সেখানে গিয়ে যখন ম্যালেরিয়ায় কী কী করে পড়বে—তখন কে মুখে জল দেবে? তখন ত আবার এই পাষণ্ড বাপ-মার কাছেই আসতে হবে! ...ও, বাপ রে! বাপ-মা এত মশ্ন যে পাছে বাড়ী থাকতে হয় বলে সেই নিবান্দা যমপুরে বাওয়া—

ভূপেন তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া ঠাঁড়াইয়া কহিল—কলকাতায় ইতুলে মাঠারী নিয়ে ত কেউ বসে নেই। আর সে শুধু দরখাস্ত করে পাওয়াও যায় না—ঢের ধর-পাকড় করতে হয়। সেখানে বাচ্ছি সে দেশেও মানুষ বাস করে নিশ্চয়, সবাই যদি ম্যালেরিয়ায় মরে যেত তাহ'লে ইতুলটাও চলত না। এ আমার সহজ-বুদ্ধিতে বুদ্ধি—

সে আর তর্ক-বিতর্কের অবসর না দিয়া রাগা-ঘরে গিয়া কহিল, মা, ভাত দাও।

মা তখন উনানের সামনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে-ছিলেন, ছেলেকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া বহিলেন,—আমি যে তোর ওপর অনেক আশা করে বসে আছি বাবা—

ভূপেন ধমক দিয়া কহিল,—হ্যাঁ, তা হয়েছে কি? আমি কি মরে বাচ্ছি? না মরতে বাচ্ছি? যদি সবাই মিলে তোমরা অমন কর তাহ'লে আমি এই দণ্ডেই চলে বাবো বলে রাখছি। ভয় দেখানোতে ভাল কাক হইল। মা চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিলেন। ভূপেন ভাত খাইতে বসিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার বোনদেরও মুখ ধম ধম করিতেছে, যেন তাহার একটা মতা সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে। ইহায়া কিছুই বোঝে না, শুধু বাবার বিলাপ হইতে ধরিয়া লইয়াছে যে, ভূপেন মকসলে ইতুল-মাঠারী লইয়া তাহাদের সকলকার সমস্ত আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। ভূপেনের মনে মনে যেটুকু ঘিা ছিল সেটুকুও চলিয়া গেল, এ সংসর্গে আর কয়েকটা দিন থাকিলেই লেখাপড়ার সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়া তাহাকে চাকরীতে চুকিতে হইবে।

তাহার খানিকটা খাওয়া হইয়া গেলে মা আবার ভরসা করিয়া মুখ খুলিলেন,—তা এখন কি আর বাওয়াটা বন্ধ করার কোন উপায় নেই, হ্যাঁ রে?

ভূপেন গভীর ভাবে জবাব দিল,—না, আমি তাদের কথা দিয়েছি। তা ছাড়া বন্ধ করার কোন দরকারও ত দেখছি না।

দারও ভয়ে ভয়ে মা বলিলেন—ইছুল-মাঠারী ত খুব খারাপ কাজ হ'ল বাবা!

—হ্যাঁ, চুচী-ডাকাতিরও অধম! এ সব কথা কে বুঝিয়েছে কে, বাবা ত? তাঁর অফিসের ঐ গল্প সাহেবকেও এক দিন ইছুল-রর কাছে দেখাপড়া শিখতে হয়েছে, বাবাও যেটুকু শিখে চাকরী ন সেটুকুর জন্তও ঐ মাঠাররা দায়ী। আশু মুখুন্ডে, সি আর গান্ধী যে বড় সবাই জানেন মা, কিন্তু তাদের বড় ব্যাধ করলে কি এতই হয়। তুমি এমন করছ কেন? অফিসে কেবাণী-করার থেকে ইছুল-মাঠারী করা অনেক গৌরবের কাজ বলেই কবি আমি।

মা যে কতকটা ছেলের ধমকের ভয়েই চুপ করিয়া গেলেন গাহার মুখ দেখিয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহারও কথা বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না, কোন মতে আহার সারিয়া পড়িল।

রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া সে যখন নিজের ঘরে বাইতেছে, ও উপেন বাবুদের বৈঠক ভাঙ্গে নাই। সে আর সেখানে হইল না বটে, কিন্তু অবিনাশ বাবুর উৎসাহ তাহাতে কমিবার নয়, তিনি তাহার উদ্দেশে গলা চড়াইয়া কহিলেন,—কাজটা করলে না বাবাজী! আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে পাঁচ কোরাণীগিরি আর তিন বছর মাঠারী করলে মানুষ গাথা। তবু ছুটো বছর সময় পেতে!

ভূপেন তাহার নূতন মনিবদের কাছে আট দিন সময় লইয়াছিল, এখন আর অত দিনও অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা রহিল না। বাবা ঈঁকু সময় বাড়ী থাকেন, বিলাপ করেন আর বক্তৃতা দেন, মা গর্বে চোখ মোছেন এবং বোনরা গম্ভীর মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। চ উপায়ই বা কি, সে নিজে আট দিন সময় লইয়াছে এখন আবার অছিলায় আগে যায়?

তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন ছুলের কর্তৃপক্ষই। ভূপেনের সম্মতি-পাঠাইবার দ্বিতীয় দিনেই এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির হইল। হাতে লেখা আছে—‘এখনই যোগ দিন—কবে যাত্রা করিবেন তার কথা জানান।’ ভূপেন আর এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ করিল না, তখনই কথরে গিয়া তার পাঠাইয়া দিল—কালই বাইতেছি। তার পর দু কিরিয়া যাত্রার আয়োজন শুরু করিয়া দিল। অবশ্য ঘটা করিয়া যোজন করিবার মত এমন কিছু ছিলও না—মোহিত বাবু ঢেক লাইয়া সে ইতিমধ্যেই আংশিক বাড়ী-ভাড়া প্রকৃতি তাহার বাহা র, তাহা মিটাইয়া দিয়াছিল, বাকী টাকা দুই-একখানা কাপড়-মা, বিছানার একটা চাদর এবং ফাইবারের একটা স্ট্রকেস নিতেই শেষ হইয়া গেল। মাস-কয়েক আগে টাকা জমাইবার ভুজি মাধ্যম দেখা দিয়াছিল, সেই সময়ে পাঠে অফিসে একটা হিসাব লিয়া ফেলে। এখন খাতাটা খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে মাত্র আটটি কা পড়িয়া আছে। বিছানার দুই-একটা জিনিস কিনিবার ইচ্ছা হল, কিন্তু এই আর্থিক অবস্থার তাহা আর সম্ভব নয়—অগত্যা একটা বিনিমাস ফেলিয়া সে তাহার পুরাতন বিছানার রথ হইতেই শেখাকৃত ভয়ে কিছু খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দানগুলি মুখ ভার করিয়াই থাক বা গোপনে বোদনই করুক—শেষ

পর্যন্ত তাহাদের সাহায্যেই সুদৈর্ঘ্য ও বিছানা ঠিক করিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার মুখে আবার বাহির হইয়া পড়িল।...কত দিনের জন্ত কলিকাতা ছাড়িয়া যাত্রা করিতেছে কে জানে। দীর্ঘকাল, হৃদয় বা জীবনের মতই—কিছুই বিচির নয়। এই শেষ সন্ধ্যাটি সে একটু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে।

মন খারাপ হয় বৈ কি। জন্ম হইতে সিমলার এই সংকীর্ণ গলি এবং কলিকাতার অতি-পরিচিত রাস্তাগুলি দেখিয়া আসিতেছে। এত দিন যোবা যায় নাই, কখন অভ্যাসসারে এই কদম্ব পথগুলি তাহার মনে মনে বিস্তার করিয়াছিল। যে ট্রাম-বাসের কোলাহল চিরকাল অসহ্য বোধ হইয়াছে, আজ যেন তাহাদের ছাড়িয়া বাইতেই কষ্ট বোধ হইতেছে।...মা কাদিতেছেন, বাবাও বাড়ী আসিয়া খবর পাইলে প্রকাশ্যে না হোক গোপনে চোখের জল ফেলিবেন। যে বোনগুলির স্বাক্ষরের কথা সে কখনও চিন্তা করে নাই তাহাদেরও চোখ চল-ছল করিতেছে। এই সব স্নেহের বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, চিরপরিচিত এবং প্রিয় আবেষ্টনী পিছনে ফেলিয়া সে সম্পূর্ণ অভ্যাস বোনা দেশে যাত্রা করিতেছে—কি দেখানে মিলিবে কে জানে। হৃদয় এই কষ্ট করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, বাবার উপদেশ শুনিয়া অফিসে চাকরী লইলে এক রকম করিয়া জীবন কাটিয়াই বাইত, সম্ভবতঃ শান্তিতেই কাটিত। আর পাঁচটা মধ্যাহ্ন বাঙ্গালীর ছেলের যেমন করিয়া জীবন কাটে—চাকরী করিয়া, বিবাহ করিয়া, স্ত্রী-পুল-কল্লার প্রতিপালন করিয়া—অভাবে ও দারিদ্র্য—তাহার জীবনও না হয় তেমন করিয়াই কাটিত, দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আদর্শ-বাকী হইতে গিয়া হৃদয় সে তুলই করিল।

এই সব চিন্তার মধ্যে মন যখন অত্যন্ত স্কিষ্ট, সহসা সন্ধ্যার শান্ত একাগ্র চোখ দুটি যেন দৃষ্টির সামনে ফুটিয়া উঠিল। সে চোখের চাহনি যেন আর একবার মনে করাইয়া দিল, ‘আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা মাঠার মশাই, আপনি কোরাণীগিরি করছেন এ আমি ভাবতেই পারি না।’...সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্ভলতা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। পিছনের দিকে, আরামের পক্ষপাতের দিকে তাকাইলে চলিবে না। তাহাকে বড় হইতেই হইবে, ধনী নয়, শিক্ষিত হইতে হইবে।

তরুণ বয়স তাহার—জীবনের অন্ধকার দিকের ছায়া তাহার কল্পনাকে তখনও ম্লান করিতে পারে নাই, পূর্বপুরুষদের দাসত্বের সংস্কার তখনও তাহার আশা ও আদর্শবাদকে সংকীর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই—তাই সে-দিন সন্ধ্যারই জয় হইল, সহজ জীবনযাত্রার প্রলোভন ফেলিয়া যশের জয়তিলকই জীবনের কাম্য বলিয়া বাছিয়া লইতে পারিল।

অল্পমমক ভাবে পথ চলিতে চলিতে অজান্তে পা কখন চৌরবাগানে মোহিত বাবুদের বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতেও পারে নাই। সহসা দূর হইতে পরিচিত দারোয়ানকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বহু দিনের জন্তই কলিকাতা ছাড়িয়া বাইতেছে সে, দেখা করিবার অজুহাতের অভাব নাই। একবার হুঁফিয়া পড়িবে না কি বাড়ীর মধ্যে? চলিয়া বাইবার আগে আর একবার সন্ধ্যাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার মনের অবচেতন অবস্থার বরাবরই ছিল এবং হৃদয়ের সোতে বুক ছলিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল

সন্ধ্যার ঘরে আলো অলিতেছে, লাইব্রেরী-অবরোধ জানালা খোলা—
সম্ভবতঃ দু'জনই আছেন। কিন্তু—না, ছিঃ, মনে পড়িয়া গেল চিঠিতে
মোহিত বাবু দেখা করার কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। এ
অবস্থায় গেলে মোহিত বাবুর চোখে ছোট হইয়া বাইতে হইবে।
কোন কারণে, অন্তরের কোন তাগিদেই সে তাহাদের কাছে ছোট
হইতে পারিবে না।

সে জোর করিয়া নিজেকে ফিরাইয়া লইল। আর ঘুরিবারও ইচ্ছা
নাই, এতক্ষণ ইটোর ক্লাস্তিতে এই বার যেন পা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে,
সে বাড়ীর দিকেই ফিরিল।

পরের দিন সকাল দশটায় গাড়ী, মন-বাধা সারা রাতই ঘুমাইলেন
না। মা শেখ-রাতে উঠিয়া রান্না করিতে গেলেন, বাবা তখনই
তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন।
বাওয়া বন্ধ করার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কাল হইতে
সে কথা আর তুলেন নাই। এখন শুধু বান আহ্নার বিশ্রাম
সম্বন্ধে উপদেশ। বীরভূম সাপের দেশ, সাদা করবার ডাল
বিছানায় নীচে রাখিয়া দিলে সাপ আসে না, ঐ ডালেরই একটা ছড়ি
করিয়া লইলে পথেও নিরাপদ থাকা যায়। জল সর্বদা গরম করিয়া
খাইবে, হোট্টলে সম্ভব না হইলে নিকটেই ঘন বন্দোবস্ত করিয়া লয়,

হান বেশী না করাই ভাল, করিলেও গরম জল ব্যবহার করা উচিত।
হান যেত, নদীর ধার এবং জঙ্গল এই সব স্থানগুলি সর্বদা পরিত্যাগ
—ইত্যাদি।

ভূপেনের নিজের মানসিক অবস্থা এমনভাবেই ধারাপ ছিল; তাহার
উপর এই সব অবস্থার উপদেশ অন্ততঃ বিরক্তিকর। তবু সে শান্ত
ভাবেই সব শুনিয়া গেল, শেষ দিনে আর কোন আশাত দিতে ইচ্ছা
হইল না। আজ সে খুঁশিল, কেন হিন্দুস্থানীরা হাজার মাইল দূর
হইতে এ দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং বাল্যলীল ছেলেরা
ঘর ছাড়িয়া কোথাও বাইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত সে বলিয়াও
ফেলিল, আমি ত মাত্র সপ্তদশ মাইল বাড়ি বাবা, তাহাতেই
আপনারা এমন করছেন, আপনার আফিসের সাহেবরা রোজগার
করবার জন্ত কত দূর এসেছে, আর কি দেশ ছেড়ে কি দেশ এসেছে
ভেবে দেখুন দিকি।

বলা বাহুল্য, ভূপেন বাবুর উদ্বেগ তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না।
কোন মতে স্নানাহারের সময় হইয়াছে এই কথাটা স্মরণ করাইয়া
দিয়া সে অব্যাহতি পাইল এবং যথেষ্ট সময় হাতে থাকা সত্ত্বেও সাড়ে
আটটার সময়ই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ ।

—আমি—

শ্রীকুমারজ্ঞান মল্লিক

সুখ-সাগরের আমি যে কণিকা পাই তার পরিচয়,
উজ্জ্বলি' উঠে ছন্দ আমার হেরিলে চন্দ্রাশয়।
তান পাই সারা বক্ষে, পাই যে অমির আকর্ষণ
ভুলত হইতে উজ্জ্বল তুলিতে চাহে যেন মোর মন।
মহাসাগরের জোয়ার-ভাঁটা যে খেলে এ বৃকের মাঝে
বেণু যুগনাতি ভিতরে ইহার সুরভি রাজ্য রাজ্যে।

গ্রহে গ্রহে মোর আত্মীয় আছে কেহ নয় মোর পর,
বৃকের অগাধ আনন্দ মোরে করে যে জাতিশ্রম।
সকল গ্রহের কুপা অকুপা সকল গ্রহের দান—
না চাহিতে বাহ্য আপনি পেয়েছে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ।
জ্যোতির্বিদ্য সে অভিভাবকেরা উপরে রয়েছে সব,
সবার সঙ্গে আমি গাথা আছি এ কি কম গৌরব।

বদিও ক্ষুদ্র বদিও তুচ্ছ বিন্দু অমিয় আমি
এই বিশ্বের শুধা লয়ে মোর কারবার মিলা-ধামি।
ছোট সুখ দুখ লয়ে থাকি তবু এমনি শক্তিবর,
এ মর জগতে আমার সৃষ্টি হবে অবিনশ্বর।
ভেব না এ কথা ধরার তাতল সৈকতে পড়ে রবে
সুখ-সাগরের উত্তাল ঢেউ এসে বৃকে ভুলে লবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

২

মূল :—সেবগণের হওয়া উচিত জ্যেষ্ঠ; নৃপগণের মধ্যম হওয়া উচিত; পক্ষান্তরে, অবশিষ্ট প্রকৃতিগণের নিমিত্ত কনিষ্ঠ (পরিমাণের নাট্যমণ্ডপ) সমাগুরূপে বিহিত হইয়া থাকে। ১১।

সংকেত :—জ্যেষ্ঠ—১০৮ হাত; মধ্যম—৬৪ হাত; কনিষ্ঠ—৩২ হাত—নশম শ্লোকে বলা হইয়াছে। দেবানান্ত ভবেজ্যেষ্ঠাঃ (বরোদা); দেবানাঃ ভবনং জ্যেষ্ঠম্ (কাশী)। এ শ্লোকটির নিয়ন্ত্ররূপ অর্থ আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়—সেবগণের রঙ্গমঞ্চের পরিমাণ—জ্যেষ্ঠ (১০৮ হাত), নৃপগণের—মধ্যম (৬৪ হাত) ও অবশিষ্ট জনগণের—কনিষ্ঠ (৩২ হাত)। পক্ষান্ত উহাই এ শ্লোকের তাৎপৰ্য্য নহে। রূপক নশবিধ—নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ইহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকার, প্রহসন, ভাণ ও বীথী (কাশী সং, ২০শ অধ্যায়)। এই নশবিধ রূপকের মধ্যে কোন কোন রূপকের নায়ক-প্রতিনায়ক সেবাসুরাদি (যথা—‘ডিম’, ‘সমবকার’ ইত্যাদি শ্রেণীর রূপকে—যাহাতে ‘আরটী’ নামক উদ্ভূত বৃত্তির প্রাধান্য) ১। ঐ সকল রূপকের অভিনয়ার্থ সুবিধিত রঙ্গপীঠ উপযোগী। কারণ, ঐ জাতীয় রূপকের অভিনয় কালে উচ্চ লক্ষ্য, দীর্ঘ পরিক্রমণ ইত্যাদির প্রয়োজন—তাহা জ্যেষ্ঠ-প্রমাণের রঙ্গমঞ্চেরই সম্ভব। তাহা ছাড়া ঐ সকল-রূপকে ভাণ-বাত্তের প্রাধান্য ২। ভাণবাত্তের স্বর গুরুগম্ভীর, উহার বিস্তারের নিমিত্ত বৃহৎ রঙ্গপীঠের প্রয়োজন। এই সকল কারণে সেবাসুর-বহুল-নায়ক-প্রতিনায়ক-বিশিষ্ট রূপকগুলির অভিনয়ে জ্যেষ্ঠ-প্রমাণের রঙ্গপীঠ আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে অভিনব বলিয়াছেন—‘কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, সেবগণ প্রেক্ষক—ইহাই এ স্থলে বিবক্ষিত; প্রযোজ্য (পাত্র—dramatis personae) দেবতঃ—একপ অর্থ নহে; কারণ, প্রযোজ্যগণের সংখ্যা তা নিয়মিত—উহার ত আর হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই’। এই সকল ব্যাখ্যাভা অভিনবের, অভিশ্রায় হৃদয়লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। অভিনব-স্মৃতিত অর্থই যে নাট্যশাস্ত্রের বার্থ তাৎপৰ্য্য, তাহা অভিনব স্থানান্তরে দেখাইবেন—বলিয়াছেন (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫১)। অভিনব যে পূৰ্বপক্ষটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই আপাত-দৃষ্টিতে শ্লোকটির অর্থ বলিয়া বোধ হয়—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সেবগণ যে রঙ্গালয়ে দর্শক—তাহাই জ্যেষ্ঠ, পরিমাণের হওয়া উচিত—ইহাই পূৰ্বপক্ষ। সেব-চরিত্র যে রূপকের পাত্রমধ্যে অন্তর্ভুক্ত, সেই রূপকের অভিনয়ের উপযোগী নাট্যমণ্ডপ জ্যেষ্ঠ-পরিমাণের হওয়া উচিত—একপ অর্থ পূৰ্বপক্ষে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ-স্বরূপে পূৰ্বপক্ষী বলিয়াছেন,—যে রূপকে সেবাদি নায়ক বা অন্ত কোন পাত্ররূপে চিত্রিত হন, সে রূপকে সেবাদি-চরিত্রের সংখ্যা ত গণনা-ধারা নিয়ন্ত্রিত

—অসংখ্য ত নহে; তবে আর তাঁহাদের অভিনয়ে প্রয়োজ্য বৃহৎসংখ্য রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন কেন হইবে? বরং দর্শকগণ স্বয়ং দেববৃন্দ—তথায় স্থান-সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠ-পরিমাণের রঙ্গালয়ের প্রয়োজন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহার বিরুদ্ধ যুক্তি (অভিনবগণ-সমত) পূর্বেই প্রসঙ্গ হইয়াছে।

ঐরূপ নৃপাদি-চরিত্র যে রূপকে অভিনয়ে প্রযোজ্য—সে রূপকের অভিনয়ার্থ মধ্যম-পরিমাণ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন। সেব ও নৃপ ব্যতীত অন্তান্ত সাধারণ নব-নারী বাহাতে পাত্রসানীয়ে, সেই সকল রূপকের অভিনয়ার্থ কনিষ্ঠ-পরিমাণের রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

মূল :—[সকল প্রেক্ষাগৃহের (মধ্যে) মধ্যম প্রশস্ত (বলিয়া) স্মৃত। তাহাতে পাঠ্য ও গেষ্য সুখ-শ্রাব্যতর হওয়ার সম্ভাবনা। ১২। প্রযোজ্য-রূপ-কৰ্ত্তৃক সকল প্রেক্ষাগৃহের তিন প্রকার বিধি স্মৃত হইয়া থাকে—বিকৃষ্ট, চতুরশ্র ও ত্র্যশ্র। ১৩।

নাট্যবেদ-প্রায়োগকৰ্ত্তৃক-কৰ্ত্তৃক কনিষ্ঠই ত্র্যশ্র (বলিয়া) স্মৃত, পক্ষান্তরে চতুরশ্র মধ্যম, আর জ্যেষ্ঠ বিকৃষ্ট (রূপে) বিজ্ঞেয় (হইয়া থাকে)। ১৪।]

সংকেত :—এই তিনটি শ্লোক বরোদা-সংস্করণে মূলমধ্যে ত্র্যাকোট বহু অবস্থায় ছাপা হইয়াছে। কাশী-সংস্করণে ঐ তিনটি শ্লোক দৃষ্ট হয় না। উহাদিগের উপর অভিনবগণ-পুস্তকের টীকাও নাই। সম্ভবতঃ ঐগুলি প্রাক্তন শ্লোক—উহাদিগের সারার্থ ৭ম ও ৮ম শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

১২। মধ্যম-প্রমাণের রঙ্গমঞ্চের পাঠ্য ও গেষ্য অধিকতর সুখশ্রাব্য হয়। জ্যেষ্ঠ স্বর এলাইয়া পড়ে—কনিষ্ঠ স্বরের প্রতিধ্বনি ভাল খোলে না। অতএব, মধ্যমই সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৩। ত্রিপ্রকার বিধি—বিধি-বিধান—পরিমাণ ও সন্নিবেশ।

১৪। কনিষ্ঠই ত্র্যশ্র, চতুরশ্রই মধ্যম, বিকৃষ্টই জ্যেষ্ঠ—এ মত নাট্য-শাস্ত্রসম্মত নহে—ইহা অভিনব স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে—বিকৃষ্ট-চতুরশ্র-ত্র্যশ্র—এই ত্রিবিধ সন্নিবেশ-বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের প্রত্যেক সন্নিবেশের ত্রিবিধ পরিমাণ—জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠ (অষ্টম শ্লোকের সংকেত প্রঃ ভাঃ—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫০।) অতএব, এ শ্লোকটি যে নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিয়া নিশ্চিত প্রাক্তন, তাহাতে সন্দেহই নাই।

মূল :—সকল প্রেক্ষাগৃহের যে প্রমাণ ও লক্ষণ বিবক্ষিত-কৰ্ত্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বুঝিয়া লও। ১৫।

সংকেত :—প্রমাণ—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, অবব (কনিষ্ঠ)।

লক্ষণ—সন্নিবেশ—বিকৃষ্ট, চতুরশ্র, ত্র্যশ্র।

নিবোধত—বোধ বা শোন।

মূল :—অণু ও রজঃ, বালা ও লক্ষা, বৃকা ও বব; অজুল আর হস্ত ও দণ্ডও প্রকীর্তিত হইয়া থাকে। ১৬।

সংকেত :—অজুলঋষে হস্তঃ দণ্ডঃ পরিকীর্তিতঃ (কাশী); অজুলক তথা হস্তা দণ্ডৌচৈব প্রকীর্তিতঃ (বরোদা)।

মূল :—আট অণুতে এক ‘রজঃ’ উক্ত হইয়াছে; আট উহা এক ‘বাল’ (নামে) উক্ত হইয়া থাকে; আট বালে এক ‘লক্ষা’ হইয়া থাকে; অষ্ট লক্ষায় এক ‘বৃকা’ হয়। ১৭।

পক্ষান্তরে, অষ্ট বৃকায় (এক) ‘বব’—(ইহা) জানিতে হইবে; আর আট ববে (এক) ‘অজুল’। আর চতুর্কিংশতি অজুলে (এক) ‘হস্ত’—উক্ত হইয়া থাকে। ১৮।

১ বৃত্তি—বিলাস-বিজ্ঞাস-ক্রম বৃত্তি—‘নাট্যমাতৃকা’ নামে খ্যাত—বৃত্তি চতুর্কিংশ—কৈশিকী (কোমল), ভারতী (মধ্যম), সাঙ্ঘতী (উদার) ও আরভটী (উদ্ভূত)—মণীয় ‘নাট্যমাতৃকা’ প্রবন্ধ স্ট্রব্য—মাসিক বহুমতী, শ্রাবণ, ১৩৪৪। [নাঃ শাঃ, ২২শ অধ্যায়ে (কাশী সং) বৃত্তির বিবরণ দেওয়া আছে।]

২ ভাণবাত্ত—পুষ্প-বাত্ত—দ্রোণাজাতীয় বাত।

সংকেত :—অভিনবগুণ বস্তুমতী—এ ‘অণু’ নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের ‘অণু’-পরিমাণ নহে। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম দৃশ্য পদার্থই এই অণু—যেখান হইতে দৃশ্যতার আরম্ভ (‘বস্তু: প্রকৃতি দৃশ্যতা প্রবর্ততে সোহং:’—অ: ভা: পৃ: ৫২)। এই অণু লোকে প্রসিদ্ধ অণু-পরিমাণ। দুইটি ‘দ্যাক’ ও দুইটি পরমাণু দ্বারা ইহা গঠিত—এই অণুগুলি মহত্ত্বযুক্ত। নৈয়ায়িকের মতে দুইটি পরমাণু-দ্বারা গঠিত দ্যাককে যে পারিভাষিক অণু-পরিমাণ আছে, তাহা দ্যাক—তাহার সহিত এ লৌকিক অণু-পরিমাণের কোন বিরোধ নাই (অণু: প্রসিদ্ধো-হণুপরিমাণ:)। দ্যাকদ্বয়পরমাণুদ্বারাক্ষা: অণব এব বা মহত্ত্বযুক্তা:। পরমাণুদ্বারকে তু দ্যাকদ্বয়পরিমাণমন্ত, কোহত্র বিরোধ ইত্যলম-বাস্তবঃ—অ: ভা: পৃ: ৫২)।

ব্যাপারটি একটু তলাইয়া বুঝা প্রয়োজন। নৈয়ায়িক-বৈশেষিক-দর্শন-সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রতম দর্শনযোগ্য পদার্থের নাম—‘ত্রসরেণু’ বা ‘দ্যাক’। উহার পরিমাণ মহৎ ও দীর্ঘ। ত্রসরেণুকে তিন ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগটির নাম হয় ‘দ্যাক’। দ্যাক দৃশ্য নহে—উহার পরিমাণ অণু ও ত্রয়। দ্যাককে দ্বিধা বিভক্ত করিলে যে পদার্থ হয়, তাহার নাম ‘পরমাণু’। ইহা অবিভাজ্য অদৃশ্য। ইহার পরিমাণের পারিভাষিক-সংজ্ঞা—‘পারিমাণুল্য’। পরমাণু ও দ্যাকের সাধারণ পরিমাণের নাম ‘অণু’। দুই পরমাণুতে এক দ্যাক। দুই দ্যাককে কিছু কিছু মহৎ-পরিমাণের বস্তু উৎপন্ন হয় না; মহৎ-পরিমাণ পদার্থ উৎপাদন করিতে হইলে—(১) হয় কারণের অর্থাৎ উপাদানের (যদি উহা অণু-পরিমাণ হয়) সংখ্যা-বহুত্ব, অথবা (২) উপাদানের (যদি উহা অণু-পরিমাণ না হয়) মহৎ-পরিমাণ—প্রয়োজন। পরমাণু অণু-পরিমাণ; এ কারণে দুই পরমাণু হইতে জাত দ্যাক মহৎ নহে—অণু-পরিমাণ মাত্র। দ্যাক—অণু-পরিমাণ; অতএব দুই দ্যাককে মহৎ-পরিমাণ পদার্থ জন্মে না। মহৎ-পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে অন্তত: তিনটি দ্যাকের প্রয়োজন। তিন দ্যাককে ক্ষুদ্রতম মহৎ-পরিমাণ পদার্থ ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। মহৎ-পরিমাণ হইলেই পদার্থ দর্শনযোগ্য ইহা থাকে—অণু-পরিমাণ পদার্থ দৃশ্য হয় না। এ কারণে ত্রসরেণুই ক্ষুদ্রতম দৃশ্য পদার্থ—দ্যাক বা পরমাণু দৃশ্য নহে। যদি দুইটি দ্যাক ও দুইটি পরমাণু লওয়া হয়—তাহা হইলে উপাদান-গুলি অণু-পরিমাণ হইলেও উপাদানের সংখ্যার বহুত্ব (দ্যাক দুইটি ও পরমাণু দুইটি—মোট চারিটি) আছে বলিয়া দৃশ্য মহৎ বস্তুর সৃষ্টি হয়—ইহাই ত্রসরেণু। দুই দ্যাক ও দুই পরমাণু মিলিয়া হয় তিন দ্যাক; কারণ, দুই পরমাণু ত এক দ্যাকের সমান। তিন দ্যাককে হয় এক ত্রসরেণু। উহাই ক্ষুদ্রতম মহৎ-পরিমাণের পদার্থ—দৃশ্য ও বস্তু। অভিনব এই কথাই বলিয়াছেন—‘দ্যাকদ্বয়পরমাণুদ্বারাক্ষা: অণব এব বা মহত্ত্বযুক্তা:।’ নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের এই যে ত্রসরেণু—নাট্যশাস্ত্রের ইহাই অণু—এ অণু মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট—অতএব দৃশ্য—ইহাই অভিনবের অভিমত—যাহা হইতে প্রথম দৃশ্যতার আরম্ভ তাহাই অণু—‘বস্তু: প্রকৃতি দৃশ্যতা প্রবর্ততে সোহং:।’ নৈয়ায়িকের ও বৈশেষিকের দ্যাককে যে অণু-পরিমাণ বর্তমান—তাহা অদৃশ্য; আর নাট্যশাস্ত্রের এ অণু—দৃশ্য। অতএব, উভয়সম্প্রদায়ের অণু পরিমাণের কল্পনা বিভিন্ন হওয়ায় কোন বিরোধ হইতেছে না—‘পরমাণুদ্বারকে তু দ্যাকদ্বয়পরিমাণমন্ত, কোহত্র বিরোধ:?’ (অ: ভা: ১ পৃ: ৫২)

তবে তাহা অবশ্য ভ্রমের পরিমাণ—দৈর্ঘ্যের নহে। তথাপি তাহাতেও দুই একটি সাধারণ শব্দ আছে। ‘মহৎ মতে—গব্যক-বিবরে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়—দৃশ্য-পরিমাণের তাহাই প্রথম—উহার নাম ‘ত্রসরেণু’—‘জালাস্তরগতে ভানৌ বৎ সূর্য্য: দৃশ্যতে রজ:। প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণু: প্রচকতে’।—(মহাসংহিতা ৮।১৩২)। আট ত্রসরেণুতে এক লিকা। তিন লিকার এক রাজসর্প। তিন রাজসর্পে এক গৌরসর্প। খুব বড়ও নয়—খুব ছোটও নয় এমন মাঝারি ছয়টি গৌরসর্পে এক বব ইত্যাদি (মহা ৮।১৩৩-৩৪)। বামন শিবরাম আস্তে মহোদয়ের সংস্কৃত ইংরেজি অভিধানেও পাওয়া যায় যে, অণু—‘the mote in a sunbeam, the smallest perceptible quantity.’

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই যে—নাট্যশাস্ত্রের এ ‘অণু’ নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের ত্রসরেণুরই তুল্য—ইহা মহৎ-পরিমাণের ক্ষুদ্রতম দৃশ্য পদার্থ।

আট অণু—১ রজ:; ৮ রজ:—১ বাল; ৮ বাল—১ লিকা; ৮ লিকা—১ যুকা; ৮ যুকা—১ বব; ৮ বব—১ অঙ্গুল (আঙুল); ২৪ অঙ্গুল—১ হাত; ৪ হাত—১ দণ্ড (১১ শ্রোক)।

মূল:—চারি হস্তে (এক) দণ্ড ইহা থাকে—ইহা প্রমাণত: নির্দিষ্ট। এই প্রমাণাঙ্কদ্বয়েই ইহাদিগের বিনির্ণয় বলিব। ১১।

সংকেত :—‘অনেনৈব প্রমাণেন বক্ষ্যাম্যেযাং বিনির্ণয়ম্’—অভিনব এই প্রসঙ্গে বহু বিচার করিয়াছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে—‘দেবানাঙ্ক ভবজ্যোতিঃ নৃপাণাং মধ্যমং ভবৎ’ ইত্যাদি। ডিমাদি-শ্রেণীর রূপকের অভিনয়ার্থ জ্যোতি-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপ কর্তব্য। ডিমাদি-শ্রেণীর রূপকে নায়ক সেবতা, প্রতিনায়ক অনুরাদি। বস্ত্রপাত, উদ্ভাপাত, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ, যুদ্ধ, বাহুস্থান্দির বর্ণনা বাহাতে বিভ্রম—দেব-ভূজগ-রাক্ষস-যক্ষ-পিশাচাদি শ্রেণীর ষোড়শ জন নায়ক বাহান্ত, তাহার নাম ‘ডিম’—ইহা দশবিধ রূপকের (major drama) অষ্টম (না: শা:, বরোদা, ১৮।৮-৮-৮; কানী সং, ২।৮-৮-১২)। মধ্যম-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপ কর্তব্য—নাট্যাদির অভিনয়ার্থ; নাট্যাদির নায়ক সাধারণত: নৃপতি প্রকৃতিই হইয়া থাকেন (না: শা:, বরোদা, ১৮।১০—১২; কানী ২।১১—১২)। আর দেব-নৃপ-ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট প্রকৃতিগণ যে সকল রূপকে প্রযোজ্য, সেই সকল ভাণ-প্রহসনাদি রূপকের অভিনয়ার্থ কনিষ্ঠ-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপ কর্তব্য (ভাণ, প্রহসন ইত্যাদির লক্ষণ—না: শা:, বরোদা, ১৮ অধ্যায় ও কানী, ২। অধ্যায়ে উক্তব্য)।

দেবাদি-চরিত্রাভিনয়ার্থ—জ্যোতি মণ্ডপ;

নৃপাদি-চরিত্রাভিনয়ার্থ—মধ্যম মণ্ডপ;

অবশিষ্ট চরিত্রের অভিনয়ার্থ—কনিষ্ঠ মণ্ডপ;

—এই ত্রিবিধ প্রমাণের মণ্ডপের মধ্যে যে বিনির্ণয় সর্বসাধারণ (অর্থাৎ যে প্রমাণের মণ্ডপে সাধারণ ভাবে সকল প্রকার রূপকের—সকল শ্রেণীর চরিত্রেরই অভিনয় করা চলে) তৎ প্রমাণ মণ্ডপের বিষয় বলিব—অভিনবগুণ স্নেহেটির এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (অ: ভা:, পৃ ৫৬)। অভিনবের অভিপ্রায় এই যে—সকল শ্রেণীর রূপকের অভিনয়ের পক্ষে সাধারণ ভাবে উপযোগী—মধ্যম-প্রমাণের নাট্যমণ্ডপ। কারণ, জ্যোতি-প্রমাণের রূপে ডিমাদি-শ্রেণীর রূপকের অভিনয় সঠিক—

বিপ্রকৃষ্ট :—প্রকৃষ্ট অর্থ বুঝাইতেছে প্রকর্ষ; বাহ্য প্রকর্ষক অতিব্রূ করিয়াছে, তাহা' বিপ্রকৃষ্ট। এ স্থলে মণ্ডপের প্রকর্ষ হইতেছে—মধ্যম-পরিমাণত। বিপ্রকৃষ্ট—মধ্যম-পরিমাণাতিরিক্ত পরিমাণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ বিংবা কনিষ্ঠ-প্রমাণ—এই দুই প্রকার অর্থই কর্তব্য। পাঠ্য—নাট্যের প্রধান অঙ্গই পাঠ্য—নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—‘পাঠ্যই নাট্যের তত্ত্ব বলিয়া দৃষ্ট’ (২৪।২)। এবণ্ডি মুখ্য নাট্যাঙ্গ যে পাঠ্য তাহা বিশ্বরূপ প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ রঙ্গমণ্ডপে—অত্যাঙ্ক স্বরে উচ্চারিত পাঠ্য নিকটবর্তী দর্শকগণের নিকট বিশ্বর (অর্থাৎ অত্যন্ত উপভাষক) হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ নাট্যমণ্ডপে অতিদূরস্থ দর্শকগণকে শুনাইবার নিমিত্ত অভিনেতৃবর্গকে উচ্চস্বরে চীংকার করিতে হয়; ফলে নিকটস্থ দর্শকগণের নিকট সেই অত্যাঙ্ক স্বর বিশ্বর (অর্থাৎ কর্ণশ) শুনা—অত্যাঙ্ক স্বর কর্ণের পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। তাহার কারণ—পাঠ্যম্ উচ্চারিতস্বরম্ (মূল)। উচ্চারিত-স্বর—উচ্চ করিয়া চরিত (অর্থাৎ অতিক্রমে সম্পাদিত) স্বর (কাকু প্রভৃতি বিভাগ) বাহ্যতে—পাঠ্যের বিশেষণ। স্বর—নানাবিধ কণ্ঠস্বর—উহার কোন অংশে প্রব্ধ কোন অংশে কাকু (বতোজী) বিজ্ঞমান। তুমি কি ধাবে? ইহা সাধারণ প্রশ্ন—তুমি ধাইবে কি না—ইহাই জিজ্ঞাস্ত। কিন্তু ‘কি’ পদটির উপর বোঁক দিয়া উচ্চারণ করিলে এই প্রশ্নই কাকুতে পধ্যবসিত হইবে—তুমি কি (কী) ধাবে? তুমি কোন্ জিনিষ ধাইবে—ইহাই তখন অর্থ পীড়াইবে। স্বরের উচ্চারণগত

এই সকল শব্দ পার্থক্য—যদি বখাবধ ভাবে উচ্চারিত না হইলে বলা কঠিন। জ্যেষ্ঠ-প্রাথমিক বয়সকালের দূরবর্তী দর্শকগণের নিকট বহুগত এই সকল শব্দান্তিস্থ ভঙ্গী ঠিক মত গিয়া পৌছায় না—কলে বহু বিবরণ প্রাপ্ত হয়। বিশ্বর—বাহ্যতে শব্দবিশেষের উচ্চারণ বিগত হইয়াছে—অর্থাৎ বাহ্যতে শব্দবিশেষের উচ্চারণ শোনা যায় না—অতি উচ্চবরে উচ্চারিত হইলেও বহু দূরের দর্শক-বংশীর নিকট সকল শব্দ গিয়া পৌছায় না—পৌছাইলেও কাকু প্রভৃতি শব্দের শব্দান্তিস্থ অলঙ্কারগুলি দূরে শ্রুতি অভিযুক্ত হয় না। ইহার কারণ দূরে উক্ত হইয়াছে—অনিঃসরণবর্জিত। নিঃসরণ—নিঃ (নিঃসরণ) সরণ (অর্থাৎ দ্বিতীয়-শব্দারম্ভ); এই বর্জিত বাহার নাই—তাহাই অনিঃসরণ-বর্জিত। যখন একটি শব্দ উচ্চারণের পরক্ষণে অব্যবহিত নিকটবর্তী স্থানে ঐ শব্দের অল্পবর্ণনামাত্র শব্দান্তর উদ্ভূত হয়, তখন শব্দের নিঃসরণ-বর্জিত অনুভূত হয়। যে গৃহমধ্যে একমুখ নিঃসরণ সম্ভব হয় না, সে গৃহে অনিঃসরণ-বর্জিত প্রকট। যদি জ্যেষ্ঠ-প্রাথমিক মণ্ডল হয়, আর তাহার শব্দবিশ্লেষণ-যোগ্যতা না থাকে

(গৃহ-নির্মাণ কৌশলের দোষে), তাহা হইলে শ্রুতি উচ্চারিত শব্দ নিঃসরণবর্জিত অজ্ঞান-বশতঃ বিশ্ব হইয়া উঠে। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ-প্রাথমিক মণ্ডলে এ দোষ হইয়াই থাকে—কারণ, বহু দূর পর্যন্ত শব্দ-নিঃসরণ (বা শব্দের অল্পবর্ণন) ঠিক মত পৌছায় না। আবার কনিষ্ঠ-প্রাথমিক শব্দ-নিঃসরণের অভাব ঘটিতে পারে। কারণ, শব্দ-নিঃসরণ বা শব্দের অল্পবর্ণন মূল-শব্দোচ্চারণের নিকটবর্তী স্থানে শ্রুতি উপলব্ধ হয় না। একটু দূর পর্যন্ত শব্দ বিস্তার না হইলে অল্পবর্ণনের মাধ্যমে ঠিক বুঝা যায় না। কনিষ্ঠ-প্রাথমিক মণ্ডল অতি অল্প-পদবির; উহার মধ্যে উচ্চ ভাবে উচ্চারিত বহু অল্পবর্ণিত হইবার পর্যাপ্ত অবকাশ পায় না (অতএব, কনিষ্ঠ মণ্ডলে উচ্চারিত-বহু পাঠ্য সর্বদাই অনিঃসরণ-বর্জিত বশতঃ (অল্পবর্ণনামাত্র মধুর-শব্দারম্ভ) হুটী করিতে না পারায়) বিশ্বর (অর্থাৎ বিনষ্টবহু) হইয়া উঠে—অর্থাৎ কনিষ্ঠ গৃহে অল্পবর্ণনের অবকাশ না থাকায় বহু-মাধুর্য বিনষ্ট হইয়া যায়। অল্পবর্ণনই বহুর বখাবধ রূপ। অল্পবর্ণনের অভাবই বহুর মাধুর্যহীন নষ্টপ্রায়—বিশ্বর করিয়া তুলে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫৩—৫৪)।

[ক্রমশঃ ;

—তাকে যে মনে পড়ে—

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তাকে যে মনে পড়ে ।
সমুদ্রের প্রেত অন্ধকারে—
দূরের কুয়াসা ঠেলে
একবার চুরাশার আলো অঁলে গুঁয়ার মতন :
মুখ তার মনে পড়ে যায় ।
বড়ের মতন যেন অকস্মাৎ ছুটে আসে সে—
প্রাণের মত আসে ধেরে :
কিছুতেই, কিছুতেই ভোলা যায় নাক' ।
মরণেও নয়, মনে হয়—
তারও পরে বুঝি রূঢ় প্রহরীর মত
প্রাণপণে ঘিরে রাখে স্মরণের সাঁকো ।
পার হাতে দেয় না কিছুতে ।
কিছুতে দেয় না হতে পার :
ডাক নিলে সরে যায় মহাপারায়ণ ।

সে বড় অদ্ভুত ।
নীলে নীলে একেবারে কালো-হয়ে-বাওয়া
প্রাণছেঁড়া আলাময়ী স্মরণ মতন
অথবা শিশির-বরষা নিশীথের স্বপ্নমাখা
দুর্কীয়াসবন
যেমন আলিয়ে রাখে খুব তীব্র শংখচূড় সাপের নয়ন—
তার ছোঁয়া-ছোঁয়ানো স্বপন
তার চেয়ে আরো বুঝি উন্নত অমর ;
কোথায় কোথায় যেন কত কত দূর
পলকেতে অতিক্রান্ত, অলঙ্কিতে হায় ।
বায়ুভরে হু হু করে নিয়ে চলে যায় ।

তখন কোথায় থাকে কাকের পাখাড়—
আদর্শের মহির মিনার,
দেশ-কাল-বেড়াভাল আর—
কুটীর মতন যেন ভেসে যায় সব
সর্বনাশা জলে প্রাণের ।

তার পরে হবে কিন্তু পাওয়া যায় টের :
তখন অনেক দূরে স'রে যেতে চলেছে পৃথিবী,
মংগল গ্রহের স্বপ্ন মুছে গেছে তাও—
আরো কত আকাশেতে জীবন উগাও,
দূরান্ত তারারো আলো পিছে প'ড়ে যায়—
নিশানা কোথায় ?

যদি কোনো শাওনের বরিষণ-রাত
প্রাণেতে শিয়ার জাগে বাদলে ভেতায়,
গায়েব নদীর তীরে দুপুর বেলাতে
চুপ ক'রে বসে-থাকা ভালো লাগে, আর
নির্জন সন্ধ্যায় কোনো ঝড়-গঠা কাজল প্রান্তে :
এই বার্ষ পৃথিবীর কথা মনে ক'রে
এ জীবন লাগে অসহায়—
তখন আশ্রয় কিন্তু :
দেখে ছুঁয়ে প'ড়ে আছে পাখরের প্রায়—
হৃদয়ে ভীষণ অম, জড়তা কেমন :
তাকে যেন তোলা বড় দায়,
তোমারি দ্বন্দ্ব আর তোমারি সে নয়।

বিশেষের সবকার বাবুলাল
আসিয়া হাজির হইল।

বাবুলাল জাতিতে হাকিমপুত্র। একহারা
লখা চেহারা, চতুর্দা চ্যান্টা বুক,
কোমর হইতে দেহের উচ্চতাগটা
সামনের দিকে একটু খুঁকিয়া আছে।
পরিধানে ধূতি কোমর বাঁধিয়া পরা,
গায়ে কতুয়া। বাবুলালের বয়স
পঞ্চাশের উর্ধ্বে। এখনও বেশ শক্ত,



[বড় গল্প]
শ্রী অমলা দেবী

গোষ্ঠ ও কর্মক্ষম। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া সে বিশেষের বাবার
আলয়ে আসিয়াছিল। বিশেষের বাবা তাহাকে ছেলের মতই মানুষ
করিয়াছিলেন। পরমা ধর্ম কথিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, ঘর বাড়ী
কথিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরেই বোটি মারা যায়।
বাবুলাল আর বিবাহের চেষ্টা করে নাই। বিশেষের সংসারে স্ত্রী-
হর্ষে সমভাগী হইয়া বাস করিতেছে। বিশেষের তাহাকে ছোট
ভাইয়ের মত দেখে করেন, বিশেষের পুত্রবধূরা স্বত্বের মত তাহাকে
শ্রদ্ধা করে।

বাবুলাল কহিল—বাউরীরা কেউ বেগার দিতে আসতে চাইছে না
দাদা।

বিশেষের ভুঙ্কু চাঁকাইয়া কহিলেন—কি বলছে সব?

—বলছে কনুট্রাক্টার বাবুর বেড়ে কাজ করবার হুকুম হয়েছে
তাদের উপর।

বিশেষের কহিলেন—বললে না কেন যে আমাদের হুকুম তাদের
আগে তামিল করতে হবে—

বাবুলাল ঘাড় কাত করিয়া কহিল—বলেছিলাম।

—কি বললে সব?

—নফরা বাউরী ছেলটাকে তো জানেন, বদমাইসের বাড়ী।
মস্ত শওর মত চেহারা—হাফপ্যান্ট খিঁচে, হাকহাতা কামিজ পরে
ঘরে বেড়ায়। সে বললে—মজুরী দেবার পরমা আছে তোর বাবুর—
তথিয়ে আসগে যা—জন-পিছু এক টাকা করে মজুরী দিলে সবাই
যেয়ে কাজ করবে। একটু খামিয়া মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল—
তুই তোকারি করল আমাকে দাদা—

বিশেষের রাগে মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কঠোর কণ্ঠে কহিলেন
—বলগে যাও, মা কালীর যাত্রগা থেকে সব উঠে যাক এখনই।

বাবুলাল কহিল—তা'ও বলেছি তো, বললে কি জানেন, মা
কালী তো তোর বাবুর একার নয়—সব বাবুদেরই—তারা তো
কনুট্রাক্টার বাবুর বাড়ীর ধুলা চাটছে দিন দু'বেলা।

বিশেষের কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন,—আমাদের
বাবুরা তো এখনও পর্যন্ত কেউ দেখা দিচ্ছেন না; একবার আমার
নাম করে ডাক দেখি তাদের। বংশের পূজা—সবাই মিলে পরামর্শ
করা দরকার। তাদের যা ভাল লাগবে তারা করবে, কিন্তু আমার
ক্রেটি যেন কেউ না ধরতে পারে—

বাবুলাল চলিয়া গেল।

একটি পনের-বোল বৎসর বয়সের মেয়ে মন্দিরের পাশের রাস্তা
দিয়া বাইতছিল। শীর্ণ চেহারা, মিশমিশে কাল রং; মাথার চুল
কম্প, বিখশল, পরনের শাড়ীখানি ছিন্ন ও মলিন। অতি কষ্টে গা-
হাত ঢাকিয়া নতদুখে বাইতছিল। মেয়েটির ডান হাতে একটি
ঘটা।

বিশেষের ঠাকুরা কহিলেন—ওরে
এই! তুই অটলা মুচির মেয়ে
না?

মেয়েটি ধমকিয়া পাড়াইয়া ঘাড়
নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

বিশেষের স্তম্ভাঙ্গা করিলেন—
বটাতে কি নিয়ে যাচ্ছিস?

—দুধ গো কত্তা বাবু।

—কাদের জন্তে?

—ঐ যে—ন' বাবুদের ছোট মেয়ের ছেলের জন্তে।

—তোদের গাই আছে বুঝি?

মেয়েটি কহিল—এজ্ঞে—না; ছাগল।

বিশেষের কহিলেন,—এখন তো হুশের বেশ দর—দু'পরমা আসছে
ঘরে—অটলাকে বলবি, চার-পাঁচ বছরের খাজনা বাকী—আজই
যেন দিয়ে দাও।

মেয়েটি কহিল—এজ্ঞে, কতটুকুই বা দুধ হয়—একটিমাত্র পাঠী;
খেতেই কুলোয় না আমাদের—তার উপর বাবার এ ক'মাস
অসুখটা বেড়েছে—চলতে বুলতে পারে।

বিশেষের কহিলেন,—খাজনা তো দিতে হবে, বাপু! টাকা না
থাকে—একটা পাঠা দিবি—মা কালীর জন্তে; খাজনা দেওয়াও
হবে—ধন্যও হবে।

মেয়েটি শক্ত কণ্ঠে কহিল—পাঠা কোথায়? পাঠাটার ছোট
বাক্স হয়েছিল—তার একটা আবার হুড়োলে নিয়ে গেছে—নেহাৎ
কচি বাক্স। পরে কঠোর ও চোখের দৃষ্টি বন্ধ করিয়া তুলিয়া
মেয়েটি কহিল—বাবা কাজকর্ম কিছুই করতে পারে—দু'বেলা
দু'মুঠো ভাত খুটুছে না আমাদের—ঘটা, বাটা সব বিক্রী হয়ে গেছে—
খাজনাটা আমাদের মকুব করে দেন কর্তা।

বিশেষের কহিলেন—তোর খামী তোকে নিয়ে যায় না?

মাথা নীচু করিয়া পারের নথ দিয়া মাটা খুঁটিতে খুঁটিতে মেয়েটি
ঘাড় নাড়িয়া কহিল—এজ্ঞে না—উ আবার বিয়ে করেছে।

বিশেষের মন স্বভাবতঃ কোমল—পারের দুঃখ সহজেই আসিয়া
বিধে। তবু জোর করিয়া কঠোর কঠোর করিয়া কহিলেন—
আমি কোন কথা শুনতে চাই না। বাউরী হাড়িদের মেয়েরা
কনুট্রাক্টারের কাছে কাজ করে কত রোজগার করেছে—আর তুই
পারিস না! ঘরে যা' আছে বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রী করে হোক
—খাজনা মিটিয়ে দাও আজ। তোদের কাছে তিন-চার টাকা
পাওনা হয়েছে। অটলাকে বলবি গিয়ে—আমি এই কথা বলেছি।

মেয়েটি মুখ তুলিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিল। বিশেষের হাত
নাড়িয়া কহিলেন—কোন কথা শুনতে চাই না—যা।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

বাবুলাল আসিল। বিশেষের কহিলেন—সবাইকে বললে আসতে?

বাবুলাল কহিল—বললাম তো—আসবে কি না কে জানে?

বিশেষের কহিলেন—আমি তো কর্তব্য করলাম—না আসে না
আসবে। তা' এক কাজ কর দেখি। আমাদের ফক্রে মুন্সি বোধ
হয় এখনও মাঠে যায়নি। বলগে—আজকে মাঠের কাজ থাক।
সামনের জমিটার হাস-টাসগুলো চেষ্টে দিক্ এসে।

বাবুলাল বাইবার উপক্রম করিতেই বিশেষের কহিলেন—আসবার
সময় কলকোটা সেজে নিয়ে আসবে—আর হ'কোটা—

মুখ্যে বাড়ীর সকলে একে একে হাজির হইল—হরি, শ্রাম, কেশব, যামিনী, কৈলাস, রঘুমণি ইত্যাদি। প্রত্যেকের কোলে এক একটি ছেলে কিংবা মেয়ে। বিশ্বেশ্বর কহিলেন—পূজোটা কি একা আমার, না—তোমাদের সবাইকার? বলিয়া জিজ্ঞাস্ব মুখে সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইলেন। কেহ কোন জবাব দিল না। বিশ্বেশ্বর কহিতে লাগিলেন—কেউ মন্দিরে একবারও পা দিচ্ছ না—কি করে সব যোগাড়-যন্ত্র হবে—কেউ কিছু খবর নিচ্ছ না। কি ব্যাপার বল দেখি? দেবী-পূজা কি সামান্য ব্যাপার ভেবেছ? একটু অঙ্গহানি হ'লে বিপদ কি আমার একলার হবে?

হরি মুখ্যে বলিল—বাড়ীতে অসুখ, দেখবার শুনবার কেউ নেই—কি করে আসি বলুন?

শ্যাম জানাইল—তাহার ফিক্ বাথা চলিয়াছে আজ কয় দিন ধরিয়া; বাথা উঠিলে কাটা ছাগলের মত ছটফট করিতে হয়; কবিরাজ নড়িতে চড়িতে নিষেধ করিয়াছে। নেহাৎ বড়কর্তার ডাক বলিয়া—প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে সে।

যামিনী কহিল—আমরা এসেই বা কি করব—খরচ-পত্র করবার ক্ষমতা নাই এখন—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—কে চাচ্ছে তোমাদের কাছে? আমি তো বলেছি, চালিয়ে দেব এক রকম করে। কিন্তু পূজোটা যাতে বিধিমত হয় তা'তো দেখতে হবে তোমাদের। সঙ্কল্প সকলের নামেই হবে, তখন কারও নাম ভুল হয়ে গেলে লাফালাফি তো কেউ কম কর না!

যামিনী রাগত স্বরে কহিল,—সঙ্কল্প আমার নামে করবেন না এ বছর—কালীপূজা করে উন্নতির তো সীমা নাই, জিটের ঘুচ চরবে শেষে!

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর হইয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—তোমাদেরও তাই মত না কি?

কেশব কঁাককঁকে স্বরে কহিল,—এ রকম কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে পূজা করার চেয়ে পূজা তুলে দেওয়াই ভাল।

বিশ্বেশ্বর স্নেহের স্বরে কহিলেন—ধূম-খড়াক্তা করে পূজা কর না হে, বারণ করছে কে?

কৈলাস কহিল—গায়ে দু'টো পূজোর দরকার কি? বাঁড়জ্যো মশায় তো পূজা করছেন।

তাহার দিকে আশ্রিত নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন—“কে না কে পূজা করছে বলে পৈতৃক পূজা কেলে দিতে হবে? বুদ্ধির বৃহস্পতি আর কি।

কৈলাস উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে গেল—শ্রাম তাহাকে থামাইয়া দিল।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—তা হলে পূজোতে তোমাদের কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না, এই তো?

সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন, বেশ! তাই হোক। ক্ষোভের স্বরে বলিতে লাগিলেন—তোমরা আমার পুত্রত্বা। পরের কুপারামর্শে ভুল পথে চলেছ তোমরা, নিজেদের মঙ্গল-অমঙ্গল বিচার করে দেখছ না—ছেলেমানুষ হলে মার-ধর করে তোমাদের শোষণাত্মক—কিন্তু এখন তা চলবে না। তোমাদের কয় জন

দেবার চেষ্টা অনেকবার করেছি—এখনও করলাম, এর পর তোমাদের যা ভাল মনে হয় কর।

সকলেই কিছুকণ চুপচাপ পঁাড়াইয়া রহিল—তার পর একে একে প্রস্থান করিল।

বাবুলাল তামাক লইয়া আসিল। তামাক খাইতে খাইতে বিশ্বেশ্বর কহিলেন—ফক্রে আসছে তো?

বাবুলাল কহিল—হ্যাঁ বলে দিয়েছি—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—ঢাকের জন্মে তো তুমি নিজে বলে এসেছ। আসবে তো? না বাঁড়জ্যোদের ওখানে গিয়ে ছুটেবে?

বাবুলাল কহিল—আসবে বৈ কি। বলে এসেছি এত করে। পরে ঢোক গিলিয়া কহিল,—আর কেউ না আশ্রক পরাণ আসবে।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—তা আসবে। ও তো জানে আমাদের সব দেখেছেও সব। এ তল্লাটের কোন ঢেকো বাদ যেত না। সব আপনা থেকে এসে হাজির হোত। পেতও খুব। নগর টাকা ছাড়া শিরোপা পেত কত! আমার বাবা একবার নিজের শালখানাই দিয়ে দিলেন পরাণকে। মা নিজে পঁাড়িয়ে খাওয়াতেন ওদের—বলিয়া নারবে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বাবুলাল কহিল—বাঁড়জ্যোদের ওখানে বিশ জোড়া ঢাক আসছে শুনলাম—

বিশ্বেশ্বর হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—আসবে বৈ কি! পরসা হয়েছ খরচ করছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—মাছধের ভাগ্য—আর নদীর শ্রোত এক রকমের—এক ধার ভাসে—এক ধার গড়ে। আমাদের ভাঙ্গন ধরেছে—সব ধুয়ে মুছে যাবে। মুখের ভাব কল্পন করিয়া তুলিয়া ক্ষণেক পরে কহিলেন,—বাড়ীর বাবুয়া কি বললে জান? পূজোর দরকার নাই—পূজোতে কেউ কিছু করবে না—বলে একে একে চলে গেল। আমি বেঁচে থাকতে পূজা তুলে দিতে পারি? তুমিই বল—আমি মরে গেলে যা হবার হবে। বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বরের গলা ধরিয়া আসিল।

বাবুলাল উসখুঁস করিতে লাগিল। মরণের কথা সে ভালবাসে না। তাহার ধারণা, সে ও মুখ্যে মশায় চিত্রগুপ্তের হিসাবের ভুলে কোন রকমে এখনও বাঁচিয়া আছে। না হইলে গত বৎসর কলেরা ও ম্যালেরিয়ার এইটুকু গ্রামেই শতাধিক লোক মরিয়া গেল; মুখ্যজ্যোদের বাইশ-চব্বিশ বয়সের ছেলে কয়টা মারা গেল; বিশ্বেশ্বরের একমাত্র ছেলে মহেশ্বর মারা গেল—বড় বড় ডাক্তার-বহি দেখাইয়া, জলের মত পরসা খবচ করিয়াও তাহাকে রাখা গেল না; অথচ তাহারা দুই জনে টিকিয়া রহিল।

ফকির বাড়ীরা ঘাস চাচ্ছিলে গুলু করিয়াছিল। বাবুলাল হাঁক দিয়া কহিল—হ্যাঁ রে, ফক্রে! তোদের পাড়ার পাঠা ঠিক আছে তো?

ফকির কহিল—হ্যাঁ, তা'আছেন বৈ কি! মা-কালীর পাঠা ঠিক থাকবেন নাই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, পঁাড়াইয়া দম লইয়া কহিল,—এজমালী একটা পাঠা তো দেখেছি বাবু, তবে পাড়ার আর সব পাঠার জন্মে বাঁড়জ্যো বাবু বায়না দিয়ে এসেছে। এক একটা পাঠার দাম দেবে বলেছে—এক কুড়ি টাকা। আমাদের নফর কাকাকে তো জান—এ যে বার ছেলে বাঁড়জ্যো মশায়ের হাওয়া-গাড়ী খোদ—ওই আমাদের পাড়ার ফকির। টাকার

ছিঁবিয়া উপক্রম করিতেই বাবুলাল বলিয়া উঠিল—কাণ্ঠচূষি করবে ক'রকম! তুই কিছু শুনেছিস না কি?

ফকির জবাব দিল না।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—“হ্যাঁ রে, তোদের মজলিশ টজলিস কিছু হয়েছে না কি?”

ফকির আবার সোজা হইয়া পাঁড়াইয়া কহিল—আজ্ঞে আমি তো কিছু জানি না। তবে বোঁ বলছিল, লক্ষ্মীমেলার নফর কাকা পাড়ার সবাইকে জড় করে বলেছে যে—খাজনা যার যা দিবার নগদ দেব। কুড়ি ঘরে সিকে সিকে করে পাচ টাকা—পাঁঠা দিতে গেলে অনেক।

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া কড়া গলায় কহিলেন,—এখন না হয় যুদ্ধের বাজারে পাঁঠার দাম এত হয়েছে—কিন্তু যখন দু’-তিন টাকায় একটা পাঁঠা পাওয়া যেত, তখন এ সব বুদ্ধি কোথায় ছিল?

মুখ কাচুমাচু করিয়া ফকির কহিল,—“আমি তো কিছু জানি না কত্তা। নফর কাকাকে বাঁড়ুজ্যে মশায়রা কি সব বলেছে—

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—কি বলেছে?

ফকির কহিল,—নফর কাকাই জানে, আপনি উয়াকে একবার ডাকুন ক্যান না—বলিয়া নিজের কাজ করিতে শুরু করিল।

বিশ্বেশ্বর বাবুলালকে কহিলেন,—তুমি একবার নফরকে ডাক দেখি, কি বলে শুনি, আর একবার হাড়ীদেবর ওখানে যাবে, ওরা পাঁঠার কি ব্যবস্থা করেছে দেখে আসবে।

ফকির কাজ করিতে করিতে কহিল,—হাড়ীপাড়ায় তো অনেক পাঁঠা, বাড়ল হাড়িরই তিন গণ্ডা, তবে বাঁড়ুজ্যে মশায়রা তো ওখানেও বায়না করে দিয়েছে—

বিশ্বেশ্বর রাগতঃ স্বরে কহিলেন,—বায়না করেছে তো মাথা কিনেছে না কি। বাপ-পিতামহের আমল থেকে যা বন্দোবস্ত আছে তা তো দিতেই হবে। বাঁড়ুজ্যেদের সঙ্গে যদি এতই ঋতির তো ওদের জায়গাতেই সব বাস করুকগে—আমাদের জায়গায় কেন?

ফকির কহিল,—তাই করবেক সব—বলেছে। বাঁড়ুজ্যে মশায় যে নতুন বাঁধ কাটাচ্ছে উয়ার ধারেই জায়গা দিবেক বলেছে সবাইকে, বিনা খাজনায় হাড়ী-বাউরী সব উঠে যাবেক উয়ানে—

বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ গ্রামের পূর্বপ্রান্তে মেঘ-গজ্ঞনের মত গুরুগম্ভীর ধ্বনি উষিত হইল। বাবুলাল কহিল,—“বাঁড়ুজ্যেদের ঢাকীর দল এল।

ফকির সোজা হইয়া পাঁড়াইয়া বিষয় ও পুলকের সহিত কহিল,—বাবা! কি রকম আওয়াজ শুনছেন! যেন বাজ ডাকছে। হুঁকুড়ি ঢাকের শব্দ। কানে তাল ধরিয়ে দিবেক সবাইকার—

বিশ্বেশ্বর বিরক্তির সহিত কহিলেন,—নে, নে; তাড়াতাড়ি সেয়ে ফেল; এর পর আটচালার চালে বড় দিতে হবে মনে থাকে যেন।

কিদের কোলে থোকা আসিয়া হাজির হইল। থোকা তারস্বরে কঁসিতেছে ও হাত-পা ছুড়িতেছে। বি অনেক কষ্টে তাহাকে কোলে ধরিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বেশ্বর হাঁক দিয়া কহিলেন,—কি হোল দাছর? কীদছে কেন?

কিদের নাম কামিনী, ফকিরের স্ত্রী। মাথায় ঘোমটা টানিয়া চাপা স্বরে কহিল,—ঢাকের বাজনা শুনতে যাবে বলেছে।

বিশ্বেশ্বর উঠিয়া আসিয়া কহিলেন—এস দাছ আমার কাছে—বলিয়া হাত ঝাড়াইতেই থোকা বাঁপাইয়া তাঁহার কোলে আসিল।

বিশ্বেশ্বর কৌচর খুঁটে থোকর চোখ-মুখ দুছাইয়া দিয়া কহিলেন,—কীদতে আছে কি! ছিঃ! লোকের বাড়ীতে ঢাকের বাজনা শুনতে যেতে হবে কেন! আমাদের এখানেই ঢাক বাজবে, এখনই দেখবে।

থোকা প্রশ্ন করিল—কই ঢাক?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—এখনই আসবে। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়া বাঁড়ুজ্যেপাড়ার দিকে ছুটিতেছিল। তাহা দেখিয়া থোকা কহিল,—আমিও যাব দাছ ওদের সঙ্গে—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—তুমি ওদের সঙ্গে যেতে পারবে কেন দাছ—রাস্তায় হোচট খেয়ে পড়ে যাবে!

—তবে তুমি নিরে চল।

—আমি বড়ো মাহুব—এত দূর যেতে পারব কেন?

—কত দূর?

কষ্টস্বর যত দূর সম্ভব দীর্ঘায়িত করিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন—অনেক দূর—

—তবে ওরা যাচ্ছে কি করে?

বিশ্বেশ্বর ঢোক গিলিয়া কহিলেন,—ওরা তো যেতে পারবে না। রাস্তায় ছেলে-ধরা আছে খুলি কাঁধে নিয়ে—ওরা এতক্ষণ তার খুলির মধ্যে আঁকু-পাকু করছে দেখগে—

থোকা চোখ দুইটা ভাগর করিয়া কি ভাবিয়া কহিল,—তোমাকে তো ঢোকাতে পারবে না—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—আমার জন্মে বড়ো-ধরা আছে—তারও মস্ত খুলি—আমার মত দশ-বিশটা বড়ো তাতে ধরবে!

এমন সময়ে এক জন বেটে খাটো, শীর্ণকার বৃদ্ধ আসিয়া হাজির হইল—কাঁধে ঢাক; সঙ্গে একটি দশ-বার বৎসর বয়সের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্যাঁকাটির মত ছেলে।

বিশ্বেশ্বর পুলকিত হইয়া কহিলেন,—এই দেখ, আমাদের ঢাক এসেছে। পরাগকে কহিলেন—“হ্যাঁ পরাগ! একাই এলে না কি? আর কৈ? পরাগ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া কহিল,—“আর কেউ এল না কত্তা—সব বাঁড়ুজ্যে বাবুর ওখানে বায়না ধরেছে। তা আমি যত দিন বাঁচব নেকহারাামী করতে নারব—তাই এলাম—

—ও ছেলেটি কে?

—ওটি আমার নাতি—মালোয়ারী স্বরে ভুগছে—দেখুন না কেন দেহটা—একেবারে জ্বেরে দিয়েছে মশর—তা ওকে কেউ নিতে চাইলে না, আমিই সঙ্গে নিয়ে এলাম। একটা তো কঁসি চাই। ওই বাজাবেক যেমন তেমন করে—

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,—বেশ করেছে পরাগ, আমি যত দিন বাঁচি, তত দিন চালিয়ে যাও—তার পর চোখ বুজলে যা হবার হবে—

পরাগ চোখ ও মুখের ইঙ্গিতে থোকাকে নির্দেশ করিয়া কহিল,—“এই ছেলেটি রেখেই বাবাজী আমাদের—

বিশ্বেশ্বর থোকাকে বুকে চাপিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ পরাগ, এইটাই আমার বংশের শিবরাত্রির সন্মুখ—একে বুকে করেই বেঁচে আছি—বলিতে বলিতে চক্ষু ও কণ্ঠস্বর তাঁহার সজল হইয়া উঠিল।

থোকা কহিল—দাছ, ঢাক বাজাবে না?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—পরাগ ঢাক বাজাও। দাছ আমার ঢাক ঢাক করে পাগল হয়ে যাবে।

শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্যারিডির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিকৃত সমালোচনার তীব্রতা প্যারিডির সম্পর্কে তীব্রতর হইয়া উঠে।

ধরুন, কেহ বলিতে চান মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় যথেষ্ট ভাবে এক অত্যন্ত অসংগতরূপে নামধাতুর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর চন্দ্র একটা ছন্দই নয়। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের নারক নারক নামের অযোগ্য ইত্যাদি। প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সেই মত ব্যক্ত করিলেন।

প্রথমতঃ, কথাটা অনেকেরই কানে উঠিবে না, কারণ, পাঠকের সংখ্যা বঙ্গদেশে বিরল, বিশেষতঃ প্রবন্ধ-পাঠকের।

দ্বিতীয়তঃ, বাঁহাদের কানে উঠিবে তাঁহারাও সকলে ঠিক কানে তুলিবেন না।

তৃতীয়তঃ, বাঁহারা কানে তুলিবেন এক সমালোচকের সহিত একমত হইবেন না, তাঁহারাও সকলে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন না। (অথচ বাদ-প্রতিবাদ না হইলে কোনো জিনিষই পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।)

চতুর্থতঃ, বাঁহারা প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারাও সকলে সাহস করিয়া অগ্রসর হইবেন না। প্রতিবাদ করিলে তাহার ভক্ত প্রভুত হইতে হয় এক মুক্তিধ্বংস করিবার ভক্ত হয় পাণ্ডিত্য নয় বাক্যচ্যুত্ব, অস্তিত্ব পক্ষে অব্যাক্ত-কুব্যাক্ত প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়। 'করের খাইয়া বনের ঘোষ' তাড়াইবার হেতুটা কি?

অতএব সমালোচকের মন্তব্য মাট্টেই মারা গেল। কিন্তু ঐ কথাটা নীরস পড়ে না বলিয়া যদি সরল (?) পড়ে এইভাবে লিখি:

"টেবিলিলা স্তম্ভের কানড়িলা তাঁতি"

অমনি সকলেরই নজর পড়িবে। বাঁহা পড়িবে না, সে-ও অপরের মুখে শুনিবে।

প্যারিডি বিশেষজ্ঞের মুক্তি নয়। বিশেষজ্ঞের মতামত সে চাহেও না। সে একটা বিক্ষিপ্তপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া চূপচাপ বসিয়া থাকে। আর সেই ইঙ্গিত আপনাদের কাজ আপনি করিয়া যায়। প্যারিডিকারও অমর্যাদাসে পাঁচ জনের মধ্যে ব্যাতি (সাধারণতঃ কুখ্যাতি) লাভ করেন।

'সৌরপদ-তরঙ্গিনী-রচয়িতা' জনকদু ভ্রম বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য'র অম্লকরণে 'চুচুন্দরীধব কাব্য' নামক যে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহার কথা আজ অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন। অথচ ইহার প্রথম প্রকাশের সময় দেশে একটা কৌতুকের বঙ্গা বহিয়া গিয়াছিল। অম্লকরকাব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

"জলিহাবান সাধু অম্লগ্রহণিয়া
প্রধান ব্রহ্মদে মোরে—নাও চিহ্নিবারে
কিখি কৌনল বলে শব্দ-হুহর
পলঙ্গাশী বহনধ আতগতি আসি'
পল্লবদা চুচুন্দরী সত্যে হানিল।
কিরলো কানিলা ধনী নবরপ্রহারে,

সুখাতল ইহরম গবে সন সনে)
চুচুন্দরী চুচুন্দরী বহুবিধা পাতা,
অট্টে একদা পুঙ্খ পুঙ্খওজ সম
নড়িছে পাশ্চাত্যভাণে। হার যে যেমতি
সুখাতল বঙ্গগৃহে কতায় পরমে
বিব্রাদু বিব্রাদু দলভুলা কাহে,—
(স্বাভীন—আত্মদা যিনি গজেন্দ্রভাষা)
ব্যজেন চার লবে শুধিকনগনী।"

এক শতাব্দীর প্রায় ত্রিংশৎ অতীত হইতে চলিল। প্যারিডি সাময়িক উত্তেজনা প্রাপ্ত করিয়া কৌতুক-প্রবণ লোকের মনে নির্মম হাস্যের সঞ্চার করিয়া বিরাম লাভ করিয়াছে। কারণ, তাহাও বৈ প্যারিডির আর কিছু করিবার নাই। কিন্তু মূল 'মেঘনাদ' আভ্যন্তরীণ পাঠশালা হইতে শ্রবণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সংগ্রহী নিজস্ব সমাদৃত হইতেছে।

বিখ্যাত কবি ভাব ও ভাষার প্রতি বিক্ষিপ্ত করিয়া রচিত প্যারিডি ইংরেজী সাহিত্যে অনেক আছে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের অম্লকরণে রচিত 'ষ্ট্রিফেন'-এর (J. K. Stephen) ৪৩টি প্যারিডি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি:

Two voices are there : one is the deep ;
It learns the stormcloud's thunderous melody,
Now roars, now murmurs with the changing sea,
Now bird-like hipes, now closes soft in sleep :
And one is of an old half-witted sheep
Which bleats articulate monotony
And indicates that two and one are three,
That grass is green, lakes damp and mountains steep ;
And, Wordsworth, both are thine ; at certain times

Forth from the heart of thy melodious rhymes,
The form and pressure of high thoughts will burst :
At other times—Good Lord ! I'd rather be
Quite unacquainted with the A B C
Than write such hopeless rubbish as thy worst.

এই ব্যঙ্গ কবিতাটিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভীষ্মী অতি সুন্দর ভাবে অম্লকৃত হইয়াছে। সন্দেহের আদিক সুরক্ষিত হইয়াছে। মূল কবির দুইটি বিখ্যাত কবিতার (১) কয়েকটি সুপরিচিত কথা সুকৌশলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে—তাঁহাতে সমালোচনার তীব্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্যারিডিকার নিজের কথা বিদ্যা ব্যঙ্গকর এমন অব্যাহা তুলিতে পারিতেন না।

(১) প্রথমটি "Thought of a Briton on the subjugation of Switzerland"—বাহার প্রথম চার লাইন

মূল কবি বা কবিতার ভাব ভাষা ভাবী মুহুর্তের প্রকৃতির প্রতি
বিজ্ঞপ করা, তাহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা, তাহাদের দোষ-ত্রুটি
দূর্বলতাকে বৃহত্তর করিয়া দেখান প্যারিডির অন্ততম কাজ। 'ছদ্মকবী
বধ' তাহার একটি সুবৃহৎ দৃষ্টান্ত। কুস্তুর দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।
'রাহরচিত মিঠে-কড়া' নামক পুস্তকের কথা আজ বঙ্গবাসী সন্তবতঃ
তুলিয়া গিয়াছে। তুলাই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-নামক কবিতা পুস্তক বাহির হইলে
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার কয়েকটি কবিতার ব্যঙ্গাত্মকরণ করেন
এক সেই ব্যঙ্গাত্মক কবিতা যে পুস্তকে মুদ্রিত হয় 'রবিরচিত কড়ি ও
কোমল'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাহার নাম রাখেন, 'রাহরচিত মিঠে-কড়া।'

রবীন্দ্রনাথ আত্মশূদ্রা ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন।
এই চিঠি প্রথম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমল'ে প্রকাশিত হয়। তাহার
কিয়দংশ এইরূপ:

তোমার কেবল গায়টা দিন
আছি অমনি এক বকম,
খোপে বসে পায়রা যেমন
ব'হি কেবল বকবকম।

আজকে না কি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ঝাঁকা ঝাঁকা,
তাই ধানিকটে কোঁসকোঁসিয়ে
বিলায় হলো রবি কাকা।

কাব্যবিশারদের সঙ্ঘ হইল না। তিনি লিখিলেন:

উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোমার বকবকামি কোঁসকোঁসানি
তাও কবিরের ভাব মাঝ।
তাও ছাপালি প্রহু হলো
নগণ মূল্য এক টাকা।

'কড়ি ও কোমল'এ একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি কবির
বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত। পত্রের পাঠ এইরূপ:

সুহৃদ্যর ঐক্য প্রিঃ—হলচরববেরু।

চিঠির কিয়দংশ:

জলে বাসা বেঁধেছিলেম
ভাঙায় বেড়া কিচিমিচি
সবাই গলা জাহির করে,
চৈতায় কেবল মিছিমিছি।

In both from age to age thou didst rejoice.

They were they chosen music, liberty।

আর ষিটারটি সুপরিচিত "The world is too much with
us," ইহার কথা হইতে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত কবি:

It moves us not,—Great God I'd rather be

A pagan suckled in a creed out-worn।

So might I standing on this pleasant tea

And that would make me less

সত্তা লেখক কোঁসিয়ে মরে

ঢাক নিয়ে সে বাসি পিটোয়,

জলস্রোতের গায়ে পড়ে

কলম নেড়ে কালি ছিটায়।

এখানে যে বাস করা দায়

ভনভনানির বাজারে,

প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে

হটগোলের মাঝারে।

কানে তখন তালো ধরে

উঠি বধন হাঁপিয়ে

কোথায় পালাই কোথায় পালাই

জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে

...

...

...

জান তো ভাই আমি হুছি

জলচরের জাত

আপন মনে সাঁতরে বেড়াই

ভাসি দিন রাত। ইত্যাদি

কাব্যবিশারদ লিখিলেন:

মাছ সেজে বেশ করেছে
'জলচরের জাত'।
আর ভেসে না আর ভেসে না
হবে 'কুপোকা'ত।
কতই সাধ যাচ্ছে কবির
আহা মরে বাই,
পায়রা ছিল মাছ হয়েছে
মাছে উড়াবাই।
কবি তুমি মাছের বটে,
হলে পায়রা মাছ।
গেলে স্থলে শূন্য জলে
বাকি কেন গাছ?

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন:

ধার করা নাম নেবো আমি
হবে নাকো সিঁটি।
জানই আমার সকল কাজেই
অবিস্তাতি।

কাব্যবিশারদ ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলেন:

চুনো গলি হার সেনেছে
মৌলিকতা দেখে।
বত মুখমালা বাংলা পড়ে
রখিঁজু দেখে।

রবীন্দ্রনাথের শাশু কাব্যবিশারদের হাতেই শেষ হয় নাই,
কবিরাজ পর্যন্ত হাত তুলিয়াছিলেন। হুঃখের বিষয়, কাব্যবিশারদ
আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া নাই, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় আছেন।

জগতের শ্রেষ্ঠ কবিরের ভাস্কর্য্যে একদা শাশুনা খাটায় থাকে
সুতরাং সে ভক্ত হৃদয় করিব না। কিন্তু হৃদয় এই যে রবীন্দ্রনাথের
... হৃদয় আমার নয়, কবিরের, বত পায়রাই, কতই নাই।

‘কড়ি ও কোমল’ আর কোথায় ‘মিঠে-কড়া’। ওজর্ডস-ওয়ার্থের কবিতার সমালোচনা করিতে গিয়া ট্রিফেন সাহেব যে ধরণের প্যারডি রচনা করিয়াছিলেন, বাংলা দেশে এক জন কবিও যদি সেই ধরণের একটি প্যারডিও লিখিতেন, তাহা হইলে দুঃখের মধ্যেও কিছু সাব্বনা লাভ করা যাইত।

“Parody, if well executed has this merit, that it pours criticism swiftly into an unforgettable mould.” (২)

‘মিঠে-কড়া’-রূপ সমালোচনা সেই অবিস্মরণীয় ছঁ চে ঢালা হইয়াছে কি না, তাহা আজিকার বাঙ্গালী পাঠকসমাজ বিচার করিয়া দেখিবেন। শুধু এ দেশের নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও ভাল প্যারডি অত্যন্ত সুলভ নহে। ভাল প্যারডি হৃদয় লাভ করিতে পারে এ কথা সত্য।

“But much that is written in the name of parody is either on the one hand clownish mimicry, or, on the other, of no more value than a school exercise neatly performed by an assiduous student.” (৩)

আলোচ্য প্যারডি কেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহা বলা বিপজ্জনক। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনো মতেই করা চলে না; কারণ, উহা আর যাহাই হউক, “neatly performed” কদাচ নয়।

মূল কবিতার প্রতি কিছুমাত্র ব্যঙ্গ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না রাখিয়া মূল কবির সম্বন্ধে খণ্ডে খণ্ডে প্রশাস্যসম্পন্ন হইয়াও তাহার অমুকরণ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ‘চিরকুমার সভা’ হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি :

“বাঙ্গালী শকটে চড়ি নারী-চুড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কানীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাবিণী
কোন্ বরাজনে বরি বরমালাদানে
বাগিলা বিচ্ছেদ মাস শ্রীলীত্রয়াশালী
শ্রী অক্ষয়।”

এটি যে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম কয়েক ছত্রের অমুকরণ তাহা বোধ করি বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্যারডিরই ভূমিকায় তাহার ইঙ্গিতও আছে :

“ভূমি যখন বিদেশে থাকবে তখন আমি ‘আর্ডনাদবধ কাব্য’ বলে একটা কাব্য লিখব।” কিন্তু ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ অথবা তাহার কবির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা কিছু কম ছিল না। কবি বা কবিতার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না থাকিলেও হান্তরস ইহা সমুজ্জ্বল। এই হাসির মধ্যে মাধুর্য আছে, বিষ নাই। এখানে যে অসংগতি হান্তরসের জন্মদাতা, তাহা লঘুগুরুর অসংগতি। যে মেঘনাদবধ কাব্য বিভাগের ছাত্রগণের তথ্য শিক্ষকবর্গের পক্ষেও বিভীষিকা-স্বরূপ,

অমুকরণ সম্পত্তির লীলাকলহের অবকাশে তাহার অমুকরণ স্বভাবতই হান্তরস।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত ক্ষুদ্র গান—

“কত কাল পরে বল ভারত রে
হৃৎসাগর সাঁতারি পায় হবে।”

বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ইহার প্যারডিটিও হান্তরসমুখর! উপরে উদ্ভূত প্যারডির মত ইহা নির্বিষ নয়—ইহাতে কটুরস কিছু আছে। তবে তাহা কবির বা কবিতার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয় নাই। তদানীন্তন সমাজই তাহার প্রয়োগস্থল।

“কত কাল রবে বল ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।
দেশে অন্ন-জলের হল ঘোর অনটন,
ধর ছইকি সোড়া আর মূর্গি মটন।
বাণ ঠাকুর চৈতনচুটকি নিয়া।
এস লাড়ি নাড়ি কলিমদি মিঞা।

‘চিরকুমার সভা’র যে প্রসঙ্গ হইতে এই কবিতাটি উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা রসিক সমাজে সুপরিচিত।

‘প্যারডি’র প্রাথমিক অর্থ হান্তরসাত্মক অমুকরণ কবিতা। অন্তরে রচিত কবিতার ব্যঙ্গামুকরণই তাই প্যারডির বিষয়বৃত্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গদ্যরচনারও কৌতুকামুকৃতি বাহির হইতে লাগিল। গদ্য কবিতার মত গদ্য প্যারডিও মধ্যে মধ্যে পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিবে। তবে এ জিনিষ খুব বেশী নাই। এখানে আমরা বাংলা সাহিত্য হইতে একটি কৌতুকোজ্জ্বল গদ্যামুকৃতির উল্লেখ করিব।

‘পরশুরাম’-রচিত পুনর্মিলন’ গল্পটি আর একবার পড়ুন।

“পঞ্চপাণ্ডব বিদ্যাটিবিত্তে মুগয়া করিতে গিয়াছেন। মধ্যম পাণ্ডব একটু বেশী চঞ্চল ও হুঃসাহসিক। তাই মল হইতে ছিটকাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে হুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা একটি বান্দস তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, যুদ্ধ দেখি।

বান্দসটি তরুণ...তাহাকে দেখিয়া ভীমের মনে যুগপৎ বীর ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল। বলিলেন, অরে বালক, তোমার সঙ্গে লড়িব না, বরং তোমার পিতাকে ডাক।

বান্দস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, চাতুরী চলিবে না। হৃৎ যুদ্ধ কর নতুবা পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে চল। আমার জননী ব্রত পালন করিয়া অদ্ভুত আছেন, আজ তাঁহার পারণ। একটি স্বর্গপুত্র মমুষ্য আনিতে বলিয়াছেন। তোমাকে বেশ ছুলকার দেখিতেছি, তোমার দ্বারা ই তাঁহার ক্ষুদ্রবৃত্তি হইবে।

ভীমের কৌতুহল হইল। বলিলেন, বেশ চল।

অনেক বন-জঙ্গল গিরি-নদী অতিক্রম করিয়া বান্দস ভীমকে একটি প্রকাণ্ড পর্বতগুহার দ্বারদেশে আনিল।

বান্দস বলিল, মাতঃ, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ, কেমন শিকার আনিয়াছি।

বান্দসী বলিল, ও আর দেখিব কি। সব মাছই সমান, ভাল করিয়া রাখিলে কে খুঁবি কে চণ্ডাল টেব পাওরা যায় নাই। আমার

রাক্ষস বলিল, চুল বাঁধা এখন থাকুক, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ।

পুত্রের নির্বন্ধাতিশয়ে রাক্ষসী গুহা হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে আসিল। ভীমকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিহ্বা দংশন করিয়া কহিল, ও মা, আর্ধ্যপুত্র যে! ছি ছি, লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোংকচ, প্রণাম কর খেটা।

ভীম বলিলেন, কেও-দেবী হিড়িম্বা? প্রিয়ে, আজ ধন্ত আমি।" (৪)

(৪) হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প—পরন্তরাম।

পরিচয়

অবশেষে মালতীর বিয়ের ঠিক হ'ল।

সাধারণ বাঙালী মেয়ে যে বয়সে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়, সেই বয়সেই মালতীর নব জীবনের যাত্রা-পথে অভিযান শুরু হ'ল। তবে অন্তের সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে—কুমারী মালতী সেন, এম-এ পাশ এবং একটি বিজ্ঞানতন্ত্রের উচ্চপদস্থা শিক্ষয়িত্রী। এ সংবাদে তার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ রীতিমত বিস্মিত হ'ল। আর এ বিবাহে মালতীরও সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ওর বন্ধু সূচরিতা এসে জিজ্ঞাসা করল—লতী! বুড়ো বয়সে এসব কি?

মালতী বলল—নিয়মের বাইরে হয়ে গেছে না কি?

সূচরিতা চোখ টিপে বলল—স্বলীর্ণ কোর্টশিপের ফল বোধ করি।

মালতী চোঁট উঠে বলল—উঁহ, আলাপ হওয়া দূরে থাক, ভ্রলোকটিকে ভাল করে দেখিহিনি এ পর্যন্ত! যা করবার সব মা আর মামা বাবুই করেছেন।

গালে হাত দিয়ে অপরাধ ভঙ্গীতে সূচরিতা বলল—বলিস্ কি?

মালতী বলল—হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই। আর বয়স এমন খুব বেশী হয়েছে কি? জ্ঞোর সাতাশ কি আঠাশ। এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে গেল না কি?

সূচরিতা বলল—সে যাই হোক, আমার যেন কেমন ঠেকছে ভাই। এত লেখাপড়া শিখে স্বাধীন ভাবে চাকরী করতে করতে শেষে কি না অতি বাধ্য একটি পনেরো-ষোল বছরের মেয়ের মত মায়ের কথায় সাব দিলি? আমি হ'লে অন্ততঃ একটু ঘাটিকে লেপতুম।

'তাই করিস্ খন'—মালতী মুখ ঘুরিয়ে বলল।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে হ'লে এখন গোড়ার কথা একটু জানা দরকার।...মধ্যবিত্ত একটি ঘরের মেয়ে মালতী। স্বাস্থ্যবতী বটে, কিন্তু নেহাই সাদামাটা গোছের চেহারা। নিজ অধ্যবসায়ের গুণে, সে প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে ভাল ভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী লাভ করেছে। বর্তমানে সে কোন একটি আখ্য-সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত। সংসার প্রতিপালন করার জন্য তাকে উপাঞ্জন করতে হয় না বটে, কিন্তু বেকারের খাতার নাম লেখাতেও সে রাজী নয়। গত চার পাঁচ বছর ধরে সে এই কাজ করছে। মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের দিকে নজর দেবার সুযোগ বা অবসর তার জীবনে ঘটেনি।

গল্পটি যে ভাসের 'মধ্যম ব্যাঙ্গো' নাটকের আখ্যানভাগ অনুসরণ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা ভূমিকাতেই বলা হইয়াছে।

"মহাকবি ভাস-রচিত 'মধ্যম' নাটকের আখ্যানভাগ কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া বলিতেছি।"

এই তো গেল ভূমিকা। আবার উপসংহারও আছে। লেখক যে আখ্যানভাগ "কিঞ্চিৎ" মাত্র "অদল-বদল" করিয়াছেন, বেশী করেন নাই, কেবল সেইটুকু জানাইবার জন্যই উপসংহার:

"রাক্ষসী কি খাইল ভাস তাহা লেখেন নাই।"

গল্প প্যারডি বলিয়া নয় উচ্চশ্রেণীর স্রমধুর হান্তরসের একরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ দত্ত

তাই গত বিজ্ঞান-দশমীর দিন বিজ্ঞানস অর্থাৎ মালতীর মামা যখন তার মায়ের কাছে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আনলেন, তখন মালতী চিন্তে চঞ্চলতা অনুভব করল এবং কৌতূহলও বড় কম হ'ল না। নারীজীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে যেন বিশেষ ভাবেই ঠেকল। মনে খুসীর জোয়ার জাগল, যখন জানল যে তার মা কষ্টার বিবাহের জন্য উত্তোগী হয়েছেন।

বিজ্ঞানস বললেন—কিন্তু দিদি পাত্রের বয়স যা একটু বেশী। কিন্তু ছেলেটি সব দিক দিয়েই চোখসু। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি স্বভাব-চরিত্রে। আবার দোস্তবও নয়।

মা বললেন—বয়স কত হবে?

বিজ্ঞানস জবাব দিলেন—এই বছর চল্লিশ হ'বে আর কি।

মা বললেন—আমার অমত নেই দ্বিজ! আর মেয়েও আমার ছোটটি নয়। এখানেই যাতে লতীর বিয়েটা হয় তারই ব্যবস্থা কম।

বিজ্ঞানস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার দিদি। আমাদের দেশেই ছেলেটির বাড়ী। আমায় খাতিরও করে খুব... বলে—বুড়ো বয়সে বিয়ে করব তার আবার দেখাশোনা কি? মানে বুঝতেই ত পারছ, চাকরী-বাকরী করে, ঘরে একটু আরাম চায়। লেখাপড়া জানে আর স্বাস্থ্যটিও ভাল, এমন একটি মেয়ে খুঁজছে... তা' সৈদিক দিয়ে লতীকেও আমার কেউ হঠাতে পারবে না। তবে একটি কথা...

মা বললেন—আবার কথা কি?

বিজ্ঞানস একটু থেমে বললেন—লতীর মতটা কি, একবার জানবে না? বিশেষ যখন চারটে পাশ দিয়েছে।

মা গর্ভমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—তা দিলই বা। মেয়ে আমার তেমন নয় দ্বিজ। কোন দিনই সে আমার ওপর কথা বলেনি, আজও বলাবে না।

আশ্চর্য হয়ে বিজ্ঞানস বললেন—সে ত ভাল কথা দিদি। তবে এ কালের মেয়ে...হাওরা অন্ত রকম কি না। সব জেনে-গুনে কাজে নামা উচিত।

মা বললেন—এখন ত সব জানলে, এইবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাও দেখি।

বলা বাহুল্য, অতি শীঘ্রই সব কিছু সমাধা হয়ে গেল। পর

অবনী এক দিন নিজে এসে মালতীকে দেখে গেলেন এবং যাবার সময় পাত্রী পছন্দ হয়েছে, এই কথাটা জানাতে তুললেন না। নতুন জীবনের মোহে মালতীর সারা দেহ-মন উত্ত্বঙ্গ হয়ে উঠল। যথা-সময়ে এক শুভদিনে ও শুভলগ্নে কলিকাতার এক উচ্চ বেসরকারী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক 'শ্রীঅবনীকুমার রায় এম-এ পি এচ ডি'র সঙ্গে কুমারী 'মালতী সেন এম-এ'র শুভ পরিণয় হ'ল।

স্বামীর ঘর করতে এল মালতী।

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং মার্যবাদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অবনী-কুমারকে জড় জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হতেই দেখা গেল। পূর্বেরকার ছোট প্ল্যাট-বাড়ী ছেড়ে তাকে ছোট-খাট বকমের একটা মোতলা বাড়ী ভাড়া করতে হয়েছে। ঠিক বড় রাস্তার উপর না হলেও তার সঙ্গে যোগসূত্র আছে। একটি পরিবারের থাকার পক্ষে বাড়ীটি বেশ। ...প্রবেশ-দুখেই সামনের দেয়ালে আঁটা কার্টের বোর্ডে সাদা হরকে লেখা 'মালতী-কুঞ্জ' চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে খান-পাঁচেক ঘর...তাহাড়া রান্না-ঘর ইত্যাদি ত আছেই। অবনী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটি ঘরের জিনিষপত্র দেখানে যেটি রাখা প্রয়োজন, লোক-জন দিয়ে রাখিয়েছেন এবং এইজন্য তাঁকে কাজ থেকে দিন-কয়েকের ছুটিও নিতে হয়েছে।

সব দেখে মালতী মনে মনে স্বামীর কার্যনিপুণতার প্রশংসা করতে লাগল। বলল—এ সব তুমিই করছে?

মুখ হাস্তে অবনী বললেন—করবার আর দ্বিতীয় প্রাণী কোথায়? অবশ্য এখন তুমি এসেছ...খাও ও কথা। এ সব তোমার পছন্দ হয়েছে ত?

ঘাড় নেড়ে মালতী জানাল—হ্যাঁ।

অবনী বললেন—এখন আমি মনে মনে কি ঠিক করে রেখেছি তাই শোন। ওই যে রাস্তার দিকের ঘরটা, ওটা তোমার পড়ার আর বসবার ঘর করেছে। ঠিক তার উল্টো দিকেই তোমার শোবার ঘর। কোন অসুবিধে হবে না, কি বল?

মালতী ঘাড় নাড়ল। অবনী বলতে লাগলেন—তোমার ঘরের পাশেই আমার শোবার ঘর। মাঝে শুধু একটা মোটা ছিটের পর্দা বুলবে, প্রয়োজন বোধ করলেই আমার ডাকবে। ...আমাদের চা খাওয়া...গল্প-গাছা সব তোমার পড়ার ঘরেই চলবে। দরকার পড়লে তুমিও আমার পড়ার ঘরে চলে আসবে। তাই ত? ...র'য়?

মালতী বলল—নীচের ডান দিকের ঘরটা বুকি তোমার পড়ার ঘর করেছে?

অবনী বললেন—হ্যাঁ।

মালতী মুখ ফুটে আর বলতে পারল না, কি দরকার ছিল এ সব আলাদা ব্যবস্থা করবার? অবনীর পড়ার ঘর ওপরে করলেও ভাল। তার নিজের আর ও-সবে প্রয়োজন কি? পড়াশোনা নিয়ে জীবনের অনেকগুলি দিনই ত কেটেছে।

খানিকটা কৈফিয়তস্বরূপই বেন অবনী বললেন—মানে এ রকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, মাসের মধ্যে আমার একশটা দিন, রাত

মালতী কতকটা নির্গুণ ভাবেই বলল—তা বেশ ত...তোমার অসুবিধা বা সুবিধা আগে দেখতে হবে ত।

অবনী বললেন—তুমি বাড়ীর কর্তা। তোমার মত নেয়াও ত দরকার। কেন? মনে ধরল না আমার কথাগুলো? পছন্দ হয়নি এ ব্যবস্থা?

মালতী বলল—আমার মত নেবার আগেই ত সব ঠিক করে ফেলেছ। তা বলে আমি বলছি না যে, আবার নতুন করে সব গোছাতে।

অবনী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার একটু কাজ আছে...একবার ঘণ্টাখানেকের জন্ত কলেজে যেতে হবে। খানকয়েক বইয়ের দরকার।

শত ইচ্ছা থাকলেও মালতী অবনীকে বলতে পারল না,—'আজ না হয় থাক না বই, সে অল্প দিন এমো'খন। এস না বসে একটু গল্প করি।' তাই অবনী চলে যাবার পর খানিকক্ষণ সে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে শোবার ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াল। চুলের রাশ এলিয়ে দিয়ে সে অশ্রুমনস্ক ভাবে স্নোর কোঁটা থেকে এক চামচ তুলে নিয়ে গালে ঘসতে লাগল। স্বচ্ছ দর্পণের বৃক্কে নিজের প্রতিবিম্বটি নানা ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করল। না...কমনীয়তার অভাব তার সেহ নেই। সেখান থেকে সরে গিয়ে মালতী খাটের ওপর দেহখানি এলিয়ে দিয়ে নিজের কথা ভাবতে লাগল। আজ আর সে নিঃসঙ্গ নয়...একটি জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার জীবনও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। স্বাধীন সন্তোকে সে কোন দিনই বিসম্মত দেয়নি, তবু-তবু শিশুগৃহের আবেষ্টনীর তুলনায় এই সব আবেষ্টনী কত মধুর। সুখ-দুঃখের আবেশ তার আঁখিপাতা স্তিমিত হয়ে এল।

এর পর মাস ছয়-সাত কেটে গেছে। বিকালের দিকে মালতী ঘরে পায়চারী করতে করতে বিমনী বাঁধছিল আর গুন গুন করে একটা গানের কলি ভাঁজছিল। অবনী বাড়ী এলেন।

মালতী বললে—আজ সকাল করে ফিরলে যে?

অবনী হেসে বললেন—এমনি চলে এলাম...আর বিশেষ কোন কাজও ছিল না আজ। ভাবলাম, অনর্থক কলেজের গন্তীর মধ্যে না থেকে বরং বাড়ীই যাই, তোমার সঙ্গে না হয় গল্পই করা যাবে।

মুখ টিপে মালতী বলল—তবু ভাল।

অবনী বললেন—কিন্তু বাড়ী ফিরে কি মনে হচ্ছে জান?

মালতী বলল—কি?

অবনী বললেন—কি জানি কেন ভারী লজ্জা করছে ঐ কথা জেবে। হাজার হোক বয়স হয়েছে ত। বুড়া বয়সে না হয় বিয়েই হয়েছে, তা বলে তারুণ্য ত ফিরে পাইনি।

চোঁট উলটিয়ে মালতী বলল—তা যাও না কলেজেই ফিরে।

অবনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলতে লাগলেন—তোমার এই চুলবাধার অপরূপ ভঙ্গীটি দেখে মনে হচ্ছে যে, যদি তোমার বয়স হ'ত আঠার আর আমার হ'ত আটশ, তাহলে তোমার হাত দুটি ধরে বলতাম—'ওগো বিশ্বমানবীর প্রতীক। তোমার ও কালভূজঙ্গিনী সম বেণী দিয়ে আমার কঠোরোপ করে আমার চেননা লগ্ন করে দাও'...কিন্তু এখন এ বয়সে ও কথাগুলো বলতে ভারী

মালতী বলল—বলতেও কষ্টের করলে না। বেশী বয়সে বিয়ে করা কুণ্ডি মহাপাপ? থাক না তুমি সন্ধ্যাসী হয়ে লোটাকবল নিয়ে... বলে সে কড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিরক্ত অবনীকুমারের অবস্থা তখন ন রখা ন তছো।

২

রান সেরে একটি নীলাধরী পরে মালতী অবনী পড়ার ঘরে ঢুকল।

অবনী একথানা চিঠি লিখছিলেন, শেষ করে সেটি খামে মুড়ে রেখে বললেন—এই যে তুমি এসেছ... ভালই হয়েছে। মাসিক কিস্তিতে একটা রেডিও কেনার ব্যবস্থা করলাম—এই যে চিঠি বাচ্ছে। বলে খামখানি তুলে দেখালেন।

মালতী টেবিলে বসে পা বোলাতে বোলাতে বলল—আবার কেন মিছে খরচ বাড়ান?

অবনী বললেন—তা হোক, বেশীর ভাগ সময় ত তোমায় একলা কাটাতে হয়। তবু বা হোক সময় কাটবে।

সত্যই অবনীর কণ্ঠময় জীবনের মাঝে অবসর বড় একটা মেলে না। সকালে কলেজ বাবার আগে পড়াবার বিষয়গুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হয়। বেশীর ভাগ দিনই বিকাল পর্যন্ত কলেজে কেটে যায়, কোন দিন বা সভা-সমিতিও থাকে। কোন কোন দিন কিরতে রাতও হয়ে যায়, না হলে বাড়ী এসে বটোখানেক জিরিয়ে লেখার দপ্তর নিয়ে বসেন। সময় যে কোন দিকে দিয়ে চলে যায়, সে দিকে তখন হুঁস থাকে না।

অবনী কাছে বসলে মালতী কখনও তাকে বিরক্ত করে না। যদিও সে স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করে অপর পাঁচ জনের মত।

অবনী বললেন—একটা কথা বলব?

শ্রিতমুখে মালতী বলল—বল না।

অবনী বললেন—এ-শাড়ীতে যেন তোমায় ঠিক মানাচ্ছে না! কেমন যেন বয়সের সঙ্গে বেখান্না ঠেকছে।

মুখ ভার করে মালতী বলল—পরতে নাই না কি? কত বেশী বয়সের মেয়েরা ছাপা শাড়ী... রঙীন শাড়ী পরে তা জান?

অবনী বললেন—পছন্দগে তারা! কচি কি সকলের সমান?

মালতী বলল—শাড়ীর সখ আমার চিরকালের। যখন ঢাকরী করতাম, হাডু-খরচা আমাকে মা বা দিতেন তা দিয়ে খালি রঙ-বেরঙের শাড়ী কিনেছি। না হয় আর পরব না... না হয় কাউকে বিলিয়ে দেব।

আবহাওয়া হালকা করবার জন্ত অবনী বললেন—হা হা! আমি কি তাই বলছি!

কোন কথা না বলে মালতী চলে গেল। আসন্ন দুর্ব্যোগের সন্ধানবায় অবনী চুপ-চাপ বসে রইলেন। কিন্তু মেষ কেটে গেল। মালতী ফিরে এল জলখাবারের থালা ও চা নিয়ে। অবনী লক্ষ্য

করলেন, মালতী নীলাধরী ছেড়ে আত্ম একথানা শাড়ী পরেছে। নিশ্চয়ই তিনি আহায়ে মন দিলেন।

একটা কণ্ঠ অবজির মাঝে মালতীর বিবাহিত জীবন কাটছে। মিলনের সহজ সূত্রটি যেন হারিয়ে গেছে। কোথায় যেন কাঁটা খচ খচ করে! তাই কথার কথায় এক দিন মালতী বলল—শেষ! আমি আবার ঢাকরী করব ঠিক করেছি।

বাইরে বাবার পোষাকে অবনী ঠেরী হচ্ছিলেন। বললেন—দরকার কি? আমি কি তোমায় খাওয়ারতে পরাতে পারছি না?

মালতী বলল—সে কথা নয়। তবে... বাকীটুকু অসমাপ্ত রয়ে যায়।

আচ্ছা!... আচ্ছা!... সে হবে খন—বলে অবনী কলেজের দিকে রওনা হলেন। মালতীর বিচারে কিন্তু একটুখানি ভুল হয়ে গিয়েছে। 'অবনীর ভালবাসা ক্ষমত মত... বাছল্য-সেবমুক্ত নয়। আলোড়ন নেই, গভীরতা আছে। প্রমাণ পেতেও বেশী দেরী হল না। সেই দিনই কলেজ থেকে একটু দেরী করে ফিরে এসে পড়ার ঘরে মালতীকে না দেখতে পেয়ে সোজা তার শোবার ঘরে হাজির হলেন। ব্যগ্র ভাবে বললেন—তবে কেন মালতী? তোমার কি অসুস্থ করেছে?

চোখে হাত ঢাকা দিয়ে মালতী শুয়েছিল পাশ ফিরে!... বলল—শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না!... বডু মাথাটা ধরেছে।

—আর হয়নি ত? বলে অবনী মালতীর কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। তার পর বললেন—থাক... আজ আর বেশী ঘোরা-ফেরা করো না। বা হয় এদিকে আমি ব্যবস্থা করছি।... কলেজের পোষাক বদলিয়ে অবনী মালতীর কাছে এসে বসলেন। চাকরকে হুকুম করলেন, অভিকলোন কিনে আনতে আর ফিরতি মুখে ডাক্তারের বাড়ী খবর দিয়ে আসতে। সারা রাত্রি চম্পু ঐকান্তিক সেবা। বা কিছু করেন, মনে হয় যেন মালতীর সম্পূর্ণ তৃপ্তিবিধান হল না। মালতীর বিশেষ কিছুই হয়নি, তবুও সে পরম আরামে ও নির্বিকার চিত্ত স্বামীর এ সেবা গ্রহণ করল। তার লেডু বছরের বিবাহিত জীবনে এমন নিবিড় করে স্বামীকে অঙ্গই পেয়েছে। ভোরের দিকে অবনী বললেন—কেমন বোধ করছ মালতী?

বিহ্বল কণ্ঠে মালতী বলল—খুব ভাল।

অবনী বললেন—একটু চা করে দেব?

মালতী বলল—না থাক। তার চেয়ে বরং তুমি একটু শোও... সারা রাত জেগেছো। আবার কলেজ আছে ত।

অবনী বললেন—আজ আর কলেজ যাব না মনে করছি।

বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে মালতী বলল—কেন যাবে না? কি হয়েছে আমার?

অবনী বললেন—এমনিই যাবে না। কি এমন আমার বয়স হয়েছে যে, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামীর বিভ্রান্তিই ধরা দিতে হবে! তার চেয়ে বরং তুমি আরও একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর দেখি!... কলে সন্মুখে মালতীর মাথার হাত বুলাতে লাগলেন। মালতী কোন কথা না বলে অবনীর কোলের ওপর একথানা হাত রেখে পায়ের কাছে মুখ শুঁকে শুয়ে রইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যোগসাধনার পথবিচার

যোগসাধনা কি করে করতে হবে, কার কোন পথে আসবে সিদ্ধি, কি উপায় অবলম্বন করলে কোন সাধকের কাছে আনন্দ শক্তির অনন্ত অক্ষয় খনির দুয়ার খোলে, এই প্রশ্ন ততঃ সবারই করেন। তার উত্তরে বলতে হয়, মাহাত্ম্যেরও রকমারি নেই, তাই তাদের সাধনারও ধারার বা পথের অন্ত নেই। ঠাকুরজন, যত মত তত পথ, সেই একই কথা অস্ত্র জায়ে বলা বার—রকম প্রকৃতি তার তত. রকম পথ। যোগী সন্ন্যাসীদের মাঝে যেন কত সব জটিল আসন মুদ্রা ক্রিয়া প্রক্রিয়া আছে বোগাভাসার; তার আয়োজন উপকরণেরও অন্ত নেই আর ক্রিয়া-ভেদও শেষ নেই। কেউ শক্ত-কণ্ঠকমণ্ড শব্দ্যর স্তরে থাকেন, বা বিশ্বদ খান্ডবিশেষ খান বা স্বল্পাহারে অনাহারে থাকেন, হেট-মুণ্ড ও উর্দ্ধ-পদ হয়ে করেন জীবনকর। কার সাধনা সহস্র বা লক্ষ নাম জপে, কেউ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখে কাঠি বসে করেন বিন্দুধ্যান। কত কুজসাধক অর্ধ-স্পর্শ করেন না ও নারীর মুখ দেখেন না, পেছন বা ডায়েরী মুদ্রা অভ্যাস করে ক্রম করেন।

এ সব কি পথ নয় ? মানুষের প্রকৃতি হিসাবে এ সবই পথ ; তবে কোনটা স্বর পথ, কোনটা বা একেবারেই কাণা গলি। কেন এ সব কর্দ্দশ্য স্বর পথে মানুষ যায় ?—প্রথমতঃ, ঠিক পথ জানে না বলে ; দ্বিতীয়তঃ, তার প্রকৃতিতে আছে এমন অস্থির রক্ত-শক্তি বা কঠিন আবরণ—এমন কিছু উপাধান যা' তাকে নাকে দড়ি দিয়ে এই সব কঠোর তপশ্চর্যা করিয়ে নেয়। ঐ রকম একটা আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করা হয়তো তার আত্ম-শাসন হিসাবে পরবর্তী বিকাশের জন্য আবশ্যক ছিল, তাই ওটা করতলুয়ে জীবনে এসে গেছে। কিরার আছেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অন্তরে কামের নগ্ন পশুশক্তি দেখে অবধি কেউ ভীত হয়ে আত্মনিগ্রহের পথে প্রাণপণে তার উদ্গর্জন দিকে ষাবার করছে হুশ্চেষ্ট। ঈশ্বর বা তত্ত্বাসাক্ষাৎকাররূপ পরম লক্ষ্য ভুলে সে ক্রমাগত করছে দৈনিক ব্রহ্মচর্যরূপ গোঁণ উপারকেই আশ্রয়। কেউ বা মহাপুরুষের মুখে বা পুঁথিতে শুনেছে বা পড়েছে যে, নারী নরকের দ্বার, কাম-কাঞ্চন সঙ্গারের ভোগ-সুখেরই যোগায় মৌতাত, তাই সে তার চোখের রূপ-সুখকে উপবাসী রাখছে নারী-মুখ সন্দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে, প্রাণপণে হাত-পা গুটিয়ে আছে স্বর্ণ-রৌপ্য তাম্র মুদ্রার স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতঃ ।

যোগসাধনার পথ খুঁজবার তাড়ায় মানুষ বহু অশুভ বিপদ
কুপথের করেছে আবিষ্কার। প্রকৃতি তোমাই স্বৰ্ঘ্য, তাকে
অকালে জ্বরবশি নিরোধ করতে গেলে সেই নিপীড়িত কৃষ্ণ-
শক্তি বিকৃত পথ ধরবেই। মহাপ্রভু আনন্দ-সৌকর্য ঠাকুর,
তিনি জগতে এসেছিলেন জগৎকে ভাব, মহাভাব ও অপার্থিব
প্রেমের সন্ধান দিতে; মানব-সেহে কামবুদ্ধি থাকতে সে
মহাপ্রেমের সন্ধান মেলে না, তা বলে আখার নির্বিচারে

দায়ময়ী নারী স্বর্ণাশ্রম থেকে প্রশান্ত পুত্রচিন্তা অধিকারী শিবাকেই বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে উপদেশ মাত্র তাইই ক্ষেত্রের প্রয়োজ্য। মহামতি বৃদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্য। জগতের অসারত্ব ও মায়াময়তার কথা বলে গেছেন; সে কথা সত্যের একটা দিক। নিকির্নিবেশ নিক্সপাধি তত্ত্বের তুলনায় এ জগৎ অসীকই বটে, কিন্তু ঠাকুরের কথায় বেলাটি শুধু শাঁস নিয়ে বেল নয়, খোলা বীচি শাঁস আটা সব নিয়েই বেলের বেলত্ব। এই হচ্ছে প্রকৃত অর্থও পূর্ণদৃষ্টি। তা'বলে কি আচার্য্য শঙ্কর বা বৃদ্ধের কথা বা গহ্বা তুল ? তাঁরা যুগোপযোগী সত্য নিয়ে পূর্ণ তত্ত্বের এক একটা দিকের উপর জোর দিয়ে সেই দিকই প্রকাশ ও প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন; এক হিসাবে তাঁরা সকলেই ঠিক, সকলেই নম্রত।

অহং বুদ্ধি আশ্রয় করে যে সব সাধনার পন্থা আছে—অর্থাৎ এই উপায়ে অমুক ক্রিয়া অভ্যাস করে আমি স্বচেষ্টায় আত্মসংযম করবো, এই প্রেক্ষিয়ায় চঞ্চল অস্থির মন ও অন্তঃক প্রাণাবেগকে বলপ্রয়োগে বেঁধে ফেলবো, এই রকম হঠকারী বুদ্ধি আশ্রয় করে মানুষ যে কঠোর তপস্কর্য্যা বা সাধনা করে তা সব সময় কল্যাণ প্রসব করে না। সে অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগের পথে দুর্বল ন্যায়বিক অপূর্ণ আধার ভেঙ্গে পড়ে বা দরকচা মেঝে ইতোদ্রষ্টন্ততো নষ্ট হয়ে থাকে ; সবল শক্তিমান আধার পার পেয়ে যায়। তথাপি অধিকাংশ মানুষকে অপরিত অবস্থায় কল্প-বিস্তর এই অহংকারপ্রিত সাধনা করিতেই হয়, তার সবটা সব ক্ষেত্রে নিষ্ফল যায় না, একান্ত উদ্বিগ্নগামী চিত্ত মন প্রাণকে সাময়িক বশে রাখার কিছু শক্তি এই যমনিয়মাদি সাধনা থেকে জাগে। এই ভাবে শ্রেষ্ঠতর প্রশান্ততর সাধন-পন্থার জন্ম মানবাধার ক্রমশঃ প্রস্তুত হয়ে ওঠে। কিন্তু নিছক এ সব কষ্ট কল্পিত প্রচেষ্টা-দুষ্ট পথে তৎসুলাভ হয় না, এটা একেবারে খাঁটি সত্য। আমি মলে ঘুচিয়ে জঙ্ঘাল, যখন এই অহংজ্ঞান বিলয়ই পরম পদ লাভের প্রকৃত পথ, তখন যে পথে এই অহংবুদ্ধি ক্রীণ থেকে ক্রীণতর হয় সেই পথই বরণীয়। যতক্ষণ সাধক বোঝে না এ পরম বস্ত কি, কি উপায়ে সে পরম গুণ তত্ত্বের সন্নিহিত হতে হয় ততক্ষণ এই সব এলোমেলো হাতড়ানো চলছে স্বাভাবিক।

পরাতত্ত্বের উদয়ে যণ প্রাণ চিত্তবৃত্তি সব স্বতঃই বিলয় হতে থাকে, একটি প্রশান্ত ব্যাপক অঞ্চলমুখী অবস্থা। স্বতঃই উদিত হয়ে যোগীকে করে ইহবিমুক্ত, তত্ত্বাক্ত; ত্যাগ তখনই হয় খাঁটি, সেই স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগই ভববন্ধন মোচন করে, জোর করে অভ্যাস করা কাষ্ঠভ্যাগে হয় না। এই সত্য যে উপলব্ধি না করেছে, তার পক্ষে যোগসাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান পাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, সে পথের মাহুত পথেই থেকে যায়, বিপথকে পথ বলে ভ্রমের বশে ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু তার ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে। তবু অন্ধ অজ্ঞান অবস্থার আমরা চেষ্টা না করে পারি না, সে চেষ্টা তখনই প্রশান্তি ও নৈকর্যের পথে বেতে থাকে, যখন সাধকের সাধনা ধুলে যায়, উর্ধ্বের স্রোতাবধার যখন এসে এসে হৌঁওবা দিয়ে দিয়ে ছাকে ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখ তত্ত্বাধিষ্ঠিত করে দেয়। তখনই তার আরম্ভ হয় সত্যকার সাধনা, সার্বকথ্যাত্ম, অহংগ্রহী মোচনের খাঁটি পালা।

—————— **ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାଗଣା** **ଆଦେଶ** **ନିମ୍ନେ** **ଚଳେ** **ନା**, **ନେ** **ଚଳେ**

তাই, পণ্ডিত করে এক পথে চেষ্টা, ভাবুক চলে আর এক পথে ভাবের টানে ভেসে, অস্থির কর্মী করে কতই না আড়ম্বরে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বহুল তপস্তার আয়োজন। আমরা ভাবি, আমরা আপনি চলাছি, বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করছি, আসলে আমরা কিছু নিজের নিজের স্বভাবের ঠেলায় ঐরূপ না চলে না করে পারি না। শুধু পাণ্ডিত্যভিমানে মানুষ হচ্ছে মনের রাজা, বুদ্ধিবৃত্তি তার সত্তার প্রধান উপকরণ, তারই রঙে সে সর্বসত্তার অম্বরঞ্জিত। পণ্ডিত মানুষ তাই সাধনার পথে পা বাড়িয়ে অবধি শুধু করে মহা উৎসাহে তর্ক-বিতর্ক, কেবলি সার করে চলে শাস্ত্রের শ্লোক, জ্ঞানের ও বৃত্তির বিচার। তর্ক ও বুদ্ধি চালানাই তার পক্ষে এক রকম সঙ্কোচ, চর্চা ও ভোগের দ্বারা সে মানস-বেগ না কাটলে ঐ চঞ্চল সবজন্তু মন, বুদ্ধি তার চূপ করবে না, অন্তর্যুথী হবে না, তরঙ্গ তুলে তুলে মন তার অস্থির ও অশান্তই থেকে যাবে। শাস্ত্রেই আছে “ন মেধয়া, ন বভনা ক্ষন্তেন”—উজ্জ্বল মেধা বা বহু ক্ষতিপাঠেও আস্থা উপলব্ধি হয় না। এ কথা বার বার পাঠ করবে সে কথা তর্কাতুরাগী শাস্ত্রজ্ঞদের সহজে উপলব্ধি হয় না,—সে বুঝেও বোঝে না যে, শাস্ত্রের শ্লোকে আত্মজ্ঞান নাই—*In books and temples vain thy search*; সেখানে আছে শুধু সে পথের ইঙ্গিত মাত্র, তাও ধরতে গেলে চাই স্থির প্রশান্ত প্রাণ, মুক-তদর্পিত মন। মন বুদ্ধির পাবের বস্তকে ধরবার আয়োজন এই রকম বুদ্ধিচূর্ণ অশান্ত মানুষ কেবলি তাই চলে মনের কান্দ পেতে; তর্ক ও চিন্তার আবর্ত সৃষ্টি করে করে। ফলে, চঞ্চল মন অশান্তই থেকে যায়, বুদ্ধি চালনার মধুর পরমায়ই বার বার সে করে আত্মদান। তবে এই সৃষ্টিশক্তির জন্ম তদমুদূলে বিচার করেও ক্ষেত্র-বিশেষে মন যায় কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, বুদ্ধি হয়ে আসে প্রশান্ত গভীর ও দীপ্ত। তখন কোন কোন ভাগ্যবান জ্ঞানীর অন্তরের মানস-পুরুষ—চকিতে প্রজ্ঞাচক্ষু খুলে দেখতে পায়—প্রশান্ত সূর্যালোকদীপ্ত অতি মানসের কৈলাসচূড়া, তখনই যায় তার মনের বাঁটা ঘুরে। তখন তার শাস্ত্র-মোহ যায় ঘুচে, সে বোঝে যে,—

“বাইথেরী শব্দধরী শাস্ত্রব্যর্থানকৌশলম্।

ভুক্তয়ে ন তু যুক্তয়ে।”

যোগ হচ্ছে জীবনেরই বিকাশ; যোগ অর্থে বৃদ্ধি তোমার আমার অন্তর্নিহিত সত্তার ধর্মের পথে উত্তরোত্তর জ্ঞান শক্তি ও আনন্দে বিকশিত হওয়া। আমাদের সত্তা জীবনে অমুদূল ও প্রতিকূল দুই অবস্থার চাপে অন্তরের প্রেরণায় আপনি বিকশিত হয়ে চলেছে, মন প্রাণ ও হৃদয়ের হয়ে চলেছে ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতি; সুখের, স্বস্তির ও পরিপূর্ণতার ক্রমবর্ধিষ্ণু লোভে ও টানে সে ক্রমবিকাশ এক দিন স্বতঃই বৃহত্তর জীবনের দ্বারায় তোমায় আমায় এনে ফেলবে। তখন আর সংসারের অসার ক্ষুদ্র স্বখে, তুচ্ছ শক্তি ও জ্ঞানে, দুঃখমিশ্রিত ক্ষণিক আনন্দে আমাদের মন ডরবে না; তখন হবে সত্য সত্যই “নাহম্মে স্খমমস্তি, ভূমৈব স্খমম্”, তখন জীবন-নদীতে জাগবে পরিপূর্ণ জোয়ার—কোন এক বিশৃঙ্খলতার সাগরসন্মের দুরাশায়। এরই নাম মুমুক্শু। এই মুক্তির ইচ্ছা বার জেগেছে, সেই যোগী। তার সে মুক্তিযজ্ঞের আয়োজন উপকরণ আপনি এসে তার দায়ব্ধ হয়। কারণ, সে সত্যই পরম বস্ত

গায় পড়ে উপদেশ দিতে সাধ্য সাধনা করতে হয় না; যেমন প্রজ্ঞাপতি হবার জন্তে গুটিপোকাকে বোকাতে হ'ল না, সে আপনি নিষ্কল নিরাপদ স্থান খুঁজে বসে পড়ে নব কলেবর ধারণ করবার উদ্দেশ্যে।

স্বভাব-তাত্ত্বিক হয়তো নিচক বাকবিতণ্ডার দ্বাতিয়ে বলবেন, তবে কি এত পূজার্কনা, শাস্ত্র, মন্ত্র, বিগ্রহ, দেউল, উপদেশ ও গ্রন্থাদির কিছুই প্রয়োজন নাই? প্রয়োজন আছে বই কি, সব রকম চেষ্টা ও উপকরণের কিছু না কিছু কল আছেই; জীবমাত্রেই যেমন যে বার রুচি অমুখ্যায় আহার খুঁজে নেয়, সাধনাকামীও তাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অমুখ্যায় কেউ শাস্ত্রপাঠে, কেউ মন্ত্র বা নাম-জপে, কেউ বা আত্মনিগ্রহে লেগে যায়। এ সবার দ্বারা হয়তো দুর্দম প্রকৃতি কিছু বশে আসে, আংশিক সখ্যম অন্তঃসং হয়, অন্তর উজ্জ্বল দিকে উন্মুখ হয়; কিন্তু কেবল এ সব উপায়ে উচ্চ ভূমিতে আবোহণ বা সত্য উপলব্ধি হয় না। শাস্ত্র মন্ত্র বিগ্রহাদি তারই সত্য সত্যই কাজে লাগে, যার অন্তরে জেগেছে ভূমার ক্ষুধা, যার উজ্জ্বল জীবনে জাগবার এসেছে সময়। সংসারে ধর্মপুস্তক আছে বিস্তর, উপদেশও আছে প্রচুর, পথ আছে বহু, যোগবলসম্পন্ন যোগীও বিরল নয়। তবে পরমার্থ লাভের পথ শাস্ত্রাপাঠ-নির্বিকারে সবার কাছে খোলে না কেন? গীতা উপনিষদ ও রাশি রাশি ভক্তিগ্রন্থ পড়ে সবাই সহজে পথ পায় না কেন? এ পথ সবার জন্য নয় বলেই পথ সকলে পায় না, সকলের উজ্জ্বল বৃহত্তর চেতনায় জাগবার সময় হয় নাই বলেই তত্ত্ববস্ত হাতের কাছে থেকেও জীবনে মহাপুরুষ সংস্পর্শ হয়েও সে রুদ্ধ সত্তায় তত্ত্ব স্করণ হয় না। কিন্তু যার জাগে সত্তার অখণ্ডের ডাক, তাকে জগতের কোন কিছুই বা কেউই নিরস্ত করে রাখতে পারে না, পথ যাকে ডাকে সেই পায় পথ, ভূমা বা বৃহত্তর দীপ্ততর জীবন যাকে বরণ করে নেয়, সেই স্বতঃই ফুটে চলে অখণ্ডের ও অমৃতত্বের মাঝে।

আমার গুরুদেব বিষ্ণুভাষ্মর কলে বলতেন, “সাধক আছে দু'রকম—প্রবর্তক ও প্রাবহপণ্ডিত। প্রবর্তক তাকে বলি, যে শ্রোতের প্রতিকূলে সাতার কেটে চলে, তার শক্তি সামর্থ্য মত সে একটু একটু করে শ্রোত ও জোয়ার কাটিয়ে এগোয়। প্রাবহপণ্ডিত কিন্তু তাকেই বলি, যে নিজের অহঙ্কারের বশে স্বচেষ্টায় সম্ভরণ করে না, সে শ্রোতের বা জোয়ারের টানে নিজেকে ছেড়ে দেয়, প্রাবহই তাকে ছ হ করে টেনে নিয়ে চলে। ট্রেণ ছপু ছপু করে চলে যায় পথ অতিক্রম করে, তুমি থাক ট্রেণ চড়ে স্থির প্রতীক্ষায় বসে, এই আসে বহুমান, চার-ছ'ঘণ্টা পর আসে আসানসোল, মধুপুর, দেওঘর, দুই-চার দিন পরে পৌছে বাও প্রয়াগ, আগ্রা, দিল্লী। অহঙ্কারপ্রস্রিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ কষ্টকর, নিরাশ্রয় বা সমর্পণ-যোগে সেই সিদ্ধি আপনি আসে আপন ছন্দে।”

এই শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ পহার নাম ভক্ত দেয় সমর্পণ-যোগ, জ্ঞানী একেই বলে সাক্ষিচৈতন্ত্যে অবস্থিতি—আমারই বৃহৎ স্বরূপের মাঝে আমার ক্ষুদ্র অহংসত্তার আত্মসমর্পণ ও আত্মবিলয়। এই শ্রেষ্ঠ পথে এক দিন না এক দিন জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত আদি সকল প্রকার সাধককে আসতেই হবে। যে জপসাধনে রত, তারও এক দিন আসে জপ হুরিয়ে গিয়ে অজপার অবস্থা—

“আমার জপের মালা কলি কাঁথা

জপের করে বইলো ঢাকা।

আর কিছু নাই মা শ্যামা

কেবল তোমার চরণ রাজা ।”

যে তর্কবাসীশ, সে খাঁটি তত্ত্বাযেবী হলে কালে তারও দ্বার তর্ক
থেমে; অনেক হাঁকপাঁকানীর পর অস্থির অহঙ্কারী মন বৃদ্ধি তার
বৃক্ষে ফলে নিজের দৌড়। ঠাকুরের সেই চিলের গল্প মনে পড়ে—
চিলাটি সমুদ্রগামী জাহাজের মাষ্টালের ওপর বসে কিম্বোচ্ছিল।
ইত্যবসরে তার অজ্ঞাতে জাহাজ পড়েছে অকুল সাগরে। জেগে উঠে
বাস্তব হয়ে তখন সে উড়ে চললো পশ্চিমের দিকে হারাণ কুলের সন্ধানে।
কোথাও তটরেখার সন্ধান না পেয়ে বিরে এসে প্রান্ত ডানাল নিয়ে
সে মাষ্টালে ক্ষণেক বিশ্রাম নিল। তার পর আবার গেল পূর্ব
দিকে উড়তে উড়তে; সে দিকেও কুল-কিনারা নাই। এই ভাবে
চার দিকের অমূলসন্ধান নিশেষ করে বার্ষ হয়ে সেই যে চিল এসে
স্থির হয়ে বসলো, আর কোথায়ও গেল না।

“আপনাতে আপনি খেকো মন

যেও নাক কাক করে।

যা চাষি তা পড়ে পাষি

বোজ নিজ অন্তঃপুরে।

পরম ধন সে পরশ ঘণি

যা চাষি তা দিতে পারে

ভরে কত রত্ন পড়ে আছে

আমার চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।”

যত প্রয়াস ততই ব্যর্থতা যত নিশ্চল ও স্থির ততই প্রাপ্তি।
কারণ, অস্থির দশায় তো আমি এই ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণের খাঁচায় পড়ি
ধরা, দেহ প্রাণ মনোময় হয়ে বাই। কিন্তু স্থির উদাসীন অবস্থায়
আমি কিন্তু দেহ মন ভুলে যাই, আমি পাই বৃহত্তর ও বিপুল পরম
শাস্তের মাঝে ছাড়া—অথগুর মাঝে সহজ আশ্রয়।

নিমাই

ত্রিশান্তি পাল

রাত্রি গভীর তৃতীয় প্রহর একেলা বসিয়া ঘরে,
বাহিরে বাঘল মাদল বাজারে কর্ণ বধির করে।
মাঝে মাঝে শুনি গ্রাম্য-কুকুর রহিয়া রহিয়া ডাকে,—
ভাঙিবারে চায় যেন সে বিজ্ঞান রাতের স্তব্ধতাকে।
জোনাক-পোকারা ধক্ ধক্ জলে কাননের বুক জুড়ে,
বাউরী বাতাসে ব্যাকুল করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়ে।
মনে হেন লয় পিশাচেরা যেন গহন অন্ধকারে,
আগুনের কথা লোকালুপ্তি ক’রে আকাশে ছুঁড়িয়া মারে।
কচিৎ কখনো নিশাচর পাখী বনের আড়াল থেকে,
বিকট শব্দে চীৎকার ক’রে বনান্তে গেল ডেকে।
সে ডাকের সাথে ভেসে আসে কা’র বুক-ফাটা ক্রন্দন,
“বাণ রে আমার নয়নের নিধি কোথা গেলি বাণধন।
এ সংসারে হায় একেলা ফেলিয়া কা’র কাছে থুঁরে গেলি,
সন্ধান-হারি মায়ের দুঃখ সেখুঁ রে নয়ন মেলি।”

এ কি শুনি এ যে পরিচিত স্বর নিমায়ের মা সে হবে,
এত দিন পরে বৃদ্ধির কপাল ভাঙিল কি বিধি তবে!
অমন ছেলে যে সারা গাঁও খুঁজে একটি দেখিনি আর,
অপরের বোকা মাথায় করিতে ছুড়ি যে ছিল না তার।
কোথার কাহার চালে খড় নাই, আর নাহিক ঘরে,
গরীব চাষী সে বস্ত্র বিহনে গাম্ছা আঁটিয়া পরে;

কোথায় কাহার পুকুর ছেঁচিলা শেওলা তুলিতে হবে,
খানা-খন্দর ভরাট করিলে মাছের চলিবে তবে;
কোথায় কাহার বাঁশ-বাড় কেটে, মশা-মাছি সব ঘেরে,
বাড়ীর সমুখে বেড়-বাগানের বেড়া দিয়ে দেবে ঘেরে;
নিমায়ের ডাক পড়িত সেথায় সকল লোকের আগে,
আজিকে সারাটা গাঁয়ের মানুষ সেই কথা শুধু ভাবে।

* *

গাঁয়ের লোকেরা ছুটিয়া সবাই নিমায়ের বাড়ী যায়,
কাদিতে কাদিতে সাজনা দিয়া কহিতে লাগিল মা’র;—
“দাও মা ছাড়িয়া সন্তানে তব আশানে যে বেতে হবে,
রাত বেড়ে যায় মিছামিছি আর বাসি করিও না শবে।
নিমাই তোমার এ মর-জগতে খেলার ছলেতে এসে,
কাজের বোকা সে চাপাইয়া ঘাড়ে গিয়াছে নূতন মেলে।
জনমের পরে মরণ রয়েছে অমর নহে ত কেহ,
জানিত সে মা গো খুলায় মিশিবে এই নবর দেহ।
কীর্তি কেবল থাকে মা জগতে মুহূর্ত নাহিক তার।”
জননী কহিল,—“শ’রে যাও তবে বাধা নাহি দিব আর।
সার্বক মোর জীবন আজিকে ধর আমি রে আজ,
দাঁড়াও ক্ষণেক সাজাইয়া দিই এনেছ কি ফুল-সাজ?
কে কোথা সেখেছে আমার মতন এমন পুণ্যবতী,
সন্তান বার সেবার স্তব্র মানে নাক’ অরু-কতি।

দৈনিক পারিবারিক আদর্শ

রাশ্যে আদি কবি বাহ্যিক আত্মপ্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক সমাজে তাহা একটা কাল্পনিক স বলিয়াই মনে হয়। সেই সময়কার সমাজের আদর্শ আজ নেক সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য হাওয়া ভারতীয় সমাজের উপর একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। সেই বিজাতীয় আদর্শ ভারতের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের ব বত ক্ষতি করিয়াছে তত ক্ষতি আর কিছুতেই করে নাই। দেশ এক সময়ে যে নীতি ধর্মের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার মূলে কুঠারঘাত করিয়া দিয়াছে। পৌরাণিক দ্ব্যুদিত যে অপূর্ণ কর্তব্যপারায়ণতা, চক্ৰ-ভক্তি, পিতৃমাতৃভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম, মাননীলতা, ত্যাগ ও সেবার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আধুনিক সমাজ তাহা আজ আর নাই। পাশ্চাত্য জাতির ভারতীয় ভাবধারাকে আহত নয় একেবারে নিহত করিয়া দিয়াছে। রামায়ণ দেখা যায়, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে নিহত হইলে রামচন্দ্র যে বিলাপ করিয়াছিলেন—তাহাতে কবি বাহ্যিক রামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—

“দেশে দেশে কলরূপি দেশে দেশে চ চন্দ্রাবত।

তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভাতা সহোদরঃ।”

ভাৰ্য্যা এবং বন্ধু-বান্ধব সকল দেশেই পাওয়া যায় কিন্তু সহোদর ভ্রাতা আর পাওয়া যায় না। সেই বিলাপে রামচন্দ্রের অপূর্ণ আত্মত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ বহু আদর্শ পৌরাণিক উপাখ্যানে পাওয়া যায়।

আর এই সভ্যতার যুগে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘রাজর্ষি’ উপজ্ঞানের উপসংহারে নাটকের মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—“সকলেই এ জগতে ভাইয়ের মত ব্যবহার করে, কেবল আপন ভাই করে না।”

বাহ্যিক ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কবি, ভাবুক ও মনস্তত্ত্ববিদ। দুই জনে দুই দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবধানের যুগের সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; অথচ আদর্শের যে আলো তাঁহারা সমাজের চক্ৰ ধরিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আকাশ-পাতাল প্রদেল, এক কথায় সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ ‘রাজর্ষিতে’ যে সময়কার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও বহু বয়সের আগেকার সমাজের। সেই সময় পর্যন্তও কবি কেবল “আপন ভাই ভাইয়ের মত ব্যবহার করে না” বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু আজ এই বিশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে যদি কোন মহাকবি আবার সমাজের আধুনিক আদর্শ লইয়া উপাখ্যান রচনা করেন, তবে তাঁহাকে আরো অধঃপতনের দিকে নামিয়া আসিতে হইবে; তাঁহাকে ততোধিক গভীর মধ্যাত্তিক বেদনায় লিখিতে হইবে—“ভাই ভাইকে বন্ধনা করিতে, সর্বনাশ করিতে এমন কি স্বার্থের জন্য হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, শত্রুর নিকটও যে সম্ভার পাওয়া যায় আপন ভাইয়ের নিকট তাহা পাওয়া যায় না।” যুগধর্ম আদর্শের কি আশ্চর্য পরিবর্তন!

সেই যুগে সমাজ পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম প্রভৃতি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এটা পশ্চাত্যপ্রদেশের যুগ, এ যুগে পশ্চাত্যপ্রদেশ সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য নিজে বনবাসী হইয়াছিলেন, প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নী সীতাদেবীকেও বনবাসে পাঠাইয়া কর্তার কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। এ রকম উদাহরণ অষ্ট পাওয়া যায়।

একান্নবতী পরিবার ভারতীয় সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, আজ তাহা পোষ পাইয়াছে, ইহা পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদেশিক আগমনের ফলে এ দেশের সমাজে বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাব বিস্তার করে, তখন হইতেই ধীরে ধীরে সমাজে ভাঙ্গন ঘটে, সংসারে আর একান্নবতীতা কেহ পছন্দ করে না, বিবাহ করিয়াই এ দেশের যুবকেরা পাশ্চাত্যদের মত পত্নীপ্রেমে এমন মগ্ন হইয়া পড়ে যে, পিতামাতা ভাই-ভগিনী প্রভৃতিকে বোকা-বন্ধন মনে করিতে থাকে। এমন শোচনীয় ঘটনাও বিরল নহে—পিতা-মাতা বর্তমান থাকিতেও ভাই ভাই পৃথক হইয়া যায়। অক্ষম বা উপাধীনহীন ভাই থাকিলে, তাহাদের মানুষ হইবার পথও অনেক স্থলে রুদ্ধ হইয়া যায়। এ দেশে পাশ্চাত্যদের মত প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হইতে সন্মোদন পায় না, এক জনের উপাধীন বহু আত্মীয়-বান্ধব প্রতিপালিত হইত, ইহাই এ দেশের আদর্শ ছিল, বর্তমান যুগে তাহা অনেক স্থানেই হয় না।

এখন এই সভা যুগের সংসারে ভাই ভাইকে বঞ্চিত করিবার যিকির-কল্কী বৃদ্ধিয়া থাকে। এক পরিবারভুক্ত থাকিয়াও বাহ্যতে নিজের উপাধীন ধন-সম্পত্তির অংশ অল্প ভাই দাবী করিতে না পারে সে উদ্দেশ্যে স্বার্থসর্ষ পত্নীর বেনামীতে রক্ষা করা হয়। আইনে জীবনের উপর কাহারও শাসী-শাস্য চল না; আজকাল খুব উচ্চশিক্ষিত সন্তান পরিবারেও এই বন্ধনা-নীতি অমূল্য হয়। এ দেশে জীলোকেরা পুরুষের মত উপাধীন করে না, প্রকৃত জীবন খুব কম নারীই থাকে, কিন্তু আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, উপাধীনকম ব্যক্তিগণ সম্পত্তি, টাকা-কড়ি সব জীবন নামেই দখল করিয়া রাখেন।

অনেকে ব্যবসায় বাণিজ্য কারবারাদি ব্যাপারও পত্নীর বেনামীতে চালাইয়া থাকেন, উহার পক্ষান্তরে সেই একই বান্ধব-বন্ধনানীতি লুপ্তায়িত। বাঙ্গালার কোন একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের মালিক অপর ভাইদ্বিগকে উক্ত ব্যবসায়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা অজুহাত প্রদর্শন করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চালাইয়াছিলেন। হাইকোর্টের শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে অপর ভাইদের জয় হইয়াছিল। সেই ব্যবসারে এখন সকলেই মালিক সাব্যস্ত হইয়াছেন। ভ্রাতার ভ্রাতার মামলা মোকদ্দমা—খুন পর্যন্ত এখনকার প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার পরিণত হইয়াছে। যে সমাজে ও সংসারে এক দিন “মায়ের পেটের ভাই কোথায় গেলে পাই” নীতি বর্তমান ছিল—আজ ঐক্য প্রীতি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া “ভাই ভাই, ঠাই ঠাই” নীতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের আত্মপ্রেম আজ আত্মবিচ্ছেদে পর্যাবসিত। সংসারের ঐক্যবন্ধন আজ একেবারে শিথিল। পাশ্চাত্যদের মত জীবসর্ব্ব সংসার হইয়া উঠিয়াছে, পাঁচ জন আত্মীয়-বন্ধন লইয়া সংসার করিতে সকলেই যেন অরুচি বোধ করে। বাহ্যিক তৃপ্তিগামকত; এখন সংসারে পোষ, তাহারা হয় কৃপাকাজী অথবা অসহায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বকার বাঙ্গালার সংসার আর আজকার সংসারে কত পার্থক্য ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে আধুনিক সংসারের আদর্শ ষাঁড়াইয়াছে—

“তন যে বাহুব ভাই—

সবার উপরে পত্নী সভা তাহার উপরে নাই।”

সত্যশিবেব বিশ্বতত্ত্ব

তগবীশ গুপ্ত

আত্মবৈজ্ঞানিক বীজ হইতে বন্যশক্তির উদ্ভব—এ ভুলনাট্য।
সুশীলাশ্রমবীর কাকের সঙ্গে খাটে না। বৃদ্ধভূত কলর
স্ব হইতে মুক্তিকায় পতনের সূত্র মাথাকর্ষণের আবিষ্কার—এই
লেনাট্য কিছু খাটে। মাথাকর্ষণের, অর্থাৎ দুইটি পদার্থ বস্তুর পৰি-
পালনস্বরে এক প্রবাহের বর্ণবিপর্যয়ে পৰস্পরকে আকর্ষণ করে,
ঐ তথ্যের সম্মাননাভেব ফল বিজ্ঞানজগতে ব্যাপার ভূমল হইয়া
ঠিয়াছিল। এ প্রাচীন কথা সবাই জানে; কিন্তু সবাই জানে না যে,
নারাম পাণ্ডয়ার উপায় নৈবাং আবিষ্কার করার আগে সুশীলাশ্রমবীর
ব্রিজে এবং পরে তাঁর সমসাময়িক বিদ্রোহ লেখা মিছিল, ইহা
সামুদ্রিকতম একটা ইতিহাসিক ঘটনা।

সুশীলাশ্রমবীর একটা পুত্র, একটা কন্যা, অর্থাৎ কারকটী সন্তান
মলপ্রায়ে পড়ার পর ঐ চাঁট এখন বহিমান। স্তম্ভাঃ উচ্চাঃ
প্রাণাধিক শ্রিয়।

ছেলে সত্যশিবেব বয়স তেরো; ইতুলে পড়ে।

যেহে কিরণের বয়স পনের চল্লিশতেরে—ইতুলে পড়ে না। কর্ণা-
গবেব সম্ভাঃ বাবু পুত্র শৈলেশ্বরের সঙ্গে কিরণের বিবাহের কথা-
গাঠী চল্লিশতেরে—খুব স্তম্ভভাবেই চল্লিশতেরে। সম্ভাঃ বাবু নিরুজ্জ্বল
যাকি সন্দেহ নাই। বি-এ পড়া ছেলের শিখা হইয়াও তিনি পুত্র
এক বরাভগন স্বক্কে এমন নিশ্চুত যে, ভাবিলে অথক হইতে হয়।
কিরণের বাবা রাখাল ভট্টাচার্য্য সেই কারণে খুব অথক হইয়া থাকেন,
এবং গল্প আর প্রশংসা করিয়া অনেককেই খুব অথক করিয়া
দিতেন। এটী নির্ভর ব্যবসায়, অর্থাৎ কলার শিত্তকে নিশ্চুতইয়া
ক বেদী আদায় করিতে পারে ইত্যাদি প্রতিশ্রুতিভাঃ সম্ভাঃ বাবু
অলৌকিক সযম প্রদর্শন করিয়াছেন—রাখাল ভট্টাচার্য্যের বিশ্বাস
জাই। চারি শত টাকা মূল্য, আর সোনা মাত্র বশ ভবি, আর কিছু
না। রাখাল বাবু হিসাবে কিরণের বিবাহে চৌকুরের বরাদ্দ ছিল
সর্বস্বাকলো' ইত্যাদি চতুর্গণ। স্তম্ভভাঃ রাখাল বাবু গরগর হইয়া
মাছেন—সুশীলাশ্রমবীর গরগর হইয়া আসেন। কিরণও গরগর হইয়া
মাছে, কিন্তু তাহা কেহ জানিতে পারিতেছে না। তাঁতাদের ঘেহে
পছন্দ হইয়াছে, ইহাদের ছেলে পছন্দ হইয়াছে; স্তম্ভভাঃ এ-বিবাহ
হিবে; সিন-সিহর করিতে রাখাল ভট্টাচার্য্য সম্ভাঃ বাবুকে বিনম্র পর
দ্বাছেন।

পূর্বে যে বিদ্রোহনক আবিষ্কারের কথা বলিয়াছি তাহা এখনকার।
স্রীলোক বুদ্ধিমতী বতাই হটন, অতঃপুত্রী তাঁর দত্ত গভীরই হোক,

দুই চলে না বাসির কলসে। শিল্প কথিয়া সুশীলাশ্রমবীর সময়ে
এই তত্ত্বটি নির্ভাক সভা। তিনি ভাবেন অনেক, কিন্তু তা' দেবন
ভুল দেবের কথা; আদ্যম যে কত প্রত্যাবের হটতে পারে তাহা তিনি
চিন্তা করেন নাই, অর্থাৎ তাঁর মাথার আগে নাই—আমি যেহে প্রিয়া
এক দিন কখন কভা কিরণের একপুত্র ত্যাগ করিয়া হামিঃ প্রাণের
সিন নিকটবর্তী হইয়াছে।

সুশীলাশ্রমবীর কাছ অনেক, অতঃপুত্র, স্তম্ভভাঃ পরিচয় ভবিঃ
হয় খুব; এক বিশ্রমে আহাঃভাঃ তিনি কিছুখন না পাইয়া পড়েন
না—তাইলে তাঁর 'হাঃভের ব্যখার' লাগত হয়।

সেদিন শনিবার। সত্যশিবেব ইতুলে গিয়াছে। সুশীলাশ্রমবীর
বালিশটি মাথার দিয়া তইয়া পড়িয়াছেন; আর ঐতের মঙ্গল প্রকাশনা
চাঃভের কেবল গায়ে দিয়াছেন; পা তাকিলে পা ছালা বরাভগন
পা খেলাই আছে। তাঁর পায়েব পাতে প্রচুর ছান আছে, এক
জানালা দিয়া প্রচুর আলো আসিতেছে বলিয়া কিরণ তাঁর 'সত্যশিবেব'
সইয়া সেখানেই বসিয়া গিয়াছে...

বসার কিছু পরেই বসিল এক ভৈব ঘটনা—বিঃভগন ভবিঃ
আবিষ্কার। সারন প্রাঃভগনে কিরণের হাত অস্বিক্ ভবিক্ প্রাঃ
নামা করিতে করিতে হইয়া একবার ঐকিয়া গেল তাঁর পায়েব পাতে
তলার সঙ্গে—সঙ্গে সঙ্গে সুশীলাশ্রমবীর অতঃভব করিলেন, তাঁর মুখ
অথক একটু আদ্যম—

বলিলেন—পায়ে একটু হাত দুসিঃভে তে, মা।

সেলাই বাসিয়া পায়ে হাত দুলাইয়া কিরণ সিন না, তিনি
অতঃভাঃ আর কিছু সিন পূর্বে আসিত; কিন্তু ইহাও সেখানেতে
ছাঃভিয়া বাইবে, এক সেই কেনার নিঃস্রাঃ হইয়া না পাইয়া সে ব্যাঃ
মাঃভের বড় শেউটা সত্যক না দিয়া তাঃভাকেই দিঃভাঃন...

কিরণ নিঃকৃত্যাবামি করিল না, সেলাই সইয়া বাসিত তে
মাসের পাতে হাত দুলাইতে লাগিল—সুশীলাশ্রমবীর আঃভাঃ কত
বসিল না। কিন্তু তত পায়েব সঙ্গে তত হস্তের ঘাঃভে ইহাও ভবিঃ
হেঃভে ঐঃভগ হটল—

সুশীলা বলিলেন,—ঝালা করছে বড়ো, হাতে একটু তেল দিঃভাঃন।

কিরণ হাত তৈলাক করিয়া আসিল—

তৈলাক হাত পাতে দুলাইতে তত করিলে সুশীলাশ্রমবীর
আঃভাঃভের আরো অতঃভব হইল না।

সুে মুহুরিত করিয়া তিনি জাকিত লাগিলেন, আর বড়
এক, আর পরিচয়ে এখন ততঃভব আঃভাঃ পরঃভাঃ হাত এক কথা
তিনি আগে ভাবেন নাই। আত্মবী কিছু। একটাই তিনি
ঐ ভাবে আঃভাঃ প্রঃভব করিলেন...জাকিত জাকিত সুশীলাশ্রমবীর
চিন্তা-মুক্তিকায় সঙ্গতায় ভুলের কুঁড়ির অতঃভব বিঃভাঃ লাভ করিতে
লাগিল...যেহেব বত সিন বিবাহ না হইতেরে তত সিন সে তাঁর
এই বকম সেবা-পরিঃভাঃ করিবে, কিন্তু তার পর? তাঁর পর
বিবাহের সিন সিন হইয়া সেলাই মিঃভিত—কর্ণাঃভগের সইয়া যেহে
শাঃভতীয় পায়ে তেল মাঃভাঃভে ব্যাকিলে। কলার কলার ভবন
পূঃভব করিবে কে? আঃভাঃভে বিঃভব ভবন হইয়া সুশীলাশ্রমবীর
তবনই কিংকিং বিঃভব হইলেন...কলার হাত এখন করিতে পারে
পুঃভব। সত্যশিবেবের বিবাহ দলে কেহন হয়।

বিঃভাঃ কল মাঃভিতে পড়িল—আঃভিক্ত হইল মাঃভাঃভব। কিরণ

টার পর তাঁর মূল চিন্তার সহিত শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইতে প।

মাহুৰ এই আছে এই নাই। জীবন পদ্মপত্রের ভলবিন্দু বৈত।
। পাতা একটু কাঁচ হইলেই বিন্দু সিঁদুতে মিশিয়া বাইবে।
ন মন্থন মোড়ল মাঠ হইতে আসিয়া বাবান্দায় বসিয়া দুখ ধুইতে
ত ঠাসু হইয়া নীচে পড়িয়া গেল—বাড়ীর লোক দৌড়াইয়া
সিয়া দেখিল, মন্থন মরিয়া গেছে। এই ত জীবন। হাসিও
৫, কাঁদাও পায়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ জীবনের দৃশ্য কি?
ব স্থাবিরের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কি? পরে করা
বে বলিয়া সান-আছাদের কোনো কাজ অনিশ্চিত কালের জন্য
নতুন রাধা বুধি কাজ কি?

ভাবিতে ভাবিতে এখানকারই অপরাধিতার মতো রূপবতী
দার জমনি খেঁচি একটি মেয়েকে বধু করিয়া আনিতে তাঁর
মনে হুঙ্কার লাগল। জামিল বে, তখনই, শুইয়া শুইয়াই, তিনি যেন
দাবতীর প্রতিকূল উক্তির সম্মুখে উগ্র, অগ, দাবতীর প্রতিকূল
অবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন...

জমনি একটি মেয়েকে যদি বউ করা যায়, তবে জীবন সফল
হয়। বিবাহ দিতেই হইবে সংকল্প করিয়া সুশীলাসুন্দরী কিরণের
আরামপ্রদ হাতের ভিতর হইতে পা টানিয়া লইয়া একবারে উঠিয়া
বসিলেন।

কিরণ বলিল,—মা, উঠলে বে? এখানে বেলা আছে।

সুশীলা বলিলেন,—সত্যের বিয়ে দেব।

কিরণ সৌমনিপুণ্য হইলেও, এবং আধুনিক বই খানকতক
তার পড়া থাকিলেও, একবারের সেরেলে ধরণ তার—বিশেষ অবাক
হইলে চট করিয়া সে গাল হাত দেয়। অত্যাশ্চর্য কথা হইয়া
শোনা এ বাড়ীর বিবরণের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ যে বেজায়
আশ্চর্য। কিরণ বিশেষ অবাক হইয়া চট করিয়া গালে হাত দিল;
বলিল,—ও মা, সে কি কথা!

—হ্যা, দেব। আমি মরব' চিরকাল খেটে খেটে উপায় থাকতে?
টুকটুক বউ আনিব; বাড়ীর ভেতর দল্লীটুকুগটির মতো থাকবে,
জলজল করবে—পায়ে পায়ে ঘুরবে অটলহর—দেখে চোখ জুড়াবে।
আমি শুয়ে থাকব—পায়ে সে হাত বুঝিয়ে দেবে। আমাকে মা
বলে ডাকবে, ঠকে বলবে বাবা।—বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বধুর এই মধুর
আছাদের অপরিমেয় উল্লাস সুশীলাসুন্দরী এমন বিগলিত হইয়া
গেলেন, যেন কাঁচিয়া ফেলিলেন।

কিরণ বলিল,—বাবা দিলে ত।

—দেবে, বাড়ি টেট করে' দেবে; না দিলে আমি বুঝি তাকে
সোয়াড়ি দেব ভেবেছিলাম?

তিনিয়া কিরণ বিশেষ অবাক হইয়া আবার গালে হাত দিল,
আর হাসিতে লাগিল।

এই হাতে করিয়া সত্যশিব আসিয়া উপস্থিত হইল। শনিবারে
'হাফ ইয়াম' হবে; সন্ধ্যা সকাল সকাল কিরণে বলিয়া সুশীলাসুন্দরী
নিম্নাঙ্গ করিয়া লোক ঘোড়ার গর্ভে নাই; ঠেঁকধানার বাহির-
বাহির দিল সেস নাই—বাহির 'হোয়া' দামাইতে বিলম্ব হইলে
কেন দিয়াছেন, কীটাল কিং পায়ে।

পড়িয়া না হোক, পথশ্রমে সত্যশিবের মুখ আমিরা উঠিয়াছিল;
সুশীলাসুন্দরী তার হাত হইতে বই লইয়া আলমারির মাথায় তুলিয়া
রাখিলেন; তাহার মুখের বাম আঁচলে করিয়া মুছিয়া দিতে দিতে
কষ্টানুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ইতুল হয়েছি এক ইয়ে,
দেশছাড়া জায়গায়। কাছ-পিটে করলে ওদের কি হ'ত। তুই
বাড়ীতে পড়িস, সত্য; ইতুলে তোকে বেতে হবে না। ইতুলে
যেতে-আসতেই যদি ছেলে পুড়ে শেষ হয়, তবে সে ইতুলে মাহুৰ
আবার ছেলে পাঠায়।

সত্য বলিল,—বাবার সখ, আমার মরণ।

কিরণবালা সেলাই করিতে করিতে বলিয়া উঠিল,—সত্য,
তোর বিয়ে।

—কবে?

তিনিয়া কিরণ অবাক হইয়া গালে হাত দিল; সুশীলাসুন্দরী
হাসিয়া উঠিলেন। অবাক হওয়ার আর হাসির কারণ ছিল বই কি।
সত্য ত' বয়স্ক হিসাবে যোগ্য হয় নাই; কিন্তু তার প্রশ্ন তিনিয়া
মনে হইল, নিজেকে সে উপযুক্ত মনে করে বলিয়াই এই সরল প্রশ্ন
করিতে পারিয়াছে—যেন সে বলিতে চায়, এত দিনে ছ'শ হইয়াছে
দেখিয়া সুখী হইলাম।

কিরণ বলিল,—বেহায়া ছেলে। জিজ্ঞাসা করছে, কবে?

—কি এমন অজ্ঞান করেছে? তোরও ত' বিয়ে হবে—নিজে
যাবে চ্যাংলো করে। আমার বেলাতেই বুঝি বেহায়াপনা হ'ল।
নিজের বিয়ের কথা তুই কেমন কাণ পেতে শুনিস তা' বুঝি আমি
দেখিনি? নিজের ইয়েটুকু যদি বেশ বোঝে।...বলিয়া সত্যশিব
যুগপৎ আহত প্রবীণ ভাব ধারণ করত জননার মুখের দিকে চাহিয়া
বসিল।

কিরণ বলিল,—অতটুকু ছেলের বজ্জাতি, কম নয়।

সত্য একথাও জবাব দিল, বলিল,—মা, আমি কিছু বলেছি?
তুই-ই ত' বলি আমার বিয়ের কথা। আমি বলতে গিয়েছিলাম,
না, শুনিয়েছিলাম? না বললেই পারতিনু? বললেই শুনে হ'বে।

পুল ও কস্তার কলহে জননী কৌতুকানন্দ অনুভব করিতেছিলেন;
হাসিয়া বলিলেন,—গাছে কাঁটাল, গোপে তেল—তাই হয়েছে
তোদের! আশুক তোদের বাবা—

কিন্তু সত্যশিব বাপের মতামতের অপেক্ষার দেরি করিতে পারিল
না; বলিল,—আমি বিয়ে করব' না, মা, এখন। দিদির বিয়ে
হ'য়ে থাক' তার পর করব'।

—কেন বে?

সত্য বলিল—"বউয়ের সঙ্গে ত যগড়া করবে কেবল।

কল্পিত দোষারোপে ক্রুদ্ধ হইয়া কিরণ কি যেন প্রতিবাদ করিতে
হাইতেছিল; কিন্তু কিছুই তার বলা হইল না—জননার তুলু হাসির
উত্তাল উত্তরালের নিম্নে সে সহসা চাপা পড়িয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরীর এই প্রবল হাসি, বাপের জামা-জুতা-পরা ছেলের
মতো অবহতের সুবৃহৎ রূপ দেখিয়া নয়—বধু একবারে মূর্তি ধরিয়া
সেখা দিয়াছে; বধুনবদের সনাতন কলহের চিত্র; বাহা ভাবিতে যথু
কিন্তু ভোগে অমধুর তাহাই রসে ঢল ঢল পরম উপভোগ্য হইয়া
উঠিয়াছে ছেলে আর মেয়ের কথায়—অবশ্য তিনি নিজেই সোপে
কেন দিয়াছেন, কীটাল কিং পায়ে।

সত্যশিব হাত-পাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছিল—

হাসির বেগ ধামিলে শূইলাশ্রম্বরী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তার কোঁড় নিবারণ করিলেন। বলিলেন,—আমি থাকতে ? আর, তোকে খাবার দিইগে।—বলিয়া বিবাহে সম্প্রতি অনিচ্ছুক সত্য-শিবকে লইয়া তিনি বাগ্নাঘরের দিকে গেলেন।

রাখাল বাবু কান্ন করেন 'সাব পোষ্টাফিসে' হশটা-পাঁচটা ডিউটি। এখন কেবল তিনটে পকাশ—তার ক্ষিরিতে বেরী আছে...

শূইলাশ্রম্বরী মনে মনে ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিরণের হাত কৈবাং পায়ে ঠেকিয়া যাওয়ায়, ঐ স্থান পূর্ব অবলম্বন করিয়া, ছোট বাড়া একটি বটে আনিবার কথা তাঁর মনে আসিয়াছে ; কিন্তু আসিয়া সে বসিয়া নাই—প্রাণপণে কান্ন করিতেছে। স্বামী, অর্থাৎ তৎকালিক মালিক যিনি তিনি, কথাটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জানা নাই—শূইলাশ্রম্বরী তা'র বত শ্রম সত্ত্ব জানিতে চান ; এবং তলতলয়া যে সমুদয় কথা বখাবোগ্য যেকাজের উপর বলিতে হইবে, তাহাও বত শ্রম সত্ত্ব তিনি বলিয়া শেষ করিয়া ফেলিতে চান।

সত্যের বিবাহ নিজেই সুখের গঙ্গা যে কলনাসে ছুটিয়া আসিবে, সে বিষয়ে তাঁর অসুস্থতা সন্দেহ নাই ; কিন্তু ঐ লোকটিকে বিশ্বাস নাই ; কথা বৃত্তিবে না, অর্থ মনে করিবে, বৃত্তিই সব বলিতেছি। অর্থওনীর কর্তব্য তাঁরই, অর্থাৎ মোড়ার লাগামটি তিনিই হাতে ধরিয়া বসিয়া আছেন ; ঘান আর আবেহী পানার পড়িয়া ঘন হউক, চুরমার হউক, তাহাতে তাঁর জরাজপ নাই—তিনি করিতে চান কেবল বিবেচনা।—এমন ধারা লোকের সঙ্গে অত বড়ো একটা কথা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন যোগে যখন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যদি শূইলাশ্রম্বরী স্বামীর পথ চাতিয়া ছটফট করিতে থাকেন তবে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

সত্যশিব আহাবাস্তে মার্কেল লইয়া বাতির হইয়া গেল। কিরণবালা 'কাপড় কাচিতে' নামিল। তাহার পর সে চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা রাখিবে। বেলাবেলি প্রস্তুত না হইলে প্রদোষাক্ষরে ধর্ষণের ভিতর মুখচ্ছবি স্পষ্ট ফোট না। বলিয়া উপ পথিতে অস্তবিধা হই।

শূইলাশ্রম্বরী নিত্য-নৈমিত্তিক গৃহকর্মে নিযুক্তা হইলেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ পড়িয়া রহিল একজোড়া জুতার শব্দে উপর। কৃপের ভিতর হুড়ি-বালুতি নামাইতে নামাইতে শূইলাশ্রম্বরী একটা খটখট শব্দ শুনিয়া চমকিয়া দড়ি নামানো বন্ধ করিলেন—

কিন্তু কে যেন বাজার বলিয়া উঠিল,—খ, ধর, বাছুরটা পালিয়ে গেল।

শূইলাশ্রম্বরী অসঙ্কট হইয়া দড়ি নামাইতে লাগিলেন ; জলে ডরিয়া বালুতি তুলিলেন—টাইকা-তোলা ঠাণ্ডা জলে রাখাল বাবু বুধ হইতে ভালবাসেন—তা'ই ঘটিতে করিয়া সেই জল বরাবান্বয় রাখিয়া দিলেন।

কিন্তু এবার বাছুর নয়, জুতার শব্দ করিতে করিতে রাখাল বাবু আগিয়া পড়িলেন—করকবে' হাসিমুখে তিনি প্রবেশ করিলেন... জায়া সেখি ধুসিয়া কেশিয়া ঘোরে বসিলেন—

কিরণবালা তাঁহাকে পাখার বাতাস সেবন করাটতে লাগিল...

—বা' গরম। বলিয়া রাখাল বাবু বলিলেন,—কিরণ, মা, পাখা ঘেঁষে এক কলকে তামাক খাওয়াও। অপিসে বিড়ি খেতে খেতে ততো হ'বে গেছি।

কিরণ পাখা রাখিয়া তামাক সাজিতে বসিল ; শূইলাশ্রম্বরী পাখা তুলিয়া লইয়া নিজেকে বাতাস কথিবার জ্বলে বানীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। বাতাস করিতে করিতে তিনি ঘুরিয়া আসিয়া বাহারি সমুদ্রে ঝাঁড়াইলেন—তাঁহার চোখের উপর চোখ বাতাস নিবীক্ষণ করিতে লাগিলেন—নিজেকে...

হাওয়া খাইতে খাইতে রাখাল বাবু আরামের একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, আ...

শূইলাশ্রম্বরী বহু প্রতিক্রিয়া মতো নিকপটে বসিলেন,—পাঁচটা এতক্ষণে জুড়লো ?

—হ্যাঁ। বলিয়া রাখাল বাবু তাঁকা লটতে কিরণবালাকে নিজ হাত বাড়াইলেন, আর, শূইলাশ্রম্বরী হাসিলেন—ও হাসির বাতাস পুঙ্ককে ঘরিতে আত্মবিস্মৃত করা যায় তেমনি একটু হাসিলেন, এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—তোমাকে আমি অস্বাক্য করে দেন।

কিরণবালা হাত হইতে তাঁকা লইয়া রাখাল বাবু বাগ্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—কি বরাত ? কি বকম ?

—হ্যাঁ, সত্যের বিষয়ে সেব ঠিক করেছি।

তিনিও বুকে যেন অতর্কিতে তাঁর বিবিধা রাখাল বাবু চোখের উপর লাগাইয়া উঠিলেন।

—একবারে ঠিক—প্রস্ত করিয়া পড়ীর মুখে লিকে চাতিয়া বাবু রাখাল বাবু কীভাবে আজ প্রথম চত্বাক হইয়া বসিলেন মনে পড়িল না সে তিনি তাকান।

শূইলাশ্রম্বরী সেই অবসরে তাঁর আগন্তি শেন করিতে লাগিলেন,—তা'ই ইচ্ছে করেছি। আমার বুকি লাক-আজ্ঞান করতে ইচ্ছা হয়ে না। মস্তেসে কথা ত বলা যায় না ; করে আছি করে নেই। করে মরে মরে যানো—বউটিক লেখে গাই।

মরার কথা চূড়ান্ত কথা।

চিবকাল কথা বাটতেছে, রাখাল বাবুর কুটী অঙ্গগণা, আত্মতত্ত্ব নতে। স্বীর বিস্ময়টাই তাঁর কিশোর বয়স হইতে প্রেক্ষণীয় হইত হয় না—পাগলের মতো কাপল বুজিয়া কেডান। স্বীর হাস্যের আরো কতিন কথা—মরার কথা ত বলতুল। আত্মতত্ত্ব মুক হইয়া রাখাল বাবু বলিলেন,—মরার কথা মনে না, ওতে আমার কতো কষ্ট হয় তা কি জানো না ? তুমি মরে গেলে আমার হইলো কতো আমার লশাটা তখন কি হবে ? ভিকিবিজি ব্যাপার চার শিরেই, একা আমি সামলাবো কেমন করে। তুমি মরলে কলি আমো এক দিকে নিশ্চিন্ত। না, না, মরার কথা মুখেও এনো না। শব্দে তোমার পরমাণু। সৈবন্ত কলেছেন, আমিও বলি।—বলিয়া সেই শুকীয় কাল পর্যন্ত প্রসাধিত স্বীর সাহচর্য এবং সহায়তালোকে আনন্দে রাখাল বাবু বিহবল হইয়া বসিলেন...তার পর বলিলেন—তা' বেশ।

যেন হইল, স্বামী এক কথাকেই রাজী হইয়াছেন—সত্যশিবের বিবাহ দিতে তাঁর আপত্তি অনিচ্ছা একটুও নাই। কিন্তু স্বামীও স্ত্রী হিসাবে না চোভ, নিজের লক্ষ্যমতী অসত্যের উত্তির হিসাবে

কর্তব্য, অতঃ পরে কথার চূড়ান্ত নিশ্চয়বিশয়ক একটা অকাটা
লম্বা আলাপ-পরিচয় লওয়া—

বলিলেন,—তোমার বিষয়ও ত প্রায় ঐ বয়সেই হয়েছিল;
মনে নাই?

—মনে আবার নাই?—মনে রাখাল বাবুর ছিল, আচ্ছা এক
থাক; সেই দিন ইহাতে পটীলাভের সৌভাগ্য অংশ করিয়া তিনি
তার ভাগ্যবিধাতাকে অকৃতজ্ঞ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কানিত্তজন;
আর, সেই বয়সেই বিবাহিতা পত্নী যখন দিব্যার সখ্যুৎসেই সেইপানো,
তখন প্রাপ্তি সেই স্তম্ভনিনটিকে অংশ না রাখিয়া উপায় কি?

ভাবাকুল কণ্ঠে রাখাল বাবু বলিলেন,—মনে আবার নাই! তা
আবার স্মিত্য সা করছ!

রাখাল বাবুর কণ্ঠের স্তম্ভিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি
যেন স্বাক্ষরে এই উপলক্ষে “অরি নিষ্ট্যে” বলিয়া সম্বোধন করিতে
চান।

তার পর একটু ধামিয়া রাখাল বাবু বলিলেন,—আমি বলিনি
যে, তোমায় শেষে আমি দত্ত হয়েছি। “দুঃখ” “দুঃখলাপ”
একথা একশা বার সত্য। তোমার মতো যুঁ পেয়েছি বলেই
ত’ কুপিত আমি কিছু করে উঠতে পারেন না—সকল তেজে
তিনি পিছিয়ে আছেন। বলিনি?—বলিয়া সজ্ঞাধরপিতা স্তম্ভ
জোবে শর্মির সঙ্গে সঙ্গামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গেছেন মনে করিয়া রাখাল বাবু
অংশ চাক করিতে লাগিলেন।

“দুঃখ” তিনি, এটো খোঁজার স্মীলনাম্বরী সন্তুষ্ট হইলেন।
“দুঃখলাপ” শব্দের অর্থ তার জানা ছিল না; স্তম্ভিয়া বলিলেন,—
বলেছ। কিন্তু তা’ আর আমি শুনেই চাইনি। আমি বলছি,
সন্ত’র বিয়ের কথা। যেটো বাছা ‘ক’ তেবো বহুবে হ’ল।
বলিয়া স্মীলনাম্বরী এমন করিয়া আকস্মিক্যে বাকিলেন, যেন অবাধ
বাক্যিক তিন দারেক্তা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

রাখাল বাবু ত’কা কিরণবালার হাতে প্রস্তাবণ করিয়া বলিলেন,
—কিন্তু মুশকিল কি জানো, অহটুকু মেয়ে তুমি কোথায় পাবে? ছোট
ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া নেই আজকাল।

অবাধ বাক্যিক শায়েস্তা করিবার ইচ্ছা স্মীলনাম্বরী আপাততঃ
বন্ধন করিলেন, শাস্ত্র হবে বলিলেন,—এই ত’ উলটো গাইছ।
দুখে-পাওলা ছোট মেয়ে কে চাইছে তোমার কাছে? আট-নয়
দশ এগারো কি ছোট হ’ল?

কিরণবালার সজ্জিত হইয়া ততাকে সখিয়া টাড়াইল।

কিন্তু এ বড় গুরুতর সমস্যা—স্মীলনাম্বরী রাখালকে ছোট
বলিয়া বীকার করিতে চান না, রাখাল বাবুর তাহাকে মনে হয় ছোট।
কিন্তু তনুটি আর দারিত্র্যের মতো বন্ধনও রাখাল বাবু ভয় করেন;
বলিলেন,—তা’ নয়; তবে লোকের কি মত হয়েছে আজকাল—এই
খিঁচি খিঁচি মেয়েগুলোকে বলে কুমারী...

বলিতে বলিতে রাখাল বাবু কিরণবালার নিকট হইতে হাঁকটা
আবার চাহিয়া লইলেন; বলিতে লাগিলেন,—“বলে কুমারী আর
খুক। কলকাতায় দেখে এলেম সেদিন, তাদের বড়ো হ’তে কিছু
বাকি নেই—অথচ বিয়ে হয়নি।—বলিয়া কলিকাতার খিঁচি খিঁচি
মেয়েগুলো কত বড়ো, হাত উত্তোলিত করিয়া তা’ দেখাইতে যাইয়া
—কিন্তু সেদিন সেদিন বলিলেন—

—ও মা, গায়ে পড়নি ত?—স্মীলনাম্বরী শঙ্কিতচিত্তে প্রশ্ন
করিলেন।

রাখাল বাবু বলিলেন,—না; মাটিতে পড়ছে।

—আচ্ছা, জলটল খাও। হবে এখন কথা।

‘কলপাবার’ খাইতে খাইতে রাখাল বাবু স্বীকৃতি জিজ্ঞাসা
করিলেন,—সন্ত’ গেছে কোথায়?

—খেলতে বেরিয়েছে। সে ত’ বেগে খুন।

—কারণ?

—কিরণ স্বত্ববরে না গেলে সে বিয়ে করবে না।

—কেন?

—বলে, দিদি বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে।

স্তম্ভিয়া রাখাল বাবু ‘কলপাবার’ অর্থাৎ মুড়ির প্রাস তাড়াতাড়ি
ঢোক গিলিয়া নামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আসনের উপর হইতে
প্রায় অর্ধেক বাহির হইয়া গেলেন...তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া
বলিলেন,—আমার ছেলে ত’! খাঁটি বাম্বনের বক্ত নেড়ানো
সেগা ছেলে; বুদ্ধি ওর রগে রগে। তাই বললে বুদ্ধি?

জননীকে বাদ দিয়া জনকের বুদ্ধির ধার ছেলে পাইয়াছে, এই
অন্তায় উল্লাসে স্বামী আত্মহারা হওয়ায় স্মীলনাম্বরী বিরক্ত
হইলেন; বলিলেন,—শুনলেই ত’! এক কথাই বার বার শুনে
চাওয়া কি?

কুঁহলী বলার কিরণেরও রাগ হইয়াছিল; জড়জি করিয়া
সে বলিল,—ওই রকম!

রাখাল বাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আমি মেয়ে খুঁজতে লাগলাম।
তুই বিয়ে একসঙ্গে লাগিয়ে দেয়া থাক। তোমার ইচ্ছা আমি
চিরকাল পালন করে’ এসেছি—অথপত্নীর মর্যাদা রেখেছি প্রাণপণে
—এবারও রাখব। খরচেরও শাস্ত্র কিছু হবে।—বলিয়া তিনি
জলযোগ সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন।

—রাখাল ডোচার্য্য কাজ করেন সাব-অফিসে; আর, সঞ্জীব সাজাল
কাজ করেন ব্রাক অফিসে। সঞ্জীবের একটি মেয়ে আছে। তাহার
বিবাহ দিব্যার জন্ত, অর্থাৎ তাহাকে বিলাস করিবার জন্ত, সঞ্জীব
উৎস্রক নয়, অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। পিতা পুত্রকে আপদ মনে
করিয়া তাড়াইতে চান, কথটা শুনিতে বড়ো অকরণ; কিন্তু নেহাত
নাচার হইলে অকরণ কথা উচ্চারণ এবং অকরণ কাজ সম্পাদন
করিতেই হয়। সঞ্জীব তাই উত্তোষী হইয়াছেন। মল্লিকিনী
সঞ্জীবের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা—সেখিতে সুল্লী কিন্তু কলহপ্রিয়া।
প্রথমা স্ত্রী ঐ কন্যাটি দিয়া গিয়াছেন, আর রাখিয়া গিয়াছেন পিত্রালয়
হইতে সংগ্রহীত দুই শত টাকা এবং তিন দফা অলঙ্কার।
স্বামীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আশ্রয় করিয়া লইয়া গেছেন যে,
ঐ টাকা আর অলঙ্কার মল্লিকার বিবাহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে
ব্যয় করিবেন না। সুতরাং কিছু মূলধন সঞ্জীবের হাতে আছে।

কিন্তু মূলধন হাতে থাকাই বড়ো কথা নয়, বড়ো হইয়া উঠিয়াছে
এই কথাটাই যে, সংসা মল্লিকিনীর সঙ্গে আর পারিয়া উঠিতেছে না
—মল্লিকিনী হামেশাই তাঁকে চোখের জলে নাকের জলে একাকার
করিয়া দিতেছে—সঞ্জীব নিজেরও খই পাইতেছেন না। সংসা

কথাটি এমন যে তিনিলেই মনে হয়, সে পূর্ণশাক্তের সম্মানগুলিকে
বহুলা দিবেই আসে একা লোক মনে করে, বাপটাও যায় বউয়ের
পক্ষ—সম্মানগুলিকে দেখে ভাসাইয়া।

সুতরাং সস্তাব সাফল্য বিপন্ন, সেক্ষেত্রে নাই এবং অতিরিক্ত হইয়া
 মেঘের বিবাহের কথা চিন্তা করিতেছেন—এমন কি, যাহার মাঝে
 মণ্ডল প্রকাশও করিতেছেন...

ধৰ্মপুত্ৰৰ অজ্ঞানীৰ অভিজ্ঞতা পৰিপূৰ্ণ কৰিবাবৰ লক্ষ আৱশ্যকীয়
হ’বগৈ। অৰ্থাৎ পুৰুষ সন্তানশিৰেৰ লক্ষ একটী কৰে’ টীৰ চাই
স্বাৰ্থলব্ধিৰ বাবেও বহুত ব্যাপক ভাবে যোগ্য কৰিয়া দিয়াহেঁতেন; কেই
অৰ্থক হ’বগৈ, কেই বিদ্যুত কৰিয়াহেঁতেন, কেই নিবেশ কৰিয়াহেঁতেন; কিন্তু
ধৰ্মপুত্ৰৰ পালে সেয়ে লোক হুজু; বাৰ্ণাল বাবু কীৰ্ত্তন কৰা
কৰ্মপাত কৰেন নাই।

সেই একবার কাঁচাকাঁচ, আর কোণাখোঁচের বাপাখানী।
গজাঘর বাগানী 'বাগাব'। বল্লভের মাথার পুঁচ বাজাইয়া
শ্রদ্ধা সে সাব-অফিস চঠিতে ডাকের বাগ লইয়া ত্রাঙ্ক-অফিসে
যায়। এই গজাঘর বাগানী কতিল ঘোঁড়ের কাজ, অবশ্য গজাঘরে;
সাব-অফিসে সে গজা কবিল যে, ত্রাঙ্ক-অফিসের সজীর বদু মেয়ের
বিয়ের পর খুঁজিতেছেন—মেয়ের বয়স মাত্র চল্লিশ; আর, ত্রাঙ্ক-
অফিসে সে গজা কবিল, সাব-অফিসের বাপাখানী বদু পুত্রের জন্য
পাত্রী খুঁজিতেছেন—ছোলের বয়স মাত্র তেরো।

इन्द्राय नमः । आत्मा कर्मिणा स्मर्यते विनाश इत्येव वा, ऐक्य भक्त्यै
नाशायित—गणाय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः ।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—কেমন হবে বলে দেখি—আনন্দে
 তাঁর গলা ধবিস্বা আসিল।

दाशरथि वादः तज्जिज्ञान, — सङ्घेन वादः...

—শির আর সতী।—ঐ তুলনা বেওয়ার্ধ বর্মীর উপর, অর্থাৎ
লক্ষ্মীকায়ার উপর 'টোকা দেওয়া' হইয়াছে, মান করিয়া শুভীলা-
সুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—কি বল হার ভেবেই
আমার বুক চুচু করছে শিশু-বাত। যাওয়া ঘুম আমার এক বকম
নেই। বউদোক, সেই সঙ্গে যেয়েকটা চিরদিনের ভাবে যবে গিয়া
পাবে। আমার বে কি করতে ইচ্ছা হচ্ছে তা' আমি জানিনে।—

রাখাল বাবু বলিলেন,—খুবই আনন্দের কথা বটে, কিন্তু মেয়ে-পক্ষ
টাকাকড়ি তেমন খরচ করবে না। জামি হু। অবস্থা ভালো নহু।

করতে পারবে না। ছোট ছোট বক-কনের খেবড়া কম কমা
কিরণের কিরণে বড় বড় স্তোমার মায়ায় কিছু কিছু মিল
কেনেছেন বটে; কিন্তু আয়াকও এত হবে মেলা। সত্যিকার
জবাব দেবে? স্তোমার কি মত?

—এই ন্যাকামি তক হ'ল। আমাৰ মত আমি বুজিছো যেই
না কি যে টোনে বাৰ কহেচৈ চাইছে। সেয়ে দেখাওঁ যাবাৰ দিন
কবে চিহ্নি লিখে যাব।

সত্য মাহের কানে কানে বলিল,—যেহেতু বা কখনো তাঁর বিধ
আমি পছন্দ করবো না।

—कि सत्यम् ?—राधाजी वात् सोऽस्यैव ज्ञानिनाः प्राविशन्तः ।

—কালো ঘেঁষে পছন্দ করবে না। 'চাঁ' হোলেও কালো হয়
না। গাভীর মনেছে, ঘেঁষে পাবে শুধুই — বড়ি! চট্টোপাধ্যায়কে
বিলম্বিত করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বাখাল বাবু বলিলেন,—প্রকৃত স্তিতি ভক্ত আত্মারের বাবু বিখ্যাত
 প্রেমিক। আমার বিয়ের সময়ে গোমায়ের কত বাগদান করেছিল
 মনে আছে।—বলিয়া বাখাল বাবু তখনকার কথা বলিলেন। ততক্ষণ
 আর নিরানন্দ—কি শ্রবণ করিয়া কুহকতার আনন্দে বাগদান
 লাগিলেন।

ନାକ ହୁଲିକା ଅଧିନାୟକର ବଲିକେର,—ତା' ଆସନ ଉପ-
 ଖାଲିରେ ହୁଲେଇଲ । ବଡ଼ ଧାମା 'ତ' ବସେ' ଲାଲ ।

पुनिया सागल बापु बलिदान—आपका मान्य पुत्र हुन्ने
 किलम, शैकुमार नाम हिल किलमिया; कलम सागल किलम।
 कलम कलम कलम शैकुमार ना कि किपु निम सागल कलम
 गिराविलम। किशु बापि—

—हृषि हिहि लोचकः । दातु, दातु लोचकः ॥ १० ॥
लोचि लोच' भिन्-भिन् शिक कच' लोचन ।

—আ, যেহেতু জেয়ার জিন একটা ঠিক করিল।—বলিও হইল
দাঁড়িত কিরিয়া কাঁড়াইয়া রাখাল বাবু পুর সত্যনিষ্ঠকে সত্য করিয়া
বলিলেন,—সত্য, সত্যকথনো করিসু বাবু মন চিরে। দাঁড়িত পলাই
দাড়ে। আমার ছেলে হইবে যদি সূর্য হইবে থাকো, আর, হেঁচকিগায়ে
খোঁচ খিচ না পাছো তবর সে বড়ো জেয়ার কথা হবে। হেঁচকি
সত্যনিষ্ঠ দাঁড় নাড়িয়া বলিল,—হেঁচকি।

“যদি সকল বৃত্তির অমূল্যত্ব মনুষ্যের পক্ষে হয়, তবে শারীরিক বৃত্তির অমূল্যত্বও অবশ্য বহু। কিন্তু সে কথা না হউ, জাতিরা লও। সোকে সভ্যতার বাহ্যকে বহু বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রসিদ্ধি বহু গ্রহণ কর, তাহাশি দেখিবে যে শারীরিক বৃত্তির অমূল্যত্ব প্রত্যক্ষময়। যদি বাগবহন ব্যতীত কোন বিদ্যাকলাপকে বহু বলে, যদি চরা চরময়।

সোভিয়েট সিনেমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সৌভাগ্যে সম্পর্কে বীরা কিছুমাত্র খবর রাখেন, তাঁদের কাছে অধ্যাপক ইসেনষ্ট্রিনের নাম অজানা নাই। তিনি নিয়োগের সেই স্থানে 'অর্ডার অফ সেনিন' লাভ করেছেন—সিনেমা-র মধ্যে নৃতন প্রদর্শনা, প্রোগেশিয়াল ও প্রভোজন্যের নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর মননি কবে। চায়াছবির উৎকর্ষ সাধনের কথা চিন্তে আজকের এ ইসেনষ্ট্রিনের নাম চলিউডেও প্রচার সত্তে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

নে কি, একবার সেখানে প্রভোজন্যের কিছু কাজ হাতে নেবার হ সময় আমন্ত্রণ ও সনির্ভুক্ত অনুরোধ তাঁর কাছে এসেছিল—নি সেখানে পদার্পণও করেছিলেন, কিন্তু মাতৃহত্যার জীবনের তি ইসেনষ্ট্রিনের যে দৃষ্টিভঙ্গী, তাকে চলিউডে প্রচার ও বিশ্বাসের ই চলেও আবেদিকার পুঁজিপতি-প্রভাবিত জিরোবাসটায়ের পক্ষে কে কাজে লাগানোর শুরিমা চল না। তবু আমন্ত্রিকা বা প্রত্যয় দেশের প্রত্যেক স্থানেই চিরন্তন সম্পর্কে ইসেনষ্ট্রিনকে চলিউ প্রচার সত্তে বীকার করে থাকেন।

হিনি এক উদাহরণ করছেন,—We say that the screen of all arts the most popular in the Soviet Union not for the sole reason that it attracts millions of people to the picture theatres but because of the great public interest displayed during the actual production of films. অর্থাৎ চলচ্চিত্র ইন্ডেস্ট্রিতে সব বকম চাকরকার মতো ছাত্র-ছাত্রী হোক সব ইতিহাসবিদ, লোক-লোক নব-নবী যে কার প্রতীতি হোক একমাত্র ইতিহাসবিদ নয়—যখন বসন্ত; ছবির প্রযোজনা হচ্ছে তেই সমস্ত প্রকৃতি সর্বস্বাধীনভাবে যে উৎসাহ-মত্ত তারা যার কণ্ঠে উঠে। সেন্সিটাইভ এই কথাগুলির মধ্যে দুটি বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে জ্ঞান করা প্রকার,—“most popular” এবং “great public interest displayed during the actual production,”

এটা অবশ্য অতি সত্য কথা যে, আমাদের দেশের রাজনীতিক দলগুলির শোচনীয়তাই একমাত্র কারণ যার জন্য আমাদের দেশে হায়াছবি সোভিয়েটের মত জনপ্রিয় হতে পারে না এবং বহুতর : পক্ষে তার প্রয়োজনার সমর্থও সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে যত নড়োয়ও প্রচোপ-পরিচা জনসাধারণ প ছাড়া বসে তাও মনে হয় না। কিন্তু টীমার্ক মুযোগ-পরিণাম মধ্যেও আমাদের মনোভাব তার একান্ত পরিণত না হলেও অনেকটা বিবোধী বটে।

ইসেনবার্গ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন—যদিও কাগজে
যখন 'হ'ল যে তাঁর 'ডিও থেকে 'আলোকবর্ত্তার নেতৃত্ব'ের
ছবি তোলায় কাজ শুরু হবে, তখন সমস্ত সমস্ত লোক তাঁর কাছে
এমন অনেক প্রস্তাব লিখে পাঠালে যাতে তাঁর কাজে খুব সাহায্য
হবেছিল এবং চিত্রিত অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যও অনেকে
পাঠালেন। মূল তথ্যের সন্ধান তিনি কোথা থেকে পেতে পারেন,
ভক্তি তাঁরা জানালেন। এইটাই একমাত্র উদাহরণ নয়—জঙ্গ
প্রবোধকবোও জনসাধারণের কাছ থেকে সমভাবেই সাহায্য পেয়েছেন।
Vassiliev Brothers (প্রবোধক) Chapayev ছবি
তোলায় সমর Michael Romm (মাইকেল রম) Lenin
তোলায় সমর ১৯১৯ সালের সমরও এমনি সাহায্য

প্রতিপক্ষের দল, এবং যারা অন্তর্বিব্রাহে যোগ দিয়েছিল তারা, তাদের পোক্তনামা ফটোগ্রাফ, এবং অস্বাভাবিক কাগজপত্র পাঠিয়ে দিল—যাতে সোভিয়েটের প্রথম বারিকী শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ আছে। এই ভাবে ছবিই মাল-মশলা আপনা হতেই ঠুঁয়োতে এসে জমা হতে লাগল। এদের মধ্যে আবার অনেকে মস্তান্ত্রে নিজে এসে, প্রযোজক, প্রযোগ-শিল্পী, চিত্রশিল্পী এবং মঞ্চসজ্জাকর প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে গিয়েছিলেন। সাধারণতঃ চারুকিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাতে এ ব্যাপারে খুব আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই। সোভিয়েটের চিত্রকলিতে প্রযোজকেরা, শিল্পীরা, লেখকেরা জনসাধারণের কাছ থেকে প্রতিদিন চারি দিক থেকে যে অসংখ্য চিঠি পান তা থেকেই এ কথা বেশ বুঝা যায়। পশ্চিমের চিত্রতাবকারা বস্তু বস্তু চিঠি পান, তা আমরা জানি, কিন্তু তার অধিকাংশই বিহীন সপ্রশংস অমুরাগী-মহল থেকে। কিন্তু সোভিয়েটের অসংখ্য চিত্রতাবকারা লুবা অলভা তার প্রশস্তি ছাড়াও অমুরাগের বহু চিঠি পেয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন লোকের স্তন্যে গেলে যে তিনি Volga Volga ছবিতে ডাক-পিয়নের অভিনয় করবেন, তখন সাগা দেশ থেকে, যে সব মেয়েরা সত্য সত্যি ঐ কাজ করছেন, তাঁরা নানা বকম উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করে দিলেন। কেমন করে ঐ অংশের অভিনয় করবে ঠিক স্বাভাবিক হবে, এমন উপদেশ দিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। হর্ভাভা সেই সব উপদেশগুলি বিশেষ ভাবে প্রাধিকার করে নিজের ভূমিকাসঙ্গে আয়ত্ত করত লাগলেন। এমনি ভাবেই তিনি কাগখানার মজুরাণির ভূমিকাতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন।

জনসাধারণ ছবি তোলার ব্যাপারে যে কি ভাবে সাহায্য করে ও যত্ন নেয়, তার একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত ইসেনহ্রিন দিয়েছেন। আর্থষ্টাম যখন কিছু দিন আগে Friends নামে একটা ছবি, —সোলিস্টিটের জনসাধারণের মধ্যে সস্তার ও মৈত্রীর উৎকর্ষ-সাধনের জন্ত তৈরী করছিলেন তখন তাঁর একটা দৃশ্যের পরিকল্পনা ছিল যে, মিসেস্‌ই পাথারডায়ের সাহায্য করার জন্ম সোলিস্টিট সৈন্তেরা আশ্রয় এবং হোয়াইট গার্ডস্‌দের একেবারে বিধ্বস্ত করে দেবে। যখনই কোনো দৃশ্যে বহু লোকের প্রয়োজন হয়, তখন সোলিস্টিট জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে সাহায্যের জন্ত এগিয়ে আসে। এবারও তারা হল। তারা ঘোড়ায় চড়ে মলে মলে আশ্রুতে লাগল। সামরিক সাজসজ্জায়—তাঁরা অভিনয়ও করলে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যখন প্রাণোক্ত অহুরোধ করলেন, এক দলকে হোয়াইট গার্ডস্‌ অংশ সোলিস্টিট থেকে ৬০ পক্ষ সাজতে হবে, তখন তাদের সেই অস্বাভাবিক অতীতের কথা শ্রবণ করে, তারা আর কিছুতেই তাতে রাজী হ'ল না।

এর পরই ভারী মজার ব্যাপার ঘটল। যখন রডে আশি
আক্রমণ করতে গেল, বাবা দর্শকরূপে সেখানে দাঁড়িয়েছিল—সেই সব
কৃষক ও কৃষিব্যবসায়ীর মল কাবো নিদেশের অপেক্ষা না রেখেই
শক্রনিপাতের জঙ্ক বহুপরিবর হয়ে ঘোড়সোয়ার-সৈন্যদের পিছু পিছু
আক্রমণ চালাতে লাগল প্রবল উৎসাহে—তাদের উৎসাহিত করে
চারি দিকে জয়ধ্বনিও উঠতে লাগল। খুব realistic হ'ল বটে, কিন্তু
দোষভাজককে আবার ঢেলে সাজতে হল।

কটিল ডাঙ বেল উল্লেখযোগ্য। যে দৃশ্য বেল পার্শ্ব ও সৈকত
জায়ের শীত-প্রান্তর বিস্তৃত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সে বিন যাবে
ভরপুর শীত। দ্বারা এই দৃশ্য ছবিলা এই করেই তাদের জন্য
আত্মন চালিয়ে রাখা হয়েছে এক এক জনকে সেই আত্মন অনিবার্য
রাখার নিযুক্ত করা হয়েছে। সফলতমনি করার সঙ্গে সঙ্গে সৈকতের
আকর্ষণের জন্য ছুটে চলে প্রত্যেকের—কিন্তু প্রত্যেককে বিজিত করে
সেবেলেন, সকলের আসে ছুটে চলেছে সেই বৃষ্টি অস্বস্তিক প্রেক্ষাপট।
সমস্ত দৃশ্যটি ঘটি হয়ে গেল। প্রত্যেককে প্রেক্ষাপটকে বিজিত
করলেন—যাগার কি? সেই বৃষ্টি উত্তর দিলে—“I couldn't help
it. I took a hand when the Winter Palace was
really captured.”—আমি কি করব? বন্ধন শীত-প্রান্তর দখল
করা হয়েছিল তখন যে আমিও তার মধ্যে ছিলাম। সোভিয়েটে
বন্ধন ঐতিহাসিক ছবি বিরাট পরিকল্পনায় তোলার ব্যবস্থা করা হয়,
অথবা জনতা বা জনবহুল দৃশ্য অর্থাৎ বিপুল সৈন্যসামর্যের দৃশ্য
তোলার ব্যবস্থা হয়, তখন তাতে যেমন পাওয়া যায় অস্বস্তিক নবন্যার
স্বতন্ত্রত্ব সন্ধান, তেমনি রেড আর্মির অস্বস্তিক সুরক্ষিত
সৈন্যের সাগ্রহ উপস্থিতি। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাধারণ সৈনিকের
অথবা সেনাপতির এ বিষয়ে বিশেষ বস্তু ও উৎসাহ দেখতে পাওয়া
যায়। রেড আর্মির অস্বস্তিক সৌরবাহিনী, তাদের বীরত্ব ও সাহস
প্রকাশক ছবিকার অংশ গ্রহণ করতে তারা সর্বদাই আগ্রহ প্রকাশ
করে থাকেন।

এই ত গেল জনসাধারণ কি ভাবে ছায়া-ছবি তোলার বিষয়ে
হস্ত নেয়, সাহায্য করে। কিন্তু ছবি বন্ধন সত্য সত্যই পক্ষের উপর
মুক্তিলাভ করে, তখন ছবিগুলি প্রশংসার যোগ্য হলে যেমন তারা
প্রশংসা করে—নিশ্চয় কিছু থাকলে ভীতভাবে নিন্দা করতেও
বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তারা ভাবে, এ বিষয়ে তাদের
নিজের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। প্রশংসা বা নিন্দা করার অধিকার
আছে প্রত্যেক সোভিয়েটের অধিবাসীর।

সোভিয়েট জনসাধারণের মধ্যে এই একত্ব-বোধ এবং পারস্পরিক
যোগাযোগই সমগ্র জাতকে একত্বের বেঁধে রেখেছে। সোভিয়েট
গভর্নমেন্ট যেমন চারুকলায় পৃষ্ঠপোষক তেমনি শিল্পীদের প্রতিভার
বিকাশ কি করে হতে পারে—কি সুযোগ তাদের দেওয়া
করকার, তার জ্ঞাত তারা সর্বদা অবহিত। ফিল্মের আবশ্যিকতা
স্বতন্ত্র তারা বিশেষ সজাগ এবং লেনিন থেকে আশ্রয় করে ট্যালিন
পর্যন্ত সকলে ফিল্মের উন্নতির জন্য ঠেঁই থেকে প্রচুর সহায়তা করে
এসেছেন। সমগ্রতর দিক থেকে ছায়া-ছবি সোভিয়েট জনসাধারণকে
সর্বদা সঙ্গাণ রেখেছে। উৎকৃষ্ট ছবিগুলির হাজার হাজার সংগ্রহণ
করে সারা দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শুধু সহজে নয়—গ্রামে গ্রামে,
ক্ষেত-খামারে, ক্লাবে, সেনানিবাসে, এমন কি, নৌ-বাহিনীতে
এবং সাধারণ সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে। জাম্যান বস্তু ও যন্ত্রের
সাহায্যে ছায়া-ছবির এই সুবিধিত প্রশ্রয় সেখানে সম্ভব
হয়েছে—আর সম্ভব হয়েছে ট্রেটের প্রধান লক্ষ্য আছে বলে যে কি
ভাবে জনসাধারণের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণ সাধন
করা যায়। “They show films in the most remote
corner of the country, the Siberian forests, the

Turkmenia and Tajikistan and the auls (native
villages) of Kazakhstan.” আরো উল্লেখ—জাম্যানপোতের
সাহায্যে ছবি সংগ্রহ করা হয়, সেখানে বহুতর মনো ছবি বা
বহুতর সহায়ক আশ্রয় স্থান তৈরি করে রাখা হয়। জাম্যান
নিবেদ্য-সহায়ক আশ্রয় সোভিয়েট সাহায্যেই প্রদান করা হয়।

জনসভা সেদিন ও ট্যালিন যে ছবিতে আছেন, সেই ছবি
সোভিয়েটে সব জায়গাতে বন্টন। এ সম্বন্ধে Lenin in October,
Lenin in 1918, The Great Dawn, The Man with
the Gun-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েট পশ্চিমের নামজাদা চিত্র-ভারকাদের খুব ভালবাসে।
চার্লি চাপ্লিন ওখানে খুব জনপ্রিয়। তার পক্ষাণ্য জন্মদিন
সোভিয়েটে খুব সাজা পড়েছিল। ১৯১১ বর্ষটিকে ইংল্যান্ডের কলেজ
—Twenty years ago, encircled by a ring of
enemies, exhausted by blockade and famine,
the Soviet country began to develop its motion
picture industry. The first Soviet films were
made in unheated studios by half-starved
people, whose enthusiasm made up for the
shortage of apparatus, film and other accessories.
অর্থাৎ বিশ বছর পূর্বে শত্রু-শত্রিত্ব অবস্থার, দুর্ভিক্ষ, অবস্থার অবসর
সোভিয়েটে তার চিত্র-শিল্পের উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। প্রথম
সোভিয়েট-চিত্র তৈরী হয়েছিল উত্তর-বাহিনী টুডিওতে তারের দ্বারা,
যারা অর্ধাংশে দিন কাটিয়েছে—কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সব কিছু
অভাব পূর্ণ হয়েছিল তাদের অদম্য উৎসাহের চারা। সেই প্রথম
চিত্রটি তৈরী হয়েছিল আন্দোলন-মূলক—যারা সমুদ্র সময়ে নিযুক্ত
তাদেরই জন্ত—সেই গৌরবময় দিনের ধরনগুলি তাতে থাকত—
সেগুলিকে এখন মহামূল্য সম্পদ হিসাবে ট্রেট করা করা হয়েছে—
তাতে মুদ্রিত হয়ে আছে স্বাধীনতা ও মুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত জনগণের
অপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস।

এখন মস্কো, কিয়েভ, মিংকস্, লেনিনগ্রাড এবং আরো
অনেক জায়গায় ভাল ভাল টুডিও স্থাপন করা হয়েছে। সংবাদ-
সরবরাহক ফিল্মের ব্যবস্থা সকল সহজেই আছে। আশ্চর্যের বিষয়
এই যে, সোভিয়েটের শাসনাবধি হয়ে অল্পশীঘ্র প্রদেশগুলিতে ফিল্মের
যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। ইউক্রেন, জর্জিয়া, বাইনো-
ক্রিয়া, আর্মেনিয়া, আজেরবাইজান, তুর্কমেনিয়া, উজবেকিস্তান,
টাজিকিস্তান প্রভৃতি প্রদেশের লোক তাদের নিজের নিজের ভাষায়
ছায়া-ছবির অতি স্বাভাবিক সংলাপ শুনেতে পারে।

মস্কোতে ছেলোদের উপযোগী ছবি তৈরী করার জন্য বিশেষ ভাবে
টুডিও স্থাপন করা হয়েছে। সে সব ছবির আদর্শ শিক্ষামূলক
হওয়াতে ছেলোদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হয়েছে। ছেলোদের মধ্যে
যিনি ছবিতে নামেন যেমন স্কুলের ছেলে—জ্যাকবিন শিশু ম্যাকসিম-
গোর্কির ছবিকার নেমেছিল Among men ছবিতে। তাকে “শিশু-
প্রতিভা” বলে পড়া-শুনা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি এবং স্কুলের পড়াশুনায়
খুব ভাল ফল না করলে তাকে আর ছবিতে নামতেও দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক, প্রত্যেকশিল্পী ও চিত্রনাট্যলেখক সকলের শিক্ষার
Institute of

ematography)। সেখানকার শিক্ষা অবৈতনিক—
ন শিক্ষা অবৈতনিক সোভিয়েটের আর সব শিক্ষালয়ে, কলে ও
দুর্গ। কং বিক্ষোভের নিমিত্ত বৃত্তি পেয়ে থাকেন সোভিয়েট
দেশেও থেকে। চিত্রশিল্পের মধ্যে গীরা বাস্তবিক হিসাবে কাজ করেন,
রা শিক্ষালাভ করেন লেনিনগ্রাদের আর এন্ট শিক্ষালয়ে। তৃতীয়
কণাগারী ছাত্রশিল্প সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণায় নিযুক্ত আছে
হাড়ে।

চিত্র-শিল্প-কণ্ডের আর ২০০ জন লোক সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ
রান Order of the U-S S-R পেয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা
লজাকে Order of Lenin ও Order of the Red Banner
Labour এর সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

চিত্রকলপতে গীরা প্রেসিডেন্সি লাভ করেছেন, তাঁরা কিছু বয়স
প্রবীণ নন। তাঁদের গড়পড়তা বয়স চল্লিশের নীচে। ম্যাক্সিম
গোর্কির জীবন সম্পর্কে তিনটি ছবি তিনি তুলেছেন—বিশ বছর
বয়সে সোভিয়েত আগের তিন ছবি বাকি আরম্ভ করেন।
প্রয়োজক ইবার্স যখন The Blue Express নামে বিশ্ববিখ্যাত
ছবিখানি তুলেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দুই; এর
কারণ অধ্যাপক ইসেনট্রিন নিষেধ করে বলেছেন—“This is
because our young scenario writers, actors,
and producers easily receive opportunities to
display and develop their talents.” কিন্তু পরাধীন
দেশে সে সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া আমরা এ দেশে তখন

প্রবীণ সবাই অত্যন্ত সহজে এবং সহজাত কৌশলে পৃথিবীর
বা-কিছু জেনে ফেলেন বৃহত্ত্ব হয়ে বসে আছি—কি প্রয়োজনীয়,
কি প্রয়োগশিল্পে, কি চিত্রনাট্যরচনায়, কি বাস্তবিক বক্তব্যের
আমরা একেবারে দুরূহ। বাস্তব দিকটায় প্রতি বহি তাঁদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, এই উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।
আরো একটা জ্ঞাতব্য কথা—অধ্যাপক ইসেনট্রিন বলেছেন—The
virtue and significance of Soviet Cinematography is that it gives a true portrayal of
life in our Soviet country and has really
become, of all arts, the closest to the masses,
that it is actively contributing to the further
consolidation of our new system of society,
that it has a great formative influence on the
minds of the Soviet people. অর্থাৎ সোভিয়েট সিনেমা
যে ধরণে সার্থক হয়েছে সেটা খুব প্রাথমিকযোগ্য। সোভিয়েটে
মহানুভবের জীবনের সত্যিকার ছবি ফুটিয়ে তোলে সোভিয়েট ফিল্ম,
এবং সব-রকম শিল্পকলার মধ্যে চিত্রশিল্প জনগণের একেবারে
নিকটে এসে পৌঁছে গেছে, সোভিয়েট সমাজের নতুন ব্যবস্থাকে
স্থিতি করার কাজে সোভিয়েট সিনেমা নিযুক্ত আছে এবং আরো
একটি কারণ এই যে—সোভিয়েটে জনসাধারণের মনকে গড়ে তোলার
দিকে এবং প্রভাব অপরিমিত। এ মূল্যবান কথাটির উপর মন্তব্য
নিম্নরোজন।

—স্বগতোক্তি—

গোপাল ভৌমিক

পৃথিবীতে বার বার আমাদের পরাজয় হল;
মুছে নিয়ে ছল ছল
দুটি চোখ, তবু ত আমরা চলি—
এক রাজি শেষ হল—
আর হাড়ে অমগ্নই বলি।
দিন কাটে, রাতও কেটে যায়—
সময়ের পাখায় পাখায়
আমরাই তবু ছুটে চলি—
কোথায় লাইভ, স্ট্রীট—
কোথায় বা ইয়ালটার অঙ্ক সোঁাল গলি।

প্রাত্যহিক কাগজের পাতার পাতায়—
সংবাদের ছড়াছড়ি;
প্রতি পৃষ্ঠা ভরে ওঠে
আমাদেরই জীবন-পাখায়।
পৃথিবীর কোন প্রান্তে
কয় নেতা বসে—
আমাদের ভাগ্য গোপে ছক কেটে কলে।

আশা নিয়ে বসে আছি ঠায়—
লাইভ, স্ট্রীট, বাস চলে যায়।

এ নতুন বাহুবলী—
পূর্ণাঙ্গ নতুন তবু নয়;
অলঙ্কারে পুরানো দিন হাসে—
সেই তার হারাবার ভয়।

এ এক মজার অঙ্ক, মন্দ নয়—
ভাগ্যের এ খেলা;
এ দিনের এত মৃত্যু এ রক্ত-সকল—
সব ভাবে বুঝা হল।
মহানুভবের সনাতন ভয়—
থেকে গেল আগের মতন—
পুরাতন পৃথিবীতে
এ নতুন শাসন-শোষণ
আগের মতই চলে;
মৌলিক নীতিতে ভেদ কই?
গাছে বারা তুলে দিল—
তারাই ত কেড়ে নিল মই!
খণ্ডিত সময়ে তবু—

কয়েক দিন ধরে প্রতি সন্ধ্যা আমার থিয়েটারে কাটাচ্ছি। আজ, এখানে, কাল ওখানে।

আমি তবু বসে থিয়েটার দেখি, রামানুজ তাও দেখে না। ঠেঙে গিয়ে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে গল্প করে কাটায়। ঠাট্টা, ভাষা, পান, সিগারেট আর চা।

এক দিন আর থাকতে না পেরে রামানুজকে জিজ্ঞেস করলুম—“কি করছ? রোজ রোজ এই ভাবে সময় নষ্ট—”

বাধা দিয়ে রামানুজ হো হো করে হেসে উঠে বললে—“থিয়েটারে বই চালাবার চেষ্টা করছি। কেউ আমলই দিতে চায় না। ভারী শক্ত কাজ।”

বিরক্ত হয়ে বললুম—“তা হলে আমি আর এখানে থেকে কি করব? নিত্য সন্ধ্যার সময় থিয়েটারে বসে থাক। আমার ভাল লাগে না। এসেছিলাম অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে, তা তোমার প্রতিগতি দেখে তো মনে হচ্ছে যে সে আশা দুর্ভাগ্য মাত্র। ত্রিমূর্তি ছেড়ে এখন তোমার থিয়েটারে পেয়েছে।”

“আমায় কি করতে বল?”

“কাজ করতে বলি। ত্রিমূর্তির ব্যাপারটা যদি বাজে হয়, অস্ত্র একটা কিছু আরম্ভ কর।”

গম্ভীর হয়ে রামানুজ বললে—“ত্রিমূর্তির ব্যাপারটা বাজেও নয়, সাজাও নয়। সেটা ছেড়ে অস্ত্র কাজে মনোনিবেশ করা চলেবে না।”

আমি রেগে বললুম—“সে কাজই বা করছ কই?”

রামানুজ হেসে বললে—“সেই বাজই তো করছি। আচ্ছা, ত্রিমূর্তির মহেশ্বরকে তো ক’বার দেখলে। চিনতে পার?”

কোন উত্তর দিতে পারলুম না। মাথা চুলকোতে লাগলুম।

রামানুজ বলে চলল—“চিনতে পার না। কেন? কারণ, তার ছদ্মবেশ নিখুঁত।”

আমি বললুম—“তা ঠিক।”

“কি ঠিক?” রামানুজ প্রশ্ন করলে। “ছদ্মবেশ নিখুঁত হলেও বিচক্ষণ লোকের চোখ এড়ানো শক্ত। এসব থেকে কি প্রমাণ হচ্ছে?”

“লোকটা ছদ্মবেশ ধারণে পটু।”

“পটু তো বটেই, কিন্তু তা ছাড়া আর কি জানা যায়?”

“লোকটা ক্রিমিডাল।”

বিরক্ত হয়ে রামানুজ বলে উঠল—“না, না। এ থেকে আমার বুঝতে পারছি লোকটা খুব ভাল এক জন অভিনেতা। যে ছদ্মবেশ সে ধারণ করে, সে পার্টের সঙ্গে সে নিজেকে এমন ভাবে মিশিয়ে ফেলে যে কারো বোঝবার বো নেই, সেই পার্ট ছাড়া তার আর কোন ব্যক্তিত্ব আছে।”

তাছাড়া আর আমি বললুম—“না হয় স্বীকার করা গেল, সে এক জন বড় অভিনেতা, কিন্তু এই আবিষ্কারে লাভটা কি হল?”

উত্তেজিত হয়ে রামানুজ বললে—“লাভ বিলক্ষণ। সে এক জন অভিনেতা। কোন না কোন সময় ঠেঙে অভিনয় করত। কিছু দিন বাবং করছে না। খুঁজে বের করতে হবে।”

“কি করে?”

“কিছু গিয়ার এবং লোক দিয়ে তাদের নাম, চেহারা,



[চাকল কর উপভাস]

শ্রীকান্তনীর রায়

* কেউ চাকরী নিয়েছে, কেউ ব্যবসা করছে। মাত্র তিন জনের কোন রকম পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এরা বেন হঠাৎ এক দিন ঠেঙে পরিভ্রমণ করে কপূরের মতো হাওয়ায় মিশিয়ে গেছে।”

প্রশ্ন করলুম—“এই তিন জনের মধ্যে মহেশ্বর বলে লোকটি কে, বুঝে কি করে?”

রামানুজ হেসে বললে—“খুব শক্ত হবে না বন্ধু। সব ভেবে-চিন্তে কাজ করছি। মহেশ্বরকে যত বার দেখলে প্রত্যেক বাহই তার নতুন চেহারা। এক বার গীত উঁচু, এক বার সামনের গীত ভাল, এক বার সুন্দর সাজানো গীত। তার মানে কি?”

“মানে বাধানো গীত।”

সেংসাছে আমার শিঠ চাপড়ে রামানুজ বললে—“ঠিক বলেছি। বাধানো গীত। এখন খোঁজ করতে হবে, এই তিন জনের মধ্যে বাধানো গীত কার ছিল। আজ সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। জানো বোধ হয়, আজ ‘কসমোপোলিটেন’ জুবিলী উৎসব। বত নট-নটী সকলকেই কর্তৃপক্ষরা নিমন্ত্রণ করেছেন। তার পর যদি ভাগ্য থাকে, কথায় কথায়—বুঝে কি না। নাও, তৈরী হয়ে নাও। সময় হয়ে গেছে।”

রাতে বাড়ী ফেরবার পথে রামানুজকে খুবই প্রসন্ন দেখলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে পারলুম না। অবশ্য অভিনয় খুব ভালই হয়েছিল আর কর্তৃপক্ষরা খাইয়েছিলও দিয়া, কিন্তু রামানুজের ভাগ্যে দু’টোর কোনটাই বিশেষ জোটেনি। স্নেহ চরকির মত সে এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়িয়েছে। আশা করেছিলাম, সে নিজেই প্রসন্নতার কারণ জানাবে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হ’ল না। শেষ পর্যন্ত কোতুলক দমন করতে না পেরে নিজেই প্রশ্ন করলুম—“ব্যাপার কি? আজ এত খুশী কেন?”

রামানুজ বললে—“এতদিন পরে আজ আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। মহেশ্বরের সন্ধান পেয়েছি।”

উত্তেজিত হয়ে বললুম—“তাই না কি? কোথায় সে?”

নিশ্চয় কণ্ঠে রামানুজ উত্তর দিলে—“জানি না।”

ভয়ানক রাগ হল আমার। রাগ হবার কথাই। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললুম—“এ রকম উৎকট ঠাট্টার প্রয়োজন কি? নেশা-টেশা করনি তো?”

হেসে রামানুজ বললে—“আহা, রাগ কর কেন। ঠাট্টা আমি করিনি। আজ এক পুরোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা হল। সে মহেশ্বরকে চেনে। তার সঙ্গে মহেশ্বরের একটু প্রেম হয়েছিল। তখন মহেশ্বরের নাম ছিল কমল গাঙ্গুলী। অবশ্য কমল গাঙ্গুলী নামটা আমার লিটে ছিল। কিন্তু সেই যে মহেশ্বর তা জানতুম না।” প্রশ্ন করলুম—“জেনে কিছু লাভ হল?”

রামানুজ উত্তর দিলে—“না। নাম জেনে কোন লাভ হয়নি সত্য, কিন্তু তার আসল চেহারার বর্ণনা জানতে পারলুম। কাল সেই অভিনেত্রীর বাড়ী বাব। মহেশ্বরের আসল চেহারার ছবি তার বাড়ীতে আছে।”

আগ্রহে ভরা কণ্ঠে বললুম—“এটা জেনে অবশ্য খুবই সুবিধে হয়েছে—”

ভিন্ন করছে, অথচ কেউ তাকে চিনতে পারছে না। অবশ্য ছবি ধলে হয়তো কিছু লাভ হতে পারে। কিন্তু আমার মন প্রসন্ন হইল কারণে।

“কারণটা কি তুমি।”

“মহেশ্বরের মৃত্যুদোষের সন্ধান পেয়েছি। উত্তেজিত হলে সে মজের নাক ধরে টানে।”

হেসে বললুম—“নাক টানা দেখে মহেশ্বরকে ধরে ফেলবে। ধংকার যুক্তি।”

গভীর হয়ে রামাহুজ বললে—“হেস না। ঐ মৃত্যুদোষেই ধরা পড়বে মহেশ্বর।”

পরদিন সকালে উঠেই আমরা সেই অভিনেত্রীর বাড়ী গিয়ে পস্থিত হলাম। কিন্তু দেখানে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে চমুহ্বিত। নাকে লোকারণ্য। পুলিশ-অফিসারকে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল—“তবে কে এক জন এসে অভিনেত্রীকে খুন করে গেছে। অফিসারের কুম নিয়ে আমরা বাড়ীর ভেতর গেলুম। অভিনেত্রীর শোবার ঘরে গিয়ে রামাহুজ এ-দিক ও-দিক দেখতে লাগল। হঠাৎ টেবিলের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের বললে—“কান্ডিনি, এই দেশ ছবির ফ্রেম। ছবি নেই।” তার পর ফ্রেমটা উল্টে পাটে দেখে বললে—“দেখো, তিন লেখা রয়েছে। কি বুঝে?”

আমি বললুম—“বোধ হয় ছবির দাম তিন টাকা।”

রামাহুজ গভীর ভাবে বললে—“দাম নয়। ত্রিমূর্তির তিন নম্বর। মানে মহেশ্বর। সেই এসে খুন করে গেছে একে। আর নিয়ে গেছে নিজের ছবি। কি রকম স্পাই-সিটেম। ঠিক জানতে পেরেছে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি কি বুকব। আমার উচিত ছিল, অভিনেত্রীটিকে চোখে চোখে রাখা। দীপঙ্করকে বলে পুলিশ প্রোটেকশন নিলে হ’ত। আবার মহেশ্বরের কাছে আমি পরাজিত হলাম। কিন্তু এই শেষ। এইবার এ নাটকের শেষ অঙ্ক। আমার জীবন-পূর্ণ। হয় তাদের ধরব, না হয় সেই চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দেব।”

মনে মনে একটু হাসলুম। ত্রিমূর্তি যেন রামাহুজকে পেয়ে বসেছে। তখন কি জানি তার কথা একটু পরেই অন্ধরে অন্ধরে মিলে যাবে।

বাড়ী কিয়ে ঘরে ঢুকতে যাত্রি, হঠাৎ রামাহুজ আমার বাধা দিলে। বললে—“কান্ডিনি, দাঁড়াও। আমার যেন কি রকম একটা সন্দেহ হচ্ছে। আগে আমি চুকি।”

অতি সতর্কপণে ঘরে ঢুকে রামাহুজ এ-দিক ও-দিক চাইতে লাগল। আমি হেসে জিজ্ঞাস করলুম—“কি হে, সন্দেহ ভঞ্জন হল?”

রামাহুজ উত্তর দিলে—“কই, সন্দেহজনক তো কিছু চোখে পড়তে না।”

আমি বিদ্রূপ করে বললুম—“ত্রিমূর্তির চিন্তা তোমার পেয়ে বসেছে। রক্তকে সর্পভ্রম করছ।”

রামাহুজ গভীর হয়ে বললে—“সাবধানে মার নেই। রক্তকে সর্পভ্রম করা হাতকর হতে পারে, কিন্তু সর্পকে রক্তভ্রম করা

“ও সব দর্শনশাস্ত্রের কচকচিতে মরকার নেই। তার চেয়ে একটা সিগারেট ধরাই, তুমি চা আনতে বল।” এই বলে কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে টেবিলস্থিত দেশলাইয়ের বাজ নিতে হাত বাড়ালুম।

রামাহুজ চাঁৎকার করে উঠল—“কান্ডিনি, হাত দিও না।”

কিন্তু—টু লেট। ততক্ষণে বাজটার হাত দিয়েছি। তার পর—বোমা ফাটার মত বিকট শব্দ—চোখ ঝলকানো আলো—অন্ধকার—অন্ধকার—

যখন জ্ঞান হ’ল, চোখ খুলে দেখি নতুন জায়গা। কীপ ঘরে প্রাঙ্গ করলুম—“আমি কোথায়?”

আমার খাটের পাশেই ডাক্তার, নার্স সকলে দাঁড়িয়েছিলেন। এক জন নার্স আমার কাছে এসে নিম্ন স্বরে বললে—“হাসপাতালে।”

মনে পড়ে গেল দেশলাইয়ের বাজ বোমার কথা। উদ্ভাব হয়ে প্রাঙ্গ করলুম—“আর রামাহুজ?”

নার্স উত্তর দিলে না, ডাক্তারের দিকে চাইলে। আমি ভীত উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাস করলুম—“আমার কাছে লুকোবেন না। শীগগির বলুন, রামাহুজ কোথায়? কেমন আছে?”

একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেল ডাক্তার উত্তর দিলেন—“তিনি মায়া গেছেন।”

আমি আবার জ্ঞান হারালুম।

৮

অন্ধ হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরোতে প্রায় দিন পনের লাগল। তখনলুম, রামাহুজের মৃত্যুসংস্কারের ওপর পোর্টমেন্টে করা হয়েছিল, তার পর যথাবিধি সংস্কার করা হয়েছে। আমার বন্ধু বলতে কেবল রামাহুজই ছিল। তাকে হারিয়ে যেন সমস্ত জগৎ কাঁকা ঠকতে লাগল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য দীপঙ্কর আসে, কিন্তু রামাহুজের অভাব কি আর কেউ পূরণ করতে পারে। রামাহুজের বাড়ীতেই আছি। রোজ সন্ধ্যায় বাড়ীর কাছেই একটা পার্ক একটু বেড়াই। ডাক্তার বলেছে। এক দিন পার্কের বেঞ্চে বসে আছি, এমন সময় এক জন বৃদ্ধ আমার পাশে এসে বসল। তার পর একথা সেকথার পর আমার দিকে তিনটে আঙুল দেখালে। প্রথমটা আমি কিছুই বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে ঠাঁ করে চেয়ে রইলুম। কিন্তু যখন সে বললে—“আপনার বন্ধু বা পারেননি, আপনি কি তা পারবেন?” তখন বুঝতে পারলুম, লোকটা ত্রিমূর্তির চর। কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে এ-দিক ও-দিক চাইতে লাগলুম।

লোকটা বললে—“পুলিশ ডাকবার অথবা কোন রকম গোলামাল করবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন। রামাহুজ বাবু আপনার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য তাকেও সংসার থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আমি শুধু এই কথাই আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে, আর আমাদের সঙ্গে না লেগে ভালর ভালর পাটনা চলে যান। অনর্থক কেন পৈত্রিক প্রাণটা হারাবেন।”

রাগে আমার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। বললুম—“তোমরা মাহুজ নয়, পিশাচ—”

কথা শেষ করতে না দিয়েই বৃদ্ধ বলে উঠল—“আচ্ছা, নমস্কার।”

বুদ্ধ চল গেল। আমি শুধু হসে বসে রইলুম। তাকে অল্পস্বপ্ন করার চেষ্টাও বেন লুপ্ত হইবে গেল।

সকাল হতে না হতে হস্তান্তর হয়ে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত। বললে—“কান্তিনি, সর্বনাশ হয়েছে।” ত্রিমূর্তির খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে।”

বিমিত হইবে প্রশ্ন করলুম—“কি বলছ? একটি বর্ণও বুঝতে পারছি না।”

দীপঙ্কর হাঁকাছিল। একটু দম নিয়ে বললে—“রামানুজ বা বলেছিল ঠিক তাই ঘটেছে। কাল রাতে খবর পাওয়া গেছে, তিনটি গ্রামের সমস্ত শস্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। চমৎকার ফসল হয়েছিল। হঠাৎ সব বেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল।”

রামানুজের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললুম—“হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ত্রিমূর্তিগা না কি এমন এক কেমিক্যাল আবিষ্কার করেছে যাতে সমস্ত ফসল পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। খবরের কাগজের লোকরা এখনও জানতে পারেনি তো?”

“না। এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের কনসিডেনশিয়াল খবর।” এমন সময় খবরের কাগজ হাতে রামানুজের চাকর ঘরে ঢুকল। খুলে দেখি, প্রথম পাতার বড় বড় হেডলাইন দিয়ে এই খবর বেরিয়েছে। দীপঙ্করের হাতে কাগজটা এগিয়ে দিলুম। সে খবরটা পড়ে বিমিত হইবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—“কিন্তু এরা খবর গেলে কোথেকে?”

আমি জানি তেঁসে বললুম—“ত্রিমূর্তি নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না? তারাই নিশ্চয়ই কাগজওয়ালাদের খবর পাঠিয়েছে। আজ যদি রামানুজ থাকত।”

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—“আমি চললুম। একবার কমিশনের সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করি।”

ক’দিন পরে দীপঙ্কর এস। বললে—“কমিশনের সাহেব একটা মিটিং ডেকেছেন। কি করে এই নিশ্চিত দুর্ভিক্ষের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়, তারই কথা বার্তা, পরামর্শ হবে। তোমাকেও যেতে বলেছেন।”

প্রশ্ন করলুম—“কারা থাকবেন?”

দীপঙ্কর উত্তর দিলে—“অনেক বড় লোক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অবশ্য তাঁদের এখন মিটিং-এর উদ্দেশ্য জানান হয়নি। তুমিও যেও।”

বধাসময়ে মিটিং-এ গেলুম। অনেক লোক। বিমিত হইবে দেখলুম, শ্যামলদাস ও সার মোহন চাঁদ অগ্রওয়ালও সেখানে উপস্থিত। কমিশনের সাহেব ব্যাপারটা সব খুলে ব্যক্ত করে বললেন—“শুধু পুলিশের দ্বারা এর প্রতিকার সম্ভব নয়। আপনাদের সকলের সাহায্য প্রয়োজন। মিষ্টার শ্যামলদাসের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে। তিনি এই কাজের জন্য অর্থ-সাহায্য করতে প্রস্তুত। অবশ্য সরকারও এ বিষয়ে কার্পণ্য করবেন না। সার

নির্দেশ মত সেখানে এই উগ্র বিবের প্রতিবেদক আবিষ্কারের চেষ্টা করা হবে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে খোঁজ-খবর করবেন এবং স্যান্সল নিয়ে আসবেন।”

শ্যামলদাস সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন—“আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আমরা সফলতা লাভ করব।”

কমিশনের সাহেব বললেন—“আমারও তাই বিশ্বাস এবং আমি আশা করি, আপনারা যথাসাধ্য সাহায্যদানে বিরত হবেন না।”

এক জন বুদ্ধ পিছনে বসেছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—“আমি এই উগ্র বিবের প্রতিরোধ করতে পারি।”

সকলেই চমকিত হলেন। কে এই বুদ্ধ?

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনের প্রশ্ন করলেন—“আপনি কে? আপনাকে তো আমরা চিনতে পারছি না।”

বুদ্ধ হেসে বললেন—“না চেনবারই কথা। আমি নিমন্ত্রিত হয়ে এখানে আসিনি। তবে এ কাজের স্তম্ভ এত বেশী যে, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করতে পারলুম না। আপনারা তো সকলেরই সাহায্য চান? তাই আমি কর্তব্যবোধে এখানে এসেছি।”

কমিশনের বললেন—“ভালই করেছেন। প্রত্যেকের সাহায্যই এ কাজে প্রয়োজন। আপনি কি সত্যিই প্রতিরোধ করতে পারেন?”

দৃঢ় স্বরে বুদ্ধ বললেন—“হ্যাঁ, পারি। যারা এই বিষয় প্রয়োগ করে দেশে দুর্ভিক্ষ আনবার চেষ্টা করছে, তাদের আমি জানি।”

বিমিত হইবে কমিশনের প্রশ্ন করলেন—“জানেন?”

বুদ্ধ উত্তর দিলেন—“জানি।”

“কারা?”

“ত্রিমূর্তি।”

লক্ষ্য করলুম, শ্যামলদাস আর সার মোহন চাঁদের মুখ পাংশবৎ ধারণ করেছে। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রমাগত নিজের নাক ধরে টানাটানি করছেন।

কমিশনের সাহেব জিগ্যেস করলেন—“আপনার নামটা জানতে পারি কি?”

বুদ্ধ হেসে বললেন—“নিশ্চয়ই পারেন। আমার নাম রামানুজ।

এই বলে বুদ্ধ ছয়বেশ ত্যাগ করলেন। দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে রামানুজ। নিজের চোখকে বেন বিশ্বাস করতে পারলুম না। হু রামানুজ কি উপায়ে জীবন্ত হয়ে উঠল!

নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনের ক্রমাগত নিজের নাক ধরে টানাটানি করছেন।

সভাস্থল স্তব্ধ। নিশ্চল।

রামানুজ বলে উঠল—“দীপঙ্কর!”

সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর এগিয়ে গেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনের দিকে দেখা গেল, শ্যামলদাস, সার মোহনচাঁদ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশন প্রত্যেকের পিছনেই হুঁজন করে সার্কেলট দাঁড়িয়ে। হা রিভলভার।

রামানুজ গম্ভীর কণ্ঠে বললে—“সার মোহনচাঁদ ও শ্যামল ত্রিমূর্তির ত্রুটি ও বিহু। আর ঐ নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনের মহেশ্বর।”

এই সময় সার মোহনচাঁদ নিজের নাক ধরে টানাটানি করছেন।

রামায়ুজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—“টু লেট। তিন জনেই আত্মহত্যা করেছে! ধরেও ধরতে পারলুম না।”

কমিশনের সাহেবের কামরায় বসে কথা হচ্ছিল। রামায়ুজ বললে—“বোমা বিস্ফোরণে আমি আহত হয়েছিলুম সামান্যই। মরিনি। কিন্তু সেই সুযোগে আমি মরে নিলুম। চক্রান্ত জানলে কেবল তিন জন ব্যক্তি। হাসপাতালের ডাক্তার, কমিশনের সাহেব নিজে আর দীপঙ্কর। তারা রটিয়ে দিলে আমি মরে গেছি। একটা বেওয়ারিশ মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেম করে দাখ পর্যালোচনা করে দিলে।

“কিন্তু আমাকে এত দিন ধরে এই মনকষ্ট দেবার কি প্রয়োজন ছিল?” বিমর্ষ ভাবে আমি প্রশ্ন করলুম।

রামায়ুজ সহস্বে বললে—“উপায় ছিল না বন্ধু। তুমি অতি সরল। আমি বেঁচে আছি জানলে তুমি তো এমন ভাবে শোকার্ত হতে পারতে না। তোমাকে দেখে ত্রিমূর্তির দল কাঁজ করেছে। তাই তারা এমন ভাবে কাঁদে পড়ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরতে পারলুম না। কাঁকি দিল।”

কমিশনের সাহেব বললেন—“নেভার মাইণ্ড রামায়ুজ! এক দল ক্রিমিঞ্চালের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে—এই কি কম।”

• ‘Agatha Christie’র ‘The Big Four’ নামক উপন্যাস অবলম্বনে।

সমাপ্ত

ভারতের পোত-শিল্প

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে ভারতের অতি-তরুণ পোতশিল্প যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, আর কোন গতিশীল শিল্পেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সুতরাং যুদ্ধান্তে যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ করিয়া যাহাতে আমাদের জাতীয় পোত নিষ্পত্তি ও পোত-পরিচালনা-প্রচেষ্টা দ্রুত উন্নতি লাভ করে, তদ্বিষয়ে আমাদের পক্ষে ইহাতেই অবহিত হইতে হইবে। এই প্রচেষ্টা আমাদের যুদ্ধান্তের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টার একটি অতি প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট অঙ্গ। যুদ্ধান্তে যে মন্দা আসিবে এবং প্রচণ্ড বৈদেশিক প্রতিযোগিতার যেরূপ প্রাবল্য ঘটবে, তাহার নিমিত্ত এখন ইহাতেই আমাদের পক্ষে সতর্ক ও প্রস্তুত হইতে হইবে। এই নিমিত্ত পোতশিল্পে প্রচেষ্টা ভারতীয় শিল্পী ও বণিকগণ এই শিল্পের সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণার্থ আমাদের আর্থিক সামর্থ্য ও বাঁচা মালের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার প্রবর্তনীয় প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন ভারত সরকারের এবং আন্তর্জাতিক কার্যকারবার বৈঠকের গোচরে আনিয়াছেন। যুদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টায় যে যুদ্ধান্তের সহযোগিতার পরিকল্পনা রপায়িত হইতেছে, তাহাতে ভারতের স্বার্থ ও মর্যাদা যাহাতে উপযুক্ত প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করে, তদ্বিষয়ে আমাদের শোচনীয় প্রয়োজন। আমরা এখন ইহাতেই নিশ্চিত ভাবে জানিতে চাই যে, এই সকল পরিকল্পনায় ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইবে কি না এবং তাহার ফলে ভারতের জাতীয় পোত-শিল্পের যথার্থ উন্নতি ও প্রসার ঘটবে কি না। আমরা যে কেবল মাত্র ভারত মহাসাগরে এবং প্রাচ্য গোলাকে আমাদের জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দাবী করি, তাহা নহে; সাগরপারের বৈদেশিক বাণিজ্যেও আমরা আমাদের জাতীয় নৌবহরের অঙ্গুর অধিকার আকাঙ্ক্ষা করি। ভারতে পোত-নিষ্পত্তি শিল্প এবং সমুদ্রবন্দে অবধি পোত-পরিচালনা প্রচেষ্টার ইতিহাস মসী-কলঙ্কিত। এই উভয়বিধ বৈধ প্রচেষ্টায় আমাদের জাতীয় প্রবন্ধ পরদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের স্বদেশীয় সর্কার স্বার্থের পরিপূর্ণতার নিমিত্ত পদে পদে ব্যাহত ও প্রতিহত হইয়াছে।

সম্প্রতি ভারত সরকার যুদ্ধান্তের সংগঠন সমুন্নয়ন পরিকল্পনার নিমিত্ত যে কয়েকটি সমিতি ও উপসমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তদ্ব্য

একটির প্রতি ভারতের পোতশিল্প ও পোতবাণিজ্য প্রবর্তনের নিয়ম-নীতি-নির্ধারণের ভার অর্পিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বে বোম্বাই সহরে ইহার একটি অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। যে প্রচেষ্টা বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই অগ্রহস্ত হওয়া অত্যন্ত কষ্টব্য ছিল, দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় স্বার্থে অঙ্গ শাসক-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অসুচিন্তিত শৈথিল্যে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। অঙ্গ শতাব্দীর পূর্বে ইহাতে ভারত একটি জাতীয় বাণিজ্য নৌবহর প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করিতেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনাপ্রণালী দেশ-সমূহের মধ্যে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি রাষ্ট্র ও রণনীতির দিক হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অজ্ঞাত স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনশীল দেশসমূহের দ্বারা স্বীয় উপকূল ভাগে এবং বহিঃসমুদ্রে বাণিজ্য পরিচালনা করিবার তাহার আশঙ্কা যেমন সমস্ত ও স্বাভাবিক, তদ্বিষয়ে অধিকারও তরুণ অবিসম্বাদিত। কিন্তু নৌবাণিজ্য পরিচালনাপ্রণালী উন্নয়ন ও সামর্থ্য সম্বন্ধে ভারতবাসী বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চবিশ বর্ষে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা সম্বন্ধে নৌশিল্প ও নৌবাণিজ্য পরিচালনা অগ্রহস্তান প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। অথচ এ বিষয়ে তাহার অধিকার যেমন প্রবল, তাহার প্রয়োজনও তরুণ প্রচণ্ড। কিন্তু পরদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের জাতীয় স্বার্থ ইহার বিষম বিদ্রোহী। সুতরাং সাগর-পার হইতে নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকারের ভারতের জাতীয় পোত-শিল্প ও পোত-বাণিজ্য প্রবর্তন সম্পর্কে কোন সুনির্ধারিত নীতি নাই। পরন্তু এ বিষয়ে বৃটিশ পোত-শিল্পী ও পোত-বাণিকগণের বিরুদ্ধাচরণ স্পষ্ট ও তীব্র। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি প্রচণ্ড অভাবাত। অজ্ঞাত দেশের পোত-শিল্পী ও পোত-বাণিক রাষ্ট্রের নিকট ইহাতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য ও সহযোগিতা পায়, যাহাতে তাহারা সহজেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতা পরাজয় করিতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে বিদেশী শিল্পী ও বাণিক প্রচুর প্রসার পায়; এবং তাহার পূর্বা-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ব্যতীত নতুন নতুন অগ্রহস্তান-প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও বিলম্ব সুযোগ-সুবিধা পায়। ফলে, আমাদের জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা দুর্বল ও দুঃসম্ভব; অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অতীতে ভারত সরকার একটি ভারতীয় বাণিজ্য-নৌবহর গড়িয়া তুলিবার প্রতিশ্রুতি বহু বার নিশ্চয়ান্বক ভাবে দিয়াছেন। ভারত সরকার পুনঃ পুনঃ আমাঙ্গিককে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়াছেন যে, জাতীয় পোত পরিচালন প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ভারতের উপকূল ভাগে এবং বাহির সমুদ্রে বাণিজ্যের একটি প্রবৃষ্ট অংশ দিতে তাঁহারা বাধ্য এবং সমুদয়ক। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের অঙ্গীকৃত দায়িত্ব পরিপূরণের নিমিত্ত কোন কার্যকরী নীতি অবলম্বন করেন নাই। অর্ধ শতাব্দীর তীব্র প্রচেষ্টার ফলে, ভারতের জাতীয় পোতগুলি উপকূল ভাগের বাণিজ্যের মাত্র শতকরা পঁচিশ অংশ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাহির সমুদ্রের বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোতগুলির উল্লেখযোগ্য কোন অংশ নাই। ভারতের তটরেখার একুন দৈর্ঘ্য ৪,৫০০ মাইল; এবং ইহার বহির্বাণিজ্যের পণ্যের পরিমাণ পঁচিশ মিলিয়ন টনেরও অধিক, এবং স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যনিক। যদিও সরকার পনের বৎসর পূর্বে ভারতের জাতীয় পোতগুলিকে এই যাত্রী ও মাল-পরিবহনের একটি শ্রায়সম্পন্ন অংশ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তথাপি আজ পর্যন্ত সে অঙ্গীকার প্রতিপালনের নিমিত্ত কোন কার্যকরী প্রচেষ্টা অবলম্বন করেন নাই। গত ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন উত্তমশীল ভারতবাসী যুরোপ ও ভারতের মধ্যে যাত্রী পরিবহনের নিমিত্ত একটি দ্রুতগামী পোত পরিচালন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারত সরকার এই প্রচেষ্টার সমর্থন ও সাহায্য দূরে থাকুক, ইহাকে বহুবিধ বাধা-বিঘ্নে প্রতিহত করিয়াছিলেন। পোত-শিল্প ও বাণিজ্যের যুদ্ধান্তর সমুন্নয়ন-সম্প্রসারণকালে এই সকল তিক্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস ভারতবাসী সহজে বিস্মৃত হইতে পারে না।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমান পৃথিবীবাণী যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বোম্বাই সহরে সম্প্রতি যে পোত-শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ সমিতির বৈঠক আহূত হইয়াছিল, তাহার সদস্যদের নিকট ভারত সরকার 'যে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনই তাঁহাদিগের যুদ্ধান্তর পরিকল্পনা প্রচেষ্টার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। এত দিনে তাঁহাদের যথার্থই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, ভারতে একটি বাণিজ্য নৌবহরের প্রয়োজন যে কেবল বাণিজ্য ব্যাপদেশে, তাহা নহে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার নিমিত্তও তাহা প্রয়োজন। জাতীয় পোত-শিল্প ও বাণিজ্য সমুন্নয়ন সম্বন্ধে সরকারের এই যে নব-জ্ঞাত অনুভাব, ইহা বাস্তবিকই আশ্বাসপ্রদ। এই বিশিষ্ট পোত-শিল্প-বাণিজ্য নীতি-নির্ধারণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা বাণিজ্য-সচিবের যথেষ্ট সংসাহসের পরিচায়ক। এখন এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নব-প্রেরণাকে যথাসম্ভব সত্বর কার্যকরী করিলে ভারতের পোত-শিল্প-বাণিজ্য সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা অচিরে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ভারতের পোত-শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি বত শীঘ্র সমুদ্রপথে সাগর-পারের ঝিল্লি দেশ সমূহের সহিত যাত্রী ও মাল পরিবহন ব্যবসায়ের বিশিষ্ট

আমাদের পোত-শিল্প ও বাণিজ্য-নৌবহর বত শীঘ্র পুষ্ট হইবে, আপন-কালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত আমরা ততই প্রস্তুত হইব। শক্তিশালী বাণিজ্য-নৌবহর যেমন দ্রুত অর্থ-নৈতিক উন্নতি বিধানের উপায়, তেমনি যুদ্ধ-বিগ্রহে দেশরক্ষার অতীব প্রয়োজন।

ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর বলিতে আমরা কি বুঝি,—তাঁহাও প্রাধান্যযোগ্য। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য পণ্য বহন করিবার নিমিত্ত বৃটিশ জাহাজ-মালিকগণ কর্তৃক পরিচালিত জাহাজ সমূহ ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর নহে। এমন কি, ভারতের রৌপ্যমুদ্রার নির্ধারিত মূলধনে ভারতে ভারতীয় আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত পরদেশী-পরিচালিত জাহাজ-কোম্পানীর নৌ-বহরকেও আমরা ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর বলিব না। এইরূপ জাহাজ কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলীতে কয়েক জন ভারতবাসী পরিচালক থাকিলেও আমরা তাহাকে ভারতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কোন জাহাজ-কোম্পানী রৌপ্য মুদ্রা-মূলধনে ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত হইতে পারে; এবং ইহার পরিচালক-মণ্ডলীর অধিকাংশ ভারতবাসী হইতে পারে। বহু দিন হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত যে-কোন বৃটিশ-কোম্পানী উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানে তাহার জাহাজগুলি হস্তান্তরিত করিতে পারে; এবং এইরূপ হস্তান্তর-করণের পরেও পরদেশী ধনিকগণ অতীতের শ্রায় ডবিষ্যতেও ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে তাহাদের স্বার্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে। এই প্রকার অপ অথবা কুট কৌশলে পরিচালিত পরদেশী-শাসিত নৌ-বহরকেও আমরা ভারতীয় সংজ্ঞা দিতে পারি না। ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর আখ্যায় আমরা যথার্থই জাতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর কামনা করি; ভারতবাসীর অর্থে, ভারতবাসীর স্বত্বাধিকারে, ভারত-বাসী কর্তৃক পরিচালিত বাণিজ্য-নৌ-বহরই যথার্থ 'জাতীয়' আখ্যা পাইবার উপযুক্ত। যে জাহাজ-কোম্পানীর সংগঠনে এই তিনটির কোনটির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অভাব তাহা জাতীয় নহে; তাহা মিশ্র অথবা আন্তর্জাতিক।

১১৩২ খৃষ্টাব্দে যখন স্বনামধন্য স্যার সি., পি., রামস্বামী আয়ার কিছু দিনের জঙ্গ ভারতের বাণিজ্য-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—“ভারতীয় মূলধনে ভারতবাসী কর্তৃক সংগঠিত প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত উপকূল-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার-সাধনের নিমিত্ত ভারত সরকার বিশেষ ভাবে ব্যগ্র।” ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন স্যার জোসেফ ভোর ভারতের বাণিজ্য-সচিব, তখনও তিনি এই নীতি সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, “ভারত সরকার সর্বদাই চেষ্টা করিবেন এবং সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন, বাহ্যতে ভারতবাসীর স্বত্বাধিকারভুক্ত বাণিজ্য-নৌ-বহর ক্রমোন্নতি লাভ করে।” এই দুই জন মনীষী সচিবের উক্তি হইতেও স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, “ভারতীয়” সংজ্ঞায় “জাতীয়” নৌ-বহরই তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয়; এবং জাতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর প্রতিষ্ঠাই তথাকথিত শাসন-সংস্কার-সম্বৃত বর্তমান ভারত সরকারের নীতি-সম্মত।

কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাই সহরে যে পোত-শিল্প-বাণিজ্য নীতি-নির্ধারণ সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত পরদেশী

সুবিখ্যাত শিল্পরথী মিষ্টার বালচাঁদ হীরাচাঁদ ঐ সমিতিতে নৌবহর সম্পর্কে “ভারতীয়” সংজ্ঞার অর্থ “জাতীয়” কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরাধীন ভারতের বর্তমান শাসন-তন্ত্র বিলাতের কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন। সুতরাং তাঁহারা যে নিছক জাতীয় পোত-শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষপাতী, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় নহি। পূর্ব হইতেই ভারতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের হানি ঘটে, একপ কৌন প্রচেষ্টা তাঁহাদের অন্তিমোদিত হইতে পারে না। ভারত সরকারের বর্তমান উদ্দেশ্য বোধ হয় এই পর্যন্ত যে, প্রাচীন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত পরদেশী অথবা স্বদেশি-বিশেষ-মিশ্রিত প্রচেষ্টার সহিত যতটা সম্ভব তথাকথিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ভাবে আপত্তির কোন কারণ ঘটিবে না! সাগরপারের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বর্তমান ভারতীয় শাসন-তন্ত্রের পক্ষে ইহার অধিক অগ্রগতিশীল নীতি সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বোম্বাই বৈঠকের সদশ্রুগণ মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদের সংশয়-সমস্যার কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তাঁহারা নিশ্চিত “শাম ও কুল” দুই-ই রক্ষা করিয়া চলিবার বিধান দিয়াছেন।

যাহা হউক, বোম্বাই বৈঠকের সদশ্রুদিগের নিকট প্রচারিত অন্তঃস্থান-পত্রের নির্দেশ যে, “নিখিল জগতের পরিবহন ব্যবসায় যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণই আমাদের যুক্তোত্তর পোত-নীতির উদ্দেশ্য,”—ইহাই আমাদের আশু প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। তবে, আমাদের অবশ্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির জাহাজ ভারতের উপকূল-বাণিজ্যে সিংহল ও বন্দার সহিত বাণিজ্যে উত্তরোত্তর অধিকতর অধিকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োচনায় সরকার যদি যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিন্ন প্রদান দ্বারা ভারতের জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলিকে খুশী রাখিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলেই অসন্তোষ ধুমায়িত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকে পরিণত হইবে। জাতীয় পোত-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে জাতীয় পোতগুলিকে ভারতের উপকূল-বাণিজ্যে এবং সিংহল ও বন্দার সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে উত্তরোত্তর অধিকতর অংশ দিতে হইবে। যখন নিখিল জগতের সমুদ্র-বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোত যথোপযুক্ত অধিকার-বিস্তার করিতে অভিলাষী, তখন তাহার স্বদেশীয় উপকূলে তাহাকে শ্রদ্ধা অথবা অশ্রদ্ধার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সন্ধীর্ণ অধিকার দিয়া তৃপ্ত রাখিতে চেষ্টা করা অত্যন্ত অসঙ্গত। পৃথিবীর সর্বত্র স্বদেশীয় উপকূলে জাতীয় পোতের অপ্রতিহত অধিকার। ইহাই চিরন্তন গ্রায়সঙ্গত নীতি। পূর্বোক্ত অন্তঃস্থান-পত্রে যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, পারস্য উপসাগর, পূর্ব-আফ্রিকা, মালয় এবং ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোতগুলির একটি গ্রায়সঙ্গত অংশ থাকা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত পূর্বদেশীয় বাণিজ্যে এবং ভারত ও যুক্তরাজ্য এবং যুরোপীয় মহাদেশের মধ্যে এবং উত্তর-আমেরিকার সহিত বাণিজ্যেও ভারতের জাতীয় পোতগুলির যথোযোগ্য অধিকার আবশ্যক। আমাদের সর্ববিধ অধিকার-বিস্তার প্রস্তাবে সরকারের শুভ ইচ্ছা চির-প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই শুভ ইচ্ছা,—চিরদিন উচ্চ ঘোষণা মাত্রই পরিমাপপূর্ণ লাভ করে, কদাচিৎ ইহা কার্যে পরিণত হয়। এই নিমিত্ত জাতীয় পোত ব্যতীতে তৃতী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানবর্গ

স্বভাবতঃই জানিতে সমুদ্ররক যে, এই অন্তঃস্থান-পত্রে ব্যক্ত অভিপ্রায়ের সহিত ভারত সরকারের আন্তরিক সহায়ত্বের পরিমাপ কিরূপ, এবং এই প্রচেষ্টায় তাঁহারা সরকারের নিকট কি প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিবার প্রত্যাশা রাখিতে পারেন। জাতীয় পোত ব্যবসারে যাহারা লিপ্ত, তাঁহারা এখন হইতেই বুঝিতে চাহেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতের কতগুলি জাতীয় পোত প্রয়োজন হইবে এবং উপকূল ও বাহির সমুদ্রে মাল ও যাত্রী পরিবহন ব্যবসারে তাঁহাদের কিরূপ অধিকার লাভ ঘটিবে। এখন হইতেই চেষ্টা না করিলে, তাহার জায অধিকার লাভ করিবার উপযুক্ত পোত সংগ্রহ সম্ভবপর হইবে না। বিলম্বে নিষ্ফল নৈরাশ্য স্থানিষ্ঠিত। সিদ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর সভাপতি মিষ্টার বালচাঁদ হীরাচাঁদ পঞ্চবিশ বর্ষের অধিক কাল জাতীয় পোত ব্যবসারে ব্রতী আছেন; তাহার অভিমত এই যে, উপকূল-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অধিকার জাতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানের জায প্রাপ্য। নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশ সমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় পোতের অধিকার। দূরবর্তী সাগরপারের দেশ সমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক ভারতের জাতীয় পোতপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রাপ্য। যুক্তরাষ্ট্র, যুরোপীয় মহাদেশ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এই পর্যায়ভুক্ত; এবং পূর্ব গোলাক্ধের অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ভারতের জাতীয় পোতবহরের অধিকার। এই অঞ্চলে অধুনা শত্রু-কবলিত দেশগুলিও এই পর্যায়ভুক্ত। ভারতে একটি জাতীয় বাণিজ্যপোত-বহর গড়িয়া তুলিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন এবং অপরিহার্য। সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-পোত-বহর জাতীয় গৌরবের বিষয়। বুটেন চিরদিনই তাহার বাণিজ্য-পোত-বহরের গৌরব ঘোষণা করিয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় অর্থ-নৈতিক উন্নতি-সাধন হেতু আমাদেরও এ বিষয়ে কুঠাবোধ করিবার বিমুখ্যাক কারণ নাই। এই সম্পর্কে বুটেনের যুদ্ধান্তর নীতি ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ-পরিবহন মন্ত্রী মহাসভায় কর্তৃক-সম্পাদক মিঃ লোয়েল বোকার গভ বৎসর বলিয়াছিলেন যে, “যুদ্ধ-পূর্বের জায যুদ্ধান্তেও বুটেন অবশ্যই একটি স্বেচ্ছা ও কাণ্ড-কুশল বাণিজ্যবহর দ্বারা নিখিল জগতের পরিবহন কার্য পরিচালন করিবে।” কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ব্রিটিশ যুদ্ধ-পরিবহন মন্ত্রী লর্ড লেদার্স এই নীতি সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “বুটেনের বাণিজ্য-বহর যুদ্ধান্তে অন্ততঃ যুদ্ধ-পূর্বের জায সংখ্যা ও শক্তিবিশিষ্ট হইবে।” তিনি এই শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। তিনি পার্সিয়ামেন্ট মহাসভাকে এই স্থনিশ্চিত আশ্বাস দিয়াছেন যে, “মস্রিমগুলীর দৃঢ় সঙ্কল্প এই যে, ব্রিটিশ বাণিজ্য-বহর এবং জাহাজগুলির রক্ষণাচার ও নাবিকবৃন্দকে পুনরায় একটি বৃহৎ এবং কাণ্ডকুশল নৌ-বহরে পরিণত করিতে হইবে। তাঁহারা সর্বপ্রথমে দেখিবেন যে, এই শিল্প এবং এই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধান্তে যেন যুদ্ধপূর্বের জায গ্রায়সঙ্গত অধিকার লাভ করে।”

যুদ্ধান্তে যে নব পরিস্থিতির অভ্যুদয় ঘটিবে, তাহাতে ভারতেরও একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু জগতের পরিবহন ব্যবসারে আমাদের যথোযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নৌ-বহর কোথা? কিরূপে আমরা পোত নির্মাণ করিব, অথবা কোথা হইতে আমরা পোত সংগ্রহ করিব, এই প্রশ্নই আমাদের কঠিন সমস্যা।

ভারতে পোত-নির্ধারণের উপযোগী উপাদান-উপকরণের অভাব নাই এবং ভারতীয় ধনিক-বণিক ও শিল্পী-শ্রমিকের উত্তম ও অগ্রসর ভাব নাই। নৌ-বহন-পণ্ডিত এডুইয়ার্ড স্ত্রায় হারবার্ট বিজহারবার্ট দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যত শীঘ্র ভারতে পোত-নির্ধারণ-শিল্প প্রবর্তিত হয়, ততই মঙ্গল। এইরূপ শিল্পের সাফল্যের নিশ্চিত প্রয়োজন সাহস, উত্তম ও হবিয়া চিন্তা। ইহার সফলত্বগ্ৰহী যে ভারতে বিদ্যমান তাহা কেউই অস্বীকার করিতে পারেন না।" সংশ্লিষ্ট ভারতে একটি পূর্ণাঙ্গ পোত-নির্ধারণ-প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ভারতীয় অর্থ-সাক্ষ্য ইহা সুশিক্ষিত; কিন্তু ভারতের সন্ত্রাসবাদী জাহাজ নির্ধারণের অধিকার নাই। বর্তমান যুদ্ধপরিচালনার জাহাজের তীর ও তীরক অভাব সত্ত্বেও বিলাতের পোত-শিল্পী-কারিকরণের দ্বাৰা ব্যাঘাত আনয়ন, ব্রিটিশ ও ভারত উভয় সরকারই ভারতের এই প্রচেষ্টাকে বাধা না হটুক, ব্যাহত করিতেছেন। আমরা যে আমাদের দেশে মাত্র জাহাজ নির্ধারণ করিতে অধিকারী নহি, তাহা নহে, আমরা ভিন্ন দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদী জাহাজ ক্রয় করিতেও অধিকারী নহি। যুদ্ধভরতে ভারতের নৌ-বহন ছিল অতি ক্ষুদ্র; তথাপি ইহা দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও যুদ্ধের অভাব কল্পে ভারত মহাসাগর হইতে বহু দূরে কৃত্রিম অঙ্গন করিয়াছে। কল, এই ক্ষুদ্র নৌ-বহন যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির অভিযোজ্য ক্ষুদ্রতর আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নৌ-বহন ভারত সরকারকে গুণ বহুল প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের অধিকারে ছিল। সন্ত্রাস-বর্ণপ্রহীতার মৌলিক দায়িত্ব অনুযায়ী এই নৌ-বহনকে অনুপ্রবেশ প্রদান করাই ভারত সরকারের নৈতিক কর্তব্য। বিজয়ের বিষয় যে, ভারত সরকার ভারতীয় পোত-অধিকারীদের এই ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রিটিশ পোত অধিকারীদের সত্ত্বে ব্যবস্থা কিংবা বস্ত্র। যুদ্ধভরতে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ পোত-দালিকদের যুদ্ধকালীন ক্ষয় ও ক্ষতি বস্ত্র-প্রদত্ত হইয়া পূরণ করেন। পরাধীন ভারতে বিপরীত বিধান। ভারতবাসীর পোত-নির্ধারণে অধিকার নাই; এবং তাহাদের যুদ্ধকালে পোতগুলির সরকারী কর্তৃক নিযুক্ত অবস্থার ক্ষয় ও ক্ষতিও সরকার পূরণ করিতে নারাজ। সন্ত্রাস-যুদ্ধভরতে তাহার অতি প্রত্যাশিত ও সমীচীন কর্তৃপরিধির প্রসার দূরে থাকুক, যুদ্ধ-পূর্বে তাহার বটটুকু কর্তৃক-সামর্থ্য ছিল, তাহাও বহুল পরিমাণে বর্ধীকৃত হইবে।

সরকারের প্রকৃত সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ কোন পোত-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিলাতের যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত নভিশালী পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বাহা সম্ভব, ভারতের হর্সল শিপ-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে তাহা আরো সম্ভবপর নহে। যুদ্ধ-বীমার কল যে ক্ষতিপূরণ পাওরা বাইবে, তাহা হইতে নূতন-নির্ধারণের ক্ষয় যেমন অত্যধিক, অঙ্গন অবস্থা-প্রাপ্ত জাহাজগুলির নিশ্চিত যৌথ-কারবারের সালতাবাহী হিসাবে যে ক্ষয়-পূরণ ব্যয় বরাদ্দ থাকে, তাহা হইতে তাহাদের পরিবর্তে নূতন জাহাজ সংগ্রহ করিবার ব্যয়ও তেমন অত্যধিক। এ বিষয়ে বিলাতী প্রতিষ্ঠান-গুলি ব্রিটিশ সরকারের বৎসসত্ত্ব সাহায্য পাইবার আশাস পাইয়াছে।

যুদ্ধের ব্যবস্থা। পরাধীন দেশের পরদেশি-নিরস্ত্রিত সামন্তাধিপতি-শাসন-ভরতের পক্ষে সেই দেশের জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে এইরূপ "কাণ্ড-বিচার"ই নির্ধারিত। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে, এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা-কলে সন্তু সন্ত্রাসবাদীকে বেশসমূহ তাহাদের জাতীয় নৌ-বহনকে আত্মরক্ষা ও পরাক্রমে প্রকাশের কথিয়া গড়িয়াছিল। বিগত ভারতের তিন বিষ্ণু বর্ণিত সন্ত্রাস-সেবায় পরিযুক্ত, তথাপি পরাধীন ভারত সরকার তদ্বিক্রে কোন প্রচেষ্টাই করেন নাই; পরন্তু, ভারতীয় শিল্পী বণিকদের এই সম্পর্কে কোন প্রচেষ্টাকে প্রেরণ দেশ-দেশে সম্ভব মনে করেন নাই। আমরা হুঙ্কারি। এই নিশ্চিত আমরা এখনও আশা করিতেছি যে, বর্তমান যুদ্ধের অভিজ্ঞত ও তীর অভিজ্ঞতার কলে তাহারা সত্যিই কোন প্রচেষ্টা না করিলেও ভারতীয় শিল্পী বণিকগণকে বাধ্যকিরে কিংবা করিয়েন না। বিগত মহা-যুদ্ধের অবসানে এ বিধির অব্যাহত হইলে, আজ তাহাদিগকে গণ্য মহাযুদ্ধের সহিত স্বীকার করিতে হইত না যে, "গভীর সন্ত্রাসবাদী জাহাজের অভাব ভারতে পোত-নিরক্ষণ প্রচেষ্টা।" দৃষ্টিকে মহাযুদ্ধ দেশবাসীর প্রাণরক্ষার নিশ্চিত সাগরপার হইতে বাতাস্যবাদী আনিবার মত জাহাজও আমাদের নাই।

কেবলমাত্র জাহাজ গড়িয়া তুলিলেই যে জাতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহনের প্রতিষ্ঠা ঘটিবে, তাহা নহে। সেই সকল জাহাজে উপযুক্ত পরিমাণে মাল সরাবার ক্রিয়াও ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিবহনোপযোগী মালের তুলনায় জাহাজের ক্ষমতা অল্প অথবা অধিক হইলে, কিংবা জাহাজের ক্ষমতার তুলনায় পরিবহনোপযোগী মালের পরিমাণ অল্প অথবা অধিক হইলে, পরাক্রমের গলাকাটা প্রতিযোগিতার উৎপত্তি ঘটিবে। প্রকল পরাক্রমশালী পরদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা প্রতিযোগিতার সহিত বহি এইরূপ পরিচিতির অভাব ঘটে, তাহা হইলে কখনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমুদ্রে ভিৎ হইতে হইবে। যুদ্ধভরতে সন্ত্রাস-পঞ্জির বহুল পরিবর্তন ঘটিবে। এ নিশ্চিত বিলাতেও এই সমস্তা প্রকল হইয়াছে। সম্প্রতি বিলাত লর্ড মহাসভার লর্ড রাবারউইক এই প্রের উদ্যোগিত কথিয়া বলিয়াছেন যে, "পোত-পরিচালন ব্যবস্থারের ভবিষ্যৎ নিরূপণের মত আন্তর্জাতিক পোত-পরিচালন-বৈঠকের একটি অধিকার প্রয়োজন। যেসব প্রচেষ্টা এক অথবা প্রতিযোগিতা লক্ষ্য রাখিয়া চাহিয়া অনুপ্রাণিত জাহাজ সরাবারের এক জাহাজে বাতনের মাত্রা পরিমিত পণ্য রাখিবার নিশ্চিত একটি যুক্তিসঙ্গত কথ্যবস্ত্র কিংবা আশাও আজ যুদ্ধে বিশদ হইয়া যুটেন জাহাজে বাতনের মাত্রা পরিমিত রাখিবার পক্ষপাতী। কিন্তু এত দিন ভারতে ব্রিটিশ পোত-পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় পোত-পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা কর্তব্যে কথিবার নিশ্চিত হুঙ্কার বাতল কথাইয়া জাতীয় পোত-পণ্য সহিত গলাকাটা প্রতিযোগিতা চালাইয়াছেন। সে অপ্রীতি-আলোচনার স্থান এ প্রকল্পে নাই। বাহা হটুক, ইহা এখন বস্ত্র-যে, ভারতে একটি স্বাধী নভিশালী জাতীয় বাণিজ্য নৌ-বহন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, ভারত সরকারকে তাহার কল্যাণকর কাব্যকীর তম প্রবিচার বস্ত্র-বস্ত্র করিতে হইবে। হুঙ্কারে ইহা সরকারের বি-

বুটানের ১লা আনুমানিক হইতে দুই বৎসর আট মাসে আমেরিকা ৪০ মিলিয়ন টন কাহাজ নির্ধারিত করিয়াছে। বৃহত্তর এই সকল যুদ্ধ-কাহাজ নিষিদ্ধ জগতের বাণিজ্য নৌ-বহরের যুদ্ধ-পূর্ণ পরিস্থিতির বিপর্যয় জটিল। সমুদ্রযুদ্ধে আমেরিকাই মিত্রসমূহের প্রতিপত্তি অক্লান্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বৃহত্তর মার্কিনের নব-নির্মিত কাহাজগুলির বিলি-ব্যবস্থা একটি বিশ্ব সমস্যার সৃষ্টি করিলে। সমুদ্র-ভারবাহী সমুদ্র-বাণিজ্যে সমুদ্র দেশ সমূহের মধ্যে পরাধীন ভারতের পোতাশ্রয় শোচনীয়রূপে কম। ইংলণ্ডের ব্যবসায় ভারতের ব্যবসায় অপেক্ষা মাত্র সড়ে ৫১ গুণ অধিক, কিন্তু বুটানের কাহাজ-গুলির মাল-বহন করিবার শক্তি ভারতের ঐ শক্তি অপেক্ষা ১৩৫ গুণ অধিক। সমুদ্র-বাণিজ্যে-প্রবল সমুদ্র-ভারবাহী দেশ সমূহের মধ্যে ভারতীয় কাহাজ-কাহাজ-এই যে প্রচণ্ড পার্থক্য, বৃহত্তর ইহার সমগ্র ও সমীচীন প্রতিকার প্রয়োজন। ভারতের জায় সমুদ্র-ভারবাহী এবং সমুদ্র-বাণিজ্যে একটি সুযোগ-সম্পন্ন দেশ সমূহের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ হেতু বর্তমান অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক সংখ্যক বাণিজ্য কাহাজের প্রয়োজন। বৃহত্তর আমাদের কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির উপায়-উপকরণের নিমিত্ত বুটান অপেক্ষা আমেরিকার উপর অধিক নির্ভর

করিতে হইবে। এই নিমিত্ত কিছু দিন পূর্বে আহুত আন্তর্জাতিক কারকারবার বৈঠকের ভারতীয় সদস্যমণ্ডলীর নায়ক ও উপনায়ক উভয়েই ভারতের সহিত মার্কিনের কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে নহে, মাতারাত সম্পর্কেও একটি স্বরিত বন্দোবস্তের আদ্য প্রয়োজন ঘোষণা করিয়াছেন। স্বদেশে পোতা নির্ধারণ ব্যতীত ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে আমাদিগের বাণিজ্য-পোতা ক্রয় করিতে হইবে। ভারতের উপকূলে ভারত মহাসাগরে আমাদের জাতীয় পোতা বাণিজ্যের প্রচার, বাহির দরিয়ায় বাণিজ্যে ভারতের জাতীয় পোতের স্বাধীনতা অধিকার এবং নিষিদ্ধ জগতের পরিবহন ব্যবসায় আমাদের একটি প্রকৃত অংশ ব্যতীত ভারতের শক্তিশালী বাণিজ্য নৌবহর প্রতিষ্ঠার আশা বুঝা। ইতিমধ্যে বৃহত্তর বাণিজ্য-নৌবহরের সমগ্র ও সমীচীন বিস্তারের জন্য মিত্রশক্তিসমূহ মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত নিশ্চায়িত হইয়াছে। ইহাতে ভারতের সহযোগ আছে কি না আমরা জানি না। অনতিদূরবর্তী শান্তি বৈঠকে ভারতের দাবী জানাইয়া ভারতের স্বাধীনতা অধিকার আদায় করিতে হইবে। পোতা-শিল্প ও পোতা-বাণিজ্যে ভারতের প্রয়োজন কোন স্বাধীন দেশ অপেক্ষা কোন দেশে নূন নহে।

স্বর্ণ-মৃগ

রাশিয়ার কানিনী—শ্রীমচ্চন্দ্র স্বর্ণ-মৃগ আত্মন কবিত্তে গিয়া প্রাণাধিক। সীতাকে হারাইয়াছিলেন। রামায়ণের মূল অনেক কাল শেষ হইয়াছে। সে যুগও নাই, সে কালের ঘটনাও ঘটে না। সে কালে বাহা সত্ত্ব হইত, আজ তাহা শুধু মনের কোণেই কল্পনা করা যায়। কিন্তু মাকে মাকে আজও এমন এক-একটি ঘটনা ঘটে, তাহার দোলায় পুরাকালের রূপকথার দৃষ্টি মানসপটে সূচিয়া উঠে।

ভারতবাসীর বর্তমান স্বর্ণ-মৃগের উদ্ভবতা শ্রীমচ্চন্দ্রের স্বর্ণ-মৃগ আহরণের কথা শ্রবণ করা হইয়া দেয়। স্বর্ণ-মৃগের বিনিময়ে ভারতকে যে পরিমাণ স্বর্ণ-মৃগ বরণ করিতে হইতেছে, তাহার বধ্যবধ হিসাব-নিকাশ যুদ্ধোত্তর কালেই সম্ভব হইবে। আজ তাহার আংশিক আভাস মাত্র দেওয়া চলে।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর দরবারে ভিখারী। কিন্তু এক দিন এই ভারতভূমি ছিল সত্যসত্যই লক্ষ্যের ববক্ষা। ভারতের জমি ছিল স্বর্ণ-মৃগ। ভারতমহাভারত সন্তানদের নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া বহি-বাণিজ্যের দ্বারা রাশি রাশি স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়াছিল। অর্থ-নৈতিকেরা বলেন, সে স্বর্ণের পরিমাণ ছিল এক সহস্র কোটি মূল্যবৎ উল্কে।

সম্রাটের চক্রে সন্তানের প্রার্থনা যেমন পীড়াদায়ক, ভারতের এই স্বর্ণজাতার বিশেষীয়ের নিবর্ত যেমন ছিল উৎসাহের কারণ। বিজয়র চলে তাহারা বলিত, ভারতবর্ষ সেনার অতুল সমাধিক্ষেত্র। বিজয় অবস্থার চক্রান্তে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সঙ্কট সমুদয় স্বর্ণের শতকরা আশী ভাগ হস্তগত করিয়া বসিয়া আছে, তাহার সম্বন্ধে একপাশে মেঘবৃত্ত ব্যোমাজি করা কাহাও সাহসে কুলায় না।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমাল্য পরিচয়গত করে।

স্বর্ণ-মৃগের ইহাতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

টাকার বেশী ছিল না। বৃটিশ সরকারের স্বর্ণভাণ্ডারে সোনার যে পরিমাণ বাটতি দেখা দিয়াছিল, তাহা পূরণ করিবার জন্য সাধারণতঃই তাহাদের চুপ্তি ভারতের উপর পড়ে। ভারত সরকারের মারফৎ তখন সোনা-জন্মের হিড়িক পড়িয়া যায়, আর সেই সোনা বাজবন্দী হইয়া ক্রমাগত জলপ্রোতের রত ভারতভূমি পরিচয়গত করিয়া বৃটিশ সরকারের কৃষ্ণগত হইতে থাকে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বর্ণ-রপ্তানীর পরিমাণ ঠাড়াইয়াছিল নূনকয়ে ৩,৫১৪,০০০,০০০ মুদ্রা—সমগ্র ভারতের সঙ্কট স্বর্ণভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশের উপর। সমসাময়িক স্বাধীন-পত্রে, বাবস্থাপক সভায় এই প্রকার স্বর্ণ-রপ্তানীর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু কখনও সভ্যদেশে এইরূপ জনমত উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইত কি না জানি না—কিন্তু ভারত পরাধীন, প্রতিবাদ করিতে সে পারে, কিন্তু প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়? তাই ভারতীয় স্বর্ণভাণ্ডার ইংলণ্ডের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

আজ আবার ইঙ্গ-মার্কিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতীয় স্বর্ণের বলিদান-পূর্ণ আরম্ভ হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের জন্য ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনদেশ পর্যন্ত ভূখণ্ডে সৈন্ত মোতায়েন করিতে হইয়াছে। এই সব সৈন্তদের ভরণ-পোষণের জন্য বা যুদ্ধসংক্রান্ত অস্ত্রাদি প্রয়োজন বিপুল অর্থের আবশ্যক। এই অর্থের চাহিদা মিটাইবার জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা করিয়াছিল ইঙ্গ-মার্কিন সরকার। ভারত সরকারের মারফৎ বর্তমান স্বর্ণ-বিক্রয়ের মূল্যও বহিয়াছে একই পরিকল্পনা।

এ দিকে ভারত সরকার বড়-গলায় প্রচার করিয়া থাকেন যে, স্বর্ণ-বিক্রয়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রা-ক্ষতি হ্রাস করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক-হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্বর্ণ

বাধিবার সমসাময়িক কালে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২ কোটি মুদ্রার কিছু বেশী।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট উহার পরিমাণ ঠাঁড়ায় ৭৪১ কোটি মুদ্রার উপর; ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট তারিখে উহার পরিমাণ হইয়াছে ১২৭ কোটি মুদ্রা; আর বর্তমান বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের হিসাবে দেখা যায়, নোটের পরিমাণ হইয়াছে ১০৩৪ কোটি মুদ্রার উপর। চলতি নোটের পরিমাণ যদি এই ভাবে বাড়িয়াই চলে, তবে স্বর্ণ-বিক্রয় দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি-দমনকার্য কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা ভবিষ্যৎ কথ্য বটে।

ভারতবর্ষে মোতামেন সৈয়দদের খরচ মিটাইবার জন্ত যে পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহার সংস্থান নিম্নলিখিত দুই ভাবে সম্ভব হইতে পারে।

১। যদি ভারতবর্ষের নিকট ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাণ্ডনার পরিমাণ তাহাদের দেনার চেয়ে বেশী হয়, তবে ঐ পাণ্ডনা হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা। ভারতবর্ষের যে সকল পাণ্ডনা ইংলণ্ডে উৎপত্তি হইতেছে, তাহা ব্রিটিশ সরকার নিজের দেশীয় মুদ্রায় (টালিংএ) হিসাব করিতেছে। শত্রুর ইউবোট আক্রমণের ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার রপ্তানী বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, পরন্তু ইংলণ্ডের নিকট ভারতীয় পাণ্ডনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও দিনের পর দিন পাণ্ডনার আকার বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু সে সম্পাদ ভারতবর্ষের কোন উপকারে আসিবে কি না তাহার আলোচনা বারাস্তরে করা ই ভাল।

২। দ্বিতীয় উপায় স্বর্ণ-রপ্তানীর দ্বারা। সোনোও যে ইহাদের নাই তাহা নয়। তবে তাহারা উহা রপ্তানী করিতেছে না কেন? ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর রয়টারের খবরে স্বর্ণ-বিক্রয়ের তাৎপর্য কতকংশে প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সংবাদ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিসেম্বর মাসের পত্রিকায় না কি বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনার সরকারী যে দাম, তাহার বহু উচ্চ সোনা মিশর, প্যালাষ্টাইন, সিরিয়া, লেবানন, আরব, ইরাক, ভারতবর্ষ ও চীনে বিক্রয় হইতেছে। উদ্দেশ্য—সকল দেশে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা আর মিলিত শক্তির যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যয়ের সংস্থান করা।

সংবাদপত্রে প্রচারিত বাজার-দর হইতে জানা যায়, বর্তমান বৎসরের ১০ই জানুয়ারী সোনার দর বোম্বাইয়ে ছিল ডব্লি-প্রতি ৭৪৮/০ আনা আর ঐ দিন ইংলণ্ডের বাজার-দর ছিল আউল প্রতি ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৪ পেন্স ঠাঁড়ায়; তোলা-প্রতি ১৮০ গ্রেণ আর টাকা প্রতি ১ শিলিং ৬ পেন্স ধরিয়া হিসাব করিলে ইংলণ্ডে সোনার মূল্য তোলা প্রতি হয় ভারতীয় মুদ্রামানের ৪২ টাকা মাত্র।

আর ভারতবর্ষে ঐ সোনাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ বিক্রীত হইতেছে ডব্লি-প্রতি ৭১।৭২ টাকা দরে। অর্থনীতির দিক্ দিয়া এইরূপ দুর্নীতি কোন সভ্যদেশে যে আশ্চর্য্য চকিত্তে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সরকার-পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় বাজার-দর অনুযায়ী অজ্ঞাত পণ্যবস্তুর মূল্য যেমন, সে তুলনায় সোনার দর বিশেষ কিছু বেশী নয়! কিন্তু ভারতের এইরূপ বিপুল মূল্যবৃদ্ধির

মানদ্বরূপ (অর্থাৎ ১০০) ধরিয়া দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে মূল্যবৃদ্ধি নিম্নলিখিত ধারায় হইয়াছে।

১নং তালিকা	
ইরাক	৬১২ (নভেম্বর ১৯৪৩)
ইরান	৪১৫ "
প্যালাষ্টাইন	৩২৫ "
মিশর	২১১ "
ভারতবর্ষ	৩১৮ "

২নং তালিকা	
ইংলণ্ড	১৬৭ (নভেম্বর ১৯৪৩)
ক্যানাডা	১৪০ "
অস্ট্রেলিয়া	১৩৮ "
দক্ষিণ-আফ্রিকা	১৫৪ "
মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র	১৩৫ "

৩নং তালিকা	
জায়াগী	১০১ (নভেম্বর ১৯৪৩)
জাপান	১৪৪ "

উপরোক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পণ্যবস্তুর সর্ববিধ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে অধীন দেশগুলিতে (যেমন ইরাক, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি)। যদিও নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে জায়াগী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, তবুও ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-প্রথা প্রশংসনীয়। যে ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা নিজের দেশে ইংরেজগণ জন্মমূল্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তদনুরূপ ব্যবস্থা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পূরাপূরি না হইলেও আংশিক ভাবে তাঁহাদের জমিদারী অভাগা ভারতভূমিতেও করিতে পারিতেন না কি? কিন্তু সে কথা দূরে থাকুক, এই ডামাডোলের বাজারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ৪২।৪৩ টাকা মূল্যের সোনা ৭১।৭২ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছেন। ফলে ডব্লি-প্রতি ইংরেজ সরকারের মুনাফা হইতেছে প্রায় ২১ টাকা।

কিন্তু সরকার কি সত্য সত্যই স্বর্ণমূল্য সম্বন্ধে সন্দেহহীন? যদি তাহাই হইত, তবে তাহারা বাজার-দর অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্স ডিপার্টমেন্টের গচ্ছিত সোনার মূল্য নূতন ভাবে স্থিরীকৃত করিতেছেন না কেন? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৩৩ (৪) ধারা অনুযায়ী সোনার মূল্য টাকা প্রতি ৮৪৭৫১২ গ্রেণ অর্থাৎ ডব্লি প্রতি প্রায় ২১ টাকা ৩ আনা ১ পাই মাত্র।

সরকার হয়তো মনে করেন, আর মনে করা স্বাভাবিকও যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ যখন শেষ হইয়া যাইবে পণ্যমূল্য তখন নিম্নগামী হইবে। স্বর্ণ-মূল্য তখন আর এমন গগনম্পর্শী থাকিবে না। সরকার যখন তাঁহাদের ক্ষম-ক্ষতির প্রতি এতই জাগরুক, তবে দেশবাসীর স্বার্থ এমন দ্বিধাহীন ভাবে কেনই বা জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে? যাহারা এখন এই নিদারুণ মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে, তাহাদের অবস্থা যুদ্ধান্তর কালে কিরূপ হইবে? সঞ্চিত স্বর্ণ পুনরায় বিক্রয় করিয়া তাহারা ইহার অর্ধেক মূল্যও পাইবেন কি? সরকার কি তখন আবার বর্তমান মূল্যে উহা ক্রয় করিবেন? সরকার হয়তো তাহা করিবেন না। সুতরাং এই সব উচ্চমূল্যে অর্জিত সোনা আত্মীয়-পরিজনদের

বায়ু, পিত্ত ও কফ কি ?

বাড়ীতে কবিরাজ মশায় এলেই
বায়ু, পিত্ত ও কফের কথা
শোন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত বা
রোগীর পথ্যাপথ্য বিচারের প্রয়োজন
হলে কোন্ খাদ্য বায়ুকারক,
পিত্তকারক বা কফকারক এবং

স্বাস্থ্য-মৌল্য

কবিরাজ শ্রীনলিনাক্ষদাস মহাপাত্র

পৃষ্ঠা ৩৪৯

কতক অচেতন দ্রব্য।

এই চেনন দ্রব্য। আবার কি
কি অচেতন সমুদ্র দ্রব্য-স্থির মূল
উপাদান পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি,
অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই
পাঁচটি। তবে জীবের উপাদানের

কোনটাই বা বায়ুনাশক, পিত্তনাশক বা কফনাশক এই সব
আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হয়। অথচ বায়ু, পিত্ত ও কফ যে কি বস্তু,
সে সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ জ্ঞান নেই। এই সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানা
থাকলে আমরা অনেক রোগের হাত থেকে রেহাই পাই এবং দীর্ঘজীবী
হয়ে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারি। বায়ু, পিত্ত ও কফ
এদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? “বায়ু” ধাতুর অর্থ গমন করা, তা থেকে
কৃত্যযোগে হয়েছে বায়ু অর্থাৎ গতিমান পদার্থবিশেষ। “তপ” ধাতুর
অর্থ উত্তাপ দেওয়া, তা থেকে কৃত্যযোগে বর্ণগাম বিপর্যয়ে হয়েছে
পিত্ত অর্থাৎ উষ্ণ পদার্থবিশেষ। “কফ” ধাতুর অর্থ দান করা,
তা থেকে কৃত্যযোগে হয়েছে কফ অর্থাৎ বাহ্য কিছু দান করে। আবার
কফের অপর নাম শ্লেষ্মা। “শ্লিচ” ধাতুর অর্থ সংযুক্ত হওয়া, তা
থেকে কৃত্যযোগে হয়েছে শ্লেষ্মা অর্থাৎ সংযোজক পদার্থবিশেষ।

আয়ুর্বেদে বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে সূত্রকৃতে আছে;—দেহোৎ-
পত্তির মূলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি। আবার কফ, পিত্ত বা বায়ু
ছাড়া কোন রকমেই দেহ থাকতে পারে না। যেমন চক্ষু জগৎকে
স্বিকৃতা দান করে, সূর্য জগতের রসগ্রহণ করে, এবং বায়ু সে রস
চতুর্দিকে মেঘরূপে বিক্ষিপ্ত করে বর্ষণাদি দ্বারা জগৎ রক্ষা করে,
সেইরূপ জীবন্ত দেহ-স্থিত কফ শরীর গঠনের উপাদান যোগাচ্ছে,
পিত্ত সেই উপাদান নিয়ে পরিপাক করছে স্বীয় অগ্নি দ্বারা এবং বায়ু
সেই পরিপাক দ্রব্য শরীরের প্রতিটি অংশে সঞ্চালিত করে শরীর রক্ষা
করছে বলেই আমরা বেঁচে আছি।

পাশ্চাত্য মতেও শরীরের প্রধান উপকরণ তিনটি,—প্রোটিন,
কার্বোহাইড্রেট আর চর্বি। খাতে এই তিনটি উপকরণ থাকা
প্রয়োজন।

প্রোটিন শরীরের গঠনমূলক উপাদান, কার্বোহাইড্রেট বায়বীয়
উপাদান এবং চর্বি আয়ুর্ উপাদান। খাৎস্থিত প্রোটিন থেকে
অনেক পরিবর্তনের পর শরীরের এই জান্তব টিস্যু প্রোটিন তৈরী
হয়। খাৎস্থিত কার্বোহাইড্রেটও মুকোজে পরিণত হয়ে নানাবিধ
পরিবর্তনের পর কার্বনিক এসিড, গ্যাস রূপ বায়বীয় পদার্থে পরিণত
হয়ে বায়বীয় উপাদানের কাণ্ড করছে। আর খাৎস্থিত চর্বি শরীরে
অগ্নির কাণ্ড করছে এবং শরীরের বিভিদ্ভাগে জমা হচ্ছে ও দহনের
ফলে শেষে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হচ্ছে।

সুতরাং প্রোটিন কফের কাণ্ড অর্থাৎ টিস্যু গঠনের কাণ্ড, কার্বো-
হাইড্রেট বায়ুর কাণ্ড এবং চর্বি পিত্তের কাণ্ড করছে, এটা অনেকটা
বোঝা যাচ্ছে। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ ছাড়া কোন জীবন্ত দেহের
অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ পাশ্চাত্য মতে কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ও প্রোটিন
জীবদেহের অত্যাবশ্যকীয় মূল উপাদান। আবার আয়ুর্বেদ মতে
কবায় রসবিশিষ্ট দ্রব্য শরীরের বায়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কটু রস-
বিশিষ্ট দ্রব্য পিত্তের পরিমাণ এবং মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য কফের

বিশেষত্ব এই যে, তাহার দেহ-গঠনে এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত
উনবিংশতিটি সূক্ষ্ম উপাদানযুক্ত পুরুষ বা চৈতন্যশক্তির সমবায়
সম্বন্ধ রয়েছে।

এখন পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা শরীরের গঠন ও রক্ষণকাণ্ড কি ভাবে
চলছে দেখা যাক। ক্ষিতি ভূতের দ্বারা শরীরের প্রতি অংশের
আণবিক (cells) গঠনকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে? অপ, ভূতের দ্বারা
শরীরের প্রতি অংশের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।
তেজো ভূতের দ্বারা শরীরের তাপমান (caloric) বস্তুত হচ্ছে এবং
দ্রব্য থেকে দ্রব্যান্তরে পরিণতির কাণ্ড (metabolism) সাধিত
হচ্ছে। বায়ু ভূত দ্বারা দ্রব্য শরীরের এক স্থান হ'তে স্থানান্তরে
প্রেরিত হচ্ছে। আকাশ ভূত দ্বারা শরীরের প্রতি অংশের ভিতর
দিয়ে তুল ও স্ফুটতিসূক্ষ্ম শ্রোত প্রভৃতির (vessels) সন্ধিবেশে শরীর
গঠিত হচ্ছে। গর্ভশরীররক্ত সমায় প্রত্যেক জীবের দেহ এই পঞ্চ
মহাভূতের একটি বিশিষ্ট সমাহুপাতিক পরিমাণ নিয়ে গঠিত হয়েছে।
দেহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকের পরিমাণ মাত্রা
বেড়ে চলে, কিন্তু উহাদের পরস্পরের অহুপাত (ratio) ঠিক থাকে।
পঞ্চ মহাভূতের যে অহুপাতে গর্ভশরীর আরম্ভ হয়েছে ঠিক সেই
অহুপাতই মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক থাকে। পাক্ভৌতিক খাৎদ্রব্যের পঞ্চ
মহাভূতবিশিষ্ট পরিপাকের দ্বারা শরীর পঞ্চ মহাভূতে পরিণত হয়ে
শরীরে পঞ্চ মহাভূতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেহ বৃদ্ধি করছে। আবার
শ্রমাদি নানাবিধ কারণে শরীরের পাক্ভৌতিক উপাদানের প্রতি-
ন্যায়ত ক্ষয় হচ্ছে। খাৎ গ্রহণে সেই ক্ষয়ের পূরণ হয়ে পঞ্চ মহাভূতের
সমতা রক্ষিত হচ্ছে। পঞ্চমহাভূতের যে কোন একটির পরিমাণের বৃদ্ধি
বা হ্রাস হলেই পঞ্চ মহাভূতের সমাহুপাত নষ্ট হওয়ায় দেহের
উপাদানগত সম্বন্ধও বিনষ্ট হয়, এবং জীবের মৃত্যু ঘটে। কাজেই শরীরের
বৃদ্ধি ও জীবনরক্ষার জন্ত প্রতি মুহূর্তেই এই পঞ্চ মহাভূতের সমাহু-
পাত রক্ষা করে চলা উচিত। প্রতি মুহূর্তেই এই সমাহুপাত রক্ষার
জন্ত আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যদি
আমরা কখনও খাৎ না পাই বা যে খাৎ পাই তাতে পঞ্চ মহাভূতের
মধ্যে যে ভূতাংশের ক্ষয় হয়েছে, সেই ভূতাংশের একান্ত অভাব বা
যে পরিমাণ সেই ভূতাংশ আছে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত ভূতাংশের পূরণের
পক্ষে পণ্যান্ত নয়, অথচ যে মুহূর্তেই সেই সেই ভূতাংশের ক্ষয় হয়েছে
সেই মুহূর্তেই তাহাদের পূরণ করিয়া পঞ্চ মহাভূতের সমাহুপাত
ঠিক রাখা প্রয়োজন; সে জন্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি খাতের
ভাণ্ডার আছে। এই খাতভাণ্ডার সমূহ শরীর পাক্ভৌতিক উপাদানেই
গঠিত। খাৎ থেকে শরীরবৃদ্ধির জন্ত বেরূপ এক দিকে পাক্ভৌতিক
উপাদানবিশিষ্ট রস ধাতু তৈরী হয়ে ক্রমাগত সপ্তধাতুর পুষ্টি ও পরিমাণ
বৃদ্ধির দ্বারা শরীরের পঞ্চ উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে, সেইরূপ
জন্ত দিকে শরীরের পাক্ভৌতিক অহুপাত অহুপাত অব্যাহত রাখার
জন্ত খাৎ থেকে আরও কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় পাক্ভৌতিক দ্রব্য

কলা বাহুল্য, এই সব শারীর খাতভাগের থেকে প্রয়োজন মত অম্লকণই শারীর পাকভৌতিক উপাদানের পূরণ হচ্ছে। এই শারীর খাতভাগের সংখ্যা ১৫টি। এই পঞ্চদশ শারীর খাতভাগকে পাকভৌতিক ভিত্তিতে ষোড়শটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সকলেই জানেন, দ্রবীভূত না হলে শরীরে কোনও পাকভৌতিক দ্রব্য গ্রহণযোগ্য হয় না। অণু ভূত প্রায় শরীরের সর্বত্রই এই দ্রাব্য-কাণ্ড করছে। সেজন্য পাকভৌতিক দ্রব্যের আপ্যাতন শারীর প্রাণে সহনীয় দ্রব্যেরই medium আর আকাশ ভূত ত inter cellular space হিসাবে শরীরের সর্বত্র বিস্তারিত। শারীর পাকভৌতিক পাকভৌতিক দ্রব্যের মধ্যে প্রায় সমস্তই আপ্যাতন ও আকাশীয় রসে অবশিষ্ট ক্ষিতি, তেজ ও বায়ু ভূতের তারতম্যে পার্থক্য হয়, আরও দ্রব্য ও বায়বীয় দ্রব্য এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের পঞ্চদশ শারীর খাতভাগের এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই তিন শ্রেণীর পার্থক্য শারীর খাতভাগের পাঁচটির দ্রব্যকে বলা হয়; আরও শারীর খাতভাগের পাঁচটির দ্রব্যকে বলা হয়; এবং বায়বীয় শারীর খাতভাগের পাঁচটির দ্রব্যকে বলা হয়। আরও মনে এই সিদ্ধান্ত সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। আবার ভাণ্ডারগুলিকে বলা হয় কক্ষের স্থান, পিত্তের স্থান এবং বায়ুর স্থান। কক্ষের এই পাঁচটি স্থানের মধ্যে একটি স্থানে কক্ষের পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া সেই স্থানটিকে বলা হয় কক্ষের প্রধান স্থান এবং সেই স্থানেই কক্ষ বাস্তব্য থেকে উৎপন্ন হয় অবস্থান করে। কক্ষের সেই প্রধান স্থান ও উৎপত্তি-স্থানের নাম আমাশয়। এইরূপে পিত্তেরও পাঁচটি স্থানের মধ্যে প্রধান স্থান ও উৎপত্তি-স্থান হচ্ছে গ্রন্থী নাড়ী। বায়ুর পাঁচটি স্থানের মধ্যে প্রধান স্থান ও উৎপত্তি-স্থানের নাম পকাশয়। এবার বাস্তব্য থেকে কক্ষ, পিত্ত ও বায়ু কক্ষের উৎপন্ন হয় তাই বলা হয়। মুগ্ধবৎ হতে ওজন-পূর্ণ পথ্য বৃদ্ধি অন্নবহা নাড়ীর (alimentary canal) প্রথমার্শে চিহ্নিত বাস্তব্য শারীর রসের সমিগ্রণে মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর এই মধুর মণ্ডলভাটের দ্রব্য আমাশয়ের (stomach) সন্তোষ ও প্রসারণে উত্তমরূপে মণ্ডিত হয়ে যাওয়ার পর তা থেকে কেন্দ্রীভূত এক বকম পার্শ্ব উৎপন্ন হয়ে এই আমাশয়ের গায়ে সঞ্চার থাকে। এই কেন্দ্রীভূত দ্রব্যটিকে কক্ষ; অতঃপর আমাশয়ের মণ্ডীভূত বাস্তব্য প্রতীকিত গিয়ে পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হয়ে অন্নতা প্রাপ্ত হয়। এই অন্নীভূত বাস্তব্য থেকে এক প্রকার স্বচ্ছ আরও দ্রব্য উৎপন্ন হয়; তার নাম পিত্ত। অতঃপর বাস্তব্য এই স্থানেই সমাক্ষ পৰিপাকান্তে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ অন্ন রস বাতুরূপে পরিণত হয়ে সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয় এবং অপর ভাগ পুরীকরণে পাকশয়ের গমন করে। পুরীকরণে পরিভ্রমণকালীন কটুগন্ধবিশিষ্ট হয় এবং এই স্থানে উত্তর দ্রাব্য শরীরে শোষিত হয়। উটাই বায়ু।

আর্য্যুর্ক্সে বায়ু, পিত্ত ও কক্ষের স্বরূপ সহজে কি আছে দেখা যাক। চরকে বায়ুর লক্ষণ—“কক্ষ: শীতো বায়ু: হৃদয়: চলাচল বিবদ: ধর্ম: কক্ষতা, চলাচল ও বৈশাখ গুণের দ্বারা বায়ু ভূতের প্রাধান্য, হৃদয় গুণের দ্বারা আকাশ-ভূতের স্বরূপ, বর গুণের দ্বারা ক্ষিতি ভূতের, শীত

সব মেহ ও ত্র্যম্বকের দ্বারা অণু ভূতেরও প্রাধান্য লক্ষিত হচ্ছে। পিত্ত বাতমাত্র অন্নরস কক্ষ অণু ভূত ও অগ্নি ভূতের সংযোগ হয়; তৎপরে উত্তর দ্রাব্যে পরিণত হওয়ার বায়ু ও অগ্নি ভূতের সমিগ্রণে কটু রস হয়। উপরোক্ত লক্ষণ দ্বারা পিত্ত যে একটি আরও মেহমুক্ত দ্রব্য, তা বেশ বোঝাচ্ছে। কক্ষের লক্ষণ “ওজনীভূত, মধুর, মধুরবিশিষ্ট।” ওজন ও মধুর রসের গুণের দ্বারা ক্ষিতি ও অণু ভূতের প্রাধান্য, মধুর গুণের দ্বারা অণু ও আকাশ ভূতের, ক্ষিতি গুণের দ্বারা অণু ভূতের, হৃদয় গুণের দ্বারা ক্ষিতি ভূতের সমিগ্রণ লক্ষিত হচ্ছে। উপরোক্ত লক্ষণ থেকে বেশ বোঝা হচ্ছে যে, কক্ষ একটি পার্থক্য দ্রব্য দ্রব্যবিশেষ।

এবার বায়ু, পিত্ত ও কক্ষের প্রত্যেকেরই একটি কথিয়া ১৫টি স্থানের বিবরণ ও তাদের বিশেষ বিশেষ কার্যের কথা বলব। বায়ুর প্রধান স্থান পকাশয়। এই স্থানে বায়ু উৎপন্ন হয়ে মল, কৃমি, পুত্র ও আত্মগতি অথবা স্নিক নিয়ে পিত্তে বর্জিত করে কক্ষ তার একটি পারিভাসিক নাম আশান বায়ু। অগ্ন্যাপরে একজাতীয় বায়ু আছে, তাকে বায়ু পরিপাক পাচক পিত্তের সাহায্য করে এবং রস, যৌব ও বলাগি পৃথক করে, তার নাম সহান বায়ু। সব শরীরে একজাতীয় বায়ু শিরা ধমনী প্রভৃতিতে বসে বলাগি সঞ্চার করে, তার নাম বায়ন বায়ু। মুগ্ধবৎ হতে আমাশয়ের পথ্য অন্নবহা নাড়ীর প্রথমার্শে একজাতীয় বায়ু আছে, যার সাহায্যে বাস্তব্য মুগ্ধ হতে আমাশয়ে পৌঁছে, তার নাম প্রাণ বায়ু। কক্ষের একজাতীয় বায়ু আছে, উটুপী হয়ে বরমাত্র উপর ক্রিয়া করার আমাশয় কক্ষ বলতে পারি, সেই বায়ুর নাম উলান। পাকভাট মতে বায়ুর উপরোক্ত কার্যগুলি বায়ু কেন্দ্র দ্বারা চালিত হলেও আর্য্যুর্ক্সমতে এই কার্যগুলির স্থানিক হির অধ্যাহত রাখার জন্য এই স্থানে সক্রিয় বায়বীয় দ্রব্যের অবস্থান বৈক্যের কথা হয়েছে। প্রধানত: এই পিত্তের উৎপত্তি-স্থান হচ্ছে গ্রন্থী নাড়ী অর্থাৎ অন্নবহা নাড়ীর অন্তর্ভুক্ত এই স্থানটিকে, পিত্তের পারিভাসিক নাম পাচক-পিত্ত। গ্রন্থী-বৃত্তে এক জাতীয় পিত্ত আছে তাহা হলেও কক্ষ বসন্ত থেকে বক্ত তৈরী করা, তার নাম বক্তপিত্ত। কক্ষের এক জাতীয় পিত্ত আছে তার নাম স্নায়ক-পিত্ত, তার কাজ শরীরে শীর্ণ বা বর্ণ প্রকাশ করা। অন্ধিলে এক জাতীয় পিত্ত আছে যার দ্বারা চক্ষুতে দ্রব্যের আকার প্রতিফলিত হয় সেই পিত্তের নাম আলোক-পিত্ত। কক্ষের একজাতীয় পিত্ত আছে তার কাজ অতিপ্রাণিত মনোবোধ সাধন করা, সেই পিত্তের নাম সাধক পিত্ত।

মুখ্যত: এই কক্ষের উৎপত্তি-স্থান আমাশয়; এই স্থানের কক্ষ কাণ্ড সহনীয় আহার্য্য দ্রব্য জল ভাবে স্নেহন অর্থাৎ পাত্তের পর অল্প জেলে আত্ম করে কাবার মত করা, যাতে সহজে হজা হয়। এই কক্ষের নাম স্নেহক কক্ষ। বক্ষের একজাতীয় কক্ষ আছে, উত্তর দ্রাব্য দুইটি সুস্কৃৎ এক জন্মপিত্ত এই তিনটির অধিক স্পন্দন অধ্যাহত রাখা। তার কক্ষের ও জন্মপিত্তের আয়বের মত থেকে এই কাণ্ড করে। কক্ষের জন্মস্থানে এক জাতীয় কক্ষ আছে

অন্ধর ও বাহির

ঐনুলিখা পাল

পৃথিবীর কৃষ্টির প্রত্যেক ভাগে যেখানে প্ৰতাপগতিক নিয়ম ভেঙ্গে মৃতন কিছু কৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে মানুষের জ্ঞান প্রখ্য প্রতিকার হইলে, সবার আগে বিপ্লবের হস্তে প্রয়োজন। নারীজগতেও কখন বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা হলো, সেই বিপ্লবের ডেউ তাকে চিরপরিচিত বিষয়ের গভীর ভেঙ্গে উন্মুক্ত বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে নিজের দাবী জানায় দেখাশোনা। পরিবর্তন বিষয়ে নিয়ম, তাই মানুষের বাধা, অগতঃ বিতর্ক সব-কিছুকে তুচ্ছ করে সে অব্যাহতি অতিথিতপে এসে দাঁড়ায়। বিবর্তনের গতি স্বয়ং অতি মহৎ হয় তখনই বিপ্লব এসে শতাব্দীর পথকে সংক্ষেপ করে কয়েক এনে দাঁড় করায়। নারীজগতের পরিবর্তনও অতি মহৎ গতিতে চলছিল, তাই প্রগতির হস্তক্ষেপে বিপ্লব এসে তার গতি দ্রুত করে দিল।

নারী-জগৎপথের প্রথম প্রভাতে নারী চেয়েছিলো পুরুষের সাথে সমান অধিকার; কেবলমাত্র কৃষ্টির পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে যে সমাজ তাকে গভীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলো তার অপ্রয়োজনীয় বন্ধনকে অধীকার করত। সমাজের কোনও অংশে যখন বিপ্লব ঘটে, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে যখন, কিন্তু সেই বিপ্লবের রূপ যখন সমগ্র সমাজ-লোকের উপর প্রতিকলিত হয়, তখন তার নানা বিকৃত অংশ মানুষের চোখে পড়তে বসে পড়ে। কারণ, দ্রুত পরিবর্তনকে খাপ বাইরে নেবার ক্ষমতা যে সামাজিকব্যবস্থা এবং পরিচালনাবিদ্যা থাকে প্রয়োজন সেটা কয়েক জন দৃষ্টিগত নারীর হস্তেই ছিল, কিন্তু নারীসমাজের কৃত্র এক বৃহৎ অংশে যখন পরিবর্তন এলো তখন তাকে মানিয়ে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

নারীসমাজ শিক্ষিতা হবার সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন কাজে ও প্রতিষ্ঠানে নারীর সাহায্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কিন্তু এই বিরাট সমাজের একাংশ যেন তার উন্নতির বাধা করলে চলবে না। বহি আদ্য প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিভাগ, যেখানে পাস্কাভ্য নারীর অঙ্গকরণে অঙ্গপ্রাণিত হয়ে তারতীর নারীসমাজ কাজ করছে তার ভালো ও মন্দ দুটো কিছুই পর্যালোচনা করি, তাহলে মনের মিক্টাই ভাবী হয়ে ওঠে। বীরা নারীকর্মের প্রধান কর্তব্যটিকে অবহেলা করে,

বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে স্ত্রীমান অর্জন করেছেন, তাঁদের মনের গোপন মনিকোঠাও একটি অপূর্ণ বাসনার দীর্ঘশ্বাস জন্মে থাকে। এ কথা অধীকার করি না যে, পূর্বে যখন নারীজগৎ, বহি-জগতের সাথে সম্পর্কশূন্য হয়ে থাকতো তখন তাকে পুরুষের অনেক অধিকার মাথা পেতে নিতে হ'তো। কিন্তু তাহলেও সেই অসীম বৈধা ও সহিষ্ণুতার পরিবর্তে তার এমন একটি আশ্রয় ছিল, যার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কলে নারীসমাজ ক্রমশই বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। গৃহের গভীরে সম্পূর্ণ অধীকার করে যেখানেই নারী পুরুষের সাথে সমান তালে চলতে গেছে সেখানেই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।

সু এক কু, উন্নত এবং অন্নত এই নিয়েই সমাজদেহ গঠিত। নারী যখন গৃহের গভীর ভিতরে, সাধারণের চোখের বাইরে বাস করে তখনই সে পায় মধ্যাধা। কিন্তু যখনই সে তাকে অধীকার করে সাধারণের চোখের সম্মুখীন হয় তখনই তার গৌরব ধানিকটা লুপ্ত হয়ে যায়। এই জটিল ভারতীয় নীতি নারীর গভীরে একটা কঠোর ভাবে নির্দেশ করে দিয়েছিল। আজ এই বিপ্লবের কলে জেগেছে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেখানে গৃহের অধিকার আমাদের অসহ হয়েছিল, সেখানে পরিবর্তন এসে গৃহের গভীর ভেঙে আমাদের বাইরের লোকের বিচারের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

আমার বক্তব্য বিষয় কেউ ভুল বুঝবেন না। কারণ, সমগ্র জগৎ যখন তার নিজের নিয়মে এগিয়ে চলেছে, তখন ভারতের পক্ষে তার পুরানো দিনের মাত্রের প্রসঙ্গের নিয়ম বজায় রাখা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে অপ্রগতি কোনও মুকল এনে দিতে অক্ষম, তখন পদক্ষেপটা একটু বীরে করাই মঙ্গল।

পাস্কাভ্য নারীসমাজের যে সহজ চলাফেরা আমাদের চোখের চোখে করে, তা আমাদের সমাজে আনতে গেলে কখনই চলবে না। তার জন্ত যে সমাজ-ব্যবস্থা ও চুক্তিভাবী প্রয়োজন তা এখনও বহু দূরের কথা। মাঝখান থেকে সমাজকে পিছনে রেখে তার চুক্তিভাবী অগ্রাধি করে বীরা হঠাৎ গভীরে দ্রুত করে দিয়েছেন, তাঁরা হ্যান্ডব্রেক নিয়ে নিজের বধ্যাধা ও সম্মান। গৃহের বিচারালয়কে অধীকার করতে গিয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ বিষয়ে দরবারে আসাবী।

—বসন্ত—

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

এখনো ভাঙেনি হৃদয়ের
কখন সে উঠে গেছে
কিন্তু রয়েছে খোলা দোর
তারি কাঁধ দিয়ে এসে
ভীতক রেবার আঁচ ভোর।

তারি কাঁধ দিয়ে
কখনো আসে,
আমার হাতের
পাশে পড়ে তাই কি নিশ্বাস
তারি কি হাতের
এখনো রয়েছে পাল



লক্ষ্মী-প্যাঁচা
শ্রীঅখিল নিরোপী

বন-পলাশ গায়ে পাশাপাশি দু'টি বাড়ি।

একটি বাড়ি বড়লোকের, আর একটি হঠাৎ এক সতীর চাষার ছেলেব। বড়লোকের ছেলেটি আর চাষার ছেলেটি দু' ছেলেবেলায় গাঁয়ের পাশাপাশি পাশাপাশি বসে লেখাপড়া শুরু করেছিল।

আজ কিন্তু আর বড়লোকের ছেলেটি চাষার ছেলেটিকে চিন্তে পাবে না। কারণ বড়লোকের ছেলে সহরে থেকে বসন্তে পড়ে আর গাড়ী করে ঘরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দেশের বাড়ীতে সব করে চাওয়া বসন্ত করতে আসে।

চাষার ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিজের জমি চাষ করে, বোকায়ে পুড়ে ভালো জিহ্বা, ফসল ঘরে তোলে, আর লক্ষ্যবোলা নিজের লাঙলার বসে আপন মনে বাঁকি বাজায়।

এমনি ভাবে দু'জনে চাপায়ে চলতে চলতে তারা এত দূর চলে এসেছে যে, পাশাপাশি বাড়ীর লোক চলেও মনের দিক দিয়ে তারা বহু ভাঙতে বাস করে।

বড়লোকের বাড়ীর চিল-কোঠার অঙ্ককার গড়ে বহু কাল থেকে বাস করে এক লক্ষী-প্যাঁচা।

গাঁয়ের লোকে বলে, ঐ লক্ষী-প্যাঁচা আছে বলেই বড়লোকের দিনের পর দিন এত বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে।

বড়লোকের ছেলেটির কিন্তু সেই লক্ষী-প্যাঁচার দিকে বিশেষ নজর নেই। ওই কিছুটে পাখীটা বাড়ীতে একটি কতালের বগী করেছে ওই জায় ধারণা।

লক্ষী-প্যাঁচা নিজের মতো চিল-কুঁহুতে বসে থাকে আর চাষ দিক জলের করে তাকিয়ে নেবে।

বায়ু, তার পর আবার এসে লক্ষী ছেলেটির মতো কোঠার কোঠা লাগাটা দিন যোড়ের বেলা সে সইতে পারে না, তার একটি ভেতর ঘুরিয়েই কানির দেয়।

বড়লোকের বাড়ীতে হুঁকলা বহু লাভ পড়ে। সেটা না বড়লোকের কারবার করে। গাঁয়ের বহু চাষীর ফসল তারা কিনে ও তার পর সেই ফসল সহরে চালান দিয়ে অনেক টাকা লাভ করে।

এ বছর সব চাষীরাই খিঁচি-চালচালি। থাকে বলে, "পাশ আনতে লবণ কুহোর"। তাই সব কৃষকই আসাম টাকা নিয়ে কো সব ধান কিন্তি করে বিক্রয় কর লোকের কাছে। পোনা বয় আগে পাশের বহু গ্রামের ফসলও ওরা এই ভাবে কিনে নেবে এটা এইই মধ্যে বহু হাজার বশ চাল জমিয়ে খেলের নিজে বাড়ীতে।

এই সব চালের বিলি-ব্যবসা করতে অনেক লাভ পর্যায় লোক খাটে। তাদের কথা-বাড়ী, আমাক বাঙালি, শুক-কুঁহু, শাল-কোষার আঙুরা—সব কিছু ফিলে চালার ছেলের ঘুম নষ্ট করে।

সারাদিন খেটে-খুটে পাতো। খেয়ে চাষার ছেলে বিচালী ও গা পড়িয়ে ফিলে আগুয়া-খেকেই ঘুম এসে ওর কোষের পর সঙ্গে বিভালি পাতাতো।

কিন্তু এই হঠাৎমো কেমেনে ওর ঘুমের আরাম বেড়ে গি ফেল। বহুই দিন যেতে লাগলো, বড়লোকের বাড়ীর গোশম কমেই জেত যেতে লাগলো।

এখন আবার বেদী বাড়িয়ে লক্ষী আসে, ভাবতে কি সব ঘের হয়... বাড়িরের অঙ্ককারেই বিকট দৃশ্য করতে করতে সেগুলি সরে পাবে চলে যায়।

দিনের বেশা কিন্তু চুপচাপ...কোনো লাভাশব্দ নেই। চাষ ছেলে এক-এক দিন বিরক্ত হয়ে চাষে, হুজুর। সারাদিন না খেটে-খুটে আসে, কিন্তু সারাদিন একটুই ঘুমেতে পারবে না তার চাইতে চলে যাবে অঙ্ক কোষাজে। একটা কো শেট, যা মো এক বকস করে চলে যাবে।

আবার কলে করে, লাভ-পুজুরে খিটে ছেলে কোখাই শ হায়ে নিজেরও ছেলেবেলা থেকে এই খিটের প্রতিটি পার প্রতিটি কলে সঙ্গে ওর পড়িত। বাবার সব্ব ভাঙ সব্বই পেটু জড়বে... মাথা কাটানো কি এতই মোলা?

লক্ষী-প্যাঁচার মনেও এই একটি কথাই আসে-জায়ায় মনে ফেলা করে।

কেন বিবিবিবি সে ছিল একবারে লক্ষ্যবগী হুপে...অঙ্ককার হুপ লুকিয়ে...মাড়লের সকল কছাট আর গোঁড়াক্তির কাঁয়ে। ঠাণ্ড আর খিটে জায়ায় জাণে হুঁয়ে হুঁয়ে সে কী আবার সে কল লক্ষী-প্যাঁচার হাঙা আর কে বেদী আসে।

কিন্তু বহু গোলাফাল হুপ করলে ওয়।

আগে ফিলে ছিল না, এখন আবার ফিলেও ফিলেও হুপ করলে যে সব চাল বাড়িরে সহরে পড়িত... এই কথা-বাড়ী করে ছা

বু সেই কথা চিন্তা করে লক্ষ্মী-প্যাচার সিনের ঘুম তরুটি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

বতাই দিন খেতে লাগল—গোটা বাড়ীতে যেন চালের পাহাড় তৈরী হতে লাগল। চাল আসা আর খাওয়ার বিদ্যমান নাই। বাড়ীর উঠানের আনাচে-কানাচে যে চাল পড়ে রইল তাই দিয়ে একটা বস্ত্র-বাড়ীর ব্যাশার হয়ে যায়!

এক দিন একটি ভিথিরী এক মুঠা চাল ভিকে চাইতে এসে দাবানলের কাছে হার খেয়ে কীকত কীকত পালিয়ে গেল।

বাড়ীর কর্তা বলে, ও ভিকে চাইতে আসেনি। ওর মতলব খাবার; ওরই দিয়ে চোর ডাকাতিদের খবর দেয়।

সেদিন সারাবাত কর্তা ঘুমোতে পারলে না, পরদিন সূর্য থেকে দু'টো দেশালী দরওয়ানকে বন্ধক-হাতে বাড়ীর দেয়-গোড়ায় অটপ্রহর দেখা দিতে লাগল।

গাঁয়ের বুড়োরা বলাবলি করতে লাগল, বত দিন লক্ষ্মী-প্যাচা ও-বাড়ীতে আছে তত দিন মালমালী দেখানে অচলা হয়ে থাকবেন। খুলা মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়ে ফিরে আসবে।

গোটা গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র চাষার ছেলে বড়লোকের বাড়ী ধান বিক্রি করেছিল। তাই বড়লোকের বাড়ীর দরকারের ওর ওপর খুব দাপ।

এক দিন বাড়ীর কর্তা চাষার ছেলেকে ডেকে বলে, তোমার ভিটেটা আমার কাছে বিক্রি করো, অনেক টাকা দেবো। আমার কান-কর্ণের বড় কাহণীর অভাব হচ্ছে।

চাষার ছেলে বলে, আমি একলা মানুষ, দিবা চলে যাচ্ছে। টাকার আমার খুব বেশী দরকার নেই। নিজের বাড়িভিটে আমি বিক্রি করবো না।

এই কথার বড়লোক তার ওপর আরো চটে গেল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরই জানা গেল যে, বড়লোকের একমাত্র ছেলের খুব খুবখাব করে বিয়ে হবে। গাঁয়েতেই। গোটা বাড়ী বোহাগত করা শুরু হল।

ছেলে সূর্য থেকে ফিরে এসে তার মাকে বলে, বেশ মা, চিলে-মুঠীটা জালো করে বেহাগত করতে হবে, এখানে নহক বসবে। আমি সূর্য থেকে জল নহক-এর দল বারনা করে এসেছি।

মা ভিক কেটে কবাব বিসে, অমন কথা মুখেও আনিদনি থোকা, তখনই লক্ষী-প্যাচা থাকে, তোর ঠাকুরমার আমল থেকে আছে। অনেক বিটগিনি। নহক বর বাইরের বাড়ীতে কুসে।

মোমার এই পরামর্শটা আদমের জালো লাগলো না। এক দিন পক্ষীর মাংস আর মা ঘুমিয়ে পড়লে সে মিল্লীক নিয়ে মশাল জালিয়ে চিলে-মুঠীসহ সিনে হাফির হল। ওর হুকুম করলে, কোঠের ভিতর দাঁড় করাগলি হুকুম—

আজ্ঞার কালে লক্ষী-প্যাচা বুকমটা চিলেবার করে উঠল। তার পরে গাঁয়ের বাসিন্দারা সূর্য দেখে। অপর দালার সে হুকুম দিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে দাঁড় পড়ে গেল।

উঠানের মাঝখানে পড়ে আছে। পাখার শানিকটা পুড়ে গেছে। সে অসহ যন্ত্রণায় ছটকট করছে।

বড়লোকের বাড়ীর চিলে-মুঠীসহ মশালের আলো দেখেই সে ব্যাশারটা বুঝতে পারলে। এ নিশ্চয়ই লক্ষী-প্যাচাকে তাড়িয়ে দেবার মতলব।

সে তাড়াতাড়ি কি একটা গাছের পাতার রস লক্ষী-প্যাচার পাখার মাথিয়ে দিলে। মনে হল, পাখীটা তখন বেশ একটু আরাম পাচ্ছে। আস্তে আস্তে সে চাষার ছেলের কোলের ওপরই ঘুমিয়ে পড়ল।

চাষার ছেলে বীশ আর বড় দিয়ে লক্ষী-প্যাচার জন্ত উঁচু করে চমৎকার একটি বাসা তৈরী করে দিলে। ওর পাখার যা আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেছে। এখন দু'টোতে ভারী ভাব।

চাষার ছেলের কাছে লক্ষী-প্যাচা আসার পর থেকে ওর নতুন করে বাড়-বাড়ন্ত শুরু হল।

সে বছর ওর ক্ষেতে এত ফসল ফলল যে, গাঁয়ের বুড়ো চাষীর দল বলাবলি করতে লাগল যে, স্বয়ং লক্ষীঠাকুরশ তাঁর আলতা-পরা পায়ে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেছেন!

এই ভাবে দেখতে দেখতে চাষার ছেলের বহু ধানী জমি হল... গোয়াল ভরা গরু, পুতুর ভরা মাহু, কেত ভরা ফসল...যে দিকে চোখ পড়ে...হু' চোখ ছুড়িয়ে যায়।

ওদিকে পাশের বাড়ীতে কোথাও কিছু নেই...হঠাৎ এক দিন বাজ পড়ে বুড়ো কর্তা মারা গেল। সেই শোকে বাড়ীর গিন্নী পাগল হয়ে গেল।

বাড়ীর যে একমাত্র ছেলে—বিয়ের পর থেকে দেশের বাড়ীর দিকে তার একটুও টান নেই। আগে মাঝে মাঝে আসত; এখন সূর্য থেকে মোটে নড়ে না।

গাঁয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হতে লাগল। সাত-ভুতে সব লুটে নিলে। এক দিন দুপুর বেলা হঠাৎ কি করে বড়লোকের বাড়ীর গোলাঘরে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

চাষার ছেলে তার লোকজন নিয়ে আগুন নেবাবার জন্তে খুব চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনো মতেই কিছু রক্ষা করা গেল না।

এক দিন বড়বাড়ীর কর্তা চাষার ছেলেকে ডেকে বলেছিল তার ভিটে বিক্রি করতে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, বড়লোকের ছেলেই চাষার ছেলের কাছে নিজের বসতবাড়ী বিক্রি করে সহরে পালিয়ে গেল।

চাষার ছেলে আরও উঁচু করে আর ভালো করে লক্ষী-প্যাচার একটি বাসা তৈরী করে দিয়েছে। সেইখানে যেন লক্ষী-প্যাচা চাষার ছেলের চার সিককার মাঠের ডেউ-খেলানো। ধানের শীষ লেখে আর আপন মনে কি যে বল সেই জানে।

লক্ষী-প্যাচাতে আর চাষার ছেলেতে এখন ভারী ভাব।

—ইতিহাস যারা তৈরী করে—

শালেকলাগার দি এমই

প্রিন্টার্স কলিকতা

রাজ্যের চতুর্দিকে তখন মহা বিপদ এবং মহাশত্রু। ম্যাসি-ডেনিয়ার চরম দুর্দিন তখন।

লোকে তাঁকে পরামর্শ দিলে গ্রীসের অধিবাসী আর সীমান্ত-বিশ্রোহীদের মিঠে কথায় শাস্ত করতে, কাজ নেই আর ধ'রে।

তিনি শুনলেন না সে কথা। বললেন, কাণ্ডকারখানা ও-রকম বলে।

চলো তাঁর সৈন্য ড্যানিয়ুব নদীর তীর পর্যন্ত এবং ঘটালে রাজ্য সারমাসের পতন।

খাওঁপালির গিরিপথ দিয়ে গিয়ে ক্ষীরণ আর এয়িনীয়ানদের বিপ্লবও তিনি চূর্ণ ক'রে এলেন থাকে ডিমছিনিসের মত জানী, বালক ব'লে উপহাস করেছিলেন।

খাবসু সহজে বশুতা স্বীকার করেনি। তাই সেখানকার যুদ্ধ হ'ল এত ভয়ঙ্কর, যাতে সমস্ত গ্রীসের আন্তর হ'য়ে গেল। নগর ত লুণ্ঠিত হলই, ত্রিশ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস ক'রে বিক্রী ক'রে দেওয়া হল, ছ'হাজারের বেশী নাগরিককে শাসিত তরবারিতে বিধৃত করা হল।

টিমোক্রিয়া ব'লে একটি মেয়েকে আলেকজান্ডারের সৈন্যরা এসে যখন জিজ্ঞেস করলে কোথায় তার ধনবস্তু? সে দেখিয়ে দিলে একটি পাতকুয়া। যেই না এরা স্ব'কে দেখতে গেছে, দিলে তাদের ঠেলে ফেল, আর তার ওপর চাপালো ভারী ভারী পাথরের বোকা।

তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি কিন্তু মুক্তি দিলেন বীরান্না ব'লে।

সিংহ তার বিক্রমের পর যেমন শাস্ত হয়, এই যুদ্ধের চরম নৃশংসতার পর তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন আলেকজান্ডার।

কমা করলেন তিনি সমস্ত বিশ্রোহীদের, করতে লাগলেন সকলের প্রার্থনা পূরণ।

এর পর গ্রীসের অধিবাসীরা তাঁকে সেনাপতি ক'রে পারশ্ববিজয়ে যাওয়া স্থির করলে, তার পর ভারতবর্ষ।

চারি ধার থেকে পণ্ডিতেরা এলেন তাঁকে আশীর্বাদ করতে—এলেন না শুধু ডায়োজেনিস, সেই বিখ্যাত দার্শনিক।

অগত্যা আলেকজান্ডারই ছুটলেন তাঁর কাছে।

ওয়ে ওয়ে রোম পোহাছিলেন পণ্ডিত, খুব কাছে গিয়ে কাঁড়ালেন আলেকজান্ডার, তবু তিনি ঘাড় ফিরিয়েও দেখলেন না।

সম্রাটের দুঃসাহস।

বললেন, আপনার যদি কোন প্রার্থনা থাকে আমি পূরণ করতে প্রস্তুত।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জবাব এলো, প্রার্থনা এই যে, বাপু, বোনটা ছেড়ে সরে কাঁড়াও।

বিস্মিত সম্রাট চলে যেতে যেতে অল্পচরদের বললেন, সিংহাসনের চেয়ে এমনি পাণ্ডিত্যই কাম্য।

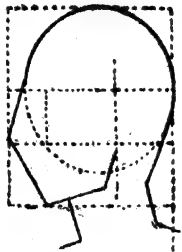
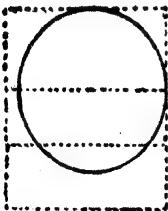
আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম কি হবে, জানবার জন্তে তিনি যে দিন আপলোর মন্দিরে গেলেন সে দিনটা খুব শুভ ছিল না, তাই পূজারিণী ভবিষ্যবাণী করতে নারাজ ছিলেন।

তবু মহিলাটিকে দিয়ে বলাবার জন্তে স্বয়ং আলেকজান্ডার যখন তাঁকে হিড়-হিড় করে টেনে মন্দিরে নিয়ে এলেন তখন শুধু রাগে মাথায় তিনি বলে ফেললেন, আঃ, তোমার সঙ্গে পেয়ে ওঠা মুশ্বিল!

অমনি আলেকজান্ডার বললেন, হয়েছে, এই বাণী সফল করে আমি যাত্রা করব—আমার সঙ্গে পেয়ে ওঠা মুশ্বিল, আমি অজ্ঞে আমি দুর্দমনীয়া।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে সামান্য জরে তিনি মারা গেলেন কি চিরকালের জন্ত হ'য়ে রইলেন আলেকজান্ডার দি গ্রেট।

ছবি আঁকা শত কি? প্রীতনোবজ্ঞান চক্রবর্তী



—দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে—

রুশিয়া

শ্রীধীরেন্দ্রলাল দর

দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই সবার আগে মনে পড়ে রুশিয়ার ছেলেমেয়েদের কথা। ওরা যত বেশী সুখ-সুবিধা পায়, পৃথিবীর আর কোন দেশের ছেলেমেয়েরা তা পায় না।

ছেলে-মেয়ে জন্মাবামাত্রই আর সব দেশের মত সরকারী খাতায় লেখানো হয়। ডাক্তার আর নার্সের নিয়মিত ভাবে খবরদারী করেন—ছেলে কেমন আছে? ছেলের মা কেমন আছে? মিউনিসিপালিটি থেকে বাঁটি দুধ বরাহ হইবে ঝাঝ ছেলের জন্ম। অবশ্য এ-সবের জন্ত খরচ লাগে না এক পয়সাও। ছেলে-মেয়েরা যে জাতীয় ভবিষ্যৎ, সেই জন্ত ছেলে-মেয়ে মানুষ করার সব দায়িত্বই সরকারের।

ও-দেশের নিয়ম হোল, যে কাজ করবে না সে বাবে না। শিশুর দু'মাস বয়স অবধি মায়ের ছুটি থাকে, তার পরেই মাকে আবার কাজে বেরতে হয়। তখন সন্তানের থাকার ব্যবস্থা হয় শিশুমঙ্গলে।

শিশুমঙ্গল ছেলে-মেয়েদের আশ্রম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বাড়ী। সামনে খেলার মাঠ, ফুলের বাগান। গ্রীষ্মের দিনে ছেলে-মেয়েরা বাগানেই থাকে, খেলাধুলা করে। আর শীতের দিনে বাগানে ছোট ছোট তাঁবু পড়ে। বত-দূর সমস্ত ছেলেমেয়েদের মুক্ত আলো-হাওয়ায় রাখা হয়, যাতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। সেই জন্ত সময় মাসিক খাওয়া-দাওয়াও প্রচুর আয়োজন আছে। তাছাড়া নার্স' আর ডাক্তারের সজাগ চোখ সদা-সর্বদা জেগে থাকে প্রতিটি শিশুর উপর।

শিশুদের সারাদিন এই শিশুমঙ্গলেই কাটে। মায়েরা সকালে কাজে যাবার আগে ছেলেমেয়েদের পাটিয়ে দেয়, আর ডিউটি শেষ করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরার সময় শিশুক নিয়ে আসে। এখানে ছেলে-মেয়ে রাখার জন্ত বাপ-মায়ের কোন খরচ লাগে না।

এক-একটি শিশুমঙ্গলে দেড়শো-দু'শো করে শিশু থাকে। সারা দেশময় এই ধরণের শিশুমঙ্গল আছে হাজার হাজার।

চার বছর বয়স হতেই ছেলেমেয়ের পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল কিণ্ডারগার্টেনে ইচ্ছুলে। সেখানে খেলা করে 'গল্প বলে' ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া আর নানা কাজকর্ম শেখানো হয়। তারা বুঝতেই পারে না যে, তারা লিখছে, পড়ছে, কি কাজ লিখছে।

বছর তিনেক তো এই ভাবেই কাটলো, সাত বছর বয়সেই ডাক পড়লো—'খোকা-খুকুকে ইচ্ছুলে যেতে হবে'। 'ইচ্ছুলে পাঠাবো না' বললে চলবে না। 'আমি গরীব, আমার এই সব অসুবিধে', 'আমি বড়লোক, আমার এই সব সুবিধে চাই' এ কথা কেউ শুনবে না। ছেলে-মেয়ের সাত বছর বয়স হলেই ইচ্ছুলে যেতে হবে—এই হোল আইন। ইচ্ছুলে কারুর কোন মাইনে লাগে না; গভর্নমেন্টের টাকায় ইচ্ছুল চলে।

ইচ্ছুল বসে সকাল আটটায়। ঢা ঢা করে প্রথমেই পড়ে খাবার

তার পর আবার বটা—ঢা ঢা—ইচ্ছুল বসলো। স্কুল হল রীতিমত পড়াশুনা। পড়াশুনা মানে আমাদের দেশের মত বই মুখস্থ করা নয়। আমাদের বই দেখে পড়া তৈরী করাও নয়। যে বইসের ছেলে-মেয়ের যেমন বুদ্ধি তাদের সেই রকম বই দেওয়া হয়, যা পড়ে তারা বুঝতে পারবে। আমাদের ইউনিভার্সিটির মত এক গালা বই আর সিলেবাস চাপিয়েই সে দেশের শিক্ষাবিদেব্রা মনে করেন না যে, ছেলে-মেয়ের বিত্তে খুব বাড়িয়ে দিলাম। সে দেশের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ছেলে-মেয়েদের সত্যিকারের শিক্ষা দিতে চান, সে জন্ত তাঁরা মাথা ঘামান ব্যেটে। কোন ছাত্র পড়াশুনার খারাপ ছলে, কেন খারাপ হোল, শিক্ষকেরা তা জানবার চেষ্টা করেন। নিজে পড়ানোর দেখ কি, ছাত্রের বুদ্ধির দোষ—যাই হোক তখনই নেবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করেন, নিজে শোধরাতে না পারলে অন্য শিক্ষকের সাহায্য নেন। এই সব ব্যাপারে আলোচনার জন্ত শিক্ষক-সংঘ আছে। উত্তম-মধ্যম প্রহরের ভর দেখিয়ে সর্ব্ব দোষ চাপা দেবার চেষ্টা কেউ করে না। মাষ্টাররা লুকলুকে বেত হাতে নিজেও ক্রাশে ঢোকে না। ছেলে-মেয়েদের এরা বন্ধু বলে মনে করে। ছেলে-মেয়েরাও এদের কাছে মন খুলে দেয়, কোন ভয়ের গভী থাকে না।

প্রতি ক্রাশে ছেলে-মেয়েদেরও এক একটি সংঘ থাকে। সংঘের সব-সেরা পড়ুয়া আর সব-সেরা খেলোয়াড় ক্রাশের দলপতি হয়। এদের কাজ হোল ক্রাশের প্রত্যেকটি ছেলের উন্নতির দিকে নজর রাখা। আর কি করে শৃঙ্খলা রক্ষায়, স্বাস্থ্য রক্ষায়, পড়াশুনার নম্রয়ে, খেলাধুলায় তার ক্রাশ ইচ্ছুলের আর সব ক্রাশকে ছাপিয়ে বাবে সেই চেষ্টাতেই দলপতির ব্যস্ত থাকে। এবার সব কটি ক্রাশের, সংঘ এক হয়ে ইচ্ছুল-সংঘ হয়, তারা চেষ্টা করে তাদের ইচ্ছুল কি করে সেই অবসরের আর সব ইচ্ছুলকে ছাড়িয়ে উঠবে। এই সব সংঘপত্রিকে ওদের দেশ বলে 'পায়োনিয়ার'। এরা গলায় একটি করে লাল টাই বাঁধে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এদের কাজে সর্ব্বোত্তমভাবে সাহায্য করেন।

দুপুরে একটা থেকে দু'টো অবধি আবার খাবার বটা পড়ে। তার পর স্কুল হয় হাটের কাজ শেখা—চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, লোহার কাজ—যার যেটা পছন্দ সে সেইটি শেখে। কোন বিষয় কড়িক জোর করে শেখানো হয় না।

ছেলে-মেয়েদের রুচি তৃষ্টি করার জন্ত সহরে সহরে শিশুসৌধ আছে। আমরা তাকে রূপকথার রাজ্য বলতে পারি। একাও বাড়ী। বড় বড় এক একখানি হলঘরে এক এক রকমের ব্যাপার। কোথাও ঘর ভরা রকমারি পুতুল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে বসে খেলছে। কোন ঘরে গিংগা, ক্যারাম, ব্যাগাটেলি। কোন ঘরে ব্যায়াম চলছে, ছেলে-মেয়েরা বড় বড় আয়নার সামনে দেখছে শৈল্পী নর্তন। কোন ঘরে চলছে গান-বাজনা, কোথাও বা ফটোগ্রাফি। কোন ঘরে বকুতা, আবৃত্তি আর অভিনয়ের মহলা চলে। কোথাও বড় বড় শিল্পীর ছবি টাঙানো আছে। ছেলেমেয়েরা তাই দেখে ছবি আঁকা লিখছে। কোন ঘরে পুতুল গড়া হচ্ছে, কোন ঘরে হুটিশিল্প, হাঁটকাট চলছে। কোথাও স্বপ্নপাতি নিয়ে ছেলে-মেয়েরা বসে ইম্বিন, জাহাজ, কলকারখানার মডেল তৈরী করছে ব্যস্ত। কাউকে কোন ঘরে জোর করে ঘরে রাখার চেষ্টা নেই

নিয়ম-কানুন। কোন নৃত্য

এলে, শিকড়িত্রী তার হাট ঘরে দিনের পর দিন এক ঘর থেকে আর এক ঘর দেখিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যত দিন না ছোটটি মনস্থির করে কোন ঘরে বসতে পারে, তত দিন তাকে ঘোরানো হবে—প্রদর্শক কোন বিরক্তি প্রকাশ করবেন না।

এই সব শিশু-সৌখণ্যলিকে আমরা এক একটি ক্লাব বলতে পারি। এখানে ছেলেদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের যত্না বেশী সহায়তা করে এমন আর কিছুতে করে না। এখানকার কলকলার ঘরে বসে ছোটরা খেলাচ্ছিলে এমন অনেক কিছুই মডেল তৈরী করে বসে যা দেশের লোকের অনেক কাজে লাগে। ছোটদের তৈরী প্রায় শ'-দেড়েক যন্ত্র সরকার গ্রহণ করেছে, এবং দেশের সর্বত্র সেই ধরণের যন্ত্র চলছে।

ছোটদের কোন ব্যাপারকেই সে দেশে ছোট করে দেখা হয় না। ছোটদের আনন্দ দেবার জন্য যেভাবে দিনে তিন বার তাদের আসর বসে। ছোটদের জন্য সহরে নাট্যশালা আছে, সেখানে কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা নাটক অভিনীত হয়। সর্বত্রই ছোটদের জন্য সিনেমা আছে, সেখানে ছোটদের মনোমত বত ছবি দেখানো হয়। ছোটদের নিজস্ব ঠুঙিও আছে অনেকগুলি, সেখানে ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই নিজের মনোমত ফিল্ম তোলে। কশিয়ার ছেলেমেয়েদের জন্য দৈনিক খবরের কাগজ আছে তিল্লালখানি। সাপ্তাহিক কাগজ আছে অনেক, আর মাসিকের তো ছড়াছড়ি। ছোটদের জন্য শুধু গল্পের বই-ই ছাপা হয় বছরে প্রায় চার কোটি। অনেক বড় বড় সহরে ছোটরা রেল-লাইন পেতেছে, সেখানে তারা নিজেরাই রেলগাড়ী চালায়, তারাই ড্রাইভার, ট্রেন-মাস্টার, সিগনালার। কোন কিছু ভুলে গেলে নিজেরাই নিজের কারখানায় সারিয়ে নেয়। সেই ট্রেনে যাত্রীচলানো করে। ওডেশাতে ছোটদের জন্য একটা নকল বন্দরও আছে, সেখানে ছোটরা ছোট ছোট জাহাজ চালায়, জাহাজ তৈরী করে, জাহাজ মেরামত করে।

ইকুলের পড়াশুনা শেষ করে ছোটরা যায় শিশুসোখা, সেখানকার মজলিশ শেষ করে তারা বাড়ী ফেরে রাত দশটায়, ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আগে তাদের আর একবার খাওয়া-পাওয়া পালা শেষ হয়।

স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। নিজের দলের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের উপর পায়োনিয়ারের দৃষ্টি থাকে। কার চোখে জল গড়াচ্ছে, কার গীত পোকায় খাচ্ছে, কে একটু ছুটে হাঁপিয়ে পড়ছে, ইকুলের ডাক্তারের কাছে তখনই রিপোর্ট যায়। তখন থেকে রোগীর রীতিমত চিকিৎসা শুরু হয়। প্রত্যেক ইকুলেই এক এক জন ডাক্তার আর একটি করে ডিসপেনসারী আছে। নার্সও থাকে। তাছাড়া উঁচু ক্লাশের অনেক ছেলেমেয়েই মোটামুটি নার্সি বিজ্ঞতা শিখে রাখে।

ইকুলে যখন লম্বা ছুটি থাকে—গ্রীষ্মের ছুটি, বড়দিনের ছুটি, তখন ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। এক একটি দল এক এক জায়গায় যায় বেড়াতে। সেখানে তাদের 'দ্রীদ-শিবির' বসে। সঙ্গে থাকেন শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার ও নার্স। সেখানে ছেলে-

ওদেশে শরীরচর্চার ডিগ্রি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে হাতে-কলমে রীতিমত শিক্ষা দেবার জন্য পাঁচটি সরকারী কলেজ আছে। সেখান থেকে যারা পাশ করে বের হয়, তারা স্বাস্থ্যোত্তির প্রচারকার্য চালায় সারা দেশে। তাদের চোঁচর আজ ওদেশের বিশ কোটি লোকের মধ্যে 'অল-রাউন্ড-স্পোর্টসের' ব্যান পেরেছে প্রায় পঞ্চাশ লাখ ছেলে-মেয়ে। শুধু ফুটবল টাইমই আছে চার হাজার। সারা দেশ জুড়ে খেলাধুলার ট্রেডিসম আছে সাড়ে ছ'শো। মন্ডো সহরে এমন ট্রেডিসমও আছে যেখানে বসে নকল ই হাজার দর্শক খেলাধুলা দেখতে পারে।

প্রতি ইকুলেরই এক একখানি হাতে-লেখা সাপ্তাহিক কাগজ আছে, তাতে প্রত্যেকটি ক্লাশের সাপ্তাহিক খবর থাকে, বাস-প্রতিবাদ আলাপ-আলোচনাও থাকে।

ছেলেমেয়ের জন্মস্থান হলে হাসপাতালে থাকতে হয়, সে জন্য ডাক্তারকে কোন কী দিতে হয় না, ওষুধেরও দাম লাগে না।

আঠারো বছর বয়স অবধি প্রাথমিক ইকুলে পড়াই নিয়ম, তবে যে তার আগেই সব মান শেষ করতে পারে তার পক্ষে অন্তর কথা। ইকুল থেকে বেরবার পরেই ছেলেমেয়েরা চাকরী পায়, চাকরীর জন্য কাড়কে কখনো উমেশারী করতে হয় না। তবে যে সব ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণের চেয়েও উপরের স্তরের বলে শিক্ষয়িত্রীরা মনে করেন, তাদের আর কারখানায় চাকরী নিতে হয় না। তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কারখানায় চাকরী নিলেই যে চাকর পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তা নয়। কারখানায় চাকরী নিলেই সেখানকার কন্সট্রাক্টর সংঘের সভ্য হতে হবে। সভ্যদের জন্য রায়ে ক্লাব বসে, ইচ্ছা করলে যে কোন কন্সট্রাক্টরী কাজের শেষে বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারে। তুমি ম্যাট্রিক পাশ, অনুক বিষয় শেখা তোমার কথ নয়, তুমি আই-এস-সি পাশ নও, এ জিনিষ তুমি শিখতে পারবে না—এ সব বিধি-নিষেধের ভণ্ডামি সে দেশে শোনা যায় না। যা শিখতে মন চায়, চেষ্টা কর, শিখতে পারবে—এই হোল ওদের দেশের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটা ওরা বড় বলে ধরে না, জ্ঞানের আলোচনা আর জ্ঞানবুদ্ধিকেই ওরা উচ্চশিক্ষা বলে মনে করে।

ওদেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ইকুলে তারা একসঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে খেলাধুলা করে। বড় হয়ে কলকারখানা, চাষ-আবাদ, আফিস-ইকুল, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বত্রই তারা সমভাবে কাজ করে যায়, কোথাও কোন বাধা নেই। এখন আবার তারা একই সঙ্গে জলে হলে আকাশে যুদ্ধ করছে এবং এই যুদ্ধে যোগ্যতা দেখিয়ে অনেক মেয়ে সেনানায়কের পদমর্যাদাও লাভ করেছে।

বর্তমান কশিয়ার সোভিয়েট গভর্নমেন্ট ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের মানুষ হবার যে সুযোগ দিয়েছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে আর কোন জাত তার ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করার জন্য

র মনের টানটা ছিল মুহারই ওপর। ক্ষত্রিয়দের প্রতি তাঁর এই ঈগত বিবেক উত্তরাধিকার-স্বত্রে নটি ছেলেই মনে বেশ ভাল বেই চেষ্টা বসেছিল। তার কলে তারা হ'য়ে উঠছিল যৌবতর পাচারী।

নয় ছেলের যখন ভয়া যৌবন, তখন তাদের ভয়ানক উচ্ছ্বাস বি দেখে বুড়ো রাজা নশ বৃত্তে পারলেন যে, তিনি মারা গেলে ঐ এই নয় ভাই সিংহাসন নিয়ে পরম্পর মারামারি ক'রে এত বড় বংশাল সাম্রাজ্য একেবারে ছারেখারে দেবে নিশ্চয়। তাই তিনি টেবুন্ডি বিচক্ষণ প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসকে গোপনে ডেকে নানা রকম

পরামর্শ করলেন কিছু দিন ধ'রে। শেষে দু'জনে মিলে স্থির করলেন যে, বুড়ো মহারাজ বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁর রাজসিংহাসন এই ন'জন ছেলের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন। ঠিক হ'ল—নয় ছেলের প্রত্যেকে পালা ক'রে এক এক বছর রাজত্ব করবেন। প্রথম ছেলে—প্রথম বছর; দ্বিতীয় ছেলে—দ্বিতীয় বছর; তৃতীয়—তৃতীয় বছর। এই ভাবে নবম ছেলে নবম বছরে রাজ্য করবার পর আবার প্রথম ছেলে দশম বছরে রাজ্যের অধিকার পাবেন। আবার ঠিক আগের মত নিয়ে রাজ্য করার পালা চলতে থাকবে।

[ক্রমশঃ।

জীবন-জয়ন্তী

বিমলচন্দ্র ঘোষ



[কোন এক কিশোর কবিক]

হে কিশোর কবি প্রবাসী ভাইটি মোর

দু'চোখে তোমার কিসের স্বপ্ন-বোর ?

আমি যে দেখতে পাই।

কি কবিতা চাও তানি না আমার কাছে

দেবার মতন কি-ই বা আমার আছে ?

শোনো স্তব্ধের ভাই।

ত্রিভুবন ছুড়ে স্বার্থের হানাহানি

বীভৎসতম হস্তের কালাপানি

তবু হ'তে হবে পার।

আমরা মানুষ কালের অমর ছেলে

যুগিত স্বার্থ পায়ের তলায় ফেলে

ভাঙবাই কারাগার।

যে কারায় আজো লাখো মানুষের প্রাণ

লঘিষ্ঠতম স্বার্থের বলিদান

শোষণের হাড়িকাঠে।

আমরা জাগাবো, জাগাবো লক্ষ মন

সমহার্য যতো বকিত জনগণ

জাগাবোই মাঠে মাঠে।

মানুষের মুখে দেবো মানুষের ভাষা

লাঞ্ছিত বৃকে জাগাবো অজ্ঞেয় আশা

জীবনের বেদগান।

আমাদের গানে নিখিলের নরনারী

শত্রুর বৃকে মুক্তির তরবারি

হানিবেই খরশাণ।

জীবন-জোয়ারে দৃপ্ত ঘোড়ায় চড়ে

চবোই সোমার বার বার উঠে পড়ে

অযুত কণ্ঠে একটি উদার গান

নিঃশেষে চাই শোষণের অবসান

এক সুরে সুর সাধা।

যুগ যুগ ধরে খেয়েছি অনেক লাখি

কেটেছে কতই দুঃখের অমারাতি—

বার বার অপমানে,

কত ঝড় কত ভূমিকম্পের বৃকে

ভীমবজ্র দাবানলে কৌতুকে

জাগেনি শঙ্কা প্রাণে।

কত মাংসাশী অতিকায় প্রাণীদল

দিখিজয়ীর হিংস্র সৈন্তদল

হেরে গেছে বার বার।

মানুষ মরেনি, মরতে পারে না কভু,

মৃত্যুর বৃকে লাগি মেরে হয় প্রভু

জীবমাতা বসুধার।

হে কবি বন্ধু, প্রবাসী ভাইটি মোর

আমাদের চোখে সোনার স্বপ্ন-বোর

প্রাণময় জগতের।

মরা-পৃথিবীর পুরোনো চামড়া খুলে

নবীন অঙ্গ সাজাবো প্রেমের ফুলে

মালা গেঁথে মিলনের।

আমাদের প্রভু হলধর বলরাম

সোনার লাঙলে চিরমানুষের নাম

লিখে যায় ইতিহাসে।

রাষ্ট্রিক বেগে মহামানবের ঘোড়া

মোদের বাহন ছুটবে জগত-জোড়া

সাম্যের উজ্জ্বলে।

ইনটারভিউ

অ, কৃ, ডা,



১

মালা তুলসী বটে গেল সেই বাঁহী।

হেড মিস্ট্রেস্ মৈত্রেয়ী শি' পুনঃ ঘাইয়েন কলিকাতা।

মালা শি' বললেন শুনে, দুখ বৈকিটেই বললেন : এবটী মনো
আবার...এটী ত সে-দিন আদ্যলেন যবে...নাঃ, বার বার আমি পাব
না তুল সামলাতে। যে সব দ্রুতি মেয়ে হয়েছ সব।

মালা শি' হাসিমুখে হেড মিস্ট্রেস্।

কেন বার বার এই বাওয়া-আসা?—কৌতুকভা ভাষে জিজ্ঞাসা
করেন অস্তের সিঁহিমাশ নীহার শি'। শুধু কৌতুক নয়, মেগাধার
গভীরে কোন রহস্যের সন্ধানও যেন তিনি জানেন, এমনি তার
প্রশ্নের সুর।

মৈত্রেয়ী শি'র এই ঘন ঘন কলকাতা বাওয়া-আসাটা তুলসীর নিকট
একটা দুর্কোথা হৈছিল। আগে এটা শুধু সিঁহিমাশের মধ্যেই
সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তার চেউ মেয়েদের মধ্যেও ছড়িয়েছে।

সে সব কথা চিন্তা করেই মালা শি' বললেন উচ্চ হারে : তা কি
করে বলব—বলে না কি কিছু আমায়ের...

নীহার শি' কিছু করে হেসে বললেন : নাইন ক্লাসের ফর
মেয়েগুলো কি বলে জানেন?

মালা শি' জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন করেন : কি বলে তিনি?

মুচকি হেসে ফিস্ ফিস্ করে নীহার শি' বললেন : বলে হেড
মিস্ট্রেস্ না কি প্রোমে পাড়ছেন...

বলে নিশাঙ্কে হাসতে লাগলেন।

হুঃ! গা ঝাঁড়া গিয়ে বললেন মালা শি'।

তা এতে আকর্ষণ কি? নীহার শি' মেয়েদের বটনায়ই ওকালতি
করেন; এমন শু কতই হয়ে থাকে...

কি আর আছে এখন তার—আর শিল্পের সেই বিপজ্জনক
seasons-এর বহনগুলিই এখন সিঁহিমাশে পেরিয়ে এলেন এখন শু
ও-সব কাটিয়ে উঠতে পারছেন সহজে! এই উত্তর-পাশি সোধ-ও
প্রতাপ, গভীরামনা, হৃদয়ভা হেড মিস্ট্রেসের মনে কি লাগবে
কান্ডনের গোলা? হুঃ, হুঃ, একবারে অস্তর কল্লা। তুলসীর হেড
মিস্ট্রেসকেই ওকে চিরকাল মানাবে ভালো—কোন ভুলসোকে
প্রেরণারূপে নয়...

নীহার শি' বললেন : কিন্তু তার এই বার বার বাওয়া আসাটা
অনেকের কাছেই যে শুধু রহস্যময় ঠেকে তা নয়—বেশ হাস্যোৎ
করে তুলেছেন অনেক। তা জানেন...

হ্যাঃ, তা সভা বটে।

মালা শি' হার মানলেন। এবাং জিজ্ঞাসা করতেই হবে মৈত্রেয়ী
সেইকে। এত পেশুসেলনের দরকার কি?

শনিবারে ছুটির পূর্ব মালাশি পার্শ্বস্থলের সিঁহিমাশের মধ্যে
সেছিল বহিরাবের হেড মিস্ট্রেসের কলকাতা বাওয়া নিয়ে আলোচনা।
তার অসাক্ষাতেই। হুটী সিঁহিমাশি সব আদেই চলে গিয়েছিলেন;
তরুণ-বয়সীরা তাই অব্যবহায়ে তুলেছিলেন অপিস-বরে
শনিবারের বৈকালিক ঠৈক।

মনী শি' চুপ করে শুয়েছিলেন আলোচনা। এক হেড মিস্ট্রেস্
ছাত্রা তুলসীর সব সিঁহিমাশের মধ্যে তার ডিট্রীগুলিই সব চেয়ে বেশী
ভয়কালো। এই অকল্পিত আত্মভিমান এক কিকি লাঙ্ক
প্রকৃতির জন্ত তুলসীর আর আর সিঁহিমাশের থেকে তিনি যেন একটু
দূরে। কলকাতার মেয়ে—ইংরেজী ও বাংলায় উল্ল এক-এ। চাকরী
নেওয়াই নেওয়াই তার সময় কাটানোর একটা পথ—কলকাতার
চাপ নয়। মৈত্রেয়ী শি'র পরেই তুলসী তার হান, ছাত্রী ও সিঁহিমাশ
উভয় মহলেই।

মনী শি' শ্রুতী। কিন্তু চিন্তকের পাশের একটা বড় আঁচল তার
সৌন্দর্যের একটা বড় অংশ অসংকল করে বিচরেছে। মনী শি' নিজেই
তা যেন যেন বোঝেন।

মনী শি' চুপ করে শুয়েছিলেন আলোচনা। এ সব আলোচনার
বড় বেশী যোগ যেন না তিনি। কিন্তু আর তার ব্যক্তির সেবা
গেল। মহলা মনী শি' আক যেন মহা উৎসাহে মেতে উঠলেন এ
নিবে। মালা শি'র কথাব খেঁটী টেনে নিয়ে কলকাতা : আপনারা ত
কেউ করতে পারলেন না—কিন্তু আমি মেয়েছি তার এই ঘন ঘন
বাওয়া-আসার কারণ।

বলে বেশ আশ্চর্যপূর্ণ হাসলেন।

সত্যি জানতে পেরেছেন। হ্যাঁ?

তাওব উচ্চাসে বহনক সকলের কৌতুক যেন কেউ পকতে
চাইছে! চাকল্যের একটা জন্ত তথ্যের আশার তার চারি দিক
সকলে বনোদ্ধত হয়ে বসলেন।

মনী শি' এবাং পোশন শুভাটী উদ্ঘাটন করে বিলম্ব : আপনাদের
মৈত্রেয়ী শি' ত শিঁগিদিই চাকরী ছাড়ছেন...

কলকাতার মেয়েদের তার জীবন গেল। কলকাতা

নীহার সি' বললেন : সে ত বোকাই যায়—এ বাজারে ফুলের কলী করে নেহাত হতভাগীরাই... সাম্রাটতে, ওয়াকিতে কত ভালো সো চাকরী পাও রয়েছে...

মালা সি' বললেন, তা হবে, ইনটারভিউ নিতেই হয়ত মৈত্রেরী !' বায় বায় বান কলকাতায়...

ননী সি' াঁকা এসে বললেন : চাকরীর ইনটারভিউই ষটে। কিন্তু এ চাকরীটা অবৈতনিক যে। ননী সি' পুনরায় বহুসময় হয়ে উঠেন।

কিকলী সি' বললেন : বাঃ, অবৈতনিক চাকরী হলে তার চলবে কি করে ?

ননী সি' পতীর হয়ে বললেন : এত দিন সব মেসেরই ত চলে এসেছে—গুরই বা চলবে না কেন ?

সকলের মনে লম্বাচক্রে ধাঁধার আন্দোলন দেখা দেয়...

নীহার সি' বললেন : দেখা কথাই বলুন। 'অত' যোক-প্যাচে যাবেন না—শোহাই...'

ননী সি' এবার জিজ্ঞাসেন কথাটা : তার মানে আমি বলছি বিয়ের কথা। স্বামীর সঙ্গার আগলানো কি মেসেরের একটা চাকরী নয় ? আর এট চাকরী বাগানোর জন্য ক'নে দেখার নামে মেসেরের ইনটারভিউ ত চিরকালই চলে আসছে...

মালা সি' কহু কহু বললেন : তাহলে কি আপনি বলতে চান...

বাধা দিয়ে ননী সি' বললেন : আমি যা বলতে চাই তার মিকি ভাগও এখনও বলা হয়নি... একটু সবু বকুন না—

কল বার করলেন একখানা পুরোনো খবরের কাগজ। করে বললেন : একটা বিজ্ঞাপন আমি দেখছি আপনাদের—আমারই এক আত্মীয়ের সেওয়া বিজ্ঞাপনটা। জ্বলোক আই, সি, এম্। অবি-বাহিত। বয়স চল্লিশোর্ডি। বিয়ে করবেন না এ প্রতিজ্ঞা তাঁর কোন কালেই ছিল না। বোধ হয় বিয়ে করানি দরকার, তা আগে কোন দিনই খেয়াল হয়নি। সম্ভ্রতি হ'লু হয়েছে—বিয়ে করতে হবে। এ বিয়ের আবার সেই সনাতন প্রথা বধ্যাঙ্গা বেখে নয়—জার নিজস্ব পথেই তিনি সগঠনের ভার নিয়েছেন। সমগ্র প্রভাতী সংবাদপত্র হাফং তিনি বাংলাদেশের সব মেসেরের কাছে পাঠিয়েছেন আশা, তার বয়সকু-সজার যোগদান করবার।

কল পুরুত লাগলেন বিজ্ঞাপনটা।

পাত্রী চাই। সবকারী চাকুরীতে সুপ্রতিষ্ঠিত, আই, সি, এম্ পাশের জ্ঞান আধুনিক, উচ্চশিক্ষিতা, হুদর্শনা উপবৃত্ত পাত্রী চাই। পাত্র বহু নিকিট তারিখে ইনটারভিউ লইবেন ও পাত্রী যদোনয়ন করিবেন...

এখন হয়েছে কি জায়েন, তিনি আবার তাঁর নিজস্ব যদোনয়নের উদ্য ঠিক জরুর করতে পারছিলেন না। মেসেরের বাসিনের মেসার ব্যাপারে এক অব মেসের সহায়তা পেলেই যেন ভালো হয়। তাই আবার তিনি আশা করেছিলেন বয়সকু-সজার এক জন নির্ভর্য্য বিবাহের।

চৌধুরী হলে বসেছে সে দিন যেন চাঁদের হাট। কলব কি মালা সি', অল্প বয়স কলিল ভূ-ভারত থেকে এসেছে রাশি রাশি তরুণী—আই, সি, এম্দের সোনার ভবীতে ঠাই পাবার জন্যে... বীতিমত যেন সঙ্গারী অপিসের কেরাণী নির্বাচনের ব্যাপার।

একে একে চৌধুরী কল দিতে লাগলেন—সকলকে।

সৌন্দর্য্য, শ্রেমাব, ডিগ্রী, আভিজাত্য, ধন,—বহু মধ্যে এসব অনেকগুলি জিনিষের একটা সিনথিসিস্ চৌধুরীর লক্ষ্য। কিন্তু জমন ফরমাইসী মেসে বড় একটা সহসা পাওয়া যায় না। তাই অনভিজ্ঞতাদের কহতে লাগলেন অকৌশলে ফেল।

কাউকে জিজ্ঞাসা করেন গলক খেলার মাঠে ক'টা গর্ত, বেস বল খেলার বেস্ (base) কি ? কাউকে বা জিজ্ঞাসা করলেন : রোজ দেড় পোয়া করে ছাগলের দুধ খেলে জীবনে মহাত্মা ক'টা ছাগলের দুধ খেয়েছেন... ? এমনি সব জটিল প্রশ্ন...

অবশ্য চৌধুরী যে ঘরপের মেয়ে চান তা সহজে পেতে হলে সব চেয়ে সোজা পথ হল হলভু সব মেয়েকেই বিয়ে করা। একটিতে সব গুণ মেলা দুধর। একে একে তাই নিফল ইনটারভিউ দিলেন : গীতা মিশ্র এম-এ (ডবল)—বর্ণ শ্যাম (বিয়ের ভাষায়), ডবল ডিগ্রীর আবরণে তা ঢাকা গেল না। নীলিমা সেন—কি-এ, গীত-শ্রী, (কিন্তু নাক চ্যাগটা যে—আই, সি, এম্ বউয়ের নাক চ্যাগটা—এ কি কখনও সম্ভব হতে পারে—অতএব বাতিল)। অরুন্ধতী নাগ—পড়ন্ত ফিন-ষ্টার (কিন্তু ডিগ্রী নেই যে—খোং, আই, সি, এম্ বো-এর শুধু পদ্যায় লোকের মন হরণ করলেই চলবে না কি ? তার পর পাটিতে বাঘা বাঘা সাহেবদের দেখবে কে ?) উম্মিলা ডেক্টেবরম্ জাহার, কথাকলি নৃত্যগুরু, কল্লি নীক্ষিত, মালবিকা ভট্ট, বোলাবাণী পাকড়াশী (বেডিও), শীলা চট্টোপাধ্যায় (ববীক্স-সকীত) ইত্যাদি। কিন্তু কেউ মিঃ চৌধুরীর মানসীর কাছাকাছি পৌছতে পারলেন না।

‘আর হু’-এক জন হলোই সেদিনকার মত নির্বাচন-পরীকটা শেষ হত। এমন সময় ডায়িক্রমে ঘোষিত হল এক জনের নাম। যা শুনে আমি চমকে উঠলুম—এক তিনি ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটে পালালুম, প্রেক পালালুম।

এ যে আমাদের মৈত্রেরী দেবী।

বিষয়ের বিক্ষোভে সকল শ্রোতা আতঁনাদ করে উঠলেন : যাঁ ?

সত্যি ?

ননী সি' বললেন : জানি, আপনারা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না।

নীহার সি' এক হাত জিড কেটে বললেন : কেলেকারী...

মালা সি' বললেন : কপালে হাত দিয়ে প্রকৃতির প্রতিশ্রুতির স্মার কি, আগে বাগ-মা কত সেবেছে—আমি বিয়ে করব না—এখন... ভ্যাংচোতে গিয়ে দ্বতী হয়ে পড়ল সাহেন্সিকি। মালা সি' নিজে বিবাহিত।

বাত্তের বিধিমণি সম্বন্ধ সি' বললেন, বিবাহটা একটা নৈতিক প্রয়োজন। বয়স করুকই হবে তখন নাক স্টেটলানোর কি দরকার আগে—

হতীসের মধ্যে একমাত্র ছিলেন মেসার সি'। আর হুই করে

গল্পের পুত্র হারিয়ে যায় দেখে মালা মি' বললেন : থাকলে
-সব কথা...তার পর কি হল বলুন ত ?

ননী মি' বললেন : মৈত্রের মি'র ইনটায়ভিউ আমি দেখে
আসতে পারিনি। পরে শুনলাম, তিনিও না কি ফেল করেছেন।
ব'লে মুহু হাসলেন বঁকে।

যতদূর সকলের মুখে সঞ্চারিত হল সে হাসি।

এমন সময় সহসা অকস্মে কাল-বৈশাখীর মত ঘরে আবির্ভূত
হলেন মৈত্রের মি'। আরক্ত চক্ষু, কর্ণমূলে লালিমার প্রাবল্য...
যতদূর সকলের দিকে একবার চেয়ে দেখে বললেন : আপনারা এত-
ক্ষণ ধরে ত শুনলেন ননী মি'র গল্প। এবার বাকীটা শুুন আমার
মুখ থেকে...কেল শুু আমি একাই করিনি সে বিন-করেছেন
ননী মি'ও...

সর্বনাশ! আড়ালে টাড়িয়ে সব শুনেছে না কি ?

তার মানে ? আমতা আমতা করতে করতে বললেন ননী মি'।

মনভর-মার্জা চোখে তার দিকে তাকিয়ে সকলকে তুলিয়ে
বললেন মৈত্রের মি' : মানে, চৌধুরী ভাই-জমে আপনি সে বিন
উপস্থিত ছিলেন নির্বাচকরূপে না নির্বাচনপ্রার্থিরূপে ? সে সত্য
কথাটা আপনিই যখন বললেন না, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই
বলতে হল। শুুন আপনারা,—সে বিন ননী মি'ও চৌধুরী
হলে উপস্থিত ছিলেন—নির্বাচকরূপে নয়। নির্বাচনপ্রার্থিরূপে...

তারি একটা সবকের সম্ভাবনা ছাড়া কল্পি কালেও চৌধুরী পদ
তার কোনই সম্ভাব্য নেই...

মিথো কথা, মিথো কথা, একেবারে মিথো—ননী মি' কিন্তু হঠাৎ
বললেন।

তা মিথো হতে পারে এ কথা। কিন্তু চৌধুরীর নিয়োগে ননী
মি' যে ফেল করেছেন, তা ত আর মিথো নয়...আর করেছেন ঐ
ধৃতনির উপরকার আঁচলিটার জন্মেই...

মা গো! এত বানিয়ে বলতেও পারে লোক।

গলায় আরক্তা আঁচলিটা ঘরে বললেন ননী মি'...
কলতে সহসা চক্ষু করে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে—

এ কি এ কি! সকলে আতঙ্কিত করে উঠলেন।

ধর ধর তোমারা সবাই ননী মি'কে।

ননী মি'র আবার কিটর ব্যারাম।

২

মুহূর্ত্ত জাকলে পর ছোট্টলে ননী মি' মৈত্রের মি'র বাক্যে
শনিবারের বিকলে না হয় বানিয়ে একটা নজর পড়েই বসেছিল।
তাই বলে রেস গিয়ে আমার অবন জন্মে সকলের সামনে নাড়া
করলেন কেন বলুন ত...

মৈত্রের মি' বৃহৎসে বললেন, আসে কি জানকুম আপনি এত
সেনটিমেন্টাল! এক জন্মেই মুহূর্ত্ত পড়লেন...

কর্মহরত

প্রচলিতকর্ম দর্শনাচায়া

মাহুরের পরম প্রয়োজনীয় বস্তুই হইল মোক, এই মোক-
লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রাক্ত নিয়ম কর্মই তার এক
মাত্র সহায়। কাশ, শাস্ত্রাক্ত কর্মের দ্বারা মন অত্যন্ত পবিত্র
হইলে তবে আত্মদর্শন হইয়া মোকলাভ হয়। অতএব
মোকলাভ করিতে হইলে শাস্ত্রাক্ত ব্রতাদির কর্ম করিতেই হইবে,
এক তাহাই ধর্ম, এক ধর্মই মাহুরের প্রকৃত বন্ধু, কর্মের
দ্বারাই লোক সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া যায়। সেখানে পাই, যিনি
ধাঞ্চিক হন তিনি কখনই কোন অর্থ করিতে পারেন না।
অর্থের কোন সম্ভাবনা হইলে ধর্ম তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর বাধা
প্রদান করিবেন, তখনই তাঁহার মনে হইবে ইহা অজ্ঞান কাম, কখনই
ইহা ভয় হইবে না, ইত্যাদি। এই ভয় ধাঞ্চিক লোক ব্রতব্রতই সম্বল
হইয়া থাকেন এক সেই হেতু সকলেই তাঁহাকে আত্মবিক্রম করে ও
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। এ বিষয়ে একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি।
কলিকাতার এক জন ভক্তলোক ছিলেন, তিনি ধনী ও প্রসিদ্ধ ধাঞ্চিক;
তাঁহার এক জন বন্ধু ছিলেন তিনিও ধর্মপরায়ণ ও সমাজসেবিত। এই
লোকটির বিশেষ কার্যের ভক্ত হইয়া পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন
হয়, সেই ভক্ত তিনি এক দিন গলা হান করিয়া বাড়ী বাইবার সময়

মা গলা একমাত্র সাক্ষী থাকিলেন, এই বলিয়া এক ঘণ্টা গলাভল বন্ধ
রাখিলেন। তিনি তৎকালে সমস্ত ইহা এক জন কল্যাণীকে এ টাকা
দ্বিবার ভক্ত আদেশ করিলেন। কল্যাণীটি গোপনে তাঁহাকে বলিলেন,
এতগুলি টাকা এক কথার দিবেন, একটা কিছু পর লিখিয়া লইয়া
তবে দিলে ভাল হয়। তখন তিনি বলিলেন, এই ভ্রাতা বিশেষ ধাঞ্চিক
লোক জানি, ইনি যা লজাকে বন্ধ রাখিতেছেন, ইহা আপনাকে প্রেরণ
সাক্ষী আর কি হইতে পারে? অতএব নিশ্চয়ই সেটা ঘাইতে
পারে। তখন ভ্রাতাকে টাকা দেওয়া হইল, ভ্রাতা টাকা লইয়া চলিয়া
গেলেন, এক মাস পরে তিনি ঐ টাকা সম্পূর্ণ শোধ করিয়া গলাভল
উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। সেজন্য ধাঞ্চিক ব্যক্তির কথার এমনই
মূল্য যে তাহা লিখিত প্রমাণ অপেক্ষাও বৃহত্তর হয়, অথচ থাকিতে
তাঁহার মিথ্যা কথা বলেন না, এই ভক্ত সকলেই নিকট
অত্যন্ত লজ্জাজনন হন। আর এখন সেখানে পাই, লোক বেচুই
করা দলিল পর্যন্ত লজ্জা করিয়া দেয়। সত্য সত্যে কখন হইতে
গোপ পাইতে বসিবার, প্রত্যহা ধাঞ্চিক আর আশা কোথায়?
ধাঞ্চিক ভিন্ন কেহ কখনো সম্বল হইতে পারে না, অতএব লজ্জাক্ত
ধাঞ্চিকের দ্বারা ও ভক্ত করিতে হইলে ধর্মের পথিক আত্মবিক্রমিত

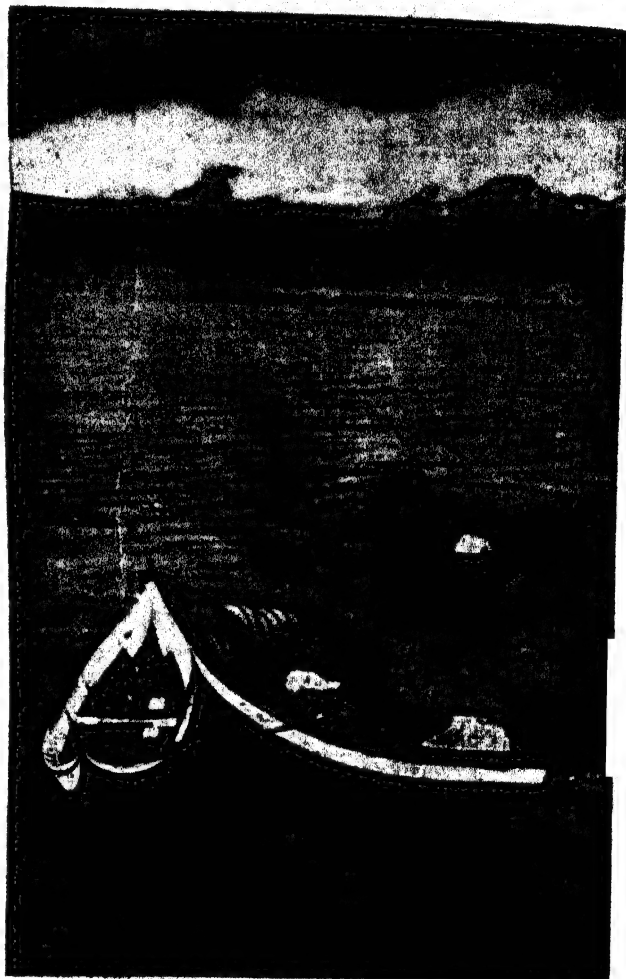
নবওয়ে

এ যুদ্ধে নবওয়ের পানে চাইলে সেখানের কাঁপা প্রতাপসিঁদেহ কথা মনে পড়ে। বোঙ্গল বান্দ্যাহের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি যেমন বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, বিজ্ঞান-সুখ উপভোগ না করিয়া কয়েক জন বীর অন্তর লইয়া অস্ত্রের মুহূর্ত পর্যন্ত বোঙ্গলের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, নবওয়েও আজ ঠিক সেইরূপ করিতেছে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সূচনা-কালে জাপানি বহন অন্তর্ভুক্ত নবওয়ে আক্রমণ করে, তখন প্রকৃত না থাকার কারণে নবওয়ে পরাজিত হয়। এ পরাজয় নবওয়ে মানিয়া লয় নাই। সমুদ্র-সমরে জাপানিকে প্রত্যাখ্যাত করা নবওয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই জাপানি হাতে আত্ম-সমর্পণের লালনা না সহিতে হয়, এ ক্ষেত্রে নবওয়েজিয়ান পার্লামেন্টের উপস্থিতি নবওয়ে-রাজ ক্রয়োল্ড হাকন তাঁহার গর্বমেন্ট-সম্মত আসিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লন; এবং সেখানে মিত্র-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়া সর্বতোভাবে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিতেছেন। তিনিই নবওয়ের স্বাধীনতার প্রতীক—তাঁহাকে ঘিরিয়া নবওয়েজিয়ানরা আজ মিত্রপক্ষের বিমান, বণতরী, নৌ-ও-স্থলকৌজ-বিভাগে অদম্য উৎসাহে কাজ করিতেছে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ জিতিলেও নবওয়ের বাণিজ্য-পোতগুলির শতকরা আশি ভাগ জাপানির কবলচ্যুত ও নিরাপদ রহিয়া গিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সব চেয়ে বেশী বাণিজ্যপোত ছিল বুটেনের—২১২১৫০০০ টন; তার পর মার্কিণের—১২০০০০০ টন। তার পর জাপানের ৫৬৩০০০০ টন; জাপানের পরেই নবওয়ের নৌ-বল—৪৮৩৫০০০ টন। ইহার মধ্যে অর্ধেকের উপর আনকোরা নূতন জাহাজ মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে নিশ্চিত কাজেই বেশ মজবুত। শতকরা ৬০খানি আধুনিক পদ্ধতিতে নিশ্চিত মোটর জাহাজ; ৪০ খানি অতিশয় ক্ষিপ্ৰগামী এবং আধুনিক রীতিতে নিশ্চিত ট্যাঙ্কার। নবওয়ের বাণিজ্য-পোতগুলি সরকারী ব্যয়ে নিশ্চিত নয়—সেগুলি সাধারণের অর্থে ও আত্মকূল্যে তৈরী।

হিটলারের কথার কণ্ঠশ্রুত করে নাই। নবওয়ের জাহাজ পাইয়া ব্রিটিশ জাহাজী-বিভাগের বসিয়াছিলেন—এ জাহাজ পাইয়া মিত্র-পক্ষ অস্বস্ত শক্তিবান হইয়াছে। এ জাহাজগুলির দ্বারা এক কোটি কোর্ডের ঘেরাও বেশী। এই জাহাজগুলির দৌলতেই মিত্র-বাহিনী সেই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে টর্ণজের, হাইন, ঘোমা ও শেল-প্রতিরোধে সফল হইয়াছিল। নবওয়ের জাহাজী-বাহিনী জীবনকে হুমকি করিয়া জল-যুদ্ধে সকলের পূর্বোক্ত পিতা ধাক্কাইয়াছিল। নবওয়েতে জাপানি অস্ত্রের মুখে এই সব নাবিকের শ্রী পুষ্ট করা বিপর



এই সব জেলে-ভিত্তিতে চড়িয়া নবওয়েজিয়ানরা লেণ্ডাংগ করে

জাপানির আক্রমণ ঘটানামাত্র নবওয়ে প্রায় ১০০০ জাহাজ—হিটলার শাসাইয়াছিল, জাহাজ ছাড়িয়া নবওয়েতে কিরীয়া ব্রিটিশ ও মিত্রপক্ষীয় বন্দরে পাঠাইয়া দিয়াছিল; জাহাজ হারাওয়া আসিয়া আমার সঙ্গে যোগ দাও, নচেৎ তোমাদের গৃহ-সঙ্গার নিশ্চিহ্ন

যে এক ছিল সে অধিকার করিতে পারে নাই। শুধু চর উচ্ছেদ এবং বহু জমি নিরোপিত। কবিয়া, নরওয়েজিয়ান ও বালক-বালিকাদের হত্যা করিয়াও হিটলার স্বাধীন-চিত্ত স্কেন্ডিনাভিয়ার চিত্ত-বাসে সর্ব্ব হইতে নাই।

তার পর যুদ্ধে নারিয়া জাপান বোকার-বোমে নরওয়েজিয়ান কক্ষে বহু প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছিল, প্রশান্ত মহাসাগরে নানী বন্দরগুলিতে তোমাদের জাহাজ আনিয়া ভিড়াও—তোমরা চাহিলে, দিবা। জাপানি ও জাপান—উভয় পক্ষই বহু যোষণায়

বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছে। তবে—বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছে।

যাচল আদায় হয়, তাহার উপরেই প্রধানতঃ নরওয়ের রাজ্য নির্ভর করিতেছে। এ ক্ষতির কতক বাহাতে পূরণ হয়, সে জন্য স্ট্রেট বুটেন নরওয়েকে বহু মাল-জাহাজ দিয়াছে,—ইজারা-কণ-রীতিতে আমেরিকায় নরওয়েকে বহু জাহাজ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

সশস্ত্রি বহিরা নরওয়েজিয়ান জাহাজ এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে যে ভাবে সাহায্য করিতেছে, তাহার তুলনা হয় না। তাছাড়া, ডানকার্ক এবং ক্রীট হইতে জনগণকে অপসারণ করায় তাহার কৃতিত্ব অসামান্য। কারণ, সে সময় নাইন ও সাবমেরিনে সমুদ্র-বন্দ সমাকীর্ণ ছিল, সে সবেয় আঘাত বাঁচাইয়া নরওয়েজিয়ান জাহাজগুলি যে ভাবে জন-সাধারণকে নিরাপত্তা কুলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সে কাজ আর কোনো দেশের জাহাজের পক্ষে সম্ভব হইত না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে উত্তর-আফ্রিকা-অভিযানে নরওয়েজিয়ান জাহাজগুলি জাখাডারূপে প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

নরওয়েজিয়ান জাহাজগুলির অধিকাংশই আধুনিক রীতিতে গঠিত এবং বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পরিচালিত। তাদের গতিবেগ অতিশয় দ্রুত। এগুলি চালাইতে বহু লোক বা বহু জটিল ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। নরওয়েজিয়ান নাবিকের দল আলস্ত বা ভয় জানে না; চরিত্র্যে তাহাদের নিষ্ঠা অসাধারণ। এ নিষ্ঠার ফলে আছে তাহাদের বিশেষ-প্রেম। জাখানির প্রত্যেক চূর্ণ করিতে হাজার হাজার নরওয়েজিয়ান ঘন-প্রাণ বা আত্মীয় জনের মায়-দমতা ভাগ করিতে সক্ষমাত্র যিগ বা চিন্তা করে না। ভূমধ্যসাগরে জাখান বোমার প্রকৃত বর্ণন তুলছ করিয়া তাহারা যে সাহস ও কণ্ডতৎপরতার বিচর দিয়াছে, কালের প্রভাবে তাহা মুছিবার নয়।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাখানির হস্তে নরওয়ের পরাজয় ঘটিলে জীর্ঘ-বৈকল্যনি প্রেনে চড়িয়া ১২০ জন অফিসার সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; তার পর বহু নর-নারী জেল-ভিত্তিতে ও ছোট নৌকার চড়িয়া চলিয়া আসে। কানাডাতেও বহু নরওয়েজিয়ান গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কানাডার টরন্টো প্রদেশে ছোট-নরওয়ে নাম দিয়া একটি পঞ্জীতে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে; সেখানে আধুনিক রীতিতে বর্ণ-কৌশল শিখিবার জন্য সুবৃহৎ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। বিমান-বাহিনীর অভাবেই যে নরওয়ের পরাজয়, এ কথা বুঝিয়া এই সব নরওয়েজিয়ান বিমান-যুদ্ধ-রীতি শিক্ষায় কায়মন উৎসর্গ করিতেছে। আইসল্যান্ডও বহু নরওয়েজিয়ান গিয়া আশ্রয় লইয়াছে—তাহারাও সেখানে বিমান-যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করিতেছে। এই সব শিক্ষা-সময়ে নানা দেশ হইতে নরওয়েজিয়ান গিয়া সমর-রীতি শিখিতেছে। উদ্দেশ্য—পূর্ণোদ্দেশ্যে প্রতি-আক্রমণে জাখানদের ক্লান্ত ও নরওয়ে হইতে বিতাড়িত করিয়া বশেষকে আবার স্বাধীনতা-ভূষণে বিভূষিত করিবে।

তদন্ত নরওয়েজিয়ানদের সব চেয়ে বোক—পাইলট হইবার দিক। কয়েক জন নরওয়েজিয়ান স্ট্রেট-বুটেনের বিমান-বিভাগে আবেদন লিখিয়া জানাইয়াছে—“ইংলণ্ডে আমরা পাইলট-বিশ্বা শিখিয়ে চাই। বত শীঘ্র এ-বিষয় শিখাইতে পারেন, অল্প-গ্রহপূর্ব্বক সে

তাহা গিয়া প্রাক-যুদ্ধকালীন বিশেষে কণ পরিশোধ হইতেছে, নাবিকদের সর্ব্ববিধ ব্যয় জোগানো হইতেছে। স্ট্রেট-বুটেনে নরওয়েজিয়ান বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে সব বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, সে সব বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভারও এই জাহাজী যাতুল হইতে বহন করা হইতেছে।

এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের তরফে নরওয়ের সহযোগিতার মূল্য অল্প বা সাধারণ্যে নিরূপণ করা যায় না। এ কাজে জাহাজ সমূহে ধ্বংস হইবার ও নাবিকগণের প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কা সীমাহীন। জাখানি প্রথম বর্ষন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে নরওয়ে আক্রমণ করে, তখন

এই সময় জাহাজ ডুবাইয়া দেয়—

হিটলার বহু চেষ্টা করিয়াছিল; সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বিশ্বাস-ভঙ্গ কুইশলিংয়ের উপর নরওয়েজিয়ানদের ঘৃণা সীমাহীন। নাৎসী-শাসনে নরওয়ের সাংসদী প্রথার উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয় নাই—সাধারণের ভোটে জার্মানির বহু দাবী পরিত্যক্ত হইতেছে। হিটলারের অবস্থা হইয়াছে সেই সাপের ছুঁচো গেলার মত। তিন লক্ষ তরুণ নরওয়েজিয়ান আজও জাতীয় ভাবে শাসন-বন্দী করিয়া আছে; সে বন্দীর সমূহে বিজয়ী নাৎসী নিকপায় গান্ধীরা লইয়া পাড়াইয়া আছে। সর্ব বিভাগের অধ্যক্ষতার পদে নাৎসীকে খাড়া করিলেও নরওয়েজিয়ানদের আভ্যন্তরীণ বিরোধিতার ফলে নরওয়ের মাটিতে জার্মান নীতির প্রবর্তন প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রেলোভনের স্বত্ব নাই। সমস্তরা ঘৃণাভর জবাব দেয়,

মানিলে প্রত্যাবার ঘটবে। উপাসনা-যশ্মিরে নাৎসী-বিধির বিন্দু-বাস্প না প্রবেশ করে, সে-সম্বন্ধে স্বাধীনগণ বিশেষ মনোযোগী। দেশবাসীর তরফ হইতে সহযোগিতা না পাওয়া জার্মানরা সবলে বিজয়ীর রীতি প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয়—ফলে বিদ্রোহ ঘটে। চাকরি হইতে তাড়াইয়া, জেলে পাঠাইয়া এবং বহু ভাবে নিপীড়িত করিয়াও বিদ্রোহী নরওয়েজিয়ানদিগকে জার্মানি এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই। বিদ্রোহীরা নাৎসী-নীতিতে শিক্ষা চালাইবার ব্যবস্থা হয়—তার ফলে শিক্ষকের দল একযোগে চাকরি ছাড়িয়াছেন। বিদ্রোহী বন্ধ। শাসন-নীতি প্রায় অচল হইয়া আছে। সমস্ত-সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া, ধর-পাকড়, প্রাণদণ্ড, জমি-ঘর কাড়িয়া লওয়া—এমনি শাসক-স্থলভ নিপীড়নের অন্তহীন প্রবাহে হৃৎ-দুর্দশা সীমাহীন



তুয়ারময় আইসল্যান্ডে নরওয়েজিয়ান বিমান-বাহিনী

নাৎসীদের সঙ্গে নরওয়ে কোনও ক্ষেত্রে মিশিতে পারে না, মিলিতে পারিবে না। নাৎসীর আধানে নরওয়ে এক তিল টলে নাই।

নরওয়ের প্রধান বিচারালয়ে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য জন-সাধারণের ভোটে বিচারক নির্বাচিত হইয়া আসিতেছে চিরকাল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নাৎসী বিধি-ব্যবস্থায় নরওয়ে সায় দিতে অস্বীকার করার ফলে এই বিচারালয় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিটলার-নির্বাচিত যন্ত্রী কুইশলিংয়ের বিধি মানিয়া বিচার করিতে পারিবেন না বলিয়া

হইয়া ওঠে, তবু নরওয়ে নাৎসীর যন্ত্রপ্রাণে সম্মত হয় নাই। নরওয়ে জার্মান-অধিকার-ভুক্ত হইলেও নরওয়েজিয়ানরা আজ পর্যন্ত জার্মানির বশ্যতা স্বীকার করে নাই; যথো-বাহিরে থাকিয়া সমানে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

নরওয়ের এই অদম্য সংগ্রাম দেখিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন—জন-সাধারণের মন বলিতে কি বুঝায়, তাহা যদি কেহ ভানিতে চান তো তিনি চাহিয়া দেখুন নরওয়ের দিকে। এই মন জাগিলে কোনো শাসকের সাধ্য নাই। জনগণকে স্বাধীনতা-ধনে

— ইচ্ছা জিলাভন : বিচারসনে বসিয়া অধিকার

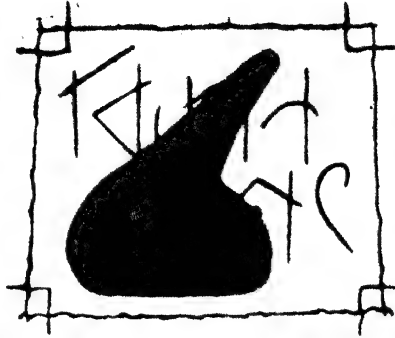
— ইচ্ছা জিলাভন : বিচারসনে বসিয়া অধিকার

শক্তি

শি, এসু

প্রাচীন কালে শক্তি (power)

বলিতে লোক মানবজাতির
অর্থাৎ মানুষের শক্তিই বুঝিত।
সব কিছু করিতে নিজের বা আর
কারও শক্তির শক্তিরই মানুষ কাজে
লাগাইত। পরে ক্রমশঃ এক এক
করিয়া গন্ধ যোড়া প্রকৃতি পত্তকে



কাজে লাগানো আরম্ভ হয়। তার পর বহমান জল ও বায়ুর শক্তি
কাজে লাগানো হইতে থাকে। আজ কাল প্রগতিশীল দেশ-সমূহে
অবিকারিত কাজ কয়লা, তৈল বা বিদ্যুতের শক্তিতে করা হয়। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রে আজ গড়ে নাশা-শিল্পে ৬টি অংশশক্তি লোকের শ্রম-সুবিধা
নিবার কাজে নিযুক্ত। শক্তি উৎপাদনের কলকল্লা আজ দুসভা
দেশগুলির সব চেয়ে সেবা ধনদৌলত বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ঠিক
করিয়া বলিতে গেলে "শক্তির উৎপাদন" আমাদের পক্ষে অসম্ভব।
আমরা এক প্রকার কার্যক্ষমতা (energy) অন্য প্রকারে
বণ্যস্থিতি করিতে পারি মাত্র। প্রকৃতিই শক্তির একমাত্র ভাণ্ডার;
এই ভাণ্ডারের জিনিষপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করাই মানুষের সম্ভব;
মানুষ ইহার কণামাত্রও বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। কেবল
এক বস্তুকে বস্তু-রূপে করিয়া আপনার কাজে লাগায়। তবে এই
কাজে-লাগানো ব্যাপারটি আলো নগণ্য নহে। ইহাই চিরকাল
মানুষের জীবনধারা ওলট পালট করিয়া গিয়া আসিতেছে। ইহার
ফলেই সমস্ত দেশের লোকেরা অসম্ভব বস্তু সত্তায় আপনারদের সমস্ত
কাজ চালাইয়া লইতে পারিতেছে। মূলধনের হিসাব না ধরিলে
শ্রীম-টার্বিনের সাহায্যে বোকা লরানো কাজের খরচ, কুলি লাগাইয়া ঐ
কাজ করিবার ১ ভাগের ২০০০তম অংশ মাত্র। মূলধন প্রকৃতির হিসাব
ধরিলেও ১ ভাগের ৮০০তম অংশ। শক্তির সাহায্যে কাজ শুধু সম্ভব নয়
—অল্প সময়েও সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলে, আজ-কাল সভ্য জগতের
সর্বসাধারণ যে সমস্ত সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পার, তাহা পূর্বকালে
বহু ক্রীতদাসের প্রভুসিগের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাসস্থানের
ময়লা সাফ করা হইতে বস্তুর অনেক বার নুতন কাপড়-চোপড় কেনা
পার্থক্য সমস্ত সুখ-সুবিধা আজ-কাল হল ব্যয়ে শক্তি উৎপাদনের
উপর নির্ভর করে।

মানুষ এখন প্রধানতঃ জল, কয়লা, ও তৈল হইতে শক্তি
উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির
নুতন নুতন উৎস আবিষ্কৃত হইতেছে। বত কম খরচে ও বত সহজে
শক্তি উৎপাদন করা বাইতে পারে, তাহাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এখন
পর্যন্ত এ বিকল্পে মানবের চোঁড়া খেঁচা কলত্র হয় নাই। একটা
জিসেল ইঞ্জিনেও ৬০% শক্তির অপচয় হইয়া থাকে, শ্রীম-ইঞ্জিনের
অপচয় আরও অনেক বেশী। আলোক উৎপাদন করিতে গিয়াও
আমরা উত্তাপ উৎপাদন করিয়া অনেকটা তাপ নষ্ট করিয়া

বেজিরেটার এবং পাস বাতির করিবার
কলত্রের মধ্যেই অব্যর্থতা ঘটে
হয়। মোটের উপর শক্তি উৎপাদনে
অব্যর্থতা-শিল্পে খরচা কমাইবার
জন্ত ক্রমাগত অধ্যয়ন গবেষণা চলি-
তেছে। তবে খরচ ছাড়া আরও
কতকগুলি বিশেষ প্রবিধি
অনুকরণ উপর দৃষ্টি রাখা উচিত।
যেমন বিমানগুলিতে অবশেষে শিল্প
ওজন কমাইতে হয় ও কঠিন

নিবারণের জন্য ভারী তেল (heavy oil) ব্যবহার পরিহারজনক
বলিয়া বিবেচিত। আরার যেখানে কল্লা সড়কলজা সে স্থানে
অন্তর্ভুক্ত ইঞ্জিন অপেক্ষা বহির্ভুক্ত ইঞ্জিন সুবিধাজনক। দেশের
সমূহে বহির্ভুক্ত ইঞ্জিনেও কল্লা অপেক্ষা তৈল ব্যবহার পদ্ধতিহীন,
যোকাই করিবার সুবিধা, ও ওজনবহুল বাহনীর। বহির্ভুক্ত ইঞ্জিন
জলের পরিবর্তে অল্প তরল পদার্থের ব্যবহার চোঁড়াও ইহাই কারণ।
এই ক্ষেত্রে পারদের ব্যবহার অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, কারণ
ইহার বাষ্পের আপেক্ষিক তাপ শ্রীমের আপেক্ষিক তাপ অপেক্ষা
অনেক অধিক। অতি তরল শ্রীম ব্যবহার করিলে শ্রীম-ইঞ্জিনের
কাজ করিবার ক্ষমতার অপচয় অনেক করিয়া গেলেও ইহা অত্যন্ত
জনিত ক্ষতি হয় এক আনন্দকীর্তন কলকল্লায় আঘাত প্রেরণ
হইতে পারে না। সর্বপ্রকারে অন্তর্ভুক্ত ইঞ্জিন বড় বেশী শক্ত করে
এক এগুলি সহজে দুর্বাস্ত-কিরানো যায় না।

বিদ্যুৎ-শক্তি নিয়ে সাধারণতঃ শক্তির উৎস নহে। কেবল
বায়ুচাপ হইতে ঘরিয়া লইলে বা বায়োকম্পন অর্থাৎ "তাপ-বৃত্ত"
সাহায্যে প্রকৃত হইলে ইহাকে শক্তির উৎসবস্তু বলি কহা বাইতে
পারে। ইহা অধিকাল ফলে কার্যক্ষমতার সহজ পরিচালন এবং
মজুত রাখার উপায় মাত্র। শক্তি-পরিচালন ব্যাপারে বিদ্যুতের
আসন সর্বশ্রেষ্ঠ। বিদ্যুৎ ছাড়া বৈদ্যুতিক ও পাটনের মধ্য জলের
সাহায্যে কার্যক্ষমতা কতকটা দূরে চালাইয়া লওয়া যায় বটে,
কিন্তু এটি শুই উপায়ে অধিক দূরে লইয়া বাইতে হইলে খরচ ও
অপচয় অত্যধিক হয়। শ্রীমও দূরে লইয়া বাইতে বহু অপচয়
হয় ও ইহা বহু ব্যয়সাধ্যও বটে। যেখানে অতি অল্প ব্যয়ে
শ্রীম পাওয়া যায়, সেখানে তাপবোধক পাটনে করিয়া বানিক
দূর পর্যন্ত চালানো বাইতে পারে বটে, কিন্তু খেঁচা সাফল্যমাত্রা
অবলম্বন করিয়াও ইহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না বলিয়া
শ্রীম-ইঞ্জিন সাধারণতঃ বরলাভের নিকটেই বসানো হইয়া থাকে।
তাপ দিয়া ঘন-করা বাতাসের সাহায্যেও শক্তি এক স্থান হইতে
অন্য স্থানে চালাইয়া লওয়া যায়। কোন কোন কাজে ইহাতে দূর
সুবিধা হয়। কারণ, তাপে ঘন বাতাস চালাইয়া লইয়া বাইবার পাটন
বিদ্যুৎ-পরিচালনের তুলনায় বহু নমনীয় করিয়া তৈয়ারী হইতে পারে
ও বায়ু-তাপ কল চালাইবার শক্তিতে পণ্ডিত করা দূর সোজা; কিন্তু
২১৪ হাইলের বেশী দূর দূরত্ব পরিচালন সম্ভব হয় না।

ধরিয়া লইয়া গিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা অপেক্ষা ভাল। ইহা অনেক বেশী সস্তা ও পরিবার পরিচ্ছন্ন। শক্তি দূরে লইয়া যাইতে হইলে বিদ্যুতের সাহায্য বিনা গতি জারের সাহায্যে দূরে লইয়া যাওয়ার সুবিধা ছাড়া বিদ্যুৎশক্তির এক বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার নিয়ন্ত্রণ (Control) অতি ; কেবল স্ট্রট মাঝিয়া ইহা জ্বালানো বা বন্ধ করা যায় এবং **france** অর্থাৎ বাধা বাড়াইলে কমাইলেই হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। ২টি হাত-সেতার (hand-lever) যে কোন বৈদ্যুতিক বা চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রয়োজনমত ২টি মিসাইয়া টগ করা যায়। আবার একাধিক ছোট ছোট মোটর ব্যবহার বিশেষ হইলে ইচ্ছামত যে কোনটি বন্ধ করিয়া খরচ বাঁচানো। যেটি সাহায্যে শক্তি-পরিচালনার কল হইতে বেন্টিং সরাইয়া বন্ধ করিলে যে পরিমাণ শক্তি বাঁচে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে। বিদ্যুতের একমাত্র অসুবিধা এই যে, ইহা জ্বালা করিয়া রাখার ঠা এবং কাঁচা (efficient) কোন উপায় এখনও আবিষ্কৃত হই নাই। এক্ষণে সর্ববিধ শক্তি সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। গ্র্যাকুলেটর। 'সক্সিটার' এখন বিদ্যুৎ-শক্তি জ্বালা করিয়া রাখার একমাত্র যন্ত্র; কল প্রবাহের পরিমাণ হিসাবে ইহাতে বড় বেশী খরচ ও জায়গা লাগে। এই কল বর্তমানে মেন (main) হইতে সংশ্লিষ্ট দ্বারা প্রবাহ না লইয়া গাড়ী চালানো অসম্ভব। রেলের তৃতীয় লাইন ও ট্রামের মাথার উপরের তার (over head wire) হইতে আজকাল বিদ্যুৎ লওয়া হয় বলিয়া বাঁধ-ধরা পথে ছাড়া বৈদ্যুতিক গাড়ী চালাইবার কোন উপায় নাই। পথের ধারের মেন হইতে বিনা সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ লইয়া গাড়ী চালাইবার চেষ্টা সফল হইলে এই গুণে দূর হইতে পারে। বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিবার হাঙ্গা ব্যাটারী আবিষ্কৃত হইলেও এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এখনও বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল এত সুবিধা যে, ডিসেল ইলেকট্রিক রেল-ইঞ্জিন কোন কোন স্থানে অসম্ভব ইঞ্জিনের শক্তি বিদ্যুতে পরিণত করিয়া কাজে লাগানো হয়। 'সক্সিটার' আর এক অসুবিধা এই যে, ইহার সংরক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং অবিরাম পরিদর্শন আবশ্যিক। আনাড়ীর মত অসাবধানে ব্যবহার করিলে ইহা নষ্ট বা বিগড়াইয়া যায়।

আজকের দিক্ দিয়া দেখিলে বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখার উপায় কতকটা বাজে বলিয়া বোধ হইলেও এখনকার শক্তি ধরিয়া রাখিবার অল্প কোন উপায় অপেক্ষা ইহা কাজের বলিয়াই বোধ হয়। তাপ-রূপে শক্তি গরম জলের সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায় কিন্তু উপায়টি বড়ই বেয়াদব; কারণ, ইহাতে যেতুঁ শক্তি ধরিয়া রাখা যায় তাহার অল্পপাতে জলের পরিমাণ ও ওজন অনেক বেশী আবশ্যিক হয়। তাপ বিকিরণের মত দূর সম্ভব প্রতিরোধ ব্যবহার করিয়াও ইহাতে শক্তির—তাপের বে অপচয় হয়, তাহার পরিমাণ ইলেকট্রিক ব্যাটারীর অপচয় শক্তি অপেক্ষা অনেক কম।

— নিজস্ব ব্যবহারে বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিবার চৌবেজ
— মোটর গাড়ীতে টাট

আলোর হ্রাসবৃদ্ধির জন্য অনেক জটিল ব্যবস্থা আবশ্যিক হইত এক স্বয়ংক্রিয় ষ্টার্টারের (self starters) অস্তিত্ব থাকিত না। ছোট ছোট আলো দিবার ব্যবস্থা স্বক্ৰিয়তার দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি আবশ্যিক হইলে সোজাশক্তি ডাইনামো বা ডিউইং উৎপাদক হইতে লওয়াই ভাল; তবে ইহাতে আবশ্যিকমত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। যন্ত্র সাহায্যে অল্প দূরে শক্তি-পরিচালন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এই কাজে আজকাল হাতের হাজার যন্ত্র প্রত্যাহ ব্যবহৃত হইতেছে। যেরূপেই এই শক্তি উৎপাদিত হউক না কেন, তাপ বা আলোর জন্য আবশ্যিক না হইলে ইহা যন্ত্রের গতিতে পরিণত করিয়া কাজের স্থানে চালান করা হয়। বেন্ট, দড়ি, শিকল, তার প্রভৃতি এই চালানোর কার্য করে। চাকার আয়তনের সাহায্যে কলের কাজের বেগ বাড়ানো বা কমানো হয়। কল চালাইবার শক্তি হয়তো অল্প গতিবেগে অল্প খরচে অধিক উৎপাদন করা যায়, কিন্তু যেখানে কল অধিক বেগে চালানো প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে মোটর বড় চাকা দিয়া কলে ছোট চাকা লাগানো হয়। বৈদ্যুতিক মোটর সাধারণতঃ খুব জোরে চলে। এই জোরে কমাইবার জন্য কখন কখন Belt reducing gear ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ দাঁতি-চাকার সাহায্যে এই কার্য চলে। উপযুক্ত গিয়ারের সাহায্যে গতির দিক উল্টাইয়া দেওয়া যায়, চতুর্কোণাকৃতি গিয়ার চাকা এক ভাবে স্থায়ী কৌণিক গতিতে নানাবিধ গতিতে পরিণত করিতে পারে। ডিম্বাকৃতি গিয়ারগুলি আরও অল্প প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করে। ফ্রোল অর্থাৎ গুটানো পদ্ধতির মত গিয়ার এক ভাবে ক্রমবর্ধমান বা হ্রাসমান গতিবেগে উৎপাদন করে। অভ্যন্তরীণ গিয়ার একই দিকে এবং পোকা-গিয়ার বা পোকা-চাকা (worm gear or worm wheel) 'লব্ধের' দিকে বা সমকোণে দিকে শক্তি চালনে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ গিয়ার তৈয়ার হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নতুন গ্রেট গিয়ারের কথা বলা যায়। ইহাতে একসঙ্গে যোরাণো ও চটকাইয়া মাথার কাজ করা হয়। এগুলি কাপড় কাচার বা দ্রব্যাদি মিশাইবার কার্যে ব্যবহার হয়। কলে যে কোন রকম গতির সৃষ্টি আর মিল্লিদের অসাধ্য নহে। গিয়ারের সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ফলত এই গিয়ার তৈয়ারী এখন একটা বিশেষ শিল্পে পরিণত হইয়াছে। গতি পরিবর্তনের বর্তমান উপায়গুলি নানারূপ অটোমটিক কলে বিশেষতঃ ঘণ্টায় হাজার হাজার সিগারেট তৈয়ারীর কল ও মোটর গাড়ীতে দেখা যায়। মোটর পিষ্টনের যাওয়া আসা গতি দ্বারা গিয়ার সাহায্যে চাকা ঘুরে, তাল্‌ব খুলে ও বন্ধ হয়, ডাইনামো চলে এবং অসংখ্য অল্প কাজ করে। ফলতঃ গিয়ার সাহায্যে গতি পরিবর্তন বর্তমান ওস্তাদ মিল্লিগিরির চাবিকাটা। আজকালের ওস্তাদ মিল্লীয়া কেবল একটি সমস্যার সম্ভাবজনক সমাধান করিতে পারেন নাই— তাহা অনন্ত পরিবর্তনক্ষম গিয়ার। হাইড্রলিক স্কাচ পরিবর্তনক্ষম গিয়ার নহে, ইহা এক প্রকার 'কম্বা কল' মাত্র। ইহাতে ঘর্ষণজনিত পরিবর্তন শক্তির অত্যধিক অপচয় হয়। কিন্তু ঘর্ষণজনিত পরিবর্তন শক্তির অত্যধিক অপচয় হয়। কিন্তু

— যন্ত্র রাখা উচিত যে, কোন কলই ভগবানের কল

সম্পন্নকর নহে। ইহাতে প্রায় অজ্ঞতব করিতে পারা যায় না, একপক্ষ স্পর্শ হইতে এক স্থানেই বহু পাউণ্ড ওজননের সমান শক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহার ইচ্ছামত শক্তির দিক পরিবর্তন-ক্ষমতাও তুলনীয়।

[ক্রমশঃ]

হাউইটসার

মার্কিন সমর-বিভাগ সম্প্রতি নূতন মডেলের হাউইটসার তৈয়ারী করিয়াছে; তাহার চেয়ে ভারী এক অমোঘ "শেল" আর নাই। এ



এই বাজে হাউইটসারের টিউব ভরা হয়

হাউইটসার প্যারাট্রপারদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি হয়। তিন মণ গাড়ি তিন মণ ওজনের কয়টি করিয়া বাণিলে এ হাউইটসারের বিভিন্ন অংশ ভরিয়া বাণিলগুলিকে বিশেষ বাজে পুরিয়া দেনে। তুলিয়া কক্ষ-ক্ষেত্রে বহিয়া নাশানো হয়; তার পর চকিতে বাজ বুলিয়া হাউইটসারকে



নিয়ন্ত্রণসামী প্লেন

আমেবিকার আর-এক অভিনব কীর্তি পি-৩৮ মডেলের প্লেন। এ প্লেন গাছপালায় বাহ কাটিয়া শূন্যপথেব পাড়ি সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। গাছপালায় মাথার পক্ষের বা বিকলতার এতটুকু আশঙ্কা নাই। মাথার খড়গ-অস্ত্রে গাছের বড় বড় ডালপালা কাটিয়া অবাধ-গতিতে শত্রুর কামান বন্ধক টাঙ্ক-ভূগাণি অগ্নিস্রব করিতে এ বিমানের জোড়া নাই বলিলে অহুতি হইবে না। প্রয়োজন বুঝিলে জোখের শলক-পাত্ত এ প্লেন দ্বিপ্রায়ে বহু



এ প্লেন খুব নীচু গথে যায়

উচ্চ উড়িতে পারে এক ভিত্তিক ভাবে বোমানিকেশেও এপ্লেনের শক্তি অব্যর্থ।

জাপজয়ী কামান

কিছু কাল পূর্বে ক'খানি মার্কিন বণ-স্তরী জাপান-অভিযানে বাহির হইলে ক'খানি জাপানী টর্পেডো-বমার জাহাজের



ভেলার বোফর কামান। এই কামানের প্রথম পরি-
স্রুতিভেন ১১৩০ খৃষ্টাব্দে। তার পর যুরোপের
এই বোফরের উৎকর্ষ-সাধনে আন্তর্নিয়োগ করিয়াছিল।
টিশ সমর-বিভাগের পরামর্শে মার্কিন সমর-বিভাগ বোফরের
ধনে মনোনিবেশ করে; তাহার ফলে বোফর আজ দুর্দ্বার
প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ এ কামান বৈদ্যাতিক শক্তিতে
নে সমর্থ হইলেও মানুষের হাতে চলিতেও কুঠিত নয়।
কাধাকারিতা মার্কিনের হাতে আজ ত্রিশ গুণ বাড়িয়াছে;
উপর এ বোফরের নিষ্কাশন সময়, উপকরণ এবং ব্যয়
হ। তার কারণ, ব্যারেল, কাটার প্রভৃতি অংশগুলি মানুষের
পরিশ্রমে এখন ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ারী হইতেছে। তাই
হয় ঘটায় যে কাজ হ্রাস, এখন সে কাজ নিশ্চয় হইতেছে
মিনিটে। পূর্বে এক একটা বোফর-নিষ্কাশন সময় লাগিত ৪৫০
; এখন সময় লাগিতেছে ১৪ ঘণ্টারও কম।

করা সম্ভব হইয়াছে; তার উপর ট্রেক খুঁড়িয়া ট্রেকের মাটা তুলিয়া
ফেলা—সে-কাজেও এ হেলমেট আজ হেলমেট হইয়াছে।

৭৫ এম্-এম্, না, দামোদর!



এক-এ ছয়

শব্দভের মাথার ঐ পাথর তেলমেট বা টুপি—ওটুপিতে ফৌজ
ক শুধু শির রক্ষা করিতেছে না, পিপাসায় ঐ টুপিতে জল ভরিয়া



হাসপাতালের সংগ্রহ

এক টুপিতে কত কাজ হয়

সেই জল-পানে পিপাসা মিটাইতেছে; ফুট-বাথ লইতেছে। এ-টুপিতে
বন্ধন-কাঠা ও দাড়ি কামানো চলে। নৌকায় জল উঠিলে
এ টুপিতে সেক্সল ছেঁচিয়া নৌকাকে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা

৭৫ এম্-এম্ মডেলের বে গ্রাইডার-গেন
নির্মিত হইয়াছে, সে যেন দামোদর! তার
পেটের মধ্যে বেড়-টনী ওজনের ট্রাক পুরিয়া
তাহা যেমন বহন করা চলে, তেমনি বহা
চলে আর্দ্র-ক্লান্তদের উপযোগী ২৫টি শয্যায়ুক্ত
হাসপাতাল-গাড়ী। হাসপাতাল-গাড়ীর মধ্যে
ঔষধাদির সকল সরঞ্জাম মজুত থাকে। আর
থাকে তাঁবু, এবং দু'-জন অন্তর্চিকিৎসক, এক
জন এনেস্থেসিষ্ট ও ৩৩ জন টেকনি-

শিয়ান। গ্রাইডার হইতে হাসপাতাল-গাড়ী নামাইয়া বিশ মিনিটের
মধ্যে আহতকে রক্ত-দান করা এবং তার সেবা-সুশ্রবাব্য কাজ
সম্পূর্ণভাবে চলে।

বেহলার ক্রন্দন

সপ্তম একটি বালকের মৃতদেহ এক দিন ভেলার উপরে
খেঁচেলিষায়; ভেলাখানি চলেছিল স্রোতের টানে নিক-
কালের হাজার। মনে হইলি ছোট্ট অঝোরে ঘুমচ্ছে; স্বপ্নের তার
— কল্লভ ছবি মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে
— এক রকমই

ত্রিবারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

নদীর তীরে আমাদের বাড়ী। বহু বিচিত্রের মেলা এই নদী।
ছোটবেলা থেকেই বহু বিচিত্র লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি এই নদীর
ঘাটে। কত দেশ-বিদেশের ব্যাপারী আসত পথ্য নিতে। কত
ধরণের নৌকা, কত ধরণের লোক, কত ধরণের ভাষা, আর কত ধরণের
ভাদের বলবায় ভলী। নদীর প্রান্তি ছিল আমাদের একটা প্রেক-
— সমগ্র নদীর ঘাটে বাওয়া চাই-ই। বাক সে সব কথা —
— নদী একটি ছোট্ট

আটকে আছে ; তাতে একটি সর্পাঙ্কুর বৃত্তবৎ। তদনৈ নদীং
খাটে ছুটল। নদীং খাটে লোকে লোকারণ্য। আমাদের সকলে
কলাগাহ পাশাপাশি সাজিয়ে 'ভেলা' তৈরী করে। এ ভেলাখানিও
কলাগাহ দিয়ে তৈরী। কিন্তু খুব মজবুত ও পহিরাটা তার কাজ।
উপরে একখানা চাটাইয়ের তৈরী ছইও রয়েছে।

ভেলার উপরে ধবধবে বিছানা ; তার উপর শাবিত একটি কিশোর।
তার পা থেকে বুক পর্যন্ত একখানি চাবর দিয়ে ঢাকা। দুর্ধখানি
খোলা রয়েছে। ভেলার একপাশে একটি মোহর বাঁধ। মোহরগর
পাশে তার খাবার জল চাল ও ধান একটি বস্তিতে ছিল। এ রকম
করে কেন যে একটি বালককে ভাসিয়ে দিয়েছে, তা বুঝতে পারলাম
না। সেখানেই জনতার জলনা-কলনা ও আলাপ-আলোচনার
মাঝখানে থেকে জানতে পারলাম—সাপের কামড়ে যদি কারো মৃত্যু
হয়, তবে তাকে এমন ভাবেই ভাসিয়ে দিতে হয়। মৃতদের বুক
করে ভেলা চাল ; মোহরই তাকে পথ দেখায়। সাপের বিষ নষ্ট
করবার বা সর্পাঙ্কুরে আরোগ্য করবার ক্ষমতা হালের আছে ভেলা
লেগেই তাদেরই সন্ধান। এ রকমের লোককে আমাদের সকলে
'ভলা' বা 'রোজা' বলে ; কেউ কেউ আবার বলে 'ভলী'।

এই ভলী বা রোজাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। সর্পাঙ্কুর
ব্যক্তিকে আরোগ্য করবার জন্য এরা প্রাণপণ চেষ্টা করে ; নিজের
সামান্যত শেব চেষ্টা না করা পর্যন্ত ইহারা জলস্পর্শও করে না। এমন
কি, কাউকে সাপে কামড়েছে তদনৈ খেতে বসলেও ভাত ফেলে রেখে
ছুটে বেতে হয়। যে গাঁয়ের লোককে সাপে কামড়ায়, প্রথমে তার
আমোদনের রোজার আরোগ্য করতে চেষ্টা করে। আরোগ্য হয়
ভালই, নচেৎ সাত-আট দিন পর্যন্ত—রেখে দিয়ে বুক-বুড়াভরের
'ভলী'দের ডাকা হয়। তাতেও বিফল হলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।
লোকে বিশ্বাস করে,—নদীপথে যেতে যেতে যে জায়গার প্রকৃত
'ভলী' আছে, মোহর তা জানতে পারবে আর তখন উঠরবে ডেকে
উঠবে। তার সে আহ্বানে 'ভলী' ছুটে এসে মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার
করবে। এমন কি, মৃতদেহটি পড়ে গলে গেলেও ক্ষতি নাই।
এমন 'ভলী'ও আছে যে, ক'খানা হাড় পেলেই তা থেকে জীবন্ত
আলম হানুব না কি ঠাঁড় করিয়ে দিবে। লোকে তা মনে-প্রাণে
বিশ্বাস করে। বাক, সে ভেলাখানি লোকে বহু করে আবার প্রোতে
ভাসিয়ে দিলে।

মৃত কিশোর বালকটি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল কি না তা জানবার
প্রবল কৌতূহল বহু দিন পর্যন্ত মনে পোষণ করেছিলাম। কিন্তু
আজ পর্যন্ত তা কৌতূহলই রয়ে গেছে। মৃত পড়ে সাপের
বিষ ঝাড়া, সাপকে ডেকে আনার নানা গল্প শুনেছি। সেই
দিন থেকে কয়েক দিন কোথায় কাকে সাপে কামড়েছিল, কে বারো
বছর পরে ফিরে এসেছে—এক গল্প খুব শুনেছি। বিশ্বাস যে করি
নাই; তা নয়। কিন্তু আজ জীবনের যাত-প্রতিযাত অনেক দূর
এগিয়েছি ; বিজ্ঞানের কথাগুলো সে বিশ্বাস চূরবার হয়ে গিয়েছে।
ভলীদের 'ভল'কে এখন বহুকতি বলে জানতে পারি।

আমরা-সমস্ত সর্পাঙ্কুর ভলীরাই যেই বিষয়ই হলেও সবকিছু শুনে।
হিয়ে সর্পাঙ্কুর হাড় থেকে পরিচাল্য পাবার এমন অপূর্ণ ব্যবহার আজ মনে
সম্মত আছে। কিন্তু আজ এ-ও বুঝতে পারছি, অজানা ভয়ের হাত
থেকে পরিচাল্যের উপায় আবিষ্কার করতে গিয়েই হানুব ধরার সন্ধান
পেয়েছে। এই বর্ষকে ভেলে করেই হানুবের মৃত-জল-কাবা-পূরণ
পড়ে উঠেছে। আশেপাশ মনসার জগানে মনসার জয়গান শুনেছি।

ভেলার ভেসে যেতে দেখেছি একটি বালককে, আর মনসার
জগানে বেহলার কন্দন শুনেছি। মৃত বামীকে নিয়ে বেহলা ঘেঁ-
পুয়ে গিয়েছিল ; মৃত কয়েকখানি হাড় থেকেই লম্বির পুনর্জীবন
লাভ করেছিল। তাই হাড় থেকে জীবনহানের গল্পে অবিবাদের
কোন বেতুই ছিল না। তবে মনে হ'ত, সকলের সঙ্গে ত 'বেহলা'
নাই। আছে একটি মোহর। কুৎসার কলভন, এই মোহরগর সঙ্গে
রয়েছে বেহলার আশা। তখন আর আমাদের অবিবাদের কোন
কারণই থাকত না। কোন্ কুৎসার সে বেহলা, তাঁর পক্ষে এখানে
আবির্ভাব হওয়া সম্ভব কি না, তা জেবেও দেখি নাই। কিন্তু
নিরুপায় হানুবের জন্য বেহলার এই ধরনের ভক্ত তাঁর প্রতি প্রা-
তিভূত আগ্রহ হয়ে উঠত।

মনসা-পূজার আসরে প্রধান গায়কের কণ্ঠে বামি-শোকাভূত
বেহলার কল-কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠত—

কত নিরা বাও প্রভু বে,

প্রভু, চক্ষু মেলি চাও।

তোমারে ভাসাইয়া বাহু—

তোমার দল্ল বাপ-মা (ও)।

মনসার ক্রোমে চাঁদ-সাগরের দুর্গতি, পুষ্কোকাভূত সনকার
কন্দন, বিবাহের কালরাত্রিতে লম্বিরদের সর্পাঙ্কুরে মৃত্যু—শোকের
তরঙ্গ তরঙ্গ আমাদের শিশু-মন আলোড়িত হ'ত। বেহলা
ভেলার উপরে মৃত বামীকে কোলে নিয়ে ভেসে চলেছে ; কত কাঙ্ক্ষা-
মিনতি, কত প্রলোভন, কত ভয়, কত বিপদ—কিন্তু বেহলা
নির্ভীকার চিত্তে সবই উপেক্ষা করেছে। সে শুধু নিজের বামীকে
বাঁচিয়েই ফিরে নাই, মৃতদের অপহৃত হৃদ পূরণ ও সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বর্য
নিয়ে ফিরেছে। শৈশবে মুগ্ধচিত্তে সতী বেহলার কাহিনী শুনেছি ;
কিন্তু আজ বুঝি, মনসার জগান মনসার জয়গান নহে, ইহা বাঙ্গালী
বধুর প্রেমের জয়গীতি।

দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের ভেলার ভেসে চলেছি আমরা।
আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে কল্যাণী বেহলাইই জীবনদান করে আসছে।
পরার্থে তাঁদের জীবন উৎসর্গ, বামি-পুত্রের মঙ্গলের জন্য ব্রত উপবাসে
কঠোর নিয়মনিষ্ঠার তাঁদের মধ্যে বেহলা চিরজাগ্রত রয়েছে। ঐশ্বর্য
ও সহিষ্ণুতার সে মূর্তি আজ নূতন শিক্ষার আলোকে চূরবার হ'তে
বসেছে। লম্বিরকে কালনাগে দংশন করেছিল ; কিন্তু আমাদের
মনের গহনে কোন্ বিষময় প্রবেশ করেছে। স্ফাবরমুক্ত হতে চলেছি

হক লীগ প্রতিযোগিতা

হক লীগের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিযোগিতার পরিসংখ্যান

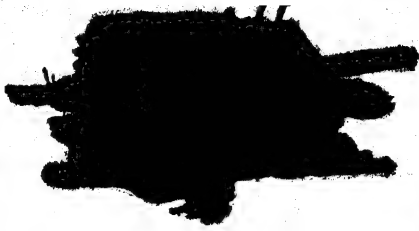
আসন্ন-প্রায়। নূতনের দল সংগঠনের তেড়াজোড় দেখিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, এবার মোহনবাগান প্রথম ডিভিশনে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহম্মেদান স্পোর্টিং এ বৎসর এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছে।

তাঁহারা অল্পকাল সম্মান অর্জন ব্যাপারে তৃতীয় ভারতীয় দল। ইতিপূর্বে গ্রীষ্ম ও মোহনবাগান এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ফুটবল জগতে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সৃষ্টিকর্তা দুর্ধর মহম্মেদান স্পোর্টিং-এর হকি-জগতে এই নূতন বিজয়ভিধান। নাইম, জাকর, মুনীর, কাদুম প্রভৃতি আন্তঃপ্রদেশিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন খেলোয়াড় এই দলের শক্তিসম্ভার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুযোগসন্ধানী কুশলী তরুণ খেলোয়াড় জাকীর অবদান অতুলনীয়। প্রত্যেক জয়ের মূলে তাঁহারা গোল করার কৃতিত্ব হইয়া গিয়াছে। লীগের সন্ধিক্ষেপে পাঞ্জাব স্পোর্টিংসের জায় দুর্দল দলের নিকট আকস্মিক ও আশাতীত বিপর্যয়ে মোহনবাগানের লীগ-বিজয়ের সমস্ত আশা অসীক স্বপ্নে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত তাহারা বাধাস' আপ হইয়াই থম্ম। তাহাদের মনের জোরে অভাব বহু বার বহু ক্ষেত্রে প্রকট হইয়াছে। লীগে উঠা নামা পুনঃ প্রবর্তিত হওয়ায় শেষের দিকের খেলাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তঃপ্রদেশের রূপান্তর হইয়া পড়িয়াছে। সহস্রাহৃত্তিসম্পন্ন ও সৌন্দর্যের আবহাওয়ায় অল্পপ্রাণিত হইয়া কয়েকটি স্রাবের মধ্যে পরেই দেওদার ব্যাপারে আশ্রিতবাং-সল্যের প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। লিলুয়ার কোন আশা নাই। এখন মেজারাস জ্যাকেরিয়াস, আর্থেনিয়াস ও বি-এণ্ড-এ, বেল দলের মধ্যে নামিয়া যাওয়ার জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে।

দ্বিতীয় ডিভিশনে পাশী কাহারও নিকট মাথা নোয়ায় নাই। শেষ খেলায় কলেজিয়াসের নিকট পরাজিত হইয়া ভবানীপুর প্রথম পর্যায়ের ডালি মাথায় নিয়া উন্নীত হওয়ার আশায় জ্বলজ্বলি নিয়াছে। পাশী ও কলেজিয়াস আগামী বার প্রথম ডিভিশনে খেলিবে।

ফুটবল মরশুম

ফুটবল ঝগতম্। ফুটবল মরশুমে কলিকাতার ময়দানে কল-কাকলী আচিরে শুরু হইবে। আই, এক, এর, বোবণা অম্বুধারী এলা মে হইতে ফুটবল লীগের উদ্বোধন হইবে। খেলোয়াড়গণের দল-পরিবর্তনের পালা শেষ হইয়াছে। লীগবিজয়ী মোহনবাগান ভবানীপুরের শ্রী দাস ও এইচ, মজুমদারকে পাইয়া সম্বৃত্ত হইয়াছে। মহম্মেদান স্পোর্টিং-এর ভান্নাহাট। তাজ মহম্মদ, জুমা খাঁ, ও মহম্মেদান স্পোর্টিং-এর ভান্নাহাট।



এম, ডি ডি

ফুটবল বাজারে সমস্ত জিনিসেরই চাহিদা। অপেক্ষার্তী বাদলী ফুটবল-জগতেও ইহার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। এবার না কি আই, এক-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক খেলোয়াড় ছাড়পত্রের জন্ত আবেদন করিয়াছিল।

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

বাগবাজার ত্রিঘনাসিয়ার-পরিচালিত এসিয়াটিক ভারোত্তোলন

প্রতিযোগিতার এককিশতি বাৎসরিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাময়িকগণের মধ্যে খ্যাতনামা প্রতিযোগীর যোগদানে এবারের অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় ও উদ্দীপনাবহুল হয়। হেভীওয়েট ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগে পুরাতন রেকর্ড ভল হয়। মার্কিন প্রতিযোগী স্লামেল চেং মোট সর্বোৎসাহ বেষ্ট ভারোত্তোলন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাদ্রাজের প্রতিনিধি রাজা গোপাল শ্রেষ্ঠ দৈহিক গঠনের পুরস্কার লাভ করেন। বজর ব্যাধামাগারের বৈজনাথ বোব বৈশিষ্ট্যের অধিকার দাবী করেন। বোবাই ওয়াটারপোলে কোয়ার্ডাকুলার—

বোবাই ওয়াটারপোলে কোয়ার্ডাকুলার প্রতিযোগিতার পরি-সমাপ্তি হইয়াছে। হিন্দুদল শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের পরাজিত করিয়া বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছে। ক্রিকেটে অল্পকাল প্রতিযোগিতা সারা ভারতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। নীতিবাদের অন্ত নাই। খেলার জগতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিযোগিতা জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু খেলার মধ্যে বৈষম্যমূলক রাজনীতিক মাথা গলাইতে না দেওয়াই সমীচীন। এই জাতীয় খেলা শ্রেষ্ঠ ও বাছাই করা খেলোয়াড়দের পরস্পরের মধ্যে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

সেমিকাঙ্কাল খেলায় যথাক্রমে পাশী ও ইউরোপীয় দল হিন্দু ও ইহুদীগণের নিকট পরাজিত হয়। ইউরোপীয়গণ যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৩—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। হিন্দুদল ৪—২ গোলে জয়ী হয়। শেষ খেলাটিতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। তুমুল উত্তেজনার পর হিন্দুদল ৪—৩ গোলে শেষ সম্মানের অধিকারী হয়। পেনাল্টি হইতে কৃত গোলাটি শেষ নিম্পত্তি নির্ধারণ করে।

সিংহলে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিংহল পর্যটন শেষ হইয়াছে। সফরের পূর্বে জরুরী কল্লনার অন্ত ছিল না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ভ্রাম্য-মাণ দলের এই যাত্রা ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হইয়াছে। অবশ্য, বোগ-সুত্র স্থাপনে এইরূপ ভ্রমণ উত্তর দেশেরই পক্ষে মঙ্গলকর, সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়গণের সহিত পরস্পরের পরিচয় ও সংযোগ খেলোয়াড়ী কৃতিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে। সেই হিসাবে এই সফরের মূল্য অশেষ। কিন্তু ভারতীয় দলের সফরে আমাদের উদীয়মান নব ক্রিকেট-প্রতিভার

ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানের মনঃপূত হয় নাই। আযীর এলাহীর জায় শিখ-বোলার বা ছুঁর মহত্ব প্রকৃতি ব্যাটনামা অল রাউন্ডারেরা এই দল হইতে বাদ পড়ায় কেহ কেহ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু মোটামুটি যে দল নির্বাচিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণের সমাবেশ ছিল। মোট পাঁচটি খেলার দুইটিতে জয়ী হইয়া এই দল আর তিনটি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ করে। সর্বশেষে দূর্ভাগ্যের বিষয়, এই অভিযানে ভারতীয় কোন ব্যাটস্-ম্যান শতাধিক রান সংগ্রহ করিতে পারে নাই। রানী মুন্সী রত্ন-প্রতিযোগিতার পূর্ব পর সাতটি সেঞ্চুরী করিয়া ১০০৮ রান করিয়াছেন। মার্চেন্ট ভারতীয় ক্রিকেট একাধিক বার বেলেটের দৃষ্টি করিয়াছেন। এবার তাঁহার খেলার হাতও ভাল ছিল। বাজারীর জায় স্থির, বীর ও সুনিশ্চিত খেলোয়াড়, নিশুণ ও কুশলী মুস্তাক আলী বা বহুলশী ধুবড়র খেলোয়াড় অমরনাথ প্রকৃতির জায় বিকৃপাল থাকিতে এই দলের কিরূপে ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বোলিংয়ে ক্রত বোলার হিসাবে এস, ব্যানার্জীর কৃতিত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। মানকড় উত্তর বিভাগে স্বীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

নিরবধিত ভাবে নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ইব্রাহিম ও উইকেটরক্ষক পার্শ্বনাথি বাইতে অসদ্বর্ষ হওয়ার বামসি ও বরোদার নিম্নলকর শূভ হান পূর্ণ করেন।

মি: এইচ, এন, কপ্টানের কর্তৃত্বাবলীনে ও বিজয় মার্চেন্টের অধিনায়কত্ব অমরনাথ, মুস্তাক আলী, সি, এস, নাইটু, সর্কোতে, হাজারী, মানকড়, মুন্সী কিশোরচাঁদ, নিম্নলকর, বামসি, এস, ব্যানার্জী ও বরোদারকে লইয়া এই দল গঠিত হয়। উইকেটরক্ষক নিম্নলকর আউট হওয়ার মাত্রাত্তর স্ক্রিনিবাসকে বিশেষ তারযোগে আনাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

মাত্রাজের কর্পোরেশন এই দলকে নাগরিক সর্ধনায় অভ্যর্থিত করেন। মাত্রাজ গভর্ণরের দ্বারদেশে বিজয় খেলাটির শেষ নিশ্চয়িত্ব হয় নাই। অমরনাথের আউট না হইয়া মধ্যাহ্নভোজের পূর্বেই শতাধিক রান গ্রহণ এই খেলার প্রধান স্মরণ্যত্ব। মাত্রাজের মেয়র ও গভর্ণর উভয়েই এই দলকে ভারতের শক্ত হইতে সিংহলে প্রীতি ও শুভেচ্ছার অঙ্গুত বলিয়া অভিহিত করেন।

সিংহলে ভারতীয়গণ বিপুল আনন্দের ও আপ্যায়নের সহিত গৃহীত হন। কলম্বোর মেয়র তাঁহারের সম্মানার্থে আহুত সভায় ভারতীয় ক্রিকেটবীরদের প্রাণ্য প্রশংসা দেন। সিংহলীগণের আন্তঃপ্রাদেশিক রত্ন-প্রতিযোগিতার যোগদান বাহিনীর বলিয়া মন্তব্যও শুনা গিয়াছে। পর্যটনের আদান-প্রদানের উপযোগিতা সম্বন্ধে উভয় দেশের ক্রীড়াঙ্গারগণী সন্মত এক এই প্রথায্য ক্রাম্যমাণ বাছাই দলের সর্বক-বিনিময় নিরবধিত ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ারই উচিত।

সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহিত প্রথম খেলা অমীমাংসিত

খিলিত স্কটিস একাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল সাত উইকেটে বিপরীত হয়। মার্চেন্ট আহুত হইয়া অপর্যবিত থাকার দলের নেতৃত্ব-জন অবলম্বনের উপায় পড়ে। উইকেটরক্ষক নিম্নলকর খেলিতে অসদ্বর্ষ হওয়ার মাত্রাত্তর হইতে স্ক্রিনিবাসকে বিশেষ ভাবে আহ্বান করা হয়। তিনি এই খেলার উইকেট রক্ষা করেন। সামগ্রিক দলের ডিক্রেটার ও আহ্বানের মানকড় দল করিয়া কৃতির দেখান।

এক দিনব্যাপী খেলার সম্মিলিত কলমে দল ভারতীয়দের সহিত হার করে। এই খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, কলম্বোর দল পনেরো জন খেলোয়াড়কে লইয়া গঠিত হয়। কলম্বোর দল ১৪ জনে ২১১ রান করিলে ভারতীয়গণ প্রত্যুত্তরে পাঁচ উইকেটে ১৪০ রান করিতে সক্ষম হয়। এই খেলাতেও মার্চেন্ট যোগদান করেন নাই।

গল ক্রিকেট দ্বার ভারতীয় দলের নিকট এক ইনিংস ৩৫০ রানে পরাজিত হয়। বোলিংয়ে সি, এস, নাইটু ও লক্ষ্যচরী যথাক্রমে উচ্চ ইনিংসে পাঁচটি ও চারটি উইকেট লক্ষ্য করেন।

ভারতীয় বনাম সিংহলের একমাত্র টেষ্ট খেলাটির শেষ নিশ্চয়িত্ব হয় নাই। ভারতীয় দলের সিংহল দলের শেষ খেলাটি দেখিবার জন্য বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। কলম্বোতে কোন ক্রিকেট খেলার ইতিপূর্বে এত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যের সমাবেশ হয় নাই। সিংহলের ১০৭ রানের প্রত্যুত্তরে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৭১ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে সিংহল সাত উইকেটে ২২৫ রান করিলে নির্ভাবিত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। ভামিল ইউনিয়নের অধিনায়ক শতশিবম অশুর্ক দূরত্বের সহিত খেলিয়া ১১১ রান করেন ও দলের পতন বোধ করেন। ভারত-সিংহল টেষ্ট খেলার এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাঁহার ক্রীড়া কৌশল ও মায়েব চাতুর্ধ্য বিশেষ উপলব্ধি হয়। মোট ১১৭ মিনিট খেলার কলে তাঁহার উচ্চ রাগসংখ্যা গৃহীত হয়। ভারতীয় দলের মুস্তাক আলী ও নিম্নলকরের যথাক্রমে ৪১ ও ৪৮ রান উল্লেখ-যোগ্য। মার্চেন্ট, মুস্তাক আলী ও এস ব্যানার্জীর জায় তিন জন পুরাতন ও বহুলশী খেলোয়াড়ের রান আউট হওয়ার ভারতীয় দলের রান নেওয়ার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। সটরাপ নেওয়ার কৌশল আহুত করিতে না পারিলে বড় খেলার কৃতি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে রান সংগ্রহ প্রায় দুহু ব্যাপার হইয়া পড়িবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে খেলাটি দেড় দিন পরে আরম্ভ না হইলে হয়ত শেষ মীমাংসা হইয়া যাইত।

খেলার শেষে ভারতীয় দল সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্তৃক নৈশ ভোজে আপ্যায়িত হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক মি: কে, বরুয়া ও অধিনায়ক মার্চেন্ট সিংহলের আতি-থেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আগামী শীত ঋতুতে সিংহল দল

জাতিগত ভবিষ্যদ্বাণী—

আমেরিকার 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রের মতে সামরিক উৎসাহ লিখিরাজেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে যে সকল দেশ আছে, সে সকল দেশের জন্য আন্তর্জাতিক অভিতাবকণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। বর্তমান যুদ্ধের পর, বিশেষতঃ যে-জাতির পৃথিবীতে প্রাচুর্যে জাতীয় ভাবের যে বজা বহিবে তাহার উৎসাহ উল্লেখ্য পজিবোধ করা কঠিন হইবে। যদি সম্মিলিত জাতিবর্গের আশঙ্কা বৈঠক এই মহা সমস্তার সমাধান করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে মহাভা গাছীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে।

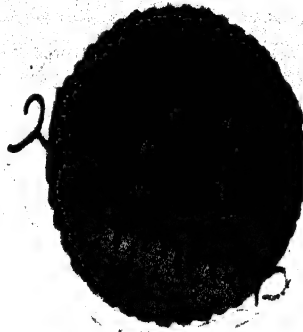
গাছীজী বলিয়াছিলেন—“Unless the peoples of the East obtain their fundamental liberties, her and bloodier war will be inevitable.”

ফ্রান্সিস্কে বৈঠক—

যাহাতে এংলো-ফ্রান্স শক্তিশ্রয়, বিশেষতঃ বুটন, বুটল জ্যাকডুক্ত জাতিবর্গের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিদের বলে সামরিকাস্থিরা কে অধিক প্রভাববিস্তৃত হইতে না পারে, তজ্জন রুশিয়া শব্ধ ভাবে চেষ্টা করিতেছে। পোল্যান্ডের লুবলিন সরকারের উনিষিক বৈঠকে যোগদান করিতে দিব্যর জ্ঞান আমেরিকাকে প্রবোধ করিলে, সে অল্পবোধ রক্ষা করা হয় নাই। শুনা ইতেছে, সামরিকাস্থিরা বৈঠকে সোভিয়েট সরকার হোয়াইট শিয়া ও ইউক্রেনের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী করিবেন। প্রস্তাবিত বৈঠক সফল হইতমধ্যেই নানাবিধ জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে। যুরোপের বর্তমান পরিস্থিতি বেকপ, তাহাতে অনেক আশঙ্কা করিতেছেন যে, মিত্রপক্ষের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিবগণ বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন না। সুতরাং হস্তবাহিত বৈঠকের আবেশন পিছাইয়া দেওয়া হইবে।

জার্মানীর আত্মসমর্পণ—

ইংলণ্ড জনবহু প্রচারিত হইয়াছে যে, জার্মানী মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং যুরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। মিত্রপক্ষও বিজয়-উৎসবের আয়োজন করিতেছে বলিয়া আজল পাওয়া যাইতেছে। ভারতের সমস্ত নরপতিদের মধ্যে ১৬ জন নরপতি জুন মাসে বিজয়-উৎসবে যোগ দিতেই না কি ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। ৩১শে মার্চ জেনারল আইজেনহাওয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট না কি এই মর্মে পত্র লিখিয়াছেন,—জার্মানী আত্মসমর্পণ না করিলেও মিত্রপক্ষ ‘জয়-দিবস’ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে। তবে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম-যুরোপের যুদ্ধে জার্মানী আত্মসমর্পণ করিবে না, শেষ পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ চালাইবে। ২০শে জুন জার্মান বৈতায় শেখার পাখার নাথসী কেন্দ্রী-কর্তৃপক্ষও জাতিকে সজাগিত উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার বলিয়াছেন—



শ্রীতারানাথ রায়

চক্রবর্তী জার্মানী—

যুরোপের পশ্চিম বণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সৈন্যবল বার্লিনের দেড় শত মাইল নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু ২২শে জুন পর্যন্ত সংবাদ—জার্মানদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে জেনারল গ্যাটিনের অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে, জার্মানরা পুনরায় গোখা সহর দখল করিয়াছে। রুট অকলে ছুটকেন, বুজবার্গ, ও ছানোভাবে জার্মানরা প্রবল প্রতিরোধ করিতেছে।

সোভিয়েট বণাঙ্গনে জার্মানীর বিপদ অধিক। ভিয়েনা অবরুদ্ধ। জার্মানরা প্রাণপণে বাধা দিতেছে। অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে রুশ সৈন্য উপনীত। চেকোস্লোভাক সীমান্তে মার্সাল কোনিভের বাহিনী হানা দিয়াছে। মনে হইতেছে, এই সীমান্তের ময়দান গ্যাণ দিয়া সৈন্য পরিচালন করিয়া প্রথমে প্রাণ দখল করা হইবে, তৎপরে মার্সাল তোলাবুর্কিনের সহিত সম্মিলিত হইয়া কোনিভের সৈন্যগণ অগ্রসর হইবে। চেক ও অষ্ট্রিয়ান কারখানাগুলি হস্তচ্যুত হইলে জার্মানী গেরিলা যুদ্ধও ভাল ভাবে চালাইতে পারিবে না। প্রকাশ যে, মর্ফোজা: বেনেসের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠালিন এই পদা স্থির করিয়াছেন। ব্যাজেরিয়ায় হিটলার শেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া যে আশা করিতেছেন, ইহাতে তাহা ব্যর্থ হইবে।

জনরবে জার্মানী—

আবার জার্মানীতে সামরিক বড়বস্ত্রের অনেক কাহিনী শুনা যাইতেছে—ফন রুনস্টাট ও গোয়েবিং নিহত হইয়াছেন; স্বঃ হিটলারকে হত্যা বা প্রেস্তার কবিবার বড়বস্ত্র ধরা পড়িয়াছে; হিটল না কি পাগল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার চোখে ভূমি নাই। এম্ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইতেছে যে, হিটলারের ৫৬তম জন্মদিন, ২৬ এপ্রিল তাঁহার জীবনের সর্বাঙ্গশেখা সফট দিবস। লণ্ডনের ‘ইর্ভা ষ্ট্যাণ্ডার্ড’ গল্প প্রচার করিয়াছেন—হিটলার, হিমলার ও মুসোলি জাপানে বাইবেন।

আর একটি সংবাদ ‘গোব’ বার্তাবহু এজেন্সী প্রচার করিয়াছেন, জার্মান সামরিক বলপতিদের দুই দলে ভেদ হইয়াছে। এক দল বক্তেছে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাও, দরকার হইলে বিব গ্যাস প্রয়োগ কর ‘ডেলী মেসে’র সংবাদযাত্রা বলিতেছেন—“the fight on ‘facti

জাপানে নতুন পরিব্রাহত—

২২শে চৈত্র সন্ধ্যা প্রচারিত হইয়াছে যে, কপ-জাপান নিরপেক্ষতা
কি সোভিয়েট সরকার আর বন্ধার রাখিবেন না (১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে
ওই প্রজ্ঞাপন এই হুক্তি হয়)। এই সঙ্গে এমন সন্ধ্যাও আঘাত
হইবে, জাপানের কুনিয়াকি কইসো-মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে।



কেসে নাখসী বিমানবাহিনীর দুরবস্থা

এডমিরাল ব্যাপন হুকু কি নতুন মন্ত্রিসভার পঠন করিয়াছেন।
খ্রিষ্টপদ আশা করিতেছেন যে, কইসো-মন্ত্রিসভার পতনভাঙ্গ হইতে
ইহাই মুচিত হয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরীর মুখে জাপান পরাজয়
বীকার করিয়াছে। ব্যাপন হুকু কি নরম বা উদারবাহী বলিয়া
মনে করা হইয়াছে এক একপ আশা হইতেছে
যে, তিনি শান্তির প্রস্তাব করিবেন। জাপান
বনিক ও শিল্পপতিগণের শত্রু ও প্রজাবই
না কি কইসো-মন্ত্রিসভার পতনের কারণ।

কপ-জাপান নিরপেক্ষতা হুক্তির বিয়া
উত্তীর্ণ হইবার এক বছর পূর্বে সোভিয়েট
সরকার উহা বাতিল করিলেও, মর্কোর
যেবদান্তে জাপান সবচে কপিয়ায় ভবিষ্যৎ
নীতিব কোন আভাস নাই। গত নভেম্বরের
কপুজনে টালিন রেড ফোরাবের বক্তৃতায়
জাপানকে "an aggressor nation"
বুলিয়া বধন অভিহিত করেন, তখন
জাপান বিস্মিত ও আপনাকে অপমানিত
মনে করে। সে সময় জাপান সরকারী জোনি

policy that will conform with any new situation
created by the Russians." অবশ্য কি ঠিকইবে তাহার
কোন ইঙ্গিত প্রদান করা এখন অসম্ভব। তবে ইতিমধ্যে জাপানকে
হইতে একপ প্রচার করা হইয়াছে যে, হুক্তি বাতিল হইলেও কপ-
জাপান নিরপেক্ষতা অটুট থাকিবে।

ইতিমধ্যে ব্যাপন হুকু উত্তর প্রদেশগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য

৩০ হাজার সুরক্ষিত জাপানি প্রেরণ করা
হইয়াছে বলিয়া টীকা-বহুল সংবাদ দিতেছেন।
কপিয়া যদি জাপানকে আক্রমণ করে তবে
এই পথেই প্রবেশ করিবে। কিন্তু কপ-
জাপান হুদের একটা প্রতিক্রিয়ক পণিতি
না হইলে কপিয়া সহসা জাপানকে আক্রমণ
করিয়া আত্মরক্ষা প্রবিধা প্রদান করিবে কি
না সম্ভব।

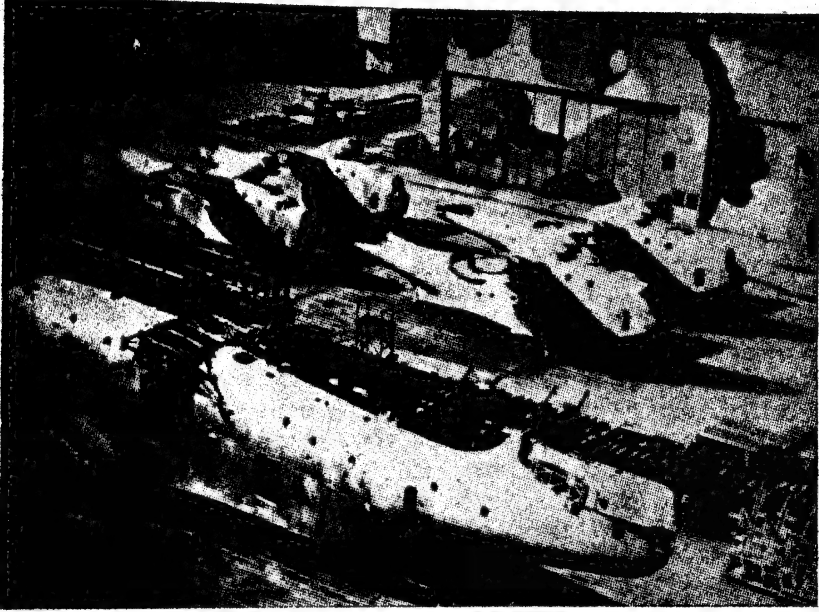
জাপান-মাকণ যুদ্ধ—

ওলিকে না কি খাস জাপানের গৃহ-
পত্রীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। জাপানকে ইম্পাত-
হুর্গে পরিত্যক্ত করা হইতেছে। মাকণ
এডমিরাল নিম্নের প্রোব প্রশান্ত মহাসাগরে
জাপান বীপপুঞ্জের চতুর্বিধিত হুদকপূর্ণ কতক-
গুলি বীপে মিত্রশক্তিগণ সৈন্য নামাইয়াছে।

বিক্রিকিট বীপপুঞ্জ যদি তাহার জয় করিতে পারে, তাহা হইলে
জাপানের গৃহ-পত্রীতে আক্রমণের বিশেষ সুযোগ হইবে। এই বীপপুঞ্জের
কেন্দ্রস্থলে ওকিনাওয়া বীপে মাকণ সেনা নামিয়াছে। আমেরিকানরা
আশা করিতেছে, এই বীপকে কেন্দ্র করিয়া জাপানের প্রমণিত



মাকণ জাপান মারী-সৈন্যবল



মার্কিন বিমানপোতের কারবান।

রাজ্য পুনরধিকার করিয়া লইবে। কিন্তু মার্কিন নৌ-বিক্রমের জৈনিক মুখপাত্র এমন কথাও বলিয়াছেন যে, জাপানীরা মার্কিন সৈন্যবিন্দকে কীভাবে ফেলিবার জন্য ওকিনাওয়া দ্বীপের মার্কিন ঘাঁটিতে পান্টা অবতরণ করিবে। জাপানীরা সম্ভবতঃ যেভাবে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। সহসা তাহারা গুপ্ত স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়া সাইপান ও আইওজিমার দ্বার বে-পরোয়া প্রতিরোধ করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

প্রাচ্যে ২০ বছরের যুদ্ধ—

চীনে কিন্তু জাপানের পরাজয় বা বিপর্যয় অবস্থার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ওদিকে সম্ভ্রান্ত চীন সশস্ত্র জাপানীভিত্তি কর্তৃত্বভাঙ্গা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ডাঃ জয়েন্টিন কু ২২শে চৈত্র নিউইয়র্কে এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, জাপানীরা বৃহৎ শেখ হইবার পূর্বেই জাপান চীনের সহিত মিচমাট করিয়া কেসিবার জন্য প্রার্থনা চেষ্টা করিতেছে। জাপান কোন যত্নে 'চৈত্র' দিয়া চলিয়া আশেপাশে জয়ের আশা করিতেছে। ('Japan is placing her hopes in fighting until Churchill and President Roosevelt get too tired to fight')।

পরবর্ত্ত-দৃষ্টি হাচিরো আরিজের নেতৃত্বে ২০ বৎসর যুদ্ধ পরিচালনের জন্য এক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। টোকিও বেতার-কেন্দ্র এই কমিটির বিষয় উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছে—“People now are talking of a 20 years war or even a 100 year war. The longer the war lasts in the Pacific, the better it is for Japan.” কল্পিত নিরবচ্ছিন্ন বিগ্রহ-বহিঃ দীর্ঘকাল প্রচ্ছলিত রাখিবার আশা জাপান কোন সাহসে করিতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

রুশ-তুর্ক সন্ধি বাতিল—

রুশিয়া সম্ভ্রান্ত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুর্ক সন্ধি পরিত্যক্ত করিয়াছে। এ সন্ধিতে তুর্কদের সহিত রুশিয়ার পরামর্শ করা সম্ভব মনে করে নাই। অতীতেও ক্যাথারিন দি গ্রেট হইতে বিভিন্ন কালের রুশ সরকার তুর্ক সাগর হইতে বহির্গমনের পথে জাপানের অধিকার স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এবারও সম্ভবতঃ রুশিয়া ভারতবর্ষের সমস্তা উপাধান করিবে এবং সম্ভবতঃ তুর্কদের এ সন্ধিতে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কথাবার্তা চালাইবে না। এ ব্যাপার-সইরা ইংরেজ সাংবাদিকরা রুশিয়া সন্ধি নানা প্রকারে জল্পনা-কল্পনা করিতেছে।

... .. अनिष्ट भयानक प्राणनि रक्षि

নাথবাধারে। শৈথিক লোকান। তাহাজ্জ তেজাবতীর কারবার। কলিকাতার বাজী-বন আছে। সহরের মানুষ। বাড়িতে বিবাহ যা আর এক বিবাহ ঘনম। ঘনমের দু'তিনটি ছেল-মেয়ে। ইহাদের লইয়া তার সঙ্গার। কালিনীকে বধু করিয়া ঘরে আনিতে মাঘের আগতি হইল না। কে-কু গিয়াছে, তার খালা যা এখনো তুলিতে পারে নাই। তাহাজ্জ সে বোয়ের জন্ত ছেলেকে যা কোনো দিন বদ-বাসী করিতে পারে নাই। এখন এ মেয়েকে আগে হইতেই ছেলের মনে ধরিয়াছে...ছেলে ঘরে থাকিবে...এই আনন্ডেই মা আর কোনো চিন্তাকে মনে স্থান দিল না।

সুশীল বলিল গোপীনাথকে—কালির নামে কিছু টাকা রাখিয়া করে দিতে হবে তোমায়। না হলে পরে আমার মান থাকবে না। গোপীনাথ বলিল—চায় হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিবে দেবে।

কোম্পানির কাগজ লিখাইয়া সুশীল সে-কাগজ দিল কালির হাতে; বলিল—কাজে রাখো কালী...

গোপীনাথ বলিল—রবি ভাবেন কোনো দিন ও-কাগজ আমি কেড়ে বেড়ে ফেলবো, কাজ কি সে সন্দেশে। ও-কাগজ আপনি নিজের কাছে রেখে দিন বস।

সুশীল বলিল—তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে গোপীনাথ। একটা অভায় করে তুমি যে-ছাতি নিয়ে সে-অভয়ের প্রতিকার করছো, এর জন্ত তোমাকে আমি শুধু বিশ্বাস নয়, শ্রদ্ধা করি। তুমি ভুয়া নও। বহি মাছবের আশীর্বাদের ভাব থাকে, তাহলে আমি আশীর্বাদ করছি তোমাদের মঙ্গল হবে।

সুশীল চলিয়া আসিতেছিল, কালিনী আসিয়া টিপ করিয়া পারের কাছে প্রণাম করিল, বলিল—মাঝে মাঝে আসবেন বাবা।

সুশীল বলিল—আসবো। এলিক এলে তোমাদের দেখে যাবে।

তার পর সুশীল কিলির চালশার মাতুলালয়ে।

সরস্বতী বলিল—কাজ চুকলো?

সুশীল বলিল—তোমার আশীর্বাদে।

—কালীর শান্ত্তী আছে?

—আছে। কালীকে সে আদর করে' ঘরে নিয়েছে।

সরস্বতী বলিল—এবার চ' এখন থেকে।

—বাসে যা, মাঝাবাদকে বলি।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—এবার আমার একটা কাজ করে নাও, সুশীল।

—কলুন।

—আমার আর কথার মতো বিবাহ চৌকি পেয়া গোবাচ্ছে না বাবা। ক'দিন আমি জনক জেবেছি। জেবে থির করেছি, বিবাহ সম্পত্তি সব ঠাঠ-প্রপাটি করে যাবে। যে দিন-কাল...তার উপর ছেলের লেখাপড়ার খরচ যেন নেই, ওরা নবাবী করতে চায়, বিলাসিতা চায়। মৃত্যুর মনে বহি নবাবী-পাখ লাগে, তাহলে সম্পত্তি ক'দিন। তাহাজ্জ বিবাহের ছেলে...এই মনেই ছেলে।

সব আগে। তার পর যা আমার থাকে, সব বিবাহের নামে গিয়ে যাবে। এ'রা হবেন সেবাদেস্ত। মাসে মাসে টাকা পাবেন। তাহলে হবে কি, জানো? কে-টাকা পাবে, তাতে সঙ্গার চল যাবে অন্যায়সে; বন্ধুকা দিয়ে সম্পত্তি বাবার ভ্রু থাকবে না। যিনি নবাবী করতে চাইবেন তাঁকে পরিশ্রম করে সেনাবাবীর পর্যা যোজগার করতে হবে।

সুশীল বলিল—বেশ।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—এ-কথা তুমি ছাড়া আর কেও জানবে না। না তোমার মামীমা, না তোমার মা...বুঝলে।

—আচ্ছা।

মাখন গাঙ্গুলি বলিলেন—তোমার মামীমার জন্ত শুধু আদায় কিছু টাকা দেবে। বিপ-হাজার টাকার গুরুমেট-পেপার। ঐ টাকাতে তিনি তাঁর-বধু কখন—যা খুশী কখন। বৃত্তাকালে যাকে খুশী ও-টাকা তিনি দিয়ে বেতে পারবেন।

৩৩

আরো দু'মাস কাটীয়া গিয়াছে।

সুশীল কলিকাতার আসিয়াছিল—জরুরি কাজে। কাজ সারিয়া ফিরবার পথে গোপীনাথের গৃহে আসিল।

গোপীনাথ গৃহে ছিল; বলিল—ছেলে হয়েছিল...বাচ্চলো না কালী কীদে। আপনি একটু বুকেরি শাঙ করুন।

সুশীল বলিল—চলো।

কালিনীর চোয়ার বিভক্ত। সুশীলকে দেখিয়া কঁপিল। সুশীল বুঝাইল...তার পর চলিয়া আসিলে, গোপীনাথ ছিল বাহিরের ঘরে। কে লোক আসিয়াছে, তার সঙ্গে কথা কহিতেছে।

সুশীল ডাকিল—গোপীনাথ...

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে হুকিল। হুকিবামাত্র বাহাকে দেখিল, চমকিয়া উঠিল। কহিল—অখিল।

গোপীনাথ বলিল—আমার বন্ধু!

—বটে। জানতুম না।

অখিলের মুখ নিম্নেরে দাল।

সুশীল বিম্বর বোধ করিল। গোপীনাথের বন্ধু হইয়াছে, ইহাতে অখিলের লজ্জার কি থাকিতে পারে। সুশীল বলিল—এ-কথা কোনো দিন তো তুমি অখিল।

গোপীনাথ বলিল—সে সময় ওর বিবাহ হাওয়া চলছে...

সুশীল বলিল—আচ্ছা, তোমার বসে, আমি আসি। তোমাদের ওখানকার খপর ভালো, অখিল?

অখিল বলিল—আমি প্রায় দু'মাস দেশে বাইনি।

—হ'। লেখাপড়া করছো।

অখিল জবাব দিল না। তার জবাবের অপেক্ষা না করিয়া সুশীল প্রেহান করিল।

কলিকাতা হইতে সুশীল আসিল চালশার বিদ্যুৎবতীর কাছে।

বিদ্যুৎবতী মগিলেন—হ'—চায় মিন থাকিবে তো আমার কাছে?

সুশীল বলিল—এসেছি এখন, তখন দুসো-পায়ে বিলাস সেজেছে মামীমা। একবার মামীমাবু'র সঙ্গে দেখা করে আসি। আমার থাকবে তোমার কাছে...ভাখানে নয়।

পরের দিন...সুশীল বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে, হঠাৎ
অখিল আসিয়া চোবের মতো ঝাঁড়াইল।

সুশীল বলিল—এ কি অখিল? না, তার ছায়া?

অখিল হাসিল...মলিন হাসি।

সুশীল কহিল—কবে এলে কলকাতা থেকে? কৈ, আমাকে
কাল তো বললে না যে এখানে আসছো।

অখিল একটা নিখাস ফেলিল; তার পর চারি দিকে চাহিয়া
সুশীলের কাছ বেঁধিয়া বসিয়া পড়িল।

সুশীল বলিল—আমার সঙ্গে কথা আছে?

—আছে সুশীলনা। বলিয়া অখিল তার পারে হাত রাখিয়া
কল্প মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল—আমায় বাঁচাও সুশীলনা...

পা সরাইয়া লইয়া সুশীল বলিল—কি হয়েছে?

অখিল বলিল—ঐ গোপীনাথ...তোমাকে খুব মানে। ওকে বলে...

বিশ্বয়ে সুশীলের দুই চোখ বিস্ফারিত। সুশীল বলিল—ওকে
কি বলতে হবে?

অখিল আর একটা নিখাস ফেলিল...বেশ বড় নিখাস। নিখাস
ফেলিয়া অখিল বলিল—গোপীর সঙ্গে ফাষ্ট ইয়ার থেকে ভাব
ও লেখাপড়া ছেড়ে দেছে। আমার মাঝে মাঝে টাকার দরকার
হতো—বাবাকে লিখলে বাবা দিত না—গোপীর কাছ থেকে
তাই ধার করতুম। তার পর মার কাছ থেকে টাকা এনে শোধ
দিতুম। বিয়ের আগে শ'খানেক, তার পর লাঠ এপ্রিলে শ'দেড়েক
—এই আড়াইশো টাকা ধার...এটা আর শোধ করতে পারিনি। মা
হলেছিল, শীতের সময় শবুর গোষড়ার তত্ত্ব করবে, তাই থেকে টাকাটা
আমাকে দিয়ে দেবে। শবুর তত্ত্ব করেছিল। শালের দরুন মা
হলেছিল নগদ টাকা দিতে...আমার পছন্দমতো শাল আমার কিনে
নেবে। শালের দরুন শবুর দিয়েছিল চারশো টাকা। বাবা সে-
টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজলো। মা চাইলো, তা দিলে না। বললে, বাবার
যে পুরোনো শাল আছে—গায়ে তায়নি—সেই শাল আমাকে দেবে।

এক-নিখাসে এতখানি বলিয়া অখিল চূপ করিল। তার পর দম
লইয়া আবার বলিল—মা টাকা দিতে পারলো না। গোপীকে
বলেছিলুম ওর টাকা স্বদণ্ডে ফেলে দেবো জাহ্নুয়ারি মাসে—তা
জাহ্নুয়ারি ছেড়ে এপ্রিল মাস শেষ হয়ে গেছে, ওকে কিছু দিতে
পারিনি। পরন্তু ও উকিলের চিঠি দেছে—সাত মিনের মধ্যে স্বদণ্ডে
টাকা না দিলে নালিশ করবে। তুমি আমাকে বাঁচাও সুশীলনা।
নালিশ করলে, বাবা বেরকম মাহুৰ, একটি পরশা দেবে না।

কথার শেষে অখিলের দু'চোখ বাষ্পভারে সজল আঁধার। সে
চাহিল সুশীলের পানে। সুশীলের মুখ গম্ভীর...দৃষ্টি অবিচল...
অখিলের উপর সংবদ্ধ।

জবাব না পাইয়া অখিল ডাকিল,—সুশীলনা...

—কাল রাত্তি বসিল।

আছে কলেজে। থিয়েটার দেখা, হোটেল মাঝে মাঝে বন্ধুদের
খাওয়ানো...

সুশীল বলিল—তাতে আড়াইশো টাকা সেনা হতে পারে না।

অখিল মুখ তুলিল না, কোনো জবাবও দিল না।

সুশীল বলিল—হঁ। তা আমাকে কি করতে হবে, তুমি?

অখিল বলিল—গোপীনাথকে শুধু বলা, এত দিন চূপ করে আছে,
আর বড়-জোর একটা মাস। সামনে বগীবাটা খন্তর-বাড়ীতে নেমন্তন্ন
হবে—মাকে বলেছি সাড়ে তিনশো টাকা না পেলে আমি শুধু
নেমন্তন্ন যাবো না তা নয়, বাড়ী থেকে পালাবো।

চমৎকার! সুশীলের রাগ হইল। কিন্তু সে-রাগ চাপিয়া

সুশীল বলিল,—বাহাদুর হয়েছে বটে। তুচ্ছতাক্ সব বেশ
আদৃত করেছে। ইউ নো হাউ টু ড মনি স্ক্রম ফণ্ড মার্শাল।
তা শোনো বাবু আমাকে যখন এমন করে বলছে, তখন গোপীকে
আমি বলে দেখবো এক মাস সে বেন নালিশ না করে। বগীবাটার
কথা বলতে পারবো না। ওতে আমার মাথা ঝেঁট হবে। কিন্তু এর পর
এ সম্বন্ধে আমাকে তুমি কোনো অনুরোধ করো না। টাকা-কড়ির
সম্বন্ধে কাকেও অনুরোধ করা কোনো ভুলস্বভাবের উচিত নয়। বুঝলে?

এ-যাত্রা তো বাঁচন। আরামের নিখাস ফেলিয়া অখিল বলিল,

—এ নিয়ে তোমাকে আর কখনো অনুরোধ করবো না। মা বলেছে,
বগীবাটার সময় টাকা দিয়ে দেবে।

—মাকে বলেছো এ কথা?

—বলেছি।

বৈকালে সুশীল বাহির হইতেছিল, হঠাৎ দুন্দাড় শব্দে গাছ-
পালা নড়িল, মাটা কঁপিল। সুশীল ঝাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিল।
মেঘ নাই, ঝড় নয়। গাছপালাগুলোর মাথা কে বেন ধরিয়া মাটাতে
নোয়াইয়া পরস্পরে আবার তুলিয়া ধরিতেছে। ঘর-বাড়ী হুলিতেছে।
চাঁকর করিয়া ডাকিল,—মামিমা, ভূমিকম্প...

বলিয়া ছুটিয়া গৃহমধ্যে গিয়া হুকিল। বিজয়ের ছেলেকে বুকে
চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিল; সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত দেহে বিদ্রুমতী...

দিকে দিকে শব্দধ্বনি...কঁপের রব...

তার পর নিমেষে আবার সব নিখর নিষ্কম্প।

বিদ্রুমতী বলিলেন—মেহিনা স্থির হয়েছে। আঃ।
সুশীল বলিল—কি জোর-ভূমিকম্প। খোকাকে নিয়ে তুমি
বাইরে বসো, আমি ও-বাড়ীতে গিয়ে সব দেখে আসি।

বিদ্রুমতী বলিল—যা বাবা।

সুশীল তখন ছুটিল।

খোকাকে বুকে লইয়া বিদ্রুমতী বলিলেন...যেন কাঠ।

ও-বাড়ীতে হলহুল ব্যাপার। ছেলে-মেয়েরা ঠিক আছে, কিন্তু
মাখন গাছুলি...

—একজন পুরোনার কাঁপিল ডাকিয়া কঁপে

ডাক্তার বঙ্কবাবু আসিলেন প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে। বুল-বাড়ীর বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—চার-পাঁচটা ছেলে বেশ লখন। আটচালা ডিঙিয়া গিয়াছে। আলিসের পায়ের উপরে একটা বড় খুঁটা—তার গায়ে প্রেন।

মাখন গাঙ্গুলির পরিচর্য্যার রাত আটটা বাজিয়া গেল। তার পর সুশীল ফিরিল বিদ্ধমতীর কাছে।

বিদ্ধমতী বলিলেন—শীগগির যা বাবা, কেশব ঠাকুরের ওখানে। কদম তিন-চার বার এসেছিল কীদতে কীদতে। কেশব বাড়ী আসছিল ছুটতে ছুটতে, বাড়ীর কাছে মন্ত যে শিমূল গাছ, সেটা মড় মড় শব্দে ভেঙ্গে একবারে কেশবের মাথায়...

তার পর?

—গাছ কেটে কোনো মতে সকলে কেশবকে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে গেছে—কিন্তু জ্ঞান নেই।

চোখের সামনে পৃথিবী যেন মল্লভূমি হইয়া দেখা দিল! সুশীল পাড়াইল না—তখন ছুটিল কেশব ঠাকুরের গৃহে।

লোকে লোকাবণ্য। উড়ানের পর লাঙরা। সেই লাঙরায় একটা মাগুরের উপর কেশব ঠাকুরের দেহ পড়িয়া আছে...পিণ্ডের মতো। নিশ্চল।

ভিড়ের মধ্যে কদম কোথায় ছিল, সুশীলকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া তার পায়ের আসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সবচেঁ তার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাকে বসাইয়া সুশীল বলিল—

কান্নার সময় এখন নয় কদম। জ্ঞান হয়েছে?

—না।

—ডাক্তার?

—কে ডাকবে?

—এত লোক মিলে শুধু তামাসা দেখছে। বাঃ! তুমি কেঁদো না,

আমি এখন ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আসছি।

সুশীল ছুটিল।

কদম সগরে আসিয়া কপাট ধরিয়া পাড়াইয়া রহিল...পুখের দিকে চাহিয়া...বিজ্ঞানের মতো। [ক্রমশঃ]

—অশ্রু-অর্ঘ্য—

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিজ্ঞান, এম-এ, ৪৪১ চৈত্র ববিবার বালোক গমন করিয়াছেন। তিনি জাহ্নবীর মাসের শেষ সপ্তাহে তে নিউমোনিয়া রোগে ছুপিতছিলেন।

তিনি এক জন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রামাণিক এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগে তিনি কুড়ি

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

বঙ্গবাসী কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ১৬ই চৈত্র শুক্রবার পরলোক গমন করিয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার বিলম্বিত সুনাম ছিল। প্রগতি লেখক-সঙ্ঘের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যেবী-শক্তি ও বাগ্মিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। ছাত্রমতো হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁহার তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

গিরিজাকুমার বসু

১৪ই চৈত্র বুধবার স্রবণ গিরিজাকুমার বসু পরলোক গমন করেন। তিনি স্রপ্রসিদ্ধ কাষ্ট বুক-প্রশেতা প্যারীচরণ সরকারের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি অধুনালুপ্ত "ভারতী" পত্রিকার সহিত বিশেষ ভাবে সান্নিহ ছিলেন। এবং বহু দিন সাপ্তাহিক "বীণালী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার "ধূলি" নামক কাব্যগ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শৈবশচন্দ্র সরকার

কাঁপাহারের স্বনামধন্য জমিদার শৈবশচন্দ্র সরকার ৩৫ বৎসর বয়সে ২৭শ মাঘ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

স্বগ্রামে তিনি শিবচন্দ্র হাইস্কুল, শিবচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয় ও মাতঙ্গিনী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। দুইয়ের অভাব মোচনায় প্রকাশ্য ও গোপন দানসমূহের জন্য তিনি স্থানীয় জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও অজিত পাত্র ছিলেন। যুগ্মকালে তিনি পট্টা



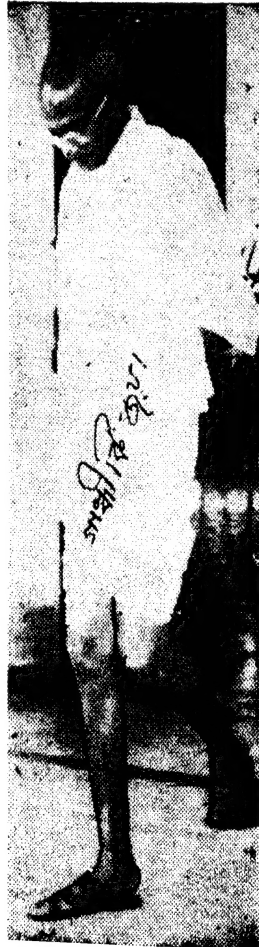
—কলিতেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি

জাতীয় সপ্তাহ

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই

এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ভারতবর্ষব্যাপী যে “জাতীয় হ” পালন করা হয়, এবারেও তা হইতেছে। কিন্তু ইহা শুধু ত বৎসরের পূর্ক-নির্ধারিত ব্যব হিসাবে পালিত হইয়া থাকে না। এই আটটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের মর্ম্মর-স্ত চিরদিন খোদিত হইয়া থাকিবে। বিশ্বরণ কোন ন ইহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিবে না। ভারতের গণমানসে ইহা ভবিষ্যতে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় কতার উজ্জল আদর্শ অনির্বাণ ও অন্ধান করিয়া থিবে।

যুগে যুগে গতিশীল ইতিহাসের আব-
ক্রান্তি এমনি কয়েকটি দিন এক-
কটি জাতির জীবনে আসে—যাহা
দিন সেই জাতির বালু-কাঁকর-বিস্তৃত
ত্রাপথে অক্ষরস্ত সংগ্রামের প্রেরণা
বাগায়, যাহা প্রাণশক্তিহীন, মরণোন্মুখ
জাতির কাণে কাণে আশার মাতৈঃ
গী শোনায় এবং ভেদবৈষম্য ও অনৈ-
ক্যর বেহুরো কলরবের মধ্যেও ঐক্যের
গংহত গম্ভীর ঐক্যতান রচনা করে।
আমাদের পরাধীন জাতির জীবনে
এমনই কয়েকটি দিন আসিয়াছিল ১৯১৯
খ্রষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই
এপ্রিল পর্য্যন্ত। নিম্নিত মহাজাতির
সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রায়-বিস্তৃত বিক্রম,
পৌরুষ ও বীর্য, স্বাধীনতা ও আত্ম-
প্রতিষ্ঠাবোধ আজ হইতে ২৬ বছর
পূর্কে ৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী এক অভূত-
পূর্ক জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে মূর্ত
হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঘটনা-পরম্পরায়
ভরস্বায়িত হইয়া ১৩ই এপ্রিল জালিয়ান-
ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে
হিন্দু-মুসলমান-শিখের ভারতীয় শোণিত-
ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলিত হইয়া-
ছিল। সাম্প্রদায়িকতার সর্কার কারাগার
চর্ণ করিয়া, দলীয় স্বার্থকলঙ্কিত তথাকথিত



অতীত ইতিহাসের কাহিনী

হিসাবে অবশ্য আজ তাহা আমরা
নিশ্চয়ই স্বরণ করিব না। মহাত্মা
গান্ধী বলিয়াছেন—“আমরা মধ্য-
রাত্রির তমসার মধ্য দিয়া অভি-
সারে চলিতেছি। হয়ত বা এখনও
আমরা কঠোরতম দুর্ভাগ্যের সম্মু-
খীন হইতে পারি নাই। কিন্তু এই পবিত্র সপ্তাহ এখনও
আমাদের আশা-ভরসার স্থল। সুতরাং আমরা ক্ষতবিক্ষত
হইয়া পড়িলেও এবং গবর্ণমেন্ট জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য
করিলেও আমরা উহা উৎসাপন করিয়া যাইব।”

আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ আজও কারাগারে বন্দী।
যখন বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শকে পুনর-

জীবিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার মহৎ
সঙ্কল্প লইয়া মিত্রশক্তিবর্গ সর্বস্ব পণ
করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং সেই যুদ্ধে
যখন তাঁহাদের জয়ও আজ নিশ্চিত,
তখন কি অপরাধে এবং কোন্ আদালতের
বিচারে আজও আমাদের দেশের জাতীয়
নেতারা এবং হাজার হাজার দেশ-
প্রেমিক কর্ম্মীরা কারাগারে বন্দী হইয়া
আছেন, তাহা আমরা জানি না।
স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর যোদ্ধা হওয়ায়
যদি তাঁহাদের অমার্জনীয় অপরাধ হইয়া
থাকে, তাহা হইলে সে-দিনের ডায়াটন
ওকস্ অথবা গ্যাঙ্গানী দিনের সানু-
ফ্রান্সিসকো-
সুঘোষিত আদর্শ
ও উদ্দেশ্য কি হাঙ্গ

জাতীয় সপ্তাহে

সঙ্কল্প হইবে সাম্রাজ্যবাদ।
ক্রিয়াশীল বড়মস্তকে চূর্ণ
দূঢ়তার সহিত সম্মিলিত পদে
পৃথিবীর অত্যাচার স্বাধীন জাতির সহিত
পা মিলাইয়া বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-স্বাধীনতা
প্রতিষ্ঠার পথে অভিযান করা।

বাক্সালার শাসন-সঙ্কট

বাক্সালার রাজনৈতিক আকাশ আবার
মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। সেখ যে ছিল না তাহা
সংস্কারমূলক ঘটনার নিষ্ঠুর বাস্তব-প্রতি-

কৃষকের পরে ভারতীয় শিল্পপতিদের সহিত সহযোগিতার ব্যবস্থা
করিতেছে। ভারতে বুটেনের ভূতপূর্ব প্রেড কমিশনার সার টমাস
এইনসে, লণ্ডনের ব্যবসায়ী সমিতি এবং কয়েক জন ব্যাংক-পরিচালক ও
ইংরেজদের এক, রামর্শ দিয়াছেন।

ভারতে ব্রিটিশ-নীতি সম্পর্কে কিছু চিন্তা করিতে গেলে এই
কয়েকটি কথাই বিশেষরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠে—

(১) ভারতে শিল্প-বিস্তারের গতি এবং ধারা পরিচালন
করিবেন ব্রিটিশ সরকার। (২) তাহাতে ইংরেজদিগের (ধনিক ও
শ্রমিকদের) স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। (৩) 'ভারতীয়
শিল্প' ছদ্মনামে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা এই দেশে ব্যবসা চালাইবে।

(৪) ভারতীয় শিল্পের সাহায্যের আড়ালে বুটেন প্রভাব বিস্তার করিবে।
এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতের শিল্পোন্নয়ন অথবা পুনর্গঠন কি করিয়া
সম্ভব হইতে পারে?

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, স্বাধীনতা এবং
জাতীয় সরকার ব্যতিরেকে অল্প কোন উপায়ে আমাদের উন্নয়ন-
পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে না।

চিনির বরাদ্দ হ্রাস

গত বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে চিনির উৎপাদন
হ্রাস পাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকায় ভারত সরকার বে-সামরিক
জনসাধারণের ব্যবহার্য চিনির পরিমাণ কুমায়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া-
ছেন। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের আখমাড়াই বলসমূহে সর্ব-
সমেত ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয় এবং ১৯৪৩-৪৪
খৃষ্টাব্দে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২ লক্ষ ২১ হাজার টনে পৌছায়।
বর্তমান বৎসরে নানা কারণে চিনির উৎপাদন হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা
বহিয়াছে।

ভারতের মধ্যে ইক্ষু-উৎপাদনে যুক্ত-প্রদেশ শীর্ষস্থানীয়। এ
বৎসর তথায় শতকরা ৭ ভাগ আখ কম জন্মিয়াছে। ইহা ছাড়া গুড়
উৎপাদন সম্বন্ধে আইনের শৈথিল্য থাকায় এবং এই ব্যবসা অধিক
লাভজনক বিবেচিত হওয়ার কৃষকগণ চিনির কলগুলিতে আখ জোগান
কুমায়া দিয়াছে। তাহার উপর রেল বিভাগের অব্যবহার্য জন্ত
মাগগাড়ীর অভাবে কলগুলিতে সময়-মত উপযুক্ত পরিমাণে আখ
পৌছিতেছে না। সর্বশেষে উপযুক্ত রাসায়নিক সাবের অভাবে
আখ জন্মিয়াছে কম, এবং তাহাতে মিষ্টতার ভাগও অল্প। এই
সকল কারণ বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া-
ছেন যে, এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় চিনির উৎপাদন অন্ততঃ
শতকরা ২০ ভাগ কম হইবে, ফলে চিনির বরাদ্দ হ্রাস পাইবে।

আমরা চিরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, ভারত সরকার যখনই
বরাদ্দনীতি সম্পর্কিত কোন বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তখনই
বাঙ্গালার অধিবাসীরাই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এবারও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের সরকারী
দপ্তরগুলি দ্বারা আকড়াইয়া আছেন, তাহার জনসাধারণের সুখ-দুখ
স্বন্ধে উদাসীন। কেন্দ্রী সরকারের অগ্রদূত ব্যবস্থা মধ্যপথে তাহাদের
স্বন্ধে উদাসীন। কেন্দ্রী সরকারের অগ্রদূত ব্যবস্থা মধ্যপথে তাহাদের

অন্ত থাকে না। বস্ত্রের সাম্প্রতিক অভাব আমাদের এই আ-
শ্রয়্যক প্রমাণ। আলোচ্য চিনির বরাদ্দ-হ্রাস সরকারী হ্রাস
পুনরাবৃত্তি।

কেন্দ্রী সরকার চিনি কেন কুমায়েলেন, এতটা পরিমাণ কুমায়ে
উচিত ছিল কি না, তাহা আমরা আলোচনা করিব না। আমাদের
বক্তব্য শুধু এই যে, কেন্দ্রী সরকার যখন চিনির বরাদ্দ কুমায়ে
কুমায়েলেন, তখন কোন অজুহাতে অথবা অধিকারে বাঙ্গালা সরকার
তৃতীয়াংশ কুমায়েলেন? বাঙ্গালা দেশের বেশনি বিভাগের জিরেদার
মিষ্টার এ, সি, হাটলী শহরের বেশনি-ব্যবহার্য সঞ্চয় সঞ্চয়ে একতরফ
হইয়াই ঘোষণা করিলেন, ২রা এপ্রিল হইতে মাথা-শিছু চিনির বরাদ্দ
সেড় পোয়া হইতে এক পোয়া করা হইবে। বাঙ্গালা সরকার না কি
আরও স্থির করিয়াছেন, মিষ্টার-প্রভুতকারীদের বরাদ্দ চিনির পরিমাণ
এই সঙ্গে বর্তমানের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ কুমায়েলেন
হইবে। বে-সামরিক জনসাধারণের ব্যবহার্য চিনি হইতে অজুহাত
বাঙ্গালা সরকারের নিকট এই যে বিপুল পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে
ইহা বাইবে কোথায়? প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় চিনি
জোগাড় করা যখন দুশ্রুত হইবে, তখন স্বতঃই চোরাবাজারের দ্বার
উন্মুক্ত হইবে। সরকার কি করিয়া তাহা ঠেকাইয়া রাখিবেন?

সরকার ও কর্পোরেশন

মাস-ধানেক পূর্বে বাঙ্গালা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের
একখানি অল্পবোধ-পত্র প্রেরণ করেন। অল্প সেই অল্পবোধ
হুমকীরই রূপান্তর। তাহাতে সরকারের ১৩ লক্ষ প্রস্তাব অবিলম্বে
কার্যে পরিণত না করিলে কর্পোরেশন ব্যতিল করিয়া দেওয়া হইবে-
এইরূপ হুমকী দেখান হইয়াছিল। কর্পোরেশনের সমস্ত সম্পদ সরকারের
এই রূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।
সম্প্রতি সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই অভিযোগের একটি জবাব
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের
ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার তাড়াহুড়া দিবার ইচ্ছা সরকারের নাই,
কেবল তাহার মনস্থির করিবার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছিল।
তাঁহার এখন বলিতেছেন যে, অল্পবোধগুলি সমর্থন করিয়া প্রস্তাব
গৃহীত হইলে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কর্পোরেশনের
উপযুক্ত সময় ও সাহায্য দেওয়া হইত। ৭ই মার্চের পত্র দ্বারা
এইরূপ সুর ছিল না।

সরকার বলিতেছেন, কলিকাতা শহরের বায়ুপ্রদূষণ
ব্যাপারগুলি অনেক দিনের পুরাতন। পুরাতন ব্যাপার সম্বন্ধে
এত দিন নিরস্ত থাকিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া পত্রের দ্বারা
প্রয়োজন? গলদ শোখনের উপায় গণন নহে—আমরিক
সহযোগিতা। কর্পোরেশন ইচ্ছা করিয়া রাত্তা-বাট অপরিহার্য
রাখিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু
এই দুঃসময়ে ইচ্ছা থাকিলেও সব কাজ সুসম্পন্ন করা পত্রের দ্বারা
সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে তো অসম্ভব।

আমরা সরকারকে অল্পবোধ করিতেছি, ভীতি প্রদর্শন অথবা
হুমকী ত্যাগ করিয়া সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। তা
১৩৫১

দিন আগত এ

‘হাঙ্গা’ গান্ধী বোম্বাইএ সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন—
‘we were never nearer the goal than now in-
le of our many blunders.’ অনেক ভুল করিয়া থাকিতে
।, তবু কাম্য স্বাধীনতার আশ্রম আমরা বত নিকটে আসিয়াছি,
। আর কখন হয় নাই। ভারতের এই রাজনৈতিক মহা-
বের সকল কথাই মনঃসহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। কাজেই ভারতের
।।। নৈরাশ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁহার এই আশার কথাই
আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

পার্লামেন্টারী কার্যতালিকা

মাত্র আমরা নহি, অনেক রাজনৈতিক-দুঃখেরও মহাত্মা গান্ধীর
বুঝিতে পারিতেছেন না। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, আসন্ন
টীয় সপ্তাহে” গঠনমূলক কর্মতালিকা যথার্থ অনুসরণের কথা
বলে রাখেন। তাহা হইলে পার্লামেন্টারী কর্মতালিকা, এমন কি
ন অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলি দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে
পারিবে। পার্লামেন্টারী কর্মতালিকা পুনরায় অনুসরণ
করিতে পারি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা যাইতেছে।
কলিকাতা, কলকাতা ও বৃহৎপ্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে
কলিকাতা প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ওয়াশিংটনে,
কলিকাতা প্রদেশের কংগ্রেসপন্থীদেরকে পার্লামেন্টারী
কর্মতালিকা আশ্রমে আপনাদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা করিবার অনুমতি
দেওয়া হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে,
কলিকাতা কার্যক্রম সমিতির সমস্তগণ এবং কংগ্রেসের সভাপতি
কলিকাতা হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রকাশ্য কোন সিদ্ধি
করিবেন না।

আবার কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল ?

মনে হয়, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দ্রুত রাজসংসাদিগণ,
ত তুল্যই দেখাই, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এক সার ভেদ-
কল্প-সঙ্কট এ সম্বন্ধে এমন চেষ্টা করিতেছেন, বাহার কল
ভের বক্তৃতা শুনাতেকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে
তে হইয়াছে। মনে হইতেছে, ইহাতে মাকিন-প্রভাবও প্রকল।
ভের ‘নিউ ট্রেইসম্যান এণ্ড নেশন’ পত্র সীমান্ত প্রদেশ ও
প্রদেশ কংগ্রেসের মন্ত্রিমণ্ডল গঠন-প্রচেষ্টা দেখিয়া বলিয়াছেন—
‘should mean that Mr. Gandhi is ready not
rely for passive acquiescence but active
operation. There is no longer a shadow of
doubt for treating him and his followers
as a political party.’

কংগ্রেসও বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সহিত সহযোগিতা করিয়া
মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করুন। বৃটিশ ও মাকিন সাংবাদিকগণ তুল্যভাবে
লিখিয়াছেন চুক্তির প্রতিশ্রুতি করিয়াই যেন বলিতেছেন—“It would
be wise act on its part if it refused to invite its
provinces to invite Muslim League to enter its
ministries even where the Muslim minority is
numerically small. After these preliminary steps
the establishment of a National Government
would no longer be an extravagant hope.”

সানক্রাফিঙ্কো বৈঠকে ভারত

তাই প্রস্তাবিত সানক্রাফিঙ্কো বৈঠকের পূর্বে ভারত সত্তা
একটা কোন সিদ্ধান্ত করিবার জন্যই যোগ্য হইতেক সরকার পরামর্শ
করিবার জন্য লর্ড ওয়াডলেটকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। সান-
ক্রাফিঙ্কো বৈঠকের পূর্বে যে বৃটিশ কমনওয়েলথ কনফারেন্স
আহুত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি হইয়াছেন বক্তৃতা
লাসন পরিষদের সন্ত্র সার রামস্বামী কুলশিয়ার, সার ক্রিষ্টিয়ান
বান মুন এবং সেক্টর রাজা-সমূহের পক্ষ হইতে সার ডি. টি.
কুমারচাট্টা। ইহাও কেহই গণ-প্রতিনিধি নহেন। আমেরিকার
ইতিমধ্যে ইহাঙ্গিকে “bogus British mouth pieces”
আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এমনও আভাস পাওয়া যাইতেছে
যে, কংগ্রেসের সহিত কথা হইয়া গেলে কংগ্রেস ও মন্ত্রিমণ্ডল
দলের কয়েক জন নেতাকে কে-সরকারী সমস্তগণে সানক্রাফিঙ্কো
বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হইবে।

বাক্সালার গভর্ণর

মন্ত্রাজের দেয়রের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বাক্সালার গভর্ণর
মিটার কেসী বলিয়াছেন, “বাক্সালার খাতি-পত্র নষ্ট হইবার সন্ত্র
অতিরিক্ত। মাল কলম্বাকাত করিয়া বাধার অবস্থিয়ার জন্য কিছু
যেই খাতি-পত্র নষ্ট হইয়াছে। তবে সন্ত্রা যেকোন প্রকাশিত হইয়াছে
অন্ত নহে।”

এ উক্তির টীকা নিম্নলিখিত। সরকারের অবতরণের জন্য
পত্র নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। বহু পত্র খাতি-পত্র কেবল
লোকদের মারকত বিক্রীত হইয়াছে, কল লোকের দ্বারা নষ্ট হইয়া
পড়িয়াছে।

কল-বাহিন্য হস্তা বাক্সালার লোক হইয়াছে ও হস্তা-
এক তাহার জন্য যে খাতি-পত্রের অন্তর্গত অসংখ্য সরকারী অবতরণ
অনিত অসংখ্য কল নাই, তাহা আশ্রম কার্যক্রম জাতিতে বার
নাই। অত্র সরকারী সাক্ষাৎকার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাহা
কিহতেই এই জাতীয় “কিহ” মোহ প্রাপ্তি পায়ে না।

